গজেন্দ্রকুমার মিত্র
রচনাবলী

দশম খণ্ড



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

প্রকাশকাল : ১৩৬৪

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন—পূর্ণেন্দু রায়
মুদ্রণ—সিল্ক স্ক্রীন

সম্পাদক
সবিতেন্দ্রনাথ রায়
মনীশ চক্রবর্তী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন
স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

রাই জাগো রাই জাগো

উৎসর্গ

ডাঃ বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

করকমলেষু

কৈফিয়ত

উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের সময় লেখকের কাছে পাঠকবৃন্দের অনেক চিঠি আসে। আমিও বিভিন্ন উপন্যাস প্রকাশের সময়ে অনেক রকমের চিঠি পেয়েছি। নানা কৌতূহল, চরিত্র বা ঘটনা সম্বন্ধে প্রশ্ন—এই সবই বেশী। সর্বাধিক পত্র পেয়েছি 'পাঞ্চজন্য' আর 'আদি আছে অন্ত নেই' প্রকাশের সময়ে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বিস্মিত হচ্ছি 'রাই জাগো রাই জাগো' উপন্যাস প্রকাশের সময়ে এই পরিমাণ চিঠি ও প্রশ্ন বর্ষিত হওয়ায়। উপন্যাসের আয়তন ছোট। তাকে নিয়ে প্রশ্নের এত সব ঝড় উঠবে ভাবি নি। আমার গৌরব—স্বয়ং সাহিত্যসম্রাজ্ঞী আশাপূর্ণা দেবী ধারাবাহিক প্রকাশের সময়ে বহু প্রশংসা করেছেন। কিন্তু বই শেষ হতে শুধু পাঠক নয়—লেখকরাও অনেকে বলেছেন, আর একটু বলা উচিত ছিল। আপনি দ্বিতীয় খণ্ড অবিলম্বে শুরু করুন। এমন কি আশাপূর্ণা দেবীও অতৃপ্তি প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছিলেন, কানীন পুত্রটির কি হল তা জানাই নি বলে। শ্রীমান্ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য লিখেছেন অবিলম্বে দ্বিতীয় খণ্ড ধরুন। পাহাড়ে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হল কিনা—সেটা স্পষ্ট লিখি নি—এই অভিযোগই বেশি।

আমার নিবেদন এই, এত যে বিশদভাবে বলার প্রয়োজন আছে তা ভাবি নি। বাঙালী পাঠক বুদ্ধিমান, শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্য তাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা ওটুকু ভেবে নেবেন—এই ছিল আমার আশা; আর আশাপূর্ণা দেবীর কাছে নিবেদন, বিশাখা যেখানে সর্বত্যাগিনী হয়ে কঠোর সন্ন্যাসের দ্বারা তার স্বপ্ন বা সাধনা সার্থক করতে চেয়েছে—সেখানে কি পিছু ফিরে চাওয়া উচিত, না সম্ভব। আমি অন্তত বুঝতে পারি নি যে এ প্রশ্ন উঠতে পারে।

॥ ১ ॥

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন মথুরা থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার পথ—অতি সামান্য পথই—রাত্রের দিকে বেশ ভয়াবহ ছিল।

আমরা বলছি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরবর্তী কালের কথা, ১৯১৯ সালের গোড়ার দিক সেটা। তবে, তাই বা বলি কেন, আমি প্রথম বৃন্দাবনে যাই ১৯২৩ সালে, তখনও দৈবচক্রে মথুরা পে'ছিতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গিছল, ফলে আমরা পাঁচটি প্রাণী দুটো টাঙ্গা ক'রে রওনা হলেও মাঝপথে বেশ যাকে বলে বুক-ঢিপঢিপ-করা তাই করছিল।

অবশ্য আমি বাদ। তখন আমার কীই বা বয়স। গা-ছমছম যে একটু করে নি তা নয়, তবু কিছুটা উপভোগও করেছিলুম। তখনও পর্যন্ত শহরেই থেকেছি—কলকাতা আর কাশী, মুক্ত প্রকৃতি বলতে এই আমার প্রথম দেখা। দুদিকে মানব-বসতি-চিহ্নহীন অন্ধকার ধু ধু প্রান্তর, বাবলা আর ঠে'টির জঙ্গল মধ্যে মধ্যে—মনে হ'ল ঘাসও গজায় না এখানে—শুধু কখনও কখনও দু-চারটে খেজুরগাছ বা কদাচিৎ দু-একটা তালগাছের মতো মনে হচ্ছে, গাছপালা বলতে এই। প্রথম শুক্লপক্ষের চাঁদ অস্ত গেছে, তার একটা আভাস মাত্র আছে পশ্চিম আকাশে, অল্প শীতের হাওয়া—বেশ লাগছিল।

পরে জেনেছিলাম যে মানববসতি-হীন প্রান্তর বা জঙ্গল সেটা নয়—তবে আরও খারাপ। যে মানুষগুলি থাকে তারা হিংস্র পশুর থেকেও সাংঘাতিক, কাউকে একা আড়ালে পেলে দু-পাঁচ ঢেবুয়ার জন্যেও খুন করতে ইতস্তত করে না। আমাকে একবার হাতরাস থেকে 'রতি কি নাগলা' স্টেশনের পথে রাত্রে যেতে হয়েছিল। লাইন ধরে যাচ্ছি, এক গেটম্যান যেতে নিষেধ করেছিল, আমার কাছে টিকিট ছাড়া দু-তিন টাকা মাত্র আছে বলতে হেসে জবাব দিয়েছিল, 'বাবুজী, আগে আপনাকে খুন ক'রে তবে তো দেখবে আপনার কাছে টাকা আছে কি খুচরো পয়সা আছে! একবার একজনকে মেরে এক পয়সাও তার কাছে পায় নি। সেই ভরসায় সে যাচ্ছিল, তবু তার জান গেল!'

গেটম্যানের সে হুঁশিয়ারী মনে ছিল বলেই—১৯৩৭ সালেও একবার যখন মাকে নিয়ে বৃন্দাবন আসি—সঙ্গে আমার এক সাহিত্যিক বন্ধুও ছিলেন—ট্রেন লেট হওয়ার ফলে সন্ধ্যার পর ঐ পথে যেতে বাধ্য হয়েছিলুম, তখন সমস্ত পথ ভয়ে সিঁটিয়ে ছিলুম বলতে গেলে।

তবে আমরা যেদিনের কথা বলছি, সেদিন এই পথ আর ভয়ঙ্কর মনে হয় নি কারও।

না, বড় লাইনের ট্রেন লেট হয়েছে বলে নয়—ইচ্ছা করেই সন্ধ্যার পর যাত্রার

আয়োজন হয়েছে। আলোর জলুস না হলে রেশেলা জমে না।

বিরাট মিছিল—যাচ্ছে মথুরা থেকে বৃন্দাবন।

শ্রীরাধা-গোপীবল্লভের প্রধান সেবাইৎ বা গোস্বামী স্বরূপ তাঁর নববধূকে নিয়ে আসছেন বৃন্দাবনে, শান্তিপুর থেকে।

কালরাত্রি তারা কাটিয়ে নিয়েছেন শান্তিপুরেই। কারণ বিবাহের পরদিন কুশণ্ডিকা ও অন্যান্য কৃত্য সারতেই দিন অপরাহ্নে পেঁছে গেছে। তারপর যাত্রা করার উপায় ছিল না। মানে ট্রেনের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তখন, অত তাড়া করার প্রয়োজনও ছিল না।

পরের দিনই যাত্রা করা হয়েছে। তখন ট্রেন ছিল অনেক মন্থর, সুতরাং আরও একদিন ট্রেনে কাটিয়ে মানে দু'রাত্রি পরে আজই দ্বিপ্রহরে 'বরাত' বা বরযাত্রীর দল এখানে পেঁচেছে। ওখানের চৌবেজী অর্থাৎ এঁদের পাণ্ডা সমাদরে ও সাগ্রহে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে স্নান, আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছেন। দ্বারকাধীশের প্রসাদের ব্যবস্থা করা ছিল—সকলেই পরিতুষ্ট হয়ে তা গ্রহণ করেছেন। বৃন্দাবন থেকে সধবা আত্মীয়া ও দাসীর দল এসে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল—বর এবং বিশেষ ক'রে নববধূকে সাজাবে বলে। তারপর, উদ্যোগ আয়োজন শেষ করতে, মিছিলের অগ্রে কে পশ্চাতে কে কোথায় কার পরে থাকবে তার ব্যবস্থা করতে—যদিও সে ব্যবস্থা শুরু হয়েছে বিকেল চারটে থেকেই—প্রচণ্ড চেঁচামেচি অর্থাৎ সকলেই নিজ নিজ বক্তব্য অপরকে শোনাতে ব্যস্ত—প্রত্যেকেই অপরকে তিরস্কার করতে চায় অযথা বিলম্ব ও অকর্মণ্যতার জন্য—যাত্রা শুরু হয়েছে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবারও এক ঘণ্টা পার করে দিয়ে।

চারটে হাতী—দুটো এঁদেরই, শহরের সঙ্কীর্ণ গলিপথে থাকার স্থান নেই বলে শহরের উপান্তে গোপীবল্লভের বাগানবাড়িতেই থাকে তারা—আর দুটো ভাড়া করা হয়েছে। তাদের উপযুক্ত সজ্জা ও আলিম্পন রেখারও ত্রুটি ঘটে নি। বারোটি সুসজ্জিত ঘোড়া; পাইক বরকন্দাজ—তাদেরও সেদিন মহার্ঘ্য বেশভূষা; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্যে বিশেষভাবে সজ্জিত টাঙ্গা—তাদের ঘোড়ারও জরির কাজ করা ভেলভেটের পৃষ্ঠসজ্জা।

এই সমারোহের ঠিক মধ্যস্থলে কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিরাট চতুর্দোলে বর ও বধূ।

বিরাট মিছিলের আগে ও পিছনে, দুই পাশে য়্যাসিটিলিনের আলো—আলোর বহুমুখী ঝাড়—একটার সঙ্গে আর একটা লাগানো প্রায়। আগে যাকে বাঁধা রোশনাই বলত, সেই রকম। বিজলীহীন কলকাতায় ধনীদের বিবাহে এটাকে স্ট্যাটাস-সিম্বল ধরা হ'ত। তবে সে রোশনাই শুধু বরযাত্রীদের সঙ্গে থাকত না, মেয়ের বাড়ি থেকে বরের বাড়ি পর্যন্ত বা বর থেকে কনের বাড়ি—সারা পথ জুড়ে।

তবে এখানে—আকবর বাদশা যাকে ফকিরাবাদ নাম দিয়েছিলেন—শস্যহীন, প্রায় বৃক্ষহীন অঞ্চলে এ ঘটনা অভিনব বৈকি! কদাচিৎ কখনও ঘটত। ফলে দূর-দুরান্তের গ্রাম থেকে লোক ছুটে এসেছে এই দৃশ্য দেখতে। এও এক রকমের

'তামাশা'। এদের কাছে এসব রূপকথার মতোই অবিশ্বাস্য, স্বপ্নের বা প্রবাদের বস্তু। অন্য তামাশা—নাচগান কি যাত্রা-গানের চেয়ে অনেক বেশী বিস্ময়কর, উত্তেজক।

সবটা জুড়েই এই সব দর্শকদের কাছে সীমাহীন কৌতূহলের ব্যাপার, তবু মধ্যকার ঐ চতুর্দোলাটি সম্বন্ধেই কৌতূহল বেশী। এইখানে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি বেশী—ভাল করে দেখার জন্যে। পাইকদের রূঢ় আঘাতও তাদের দমাতে পারছে না।

ঠিক চতুর্দোলাও নয় কিন্তু, তাতে দেখা যেত না ভাল ক'রে। সে সম্বন্ধে উদ্যোক্তারা সবাই সচেতন—'ওয়াকিবহাল'।

আসলে এটা বিরাট চওড়া সিংহাসন—পিছন দিক দুই পাশ ও উপর দিক মহার্ঘ্যবস্ত্রে আচ্ছাদিত। বারোটি বাহকবহন করছে। আটজন ক'রে সব সময় বইছে—কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়লে তার স্থান নেবার জন্য আরও চারজন সঙ্গে যাচ্ছে—যাকে কাঁধ বদলানো বলে।

এই তিনদিক ঘেরা প্রশস্ত সিংহাসনেই বসে আছেন বর ও বধূ। ফুলের মালা জরি আর কাঁচের বলে উজ্জ্বল ঝলমলে সে আসন রাজা-রাণীরই উপযুক্ত।

এ দৃশ্য আরও মনোরম এই জন্যে যে—বর ও বধূ দুইই এমন অসামান্য সুন্দর—এমন আশ্চর্য মিলন সর্বদেশে সর্বকালেই দুর্লভ। সর্বজাতির মধ্যেও। বর সুন্দর—দেখা গেল কনে কুৎসিত বা অতি সাধারণ। সুন্দরী মেয়ের ভাগ্যেও সুন্দর বা সুপুরুষ বর জোটে কদাচিৎ। বর্তমান কালের তথাকথিত ভালবাসার বিবাহেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না।

এখানে সেই প্রায় অবিশ্বাস্য যোগাযোগই ঘটেছে।

চারিদিকের মাণিক্যমুক্তা খচিত সেটিং-এর মধ্যে বর-বধূকে দুটি বহুমূল্য হীরকখণ্ড বলে বোধ হচ্ছিল।

তৃপ্ত হচ্ছে, মুখর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে প্রশংসায়—রবাহূত গ্রাম্য সাধারণ লোকেরা।

তারা তৃপ্ত—অভাবিত অদৃষ্ট-পূর্ব এই দৃশ্যে। তাদের কল্পনায়, লোকমুখে শোনা রূপকথার রাজকন্যা ও রাজপুত্রকে দেখে।

তৃপ্ত এই সব সঙ্গীরা, বাহকরা, ভৃত্য বা সেবকের দলও।

কারণস্বরূপ গোস্বামী এদের সকলের অতি প্রিয়। ভালবাসে, ভক্তিও করে।

স্বরূপদের এত বয়সে বিয়ে হয় না। হয় নি কারও।

স্বরূপ গোস্বামীর বাবা প্রাণকিশোর গোস্বামীর বিবাহ হয়েছিল এগারো বছর বয়সে।

স্বরূপের বিবাহের কথা উঠেছিল আর একটু বেশী বয়সে—ষোল বছরে। কিন্তু তা হ'তে পারে নি। কারণ সহসাই নিমোনিয়া রোগে প্রাণকিশোর মারা গেলেন। তখন এ রোগের কোন ওষুধ ছিল না—গরম মসনের-পুলটিশ ও আকন্দর তুলো দিয়ে বেঁধে রাখা—সাধারণত এই চেষ্টাই করা হ'ত। সুতরাং যে ভাল হ'ত তার

ভাগ্যের জোর বলতে হবে।

কালাশৌচ থাকতে বিবাহ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। যদিও শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে, কেবলমাত্র বিবাহের ক্ষেত্রে কালাশৌচ সংক্ষিপ্ত করা যায়—এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই সপিণ্ডকরণ সেরে।

কিন্তু এক বছর পূর্ণ হওয়ার পরেও স্বরূপ গোসাঁই বিয়ে করতে রাজী হলেন না। তিনিই এখন কর্তা, তাঁকে আদেশ করবে কে ?

করতে পারতেন অবশ্য একজন--ওঁর মা। রাশভারী তীক্ষ্ন বুদ্ধিশালিনী মহিলা। বস্তুত তিনিই এতখানি সম্পত্তি রক্ষা এবং এত বড় মন্দিরের সেবা পূজা পার্বণ সমস্তই পরিচালনা করেন। তাঁর মুখের ওপর কথা কইতে কেউই সাহস করত না।

কিন্তু স্বরূপ মাকে বোঝালেন, 'আমরা গুরুবংশ মা, এত শিষ্য যজমান আছে, মন্দিরেও বহু লোক আসেন উপদেশ নির্দেশ নিতে—আধ্যাত্মিক প্রশ্ন নিয়ে। মূর্খ হয়ে থাকলে বার বার এদের কাছে অপদস্থ হ'তে হবে। বাবা বাল্যকালে বিবাহ করেছিলেন কিন্তু তাঁর শিক্ষার কোন ত্রুটি ঘটে নি, আমার সপ্ততীর্থ পিতামহ যত্ন ক'রে সব শিখিয়েছিলেন। আমাকে বাবা ইংরেজী স্কুলে পাঠিয়েছিলেন, ওটা জানা এখনকার দিনে দরকার বলে। তাঁর ইচ্ছা ছিল অন্তত ইস্কুলের পাসটা দিয়ে নিলে শাস্ত্র ব্যাকরণ তিনিই পড়াবেন। তা তো হ'ল না। আমি আগে অন্তত বৈষ্ণব শাস্ত্রটা কিছু পড়ে নিই—তার পর বিবাহের কথা চিন্তা করব। তুমি এতে অমত করো না।'

মা শ্যামসোহাগিনী কথাটা বুঝে আর অমত করেন নি। ধীর স্থির ধর্মপরায়ণ এই বড় ছেলেটিই তাঁর সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে গর্বের। সে যদি তার পিতামহের মতো পণ্ডিত হতে পারে—তার চেয়ে বাঞ্ছনীয় আর কি থাকতে পারে তাঁর কাছে!

স্বরূপ বা প্রাণস্বরূপ--পিতা নাম রেখেছিলেন স্বরূপ দামোদর, মহাপ্রভুর ভক্ত প্রধানের নামানুসারে—কিন্তু পিতামহ পুত্রের নামের সঙ্গে মিলিয়ে প্রাণস্বরূপ করলেন, তাঁর কথার ওপর আর কে কথা বলবে ?—নবদ্বীপে না গিয়ে কাশীতেই গেলেন। উদ্দেশ্য বৈষ্ণব শাস্ত্রচর্চার সঙ্গে কিছু সংস্কৃত পাঠও নেবেন। আর কাশীতে যত বড় বড় বৈষ্ণব পণ্ডিত আছেন বা আসেন—তত নবদ্বীপে পাওয়া যাবে না।

কাশীতে উনি পেলেনও বহু বিখ্যাত পণ্ডিতকে। রাধামাধব গোস্বামী, প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতিকে। সংস্কৃতে ন্যায়, ব্যাকরণ, সাহিত্য প্রভৃতিও কিছু কিছু চর্চা করলেন। ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, রামভূষণ শাস্ত্রী, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, হারাণ শাস্ত্রী, প্রভাস কাব্যতীর্থ প্রভৃতির কাছে পাঠ নেবার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল।

মনোযোগ যথেষ্ট ছিল, আগ্রহ ততোধিক। দৈনিক প্রায় কুড়ি ঘণ্টা পরিশ্রমে তিনি পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন ক'রে যখন ফিরলেন—তখন তাঁর দেবদুর্লভ কান্তিতে আরও বিনয় ও মাধুর্য যোগ হয়েছে—এই বিপুল

পরিশ্রমের চিহ্নমাত্রও তাঁর প্রশান্ত সুন্দর মুখে পড়ে নি।

এইবার বিবাহের ব্যবস্থা। আর বিলম্ব করা উচিত নয় কোনমতেই।

এ বংশে দীর্ঘকালের মধ্যে অষ্টমী গৌরী ছাড়া কোন বধূ আসে নি। শ্যামসোহাগিনী এসেছিলেন সাত বছরের মেয়ে। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী, কাল যে বদলেছে, সেই সঙ্গে পাত্রও, এ সম্বন্ধে তিনি সচেতন। চব্বিশ বছরের ছেলের সঙ্গে সাত বছরের মেয়ের বিয়ে দেওয়া চলে না। এ তিনি ভাল করেই ভেবে দেখেছেন।

আত্মীয়রা অবশ্য প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন ঋতু-অভিজ্ঞা কন্যা ঘরে আনার প্রস্তাবে, কিন্তু শ্যামসোহাগিনীই কর্ত্রী, ছেলে কাশী থেকে ফিরে এসেও কর্তৃত্ব হাতে নেন নি, বার্ষিক দেড় লাখ টাকা আয়ের সম্পত্তি, দেবসেবার নানা দায়িত্ব—এতটা তিনি এখনই বহন করতে প্রস্তুত নন। আর প্রয়োজনই বা কি ? মার এসব বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অসাধারণ, শ্রীরাধা-গোপীবল্লভের এই বিপুল সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়মরীতি তাঁর নখদর্পণে—তার মধ্যে স্বরূপ এখনই নাক গলাতে যাবেন কেন ?

সুতরাং শ্যামসোহাগিনীর এই সব যুক্তি ও বিবেচনাহীন আপত্তিতে কান দেবার কথা তিনি চিন্তাও করেন নি।

ওঁদের বংশের উপযুক্ত পাত্রী অবশ্য সুলভ নয়। তিনি নানা পরিচিত ব্যক্তির কাছে চিঠি লিখলেন পাত্রীর খোঁজে। খোঁজও অনেক এলো। ছবি দেখলেন, কেউ কেউ এসে কন্যা দেখিয়েও গেল। শেষ পর্যন্ত শান্তিপুরের এক সদ্‌বংশের মেয়ে পছন্দ করলেন তিনি। সঘর, জানাশুনো পরিবার—আত্মীয়তার সূত্রও আছে একটু। ষোল বছর বয়স, স্কুলে পড়ে নি বেশীদিন, তবে বাড়িতে লেখাপড়া যথেষ্ট করেছে ; সুশ্রী—সুন্দরী বলাই উচিত—সুলক্ষণা মেয়ে ; আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না।

তা ছাড়াও—যদিচ মেয়ের বাবা ওকালতি করেন—তবে তাঁরাও গুরুবংশ। গৃহে কুলদেবতা আছেন, নিত্য সেবা ভোগ হয়। মাছ যদি বা খান—বাড়িতে আজ পর্যন্ত মাংস ঢোকে নি। সব দিক দিয়েই তাঁদের উপযুক্ত পরিবার।

মেয়েটির নাম যমুনা—শ্যামসোহাগিনীই নূতন নামকরণ করলেন, বিশাখা। বললেন, 'বেয়াই মশাই—আগেই সম্পর্কটা ধরে সম্বোধন করছি বলে ধৃষ্টতা ভাববেন না, যখন পাকা কথা হয়ে গেছে তখন সম্পর্কও পাকা বলে ধরে নিচ্ছি —মহাপ্রভু বলে গেছেন, রাধিকার প্রেমের চেয়েও গোপীদের প্রেম শ্রেষ্ঠতর, তাদের প্রেম স্বার্থলেশশূন্য—তাই বিশাখা নাম দিলাম। ললিতা আমার মেয়ের নাম —নইলে ললিতাই দিতাম।'

সেই বিবাহ নির্বিঘ্নে যথাবিহিত রীতিতে সম্পন্ন হয়েছে, সেই শ্রীরাধা গোপীবল্লভের বড় গোসাঁই তাঁর নবোঢ়া বধূকে নিয়ে গৃহে ফিরছেন আজ—এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি আছে।

এই যোগ্য এবং দুর্লভ যুগল মিলনের দৃশ্যে সকলেই তৃপ্ত, প্রসন্ন। অন্তরঙ্গজন উৎফুল্ল।

তৃপ্ত স্বরূপ নিজেও। বুক ভরে গেছে তাঁর সেই শুভদৃষ্টির ক্ষণটি থেকেই। শুধু সুন্দর বলে নয়—এমন একটি স্নিগ্ধতা এমন একটি অপরূপ শান্ত কোমল লজ্জানম্র মাধুর্য সে মুখে যে, যে কোন তরুণ পুরুষেরই বুক ভরে যেতে বাধ্য। মনে হ'ল ঠিক এমনিই তিনি চেয়েছিলেন—জীবনের সঙ্গিনী হবার মতো তো বটেই, যথার্থ সহধর্মিণী হবার মতোও। তাঁদের পুণ্যের সংসার, দেবতার সংসারে উপযুক্ত সেবিকা—হয়ত কালে সাধিকা হয়েও উঠবে।

সেই ক্ষণের পর থেকে নানা সুযোগে নানা অজুহাতেই—চেয়ে দেখেছেন। কুশণ্ডিকার সময়ে তো নিজের বুকের কাছেই ছিল, যুগ্ম অঞ্জলিতে আহুতি দেবার সময় --প্রতিবারেই মুগ্ধ হয়েছেন, আশ্বস্ত ও আশান্বিত হয়েছেন।

আজ এখনও অপাঙ্গে চেয়ে চেয়ে দেখছেন।

সে মুখ—মুখ-কমল তেমনিই আছে, তবে এখন যেটা মনে হচ্ছে, কিছু ম্লান, বরং বিষণ্ন বলাই উচিত। সাধারণত পিতৃগৃহ ত্যাগ করার সময় এমন হয়—কিন্তু এখনও!

আজ সকাল থেকেই একটা সংশয় মনে দেখা দিচ্ছে—তবে কি স্বামী পছন্দ হয় নি ওর? ওর কি আরও কিছু উচ্চাশা ছিল?

কিন্তু তাই বা হবে কেন?

কুশণ্ডিকা সপ্তপদী গমন ইত্যাদির শেষে পুরোহিত যখন বললেন, 'স্বামীকে প্রণাম করো মা—ইনিই ইহলোকে তোমার ইষ্ট, তোমার দেবতা'—তখন একেবারে পায়ে মাথা রেখে প্রণাম ক'রে অমন ভাবে দু'হাতে তাঁর পা দুটো চেপে ধরবে কেন, অমন সবলে?—যেন আশ্রয় প্রার্থনার মতো, অবলম্বনের আশার মতো?

না, না, উনিই ভুল বুঝছেন।

আসলে মা-বাবাকে ছেড়ে আসার জন্য, এতদিনের বাসভূমি, আত্মীয়স্বজন পরিচিত পরিবেশ—সম্ভবত চিরদিনের মতোই—ছেড়ে আসার বেদনা এটা। এই তো স্বাভাবিক। এখন অবশ্য কোন কোন মেয়েকে দেখেছেন—কাশীতে প্রয়াগে মথুরায়—প্রথমটা কান্নাকাটি করলেও, পরে গাড়িতে আসতে আসতেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে—তবে তারা সকলেই বয়স্কা। এর মতো ষোড়শী নয়। তাঁর মা তো নাকি সাতদিন ধরে কান্নাকাটি করেছিলেন।

তিনি চারিদিক তাকিয়ে দেখে—সকলের অন্যমনস্কতার এক অবসরে—বিশাখার কোমল কম্পিত স্বেদার্ত দক্ষিণ হাতটি নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে সস্নেহে একটু চাপ দিলেন।

জানাতে চাইলেন, 'ভয় নেই, আমি আছি তোমার, তোমার সব দুঃখ সব বিষাদ ভালবাসা দিয়ে ধুয়ে মুছে বিলুপ্ত ক'রে দেব। আমার বুকে তোমার শ্রেষ্ঠতর আশ্রয় খুঁজে পাবে তুমি।'

॥ ২ ॥

বহুরাত্রি হয়েছিল বর-বধূর স্বগৃহে পৌঁছতে।

তার পরও—বিগ্রহদর্শন 'ধুলোপায়ে' (এদের জন্যেই ঠাকুরের তখনও শয়ন দেওয়া হয় নি), বরণ, অন্যান্য স্ত্রী-আচার ইত্যাদিতে বহু বিলম্ব ঘটেছে। প্রসাদ গ্রহণ—সে তো নামমাত্র, অত রাত্রে এত উত্তেজনা ও ক্লান্তির পর আহারে কারই বা রুচি থাকে—তবু এক পঙ্‌ক্তিতে বা 'পঙ্গতে' বসলে একা ওঠা যায় না। সকলের খাওয়া শেষ হলে রাধাগোপীবল্লভের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠতে হয়। সুতরাং শুতে গেছেন প্রায় রাত দুটো নাগাদ।

বিশাখা শুয়েছিল শাশুড়ীর সঙ্গে একই পালঙ্কে।

তবে অত ক্লান্তি সত্ত্বেও বহুক্ষণ ঘুম আসে নি।

নতুন পরিবেশ, নতুন সব মানুষ—সঙ্গে একটি দাসী এসেছে, তবে সে তো অবশ্যই অন্যত্র শোবে—ঘুম না আসার এই তো যথেষ্ট কারণ।

তা ছাড়াও, হয়ত স্বামীর চিন্তা, কামনা-আশার অধীরতাও উত্তেজিত রেখেছে মস্তিষ্ককে।

স্বামী শুধু সুপুরুষ এবং প্রিয়দর্শনই নন,—তিনি যে ভদ্র, বিবেচক, স্নেহ-পরায়ণ মধুর স্বভাবের মানুষ, সে পরিচয়ও ইতিমধ্যে পাবার বহু সুযোগ ঘটেছে। সেই জন্যেই কামনা, সেই জন্যেই আশার স্বপ্ন। সে কামনার ধন, স্বপ্নের মানুষকে নিভৃতে পাওয়ার অধীবতাও হয়ত ছিল।

কারণ যাই হোক—ক্লান্তির যথেষ্ট কাবণ থাকা সত্ত্বেও যমুনার ঘুম আসতে অনেক দেরি হয়েছে। দেউড়ির পেটা ঘড়িতে তিনটে বাজাও শুনেছিল। তার পর হয়ত তন্দ্রা এসে থাকবে, কিন্তু ঠিক চারটের সময়ই শ্যামসোহাগিনী তার গায়ে হাত দিয়ে সস্নেহে ডেকেছেন, 'বৌমা, আজ যে একটু বেশী ভোরেই উঠতে হবে মা। আজ যে তোমার দীক্ষা!'

'দীক্ষা!'

বধূ কি চমকে উঠল?

শ্যামসোহাগিনীর হাত তখনও পর্যন্ত বিশাখার গায়েই ছিল, চমকে ওঠাটা অনুভব করতে অসুবিধা হয় নি। তবে তিনি তাতে অস্বাভাবিক কিছু দেখেন নি। ষোল বছরের মেয়ে, একেবারে ভিন্ন পরিবেশে মানুষ—ফুলশয্যার দিন দীক্ষা নেবার প্রস্তাবে তো চমকে ওঠারই কথা।

তিনি তেমনি সস্নেহে বিশাখার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'হ্যাঁ মা, আজ যে তোমার পাকস্পর্শ। তুমি নিজের হাতে আমাদের এ সংসারের মালিক শ্রীরাধা-গোপীবল্লভের প্রসাদ আত্মীয় কুটুম্ব পরিজনদের পরিবেশন করবে, এই তো নিয়ম। তবে দীক্ষা না হলে তো সে অধিকার জন্মাবে না মা!'

আর কিছু বলল না বিশাখা। যেন একটা নিঃশ্বাস দমন ক'রে নিয়ে পালঙ্ক

থেকে নেমে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করল শাশুড়ীকে। তারপর লজ্জাজড়িত মৃদুকণ্ঠে বলল, 'মা—মানে শান্তিপুরের মা— বলে দিয়েছেন প্রতিদিন সকালে উঠে আপনাকে আর—আর—'

'স্বামীকেও প্রণাম করতে! ঠিকই বলেছেন তোমার মা, সৎশিক্ষাই দিয়েছেন। কিন্তু সেও স্নান করতে গেছে, সে-ই মঙ্গল আরতি ক'রে ঠাকুরের ঘুম ভাঙাবে। তুমিও স্নান সেরে নাও, মন্দিরে গিয়ে একেবারে গুরু-গোবিন্দ দর্শন করবে। কিন্তু মন্দিরের মধ্যে, ইষ্ট, মন্ত্রদাতা গুরু আর জন্মদাত্রী জননী ছাড়া কাউকে প্রণাম করতে নেই। খোকা যখন বাইরে এসে দাঁড়াবে সেই সময় সেইখানে প্রণাম ক'রো!'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'স্নানের ঘরে যমুনার জল আনা আছে, বিভিন্ন ঘাট থেকে সংগ্রহ করা জল—ধীর সমীরের ঘাট, কেশী ঘাট, যমুনাপুলিনের ঘাট—এই সব, তার সঙ্গে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ডর জলও একটু ক'রে মেশানো আছে। তুমি সকালের কাজ সেরে একেবারে স্নান ক'রে এসো। আমিও স্নান সেরে নিই। আমিই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো। এত ভোরে দর্শনার্থী কেউ আসবে না। নিভৃতেই দীক্ষা দিতে হয় তো—আমিই তোমাকে দীক্ষা দেব মা।… চমকে উঠো না, আমাকে আমার গুরু শ্বশুরমশাই-ই এ অধিকার দিয়েছেন—তিনি জীবিত থাকতেই বহু লোককে দীক্ষা দিয়েছি, তাঁর আদেশ মতো। স্বরূপ—মানে বর্তমান গোসাঁই, তোমার স্বামীও আমার কাছ থেকেই দীক্ষা নিয়েছেন।'

স্নান সেরে চওড়া লালপাড় সাদা বেনারসী শাড়ি পরে যখন বিশাখা মন্দিরে এসে দাঁড়াল, শ্যামসোহাগিনীও কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ওর হাত দুটি ধরে 'এসো মা, এসো' বলে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গেলেন।

যে দাসী ওর স্নান-তিলকসেবা, চন্দন-পত্রলেখা রচনা প্রভৃতি করিয়ে নতুন বেনারসী শাড়ি পরাল (স্নান ক'রে তখনই নববস্ত্র ধারণ করতে নেই, তাতে অকল্যাণ হয়—সে জন্য অন্য কাপড় পরেই বেরিয়েছে স্নানের ঘর থেকে ওরা)—সে-ই প্রথম বলেছে, 'বাঃ, আমাদের বড় গোসাঁই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীমা ঘরে এনেছেন!' তখনও—লজ্জায় মাথা নত করলেও—এ ক্ষেত্রে তার সঙ্গে যেমন সুখ ও আনন্দের রক্তিমা ও মৃদু হাসি ফোটা উচিত তা বোধ হয় ফোটে নি। এখনও উপস্থিত নিকট-আত্মীয়া ও প্রায়-পরিবারভুক্ত উচ্চস্তরের সেবিকাদের মধ্যে 'আলোচনায়—সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকরুন' কেউ বা 'গোসাঁই এ জ্যান্ত রাধারাণীকে কোথায় পেল?' এ সব প্রশংসা-বাক্য কানে এলেও—মাথা নত ক'রে থাকা ছাড়া আর কোন ভাবান্তর চোখে পড়ল না। নতুন জায়গার নতুন দায়িত্বের মধ্যে—বিশেষ এ বাড়ির বড়বৌ হওয়া মানেই বিশাল দায়িত্বের ভার এসে পড়া —এসে পড়ে নতুন বৌ বিহ্বল বা ভীত হয়ে পড়েছে—এই কথাই ভাবল সবাই।…

মন্দিরে ঢুকে নিজেই গলায় আঁচল দিয়ে বিগ্রহকে বাঁয়ে রেখে প্রণাম করতে আরও খুশী হলেন শ্যামসোহাগিনী, বললেন, 'তোমার বাপের বাড়িতেও বিগ্রহ আছেন, না? নইলে এ শিক্ষা পেতে না!'

বিশাখার বাপের বাড়িতে আছেন নারায়ণ—দধিবামন শালগ্রাম শিলা, আর আছে একটি অষ্ট ধাতুর গোপাল মূর্তি। তবে সেখানে এত নিয়মের কঠোরতা নেই। প্রতিদিন প্রণাম করাও হ'ত না। আসলে গতকাল রাত্রে যখন ধুলোপায়ে এসে যুগলে প্রণাম করা হয়েছিল—স্বরূপই ঐ ভাবে বাঁয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে বসতে বিশাখাও সেই ভাবে বসে প্রণাম করেছে—সে ব্যাপারটা শ্যামসোহাগিনী অত লক্ষ্য করেন নি, সে সময়কার প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যে—তবে বিশাখা লক্ষ্য করেছিল। এখন অপ্রয়োজন বোধেই তা বলল না, সে সুযোগও মিলল না।

এমনিই—এখানে এসে এখনও সহজভাবে কথা বলার কোন অবসর পায় নি, সে অন্তরঙ্গতা বা আত্মীয়তার তো প্রশ্নই ওঠে না।

মন্দিরের সামনে একটু চত্বর মতো, আরতির সময় কাঁসর ঘড়ি বাজাবার জন্য, সেবাইৎ বা মা-গোসাঁইরাও সেখানে বসে পূজা আহ্নিক করেন। তার নিচে—বেশ কয়েক ধাপ—বোধ হয় ছ-সাতটা হবে—মাঝারি নাটমন্দির। তারপরে অনেকখানি স্থান নিয়ে বিস্তৃত চতুষ্কোণ অঙ্গন—এঁরা বলেন শ্রীরাধা-গোপীবল্লভের আঙিনা।

শ্যামসোহাগিনী ছোট চত্বরে কাউকে উঠতে দেন নি তখনও, নিজের মেয়ে, ছোট ছেলেকেও না। সব দিকেই তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—পদে পদেই সে প্রমাণ পাচ্ছে বিশাখা। স্বামীকে প্রণাম করার পর্ব আছে, তার পর দীক্ষা—তখনও অপর কারও নিকটে আসা চলবে না। মঙ্গল আরতির পর যে মন্দির দ্বার উন্মুক্ত হয়—তারপর স্নান বেশ ইত্যাদির সময় মাত্র পর্দাটা টেনে দেওয়া হয়, কেবল ভোগ লাগার সময়ই দরজার কপাট বন্ধ করেন পূজক।

বিগ্রহ প্রণামের পর শাশুড়ির নির্দেশমতো বাইরের চত্বরে এসে স্বামীকে প্রণাম করতে হ'ল। স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর দীক্ষা গ্রহণ নিষেধ, সে আইন-বাঁচানো অনুমতিও দিলেন স্বামী—কোন প্রশ্ন করার আগেই—তার পর মন্দিরে ঢুকে হাত ধুয়ে পুনশ্চ মন্দিরে রাখা সপ্ততীর্থের জল মাথায় দিয়ে দীক্ষা গ্রহণের আসনে বসতে হ'ল।

আজও এই প্রণাম করার সময়েও—স্বরূপ লক্ষ্য করলেন, সাধারণ ভূমিষ্ঠ প্রণাম নয়—পায়ের ওপর মাথা রেখেই প্রণাম করল বিশাখা। আর, সে মাথাটা বেশ জোরে চেপে ধরার মতোই মনে হ'ল, শুধু মাথা ঠেকানো নয়। পায়ের ধুলো নেবার সময়ও যেন সেই পায়ে ধরার ভাব।

কুশণ্ডিকার দিনও স্বরূপের যা মনে হয়েছিল, আজও তাই মনে হ'ল—হয়ত অকারণেই ওঁর মনের ভ্রান্তি—শুধু নিয়মরক্ষার প্রণাম এটা নয়, এর মধ্যে দিয়ে যেন আশ্রয় আর আশ্বাস প্রার্থনা করছে স্বামীর কাছ থেকে।

এটা কি ভয়? অপরিচিত পরিবেশে অনাত্মীয়দের মধ্যে এসে পড়ার জন্যে? এ অকূল সমুদ্রে স্বামী ছাড়া কারও কাছেই এই আশ্বাস চাওয়া যায় না বলে?—কেন না সে-ই তো তখন থেকে ওর সত্যকার অবলম্বন, সারা জীবনের মতো।...

কে জানে—সাধারণ নিয়মের এই সামান্য ব্যতক্রম বা আতিশয্য—শ্যামসোহাগিনী লক্ষ্য করলেন কিনা!

মন্দিরাধিপতির ভোগ লাগার কথা সাড়ে এগারোটায়। এখানে আত্মবৎ সেবা, ভোগ লাগার পর প্রায় এক ঘণ্টা কপাট বন্ধ থাকে। অর্থাৎ ভগবানকে আহার করার পর্যাপ্ত সময় দেওয়া।

অর্পিত ভোগ সরার সময় সাড়ে বারোটা। তারপর শয়ন-আরতি, শয়ন দেওয়া—এসব সেরে পঙ্গত বসতে একটারও বেশী হয়ে যায়।*

এটা সাধারণ দিনের কথা। আজ বিরাট পর্ব—ভোগর পরিমাণ ও ভোজ্যের সংখ্যা বিপুল ও অগণিত। সুতরাং ভোগ লাগতেই সাড়ে বারোটা বেজে গেল। তাও বহু ব্রজবাসী পাচক ব্রাহ্মণদের আপ্রাণ চেষ্টাতেই এত অল্প সময়ে এত কাণ্ড সম্ভব হয়েছে। ফলে পঙ্গত বসতেই দুটো বাজল।

তাও এটা প্রথম পঙ্গত—নিকট আত্মীয় ও কুটুম্ব, প্রধান প্রধান মন্দিরের মোহান্ত বা গোসাঁই (কামদাররা এ পঙ্গতে বসার অধিকারী নন) এঁরাই বসতে পারলেন। তার পরের স্তর বসল তিনটেয়, পাচক সেবক পরিজন দাসদাসী—এরা বসল চারটেয়।

শ্যামসোহাগিনী এই সমস্ত পঙ্গতেই নিয়মরক্ষার মতো সামান্য কিছু ক'রে সঘৃত-অন্নপ্রসাদ ও ক্ষীর (পায়স) পরিবেশন করালেন। অবশ্যই অপরে পাত্র ধরেছিল, এবং শাশুড়ীও সমস্তক্ষণ ওর সঙ্গে ছিলেন, প্রায় বেষ্টন ক'রে ধরে নিয়ে। পরিশ্রমে-পরিবেশনে অনভ্যস্ত কিশোর-বয়সী মেয়ে—ক্লান্ত হয়ে না টলে পড়ে যায় এই ছিল তাঁর ভয়। দু-একবার যে সে সম্ভাবনা দেখা দেয় নি—তাও না।

এসব যখন চুকল শ্যামসোহাগিনী একেবারে ওকে নিজের শয়নগৃহে নিয়ে গিয়ে তাঁতের শাড়ি পরিয়ে এক রকম জোর ক'রেই শুইয়ে দিলেন।

আহারের প্রয়োজন ছিল না। প্রথম পঙ্গতে বধূর যা করণীয় তা সারা হতেই ওকে নিভৃতে একটু প্রসাদ খাইয়ে দিয়েছিলেন। অল্পই অবশ্য—ভরা পেটে এতগুলি লোককে পরিবেশন করতে আরও বেশী কষ্ট হবে এই ভেবেই। তা ছাড়া, পঙ্গতে বসলেই কি এর বেশী খেতে পারত!

শুইয়ে দিয়ে সস্নেহে গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তোমার খুবই কষ্ট হ'ল মা—তা আমি বুঝি, কিন্তু কি করব, এখানের এই নিয়ম। এ তো সাধারণ ভোজ নয়, ভগবানের প্রসাদ পাওয়া, সেবক-সেবিকাদের পর্যন্ত নববধূ সমান নিয়মে প্রথম কিছু পরিবেশন করবেন। কাউকেই ছোট ক'রে দেখার রীতি নেই। আসলে আমরা সবাই তো প্রভুর দাসদাসী।'

তারপর দরজা বন্ধ ক'রে যাবার সময় বলে গেলেন, 'তুমি একটু নিরিবিলি বিশ্রাম ক'রে নাও বৌমা, আমি সবাইকে বলে দিয়েছি সন্ধ্যার আগে কেউ না এ ঘরে ঢোকে। রাত্রেও তো একটা বড় রকমের পর্ব আছে। সে সব আচার-অনুষ্ঠান মেয়েলি প্রথা—ভগবানের শয়ন না হলে শুরু করতে নেই।'

ক্লান্তি সীমাহীন, পা ভেঙে আসছে। হাত নাড়তেও কষ্ট হচ্ছে। এ পরিশ্রম

* একত্র প্রসাদ গ্রহণ করা বা সাধুদের পঙ্‌ক্তি-ভোজনকে পঙ্গত বলা হয়।

ওর পক্ষে অমানুষিক। তবু, অবসন্ন হয়ে পড়লেও, চোখের পাতায় তন্দ্রার আভাস মাত্র নামল না।

উত্তেজনা। উত্তেজনার কারণ তো প্রচুর। নব পরিবেশ, নব আবেষ্টনী। নূতন জীবনের বিস্ময় যত দুশ্চিন্তা তার চেয়ে বেশী।

এখানেই থাকতে হবে চিরকালের মতো। এখানকার বড় গোসাঁই-এর স্ত্রীকে নাকি পিত্রালয়ে যেতে নেই। সেকালের রাজরানীদের মতো। মা-বাবা এলে দেখা হতে পারে, যদি এখানে থাকেন আদরযত্ন অভ্যর্থনার ত্রুটি হবে না। তাঁরা যদি এখানে থাকতে না চান—তাঁদের বাসাতে গিয়েও দেখা ক'রে আসতে পারে বধূ—এইটুকু মাত্র, এর বেশী নয়। এটুকুও নাকি সম্প্রতি হয়েছে। এই স্বাধীনতা।

এছাড়াও—উত্তেজনা উদ্বেগের আর একটা বড় কারণ ঘটেছে আজ সকালে।

দীক্ষা শেষ হবার পর গুরুপ্রণাম (মন্ত্র পড়ে, সাষ্টাঙ্গেও) শেষ ক'রে উঠে দাঁড়াতে শ্যামসোহাগিনী আবেগগম্ভীর কণ্ঠে বলেছেন, 'মা, আজ থেকে এই তোমার ইষ্ট, এ-ই আসল প্রাণ-স্বরূপ। এঁতে আর তোমার স্বামীতে অভিন্ন জেনেই সেবা করবে। আমাদের আত্মবৎ সেবা। তুমি বড় গোসাঁইয়ের সহধর্মিণী হলে, একদিন তুমিও দীক্ষা দেবে অনেককে, বহু শিষ্যশিষ্যার মা হবে, তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সফলতা নিষ্ফলতার জন্যে তুমিই দায়ী থাকবে। আমাদের ইষ্ট আমাদের মানিক শ্রীরাধা-গোপীবল্লভের বিরাট এই সংসারের তুমিই হবে কর্ত্রী। এত বড় ঠাটবাট তোমাকেই বুঝে নিতে হবে!'

সে কথার বাক্যে ও কণ্ঠস্বরে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল বিশাখার। শিউরে উঠেছিল যেন।

তবু বহু কষ্টে বলেছিল অবশ্য, 'আপনিই দেখিয়ে দেবেন মা, আমাকে তৈরী ক'রে নেবেন।'

শ্যামসোহাগিনী সাদরে ওকে বুকে টেনে কপালে একটি চুমু খেয়ে বলেছিলেন, 'বেশ বলেছ মা, মানুষের ঘরের মেয়ের মতোই বলেছ। তোমার বাবা মা সত্যি-সত্যিই সৎশিক্ষা দিয়েছেন। এই বয়সে এতটা সহবৎ আমি আশা করি নি।...জয় রাধে!'

শ্যামসোহাগিনী নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, কিন্তু বিশাখা নিশ্চিন্ত হতে পারছে কই?

তার এই বয়সে এ সব দায়িত্বের বিপুলতা, এর মর্ম বোঝাই তো কঠিন। যেন কোন এক অজানা আতঙ্কে মনে মনে শিউরে উঠেছে সে বারবারই।

সে কি পারবে এতখানি ভার বইতে, যেমন শাশুড়ী পারছেন!

হয়ত তাঁর বয়সে, প্রচুর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ফলে এটা হতে পারে—এই যোগ্যতা। কিন্তু সে শক্তি কি আছে ওর মধ্যে—যেমন ওর শাশুড়ীর মধ্যে দেখেছে!

এখন, এক যেন ঘূর্ণাবর্তের পর নির্জন অবসরেও মনে হচ্ছে সে কটি শব্দ

মেঘমন্দ্রস্বরে নিনাদিত হচ্ছে।

আবারও গায়ে কাঁটা দেয়—সর্বেন্দ্রিয় শিথিল করা একটা বিহ্বলতা বোধ করে বিশাখা।

কেমন একটা ভয়, অজানা আতঙ্ক ঐ কথাগুলোর মধ্যে।

কিছু পরে সে ভয়ের ভাব কমে এলে তার দুই চোখ প্লাবিত ক'রে অশ্রুর ধারা নামে।

এ কি আনন্দের অশ্রু? এ কি অচিন্তিত সৌভাগ্যের?

কি—তা বোধ হয় সেও বোঝে না।

বড় ঘর, বিরাট খাট।

আলমারি, আলনা—সবই বড় মাপের।

সেকালের ভারি ভারি আসবাব। খাট তো মেহগনির। আগে কেউ ড্রেসিং টেবিলের কথা ভাবত না। মাটিতে বসে কাঠের ঢাকনা দেওয়া আয়নার সামনের কাঠটা উলটে আয়না ঈষৎ হেলিয়ে রেখে তাতেই মুখ দেখে প্রসাধন করত। তবে এখানের আয়োজনে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর আছে। প্রসাধনের জন্য সোনালি কাজ করা ফ্রেমে দাঁড়া-আয়না—প্রমাণমানুষ সমান আসল বেলজিয়ামের কাঁচ। তার দর্পণত্ব, অর্থাৎ মুখশ্রী ঠিকমতো প্রতিফলিত করার শক্তি হয়তো ঠিক আগেকার মতো নেই—তবু কাজ চলে।

বিশাখার বাবা ফার্নিচার দিতে চেয়েছিলেন, বিশেষ ক'রে খাট বিছানা—এঁরা নিতে চান নি। নিয়ে যাওয়ার ঝামেলা বিস্তর, খরচও কম নয়। পৌঁছলেও কোনোটা গোটা পৌঁছবে কিনা সন্দেহ।

হয়ত এই পুরনো মোটা দেওয়ালে পাথরের ছাদওলা ঘরে সে সব আসবাব বেমানানই হ'ত।

তবে সে সব কিছুই এখন দেখা যাচ্ছে না।

মনে হচ্ছে এই বিরাট খাট, আলমারি, আলনা—ওপাশের কোণে রাখা দুটি নতুন তোরঙ্গ (বর-কনের সঙ্গে আসা) মায় আয়নার ফ্রেম—সবই ফুল দিয়ে তৈরী। ফুলে ঢেকে দেওয়া হয়েছে পাথরের মেঝেও—পুরু কার্পেটের মতো। নূতন শয্যাও—সন্তর্পণে, দাগ না লাগে এমন ফুলের পাপড়িতে ঢাকা। খাট পুরনো, শ্যামসোহাগিনীদের ফুলশয্যাও এই খাটে হয়েছিল, কিন্তু সে শয্যা রাখেন নি তিনি, গদি তোশক বালিশ সব নতুন করে করিয়েছেন।

ঘরে ঢুকে মুগ্ধ নয় শুধু, বিশাখা ক্ষণিকের জন্য যেন বিভ্রান্ত হয়ে গিছল।

এ কোথায় এল সে? কোন স্বপ্ন-বা মায়ালোকে?

ননদ ললিতা শোনাল, যে বৃদ্ধ প্রতি বছর কদিন ওদের ঝুলন সাজায়, যে কিশোর বয়সে ওদের বাবা-মার ফুলশয্যার খাট সাজিয়েছে—তারই হাতের সজ্জা, অবশ্য এখন একা পারে না, ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আসে। ওর হাতের 'ফুলকামরা'

দেখতে বৈশাখ মাসে বৃন্দাবন ভেঙে পড়ে।*

ললিতাই একমাত্র ননদ, বয়স উনিশ-কুড়ির বেশী হবে না। সেও রাধা দামোদরের গোসাঁইবাড়ির বড়বৌ। নিতান্ত পাড়ার মধ্যে বলেই এখানে আসার ছুটি পায় মধ্যে মধ্যে।

ফুলশয্যার অনুষ্ঠান-কৃত্যের সময় শ্যামসোহাগিনী উপস্থিত থাকবেন না, সে তো জানা কথাই—তবু একবার এসে বাইরে থেকে বলে গেলেন, 'এই মেয়েগুলো, তোরা অনর্থক দেরি করিস না। বৌমার ওপর দিয়ে বিস্তর ধকল গেছে আজ।'

প্রায় শ্রুতিগম্য ভাবেই ললিতা বলল, 'আহা রে, যেন ওঁর বৌমা আমরা চলে গেলেই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়বে!'

মোটামুটি অল্পেই কাজ সারা হয়। কারণ যে সব সধবা বা এয়ো এসব করবে, তাদের শরীরও আর বইছে না। তার ওপর এদিকেও রাত একটা বাজে এখন। রাত্রের ভোগের প্রসাদও খাবার লোক যথেষ্ট ছিল। অবশ্য দুপুর বা বিকেলের মতো অত নয়—দুবার মাঝারি পঙ্গতেই শেষ হয়েছে। ঠাকুরের শয়ন হবার আগে পঙ্গত বসার নিয়ম নেই।

বিশাখাকে এখন সন্ধ্যার নূতন বেনারসী ছাড়িয়ে ওর বাবার দেওয়া সাদা জমির চওড়া লালপেড়ে শান্তিপুরী শাড়ি পরানো হয়েছে, স্বরূপকেও ভোগ আরতির সময়ের তসরের ধুতি চাদর ছেড়ে জড়িপাড় ধুতি চাদর পরতে হয়েছে। বোধ হয় রেশমী কাপড়ে দৈহিক অন্তরঙ্গতা বা ঘনিষ্ঠতার ব্যাঘাত ঘটে, দুটি দেহে এক হয়ে যেতে পারে না—এই কারণেই এ রীতি ছিল সেকালে।

তবু সেই অতি সাধারণ সাজেই মোটা গুঞ্জামালায় ফুলের আভরণে দেবকন্যার মতোই দেখাচ্ছে বিশাখাকে।

কে একজন আত্মীয়া পিছন থেকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি করব কি, আমারই তো চার দণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে!'

'ইচ্ছেটা সামলাও খুড়ীমা,' ললিতা বলল, 'নইলে বড় গোসাঁই-এর শাপে ভস্ম হয়ে যাবে। তোমারই যদি ঐ অবস্থা হয় বড়দার কি হচ্ছে বুঝছ তো! বলি তোমারও তো একদিন এ পব্ব গেছে!'

'আ গেল যা! এই বলছিস খুঁড়ি আর ইয়ার্কি করছিস বর তুলে!'

'আজ সব চলে। সেই জন্যই তো মায়েরা থাকে না!'

এমনি হাসি-তামাশার মধ্যেই নিয়ম-কর্মগুলো সারা হয়। সেও তো হাসি-তামাশারই ব্যাপার। তবে বিশাখার অভিজ্ঞতা থেকে একটু স্বতন্ত্র ধরনের। ক্ষীর-

---

* বৈশাখ মাসে ঝারার সময় সন্ধ্যারতির পর বিগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে সুগন্ধি ফুলের ঘর বাড়ি, পালকি, ময়ূরপঙ্খী ইত্যাদি রচনা করা হয়। এক এক সময় গভীর রাত হয়ে যায় সাজাতে বা দর্শন খুলতে। বিশেষ ক'রে রাধাবল্লভ বা বঙ্কুবিহারী মন্দিরে।—আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন এই ভাবে চলত, হালের কথা বলতে পারব না।

মুড়কি খাওয়া ও খাওয়ানো নিয়ম—সেও আজ গোপীবল্লভকে নিবেদন করা হয়েছে নৈশভোগের সঙ্গে। কে একজন বললেন, 'তাহলে কি আজ আবার রাধারাণীও ফুলশয্যা করবেন নাকি? গোপীবল্লভ খাইয়ে দেবেন ওঁকে?' মহিলাদেরই আর একজন উত্তর দিলেন, 'ওঁদের তো নিত্য ফুলশয্যা ভাই, নিকুঞ্জ বনে তবে নিত্য ফুলের বিছানা পাতা হয় কি জন্যে? তবে হ্যাঁ, উচিত ছিল সেইখানে একটু ক্ষীর-মুড়কি রেখে আসা। বাংলাদেশ থেকে আনা মুড়কি— জমত ভাল।'

এখানে এ সবই ওর কাছে নতুন লাগছে। অবাক হয়ে যাচ্ছে সব কিছুতেই।

শান্তিপুর ছাড়া, কলকাতা নবদ্বীপ কালনার দু-একটা বিয়েবাড়িতেও গেছে। এমন পুষ্পশয্যা কোথাও দেখে নি সে।···

রীতি-নিয়মের পালা চুকিয়ে যাবার সময় ললিতা স্বরূপের সামনে হাত নেড়ে বলে গেল, 'আমি আর ফুলের গয়নাগুলো খুললুম না ভাই বড়দা। তোমাকেই ও কাজটা দিয়ে গেলুম। তবু এই ছুতোয় আলাপটা শুরু করতে পারবে!'

এই বলে বেশ শব্দ ক'রেই কপাট ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল। অবাঞ্ছিতদের উপস্থিতিতে ছেদ পড়ল যেন এইটে বোঝাবার জন্যেই।

আড়ি পাতার সম্ভাবনা বিশেষ নেই। প্রধান পাণ্ডা যার হবার কথা—ললিতা, তাকে এই রাত্রেই ফিরতে হবে। কাল সকালে সেখানেও কি সব বিশেষ অনুষ্ঠান আছে, ভোরেই তা শুরু হবে। শ্বশুরবাড়ির ভেলভেটের ঘেরাটোপ দেওয়া ডুলি অপেক্ষা করছে।

তা ছাড়াও, শ্যামসোহাগিনীর নিষেধ আছে, 'ওদের যা দেহের অবস্থা আজ— ওসব অসভ্যতা কেউ যেন না করে।'

সেটা স্বরূপ নিজের কানেই শুনেছেন। এর ওপর আড়ি পাতার সাহস হবে— কার ঘড়ে এমন দশটা মাথা!

সুতরাং উঠে দরজা বন্ধ করার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া সে বড় লজ্জারও— অভব্য ইঙ্গিত।

ঘরের মাঝখানে খাট, মৃদু কথা কেউ শুনতেও পাবে না।

স্বরূপ বিশাখার হাত দুটি ধরে সেই পুষ্পালঙ্কার-শোভিত অবস্থাতেই কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে ওর দিকে চেয়ে রইলেন। ভাল ক'রে দেখা হয় নি এ কদিন এক বারও, সুযোগ ঘটে নি বলতে গেলে, এই প্রথম দেখা।

দেখে আশ মেটার কথাও নয়। বিশাখা মাথা হেঁট ক'রে ছিল—একবার একটু তুলে দেবার চেষ্টা করলেন স্বরূপ, উঠলও কিছুটা, তবে স্বাভাবিক নিয়মেই চোখ দুটি বুজে রইল।

হাত ঘামছে স্বামীর হাতের মধ্যে—যেমন বিয়ের সময়, কুশণ্ডিকার সময় ঘেমেছিল। কাঁপছেও তেমনি থর থর ক'রে। আশা ও আশঙ্কায়।

অজানার আশঙ্কা?

একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রাণস্বরূপ বললেন, 'সত্যিই আমি ভাগ্যবান। গোপীবল্লভ রাধারানী আমার আশা শুধু নয়, কল্পনাও পূর্ণ করেছেন। বরং

বেশী দিয়েছেন।'

তার পর নিজের মালাটা খুলে খাটের বাজুতে রেখে, চাদরটাও খুলে আলনায় মেলে দিলেন। ঘামে ভিজে গেছে, এত লোকের ভিড়ে আর উত্তেজনায়—গরম হবারই কথা। যদিচ একটি মেয়ে বরাবর পিছন থেকে বড় পাখায় বাতাস করেছে।

এরপর ফুলের গহনাগুলো খোলার কথা।

স্বরূপ একেবারেই আনাড়ি এ বিষয়ে। দূর থেকে দেখেছেন গহনা পরা অবস্থায়, অনেকের বিয়েতেই। কিন্তু কোথায় আটকানো হয়—কী করে খোলে তা কোনদিন দেখার কারণ ঘটে নি। মুকুটটা খোলা সহজ, তবু তারে চুল বেঁধে কবরী একটু অবিন্যস্ত হয়ে গেল, বোধ হয় দু-একগাছি সেই রেশমের মতো চুল তারের সঙ্গে উঠেও এল, ওর ঈষৎ মাথা নাড়াতেই বুঝতে পারলেন। যন্ত্রণায় ভ্রূও কুঁচকে উঠল। স্বরূপ 'ইস্' বলে ক্ষমা প্রার্থনার একটা ভঙ্গী করেন।

কিন্তু বালা তাগা নিয়ে আরও ফ্যাসাদ। বেশী টানাটানি করতে সাহস হয় না—বিশাখার গা ছড়ে যাবার ভয়ে।

'খুকিটা আমাকে আচ্ছা বিপদে ফেলে গেল তো! কাল আসুক না, মজা দেখাচ্ছি।...তুমি, তুমি একটু সাহায্য করতে পারবে?'

এই প্রথম বিশাখার মুখে একটু হাসির আভাস ফোটে, অর্ধআনত অবস্থাতেও বোঝা যায়।

সে নীরবেই হাতের বালা দুটো খুলে ফেলে, কেবল তাগা বা বাজু যাই হোক—বাহুবন্ধনী নিজে হাতে খুলতে একটু অসুবিধে হয়। ওদিকে না চেয়েও বুঝতে পারে স্বরূপ একদৃষ্টে চেয়ে আছেন—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তার কোথায় আটকানো আছে।

স্বরূপ সহজেই খুলে ফেলেন এবার।

মালাটা ওর খুলে নেওয়া উচিত হবে কিনা এবার—স্বরূপ ভাবেন, বিশাখারও বোধ হয় সেই প্রশ্ন—বেশী নির্লজ্জতা প্রকাশ পাবে না তো?

স্বরূপই সমাধান করেন সে সমস্যার। আস্তে আস্তে বলেন, 'মালাটা খুলবে না? মানে শোওয়ার অসুবিধে হবে তো নইলে—?'

বিশাখা নিশ্চিন্ত হয়ে মালা খুলে স্বরূপেরই হাতে দেয়।

কিন্তু ততক্ষণে যেন স্বরূপ পাগল হয়ে উঠেছেন।

জীবনে এই প্রথম নারী এল, যে নারী সর্বতোভাবে ঈপ্সিতা। পাগল হবারই তো কথা। বিশেষ এই ওঁর পূর্ণ যৌবনে।

কোনমতে সে মালাটা ওঁর মালার পাশে রেখে অকস্মাৎ দুই সবল হাতে বিশাখাকে টেনে নেন একেবারে বুকের মধ্যে—কঠিন আলিঙ্গনে পিস্ট করার মতো। পাগলের মতোই চুমো খেতে থাকেন—মুখে কপালে গলায় গালে। সত্যিই কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, সে অবসরও ছিল না নিরন্ধ্র শিক্ষাসূচীর মধ্যে—এ উচ্ছ্বাস বা প্রেমের আবেগের প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত, দেহের, স্নায়ুকেন্দ্রের কাজ তারা স্বাভাবিক নিয়মে করে যাচ্ছে মাত্র। ক্রমশ একসময় নিজেই বোধ হয় দেহধর্মের স্বাভাবিক

নিয়মে বিশাখার দুই ঠোঁটে জোরে চেপে ধরেন নিজের ঠোঁট—অনেক অনেকক্ষণ ধরে। তেমনি দেহধর্মের নিয়মেই বিশাখার গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট দুটিও উন্মীলিত হয়, যেন পুষ্প বিকশিত হয় পুরুষের প্রবল দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনে।

শিথিল অবশ হয়ে আসে বিশাখার দেহ, এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতিতে, চৈতন্যও যেন তলিয়ে যেতে থাকে···

অবশেষে, বোধহয় ক্লান্ত হয়েই এক সময় থামতে হয়।

জোড়া বালিশে ঠেস দিয়ে বুকের মধ্যে থেকে বিশাখার মুখটা তুলে ধরেন। বলেন, 'আমাকে—আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে যমুনা—ঠিক ক'রে বলো তো! আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে তুমি ঠিক সুখী হও নি আমাকে পেয়ে—তাই কি?'

যে জন্য এ প্রশ্ন, স্ত্রীর মুখে প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ শোনা—বা প্রশ্নের শেষাংশের প্রবল প্রতিবাদ—যাতে পছন্দ হওয়াটাও স্বীকৃত হয়ে যায়; কথোপকথন আলাপ-প্রণয়ের সূত্রপাতও হয়—তা কিন্তু হয়ে ওঠে না।

এর উত্তরে এবার বিশাখাই জোর ক'রে—সবলে, যেন, ওঁকে আঁকড়ে ধরে স্বরূপের বুকের মধ্যে মুখটা চেপে ধরে। সে মুখ কোনমতেই আর তুলে ধরতে পারেন না স্বরূপ।

সারারাত ধরেই সেই ভাবেই রইল বিশাখা।

যেন এ বাহুবন্ধন না স্বামী খুলতে পারেন কোনদিন—এমনি ভাবে অবুঝের মতোই বুকে মুখটা চেপে থাকে, দু হাতে তেমনি জড়িয়ে ধরে।

এটা যে নববধূর পক্ষে অশোভন দেখাতে পারে, তাও তার মাথায় থাকে না।···

ফলে এতদিনের প্রতীক্ষিত বহুঈপ্সিত বিবাহিত জীবনের প্রথম প্রণয়-রজনীটিতে প্রিয়তমার কণ্ঠের একটি প্রণয়গুঞ্জনও শোনা হয় না স্বরূপের।

॥ ৩ ॥

সেবা বলতে যা বোঝায় তা করেন বেতনভুক পূজারী। একজন নন—দুজন ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ আছেন সে জন্যে। গোসাঁইরা বিশেষ পূজার দিন আসনে বসেন, অনেক সময় নিজেরা সন্ধ্যারতি বা ভোগ-আরতি করেন। স্বরূপের বাবা মূল পূজা নিজেই করতেন বেশির ভাগ, একজন মাত্র পূজারী ছিলেন সহকারী হিসেবে। স্বরূপ কাশী চলে যেতেই দুজন পূজারী রাখতে হয়েছিল। ফিরে আসার পরও কাউকে ছাড়ানো হয় নি। ছোট ভাই ছেলেমানুষ, শাস্ত্রর বদলে ইংরেজী লেখাপড়ার দিকেই তার ঝোঁক বেশী এখনও। একজন পণ্ডিত এসে কিছু কিছু সংস্কৃত পড়ান—শাস্ত্রও পড়াতে চেষ্টা করেন, তবে তা যে ওর মাথায় ঢোকে তা মনে হয় না।

সেবা বলতে কাজ অনেক।

শয়ন থেকে তোলা বা ঘুম ভাঙানো : সেটা বাড়ির মেয়েরাই রাধারাণীর নাম-

গান করে সম্পন্ন করেন। সত্যি সত্যিই গানও হয় কিছু, ভজনই বেশী—তবে মন্দিরা ছাড়া কোন বাদ্য থাকে না।

তারপর পূজারী দরজা খোলেন। মঙ্গল আরতি হয়। আরতির পর রাত্রের শৃঙ্গার বেশ ত্যাগ করিয়ে পূর্বদিনের চন্দন ও গোপীচন্দনের পত্রলেখা বা—প্রচলিত বাংলায় যাকে অলকা-তিলকা বলে—তা মুছে ফেলতে হয়। অতঃপর সুগন্ধি তেল মাখিয়ে স্নান; প্রথম দুধে পরে যমুনার চন্দনবাসিত জলে; বেশ ও নূতন পত্রলেখা রচনা। বেশ প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়। রাধা ও গোপীবল্লভের অন্তত পঞ্চাশ দফা বেশ আছে। কোনদিন ধুতি চাদর, কোনদিন চোস্ত পাজামা ও দীর্ঘ ঘেরের কুর্তা যা সোলার সাহায্যে চারিদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে রাখা হয়, মনে হয় ঠাকুর নাচছেন। রাধারাণীরও সেইমতো ঘাঘরা-কাঁচুলি বা শাড়ি।

এটা এঁদের সামর্থ্য মতো। এই শ্রীধামে ছোট ছোট মন্দির অজস্র। কোন ভক্ত বা ভক্তিমতী প্রাণের আবেগে প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন কিন্তু যথেষ্ট অর্থ রেখে যেতে পারেন নি। যাও বা রেখে গেছেন—বন্দোবস্তে যথেষ্ট কড়া বন্ধন না থাকায় তা পরহস্তগত হয়েছে অধিকাংশ। এই সব কুঞ্জ-স্বামীদের বিলাসিতা চলে না। একই পোশাকে হয়ত বিগ্রহ যুগলকে কাটাতে হয় দিনের পর দিন। একেবারে ছিঁড়ে না গেলে নূতন পোশাক পান না বেচারীরা।

একেবারে মূলে হাভাত হয়েছে দেবত্র সম্পত্তি যেখানে—সেখানের কোন কোন ক্ষেত্রে পূজারীর করুণা বা পাড়ার লোকের আনুকূল্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। কখনও হয়ত অন্য কুঞ্জে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হন পূজারী। সেখানের কুঞ্জাধিপতির সিংহাসনের অদূরে একটি চৌকীতে আসন লাভ করে এঁরা কৃতার্থ হন।

শখ অনেকেরই হয়। তীর্থস্থানে দেবপ্রতিষ্ঠা পুণ্যকর্ম। তার এইসব শোচনীয় পরিণতি দেখেও আবেগপ্রবণ ভক্তদের চৈতন্য হয় না। কাশীতে এমন পরিত্যক্ত—কোন ঘাটে কি গাছতলায় স্তূপীকৃত—শিবলিঙ্গ বোধ হয় হাজার হাজার পড়ে থাকে। অনেকেই প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ পথে বসিয়ে এসে দেবত্রর প্রমাণ লোপ ক'রে বাড়ি বেচে দিচ্ছেন।

এই ব্রজধামে অনেক ভক্তিমতী স্ত্রীলোক এ কর্ম ক'রে গেছেন। বারাঙ্গনা সবাই নন, এমনি অবস্থাপন্ন বিধবা মহিলারাও কুঞ্জ প্রতিষ্ঠা ক'রে নিজেরা যতদিন বাঁচেন ভালভাবেই সেবা পূজা করেন, তাঁর রজঃপ্রাপ্তির পর কি হবে কেউ ভাবেন না। এ ছাড়া বহু বিখ্যাত গায়িকা, অভিনেত্রী, কীর্তনওয়ালী—এ দুর্মতিতে পেয়েছে অনেককেই। শোনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহের সন্তান গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবদ্দশায় নাট্যসম্রাজ্ঞী তিনকড়ি এই প্রস্তাব করেছিলেন—গিরিশবাবু প্রবলভাবে নিষেধ করেন। বলেন: 'কখনও না। প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের দুর্গতি প্রতিষ্ঠাতার মহাপাপের কারণ।' আরও নাকি বলেছিলেন, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরোধর্ম ভয়াবহ!'

কিন্তু গোপীবল্লভ বা গোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন-রাধাবল্লভ-বঙ্কুবিহারী-রাধারমণ-দামোদর—এঁরা 'কামায়ে' ঠাকুর। সম্পত্তিও যথেষ্ট—উপার্জনও পর্যাপ্ত করেন। সেই কারণে, ভক্ত দর্শকদের চোখের সামনে সর্বদা থাকেন বলে, সেবার

অনিয়ম ঘটে না।

শ্রীরাধা-গোপীবল্লভের সেবাইত মোহান্তদের আত্মবৎ সেবা—মহিলামহল পর্যন্ত বিস্তৃত। বাড়ির গৃহিণী বা বধূরা অনেকেই ভোরবেলা স্নান সেরে এসে গুনগুন ক'রে শ্রীরাধার স্তব বা ভজন গাইতে গাইতে সাধারণ বা অসাধারণ রূপসজ্জা, তিলকচন্দন সেবা, বেশ পরিবর্তন—এ কাজগুলো ক'রে দেন—অধিকাংশ দিনই। ভোরে মঙ্গল আরতি বা রাত্রে শয়ন আরতির ঘড়ি কাঁসর—তাঁরাই বাজান।

দর্শন খোলার পূর্ব পর্যন্ত এঁদের অধিকার। সাধারণ দর্শকের সামনে এঁরা থাকেন না।

শ্যামসোহাগিনী নিজ কিছু করেন না কিন্তু বাল্যভোগ বা লাড়ুভোগ—কেউ কেউ বলেন ক্ষীরসা ভোগ, কেন না লাড়ু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে না, থাকে পেঁড়া ও এই ক্ষীরসা (ছোট ছোট খুরিতে ঢাকাই ক্ষীরের মতো ক্ষীর ঢালা, এটা অন্তত আগেকার দিনে লাড়ুভোগে অপরিহার্য ছিল। প্রসাদ হিসেবে একটা ক'রে খুরি হাতে দেওয়া অনেক সুবিধা)—লাগবার আগে পর্যন্ত, মন্দিরের মধ্যে বা নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে সেবার ত্রুটি না ঘটে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন।

অন্য মেয়েরা বিশাখাকেও দলে টানতে চান।

তার সঙ্কোচের অবধি থাকে না। বিগ্রহ স্পর্শ করতে কেমন ভয় হয়—বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করতে থাকে। প্রস্তাবের পরমুহূর্তেই বোধ হয় ললাটে স্বেদরেখা দেখা দেয়।

শ্যামসোহাগিনী তা লক্ষ্য করেন, হাসেন।

সস্নেহ প্রশ্রয়ের হাসি।

অন্যদের বলেন, ছেলে স্বরূপকেও, 'এমন ভাবে সেবা তো ওদের জানা নেই, দেখেও নি কখনও –ভয় তো করবেই। আর সত্যিই তো—এ তো আগুন নিয়ে খেলা। যেখানে আমরা মনে করি এই বিগ্রহের মধ্যে ভগবান বিরাজ করছেন—সেখানে তাঁকে স্পর্শ করতে ভয় করবে না? আমাদের এ সাহস ভালবাসার স্পর্ধা থেকে। আগে সে ভালবাসা জন্মাক—তবে তো! এরা নির্ভয়ে এ কাজ করে, অভ্যাসবশত। অত বোঝে না। অজ্ঞানের সাহস। আর করতে পারেন সেই সব সাধিকারা—যাঁদের গোপীভাবের সাধনা, সত্যি সত্যিই ভগবানকে আপনজন ভাবেন—ভাবতে পারেন।'

যথার্থই যমুনার এ ধরনের পুজো সেবা জানা নেই। বাড়িতে শালগ্রাম শিলা আছেন। গোপাল মূর্তিও আছেন। পুজারী এসে দুবেলা পুজো ক'রে যান। সন্ধ্যায় ও আরতির সঙ্গে শীতল দিয়ে—সেও লুচি-পায়স হয়ে ওঠে না অধিকাংশ দিনই—দুধ সন্দেশ দিয়েই কাজ সারতে হয়—পুজারী দুধটুকু নিয়ে বাড়ি চলে যান। মা সকালে দুটো ছোট নৈবেদ্য করেন, ভোগও সব দিন রান্না করতে পারেন না। অপর কোন আত্মীয়াকে ডেকে করাতে হয়। সকালে ভোগ রান্না হয়ে ওঠে না বলে বাড়ির ছেলেরা কেউ ভোগটা নিবেদন ক'রে দেয়। দুটো তুলসীপাতা

দিয়ে নিবেদন করা—এই তো। এটুকু মন্ত্র সবাই জানে।···একথা যমুনা শাশুড়িকেও বলেছে, সত্য গোপন করে নি।

সাধারণ গৃহস্থ-ঘর ওদের। জমিজমার ওপরই ভরসা। হয়ত কিছু পুঁজি জমা আছে কোথাও—দু-একখানা কোম্পানীর কাগজ—অত যমুনা জানে না।

প্রথম যখন এ বিবাহের প্রস্তাব আসে তখন অসমান ঘরে বিয়ে দিতে বাবা রাজী হন নি, অবস্থার অনেক ফারাক বলে আপত্তি করেছিলেন। শিক্ষিত বড়-লোকের ছেলেকে জামাই করতে গেলে যা দেওয়া উচিত, যতটা খরচ করা—তা দেবার বা করবার সঙ্গতি ওঁর নেই। বস্তুত তার দশমাংশও দিতে পারবেন না। যমুনার মাও ভয় পেয়েছিলেন, মেয়ের ক্ষোয়ার হবে বলে।

ওপক্ষ থেকেই চাপ আসতে লাগল যখন, আশ্বাস এল যে তাঁদের কিছুই দিতে হবে না, নগদ আসবাব কিছুই না, অলঙ্কার শাশুড়িই ছেলের সঙ্গে যথেষ্ট পাঠাবেন, মেয়ের বাবা যদি কড়লোহা দিয়েও বিয়ে দেন, তাহলেও কোন অসুবিধা হবে না, কেউ জানতেও পারবে না।—তখনই রাজী হয়েছিলেন বাবা-মা।

সুলক্ষণা সুন্দরী সঘরের মেয়ে ঠাকুর দেবতার ঘরে নিরামিষ খেয়ে খুশী থাকবে—এমন বাঙালীর মেয়ে দুর্লভ বৈকি।

ভোরে মঙ্গল আরতির সময় ছাড়া বাড়ির মেয়েদের মন্দিরে যাওয়ার রীতি নেই। কেবল শয়ন আরতির সময়, যখন বহিরাগতরা কেউ থাকে না, তখন কোন কোন বয়স্কা এসে নাটমন্দির থেকে দর্শন ক'রে যান।

অন্দরমহলে গোবর্ধন শিলা আছেন, একটি সিংহাসনের ওপর। তাঁকেই তুলসী দিয়ে প্রণাম ক'রে জলযোগের পর্ব শুরু করেন সকলে, মধ্যাহ্নের পঙ্গতে বসার আগেও তাই।

বিশাখাকেও সে অভ্যাস করিয়েছেন।

স্নানের পর আহ্নিক শেষ ক'রে মন্দিরে যাওয়া, তারপর গোবর্ধন শিলায় তুলসী দিয়ে পরিক্রমা ক'রে তবে জল মুখে দেয় সে।

এ বাড়ির এই রীতি।

এক মাস যখন শেষ হয়ে আসছে, শ্যামসোহাগিনী একদিন প্রশ্ন করেন, 'বৌমা, মেয়েদের অশুচি অবস্থায়—মানে মাসিকের সময় মন্দিরে যেতে নেই, গোবর্ধনকেও স্পর্শ করা নিষেধ। গোবর্ধনই এখানে শালগ্রাম শিলার কাজ করেন, "আও লালা খাও জী" বলে ভোগ নিবেদন করলে গোবিন্দ স্বয়ং সে অন্ন গ্রহণ করেন। ঐ পাথ-রের শিলাটুকুকে সামান্য ভেবো না।'

নতমুখ আরও নত হয় বিশাখার, শুধু বলে, 'জানি মা।'

'কিন্তু—', বলতে গিয়ে থেমে যান শ্যামসোহাগিনী। অভ্যস্ত তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। কোথায় যেন একটু সাগ্রহ প্রত্যাশার ভাবও ফুটে ওঠে সে দৃষ্টিতে—'কিন্তু এক মাস তো হয়ে গেল প্রায়।'

'আমার—আমার কিছু ঠিক থাকে না মা। বরাবরই এই রকম।' মুখ আরও নত হয়ে যায়, জড়িত কণ্ঠে উত্তর দেয় বিশাখা, 'কখনও কখনও তিন মাসও হয়ে যায়।'

আর কিছু বলেন না শাশুড়ি।

প্রশ্ন করেন স্বরূপও। বিশাখা উত্তর দেয় না, স্বামীর দেহের খাঁজে মুখটা চেপে ধরে থাকে শুধু।

কিছু বুঝতে পারেন না প্রাণস্বরূপ।

বিশাখার আচরণে কোন বিরূপতা নেই, বরং যেন নির্ভরতার ভাবই বেশী। আদরে সোহাগে যে বীতস্পৃহা তাও না। কোথাও কোন কঠোরতা কি বিরূপতাও প্রকাশ পায় না। বরং এক এক সময় মনে হয়—কেমন যেন ভয়ে ভয়ে থাকে সে।

স্বামী-স্ত্রীর আদিম সম্পর্ক—সব কিশোরী বা তরুণী মেয়েরই সে সম্ভোগে উন্মত্ত হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু, স্বরূপের মনে হয় বিশাখা অংশগ্রহণ করে মাত্র, উপভোগ করে না।

যৌন-সম্পর্কে অনীহা? না স্বামী সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা?

স্বরূপকে পছন্দ হয় নি?

সে কথাও বার বার জিজ্ঞাসা করেন—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, নানান ভাষায়।

'ঠিব ক'রে বল তো বিশাখা, আমাকে তোমার পছন্দ হয় নি?' আহত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন বার বার।

কথাটা ভাবতেই যেন আত্মসম্মানে, অবচেতন-অহমিকায় আঘাত লাগে, আত্ম-প্রশাস্তিতেও।

অথচ তাই বা কেন হবে। প্রশ্ন মাত্রেই যেন শিউরে ওঠে, প্রবলতর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে স্বামীকে।

সকালে উঠে এক একদিন প্রণাম করার সময় তেমনি দুই পায়ের খাঁজে মুখ চেপে ধরে—সেই প্রথম দিনের মতো। আশ্বাস ও আশ্রয় প্রার্থনার ভঙ্গীতে। অন্তত স্বরূপের তাই মনে হয়।

স্বভাবত স্বল্পভাষী?

কথা যে একেবারে কয় না তাও তো নয়। সাধারণ ভাবে সব কথাই বলে, যদিও প্রশ্নের উত্তরই বেশির ভাগ। সেবার আগ্রহ সমধিক। যেন স্বামীর এতটুকু সেবা করতে পেলে জীবন সার্থক হবে—এই রকম ভাব। তবে ভালবাসার প্রশ্ন এলে এমন কাঠ হয়ে যায় কেন?

শ্রেষ্ঠতম আলিঙ্গনে, জীবনের গভীরতম ঘনিষ্ঠতায় কেন ওপক্ষ থেকে আগ্রহ বা ঔৎসুক্য—প্রত্যুত্তর বলাই উচিত—আসে না।

একবার একজনের মুখে শুনেছিলেন, 'এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছে, যারা ভাল-বাসলেও দৈহিক সম্পর্কে উৎসুক নয়, তাদের ইংরেজীতে বলে 'কোল্ড্'—শীতল। এও কি তাই?

কিন্তু তাহ'লে এই সারা রাত্রি এমন ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে এমন দেহের কোন একটা খাঁজে মুখ গুঁজে থাকা—যেন স্বামীর দেহ আঘ্রাণ করা—কেন হবে ? সে জড়িয়ে থাকায় দুজনেই ঘেমে নেয়ে ওঠেন, তবু হাত বাড়িয়ে পাখাখানা পর্যন্ত নিতে পারেন না স্বরূপ—স্ত্রীর বাহুবন্ধন একটু শিথিল করিয়ে। আবার, যখন সচেতন হয়ে ওঠে, স্বামীর কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারে—নিজেই উঠে গিয়ে পাখা এনে দাঁড়িয়ে বাতাস করে দীর্ঘক্ষণ ধরে। তখন কাছে টানলেও আসে না।

তাহ'লে পছন্দ হয় নি, ভালবাসে নি, শীতল—এ সব কথা তো বলা যায় না।

কী এ ?

এক এক বার ভাবেন—জলের মাছ ডাঙায় এসে পড়ার মতো সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে এসে পড়ে একটা মানসিক চাঞ্চল্য ? কিছুই ভাল লাগছে না এখানের ? নিরামিষ খাওয়া, আতপ চাল—এতে অসুবিধা ?

শ্যামসোহাগিনীও লক্ষ্য করেন বধূর—ঠিক বিষণ্ণ হয় তো নয়—কেমন অসুখী মুখভাব। সোনার কমলে প্রভাতের প্রসন্নতা ম্লানতরই হচ্ছে যেন।

তিনিও ভাবেন, একেবারে ভিন্ন পরিবেশে এসে পড়ার জন্যেই এ বিষাদ।

শান্তিপুর থেকে আনা দাসী হরিমতী তখনও ফেরে নি—সঙ্গে যাবার মতো লোকের অভাবে, তাছাড়া মথুরা গোকুল মহাবন এসব দর্শন করার ইচ্ছাতেও—সেও তত তাড়া দেয় নি। এবার সেও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, স্পষ্টই বলে, 'না মা, বলতে নেই প্রসাদ খুব ভাল—এমন পঞ্চ-ব্যঞ্জন-ভাত কোথায় পাব—তবে কি জানেন, এসব তো অব্যেস নেই !'

শ্যামসোহাগিনী সেই সুযোগেই প্রশ্নটা তোলেন, 'হ্যাঁ গো মেয়ে, বৌমা অমন শুকিয়ে বেড়াচ্ছে কেন বল তো ? ওরও কি তোমার মতো খাওয়ার কষ্ট হচ্ছে ?'

'না গো মা, না না। এমনিতেই—বোধ হয় বিধেতা এখেনে পাঠাবেন বলেই এই ছাঁচে গড়েছেন—মাছ মাংসে কোন দিনই তত রত নয়। তা ছাড়া বাড়িতেও তো অন্নভোগ হয়, সেও তো নিরিমিষ্যি, আলোচালের ভাত, দিব্যি খেত।…তা নয়, আসল কি জানো—ছোটবেলা থেকেই বড্ড বাপ-সোহাগী যে, বাপ ভেন্ন আর কারুক্কে জানে না। বাপেরও আদুরী মেয়ে হ'ল চক্ষের মণি। জমি থেকে এসে সব্বাগ্যে মেয়ের খোঁজ—সে কোথায় গেল !'

এইটেই সম্ভব, বিশ্বাসযোগ্য। শ্যামসোহাগিনীও নিশ্চিন্ত হন।

কথাটা স্বরূপও শোনেন। মনে হয়, এত দিনের রীতি ভেঙে ওকে একবার বাপের বাড়িতেই পাঠাবেন নাকি ?…

মনের মধ্যে কদিন তোলাপাড়া ক'রে আগে ওর কাছেই একদিন কথাটা পাড়েন, 'বাবার কাছে যেতে চাও ? খুব মন কেমন করছে ? বলো তো বাড়ির অমতেও পাঠিয়ে দিই একবার—দিন পনেরোর জন্যে ? দ্যাখো—।'

বিশাখা যেন আর্তনাদ ক'রে ওঠে একেবারে, 'না না, আমি কোথাও যেতে চাই না। আমাকে কোথাও পাঠাবেন না !'

কিছুই বুঝতে পারেন না স্বামী।

এ কি মূর্তিমতী প্রহেলিকা বিয়ে ক'রে আনলেন তিনি!

আরও মাসখানেক কাটবার পর বিশাখা যেন কাঠ হয়ে উঠল।

শুকিয়ে কাঠ হওয়া নয়, যদিচ রোগা হয়েছে একটু সেটাও ঠিক—এ যেন আলাদা কাঠ হয়ে যাওয়া, যেমন কোন আতঙ্কে হয়।

আর এই পরিবর্তনটা সর্বাগ্রে শ্যামসোহাগিনীরই চোখে পড়ে।

স্বভাব-গম্ভীর মুখ তাঁর অন্ধকার হয়ে ওঠে।

স্বল্পভাষিণী কর্ত্রী আরও স্বল্পবাক হতে চান।

মুখের মেঘ কাটেও না। দৃষ্টি হয়ে ওঠে সংশয়-কুটিল। কেবলই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন বিশাখার দিকে, কী যেন লক্ষ্য করেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

কেন এমন ভাবে চেয়ে থাকেন, কি দেখেন কেন দেখেন—কাউকে বলেন না। বিশাখাকেও কোন প্রশ্ন করেন না।

আর ক'দিন দেখে বধূকে—এরা বৌরাণী বলতে শুরু করেছে প্রথম থেকেই, আশ্রিতা দাসদাসীর দল—মন্দিরে যেতে নিষেধ করলেন। সেই সঙ্গে গোবর্ধন পূজাও নিষিদ্ধ হ'ল।

নিষেধ করলেন ওকে নিভৃতে একা ডেকে। স্বল্প কথায় মূল বক্তব্যটা শুধু বলে চলে গেলেন অন্যত্র।

বিশাখা যে নিশ্চল পাথর হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ, তাও চেয়ে দেখলেন না।

কি কারণে এই নিষেধ তা তাকেও বললেন না, ছেলেকেও না।

আত্মীয়া-দাসী-আশ্রিতার দল বিমূঢ় হয়ে যায়। দ্বিধায় পড়ে।

অন্তঃসত্ত্বা? তাহলে তো আনন্দ-উৎসবের ধুম পড়ে যাবার কথা। বংশের প্রথম সন্তান আসছে, নতুন এক পুরুষের শুরু হবে।

ছেলেই হবে। এ বংশে মেয়ে কম।

সুতরাং প্রথম সন্তান-সম্ভাবনা হলে হৈ-চৈ পড়ে যাবে, দেবালয়ে দেবালয়ে পূজা পৌঁছবে—এই তো সবাই জানে।

এক আত্মীয়া আর এক আত্মীয়াকে চুপিচুপি প্রশ্ন করেন, 'বৌ হিজড়ে নয় তো? আমার এক ভাসুরপোর কপালে অমনি জুটেছিল। সে আবার এমন, বৌকে বিদায় করতে দিল না। অন্য বিয়েও করল না। বলে, ওর কি দোষ? দোষ গোবিন্দর, আর আমার কপালের। নইলে কারও তো এমন শুনি নি।'

যতই সংশয় ও কল্পিত কারণ মনে দেখা দিক, কৌতূহল যতই প্রবল হোক—শ্যামসোহাগিনীকে কেউ প্রশ্ন করবে এমন সাহস কারও নেই। শুধুই ছটফট করে সবাই।

আরও দশ বারোদিন দেখে মথুরার বড় ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। সেই সঙ্গে এ বাড়ির পুরাতন দাইকেও। এরাই যথেষ্ট, বরং দেখা যায় ডাক্তারের থেকে বেশী

বোঝে—তবু নিশ্চিন্ত হতে চান বলেই অত বড় ডাক্তার ডাকা।

পরীক্ষার সময় কাউকে থাকতে দেওয়া হ'ল না। গভীর রাত্রে ডাক্তার এলেন, ঠাকুরের শয়ন হয়ে যাবার অনেক পরে—প্রসাদ পাবার পর অধিকাংশই গৃহগত হলে। এত রাত্রে আসার জন্য ডাক্তারকে ডবল ফি দিতে হ'ল।

স্বরূপ বিহ্বল হয়ে পড়েন।

স্ত্রীর কথা নিয়ে মার সঙ্গে আলোচনা করা বা কোন প্রশ্ন করা তখন অশালীন বলে গণ্য হ'ত। বিশেষ তাঁর মায়ের মতো রাশভারী মানুষকে সে প্রশ্ন করার সাহসও নেই।

ফলে নানাপ্রকার—নিরসনের উপায়হীন—কুটিল সংশয় দেখা দেয় তাঁর মনেও।

স্ত্রীকে প্রশ্ন ক'রে কোন লাভ নেই। সেখানেও উত্তর পাওয়া যাবে না।

সে পা জড়িয়ে ধরবে, কাঁদবে শুধু।

আগে বুকে মুখ লুকোত, এখন কে জানে কেন, অত জড়িয়ে ধরে না। আগে যেটুকু ছিল—কঠিন আলিঙ্গন—তাও আজকাল পাওয়া যায় না।

আজকাল গোপনে চোখের জল ফেলে বিশাখা, তাও লক্ষ্য করেন।

বুক ভারী হয়ে স্বরূপের। অস্বস্তি ও অশান্তির সীমা থাকে না।···

আরও—কী এক অজানা কারণে, বিশাখাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও যেন কেমন ভয় করে। কী উত্তর পাবেন, পাওয়া সম্ভব—তার আবছা একটা কল্পনা মনে আসতেই সমস্ত মন ও দেহ যেন অবশ হয়ে আসে।

মনে হয় বরং পালিয়ে যান কোথাও।

মা আর যাই হোন, অবিবেচক নন আদৌ। তিনি কিছু বলছেন না যখন —তখন, তখন হয়ত বলার মতো নয়। হয়ত ছেলে কোন প্রবল আঘাত পাবে সেই জন্যেই বলছেন না।

কথাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত সংশয় ও আশঙ্কা দু হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেন—যেন এটা দৈহিক কিছু।

না না, হয়ত জরায়ুজ কোন পীড়া আশঙ্কা করছেন মা, এতদিন মাসিক হচ্ছে না দেখে। সন্তান যদি একেবারেই না হয়, এই ভয়ে ডাক্তার আনাচ্ছেন।

মনকে নানা রকমে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন স্বরূপ।

ডাক্তার ও দাই পরীক্ষা ক'রে মতামত জানিয়ে চলে যাবার পরই নতুন এক আদেশ জারী হ'ল।

ঠাকুরবাড়ি থেকে সামান্য দূরে—অথচ সীমানার বাইরে, একটি ছোট বাগান-বাড়ি আছে এঁদের। ছোট বাড়ি, চারিদিকে গাছপালায় ঘেরা। একজন মাত্র মালী (সে-ই দারোয়ানও) থাকে, বাড়ি ঘর সাফ রাখা ও গাছপালা দেখার জন্যে।

সেই বাড়ি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে, বিছানা রোদে দিয়ে বাসনপত্র প্রভৃতি মেজে রাখার হুকুম হ'ল।

এটাই এ'দের আঁতুড়-মহল। এ বাড়ির মধ্যে সন্তানের জন্ম হলে—ঠাকুর সেবার কোন ব্যাঘাত ঘটে না। নইলে নতুন ক'রে অভিষেক না হওয়া পর্যন্ত ভোগ-পূজা বন্ধ থাকে, বিলম্বিত হয়। গোসাঁইদেরও ততক্ষণ উপবাসী থাকতে হয়। এমনই তো শুভ অশৌচেও কদিন দেবতাকে স্পর্শ করা নিষেধ।

এখানে কাকে পাঠানো হবে? পুত্রবধূকে নাকি? কিন্তু এই তো মাত্র তিন মাস বিয়ে হয়েছে। তবে?

এ প্রশ্নও নিরুত্তরিত থেকে যায়। আসলে প্রশ্নটাই যে করা হয়ে ওঠে না।

পরের দিনই সেই বাড়িতে সরিয়ে দেওয়া হ'ল বিশাখাকে।

দিনে নয়, রাত্রে। ঘেরাটোপ দেওয়া ডুলিতে চাপিয়ে। অবগুণ্ঠনবতী হয়ে নীরবে এসে ডুলিতে চাপল। সে সময় স্বরূপ পর্যন্ত রইলেন না। শুধু পূর্ববৎ গম্ভীর অন্ধকার মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন শ্যামসোহাগিনী।

অন্য কোন পরিজন বা দাসদাসী—কেউ না এসে দাঁড়ায়, সে হুকুম আগেই দেওয়া হয়ে ছিল।

শুধু শোনা গেল এদের আঁতুড়ঘরের যে পৃথক পাচিকা ও রামরতিয়া বলে এক দাসী আছে, তারা অপরাহ্নেই পেঁছে গেছে। সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য, খাদ্যবস্তু, কাঠ, লণ্ঠনের তেল—সবই।

পাহারা দেবার জন্য অতি পুরাতন ও বিশ্বস্ত এক দারোয়ানও।

অর্থাৎ এখানের সঙ্গে কোন দৈনিক সম্পর্ক বা আসা-যাওয়ার না প্রয়োজন থাকে। লোক যাতায়াত থাকলেই নানা প্রশ্ন, নানা আলোচনা, কানাকানি গা-টেপাটেপি।

পরের দিন প্রত্যুষেই, মঙ্গল আরতিরও আগে, স্বরূপ চলে গেলেন—বৃন্দাবন নগরসীমার প্রান্তে, যেখানে গোপীবল্লভের বাগানবাড়ি। প্রতি রাসযাত্রায় সোনার চতুর্দোলে চেপে যেখানে যান ঠাকুর ও রাধারাণী।

যাবার সময় শুধু মাকে প্রণাম ক'রে গেলেন। তিনিও কিছু বললেন না, মাও কোন প্রশ্ন করলেন না।

॥ ৪ ॥

সাড়ে তিন মাস পরে একটি পুত্র-সন্তান হ'ল বিশাখার।

তার আগেই একদিন সমস্ত আশ্রিতা পরিজনদের ডেকে কঠোরভাবে সতর্ক ক'রে দিলেন শ্যামসোহাগিনী; বৌমা বললেন না, বিশাখাও না, যমুনা বলেই উল্লেখ করলেন—যমুনা সম্বন্ধে কোন আলোচনা, কানাকানি না এ বাড়িতে হয়, তার সম্বন্ধে কোন বিরূপ মন্তব্যও। যদি কখনও এমন ধরণের কিছু ওঁর কানে আসে, ওর নাম ক'রে কেউ কোন আলোচনা করেছে কি কি কিছু বলেছে—তাহ'লে তার আর গোপীবল্লভের আশ্রয়ে থাকা হবে না, সেইদিন তন্দণ্ডেই তাকে বিদায় নিতে হবে।…

এ বংশের বর্তমান বড় গোসাঁই-এর স্ত্রী পুত্র-সন্তান প্রসব করল—অথচ শাঁখ বাজল না, হুলুধ্বনি হ'ল না ; দেবালয়ে দেবালয়ে পুজো গেল না, পরিচিত বা আত্মীয়মহলে পেঁড়া কি লাড্ডু বিতরিত হ'ল না—বৈষ্ণব নাম-কীর্তনকারীরা নন্দোৎসবের গান গাইল না—এ অভূতপূর্ব ঘটনা, এ বাড়ির ইতিহাসে এর কোন নজীর নেই।

অন্যদিকে অবশ্য যা করণীয় তার কোন ত্রুটি ঘটে নি।

একুশদিনে স্নান, ক্ষেউরি—সবই হ'ল নিয়মমতো। কী পাড় শাড়ি এক্ষেত্রে পরানো হবে, নববস্ত্র দেওয়া হবে কিনা—প্রশ্ন করতে স্বয়ং শ্যামসোহাগিনীকেও কয়েক মুহূর্তের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হতে হ'ল—তার পরই যেন ধমক দিয়ে উঠলেন প্রশ্নকারিণীকে, 'লালপাড়ই দেবো—যা দেওয়া হয়, নিয়ম। পাড় নিয়ে এত মাথাব্যথা পড়ল কার ?' ঐ কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মনে পড়ে গেল তাঁর, স্বরূপই মাথায় সিঁদুর দিয়েছে নিজে হাতে—এখানে কালাপাড় কাপড় পরালে ছেলেরই অকল্যাণ হবে না কি ?

এ পর্যন্ত নিয়ম রক্ষা হ'ল, সিঁদুরও পরানো হ'ল। কিন্তু ষষ্ঠীপুজোর প্রশ্ন কেউ তুলল না, কর্ত্রীও কিছু বললেন না। শুভশৌচ যখন পালন করল না কেউ তখন আর ষষ্ঠীপুজো কিসের ?

শুদ্ধ হবার পরের দিনই যাত্রার ব্যবস্থা। যমুনার স্বাস্থ্য কেমন—এতখানি যাত্রা-পথ, ধকল সহ্য করতে পারবে কিনা—রামরতিয়াকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

রামরতিয়ার উত্তরও অবিস্মরণীয়, 'বড়মা—মানুষটা মানুষ থাকলে তার ভাল-মন্দর কথা ওঠে। এ তো কাঠ। লকড়ির গুঁড়িয়া হয়ে গেছে। মুখে দুঃখের ভাবও নেই, হাসিও নেই। খেতে বললে যা পারে একটু মুখে দেয়। শুতে বললে শুয়ে পড়ে। বাচ্ছাটার দিকে তাকায়ও না। দুধ দেবার উপায়ও নেই—দুধ আসবে কোথা থেকে ? না খেয়ে খেয়ে শরীরে কিছু রেখেছে ? প্রথম থেকেই ঢোকা দুধ খাওয়াতে হচ্ছে। সব সময় যেন পাথর হয়ে বসে থাকে। দেহে প্রাণটা আছে কিনা বোঝা যায় না। যদি চোখে জলও পড়ত তো বোধহয় বেঁচে যেত মানুষটা।'

তারপর হাত জোড় ক'রে বলেছিল, 'বড়মা, আমার ছোটমুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে, আমি আপনার পায়ের ধুলো হবারও যুগ্যি নেই, তবু বলছি, না বলে থাকতে পারছি না, জুতো মারতে হয় তো মারবেন—এ যেন মরতেই চাইছে। কিন্তু মরণ কি এত সহজে আসবে ? হাজার হোক, নওজওয়ান লড়কী ! এ জায়গা ওর ভাল লেগেছিল বড়মা, তোমাদেরও। এই জায়গা ছেড়ে যেতেই ওর বেশী কষ্ট। অনেক দেখেছি এতখানি বয়সে, এই কাজ করেই তো খাই—পাপের বাচ্ছা যে হতে দেখি নি তা তো নয়। কন্নাও করতে হয়েছে সে-সব জায়গায়। এ শহরে এ তো নতুন কিছু নয়। কিন্তু এ মেয়ে আলাদা। আবারও আস্পদ্দা ভাববেন—কথাটা বলছি বলে—পাপ কার, কেন, কি ক'রে কি হ'ল তা জানি না, তবে পাপ ওর তা আমার বিশ্বাস হয় না—অথচ ওকেই চারগুণ সাজা সইতে হচ্ছে, অপরের পাপে

ওর জীবন যেতে বসেছে।'

শ্যামসোহাগিনী অজ্ঞাতসারেই যেন 'ষাট ষাট' বলে ওঠেন অস্ফুট কণ্ঠে। পাথরের চোখে বুঝি একটু সজলতাও দেখা দেয়।

তারপরই আবার স্বাভাবিক স্থৈর্যে ফিরে এসে কি কি করতে হবে—বুঝিয়ে দেন রামরতিয়াকে।

পরের দিন শেষরাত্রে ঘেরাটোপ দেওয়া পালকিতে চাপিয়ে বিদায় দেওয়া হ'ল। শেষ মুহূর্তে আর শ্যামসোহাগিনী আসেন নি। প্রয়োজনই বা কি। নির্দেশ বিচ্যুতিহীন। আর সে নির্দেশমতোই কাজ হবে তাও তিনি জানেন।

বৃদ্ধ দারোয়ান সুরয পাণ্ডে আর দাসী রামরতিয়া সঙ্গে ছিল। হাতরাসে ট্রেনে তুলে দেওয়া পর্যন্ত দুজন লেঠেল সঙ্গে গেল। পালকি ক'রেই মথুরা পর্যন্ত যাবে যমুনা, বাচ্ছাটাকে কোলে ক'রে রামরতিয়াও। সদ্য প্রসূতিকে টাঙ্গায় পাঠানো সম্ভব নয়।

মথুরায় পেঁাছে না কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়, তার জন্য আগেই লোক পাঠিয়ে একটা ঘরভাড়া করা হয়েছিল, সেখানেই স্নানাহারের ব্যবস্থা। ট্রেন এলে মেয়েদের সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় তুলে দেওয়া হবে। সুরয সিং আর পাইক দুজন যাবে থার্ড ক্লাসে। হাতরাসে বড় লাইনের গাড়িতে সুরয সিং উঠবে ইণ্টার ক্লাসে—কারণ থার্ড ক্লাস বহুদূরে—ওর কাছাকাছি থাকা দরকার। নইলে হঠাৎ কোন প্রয়োজন পড়লে এরা সুরযকে জানাতে পারবে না।

পাইকরা ওখান থেকেই ফিরে আসবে, বড় ট্রেন ছাড়লে।

নির্দেশ নিখুঁত, ভ্রান্তিহীন।

বাক্স ক'রে বাপের বাড়ির দেওয়া গহনা; অন্যান্য জিনিস, কাপড় জামা ট্রাঙ্কে ক'রে দেওয়া হ'ল। তার সঙ্গে ওঁদের দেওয়া ও ব্যবহার করা শাড়ি-জামাও। এদের দেওয়া গহনা—চুড়ি বালা গায়ে ছিল, সোনার লোহা শাঁখা—তাও রইল। খুলে নেবার কথা কেউই বললেন না।

সুরয পাণ্ডে ও রামরতিয়াকে যা বলা ছিল, সে আদেশ অক্ষরে অক্ষরেই পালিত হ'ল।

একেবারে যমুনার বাপের বাড়ির চৌকাঠ পর্যন্ত পেঁাছে দিয়ে বিনাবাক্যে ত্বরিত গতিতে ফিরে গেল ওরা।

কি হয়েছে, এ কী ব্যাপার—হতভম্ব গৃহস্থকে জিজ্ঞাসা করারও অবসর দিল না।

এই রকমই হুকুম দেওয়া ছিল।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দু-একজন ছুটে গেল ওদের পিছু পিছু, ধরেও ফেলল। ওরা হাত জোড় করল, 'আমাদের কিছু বলার হুকুম নেই। বৌমাকে জিজ্ঞাসা করবেন।'

উত্তরটা সুরযই দিল। রামরতিয়ার তখন কিছু বলার শক্তি নেই। বৌয়ের বাপের বাড়ির কাছাকাছি আসার সময় থেকেই তার চোখে অবিরল ধারা নেমেছে। এখন তো রীতিমতোই কাঁদছে। যেন সোনার প্রতিমা অকুল পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সে—এই রকম তার মনের অবস্থা।

বিশাখাকে প্রশ্ন করা হ'ল বৈকি। কিন্তু সে যেন নিষ্প্রাণ পাথরের মতোই দাঁড়িয়ে রইল নিজের পায়ের দিকে চেয়ে।

অবশ্য প্রশ্নের খুব প্রয়োজন ছিল কি ?

অসময়ে তারা বাপের বাড়ি মেয়েকে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে—সব জিনিসপত্র সঙ্গে দিয়ে। সঙ্গে একটি শিশু।

এর পর আর বিশেষ কি জানবার আছে !

মা মূর্ছা গেলেন। অতঃপর শুরু হ'ল অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা ও অন্তহীন গঞ্জনা।

কাকা-কাকীরা—দুই মামাও এসে পড়েছিলেন সেদিন, তাঁরা কাছেই বাঘ-আঁচড়ায় থাকেন—সকলে মিলে যা মনে এল তাই বলে তিরস্কার, ধিক্কার, অনুযোগ, গালিগালাজ শুরু করলেন।

এর মধ্যে ঘোড়ার গাড়ির শব্দ, মেয়ের আগমন ও শ্বশুরবাড়ির লোকের প্রস্থান—নিকট প্রতিবেশীর চোখ এড়াবে তা সম্ভব নয়।

তাঁরাও কেউ কেউ ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে—বা ডালের কড়া চাপানো অবস্থাতেই ছুটে এলেন। এর মধ্যে কে বুদ্ধি ক'রে—এই ঝাঁক বেঁধে আগমনের আরম্ভ দেখেই—বাড়ির তিনটে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল তাই—নইলে শ্রুতিরোচক কেলেঙ্কারির গন্ধ পেয়ে গোটা পাড়াটাই বোধ হয় ভেঙে পড়ত।

প্রাথমিক লাঞ্ছনার প্রচণ্ডতা একটু কমলে—মানে ক্লান্তি বোধ হলে শুরু হ'ল প্রশ্নের বন্যা—'কে এ কাজ করলে বল !'

এর মধ্যে মেজকাকা প্রচণ্ড একটা চড় মেরেছিলেন—আরও হয়ত মারতেন, যদি না কেউ এসে হাত চেপে ধরত।

'বল্, হারামজাদী বল্,—কে এ কাজ করলে—তাকে আর তোকে একসঙ্গে চিতেয় তুলে দিই !···এতবড় বংশের নাম ডোবালি তুই ! সবচেয়ে—কোন্ বাড়িতে দিয়েছিলুম তোকে, তাদের কাছে আমাদের সবাইকে কোথায় কোন্ নরকে নামিয়ে দিলি। তারা এতদূর থেকে এসে বিশ্বাস ক'রে আমাদের মেয়ে বলে নিয়ে গিছল—হ্যাঁ ! সে কথাটা ভাবলি না ! হয়েছিল—আগে বলতে পারো নি ? যা হবার এখানে হ'ত !'

কে একজন বলে উঠলেন, 'তবু তারা খুবই ভদ্র বলতে হবে, এমন ভাবে যত্ন ক'রে লোক সঙ্গে দিয়ে কে বাপের বাড়ি পেঁৗছে দেয়। অন্য লোক হ'লে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে ঝ্যাঁটা মারতে মারতে পথে বার ক'রে দিত।'

এঁদের মধ্যে কারও মনে হ'ল না, এরও কিছু বলার আছে হয়ত।

মনে হ'ল না যে, দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে এসে সে এখনও উঠোনেই দাঁড়িয়ে

আছে একভাবে, পাথরের মতো। নিজের বাবা-মার কাছে এসেও চরম দুর্দিনে যদি একটু আশ্রয় না পায়—তাহলে কোথায় যাবে সে! আর যে একমাত্র পথ খোলা আছে তার কাছে, সে পথে গেলে তাঁদের বংশের নাম আরও পাঁকে ডুববে।

মনে হ'ল না যে সদ্যোজাত শিশু একটার কথা, কেঁদে কেঁদে তার দম বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে!

পাপজ বটে—কিন্তু সে কি ঐ শিশুর দোষ? আমরা তো নিত্য মন্ত্র পড়ার সময় উচ্চারণ করি, 'পাপোহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভব।'

মনে হ'ল যমুনার দাদা বিমলেরই শেষ পর্যন্ত।

সে এসে হাত ধরে যমুনাকে টেনে নিয়ে এল নিজের ঘরের মধ্যে। জোর ক'রে বিছানায় বসিয়ে দিল। তাতেই বোধহয় চৈতন্য হ'ল ওর এক মামীমার—তিনি এসে সেই কাঁথাজড়ানোসুদ্ধ বাচ্চাটাকে কোলে ক'রে ঘরে এনে দুধজল খাওয়াবার চেষ্টা করলেন।···

ততক্ষণে মার মূর্ছা ভেঙেছে, তিনি মেঝেয় মাথা খুঁড়ছেন!

এরপর মামা-কাকার দল যমুনার মাকে নিয়েই পড়লেন। 'তোমার দেখা উচিত ছিল! তুমি মা, তুমি নজর রাখলে কি এ কাজ হ'তে পারত!···আর, তুমি বুঝতেও পারলে না। ছিঃ ছিঃ, কতদূর পর্যন্ত আমাদের মাথা হেঁট হ'ল বল দিকি! কী অপমান হ'ল সারাগুষ্টির! আর কেউ আমাদের ঘর থেকে মেয়ে নেবে?'

মা কান্নার মধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন, 'আমি কেমন ক'রে জানব! ওর মাসিকের ঠিক থাকেনি কোনদিন। বাড়িতে কেউ বাইরের লোক ছেলে-ছোকরা আসে না—সন্দেহ হবেই বা কেন? মেয়ে স্কুলে যেত পুনি-ঝিয়ের সঙ্গে, সে গিয়ে নিয়ে আসত। ওর দাদার বন্ধুরা এলে বাইরে বৈঠকখানায় বসে—বাইরের কেউ অন্দরে আসে না। এসব নোংরা কথা ভাববই বা কেন?'

আবার শুরু হ'ল সেই জেরা।

দাদাই এর মধ্যে একটু শরবৎ খাইয়ে দিয়েছে। এতক্ষণের মধ্যে একটা কথাও যেমন বলে নি যমুনা, তেমনি 'না'ও বলল না। নিঃশব্দেই শরবৎ খেয়ে নিল।

তার মধ্যেই শোনা গেল, কে একজন প্রতিবেশিনী পিছন থেকে বেশ শ্রুতি-গোচরভাবেই ফিসফিস ক'রে বলছে, মাগো, লজ্জা-ঘেন্না বলে কিছু কি থাকতে নেই! আমরা হ'লে ঐ শরবৎ খাবার আগে—'

বোধহয় বিমল রুক্ষমুখে তাকাতেই থেমে গেল সে।

তবু, আর একটু পরে, আর একজন কে আরও ফিসফিস ক'রে বলার চেষ্টা করতে করতে বলে উঠল, 'যাই বলো বাবু—পষ্ট কথা আমার কাছে—ঘাঘু মেয়ে একখানি!'···

জেরা চলল বৈকি। প্রশ্নের ঝড় বইতে লাগল।

কিন্তু কোন অনুনয়ে অনুরোধে হুমকিতেই কথা বলানো গেল না যমুনাকে। এ কাজ কে করল, শিশুর জন্মদাতা কে—তা জানা গেল না। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে

চড়চাপড় দু'চার ঘা যে পড়ল না, তাও না। তবু কথাও যেমন বলল না, চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও বেরোল না।

খুবই যে শক্ত জান, প্রতিবেশিনীরা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

শেষ পর্যন্ত এই প্রায়-অন্তহীন লাঞ্ছনা বন্ধ করল বিমলই।

সে এমনি ভদ্র—এ বাড়িতে বাবা-কাকার মুখের ওপর কথা বলার চলন নেই—কিন্তু এখন আর থাকতে পারল না। বলল, 'আপনারা আর কতক্ষণ এ পর্ব চালাবেন? মধ্যযুগের প্রোটেস্টান্টদের নির্যাতনের মতো হয়ে উঠছে যে। ও পাথর হয়ে গেছে, দেখছেন না? থাম্বস্ক্রু চালালেও কথা কওয়াতে পারবেন না। আর কে করেছে জেনেই বা লাভ কি? বিয়ে দিতে পারবেন? হিন্দুর বিয়ে—মেয়েদের দুটো বিয়ে করা যায় না।...এসব ছেড়ে দিন। দুটো দিন যাক, একটু হাঁফ ছাড়তে দিন—চোখে জলও আসবে, মুখে কথাও। নিজেই বলবে। এখন কি করা হবে সেইটে ভাবুন।'

যে কখনও চড়া কথা বলে না—তার এই ভাষায় ও কণ্ঠস্বরে সকলেই যেন থতমত খেয়ে চুপ করলেন। খানিক পরে এক কাকা মুখ গোঁজ ক'রে বললেন, 'এ বাড়িতে থাকতে দেওয়া যাবে না, অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

বড় মামা ধমক দিয়ে উঠলেন, 'আচ্ছা সুস্থ হয়ে ধীর মাথায় ভাবলেই হবে। এখুনি সে কথা ঠিক করা যায় না। চলো আমরা অন্য ঘরে যাই।'

বিমলের এই মূর্তিতে প্রতিবেশিনীদেরও অসমাপ্ত রান্নার কথা মনে পড়ল। ঘর-বাড়ির দরজা খুলে রেখে সবাই এখানে এসেছে কিনা সে চিন্তাও।

তাঁরা এবার গৃহাভিমুখী হতে শুরু করলেন।

মামা সবাইকে নিয়ে অন্য ঘরে গিয়ে বসেছেন। একজন ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল—যমুনার বাবা কেশববাবু বাগানের এক আম গাছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন।

এবার সকলেরই মনে পড়ল, তিনি একবারও সামনে আসেন নি। একটি কথাও বলেন নি। কেউ দেখেও নি তাঁকে।

সাধারণত এসময় তিনি চাষ তদারক করতে যান বলে তাঁর অনুপস্থিতির কথা অত কারও মনেও পড়ে নি।

হয়ত কখন নিঃশব্দে এসেছিলেন, পিছন দিকে। তেমনি নিঃশব্দেই বেরিয়ে গেছেন।

সবাই ছুটল সেই দিকে। মা আবারও মূর্ছা গেলেন।

যমুনা কিন্তু সেই ভাবেই বসে রইল, তেমনি স্থির হয়ে। এখনও চোখে জল এল না তার।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রায় এক সপ্তাহ এ বাড়িতেই রাখতে হ'ল যমুনাকে। পাপ সেই দিনই বিদায় করা গেল না।

কেশববাবুর আত্মহত্যার হাঙ্গামা মেটাতেই চার-পাঁচ দিন লাগল। শ্রাদ্ধশান্তির ল্যাঠা নেই, আত্মহত্যার পর এক বছর না গেলে ঔর্ধ্বদৈহিক কাজ কিছু করা যায় না। কিন্তু আরও অনেক সমস্যা দেখা দেয়—একান্নবর্তী সংসারের কর্তা, বিশেষ যদি সে সংসার প্রধানত এজমালি সম্পত্তির ওপর নির্ভরশীল হয়—হঠাৎ মারা গেলে। পুলিসের ব্যাপার তো আছেই, তবে সেটা মেটানো তত কঠিন হয় নি, এতদিনের সম্ভ্রান্ত পরিবার, কিছু প্রভাব প্রতিপত্তি তো থাকবেই। বাকী সমস্যাই প্রধান।

একটা যন্ত্র চলতে চলতে যদি তার প্রধান 'নাট'টা শিথিল হয়ে খসে পড়ে অতর্কিতে—তখন বিভ্রাটের শেষ থাকে না। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

তবু, সেজকাকা খুব বাস্তবজ্ঞান-সম্পন্ন মানুষ এবং কাজিৎকর্মা, তিনি এর ভেতরেই দুদিন গিয়ে নবদ্বীপ ঘুরে এসেছেন। ব্যবস্থাও একটা হয়ে গেছে। এ ধরনের পাপের বোঝা নামাতে হ'লে—বিশেষ বাঙালীর পক্ষে—নবদ্বীপ কাশী বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় কি? ব্রহ্ম এসব স্থানে প্রত্যক্ষ, আর স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া তাঁর পাপী সন্তানদের কে আশ্রয় দেবে?

সেজকাকা জানেন এক্ষেত্রে বিলম্ব করা মানেই কেলেঙ্কারির সংবাদ দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়া। তাছাড়া মেয়েটার লাঞ্ছনা তো চলছেই। বাপের ওই মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য দায়ী মেয়ের দুষ্কৃতিই—এ তো জলের মতো পরিষ্কার। মা পর্যন্ত একদিন এলোপাতাড়ি কিল চড় লাথি মারলেন। তবে সে লাঞ্ছনা আর বেশী দূর এগোল না এই জন্যে যে পাথরে মাথা কুটলে নিজেরই মাথা ভাঙে, পাথরের কিছু হয় না। নিজেদেরই ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিতে হ'ল।

একমাত্র বিমলই কোনদিন কিছু বলে নি—কে জানে সে কি ভেবেছে। হয়ত জীবন সম্বন্ধে তারও কিছু বাস্তবজ্ঞান জন্মেছে, অভিজ্ঞতাও হয়েছে। তার জন্যেই যমুনা আর শিশুটার জীবনধারণ সম্ভব হয়েছে।

সেজকাকা যে ব্যবস্থা ক'রে এসেছেন, তা অনুমোদন করলেন সবাই। অথবা করতে বাধ্য হলেন। আর কীই বা করা যেতে পারত। সকলেই তখন অনেকগুলি ও অনেক প্রকার রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হয়ে পড়ে ব্যস্ত, চিন্তিত, উদ্‌ভ্রান্ত।

আশ্রয়টা পাওয়া গেছে নবদ্বীপেই। অবশ্য শহরের একেবারে উপান্তে।

শহর কি তখন বলা যেত? নবদ্বীপ তখন প্রায় হৃত-গৌরব, বড়গোছের পাড়াগাঁ একটা—অর্থাৎ যাকে গণ্ডগ্রাম বলা উচিত।*

---

* অনেক শিক্ষিত লেখক ও অধ্যাপক বিপরীত অর্থে গণ্ডগ্রাম শব্দ ব্যবহার করেন। আধাশহর জনপদকেই গণ্ডগ্রাম বলে।

তারও এক প্রান্তে একটি জীর্ণ দেবমন্দির, এ দেশের ভাষায় ঠাকুরবাড়ি, কেউ কেউ বৃন্দাবনের অনুকরণে বলেন কুঞ্জ। কোন সুদূর অতীতে বিত্তশালী প্রতিষ্ঠাতার সাধ হয়েছিল তীর্থস্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন—শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও গৌর নিতাইয়ের পূজা হবে প্রত্যহ। তাঁর বোধ হয় স্বপ্ন কল্পনা ছিল যে দেবসেবা হবে সমারোহ সহকারেই—এবং প্রত্যহ কিছু অতিথি ভিক্ষুক প্রসাদ পাবে। অতিথি-দের কথা ভেবেই সম্ভবত অনেকগুলি ঘরও বানানো হয়েছিল, প্রায় খান কুড়ি ঘর। নিশ্চয় সেই মতো সম্পত্তিও দেবত্র ক'রে রেখে গিয়েছিলেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে উত্তরপুরুষরা সে ভ্রম সংশোধন বা 'ভীমরতি'র প্রতিকার করবে—এইটেই স্বাভাবিক। আইনের সঙ্গেও লড়তে হয় না এসব ক্ষেত্রে, বিশেষ দলিলপত্র বাড়িতেই থাকে, তা অন্তর্হিত হতে বা নষ্ট হতে কতক্ষণ? কেই বা এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে! কোন নিকট-আত্মীয় তার হিস্যায় বঞ্চিত হলে সে ঝগড়াঝাঁটি লাঠালাঠি করতে পারে—আইনের আশ্রয় নিতে সাহস করে না। কারণ তাহলেও তার হাতে কিছু আসবে না, হয়ত সরকারী কর্মচারীদের গর্ভেই চলে যাবে।

ফলে মন্দির বা সংলগ্ন অতিথিশালা মেরামত তো দূরের কথা, নিত্য দুটো ফুল ফেলারও অর্থ জোটে না। তথাকথিত সেবাইতরা ঠাকুর-সেবা বাবদ মাসে দশ টাকা ক'রে পাঠান। পালে-পার্বণে খুব কাকুতি মিনতি ক'রে চিঠি লিখলে, ঠাকুরের বস্ত্র শতছিন্ন এমনি কোন অজুহাত দিলে হয়ত কখনও কখনও আরও পাঁচ দশ টাকা দেন। গত ত্রিশ বছরে নাকি সে বাড়ির কেউ কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে এ মন্দিরের অবস্থা দেখতে আসে নি।

পূজারী হরেকৃষ্ণ চক্রবর্তীরও হতদরিদ্র অবস্থা। একদা ভিক্ষে করতে করতেই বাঁকুড়ার এক গ্রাম থেকে এখানে এসেছিল। তার কাছে এই আশ্রয়টুকুই সব থেকে প্রয়োজন তখন, লোভনীয়ও। তার বিদ্যাবুদ্ধি কি সে প্রশ্ন সেবাইতরা করেন নি—একটা 'পূজুরী বামুন' পেলেই হ'ল। বেশী বিদ্যা থাকলে কেউ ঐ টাকায় থাকে না, তা যত সস্তাগণ্ডাই হোক না কেন। হরেকৃষ্ণরও ঐ টাকায় চলবার কথা নয়। সে এই সঙ্গে এমনি আরও এক প্রায়-পরিত্যক্ত বিগ্রহ সেবার ভার নিলে—সেই সঙ্গে এক স্থানীয় উকিলবাবুর বাড়ি রান্নার কাজ। ছেলে-মেয়ে আছে, আরও হবে—বাড়তি আয় না হলে চলবে কেন? স্ত্রী মোহিনী গোরু ছাগলের ব্যবসা করে, তাতে বেশী আয় তার স্বামীর চেয়ে। ছাগল বড় হয় প্রায় নিজে নিজেই, লোকের বাড়ির ফ্যান, ফেলে দেওয়া আনাজের খোসা খেয়ে—অথচ আয় অনেক, দুধও বিক্রী হয় মাদীগুলোর, মদ্দগুলো বড় হলে বিক্রী হয়। তাতে ভালো টাকা ঘরে ওঠে।

হরেকৃষ্ণ সাগ্রহেই ঘর ছেড়ে দিল। ঠিক হ'ল এরা যেমন খায়—যমুনাও তাই খাবে। মাসে সাত টাকা ক'রে পাঠাবেন কাকারা। বাচ্চাটার দুধের জন্যে আর দু-এক টাকা বাড়াবার কথা বলেছিল হরেকৃষ্ণ, সেজকাকা ধমক দিয়ে উঠলেন, নবদ্বীপে এক একটা 'পারস' মাসিক আড়াই টাকা তিন টাকায় বিক্রী হয়। ঢের বেশী দিচ্ছেন তাঁরা। তিনি শুধু কটা জামা কিনে দিয়ে গেলেন বাচ্চাটার জন্যে, যমুনার

আপাতত জামা বা সেমিজ বা কাপড়ের দরকার নেই, যখন বুঝবেন—পাঠাবেন তাঁরা।

বড়মামাও সঙ্গে এসেছিলেন, সেজকাকাকে আড়ালে বললেন, বেশী দিন এ খরচও টানতে হবে না। এত দুর্দশাতেও এক ফোঁটা জল এল না চোখে, বাবার প্রাণ ছিল এই মেয়ে—তার মৃত্যুতেও কাঁদল না। ও তো পাগল হয়ে যাবে। পাগল হয়ে পথে বেরিয়ে যাবে কিংবা কেউ হয়ত ধরে টেনে নে গিয়ে খানকী-বাড়ি তুলে দেবে। এই ওর পরিণাম—বেশ দেখতে পাচ্ছি।'

ভাঙা বালি-ঝরা ঘর, দরজা জানলা অর্ধেকের ওপর ভাঙা। তবু মোহিনী নিজেদের পাশের ঘরটাই দিয়েছিল, কিছু আবরু তখনও আছে সে ঘরের—দরজাটা অন্তত ভালই আছে। ভাল কাঁঠাল কাঠের দরজা। অন্য ঘর থেকে টেনেটুনে একটা চৌকীও এনে দিয়েছে। তবে শয্যা বলতে ওদেরই কিছু নেই। সেজকাকা একটা পুরনো তোশক আর একখানা চাদর এনেছিলেন সঙ্গে, সেই সঙ্গে ছেলেটার একটা কাঁথাও। সামনেই শীত, তখন কি হবে তা নিয়ে অত মাথা ঘামান নি। মোহিনীই পাড়া থেকে মেগে-পেতে দুখানা কাঁথা সংগ্রহ ক'রে এনেছে ওদের জন্যে, ক্ষারে কেচেও দিয়েছে।

এই ভাবেই দিন কাটে।

মোহিনীরও ভয় করে যমুনার রকমসকম দেখে।

পাগল নয় তো? না হ'লেও পাগল হয়ে যাবে হয়ত শীগগিরই। চান করতে বললে চান করে, খেতে দিলে খায়। খুব প্রয়োজন হ'লে দু-একটা কথা যে বলে না তা নয়, তাতে কোন এলোমেলো ভাবও নেই, এই যা ভরসা। কিন্তু অবাক হয়ে যায় মোহিনী ছেলেটার প্রতি ওর আচরণ দেখে—নিজের সন্তান সম্বন্ধে এমন উদাসীনতা, এমন নিস্পৃহতা কারও দেখে নি সে। সতীনপো হ'লেও এতটা অবহেলা করে না কেউ। ছেলে যেন বিষ ওর কাছে। পাপজ সন্তান যে না দেখেছে তা তো নয়—তার জন্যে ছেলেটার কি দোষ, এমন ভাবে তাকে ঘেন্না করবে কেন?

'সে পাপ তো তুই-ই করেছিস, ছেলেটা তো যেচে সেধে আসে নি। ছেলেটার দোষ কি! এমন রাক্ষুসী মা কোথাও দেখি নি বাবা।'

মোহিনী গজগজ করে আপন মনেই।

ওর বড় ছেলেটা—রাখহরি, বছর ন'দশের ছেলে—সে মাঝে মাঝে নিজে থেকেই কোলে ক'রে নিয়ে বেড়ায়—বেশী কান্নাকাটি করলে। আর মোহিনী আর্থিক ক্ষতি স্বীকার ক'রে একটু একটু দুধ খাওয়ায় ছাগলের।

হরেকেষ্ট একটু লোলুপ হয়ে উঠবে বৈকি।

শ্যামবর্ণ, রোগা হাড় বার-করা চেহারা মোহিনীর, তিন সন্তানের মা, আরও একটি গর্ভে তখন—তাতে কাজ চলতে পারে, পিপাসা মেটে না।

পরিপূর্ণ সরোবর সামনেই, হাতের কাছে। রূপসী নবযুবতী—লালসা সম্বরণ

তো কঠিন বটেই। আগে উশখুশ, পরে চুলবুল করতে লাগল হরেকেষ্ট। অকারণ মিষ্ট কথা; সহানুভূতি জ্ঞাপন ও আশ্বাসদান, সোহাগে-গলে যাওয়া কণ্ঠ—যা ওর স্বরে বা ভাষায় আদৌ মানায় না। শেষে একদিন আলো-আঁধারে হাত ধরে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল।

প্রস্তুতি পর্বটাই হ'ল ওর পক্ষে নির্বুদ্ধিতা। মোহিনীর চোখে না হোক কানে এই অস্বাভাবিক আত্মীয়তার চেষ্টাটা পেঁচেছে। সে চোখে চোখে রেখেছিল স্বামীকে। সে চেঁচামেচি করল না, ঝগড়াঝাঁটি করল না—রাখহরির কোথা থেকে একটা বাবলার ডাল ভেঙে এনেছিল বেড়াল তাড়াবে বলে—সেটাই এনে এলোপাতাড়ি পিটতে শুরু করল।

'তবে রে মিনসে! রস আর ধরে না দেখছি! এই যা পেয়েছিস—তোর চোদ্দ গুষ্টির ভাগ্যি। রূপী বাঁদর হয়ে চাস সাক্ষেৎ সীতের দিকে হাত বাড়াতে!··· বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বলছি। আমি অন্য লোক ডেকে এনে পুজো সারব।'

কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হরেকেষ্ট চেঁচাতে চেঁচাতে কোনমতে বৌকে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে সোজা গিয়ে উঠল ওর পরিচিত গাঁজার আড্ডায়।

'মরুক, মরুক মাগী। কত সংসার চালাতে পারে চালাক। আমার কি—একটা পেট চলেই যাবে। শাঁকে ফুঁ না হোক উনুনে ফুঁ—বামুনের ছেলের আবার ভাতের অভাব। অন্যত্তরে গিয়ে আর একটা বে ক'রে নতুন সংসার পাতব। তুই পারবি আর একটা বামুন জোটাতে, চারটে ছেলেমেয়েসুদ্ধ ঐ ব্রেষকাঠ মেয়েমানুষ কেউ ঘাড়াবে!'

গজগজ করতে থাকে হরেকেষ্ট গাঁজার কলকে হাতে ক'রে।

তবে গজগজ যতই করুক, ওর থেকে মোহিনীর যে রোজগার বেশী, তার ওপর পাকা গৃহিণী—হাতের রান্না ভাল—এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তাই গভীর রাত্রে ফিরে আসতে হ'ল এবং বৌয়ের পায়ে-হাতে ধরে, 'আর কখনও এমন কাজ করব না' দিব্যি গেলে মিটিয়ে নিতেও হ'ল।

ওদিকে হাত বাড়ানো চলবে না, মোহিনীর সাফ নজর, বুঝে অন্য পথ ধরল হরেকেষ্ট।

দু পয়সা রোজগারের চেষ্টা করতে দোষ কি? এমন সুযোগ যখন সামনে।

আড়ালে পেলে—দূরত্ব বজায় রেখেই অবশ্য, বাবলার জ্বালা এখনও ভোলে নি—অন্যদিকে মুখ ক'রে (মোহিনীর দৃষ্টি কতদূর থেকে এসে পড়বে কে জানে) বোঝায়, 'এই তো তোমার বয়েস, এমন ভাবে পড়ে পড়ে মার খাবে কেন? জগৎ বাগচী মস্ত ধনী লোক, এ শহরে এক ডাকে তাকে সবাই চিনবে, দু-চারটে মাঝারি জমিদারকে সে চাকর রাখতে পারে। সে তোমাকে দেখেছে দূরে থেকে। তোমাকে বে করতে চায়। অমন অনেক বে-ই হয়—কে জানছে। তোমাকে নুকিয়ে পৈরাগে নিয়ে যাবে আগে, কাশীতে ওর মেলা চেনা লোক—তাছাড়া পৈরাগে ধরো গে নিজেরই পেল্লায় বাগানবাড়ি, সেখেনে বৌ বলেই তুলবে, এখেনে রটিয়ে দেবে ওখান-

কার মেয়ে বে করেছে, সেই পরিচয়ে এ বাড়িতে এনে তুলবে। বড় বোয়ের ছেলে হয় নি। দুটো না তিনটে মেয়ে—তাই ওর দুঃখু, তোমার যে কালে একটা ছেলে হয়েছে, তোমার হবে। বলেছে জড়োয়ায় সোনায় মুড়ে দেবে। বিশ্বেস না করো এক লাখ টাকা কোম্পানীর কাগজ ক'রে দেবে আগেই। হাতের নক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না। যে-সে লোক নয় জগু বাগচি। চেহারাও সোন্দর, টক-টক করছে রঙ, ইয়া দশাসই লাশ। দেখলে মেয়েদের জিভ দিয়ে জল পড়ে।' ইত্যাদি—

এই-ই মোট বক্তব্য। একসঙ্গে একদিনে বলে না, সে অবসর নেই।

থেকে থেকে বলে, ক্ষেপে ক্ষেপে। নানা ভাবে নানা দিনে বলে, একটু একটু করে। সে একেবারে বোকা নয়। ভাবে, হোক না পাথর, পাথরেও তো ঘষতে ঘষতে গর্ত হয়। বহু লোক আনাগোনা করায় কত দেবমন্দিরে ওঠার সিঁড়ি দ্যাখো গে গিয়ে বাঁকাচোরা খাঁজকাটা হয়ে গেছে। শুনতে শুনতে একদিন এ পাথরও কি আর গলবে না?

অবশেষে একদিন মোহিনীর অসাক্ষাতে একটা পাথর-বসানো ভাল নেকলেস নিয়ে আসে কোঁচার খুঁটের আড়ালে।

আসলে হয়ত জগৎ বাগচীকে ও-ই লোভও দেখিয়েছে। আড়াল থেকে—মন্দিরে ঠাকুর দেখার নাম ক'রে হয়ত দেখেও গেছে। যতই প'ড়ো পুরোনো মন্দির হোক, শহরের প্রায় বাইরেই হোক—কখনও কোনদিন কোন দর্শনার্থী আসবে না—তা হয় না। কেউ কেউ কালেভদ্রে আসে বৈকি—ধুলোটে, রাসে, ঝুলনে—ভাল ভাল কাপড় জামা পরা বিশিষ্ট ব্যক্তিও আসেন। তবে পোশাকের আড়ালে মানুষটা কেমন দেখতে তা নিয়ে পূজারীরা মাথা ঘামায় না, দু পয়সা এক আনা প্রণামী পড়বে এই আশায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

পাথর এবার নড়েচড়ে উঠল ঠিকই। তবে হরেকৃষ্ণর কল্পনা মতো নয়—অন্যভাবে।

কথাও বলল। সামনে হারটা মেলে ধরতে—যমুনা ওর হাত থেকে সেটা নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে এক রকম দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'দেখুন, যদি আপনি এই রকম রোজ রোজ জ্বালাতন করেন, তাহ'লে আমার গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। আপনি তাতে খুশী হবেন তো? মনস্কামনা সিদ্ধ হবে?'

পায়ে পায়ে পিছিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি হারটা কুড়িয়ে নেয় হরেকৃষ্ণ। খুব সম্ভব ঝুটো পাথর, ওর হাতে দামী নেকলেস তুলে দেবে এত বোকা কেউ নয়—তবে মোহিনী অত বুঝবে না। এবার হয়ত আঁশবঁটিটা এনে কোপই বসাবে।

তবে শুধু হরেকেষ্টই তো নয়, পাড়ায় আরও মানুষ আছে। তারাও উশখুশ করে। শুধু যে টাকা দেখেই মেয়েরা ভোলে তা নয়—কখনও কখনও অকারণেই ভোলে। কুৎসিত বা নিঃস্ব, বা বদ—পশু স্বভাবের পুরুষেও ভোলে। সুতরাং আশা ছাড়বে কেন? এরা সকলেই হয়ত আশা করে একদিন মন ভুলবে,

প্রাণ গলবে।

শিস দেওয়া বাড়ির সামনে এসে, আশপাশ থেকে গান গেয়ে ওঠা এর বেশী জানে না, সময় অসময়ে জানলার সামনে ঘোরাঘুরি করে। দর্শন করতে আসে নিত্য, অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েও থাকে হাত জোড় ক'রে।

আগলে আগলে রাখে মোহিনীই। গায়ে পড়েই ছুতোয়নাতায় প্রতিবেশিনী-দের বাড়ি যায়, তাদের কাছে যমুনার প্রসঙ্গ তোলে।

'দেখো না, এ তো আমার নিজের খুড়তুতো বোন, ভাল ছেলে দেখে আমার কাকা সাধ্যির অতীত্ খরচা ক'রে বে দিছল, ভাবলে সোন্দর মেয়ে বলেই এত কমে নে যাচ্ছে ওরা। তা কপাল। আমাদের বংশে কি আর ভাল পাত্তর নিয়ে ঘর করা নিকেছে বিধাতা! এই রকম হাড়জ্বালানে হতচ্ছাড়া হলে ঠিক থাকত। প্রেথম প্রেথম তিন চার মাস বেশ কাটল, বর নিয়েছিল—তার পরই অন্য মূর্তি। আসলে ছেলে রাঁড়বাজ, বৌ সোন্দর পেলে তাকে ভুলবে ভেবেই, শ্বশুর-শাশুড়িও এত আগ্গেরো ক'রে নে গিছল। তা ধরো গে বাজারের মেয়েছেলে, খানকী, তাদের ছলাকলায় যারা ভুলেছে তাদের কি আর কচি ভালমানুষ মেয়েতে মন ওঠে! পেটে একটা আসতেই ছেলে ঘরে আসা বন্ধ করলে। শ্বশুর-শাশুড়ির মনে হ'ল বৌ তাদের ঠকিয়েছে, সোন্দর মেয়ে বরকে ঘরবাসী করতে পারে না? আসলে ওরও ইচ্ছে নেই। এই সব নানা বেত্তান্ত। নিয্যাতনের সীমে-পরিসীমে নেই—শেষে মারধোর শুরু করতেই মেয়েটা পালিয়ে এল। একটা ছেলে নে কোথায় যায় বলো! ...বাত্তারা রটে গেল ঘর ছেড়ে এসেছে, তাই কাকাও আর ভরসা পেলে না ঘরে রাখতে, এখেনে পাঠিয়ে দিলে। রূপেও কিছু হয় না, পয়সাতেও না। আসলে মেয়েদের কপাল সব্বস্ব, কী বলো ভাই?'

আবার কখনও ঝাঁটা হাতে করে বাইরে এসে শূন্যে আস্ফালন করে, আর যেন বাতাসে কথাটা ছাড়ে, 'আ মরণ! মরণদশা ছোঁড়াগুলোর। শোকা-তাপা বোনটা নিজের জ্বালায় জ্বলছে, তার ওপর টাঁক সব। কুকুরের মতো এত্তখানি জিব বার ক'রে হাঁই হাঁই ক'রে ঘুরছে। ঐ জিব এক এক করে টেনে ছিঁড়ব। আয় না, এগিয়ে আয়. এই খ্যাংরার চোটে কত ভূত ছাড়িয়েছি, তোরা তো মানুষ।'

তাতেই কতকটা ভয়ে ভয়ে থাকে। ভেতর থেকে অভিভাবকদের গঞ্জনা, এদিক থেকে রণরঙ্গিনীর ভয়।

তা ছাড়া ভদ্রলোকের বাসও তো কিছু কিছু আছে। তাঁরা দরিদ্র হয়ত কিন্তু অমানুষ নন।

এক পাশেই তো পড়ে আছে এরা, খেটে খায়; কী দরকার এদের উত্ত্যক্ত করার। তাঁরাও হাঁকডাক ক'রে শাসিয়ে দেন ছেলেছোকরাদের।

এমনি ভাবেই দিন কাটে।

একটি দিনের সঙ্গে আর একটি দিন যুক্ত হয়।

বছরও ঘুরে আসে।

তবে সে হিসেব বোধ হয় মাথায় ঢোকে না যমুনার। হিসেব রাখেও না। দিন মাস বৎসর সব একাকার হয়ে গেছে ওর কাছে।

॥ ৬ ॥

শ্যামসোহাগিনীর কর্তৃত্ব, তাঁর আদেশ এ সংসারে অমোঘ, অলঙ্ঘ্য বলেই জানত সবাই, কিন্তু তাঁকেও হার মানতে হ'ল তাঁর নিজের ছেলে; গর্ভের শ্রেষ্ঠ সন্তান—রূপে গুণে বিদ্যায় বিনয়ে গর্ব করার মতো ছেলে—তার কাছেই।

তিনি নির্বোধ নন, ছেলেকে অনেকটাই চিনতেন, তাড়া করা উচিত নয়। তা ছাড়াও, এখনই নূতন বধূ আনার চেষ্টা অশোভন। এমনিই তো শহরে আলোচনার শেষ নেই—তা নিজে কানে না শুনেও বুঝতে পারেন শ্যামসোহাগিনী, তাই মাস ছয়েক একেবারেই চুপ ক'রে ছিলেন, ও প্রসঙ্গই তোলেন নি। কদর্য ঘটনার আলোড়ন থিতিয়ে যাওয়া দরকার—ঘরে ও বাইরে সকলকার মনেই।

এবার কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে একটু নাড়াচাড়া শুরু করতেই বুঝলেন, চিনলেও—ছেলেকে এখনও পুরোটা চেনা হয় নি তাঁর। তাঁরও!

পাত্রীর খোঁজটা আগে। এবার অত দূরে নয়—কাছাকাছির মধ্যে চাই। বৃন্দাবন মথুরা না হোক—এমন কোথাও থেকে আনতে হবে যাকে গিয়ে তিনি নিজে চাক্ষুষ দেখে ঘরে আনতে পারবেন, লোক লাগিয়ে যার খোঁজ-খবর করতে পারবেন। শুধু রূপ আর বংশ দেখে ভুলবেন না। ভাল কলমের গাছের ফলেও কোন-কোনটায় পোকা লাগে।

চোখে চোখে কৌতুক, ইশারায় ইশারায়। ঠোঁটের কোণে কোণে চাপা হাসি, কামদার মশাইকে* ঘরে ডাকিয়ে এনে মায়ের আলোচনা—স্বরূপ গোসাঁইয়ের চোখে না পড়ার কথা নয়। দু'চারদিন দেখেই ব্যাপারটা আঁচ ক'রে নিলেন।

প্রাণস্বরূপ আর অপেক্ষা করলেন না। এখন উদাসীন থাকলে কথা হয়ত অনেক দূর এগিয়ে যাবে, তখন বিবাহ বন্ধ করতে গেলে অপ্রীতি অসন্তোষের সৃষ্টি হবে, নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হওয়াও বিচিত্র নয়। মা অপমানিত বোধ করবেন, জটিলতার অন্ত থাকবে না।

নিজের বিবাহ প্রসঙ্গ গুরুজনদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা করা তখন অসভ্যতা, নির্লজ্জতা বলে গণ্য হ'ত। কিন্তু প্রাণস্বরূপ দুই অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে থেকে যেটায় ভবিষ্যৎ সমস্যা কম, সেটাই বেছে নিলেন, ইংরেজিতে যাকে বলে 'বিটুইন ট্যু ইভিল্স্'।

একদিন অপরাহ্নে মায়ের বিশ্রামের অবকাশে তাঁর ঘরে গিয়ে বিনা ভনিতায় বললেন, 'মা, তুমি কি আমার আবার বিয়ের ব্যবস্থা করছ?'

[এ বাড়িতে মাকে আপনি বলাই রীতি ছিল এত কাল, এখনও কোন কোন

* মন্দিরের ম্যানেজার বা কর্মকর্তা।

বনেদী বাঙালী বাড়িতে সে প্রথা একেবারে লুপ্ত হয় নি, বিশেষত ঠাকুরদের বা তাঁদের আত্মীয় সমাজের মধ্যে। কিন্তু শিশুকাল থেকেই প্রাণস্বরূপ 'তুমি' বলে আসছেন, শ্যামসোহাগিনী সে বে-সহবৎ সংশোধনের চেষ্টা করেন নি ইচ্ছে ক'রেই। বলেছেন, 'মাকে আপনি-আজ্ঞে করলে বড্ড পর-পর লাগে না? ও যা চালু হয়ে গেছে তাই থাক।']

শ্যামসোহাগিনী বোধ হয় এটাই আশঙ্কা করছিলেন, তিনি নিজে সরে গিয়ে বিছানাটা দেখিয়ে বললেন, 'বোস্।' তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তা করতে হবে না? সংসারধর্ম পালনও তো আমাদের সেবার একটা অঙ্গ।…একটা দুর্ঘটনা—দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি বলব—ঘটে গেছে বলেই এ পর্বে ছেদ টানতে হবে তার কোন মানে নেই, এমন তো কত ঘটনাই ঘটে জীবনে, তাকে ঠেলে সরিয়ে আবার সহজ স্বাভাবিক হওয়াই তো মানুষের কাজ বাবা।'

প্রাণস্বরূপ বিছানাতে বসলেন, কিন্তু ঠিক মুখোমুখি মায়ের সঙ্গে এসব কথা বলতে এখনও সাহস হ'ল না। তিনি সামনে টাঙানো বাবার বড় ছবিটার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'দুর্ঘটনা ঘটে—তবে এমন ব্যাপার তোমার স্মরণ-কালের মধ্যে, তোমার অভিজ্ঞতায় কখনও ঘটেছে বলে শুনেছ? সাধারণ গৃহস্থ-বাড়িতে নাকি এমন হয়েছে এক-আধ জায়গায়, এ কাশীতে থাকতে আমি শুনেছি। তবে তা নিয়ে কেউ এত বড় দেবগৃহে বিয়ে ক'রে আসে না। যাদের এমন হয়, তারা গোপনে কাজ সেরে আসে। বিয়ের পর লোকমুখে এমন সংবাদ শ্বশুরবাড়ি পেঁছিলে হয়ত সেখানে অশান্তি হয়। আমার মতো এমন অবস্থা কখনও হতে দেখেছ কি কারও?'

মা আরও নিম্নকণ্ঠে বললেন, 'সব ঘটনারই একটা আরম্ভ থাকে। কখনও শুনি নি বলে চুপ ক'রে থাকলে চলবে কেন? অশান্তি অপমানের কারণ যত বড়ই হোক, প্রতিকারের চেষ্টা করতে হবে বৈকি। সেইটেই তো বড় বংশের, শিক্ষিত লোকের কাজ। হার মানব কেন?'

স্বরূপ বোধ হয় এই ধরনের যুক্তি অনুমান করেই এসেছেন। তিনি তেমনি শান্ত ভাবে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'না মা, আমাকে ক্ষমা করো—আমার বহু অপরাধ তো ক্ষমা করেছ, এটাও করো। আমি আবার বর বেশে সঙ সেজে বিয়ে করতে যেতে পারব না।'

শ্যামসোহাগিনী উত্তর দিলেন, 'এইটেই যদি তোমার আপত্তির প্রধান কারণ হয়, তাহলে আমি বাড়িতে পাত্রী আনিয়ে বিনা আড়ম্বরে বিয়ে দেব। তাহলেই তো হবে?'

'না, তা হ'লেও হবে না।'—এত স্পষ্ট ক'রে, যেন যুক্তিতে পূর্ণচ্ছেদ টেনে তিনি যে মায়ের সঙ্গে কথা কইতে পারবেন, তা বোধ হয় কিছুক্ষণ আগেও মনে হয় নি তাঁর।—'আমার মনে হয়েছে, দৃঢ় বিশ্বাস, গোপীভল্লভের ইচ্ছা নয় যে আমি বিয়ে ক'রে ঘরসংসার পাতি। নইলে কার এমন হয় বলো—এমন সাংঘাতিক আঘাত এমন অপমান কেন সইতে হবে আমাকে? তিনি কঠিন আঘাতেই সচেতন

ক'রে দিয়েছেন। আর না। আমাকে নিজের কাছেই বোধ হয় টেনে নিতে চান। আমি সেই পথেই এগিয়ে যাবো।'

অনেক, অনেকক্ষণ পরে, প্রায় অসহায় ভাবে প্রশ্ন করেন মা, 'তাহ'লে ? এ সব কি হবে ? ঠাকুরের রাজপাট, গুরুবংশের দায়িত্ব ? ছোট তো এ পথে আসতেই চায় না।'

'সে আমি তাকে বুঝিয়ে, তার হাতে পায়ে ধরতে হ'লেও তাকে রাজী করাব। আমি শিক্ষা দেব যতটা পারি। আর ধরো, হঠাৎ আমি মরে গেলে কি হ'ত—ওকেই দায়িত্ব নিতে হ'ত তো ? তুমি ওরই বিয়ের ব্যবস্থা করো। ও-ই যাতে মূল সেবাইত হ'তে পারে, সে দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে পারে, সে শিক্ষা আমি কেন—তুমিও দিকে পারবে। তুমিই তো দিয়েছ আমাকে !'

প্রাণস্বরূপ চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েও একটু ইতস্তত করেন, তার পর মাথা হেঁট ক'রে বলেন, 'মা, জীবনে তোমার কাছে কোন কথা গোপন করি নি কখনও, করার দরকারও হয় নি। আজ একটা কথা যা আমার মনে হয়েছে তোমাকে বলে যেতে চাই—আমাকে বেহায়া ভেবো না। বড় যন্ত্রণা মা—এই দ্বিধা আর সন্দেহ। আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না—সে, সে এর জন্যে দায়ী। আমি মিথ্যে বলছি না, অনেক ভেবেছি, আমার প্রাণের দেবতা বলছেন, সে নির্দোষ, নির্মল।'

মা অনেক, অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন, তারপর প্রায় চুপিচুপি বললেন, 'ওরে, আমারও যে তা মনে হয় না তা নয়। শুদ্ধ আত্মা যাকে বলে, ওর মুখের দিকে চেয়ে তাই মনে হয়েছে আমার।…তবে ও জানত, অন্তত ভয়ে ছিল—সেইজন্যে অমন কাঠ হয়ে থাকত। বিগ্রহ স্পর্শ করতে ভয় পেত। আমি সবই লক্ষ্য করেছি বাবা, হয়ত দোষ ওর নয়। কেউ জোর ক'রে এ কাজ করেছে। হয়ত এমন কেউ, যার কথা বলতে পারে নি—মা বাবা কারও কাছেই। কিন্তু আমাদেরও তো হাত পা বাঁধা বাবা, এ বৌকে তো ফিরিয়ে নেবার কোন পথ নেই !'

কথাটা নির্মম সত্য।

কিছুক্ষণ মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে নীরবেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রাণস্বরূপ।

এ কথার কোন উত্তর নেই, কিছুই বলা গেল না তাই।

শ্যামসোহাগিনী তার পরও তেমনি স্থির হয়ে বসে রইলেন।

রামরতিয়া—ওঁদের পুরনো আঁতুড়ের ঝি—তার একটা কথা তিনি আজও ভুলতে পারেন নি।

সে দূরে ঘরের বাইরে থেকে হাত জোড় ক'রে দুই কান ধরে বলেছিল—কাছাকাছি কেউ ছিল না তখন—'বড়মা, ছোট মুখে বড় কথা বলছি, আস্পর্দা নিও না, আগেই কান মলেছি মা সে জন্যে—এমন বাচ্ছা আরও অনেক জন্মাতে দেখেছি, এখানে তো এ কম্ম নতুন নয়। এই করতেই আসে অনেকে—কিন্তু সে সব মা

দেখলেই বোঝা যায়, শুধু শরীরে নয় তারা মনেও নষ্ট। কিন্তু আমাদের বহুদিদি —একেবারে আলাদা। এটা কি ক'রে হ'ল তা জানি না। তবে এ নষ্ট মেয়ে নয়।'

তাকেও স্থির কণ্ঠে এই প্রশ্নই করেছিলেন শ্যামসোহাগিনী, 'তা কি করব বল্, কি করতে বলিস তুই। ওই মেয়েকে এই সংসারে ফিরিয়ে নেব ?'

তার পর বলেছিলেন, একটু যেন তিক্ত কণ্ঠেই—সে তিক্ততা কার ওপর, নিজের না রামরতিয়ার, না ভাগ্যের, তা আজও বোঝেন না—'মিছিমিছি এসব কথা বলতে এসেছিস কেন ? কারণ কি, কে এ কাজ করলে, তা তো সে বলে নি। আর বললেই বা কি, যত ভাল মেয়েই হোক, যদি হঠাৎ কেউ জোর ক'রেও এ কাজ ক'রে থাকে —ওকে কি চান করিয়ে ঘরে তুলতে পারি ? কেউ পারে—জেনে শুনে ? সবটা কি আমার মর্জি'র ওপর নির্ভ'র করে ?'

রামরতিয়া আবারও কান মলে, বাইরে থেকেই দণ্ডবৎ ক'রে, সেইখানকার রজ মাথায় জিভে ঠেকিয়ে চলে গিছল। আঁতুড়ের ঝি—ঘরের মধ্যে ঢোকা নিষেধ তার, সে মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে দর্শ'ন করতে পারে কিন্তু সেবাইতের অন্তঃপুরে তার প্রবেশ নিষেধ। এ নিষেধ কেউ যে কোনদিন কাগজ-কলমে করেছে তা নয়—ভাঙ্গী চামার নয় ওরা—তবু, ওরা নিজেরাই ঢোকে না। সঙ্কোচ বোধ করে, ঢোকা উচিত নয়, এ ওরা নিজেরাই ধরে নিয়েছে।···

সেদিনও যেমন ছিলেন আজও তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শ্যামসোহাগিনী মেঝের দিকে চেয়ে।

চোখে কি একবার আগুন জ্বলে উঠেছিল ? কে জানে, লক্ষ্য করার মতো তো কেউই কাছে ছিল না।

হতভাগী! নিজেও নষ্ট হ'ল, নিজের জীবনটা—আশা ভরসা ভবিষ্যৎ—সব শেষ হয়ে গেল—আমাদের এই দেবতার আশ্রিত সংসার, এই বংশও শেষ ক'রে দিয়ে গেল।

গুরুবংশের প্রধান হবার উপযুক্ত ছেলে তাঁর, শিক্ষায়-দীক্ষায়, ব্যবহারে বিবেচনায় এ ব্রজপুরীতেও অদ্বিতীয়—একথা তিনি জোর গলায় বলতে পারেন। বহু বড় বড় গোসাঁইদের দেখেছেন। এমন নির্মল চরিত্র, সৎ, নির্লোভ—ঈশ্বর-গত প্রাণ কাউকে চোখে পড়ে নি। সাধনার নাম ক'রে লাম্পট্য ক'রে বেড়ায় এমন বড় বড় গুরুও দেখেছেন বৈকি। তারা—বলতে নেই—এর পায়ের কাছে দাঁড়াবার যোগ্য নয়।

এ-ই যদি সরে দাঁড়ায়, ছোট ছেলে পারবে এই ঠাট বজায় দিতে, সব দিক সামলে চলতে ?

কে জানে তার বৌ-ই বা কেমন আসবে।

ছেলেই বা বিয়ের পর কি দাঁড়াবে তার ঠিক কি।

হে গোপীবল্লভ, এ কী করলে তুমি!

তিনি জীবিত থাকতেই কি এত বড় বংশের মর্যাদা নষ্ট হয়ে যাবে! আর তাই তাঁকে দেখতে হবে!

প্রাণস্বরূপ সেই ঘটনার পর থেকেই এখানে বেশির ভাগ দিন রাত্রিবাস করেন না। ঠাকুরের শয়ন আরতি সেরে বাগানবাড়ি চলে যান। আগে প্রসাদ মুখে দেন নামমাত্র।

সঙ্গে দারোয়ান একজন যায়। কিছু দূরে ওঁদের নিজস্ব এক্কা অপেক্ষা করে, তাইতেই যান। আবার লাড়ুভোগ নিবেদন করবার সময় নাগাদ ফিরে আসেন। বাগানবাড়িরই এক প্রান্তে ছোট একটা ঘর করিয়ে নিয়েছেন, সেখানেই থাকেন তিনি। নিজস্ব পূজা-আহ্নিকের সরঞ্জাম নিয়ে।

দুপুরের আরতি, সন্ধ্যারতি কোনদিন করেন, কোনদিন বাইরে বসে থাকেন একদৃষ্টে বিগ্রহের দিকে চেয়ে। বরং সকালের পূজা এক-একদিন করেন—পূজারী-দের অনুমতি নিয়ে। তিনিই কর্তা, তবু অনুমতি নেন পাছে পূজারীরা মনে করেন উনি অবহেলা করছেন তাঁদের, অপদার্থ অকর্মণ্য ভাবছেন।

এই পূজা আরতির অবসরে ছোট ভাইকে শাস্ত্রগ্রন্থ পড়াতে বসেন—যাকে বাঘের মতো ভয় করে সে। কিন্তু মিষ্ট কথা বলে, মিনতি ক'রে নিজের ভাগ্য দেখিয়ে তাকে বশ করেছেন, সে সত্যিই এখন সংস্কৃত চর্চা শুরু করেছে বিশ্বরূপ গোস্বামীর কাছে।

কি করে ও বাগানে—কৌতূহল স্বাভাবিক। অথচ গোয়েন্দাগিরি না মনে হয়, সে ভয়ও আছে। শ্যামসোহাগিনী সুকৌশলে দারোয়ানকে ডেকে ছেলের স্বাচ্ছন্দ্য ও সেবার কোন ত্রুটি হচ্ছে কিনা সেই প্রশ্নের মধ্যেই সেটা শুনে নেন, আসল প্রশ্নের উত্তরটা।

দেখলেন দারোয়ানও বলতে চায়, তারও কৌতূহল যথেষ্ট। কৌতূহল ও আশঙ্কা।

তার বক্তব্য, দাদা গোসাঁই যেন দিন দিন সাধন-ভজনেই ডুবে যাচ্ছেন সন্ন্যাসী বাবাজীদের মতো। এখান থেকে ফিরে অত রাত্রেও শুতে যান না। আসনে বসে জপ করেন বা চোখ বুজে ধ্যান করেন। কত রাত্রে বিছানায় যান তা কেউ জানে না ; আবার ওঠেন পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই। কোন দিন বা আরও আগে। তখনই স্নান ক'রে একদফা আহ্নিক পূজো সেরে তবে রওনা দেন ওখান থেকে।

আরও বলে দারোয়ান, 'এর জন্যে পাড়ায় রটেছে, ঐ ওপাড়ার বুড়ো গোসাঁই-বাবার মতো রোজ বাগানে যান, ওখানে সেবাদাসীরা আসে—মানে খারাপ মেয়ে-ছেলেরা সব—তাদের সঙ্গে আমোদ করেন।…অথচ আমি জানি মা, এক-একদিন রাতে উঠে দেখেছি, ঠাকুরের ছবি, দাদার হাতেই আঁকা ঠাকুরের পটের সামনে দণ্ড-বৎ করার মতো শুয়ে পড়ে আছেন, যেমন ভাবে পিঠটা ফুলে ফুলে ওঠে—মনে হয় কাঁদছেন, আর বার বার নিজের কান মলছেন। তারপর—যেন শান্ত হয়ে উঠে আবার জপে বসছেন !'

শিউরে ওঠেন শ্যামসোহাগিনী। ছেলেটা পাগল হয়ে যাবে না তো শেষ পর্যন্ত ! এ কি পরীক্ষায় ফেললেন গোপীবল্লভ ! কী অপরাধ উনি করেছেন যে এত বড় শাস্তি দিচ্ছেন ! মান-ইজ্জৎ তো গেলই, শেষ পর্যন্ত ছেলের এই শোচনীয়

পরিণামও কি ওঁকে চোখে দেখতে হবে !

এক এক সময় ওঁর অখণ্ড ধৈর্যও নষ্ট হয়। হিংস্র হয়ে ওঠেন। কী কুক্ষণেই ঐ মেয়ে ঘরে এনেছিলেন ! সব দিক দিয়েই সর্বনাশ ক'রে ছাড়বে।

আবার ভাবেন, ওঁরই কোন সেবার ত্রুটি ঘটেছে। হয়ত সেবার অহঙ্কার জেগেছিল মনে। তাই এই শিক্ষা।

তিনিও বিগ্রহের সামনে মাথা খোঁড়েন নির্জন অবসরে।

দারোয়ানের তো জানবার কথাই নয়, শ্যামসোহাগিনীরও কল্পনার অতীত এ রহস্য—কেন প্রাণস্বরূপ অমন ক'রে গোপীবল্লভের সামনে মাথা খোঁড়েন, মুখ ঘষেন। কান মলেন।

তিনি যে ব্যর্থ, বার বারই ব্যর্থ হচ্ছেন।

যতই সাধনায় ধ্যানে পূজায় ডুবিয়ে দিতে চান নিজেকে, ততবারই মন অন্যত্র অন্য চিন্তায় চলে যায়। তারই জন্য এ আকুলতা, এই ক্ষমা-প্রার্থনা।

কিশোরী বধূর সেই বিপন্ন পশুর মতো অতি অসহায় দৃষ্টি, পায়ে মাথা রেখে আশ্রয় প্রার্থনা, আত্মনিবেদনের আকূতি—কিছুতেই ভুলতে পারেন না যে। সেই ওঁর দেহের খাঁজে মুখ গুঁজে দেওয়া, দীর্ঘায়িত প্রণাম, ওঁকে সেবার জন্য ওঁর কাজে লাগার জন্য ব্যাকুলতা—দিন দিন বরং স্মৃতিতে আরও স্পষ্ট, আরও রঞ্জিত হয়ে উঠছে ওঁর আর্তি আকুলতায়, ওঁর কামনায়—এমনভাবে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলছে দিন দিন।

স্বল্পদিনের প্রণয় স্মৃতি, তারই যন্ত্রণা, তারই পিপাসা—দেবতার কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ঘটতে দিচ্ছে না কিছুতেই। বিপুল এক ব্যবধান—বা অন্তরায় রচনা ক'রে রেখেছে।

॥ ৭ ॥

পাষাণে যে প্রাণসঞ্চার হচ্ছে ধীরে ধীরে, তা লক্ষ্য করার কথা নয় মোহিনীর। সারাদিনের কর্মব্যস্ততায়, অন্তহীন পরিশ্রমে—শুধু যে লক্ষ্য করার অবসর বা কৌতূহলের অভাব তাই নয়, ক্ষুদ্র সংসারের ভাল-মন্দ, জীবন-ধারণের বিপুল সমস্যা তার মনকে এই এক বিন্দুতে এমন কেন্দ্রায়িত করেছে যে—কোথায় কি সামান্য পরিবর্তন হচ্ছে তা চেয়ে দেখবার লক্ষ্য করার শক্তি হারিয়ে গেছে।

যমুনার স্তম্ভিত বা প্রস্তরীভূত ভাব কাটল আর এক তীব্রতর আঘাতে। বা শক্তিতে ?

কামনায়।

কামনার মতো শক্তি আর কোন মনোভাবের আছে !

স্বরূপ অর্থাৎ স্বামী সম্বন্ধেই কামনা।

প্রথম যৌবনে, যখন সবে নরনারী কৈশোর অতিক্রম করে, যে কোন আঘাত বিঘ্ন দুঃস্মৃতি ক্ষতি—কাটিয়ে উঠতে পারা যায়।

গুরুত্ব হিসেবে সময়ের তারতম্য ঘটে—এই পর্যন্ত।

বিশাখার এই পুনরুজ্জীবনে বিলম্ব একটু বেশী হবারই কথা। তার কারণ—এত অল্পবয়সে, সংসার ভাল ক'রে জানবার চেনবার আগেই এমন সব কঠিন দুঃসহ আঘাত এসে পড়ল উপর্যুপরি—যা কোন বেশী বয়সের মেয়েরও সহ্য করা শক্ত। হয়ত অল্প বয়স বলেই পারল,—বা সবটা বোঝে নি বলেই পারল—কে জানে!

অবিশ্বাস্য যেসব ঘটনা ঘটল তার এই কটা বছরের জীবনে, তা বুঝতেই তো সময় লাগল এত। এখনও যে ঠিক পুরো বুঝেছে তাও নয়।

ওর এই প্রস্তরবৎ অবস্থা হয়ত সেই কারণেই—কি ঘটল কি ঘটছে, কেন তার এই অকারণ লাঞ্ছনা—দুর্দশা-অপমান—তা ভাল ক'রে বুঝতে না পারার জন্যেই।

বাঁচাল তাকে যৌবনধর্মই। এই বয়সে মেয়েদের পুরুষ সম্বন্ধে আকর্ষণ আসঙ্গলিপ্সা আপনিই দেখা দেয়, দেহের নিয়ম এটা। সেই নিয়মেই পুরুষেরও নারীর প্রতি তীব্র আকর্ষণবোধ জন্মায়, কারও কারও আরো অল্প বয়সে—তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে এই ক্ষুধা বা তৃষ্ণা—যা-ই আখ্যা দিন—এমন তীব্র হয়ে ওঠে, এটা কী তা বোঝবার আগেই যে, তারা নানা অস্বাভাবিক উপায়ে সে দুর্দমনীয় পিপাসা মেটাতে বাধ্য হয়। স্বচ্ছ জলের অভাবে মরুক্লান্ত পথিক তো কাদাও খায় শোনা গেছে।

যমুনার পিপাসা অতটা অসহনীয় হয় নি—তার বিবাহের আগে পর্যন্ত।

তাদের পারিবারিক জীবনে এমন ব্যবস্থা ছিল (এ ব্যবস্থা যে আছে তাও বোঝা যেত না, চোখে অস্বাভাবিক লাগত না গৃহবাসীদের, তার কারণ এটা বহুদিন ধরে চলে আসছে, যমুনার কালের অনেক আগে থেকে) যে, নিকট-আত্মীয় ছাড়া কোন পুরুষকে কাছে থেকে দেখার কি ঘনিষ্ঠতা করার কোন সুযোগ ঘটে নি। তখনও সিনেমার এত চল হয় নি, থিয়েটার দেখতে গেলে কলকাতা যেতে হ'ত, সুতরাং তাও হয়ে ওঠে নি।

এ সম্বন্ধে জ্ঞান হ'ত সেকালের মেয়েদের—বিবাহিতা দিদি বা নববিবাহিতা বৌদিদের কাছ থেকে। যমুনার নিজের বা খুড়তুতো দাদা কারও তখনও বিয়ে হয় নি, দিদি কেউ ছিল না। মামাতো পিসতুতো দিদিরা আসতেন দু'চার দিনের জন্যে। 'ঝাঁকের ঘরে' অর্থাৎ বড় একান্নবর্তী পরিবারে, বহু সমবয়সী বা অন্য লোকের মধ্যে তাঁরা এই 'পুঁচকে' মেয়েটার সঙ্গে এসব প্রসঙ্গ আলোচনা করবেন কখন? কেনই বা করবেন?

অতি বিস্ময়ের সঙ্গেই সচেতনতাটা ঘটল তাই—বিয়ের পরে। একেবারে স্বামীর কঠোর আলিঙ্গনে, উত্তপ্ত দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনে। প্রথম যে অপূর্ব সুখ ও শিহরণ—অনাস্বাদিত অপরিচিত—বোধ করল, তাতেই পুরুষসঙ্গসুখ সম্বন্ধে তার মনের মধ্যেকার যৌবনতৃষ্ণা প্রথম জাগ্রত হ'ল।

এতে যে এত আনন্দ, এত মাদকতা—তা জানত না, কখনও ভাবেও নি। বিয়ে হয় মেয়েদের এটা জানত, সকলের সমান বিয়ে হয় না, মনের মতো পাত্র পাওয়া, ভদ্র শ্বশুরবাড়ি—এ দুর্লভ, তাও শুনেছে বহু লোকের মুখ থেকে বহুবার।

যমুনার কপাল খুবই ভাল, সকলে বলতে লাগলেন বার বার—এমন স্বামী পাওয়া বহু জন্মের তপস্যার ফল, জন্ম-জন্মান্তরের শিবপুজোর পুরস্কার—কেন তা অত বোঝে নি। জ্ঞান হবার পর থেকেই বিয়ে সম্বন্ধে এই ধরনের কথা শুনে—এর যে কোন বিশেষ অর্থ বা মূল্য আছে তাও মাথায় ঢোকে নি, তা নিয়ে চিন্তাও করে নি।

বিয়ের পর কতকটা বুঝল।

সে এই দৈহিক সুখ ও শ্বশুরবাড়ির সাদর আচরণ যে ঠিক সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারত না—সেটা অন্য কারণে। 'কারণ'টার কারণও পুরোপুরি বোঝে নি, সুতরাং অপরাধবোধও অতটা ছিল না—ছিল সহজাত একটা সঙ্কোচ। অপরাধ কিছু ঘটেছে কিনা এই জিজ্ঞাসাই একটা মনের মধ্যে ছিল, ফলাফল কি হতে পারে তাও জানা ছিল না। মনের মধ্যে কিন্তু জোরও ছিল—সে যখন কোন দোষ করেনি, ভগবান তাকে শাস্তি দেবেন কেন ? যদি দোষই হয় এটা।

এটুকু দ্বিধা বা সঙ্কোচ না থাকলে সে-ও হয়ত এই নবীন সুখে উন্মত্ত অধীর হয়ে উঠত। সে-ই স্বাভাবিক। তবু উপভোগ করেছে বৈকি। আর তার ফলে কী বিস্ময় ! কী বিস্ময় ! স্বামীর দেহের গন্ধেই যে এত মাদকতা, তার এত আকর্ষণ—এতখানি সমস্ত দেহ-মন-অবশ-করা একটা সুখাস্বাদ থাকতে পারে—তাই বা কে জানত !

সহবাস এল আরও পরে। সেদিক দিয়ে সে সৌভাগ্যবতী, আজ তাই মনে হয়। এই সুখের, মিলনের সমস্ত অধ্যায়গুলোই পুরোপুরি আস্বাদ করতে পেরেছে। ক্রমে ক্রমে একটু একটু ক'রে—দাম্পত্যজীবনের কমলদল খুলেছে।

যে বাঘ নাকি মানুষের রক্তের স্বাদ পায়, মানুষের মাংস ছাড়া তার আর কিছু রোচে না—মোহিনী বলে প্রায়ই।

এর অর্থ স্পষ্ট হ'ল তার এই জাগরণেই।

একটি একটি ক'রে প্রতিদিনের ক্ষুদ্র আপাততুচ্ছ স্মৃতি মনে পড়ে আর মনের মধ্যে এক অস্থিরতা, উন্মত্ততা বোধ হয়। আকুল হয়ে ওঠে স্বামী-সান্নিধ্যের জন্যে।

কী সুন্দর দেখতে মানুষটা ! আরতির সময় তার বিস্তৃত পিঠখানা বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরে যায়—আরতির সময় উত্তরীয় সরে পিঠের অনেকখানি অনাবৃত হয়ে পড়ে—প্রায় সব পিঠটাই চোখে পড়ত। সে সময় মনে হ'ত ঐখানটায় যদি মুখটা ঘষতে পারত ! আবার সে যখন প্রতিদফা আরতির শেষে দেবতা-দর্শকদের* উদ্দেশ্যে এদিকে ফিরে শূন্যে পঞ্চপ্রদীপ, কর্পূর পাত্র, বা পানিশঙ্খ দেখায়, তখন ললাট ও বক্ষও চোখে পড়ে চকিতে—সেটুকু দেখার জন্যেই শেষের দিকে কদিন—একটা মাস বোধ হয়—লালায়িত থাকত !

---

* অনুমান করা হয় আমার বা আমাদের বিশেষ দেবতার আরতির সময় অন্য সব দেবতা বা স্বর্গবাসীরা সে আরতি দেখার জন্য ভীড় করেন—তাঁদের উদ্দেশেই এই শূন্যে বা উর্ধ্বে তুলে ধরা, আরতির বিভিন্ন দফা উপকরণ।

কী মধুর স্বভাব, কী মিষ্টি কথাবার্তা! যমুনার জন্যে, ওর মুখে প্রসন্নতা ফোটাবার জন্যে কী উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা। সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন ক'রেও বাপেরবাড়ি পাঠাতে চেয়েছিল।...অথচ আবার সেই কোমলপ্রাণ মানুষেরই পেশীতে কত শক্তি —কী কঠিন আলিঙ্গনে চেপে ধরত ওকে—একান্ত বাঞ্ছিত ঐ বুকের ওপর।

ক্রমে ক্রমে কামনা উদগ্র হয়ে ওঠে। তাকে আবার তেমনি ভাবে পাওয়া এ জীবনে সম্ভব নয় তা সে বোঝে, বুঝতে পারে—একবার শুধু দেখার জন্যে যেন পাগল হয়ে ওঠে এক এক সময়। একটা যন্ত্রণা বোধ হয়।

এইবার চোখে জল দেখা দেয়, সে অশ্রু ধারায় ধারায় নেমে এসে বুক পর্যন্ত ভেসে যায়। অন্ধকার নির্জন ঘরে আকুল হয়ে কাঁদে এক এক দিন। কোন কোন দিন পুরনো ঘরের খোয়া-ওঠা মেঝেতে মাথাও খোঁড়ে।

এই মাথা খোঁড়ার দাগেই মোহিনী একদিন বোঝে ব্যাপারটা। যেন এক নিমেষেই বুঝতে পারে। নিঃশব্দে কাছে এসে বসে যমুনার মাথাটা ওর শীর্ণ বুকে চেপে ধরে পিঠে গায়ে হাত বুলোয়।...

বহুদর্শিনী, সংসারের-পোড়-খাওয়া মেয়ে মোহিনী জানে এ দুঃখে সান্ত্বনার কোন ভাষা নেই। সে অন্য পথ ধরে। তবে ধীরে ধীরে, একেবারে বেশী এগোনো চলবে না। এবার সে যমুনার স্বামী সম্বন্ধে প্রশ্নও করে। প্রথম প্রথম চুপ ক'রে থাকত, তার পর বলতে শুরু করে যমুনাও। বলতে পেরে যেন বেঁচে যায়। বলতেই তো চায় সে। পৃথিবীতে একজনও ব্যথার ব্যথী আছে—এইসব ঘনান্ধকারময় হতাশ মুহূর্তে—এ একটা পরম আশ্বাস, সান্ত্বনাও।

'হায় হায়! আবাগী! এমন সোয়ামী পেয়েও ভোগ করতে পারলি নি! সত্যিই তো, পাগল হয়ে যাবারই তো কথা।...ঝ্যাটা মারি বিধেতা পুরুষের কপালে! কেন, কি দোষ করেছিল এই কচি মেয়েটা—দুধের মেয়ে বলতে গেলে— তাকে এমন সাজা দিলি, এমন সব্বনাশ ঘটালি। কী বয়েস ওর, ও কি কিছু বুঝতে শিখেছে, না জানে কিছু! হাত্তোর ভগবানের বিচের রে!'

অন্ধকার গুহায় এই হয়ত আমরণ বন্দীদশা, নির্গমনের পথ নেই কোথাও,— এই কথাই মনে হয়ে আরও অধীর আরও উন্মত্ত হয়ে উঠেছে যখন—মোহিনীর সত্যকার সহানুভূতিতে, ভালবাসাই বলা উচিত—অকস্মাৎ পথ দেখতে পায় যমুনা।

সে বৃন্দাবনে যাবে, একাই যাবে। যেমন ক'রেই হোক যাবে ও পৌঁছবে সেখানে। দূর থেকেও কি দেখতে পাবে না কোন দিন, এক-আধবার? তা না পেলেও, কাছে আছে এটাও যে বড় একটা সান্ত্বনা।

আর, এটা যদি তার পাপই হয়ে থাকে, সে প্রায়শ্চিত্তও সে সেখানে গিয়ে করবে। সাধন-ভজনেই দিন কাটাবে, দীক্ষা তো হয়েই আছে, নিরন্তর জপ করবে, উপবাস করবে—যত রকমে সম্ভব কৃচ্ছ্রসাধন করবে।

আর, যদি তিনি বিয়েই ক'রে থাকেন, করেছেনই—এতদিন কি আর বিয়ে দেন নি শাশুড়ি ? কেনই বা করবেন না ?—আড়াল থেকে সে বৌকে একবার দেখার চেষ্টা করবে। সে কতটা ভালবাসছে তাঁকে, ঠিক ঠিক সেবা করতে পারছে কিনা।…

মোহিনীর অবসর কম, খুবই কম—তার মধ্যে আবার হরেকেষ্ট কি রাখহরি থাকবে না—এমন অবসর দুর্লভ।

কিন্তু হয়ত গোপীবল্লভেরই কৃপা, এমন অবসর পেযেও গেল একদিন।

বিকেলের নানাপ্রকার কাজের মধ্যেও সেদিন একটু ফাঁক পেয়ে মোহিনী এসে-ছিল ওর সঙ্গে একটু গল্প করতে।

যমুনার ছেলেটাকে একটু আদর করতেও। ও যেন মোহিনীকে পেয়ে বসেছে। শিশু বেশ বোঝে কে তাকে ভালবাসে।

তবে এখন সে ঘুমোচ্ছে। রাখহরিও ইস্কুল থেকে আসে নি, চারটেয় ছুটি হয় —কিন্তু কোনদিনই সে এ সময় ফেরে না। ছুটির পর অন্য ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা বা গাছে গাছে ফল চুরি করা—এই লোভেই সে ইস্কুলে যায়। পড়াশুনো যে তার হবে না তা সে নিজেও জানে, তার বাপ-মাও জানে। মাইনে লাগে না যখন—ছেলেটা একটু আটকে থাক, এই জন্যেই তারা পাঠায়।

রাখহরিও নেই। হরেকেষ্ট গেছে তার আড্ডায়—তাস খেলতে ও বিনা-পয়সায় গাঁজা খেতে। এই-ই প্রকৃষ্ট অবসর।

মোহিনী এসে ওর অভ্যাসমতো খোয়া-ওঠা মেঝেতেই পা ছড়িয়ে বসে নিজের পায়েই হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল বুঝি ?'

অবসর বটে তবে দীর্ঘস্থায়ী যে নয় তা যমুনা ভালই জানে। সে এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একেবারে বিনা ভূমিকায় ওর দুটো হাত চেপে ধরে বললে, 'দিদি, তুমি আমাকে স্নেহ করো, তোমার দয়াতেই বেঁচে আছি—সেই ভরসাতেই বলছি, তুমি আমার একটা উপকার করবে ? বলো, কথা দাও !'

৮

এমনিই অবসর কম, তার মধ্যে এখনই হয়ত কেউ এসে পড়বে বা গরুবাছুর মাঠ থেকে হঠাৎ ফিরে আসবে, কোন ছাগল পরের বাড়ি গাছ খেয়ে হ্যাঙ্গামা বাধাবে—সঙ্গে সঙ্গে মোহিনীকে ছুটতে হবে। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কথা-গুলো বলে নেওয়া দরকার। ওর বলতে গেলে এটা একরকম জীবন-মরণ সমস্যা। সেইজন্যেই এমন হঠাৎ বলা।

মোহিনী হকচকিয়ে গেল। এমন ভাবে কোনদিন কথা বলে নি যমুনা—সাধারণ মেয়ের মতো। আগে কথাই বলত না, এখন—এই গত মাসখানেক হ'ল, কিছু কিছু বলছে। কিন্তু এ ভাবের কথা ওর মুখে অবিশ্বাস্য।

একটু সামলে নিয়ে—যমুনাকে কাছে টেনে মুখখানা তুলে ধরে বললে, 'ব্যাপার কি বল তো ? তুই বললে—যদি আমার সাধ্যিতে কুলোয়—নিশ্চয় করব। অবিশ্যি যদি কোন দুষ্য কাজ না হয়। তার জন্যে এত "কথা" আদায় করতে হবে কেন ?'

'দিদি—আমি আর পারছি না। যদি এ থেকে মুক্তি না পাই তো আমাকে

আত্মহত্যাই করতে হবে হয়ত। অনেক আগেই করতুম, আত্মহত্যা নাকি মহাপাপ তাই করি নি। গতজন্মে—যদি জন্মান্তরের কর্মফল বলে কিছু থাকে, আমার মা, শাশুড়ি এঁরা বিশ্বাস করেন তাই বলছি—গত জন্মে কত কত মহাপাপ করেছি তাই পরিপূর্ণ সুখ-সৌভাগ্য দিয়েও ভগবান সে মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে এই আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিলেন। আত্মহত্যার কথা বার বার মনে হয়েও করতে পারি নি—মনে হয়েছে আগের জন্মে যা পাপ করেছিলুম তা ক্ষয় হয়ে যাক, পরের জন্মে যেন ওঁর পা দুটি আবার ফিরে পাই।'

'এত কথা বলছিস কেন ভাই, কি করতে হবে তাই বল না!'

মোহিনী এ ধরনের কথা শুনতে অভ্যস্ত নয়। বোধ হয় সব কথার মানেও বোঝে না—সে যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

'তুমি, তুমি এই ছেলেটার ভার নাও দিদি। তোমার তো এ অব্যেস আছে, আর এখনও তো তুমিই বলতে গেলে বাঁচিয়ে রেখেছ। আমার পেটে এসেছে, তবু বলছি দিদি—ও আমার ছেলে নয়। সেসব কথা বলতে পারব না কাউকে কোন দিনই—তবু একটা প্রাণী তো। কেউ ভার না নিলে ছুটি পাবো না।'

প্রস্তাবটার পূর্ণ অর্থ বুঝতে এবারও দেরি হয় মোহিনীর।

খানিকটা বিহ্বলভাবে ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, 'তারপর? ওর ভার না হয় নিলুম; আমার তো মায়াই পড়ে গেছে—আমি কেন, গাঁজাখোর ঐ মানুষটাও তো দেখেছিস, খ্যাল হলে কত আদর করে, নাচায়। তা সে যাকগে—তুই ছুটি নিয়ে কি করবি? আপ্তঘাতী হবার ইচ্ছে নাকি!'

'না দিদি, তাহলে সেই দিনই করতুম। বললুম তো তোমাকে—কেন করি নি। আমি বৃন্দাবনেই যাবো।'

'বিন্দেবন যাবি!' আবারও দেরি হয় মোহিনীর ব্যাপারটা বুঝতে, 'সে কি? বিন্দেবনে গিয়ে কি করবি? কোথায় যাবি? সেখেনে কি তোকে শ্বশুরবাড়িতে ফিরিয়ে নেবে ভেবেছিস!'

'না না, এত পাগল এখনও হই নি আমি। কেন যাবো, কি ভেবেছি সে বড় লজ্জার কথা—তবে তোমাকে আমার লজ্জা নেই। এখন এ পৃথিবীতে বোধ হয় তুমিই আমার একমাত্র আপন।···না, আশা আর কোথাও কিছু নেই—তবু, কাছাকাছি, এক শহরে তো থাকব। কোনদিন এক-আধবার কি চোখে দেখতে পাবো না তাঁকে? এই আশাতেই যাওয়া, সত্যি বলছি!'

'ওলো, তাতে জ্বালা বাড়বে বৈ কমবে না। এ দূরে আছিস একরকম ভাল, কিছুটা সয়ে গেছে, আরও যাবে। কাছে যাবি, দেখবি, তবু তাকে ধরতে ছুঁতে পাবি নি, কথা কইতে পারবি নি—সে যে আগুরায় পোড়া তুষের আগুনে দগ্ধে মরা। এ পাগলামি করতে যাস নি!'

'না দিদি, আমাকে ছেড়ে দাও, এভাবে থাকলেও পাগল হয়ে যাবো। না হয় না-ই দেখলুম, এক শহরে আছি, খবরও হয়ত পাবো—মনে হয় এতেও খানিকটা সুখ। আর,···যদি কোন পাপ হয়ে থাকে আমার, তীর্থে বসে দিনরাত ভগবানের

নাম জপ করলে হয়তো সেটার স্খালন হবে।'

খানিকটা চুপ ক'রে রইল মোহিনী, বোধ হয় ওর জ্বালার কিছুটা বুঝল। তার পর বলল, 'তা কার সঙ্গে যাবি ? কি খাবি, কোথায় থাকবি, সে কথাগুলো ভেবেছিস ? তুই তো ঘরের বৌ হয়ে ছিলি, সেও কটা মাস বা—একরকম নজরবন্দী হয়ে থাকা—ওখেনের কিছুই তো জানিস না।'

'কারো সঙ্গে যাবো না, একাই যাবো। তোমার স্বামী বলেন শুনেছি এখান থেকে বর্ধমান গিয়ে দিল্লীর গাড়ি ধরা যায়, পথে কি তুণ্ডুলা স্টেশন পড়ে, সেখান থেকে ছোট লাইনের গাড়িতে মথুরা। আমি তো একবার গিয়েছি, এইভাবেই গেছি, মনে পড়ছে। না হয় কোন লোককে জিজ্ঞেস করে নেবো—'

'দ্যাখ—এ হ'ল পুরো ক্ষ্যাপামি। তুই নিহাৎ ছেলেমানুষ, কচ্‌ছেলে ছাড়া এমন কথা কেউ বলে না। যাকে পথ জিজ্ঞেস করবি, সেই অন্য পথে নিয়ে যাবে। আর, এই কাঁচা বয়েস, রূপের পসরা—বধামান পজ্জন্তই কি যেতে পারবি ? কাঁচাখেগো রাক্কসের দল ছেড়ে দেবে তোকে ?···তার পর ? কোথায় থাকবি গিয়ে ? কিছুই তো জানিস না সেখেনের হালচাল। কার খপ্পরে পড়বি ঠিক আছে ! খাবিই বা কি ? যদি টাকা সঙ্গে নে যাস, সেও তো আর এক বিপদ !'

'সে—সেখানে গিয়ে ঠিক করব। কোথাও কি একটা আশ্রয় পাবো না ? সবাই কি খারাপ সেখানের ? আর খাওয়া—মাধুকরী করব !'

'দ্যাখ ছুঁড়ি, এবার আমার হাতে চড় খাবি। অমন পাগলের মতো কথাবাত্তারা বললে দরজায় কুলুপ দিয়ে রাখবো !'

তারপর একটু থেমে বলে, 'বিন্দেবন আমি যাই নি। কিন্তু আমার জানাশোনা, আমার শাউড়ী, গেরামের বেস্তর লোক গেছে সেখেনে, তাদের মুখে অনেক বিত্তেন্ত শুনেছি। তাছাড়া এই নবদ্বীপে বসেও সেখেনের কথা কি কম শুনেছি, মনে করিস ! গোবিন্দ গৌরাঙ্গ এক যাত্তারায় দর্শন করতে হয় বলে অনেকে সেখেন থেকে সোজা এখেনে আসে। গোবিন্দ পাপী-তাপী তরান, তাঁর ছিচরণের আচ্ছয়ে এরা গিয়ে পড়ে। তবে তাপীদের তরান কিন্তু পাপীদের তরাতে পারেন না। তাপীরাই বরঞ্চ তাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে। কে জানে এ তাঁর কি লীলে। তবে এত লোক এই এক কথাই বলে—সে কি মিছে হয় ! তোমাদের ঐ গাঁজাখোর চক্কত্তি একটা কথা বলে বড় মন্দ নয়—বলে, দেখিস না মা-বাবার দুষ্টু বয়াটে ছেলেদের দিকেই টান বেশী—তা গোবিন্দই বল আর মা কালীই বল—আমাদের তো বাপ-মা।'

'সে আমি জানি না দিদি, তাহলে তুমিই একটা ব্যবস্থা করে দাও, তোমার দুটি পায়ে পড়ছি—' সে সত্যি-সত্যিই মোহিনীর দুটো পা চেপে ধরে, 'যেমন ক'রেই হোক্ তুমি আমাকে মুক্তি দাও।'

'ষাট ষাট, দ্যাখো পাগলীর কাণ্ড !' হাত বাড়িয়ে দাড়িতে হাত দিয়ে হাতে চুমো খায় নিজের, 'তুই সত্যিই পাগল হয়ে গেছিস।···আচ্ছা আমি কথা দিচ্ছি, তুই কটা দিন ধয্যি ধরে থাক, আমাকে একটু ফাঁক দে, দেখি তেমন কোন জানা-

শোনা ভাল লোক এখেন থেকে সিধে বিন্দেবন যাচ্ছে কিনা। যায় তো পেরায়ই। বিন্দেবন দেখে এই গৌরের মাটিতে যেমন আসতে হয়—নবদ্বীপের লোকও গৌর গোবিন্দ মিলিয়ে নিয়ে যায়।···দেখি।'

॥ ৮ ॥

সত্যিই মোহিনী যেন ভেল্‌কি দেখায়। মাসখানেকের মধ্যেই একটা সুব্যবস্থা করে।

এক বৈষ্ণব বাবাজী আর তাঁর স্ত্রী (অথবা সেবাদাসী) পোড়া-মা-তলার কাছে এক হেলে-পড়া চালাঘরে থাকতেন। ঠিক ভিখিরী নন, জাত বৈষ্ণব, নামগানই পেশা, তবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে 'হরে কেষ্ট! চারটি ভিক্ষে দিন মা' বলে দাঁড়াতেন না। বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক, অঘ্রাণ ও মাঘ ফাল্গুন মাসে নিত্য পাড়ায় নামগান করে ভোরবেলা "ফেরা" দিতেন মাত্র। কখনও দুজনে কখনও বা একাই। এক-জনের অসুখবিসুখ হলে অপরজন বেরোতেন। "ফেরা"টা বন্ধ হ'ত না।

তখনকার দিনে এর বদলে নামবিতরণকারীর 'তনুরক্ষা' করা কর্তব্য বলে মনে করতেন গৃহস্থরা। পরের মাসের গোড়ার দিকে—সামর্থ্য মতো, যার যা সুবিধা বোধ হ'ত, এদের প্রয়োজন বুঝে—তাই দিতেন। চাল ডাল নুন তেলের বড় সিধা, ধুতি বা শাড়ি, গামছা, কেউ বা নগদ পয়সা—এক টাকা, আট আনা। এর মধ্যে কোন কোন সম্পন্ন লোকের বাড়ি থেকে—যেমন বাগচিদের কি রায়েদের বাড়ি থেকে বেশীই দেওয়া হ'ত, সিধের সঙ্গে টাকাও।

এই ভাবেই দিন চলছিল। কিন্তু দুজনেরই বয়স বাড়ছে, ক্রমে সেটা অনুভব করতে লাগলেন, বা করতে বাধ্য হলেন। এভাবে প্রতিদিন প্রায় অর্ধেকটা শহর পরিক্রমা করা আর পোষাচ্ছে না। অনেক ভেবে ওঁরা ঠিক করেছেন, এখানের পাট উঠিয়ে শ্রীধাম বৃন্দাবনে চলে যাবেন। চেনা এক ভদ্রলোক আছেন—এককালে এ পাড়াতেই থাকতেন, এক বড় জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতেন। এখন আধা সন্ন্যাস নিয়ে বৃন্দাবনের পুরনো শহরে অষ্টসখীর কুঞ্জের কাছে পুরনো মনিবের কুঞ্জে কামদার হয়ে আছেন। তিনিই—বছর দুই আগে স্ত্রীর মৃত্যুর সময় এসে-ছিলেন একবার। যদিও শ্রাদ্ধকৃত্যে কোন অংশ নেন নি—ওদের শরীরের অবস্থা দেখে বলে গিছলেন, আর কেন, রাধারাণীর আশ্রয়ে চলো, আমি থাকার জায়গা একটু দিতে পারব, একটা ক'রে পারসও* হয়ত দেওয়াতে পারব—বাকী, মাধুকরী করতে পারবে। এত হাঁটতে হবে না প্রত্যহ, ঐ পাড়াতে অনেক ছোট বড় কুঞ্জ আছে, ব্রজবাসী গৃহস্থবাড়িও আছে—জয় রাধে বলে দাঁড়ালেই দু'জনের মতো রুটির যোগাড় হয়ে যাবে।'

কথাটা মনে ছিল। এখন প্রায় অপারগ হয়ে পড়ায় মন স্থির করেছেন। অল্প দু'চারখানা কাপড় জামা, অল্প কটা টাকা নিয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করছেন। বাসন-

---

* একজনের মতো প্রসাদ। অন্ন রুটি লুচি ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন সব মিলিয়ে। অবশ্য কুঞ্জস্বামী বা স্বামিনীর সাধ্য-সামর্থ্য মতো।

কোসন সামান্য যা ছিল বিক্রী করেছেন, ঘরের কিছুই প্রায় নেই—জমিটুকু বাবদ শ'খানেক টাকাও পেয়েছেন—সেই ভরসাতেই রাধারাণীর নাম নিয়ে যাচ্ছেন। তার মধ্যেই শুনেছেন ওখানে শীত খুব বেশী, শুধু কাঁথায় হবে না, সে জন্যে কিছু শীতবস্ত্রও নিতে হয়েছে—তাতেও বেশ খানিকটা বেরিয়ে গেছে।

খবর পেয়ে তাঁর কাছেই গিছল মোহিনী।

প্রথমটা তো নামদাস বাবাজী আঁতকেই উঠেছিলেন। 'আমি কখনও কোথাও বেরুই নি, কিছুই জানি না শুনি না—নিজেরা কোথায় গিয়ে থাকব তারই ঠিক নেই। ঠিকানাটা ত্যাখন লিখে রাখি নি—সে মানুষটাকে খুঁজে না পেলে আমরাই নিবাচ্ছুয় হয়ে পড়ব। অজানা অচেনা দেশ, গোবিন্দ আছেন ঠিকই—তেমনি তাঁর চরণে আচ্ছুয় নেবার লোকও ঢের আছে। পাজী বদমাইশ লোকের অভাব নেই শুনেছি। আমি একটা সোমত্থ সোন্দর মেয়ে নে কোথায় যাবো? তুমি কি ক্ষেপেছ পুজুরীদি!'

(পুজারীর স্ত্রী অর্থে পুজুরীদি।)

মোহিনীও এত সহজে হাল ছাড়ার মেয়ে নয়। সে বলে, 'দ্যাখো বাবাজী মশাই, সত্যি কথাই বলি—বামুনের মেয়ে, বড় ঘরের মেয়ে—বেন্দাবন যাবে বলে ক্ষেপে উঠেছে। একা গেলে পথেই গুণ্ডা বজ্জাত রাঁড়ের দালাল—কে কোথায় ভুলিয়ে নে গিয়ে কোথায় কোন নরককুণ্ডুতে ফেলবে তার ঠিক আছে! কে হয়ত বা একা মেয়েছেলে দেখে পুলিস সেজে এসে থানায় নে যাচ্ছি বলে কোন খানকী-বাড়ি বেচে দেবে। সেটা কি ভাল হবে? তুমিও যাচ্ছ প্রিভুর চরণে ঠাঁই খুঁজতে—এও তাই। সঙ্গে নে যাবে, মেয়ে কি নাতনী বলে পরিচয় দেবে—এই পজ্জন্ত। তোমাদের সঙ্গে থাকলে গাড়িতে কেউ অত ভোলাবার রাস্তা পাবে না। আর আচ্ছুয়? বলি তোমরাও তো কোথায় কার কাছে যাচ্ছ তাই জানো না, সে লোকটা বেঁচে আছে কিনা তারও ঠিকানা নেই—তোমাদেরও তো কোথাও উঠতে হবে? ধম্মশালা অনেক আছে শুনিছি—একজন বলেছে আমায় গুপীনাথের ঘেরায় মন্দিরের কাছেই ভাল দুটো ধম্মশালা আছে—অমনি কোথাও উঠে তোমাদের আচ্ছুয় খুঁজতে হবে তো? তিনদিন থাকতে দেয় শুনেছি, হাতে পায়ে ধরলে আর একদিন কোন্ না দেবে। তোমরা তোমাদের আস্তানার ব্যবস্থা দেখবে, সেও নিজের রাস্তা দেখবে। পায় ভালো, না পায় ভালো—তোমরা আর দায়িক থাকবে না।… যে কাঠ খেয়েছে সে আঙরা নাদবে এ তো শাস্তরের কথা। এই পথটুকু নে যাওয়া, তিন চার দিন সঙ্গে থাকতে দেওয়া—এই তো! সে যাচ্ছে নিজের খরচে টিকিট কিনে—সেদিক দে তোমাদের কোন ঝক্কি থাকবে না।'

আরও কিছু বুলি খরচ ক'রে বাবাজীর সেবাদাসীকেও নরম ক'রে আনল মোহিনী। অগত্যা বাবাজীকেও রাজী হতে হ'ল।

দিনটাও মোহিনী জেনে এল। কথা রইল মোহিনীই স্টেশনে পৌঁছে দেবে যমুনাকে।

গহনার বাক্স এবং শাড়ি ইত্যাদি ট্রাঙ্কে ছিল সব। তার চাবি আগেই মোহিনীর কাছে জিম্মা ক'রে দিয়েছিল যমুনা। প্রথম অত কিছু তার মাথাতেই যায় নি। কি ঘটছে, কে কি বলছে কিছুই জানে না। তবে সে অবস্থা হরেকেষ্টর বোঝার কথা নয়—সে দিন তিনেক যেতেই একদিন ওর কাছে এসে বলেছিল, 'আমাকে—আমাকে পাঁচটা ট্যাকা দিতে পারেন? বড্ড ঠ্যাকায় পড়ে গেছি। তিন দিন গোনা—তিন দিনের ভিতরেই আমি শোধ দিয়ে দোব—এই আপনার দিব্যি বলছি!'

যমুনা তার কোন উত্তর দেয় নি, স্থির হয়ে মাটির দিকে চেয়ে বসেছিল পাথরের মতোই। হরেকেষ্ট তখনও ব্যাপার বোঝে নি, কাকুতি মিনতি ক'রেই যাচ্ছিল—'ও কি হচ্ছে কি? বলি হচ্ছেটা কি তাই শুনি! মেয়েটা আসতে না আসতে তাকে জ্বালাতে শুরু করেছ! নেশার পয়সার জন্যে! আবার দিব্যি দিলেশা গালা। হায়া পিত্তি বলে কি একটুকুনও থাকতে নেই!'

বলতে বলতে মোহিনী দোরের কাছে এসে দাঁড়াতেই পালিয়ে গিছল হরেকেষ্ট। মোহিনী কাছে এসে চুপি চুপি বলেছিল, 'চাবিটা কোথাও লুকিয়ে রেখো ভাই, ও গাঁজাখোর বামুন সব পারে।'

তাতেও কোন সাড়া না পেতে মোহিনী আর দ্বিধা করে নি। বাক্সর মুখেই লেগে ছিল চাবিটা, যেমন কাকারা রেখে গেছেন, মোহিনী বাক্সর চাবি বন্ধ ক'রে টেনে দেখে নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। যমুনা কোনদিনই খোঁজ করে নি। কাপড় জামা খুব ময়লা হলে কি ছিঁড়ে গেছে দেখলে নিজেই বার ক'রে দিত মোহিনী।

আগে আগে ময়লা হলে নিজেদের ময়লা কাপড় জামার সঙ্গে ক্ষারকাচায় টেনে চাপিয়ে দিত। মাস কতক পরে, কিছুটা সম্বিৎ ফিরে আসতে, নিজে কাচার চেষ্টা করতে গেছে দু-একবার, কিন্তু মোহিনী হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে।

এই প্রথম—যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা হতে—এক দুপুরবেলা নিজেই চাবিটা চেয়ে নিয়ে বাক্স খুলল যমুনা।

তখন হরেকেষ্টর আড্ডার সময়, ছেলেরাও সব বাইরে। মোহিনী খাওয়া-দাওয়া সেরে এই সময়টা গোয়াল তদারকে যায়—আজও পা বাড়িয়েছে—তাকে ডাকল যমুনা।

'দিদি, এক মিনিট শুনে যাবেন?'

'কী লো, কী আবার হ'ল? কি কি নিবি, এই সমিস্যে?' বলে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল মোহিনী।

যমুনা একেবারে গয়নার বাক্স আর চাবি—সব ওর পায়ের কাছে রেখে বলল, 'এইটে আপনি তুলে রাখুন কোথাও; ছেলে মানুষ করার তো খরচ আছে, ভারী কোন অসুখবিসুখও হতে পারে—কিম্বা ঐ—ঐ ও'রা খরচের টাকা পাঠানোও বন্ধ করতে পারেন—সে যাই হোক, দরকার লাগবেই। যে দায় চাপালুম তার ভার কম নয়; সেটা এখন এইখানে এসে নানা লোকের কথায়বার্তায় আন্দাজ করতে পেরেছি

কিছুটা—সে তুলনায় এ আর কতটুকু—কিন্তু, কিন্তু আপনি বুঝবেন—আর তো আমার কিছু নেই!'

মোহিনী প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, ধপাস ক'রে সেই খোয়া-ওঠা মেঝেতে বসে পড়ে বললে, 'সে আবার কি! তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! এ আমি নিয়ে কি করব! ছেলে মানুষ করার ভার যখন নিয়েছি তখন আমি যা পারি যতটুকু পারি তা করবই—আমার ছেলেমেয়ে যেমন ভাবে মানুষ হচ্ছে তেমনই হবে অবিশ্যি, তোর ছেলেকে তো আলাদা ভাবে মানুষ করতে পারব না। মানুষ হয়ত কোনটাই হবে না, বড় হবে এই পর্যন্ত। তারপর—ওদের বরাত। গরিবের ছেলের মতো যদি খেটে খেতে পারে সেই ঢের, চোর ডাকাত ছ্যাঁচড় না হয়।...তার জন্যে এত গয়না কি হবে—আর আমি রাখবই বা কোথায়? তোর ছেলের জন্যে আলাদা ক'রে তুলে রাখব এখন কথাও দিতে পারব না। যে মনিষ্যি নিয়ে ঘর করছি তা তো দেখতেই পাচ্ছিস—নেশার পয়সা না পেলে সিঁধ কাটতেও পারে।'

'তা হোক দিদি। তুমি যা করেছ তার ঋণ শোধ নয়—এ আমি নিজের গরজেই দিচ্ছি। তা ছাড়া আমিই বা কি করব!'

'এই দ্যাখো, ক্ষেপীর কথা শুনলে গা-জ্বালা করে। একটা অজানা অচেনা দেশে যাচ্ছিস, সঙ্গে কিছু না নিয়ে গেলে খাবি কি—থাকবি কোথায়—তার তো একটা উপায় রাখতে হবে! এ ছাড়া টাকা কিছু রইল—নগদ? থাকলেও সে কতই বা থাকবে!'

'তোরঙ্গে যা দেখেছি, উনিশ কুড়ি টাকা বোধ হয় তলায় পড়ে আছে। বোধ হয়—যা মনে হচ্ছে—ওখান থেকে, মানে শ্বশুরবাড়িতে কিছু নগদ টাকা পেয়েছিলুম মুখদেখানি, সে সব তাঁরা এই তোরঙ্গেই রেখে দিয়েছিলেন। তেমনিই চলে এসেছে। হয়ত বেশীই ছিল, ঠিক জানি না। মামা বোধ হয় বাক্স হাতড়ে দেখার সময় কিছু বার করেছিলেন—কে যেন একবার বললে। তবে বেশী আর দরকারই বা কি, টিকিট ভাড়া ওতে হবে না?'

'তা হবে। টিকিট ভাড়া দিয়েও কিছু থাকবে। কিন্তু সে আর কত। তাতে কদিন চলবে, গিয়েই তো কোন ব্যবস্থা হবে না—খাবি কি? তার মতো কিছু নিয়ে যা সঙ্গে।'

'ভিক্ষে ক'রে খাবো বলেই তো যাচ্ছি দিদি। প্রায়শ্চিত্ত করতেই তো যাওয়া।'

'ওমা—তাই বলে গিয়েই ভিক্ষেয় বেরুবি নাকি। এই চেহারা আর এই বয়েস। ক'দিন বাদই দে, ক'বেলা ভিক্ষে করবি, ক'দিন করতে পারবি? না না, ওসব পাগলামি ছাড়, কিছু সঙ্গে নে যা।'

যমুনা প্রবলভাবে ঘাড় নাড়ল, 'না দিদি, এক পয়সাও নিয়ে যাবার ইচ্ছে নেই আমার। একেবারে নিঃসম্বল হয়ে যেতে চাই...তা ছাড়া, তুমিই তো বলেছ—টাকাপয়সা সঙ্গে থাকলে পথেঘাটে বিপদ বেশী।...না, গোপীবল্লভকে ভরসা ক'রে তাঁর কাছে যাচ্ছি, তিনি তো জানেন আমার পাপ কি, কতটুকু দায়ী আমি। তাঁর বিচারে যা হয়—সেটুকু প্রায়শ্চিত্ত করতেও কি তিনি দেবেন না!'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মোহিনী বলে, 'জানি নে বাবা—কী তোর পাপ, আর কী তার প্রাচিত্তির। তোকে তো এই এতদিন দেখছি—দেখে তো মনে হয় না কোন পাপ অন্তত জান্তে করেছিস। আমরা তো এই জানি, গুরুজনরা যা বলেছেন —অজান্তে যা করা যায়, তাতে পাপ হয় না।…এক এক সময় মনে হয় তোর মাথায় ভূত চেপেছে, তাই এত জেদ ক'রে এমন অকূলে ভাসছিস!'

যমুনা আর কথা বাড়ায় না। চাবিটা জোর ক'রেই মোহিনীর হাতে গুঁজে দিয়ে দু হাতে শুধু ওর পা দুটো চেপে ধরে।

'ষাট, ষাট! পাগলী আমায় জ্বালিয়ে খেলে একেবারে!'

বলতে বলতে তারও চোখে জল এসে যায়। সে যমুনাকে সেদিনের মতোই একেবারে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরে।

তার চোখের জল আর চোখেই আবদ্ধ থাকে না। যমুনার বিপুল রুক্ষ কেশ-রাশির মধ্যে ঝরে পড়তে থাকে।

এবার যমুনারও বুঝি কাঠিন্যের দৃঢ়তার বাঁধ ভেঙে পড়ে এই যথার্থ সস্নেহ সহানুভূতির বন্যায়—তারও চোখে ধারা নামে, অনেক বেশী, বুকফাটা কান্নার মতোই কতকটা—সে জল মোহিনীর শুষ্ক শীর্ণ বুক ভাসিয়ে যেন প্লাবিত ক'রে দেয়…

কে জানে এ কান্না কিসের!

এ কি কৃতজ্ঞতার আবেগ—সর্বনাশের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অতল অন্তহীন গভীর অন্ধকারে যে প্রথম স্নেহের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, যথার্থ সহানুভূতির তাপে শীতল শিলীভূত অন্তরটাকে সঞ্জীবিত রেখেছিল—বিপদে-আপদে সর্বদা রক্ষা ক'রে এসেছে এই দু'বছর—যার আন্তরিক মমতা ও কল্যাণ চিন্তাই দিকদিশাহীন অন্ধকারে একমাত্র আলোকরেখা ছিল—কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে কথঞ্চিৎ ঋণ স্বীকারের চেষ্টা—এ কী?…

অন্ধকারেই ছিল এতদিন। তবু তার মধ্যেও আশ্রয় একটা ছিল, ছিল অবলম্বন—বুঝি প্রশ্রয়ও। সেটুকুও সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে একেবারেই অকূলে ভাসতে যাচ্ছে। তার পরিণাম কি তাই বা কে জানে। এ কি সেই দুশ্চিন্তা?

এতদিনে সেও মোহিনীকে ভালবেসে ফেলেছিল। এ হয়ত সেই স্নেহাস্পদকে ছেড়ে যাওয়ারই বেদনা।

মোহিনী নবদ্বীপ স্টেশনের গাড়িতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারল না।

পাড়ার এক মহিলাকে প্রায় হাতে-পায়ে ধরে রাজী করিয়ে ছেলে মেয়ে আর 'গাঁজাখোর চক্কত্তী'কে শাসনে রাখার ভার দিয়ে ওদের সঙ্গে বর্ধমান পর্যন্ত গেল।

যমুনা ব্যস্ত হয়ে বলার চেষ্টা করল, 'এ কি করছেন দিদি—আপনার অসুমর কাজ। কখন ফিরতে পারবেন তার ঠিক নেই—'

'তুই থাম দিকি!' ধমক দিয়ে ওঠে মোহিনী। 'মেলা নবেলী কথা বলিস নি আমার কাছে, আমি অত বুঝি না। মরছি নিজের জ্বালায়, চিন্তার শেষ নেই,

কোথায় কার হাতে গিয়ে পড়বি এই ভাবনায় আহার-নিদ্রে বন্ধ হতে বসেছে—তার ওপর তোর বকবকানি সহ্যি হয় না। দিদি বলে তো ডাকিস, আপনার দিদি হলে নিশ্চিন্তি থাকতে পারত!'

আবারও যমুনার দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

হায় রে! আপনজনের চেহারা যদি দেখতে দিদি!

এই স্নেহ, এই ব্যাকুলতা, মঙ্গল-চিন্তা—কি আর কোথাও আর কারও কাছে আছে!

এর মধ্যেই সামান্য যেটুকু ঘি ছিল ঘরে তাতে কখানা পরোটা ভেজে আলু-চচ্চড়ি ক'রে নিয়ে এসেছে; এনেছে তিনজনের মতোই, এরা না খেলে ও একা খাবে না কিছুতেই। আর এদের গরজেই এরা ওকে খাওয়াবার চেষ্টা করবে।···

গাড়ি ছাড়ল রাত্রে। এরা একটা ছোট কামরায় ভাল জায়গা পেয়ে গেল। আর দু-তিনজন যারা ছিল, তারাও তীর্থযাত্রী, বয়স্ক লোক সব। এক মহিলা ছিলেন খুবই বৃদ্ধা। মোহিনী কতকটা নিশ্চিন্ত হ'ল তবু।

গাড়ি ছাড়ল। চলেও গেল প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে, দূর দিগন্তে মিলিয়েও গেল একসময়।

অন্ধকার রাত। চারিদিকেই অন্ধকার। ইস্টিশানে তেলের আলো বেশির ভাগই এবার নিভিয়ে দেওয়া হবে। দু-একটা মাত্র জ্বলবে। অন্য বড় যা গাড়ি—মেল গাড়ি না কি বলে—তা আসতে শুরু হবে আরও অনেক পরে। তখনই আবার আলোর মুখ দেখা যাবে।

তা হোক। নিজের জন্যে ভাবে না সে। ওর অত ভয়ডর নেই। অন্ধকারেও তাকে কেউ কিছু করতে পারবে না।

ঐ যে কচি মেয়েটা অকূল অন্ধকারে ভাসল, ভাবনা তার জন্যেই।

হে গোবিন্দ, হে শ্যামসুন্দর, মহাপ্রভু—অনেক দুঃখু দিয়েছ মেয়েটাকে, আবার যেন পাঁকে না পড়ে।

॥ ৯ ॥

ধর্মশালায় তিনদিন থাকতে দেওয়া নিয়ম। একেবারে অন্যথা যে হয় না তা নয়। তবে সে অন্য ব্যাপার—মালিকপক্ষের মুনিমজীর চিঠি আনলে হয়। কিংবা আর যেটা, সেটা গোপন পথের ব্যবস্থা—তা এদের জানার কথা নয়।

প্রথম দিনটা তো কিছু কিছু দর্শনেই কেটে গেল। এটা অবশ্য-করণীয়। যেখানের যিনি অধীশ্বর—তাঁকে (বৃন্দাবনের ক্ষেত্রে "তাঁদের"—গোবিন্দ, মদন-মোহন, গোপীনাথ, এই তিন মূর্তি দর্শন হলে তবে ভগবানকে পূর্ণ দর্শন করা হয়) আগে না প্রণাম জানালে তিনি অসন্তুষ্ট হতে পারেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাষায় 'যেখানে যাবি থানাদারকে আগে সেলাম দিবি।'···এঁরা পেঁচৈছেন বেলায়,

স্নান সেরে বেরোতেই দেরি হ'ল, এখানে ঠাকুররা ১১/১১৷৷টায় ভোগে বসেন, এক ঘণ্টা ধরে আহার করেন (!!), তার পর শুধু-ভোগ-আরতির সময় ক'মিনিট খোলা থাকে—আবার সেই বিকেল চারটেয়। সুতরাং দিন তো কাটবেই।

পরের দিন ভোর হতেই নামদাস বাবাজী বেরিয়ে পড়লেন আশ্রয়ের খোঁজে। চোখে ভাল দেখেন না, নইলে হয়ত রাত থাকতেই বেরোতেন।

যিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তাঁর ঠিকানা পুরো মনে না থাকলেও পুরনো শহরে অষ্টসখী কুঞ্জের কাছে—এটুকু মনে ছিল। তাই জায়গাটা খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। কিন্তু খবর যা পেলেন তাতে একেবারে বসে পড়লেন। সেই কামদার মাত্র মাস কতক আগে 'রজ' পেয়েছেন—অর্থাৎ মারা গেছেন। এখন যাঁরা আছেন তাঁরা কিছু জানেন না, অজানা অচেনা লোককে জায়গা দিতে রাজী নন তাঁরা। উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলায় যেখানে এই কুঞ্জ-প্রতিষ্ঠাতার জমিদারী, সেখান থেকে হুকুমনামা নিয়ে এলে হতে পারে।

সারাদিন বাবাজী ফিরলেনও না, কিছু খাওয়াও হ'ল না। সন্ধ্যাবেলায় ফিরলেন প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে।

একটা সন্ধান পেয়েছেন। কোথায় গোয়ালিয়রের মহারাজার ঠাকুরবাড়ি আছে, তারই কাছাকাছি কোথাও নবদ্বীপের এক ভদ্রলোক থাকেন, কতকটা বানপ্রস্থ নিয়ে আছেন—যদি সে বাড়ি চিনে বার করতে পারেন তো হয়ত একটা সুরাহা হতে পারে। নবদ্বীপের পুরনো অধিবাসী, দেখলে বাবাজীকে চিনতে পারবেন নিশ্চয়। কিন্তু রাতে কোথায় খুঁজবেন, চোখে ভাল দেখেন না। ক্লান্তও হয়ে পড়েছেন যৎপরোনাস্তি। স্বল্প পুঁজি ভাঙিয়ে কিছু পুরী কিনে এনেছেন, তাইতেই আজকের মতো জীবনরক্ষা করতে হবে।

কিন্তু এখন যেন নিজের চেয়েও তাঁর চিন্তা হচ্ছে যমুনার জন্যে। সে কাল দর্শনেও যায়নি, তেমনি আর কোথাও যাওয়া কি ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করা—তারও কোন উদ্যোগ কি উদ্যম দেখা যাচ্ছে না। থুম হয়ে বসেই আছে, একভাবে।

এ কি ফ্যাসাদে তাদের ফেলল পুজুরীদি !···

রাত্রে খাওয়দাওয়ার পর সোজাসুজি কথাটা পাড়তে বাধ্য হলেন।

এর রকমসকম আদৌ সুবিধের নয়। শেষ মুহূর্তে কি করবে কে জানে।

'দিদিভাই, সময় তো হয়ে এল—কালই তো শেষ দিন। পরশু ভোরের ভিতুরি ঘর ছাড়তে হবে। আমরা কোন ঠিকানা না পাই—জাতে বোষ্টম, ভিক্ষে করেই খাই—রাস্তাতেও কাটিয়ে দিতে পারি কটা দিন। সঙ্গেও কিছু এমন নেই যে চোর ডাকাত লাগবে পেছনে। কিন্তু তুমি ? তুমি কি করবে, কোথায় যাবে—যা হোক একটা ব্যবস্থা করো এবার !'···

বাইরে কোন অস্থিরতা প্রকাশ না পেলেও মনে মনে চিন্তিত ও ব্যাকুল হয়ে উঠেছে বৈকি। ভাবছে তো আকাশপাতাল, আজ সারা দিনই তো ভেবেছে।

মনের সুতীব্র আবেগ আর কোন দিকে চোখ মেলতে দেয় নি, এতদিন শুধুই ভেবেছে কবে বৃন্দাবন পৌঁছবে, তাঁর দেবতার সঙ্গে যোগাযোগ না হোক—হওয়া

সম্ভবও নয়—তাঁর সান্নিধ্যে, কাছাকাছি থাকবে, এতেই অনেক শান্তি। খবরও হয়ত পাবে। গোপনে ঘোমটা দিয়ে রাত্রে আরতির সময় চোখের দেখা দেখে আসতে পারবে।

আর কোন তথ্য তলিয়ে ভাবে নি, ভাবার মতো অভিজ্ঞতাও ছিল না। সাধারণ বাস্তব জীবনের কিছুই তো সে প্রায় জানে না। কিসে কি হয়—কত কি অসুবিধা এ-সব কিছুই জানত না, বোঝবার কথা মনেও হয় নি।

'ভিক্ষে করব' 'মাধুকরী করব'···এসব শোনা কথা, তা-ই বলেছে। তার আগে কোথাও একটা আস্তানা ঠিক করতে হবে এই সহজ কথাটাও মনে পড়ে নি। কী ক'রে মাধুকরী শুরু করতে হয়, কি বলতে হয় তাই তো জানে না। এই বয়সের মেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে, চেহারা তার ভাল—এখন অপরের মুখে শুনছে—সেটাই তো সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াল। সকলের মুখেই এ কথা শুনেছে, সুদর্শনা তরুণীদের বিপদ পদে পদে। তা ছাড়া এদিক দিয়ে কিছু কিছু অভিজ্ঞতাও হয়ে গেছে নবদ্বীপেই।

এ দু দিন নয়—ট্রেন থেকেই চিন্তার শুরু হয়েছে।

তবু, সে অকূল চিন্তার মধ্যেও একটা ক্ষীণ আশা ছিল মনে, এঁরা যদি একটা আশ্রয় পান, তার মধ্যেই কি একটু ঠাঁই দেবেন না? অন্তত দিনকতকের জন্যে? ওর অসহায় অবস্থা দেখলে হয়ত রাজী হবেন। তেমন হলে এঁদের সঙ্গেই মাধু-করীতে বেরোতে পারবে। অন্তত একটু ভেবে দেখার সময় পাবে।

সে আশাও তো নির্মূল হয়ে গেল।

বাবাজীরা রাস্তায় বাস করতে পারেন, তা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাবে না, সে যদি ওঁদের সঙ্গে থাকে তো তামাশা দেখতেই ভীড় জমে যাবে।

আরও একটা কথা এতদিন মাথায় যায় নি। প্রবল—সব-বিবেচনা-ভাসিয়ে-দেওয়া যথার্থ-অর্থে একাগ্র কামনায় সে কটা দিন কোন বাস্তব বুদ্ধির স্থান ছিল না মনে—এখন মনে হচ্ছে। এখানে আসার পর "বহুরাণী" বা বড় গোসাঁইয়ের বৌকে দেখতে বহু মহিলাই এসেছেন; আরতির সময়, প্রাভাতিক পুজোর সময় অনেক দিনই মন্দিরে থাকতে হয়েছে বহু কৌতূহলী চোখের দৃষ্টির সামনে। মাথায় কাপড় দেওয়া থাকত ঠিকই, তবে সে অর্ধ-অবগুণ্ঠন, পুরাকালের বধূদের মতো দীর্ঘ ঘোমটা দেওয়ার রীতি ছিল না—তাতে কাজের অসুবিধা হয় বলেই। শ্যাম-সোহাগিনী তা নিয়ে রসিকতাও করেছেন অনেকদিন, 'আমরা যখন ছোট ছিলুম বৌমা, আমিও তো পাড়াগাঁ থেকে এসেছি—দেখেছি সামনে এক হাত ঘোমটা দিতে গিয়ে পিঠের খানিকটা আদুড় হয়ে যেত। তখন তো জামা পরার অত রেওয়াজ ছিল না।'

তার ফলে সাধারণ দর্শনার্থী অনেকেই দেখেছে। বড় গোসাঁই-এর নবোঢ়া বধূ, দর্শনীয় তো বটেই। সে কৌতূহলেও অনেকে আসত ঐ সময়গুলোয় ভীড় ক'রে। পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়ালে কেউ না কেউ চিনতে পারবেই। দুজন-একজনও যদি চিনে ফেলে, সে কথা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হবে না। তাতে যমুনার আরাধ্য

দেবতারই কি অপমান নয়, তাঁকেই কি প্রচণ্ড আঘাত করা হবে না ?

সমস্ত শ্বশুরকুলেরই অপমান, তাঁরা উপহাসাস্পদ হয়ে পড়বেন। তার চেয়ে গোপনে কোথাও গিয়ে আত্মহত্যা করাই ভাল।···

সারারাতই জেগে বসে কাটিয়ে দিল যমুনা।

চিন্তার কোন কূলকিনারা নেই। চিন্তাও তো অসম্বদ্ধ, এলোমেলো।

আসলে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছে, দিশাহারা।

মাঝে মাঝে মেঝেতে মাথা কোটা ছাড়া আর কিছুই করা হয় না, স্থির হয়ে বসে সম্ভাব্য উপায় ভাবা হয়ে ওঠে না।

অবশেষে একেবারে ভোরবেলায়—ওঁরা তখনই বেরিয়ে গেছেন গোয়ালিয়র মহারাজার ঠাকুরবাড়ির খোঁজে—মনে পড়ল রামরতিয়ার কথা।

রামরতিয়া ?···রামরতিয়া !

দোষ কি !

তার সেই চরম দুর্দিনের আশ্বাসবাণী—স্নেহ ভালবাসায় মাখা কথাগুলো—যা তখন ভাল ক'রে শোনাও হয় নি, মাথাতেও যায় নি।

আসবার দিন বলেছিল সে, 'বহুরাণী, আমি অনেক লেড়কী দেখেছি এই বয়সে, মানুষ দেখে চিনতে পারি। তুমি কোন পাপ কাজ করতে পারো না, জেনেশুনে নিজের ইচ্ছেয় কিছু করো নি। কে এ কাজ করেছে তা বললে না, কিন্তু যে-ই করুক—জোর ক'রেই করেছে।'

তারপর চোখ মুছে বলেছিল, 'জানি না বহুরাণী দিদি, আউর কোই ভাল দিন আসবে কিনা—বিপদে পড়লে কিন্তু—যদি এখানে কোনদিন আসো, কোন তেমন দরকার হয় আমাকে ইয়াদ ক'রো। আমি জান দিয়েও তোমাকে বাঁচাব।'

তাই করবে ?

তার শরণাপন্ন হবে ?

কিন্তু সে যদি ওঁদের—ওঁকে খবর দেবার চেষ্টা করে ? যদি ওর উপকার করতে গিয়ে অপকার ক'রে বসে ? পেটে কথা থাকবে কি ?

অবশ্য একবার বলেছিল সে, 'আমি বহুৎ বড় ঘরের কেচ্ছা জানি, তার যদি একটা কথাও বেরোয় তো তাদের মাথা হেঁট হবে, আমি কখনও কাউকে বলি না। আমার মরদকেও বলি না তেমন বুঝলে !'

চোখ বুজে ভাববার চেষ্টা করল রামরতিয়াকে।

ক'মাস তো ছিল ওর কাছে কাছে—না তেমন মানুষ নয়। যমুনাকে বিপদে ফেলবে না।

এক—

অনেক আশার মধ্যে একটা বড় আশঙ্কাও দেখা দেয়—যদি বেঁচে না থাকে !

এমন ভাবে কি তাকে লাঞ্ছিত করবেন গোপীবল্লভ ! এমন নিঃস্ব দীনহীন হয়ে এসেছে তাঁর শরণ নিতে, প্রায়শ্চিত্ত করতে, সে সুযোগটুকুও দেবেন না !···

আশা ও আকাঙ্ক্ষায় কণ্টকিত হয়ে বসে রইল বাবাজীদের অপেক্ষায়।

বাবাজী যদি দয়া না করেন তো খবরই বা কে দেবে!

বাবাজী মশাইরা ফিরলেন দুপুরেরও পর।

ও'দের মুখের চেহারা দেখে যমুনা বুঝল—তাঁদের সমস্যার একটা কিনারা হয়েছে কিছু।

ও'রা বললেনও তাই। অনেক খোঁজখবর ক'রে সে ভদ্রলোকের সন্ধান পেয়েছেন। ভদ্রলোক চিনতেও পেরেছেন কিন্তু তাঁর নিজের কোন উপায় ছিল না, স্থান ক'রে দেবার। ভদ্রলোক থাকেন একা, একটা ঘরভাড়া ক'রে। জপতপ ক'রে দিন কাটান। বাড়িটা বাঙালীরই, কিন্তু আগে ব্রজবাসীদের যাত্রীতোলা বাড়ি ছিল, খুপরি খুপরি ঘর, জানলার পাট বিশেষ নেই, লোহার শিক দেওয়া দরজা—আলো বাতাস বলতে ঐটুকু যা খোলা। বৃষ্টির সময়ে কোন কোন ঘরে তেরপলের পর্দা ফেলে ছাট আটকাতে হয়।

তবু—সে ঘরও খালি নেই আর। অনেক বলে-কয়ে বাড়ির মালিকের হাত ধরে অনুনয় করতে সি'ড়ির নিচে একটু জায়গা হয়েছে। এখানের সি'ড়ি বেশির ভাগই সংকীর্ণ কিন্তু দৈবক্রমে সেখানে ভেতরদিকে গুহামতো একটা খাঁজও আছে। মালিকরা বুড়োবুড়ী, তাঁদেরও ঠাকুরঘরের মতো একটু আছে, সিংহাসনে গোবর্ধন শিলা, তার সঙ্গে পিতলের একটি বাল-গোপাল মূর্তি। নিত্য এক পুজারী এসে পুজো ক'রে যান।

সেই ঘরের পাশ দিয়েই সি'ড়ি উঠেছে। ঠাকুরঘরের পিছন বলে চোরাকুটুরীর মতো একটু জায়গা বেরিয়েছে। সাধারণত ডেয়োঢাকনা কিছু কিছু থাকে। বৃদ্ধ বৈষ্ণবের কাকুতি-মিনতিতে সে জায়গাটুকু দিতে রাজী হয়েছেন, ভাড়া কিছু লাগবে না। ঘরেরই ভাড়া তো মাসিক দু' টাকা এক টাকা—ঐটুকুর জন্যে আর কি নেবেন! সাফসুতরো রাখবেন একটু—ঠাকুরঘরের লাগোয়া তো—এই শর্ত। পারেন তো ঠাকুরঘরের রোয়াকে বসে ভোরে কি সন্ধ্যায় একটু নামগান করবেন। তবে এও বলে দিয়েছেন, একতলার খুপরি মতো জায়গা—একটা তক্তাপোশ কিনে নিলে ভাল হয়। সাপের ভয় খুব একটা নেই, তবে চারদিকে ঘে'টির জঙ্গল—বিচ্ছু আছে, বিছুট আছে।

সব বৃত্তান্ত খুলে বলে বাবাজী বললেন, 'আমরা কাল ভোরে যাব বলে এসেছি। বৈকালে উনি গিয়ে আশেপাশের বাজার থেকে দু'একটা জিনিস কিনে নেবেন। দুজনে গিয়ে হাতাপিতি ক'রে সাফ ক'রে নেব, কতক্ষণই বা লাগবে!'

তারপর একটু থেমে বললেন, তবে তোমাকেও ভোরেই ঘর ছাড়তে হবে দিদিভাই। তার বেশী তো চৌকিদার থাকতে দেবে না। তুমি কি ঠিক করলে? আমাদের যে খাঁজ সেখানে আমরা দু'জন থাকলে একটা বেড়াল থাকারও জায়গা থাকবে না। যদি কোন দিন রে'ধে খেতে হয়, চৌকি খাড়া ক'রে রেখে সেই জায়গায় আঙোটিতে রাঁধতে হবে। আমরা অবশ্য মাধুকরীই করব—অত অসুবিধে হবে না। তবু—'

এই অবধি বলে চুপ ক'রে যান। 'তবু'র জের টানেন না।

বোধহয় অনাবশ্যক বোধেই।

বৈষ্ণবী তখন ভাড়া করা আঙোটিতে রান্না চাপিয়েছেন। রান্না আর কি, ভাত তার সঙ্গে কিছু আনাজ সিদ্ধ। আলু ভাতে কি করলা ভাতে, বড় জোর ডাল ভাতে। এই খাওয়া। কাল তো পেটে ভাতই পড়ে নি।

বাবাজী ততক্ষণে তামাক ধরিয়েছেন, তামাক খেতে খেতেই সব খুলে বলে উৎসুক জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইলেন।

আর সময় নেই। একেবারেই সময় নেই। যা করতে হবে, যা বলতে হবে— এখনই।

যমুনা একেবারে ও'র পা চেপে ধরল।

'বাবাজী মশাই, একটা উপকার করবেন আমার ? শেষ অবলম্বন এটা—নইলে যমুনায় গিয়ে গা ঢালা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না !'

'আরে আরে—করো কি দিদি ! নাতনী বলি ঠিকই, তবু বামুনের মেয়ে, তায় সধবা—পায়ে হাত দিলে আমার অপরাধ হয় যে। কী করতে হবে তাই বলো না, যেটুকু সাধ্যে কুলোবে সেটুকু নিশ্চয় করব !'

রামরতিয়ার ঠিকানা সে বলেছিল কয়েকবারই—তবে তার কিছুই প্রায় মনে নেই। পুরনো শহরের বঙ্কুবিহারী মন্দিরের প্রায় উলটো দিকে একটা পথ গেছে —গলির মতোই—পাড়ার নামও বলেছিল, সেটা এখন ঠিকমত মনে করতে পারছে না, তবে কে এক পাণ্ডা লালুরাম ব্রজবাসীর নামটা মনে আছে, তার বাড়ির কাছেহ থাকে। পিছন দিকটায়। বোধ হয় মণি-পাড়া, আবছা আবছা যা মনে পড়ছে।

সেই ঠিকানাই বুঝিয়ে দিল। ধর্মশালায় অন্য ঘরের এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে কাগজ পেন্সিল চেয়ে নিয়ে বাবাজী তা লিখেও নিলেন।

'সেইখানে রামরতিয়া বলে একটি আধাবয়সী মেয়েছেলে থাকে—আঁতুড়ের ঝি, তেমন সাধারণ ঘরে প্রসবের বা দাইয়ের কাজও করে। খাপরার চালের বাড়ি, তবে তা নাকি ওর নিজস্ব। যদি তাকে খুঁজে বার করতে পারেন—বহুরাণী এসেছে এখানে, ধর্মশালায় আছে—বললেই সে ছুটে আসবে।'

বাবাজী মশাই বললেন, 'তার মানে দিদিমণি তুমি এখানকারই বৌ। নিশ্চয় বড়ঘরে বে হয়েছিল !···ইস্ ! এই হাল তোমার !···যাবো ভাই, নিশ্চয়ই যাবো। মরে মরেও যাবো। তোমাকে একেবারে পথে বসিয়ে যেতে আমাদেরই কি মন চাইছে !'

খাওয়াদাওয়ার পরই রওনা দিলেন বাবাজী, তিনটে নাগাদ। এত রোদ মাথায় ক'রে যাওয়া—বৈষ্ণবী খুঁতখুঁত করছিলেন, উনি বুঝিয়ে দিলেন, দিনের আলোয় খোঁজ না করতে পারলে আজ আর হয়ে উঠবে না। প্রায় অন্ধকার শহর, মাঝে মাঝে দু-একটা তেলের আলো রাস্তায়। তাতে পথঘাট চেনা যায় না। উনি চোখেও ভাল দেখেন না, ওদিকটা বড় বড় গোল গোল এবড়ো-খেবড়ো পাথর দিয়ে পথ

বাঁধানো, অন্ধকারে চলতেই পারবেন না।

পথের দিকটা জানতে গেলে ধর্মশালার চৌকিদারও বললেন, 'এ গোপীনাথ ঘেরা থেকে পুরনো শহর বাঁকে-বিহারীর মন্দির অনেকটা পথ, এত রোদে যাবেন ?'

'উপায় কি ?' সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।···

ফিরতে দেরি হ'ল অনেক। সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হয়ে গেল একসময়। বৈষ্ণবী চিন্তিত হবেন বৈকি ! আর সে চিন্তা স-রবও। বেশ একটু তিক্ততাও তাতে।

'বুড়োটা না হোঁচট খেয়ে পড়ে কোথাও পা ভাঙে। তা হলেই তো চিত্তির। ভিক্ষে ক'রে খেতে গেলে পা-টা থাকা চাই তো। যা রাস্তার ছিরি এখানকার। ···কোথা থেকে এক উটকো হ্যাঙ্গাম ঘাড়ে চাপাল পুজুরিদি—বুড়োর জানটা বুঝি যায় !' ইত্যাদি ইত্যাদি—

এটা স্বাভাবিক। তবু অপমানে কান-মাথা গরম হয়ে ওঠে যমুনার। এখনও এটা হয়--সেও দেহের স্বাভাবিক নিয়মে। প্রাণপণে নিজেকে বোঝায়—এই তো সবে প্রায়শ্চিত্ত শুরু। আরো তো ঢের সইতে হবে।

দেরির কারণ—বাবাজী মশাই হিন্দী বোঝেন না, এখানের লোকও, পাণ্ডা ছাড়া, বিশেষ কেউ বাংলা বোঝে না। ভাগ্যে বাঙালীর সংখ্যা কম নয়—তাই মাঝে মাঝে তাদের দেখা গেলে জিজ্ঞাসা করা যায়। তাও সবাই সব চেনে না। একজন বলে দিলেন, রেঠিয়া বাজার পার হয়েই সিধে পথ, 'বাঁকে-বেহারী' বললেই পথ দেখিয়ে দেবে সবাই।

অবশেষে সেখানে পেঁছানো গেছে। মণি-পাড়াও দেখিয়ে দিয়েছে লোকে। তবে লালুরাম নাকি মারা গেছেন, তাঁর ভাই কাশীরাম আছেন। তিনি কোথায় বাইরে গিছলেন, তাতেও একটু দেরি হ'ল। অবশ্য তিনি এসেই বাবাজীর সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে রামরতিয়ার খাপরার চালওলা বাড়ি দেখিয়ে দিয়েছেন।

দিদিভাইয়ের সৌভাগ্যই বলতে হবে—গোবিন্দর কৃপা—রামরতিয়া বাড়িতেই ছিল।

বহুরাণী শব্দটা উচ্চারণ করার ওয়াস্তা—লাফিয়ে উঠেছে সে।

'বহুরাণী ? আয়ী ? হিঁয়া ? কাঁহা জী ?'

প্রশ্ন করেছে কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা করে নি। বলতে বলতেই মরদকে ডেকে দ্রুত কি সব নির্দেশ দিয়ে—বোধহয় সংসার সামলাবার কি রসুই করবার ভার চাপিয়ে—প্রায় ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে।···

'অনেক আগে আসতে পারত, প্রায় ছুটেই আসছিল,' বাবাজী বললেন, 'অন্ধকার হয়ে গেছে, এবড়ো-খেবড়ো পাথর-বাঁধানো রাস্তা, পথ দেখতে পারব না বলতে থেমে আমাকে ধরে ধরে নিয়ে এসেছে। তাও একরকম টানতে টানতেই এনেছে।'

এসব কথা শোনবার অবসর মিলল না।

তার আগেই 'বহুরাণী দিদি, তোমার এই হাল ! তোমার এই চেহারা দেখতে

হ'ল আমাকে !' বলে ডুকরে কেঁদে উঠল রামরতিয়া।

॥ ১০ ॥

আকস্মিক আঘাতের বেদনা-উচ্ছ্বাস কমতে অবশ্য খুব বেশী দেরি হ'ল না। তার পরই রামরতিয়া কর্মব্যস্ত হয়ে উঠল। সমস্যা কি সেটা বাবাজীর কাছে শুনে নিয়েছিল, কেন এসেছে তা সে নিজেই বুঝেছে, অনাবশ্যক প্রশ্ন করল না। চোখ মুছতে মুছতেই বাইরে কোথায় চলে গেল, মিনিট পনের কুড়ি পরে ফিরে এসে সোজা চলে গেল চৌকিদারের ঘরে। তাকে যা বলল—তা এখান থেকেই শোনা গেল, কারণ, ভাষাটা অনুনয়ের নয়, তর্জনের। এঁরা হিন্দী না বুঝলেও আভাসে মর্মার্থটা বুঝলেন, যমুনা তো কতকটা জেনেই গেছে এখানে মাসকতক বাস ক'রে।

রামরতিয়া বলল, 'ঐ সাত নম্বর ঘরের লেড়কী হয়তো আরও দু-একদিন থাকতে পারে। কোন কানুন দেখিও না আমাকে, তুমি পয়সা নিয়ে অনেক যাত্রীকে বেশীদিন থাকতে দাও, বাবুদের চিঠি নিয়ে এসেছে বলে—তা আমি জানি। আমি রামরতিয়া, এখানে সব বড় বড় গোসাঁইদের বাড়িই আমার যাতায়াত আছে—তোমার নোক্‌রি ছুটিয়ে দেব, যদি বেশী কথা বলতে এসো। দরি দেওয়া তোমাদের আইনে আছে—দাওনি কেন? নওজোয়ান লেড়কী, ঐ বুড়ো মানুষ দুটো—মেঝেয় শুচ্ছে! খাটিয়ার ভাড়া নেওয়া তোমার হক, তোমার খাটিয়া—দরিরও ভাড়া নাও নাকি?'

অতঃপর বিজয়গর্বে একখানা মস্তবড় শতরঞ্চি নিয়ে সাত নম্বরে ফিরে এল। নিজেই দুপাট ক'রে বিছিয়ে দিলে, বললে, 'এখানেই শোবেন আপনারা। আর বহুরাণী দিদি—তোমাকে কালকের দিনটা অন্তত এখানেই কাটাতে হবে, এই তো রাত হয়ে গেল, ঘর একটা ঠিক করতে হবে তো, নিরিবিলি জায়গা হবে, ভাড়া না লাগে দেখতে হবে—একটু সময় লাগবে বৈকি। তবে ভোর থেকেই ঘুরব আমি—আমার তো মনে হয় দুপুরের মধ্যেই একটা কিছু হয়ে যাবে। তুমি কিছু ভেবো না।'

তারপর, যেতে গিয়ে আর একটা কথা মনে পড়ল, 'হ্যাঁ, রাধারমণের মন্দির থেকে তোমার জন্যে একটা পারস পাঠাবেন ওঁরা, এখানেই পৌঁছে দিয়ে যাবে কেউ। একজনের মতোই দেবে, তবে যা নিয়মমতো দেবে তাতে তোমার দুবেলাই চলে যাবে। দশখানা রুটি, দু হাতা ভাত। তোমার যা খাওয়া দুবেলাতেও শেষ করতে পারবে না। খাবার থালায় আনবে, তবে পাতাও আনবে, পাতাতে সাজিয়ে দিয়ে থালা নিয়ে চলে যাবে, তাকে কিছু দিতে হবে না, সে আমি আগাম দিয়ে এসেছি—ডাল ক্ষীর রসা* এগুলো কুল্লড়ে থাকবে। ভাল করে খেয়ো, এমন ভাবে শরীর নষ্ট করো না। আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাবেন, আমার কাছে যখন পৌঁচেছে, তখন ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই। মাধুকরীও করতে দেব না আমার

---

* রসা—অর্থাৎ নিরামিষ ঝোল। ঝোল বলতে মাছের ঝোল মাংসের ঝোল মনে আসে, তাই বৈষ্ণবরা রসা বলেন।

জান থাকতে। তাই বলে আমি দেব কিছু এমন আস্পদ্দা আমার নেই।'

আর বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট করার লোক সে নয়—তখনই চলে গেল, বলে গেল, 'দেখি, একটা জায়গা ঘুরেই যাই—যদি এখনই কিছু একটা ঠিক করতে পারি।'

বাবাজীরা তো হতবাক।

'দিদিভাই, এত তোমার প্রতাপ, এমন সব লোক তোমার হাতের এক তুড়িতে ছুটে আসে—আর তুমি এত আকাশপাতাল ভাবছিলে! কী জানি তোমার এমন কষ্ট করার কারণটা কি ···যাই হোক, তবে আমরাও তো এখানেই রইলুম গোয়ালিয়ার ঠাকুরবাড়ির পাশেই দ্বিজু স্যাণ্ডেলের বাড়ি, বললেই লোক দেখিয়ে দেবে। তেমন কিছু দরকার পড়লে—কিম্বা রাধারাণী না করুন অসুখ-বিসুখ হলে আমাদের খবর দিয়ো। যতটা পারি তা করব।'

পরের দিন বেলা ঠিক তিনটে বাজার একটু পরেই রামরতিয়া এসে হাজির।

ব্যবস্থা সব ঠিক হয়ে গেছে। মনের মতোই জায়গাটা। কোথায় তবু বুঝিয়ে বলল, সবটা যমুনার মাথায় যাবে কিনা তা না ভেবেই, গোবিন্দ মন্দিরের কোল দিয়ে যে পথটা সাক্ষী-গোপালের ভাঙা মন্দির বাঁয়ে আর বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সমাধি ডাইনে রেখে সোজা চলে গেছে গোপীনাথ ঘেরার দিকে— তা থেকেই দুইয়ের মাঝামাঝি আর একটা পথ বেরিয়েছে—চলে গেছে সোজা লালাবাবুর কুঞ্জ পর্যন্ত (এদিকটা লালাবাবুর প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের পিছন পড়ে), সেখান থেকে বেঁকে যমুনার ধার ধরে গোপেশ্বরের দিকে—তার মাঝামাঝি একটা ছোট মন্দিরও পড়ে—বলে কিশোরীমোহনের কুঞ্জ—তারই প্রায় উল্টো দিকে—একটু পাশ ক'রে—এক বিরাট বাড়ি। কোন্ এক বিকানীর না যোধপুরওয়ালা লালার বাড়ি, এককালে খুব আসত লোকলস্কর নিয়ে—এখন কেউ বড় আসে না। বুড়ো কর্তারা সব চলে গেছে—ছোটদের এদিকে মন নেই। অবশ্য এরা কেউ মন্দির-টন্দির করেন নি—মানে রাধাকৃষ্ণর মন্দির—ভেতর দিকে একটা ছোট ঘরে মহাবীরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা আছে—তাঁর পূজারীই বাড়ির চৌকিদার।

তার সঙ্গেই কথা হয়েছে। দশ বারো টাকা মাইনে দেয়, তাতেই মহাবীরের সেবাও করতে হয়। তবে বলা আছে, যদি কোন ভাল ভাড়াটে পায়—দু'চার দিনের জন্যে তীর্থ করতে এসেছে—তাকে ভাড়া দিতে পারে। আর তা থেকে দু'পাঁচ টাকা নাও, ক্ষতি নেই। কিন্তু কিছু টাকা রাখতে হবে—বাড়ি চুনকাম মেরামত এ সব তো আছে। তবে সে বিশেষ হয় না। ঐ হামদো বাড়িতে কে আসবে বলো। এক ঝুলনে কি হোলির সময় একটু ভীড় হয়—তবে সে দেহাতী গাঁওয়ার যাত্রীই বেশী। এরা পথেই দিন কাটায়—ধরমশালায় জায়গা না পেলে। লঙ্কাবাটা মাখানো শুখা রুটি আনে টিন ভর্তি ক'রে। তাই খেয়েই কটা দিন কাটিয়ে দেয়। ঝুলনে বাঙালী আসে অনেক। তবে তারা এমন বাড়িতে পয়সা দিয়ে কেউ থাকতে চায় না। আত্মীয়দের ঠাকুরবাড়ি কোনটা না কোনটার খোঁজ-খবর নিয়ে আসে, নইলে

পান্ডাদের যাত্রীতোলা ঠাকুরবাড়ি তো আছেই। নয় তো ধর্মশালা। স্থায়ী ভাড়াটে মেলে—পাঁচ সাত টাকায় হয়ত তিন-চারখানা ঘর নিয়ে থাকবে—তাতে মালিকদের মত নেই।

আরও বলল, 'জায়গাটা অবশ্য বলতে গেলে হাটের মধ্যে। চারদিকেই বড় বড় মন্দির। ওদিকে স্বয়ং গোবিন্দজী, এদিকে কৃষ্ণচন্দ্র—এ বাড়ির পিছনেই ব্রহ্মকুণ্ড—বলে ব্রহ্মার চোখের জলে কুণ্ড হয়ে গেছে, এখন শীতে গরমে তলায় একটু সবুজ রঙের থকথকে জল থাকে, পাঁকই ধরো, বড় বড় ব্যাঙ লাফায়, তাতেই তেলেঙ্গীরা ডুব দিয়ে চান করে—ওদের এত পুণ্যির লোভ। এই ব্রহ্মকুণ্ডরই ওধারে রঙজীর মন্দির, ঐ যে যেখানে বলে সোনার তালগাছ, মন্দির তো বিরাট—একটা দেওয়ালই ইদিকে, সামনেই গোবিন্দজী। কাজেই লোক চলাচল খুব। কাছেই গৌর ডাক্তার, অসুখ-বিসুখে ডাকলেই আসবেন। তবু, তুমি তো আর বেরোচ্ছ না কোথাও। তা ছাড়া সামনের ঘরে পুজারিজী থাকেন—ওঁকে বলে আমি একটা ভেতরদিকের ঘরই ব্যবস্থা করেছি। তবে অন্ধকার নয়, বড় মাঝারি ঘর, বড় জানলাও আছে একটা। ভাড়া লাগবে না এক পয়সাও। চৌকিদারই বলো আর পুজারীই বলো—ভাল মানুষ লোক, অতি ভাল মানুষ—পুজো ধ্যান জপ নিয়ে থাকেন। তাঁর আশ্রয়ে শান্তিতে থাকতে পারবে।'

শুধু ঘরই নয়। গেরস্থালী পেতে দেওয়া যাকে বলে তাই ক'রে ফেলল রামরতিয়া।

ভারী একটা তক্তাপোশ ঘরে ছিলই, সেটা সরিয়ে নিলেন না পুজারীজী—রাখবেনই বা কোথায়? সরাবে কে—বরং একটা তোশক দিতে চাইছিলেন, যমুনা কিছুতেই রাজী হ'ল না। রামরতিয়ার দু হাত ধরে মিনতি ক'রেই বলল, 'দিদি, তোমাকে দিদিই বলছি, আর জন্মে আমার আপন দিদি ছিলে—কি মা—নিজের দিদিও এতটা করে না—আমাকে কষ্ট করতে দাও। কষ্ট করতেই এসেছি, প্রায়শ্চিত্ত করতে। আরামে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। জীবনটা নিজে নষ্ট করব না, তবে তপস্যাই করব—যাতে সব পাপ ধুয়ে মুছে গিয়ে সামনের জন্মে ওঁকে আবার পাই।'

রামরতিয়া ওর মনের ভাব বুঝল, তারও দু চোখ জলে ভরে এসেছে। সে আর পীড়াপীড়ি করল না।

জীবনধারণের অন্য ব্যবস্থাগুলোয় মন দিল। কষ্ট যতই করতে চাক না কেন, শুধু প্রাণধারণের জন্যে, দেহটা রাখার জন্যেই অনেক জিনিস দরকার। যমুনার সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। ওকেই সব ভাবতে হবে।

এখানে মাড়োয়ারীরা পরকালের হিসেবটা ঠিক রাখার জন্যে 'নাম' কেনেন পয়সা দিয়ে। দুটো এই ধরনের প্রতিষ্ঠান হয়েছে। সকালে ছ'টা থেকে ন'টা, বিকেলে তিনটে থেকে পাঁচটা—নামগান করতে হবে। গান বলতে গান নয়—যাকে তারকব্রহ্ম নাম বলে তাই—'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।' যারাই আসুক, বিধবা বা অনাথ মেয়েদের জন্যেই এটা

করা, তারা সকালে একটা ক'রে সিধা পাবে—আটা, চাল, ডাল, নুন এই সব আর বিকেলে ছটা ক'রে পয়সা। একটা পেট ভাল ভাবেই চলে যায়। যাঁরা নিয়মিত এই আসরে নাম করেন তাঁদের বছরে একপ্রস্থ জামা-কাপড়ও দেওয়া হয়।

তবে যমুনার পক্ষে এ ভাবে দুবেলা নাম গাইতে যাওয়া সম্ভব নয়। অথচ যাকে বলে 'ডান হাতের ব্যাপার' সেটা আগে ঠিক করা দরকার। এই দুইয়ের একটা প্রতিষ্ঠানের কামদারকে ধরে সে ব্যবস্থাও করেছে এর ভেতরেই (তাঁর ভাদ্র-বৌয়ের সঙ্গে একটা গোলমাল হয়ে পড়েছিল, রামরতিয়াই নিঃশব্দে সে কাজ সেরে দিয়েছে—মায় সদ্যোজাত শিশুকে বিক্রী করার কাজটাও)। মাসে মাসে পাঁচ সের আটা, এক সের চাল, আর কিছু ডাল নুন তেল পেঁছে যাবে এখানে। এক শেঠানী এক জোড়া শাড়ি ও দুটো সেমিজ দিয়েছেন, এক জোড়া গামছা। ছ মাস অন্তর এও আসবে, নিয়মিত। রামরতিয়া কিছু বর্তনও এনেছিল চেয়ে-চিন্তে। যমুনা তা থেকে একটা তাওয়া বা চাটু, আটা মাখার জন্য কানা-উঁচু পিতলের থালা, একটা চিমটে আর দুটো ঘটি ছাড়া কিছু নেয় নি। সে শুকনো রুটি নুন দিয়ে খাবে, তার কিছু দরকার নেই। রামরতিয়া বকাঝকা ক'রে ঝগড়া ক'রে একটা ছোট কড়া রেখে গেল। 'অব্যেস নেই, পেটের অসুখে মরবে যে! এটা রইল ডাল সেদ্দ ক'রে নিতে পারবে কিম্বা ভাত আলুসেদ্ধ। তাতে তোমার সন্ন্যেস নষ্ট হবে না।'*

আর যা দরকার, বালতি একটা পূজারীজি দিয়েছেন ঘর থেকে, রামরতিয়া দুটো জলের কলসী কিনে দিয়েছে। জ্বালানী কাঠ আর ঘসি বা ঘুঁটে ওর নিজের বাড়ি যথেষ্ট আছে—মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা পেঁছে দিয়ে যাবে।

মোটামুটি জীবনধারণের সমস্ত ব্যবস্থাই হয়ে গেল। যে কৃচ্ছ্রসাধন করতে চায়, তপস্যা করতে চায়—তার কাছে এও বিলাস একরকম।

তবে এও যেন মনে হয় গোপীবল্লভেরই কৃপা। সত্যি সত্যিই পথে বেরিয়ে আধখানা কি সিকিখানা ক'রে রুটি ভিক্ষে করতে হ'ল না—লজ্জার চেয়ে ভয় বেশী—চেনা লোক কেউ দেখে ফেললে তার শ্বশুরকুলেরই—স্বামী-শাশুড়ির অপমানের চূড়ান্ত হবে—এই অপরাধ থেকে তিনি বাঁচিয়ে দিলেন।

কিন্তু তপস্যাই হোক আর প্রায়শ্চিত্তই হোক—এটা একটা ধারণা, এও এক রকমের আত্মপ্রবঞ্চনা।

আসলে কামনা। প্রচলিত পুরাতন বোধের চেয়ে মানুষের কাম বা কামনা—দেহজ আকর্ষণের শক্তি অনেক বেশী। এটা এমন অনস্বীকার্য সত্য যে শাস্ত্র-গ্রন্থকাররাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। নইলে রামায়ণ মহাভারত পুরাণে

---

* সময়টা এখনকার কাল নয়। আন্দাজ ১৯২১/২২ সালের কথা। তখন বৃন্দাবনে টাকায় ষোল সের গম পাওয়া যেত, তের ছটাক ঘি, আট সের ভাল জ্বাল দেওয়া দুধ, গ্রাম থেকে যে ঘাটা, অর্থাৎ মোষ গরুর দুধ ও জল মেশানো—দুধ, বিক্রী করতে আসতো ষোল সের টাকায়। চার আনা সের রাবড়ি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এ দাম ছিল।

মুনি-ঋষিদের তপস্যাভ্রষ্ট হওয়ার, পদস্খলনের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত থাকত না। এ সব কাহিনী এক রকমের শিক্ষাই, এর পরও পরাশর বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাব নষ্ট হয় নি, তাঁদের ঋষিত্ব যায় নি। শুকদেব ও নারদের মহিমা এত ক'রে কীর্তন করা হয়েছে এই সত্যের ব্যতিক্রম বলেই।

আর এই শক্তি স্বীকার ক'রে নিয়েই পরবর্তীকালে (তখনকার দিনে যা আধুনিক হাওয়া তাকে ঠেকাতে) স্মৃতিশাস্ত্রের এত সব কড়া অনুশাসন মহিলাদের জন্যে, কামনায় বাঁধ দেবার জন্যে নির্জলা একাদশী প্রভৃতির কঠোর ব্যবস্থা।

যমুনাও এ স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে নয়। বস্তুত সেই উন্মত্ত অধীর কামনাই—প্রেম বলা যায় কি ? সে অবসর মিলল কোথায় ?—সকল বাস্তব বুদ্ধি লোপ ক'রে এমন পাগলের মতো টেনে এনেছে তাকে, অকূলে ঝাঁপ দিতে বাধ্য করেছে—এক রকম –সে কামনা কি এই জীবনযাত্রার কঠোরতা বা কৃচ্ছ্রসাধনেই সংযত করা যায়! সামান্য দৈহিক নিগ্রহে এ শ্রেণীর উন্মত্ত আবেগকে বাঁধ দেওয়া যায় না।

বহু বিনিদ্র রজনী কাটার পর একদিন রামরতিয়ার দুটো হাত চেপে ধরে, 'দিদি একবার—একবার তাঁকে দেখাতে পারো না—দূর থেকে ?'

এই বাঁধভাঙা অস্থিরতার আরো কারণ ঘটেছে এখানে এসে, ও-বাড়ির খবর পেয়ে।

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিল—কিছুটা ইতস্ততঃ ক'রে অবশ্য, জিভে যেন জড়িয়ে যায় শব্দগুলো, না জানি কী প্রচণ্ড আঘাত অপেক্ষা করছে এর উত্তরের মধ্যে—'ওখানের নতুন বড় বৌরাণী—মানে, ইয়ে, ওঁর নতুন স্ত্রী কেমন দেখতে হয়েছে ?'

'হায় কপাল!' সত্যিই কপালে চাপড় মেরে বলেছিল রামরতিয়া, 'বড় গোসাঁই দাদা কি তেমনি লোক! হায় হায়! তুমি মানুষ চিনলে না। অবিশ্যি চেনবার অবসরই বা মিলল কদিন।...আরে, বিয়ে করলে তো নতুন বৌরাণী, আসলে যে মানুষটাই এলো না—সে কেমন দেখতে বলব কি ক'রে!'

বুকের মধ্যে এ কি প্রচণ্ড উত্তাল আলোড়ন!

এ কি আনন্দের ? এ কি দুঃখের ? অধিকতর দুঃখের ? মনে হচ্ছে বুকটা বুঝি ভেঙে পিষে যাবে।—নিজেকেই এর জন্যে দায়ী মনে করে।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে কণ্ঠে স্বর খুঁজে পায় যমুনা।

'উনি—উনি এখনও বিয়ে করেন নি আর ? সে কি! মা কিছু বললেন না ?'

'বলেন নি আবার! ভেবেছিলেন কিছু বলতেও হবে না। ওঁর ওপর ওখানে কেউ কোন কথা বলবে না। বলে নি তো কখনও। মেয়ে ঠিক হয়ে গেছে—এখানকারই এক বাঙালী ঘরের মেয়ে—কিন্তু উনি কিছু বলবার আগে বড়দা নিজে থেকেই বললেন। মার ঘরে গিয়ে ডেকে বললেন, "এ চেষ্টা করো না মা। আর বিয়ে আমি করব না। কপালে সুখ কি ঘর-সংসার লেখা থাকলে এমন ঘটনা ঘটবেই বা কেন। ঠাকুর আমাকে সংসারী করতে চান না।...তুমি বরং ছোট ভাইয়ের বিয়ে দাও।" বড়মা অনেক চেষ্টা করেছেন, সে না-কে হ্যাঁ করাতে পারেন

নি। এই প্রথম হার মানলেন বড়মা।'

একটু থেমে রামরতিয়া আবার বলে, 'তবে বড়মাও তেমনি। এখনও হাল ছাড়েন নি। ছোটদাদা-গোসাঁইয়ের বিয়েও হয় নি এখনও। তবে সে-ই এখন মন্দিরের সেবার নিয়ম-রীত্, সম্পত্তির হিসেবনিকেশ বুঝে নিতে শুরু করেছে। এবার বিয়ে দিতেই হবে।...সেই মেয়েই হয়ত আসবে—কি অন্য মেয়ে আনবেন বড়মা—তা জানি না।'

'তা উনি—উনি বাড়িতে থাকেন তো? সন্ন্যিসি হবেন না তো?'

'ও মা, তুমি তো শুনে গেছ এখানে থাকতেই বহুরাণী দিদি, উনি তো সেই দিন থেকেই বাগানবাড়িতে বাস করছেন। ঠাকুর যখন যান হোলির সময় তখন একটু ভীড় হৈ-হল্লা হয়। তারপর তো চুপচাপ, নির্জন। উনি ওঁর সেই ছোট ঘরেই মন্দিরমতো ক'রে নিয়েছেন—রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত জপতপ সাধন-ভোজন করেন শুনেছি। দারোয়ান যা বলে। প্রসাদ এখান থেকে যায়।'

'উনি—উনি মন্দিরে আসেন না একেবারে?' প্রায় চাপা কান্নার মতো শোনায় ওর গলাটা।

'তা আসবেন না কেন? প্রতিদিনই আসেন। কোনদিন একেবারে ভোরে ভোরে এসে মঙ্গল আরতি করেন, ঠাকুরের ঘুম ভাঙান—কোনদিন একটু বেলায় এসে পুজোর সময় বসে থাকেন। তাছাড়া ছোট ভাইকে শাস্তর পড়ান যে রোজ। যেদিন ভোগ-আরতি সারেন সেদিন এখান থেকেই খেয়ে যান মার সামনে বসে। রাত্তিরেও আসেন দু'একদিন ছাড়া, একেবারে শয়ন আরতি সেরে যান। বৈশাখ মাসে বৈকালীর সময় উনি এসে ঠাকুরকে তোলেন ঝাড়া থেকে, বৈকালী দেন। সে সব দিন আর রাতে আসেন না। নইলে শয়ন দেওয়া হয়ে গেলে সামান্য একটু প্রসাদ মুখে দিয়ে সোজা বাগানে চলে যান। আগে দারোয়ান আলো নিয়ে সঙ্গে যেত—এখন ছাইকেল কিনেছেন, দু'চাকার গাড়ি—তাতেই চলে যান।'

এই কথাগুলো শোনবার পর আরও ছটফট করেছে কদিন। অনুশোচনায়, মানসিক অস্থিরতায়—যা চিন্তাকেও বিক্ষিপ্ত ক'রে দেয়, নিজের একান্ত মন্দভাগ্যের জন্য মর্মান্তিক দুঃখে—হয়ত বা ঈষৎ সুখেও। কি জিনিস হারাল, ওর জন্যে সমস্ত জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল মানুষটার, সংসারটাই যেন ছারখার হয়ে গেল এই দুঃখে, অনুতাপে, ঈশ্বরের প্রতি অদৃষ্ট-বিধাতার প্রতি, অনুযোগে ও তিক্ততায়,—আবার সে মানুষকে আর কোন মেয়ে ছোঁয় নি, সে ছুঁতেও দেয় নি এইটুকু সান্ত্বনা। যদিও সে আনন্দের ধারে কাছে পেঁছবার কোন আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই—তবু এ যে পরম নিশ্চিন্ততা, তা আর কেউ বুঝবে না। কায়াহীন দেহসান্নিধ্য এক রকমের।

তার ফলে এত বিপরীতমুখী মানসিক আবেগের উন্মত্ততা যেন আর সহ্য করতে না পেরেই ঐ অনুরোধ বা আকুতি বেরিয়ে এসেছিল মুখ দিয়ে।

'একবার—একবার দেখাতে পারো না?'

কথাটা শোনার পর কিছুক্ষণ রামরতিয়ার—যাকে শুদ্ধ বাংলায় বলে বাক্য-স্ফূর্তি হ'ল না।

গালে হাত দিয়ে বসেই রইল হাঁ ক'রে—যমুনার মুখের দিকে চেয়ে।

তারপর বললে, 'তুমি ওখানে যাবে ? বড় গোসাঁই দাদাকে দেখতে ? তোমাকে কেউ চিনতে পারবে না ভাবছ ? দু'একজন না পারুক, বাকী সবাই চিনবে।'

'যদি খুব বড় ঘোমটা দিয়ে যাই ?'

'সেও তো নজরে পড়বে। এতবড় ঘোমটা তো কেউ দেয় না মন্দিরে এসে।'

অগত্যা চুপ ক'রে যেতে হয় যমুনাকে !

কিন্তু ওর মুখের যে করুণ চেহারা দাঁড়ায় তা সে নিজে না বুঝুক— রাম-রতিয়া লক্ষ্য করে।

সঙ্গে সঙ্গেই তার মন খারাপ হয়ে যায়। এ যে কী আর কতটা সহ্য করছে মেয়েটা—সে-ইবোঝে। এও কম কষ্ট করছে না। এ যদি প্রায়শ্চিত্ত না হয় তো প্রায়-শ্চিত্ত আর কাকে বলে !

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলে, 'দেখি, কাল তোমাকে বলব। কাশীরাম ব্রজ-বাসীর একদল যাত্রী এসেছে—বাঙালদেশ না কি বলে সেইখান থেকে—তাদের সব অমনি ঘোমটা, রাজপুতানীদের চেয়েও বেশী। এদিকে এক ফেরতায় কাপড় পরা, গায়ে জামা নেই—আদ্ধেকটা ন্যাংটা বলতে গেলে—সামনে একগলা ঘোমটা। পিঠটা বেরিয়ে থাকে সে হুঁশ নেই, মুখটা ঢাকা চাই। দলে অনেক মেয়েছেলে। কাশীরামকে জপিয়ে যদি রাজী করাতে পারি—রাত্রে শয়ন-আরতি দেখাতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে গোপীবল্লভের—তাহলে তোমাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব অন্ধকারে, ওরা যখন ঢুকবে তুমি ঐ দলে ভীড়ে যেও। অবিশ্যি রাতে উনিই আরতি করবেন কিনা সেটা জেনে নেবো। ভোরে এলে আর রাত পর্যন্ত থাকেন না। তবে কিন্তু আরতি শেষ হবার আগে চলে এসো—নইলে জানাজানি হতে পারে। আরতির সময় সবাই সেদিকে চেয়ে থাকে, শেষ হলে চার দিকে চাইবে। তা ছাড়া আমাকে দেখা গেলে তো কথাই নেই '

কাশীরাম রাজী হয়েছিলেন। নিজে যান নি, ছোট আইবুড়ো বোন ত্রিবেণীকে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যাত্রীদের। রামরতিয়াও সবাই হুড়মুড় ক'রে ঢোকবার মুখে যমুনাকে ঠেলে দিয়েছিল।

হ্যাঁ। আজ বড় গোসাঁই আরতি করছেন।

চেনার কোন অসুবিধে নেই, ঐ দীর্ঘ গৌর কান্তি, ঐ হাত নাড়ার ভঙ্গী, তদ্‌গত ভাবে আরতি করা—সবই ওর চেনা। প্রতিটি ভঙ্গী, নিঃশ্বাসের সঙ্গে পিঠটা ফুলে ফুলে ওঠা, হাত ওপরে ওঠার সময় পাল্‌কার পেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠা—সব, সবই পরিচিত।

ঝাড়প্রদীপের আরতি শেষ ক'রে ফিরলেন এদিকে, আগন্তুক দেবতাদের উদ্দেশে। সমাগত ভক্তদের দিকেও দীপ দেখালেন একবার—এ নিয়ম ওঁরই প্রবর্তন,

ভক্তরা দেবতাদের কম নন, বড় গোসাঁই বলেন।

সেই মুখ, প্রশান্ত সুন্দর। তেমনিই আছে। কেবল মনে হ'ল, চকিতে দেখা তো, প্রশস্ত ললাটে সে মসৃণতা আর নেই, অগভীর হলেও দু-তিনটি রেখা দেখা দিয়েছে।

সীমাহীন দুঃখ, লজ্জা ও দুশ্চিন্তার চিহ্ন।

কিন্তু পিঠ। এইটেই যেন সবচেয়ে প্রিয় যমুনার। এতখানি চওড়া পিঠ জ্ঞানত ও কারও দেখে নি। চওড়া বুকের মাপেই চওড়া পিঠ—সবটাই প্রায় অনাবৃত। তেমনিই বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে মুক্তোর মতো—যা ঐ ক মাস দেখেছে সে মুগ্ধনেত্রে।

বড় লোভ হয়। বড় বিষম লোভ—ঐ পিঠের খাঁজে যদি একটিবার মুখটা গুঁজে দিতে পারত—

পাণিশঙ্খের আরতিও শেষ হ'ল। এবার মুখ মোছানো চলছে। এর পরই চামরের ব্যজন।

যমুনা হয়ত রামরতিয়ার সব সতর্কবাণী, হুঁশিয়ারী ভুলে দাঁড়িয়েই থাকত মুগ্ধ চোখে চেয়ে—হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল সহদর্শনার্থীরা দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করছেন, তার মানে এখনই চলে যাবেন।

তারও সম্বিৎ ফিরল। ওঁদের সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এল সে।

কিন্তু—কোথায় এল, কে কোথায়, কোন্ দিকে যাবার কথা—তার কোন হুঁশই ছিল না আর, মাতালের মতো পা টলছে, তাতে যেন বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। রামরতিয়া এসে জোরে বাহুমূলটা চেপে না ধরলে হুমড়ি খেয়ে পড়েই যেত বোধ হয়।

নিঃশব্দে···বেহুঁশের মতোই ঘরে ফিরল যমুনা।

রামরতিয়াও মেয়েছেলে, এ মেয়েটাকেও সে ভালবেসে ফেলেছে—সে বুঝল।

কোন প্রশ্নই করল না। 'কেমন দেখলে বহুরাণীদিদি' এই ধরনের সাধারণ প্রশ্নও এক্ষেত্রে যন্ত্রণাদায়ক হবে বুঝে, ওকে ঘরে পেঁৗছে নিঃশব্দেই বেরিয়ে চলে এল।

॥ ১১ ॥

মোহিনীই ঠিক বলেছিল, 'ওলো, সে আরও যন্ত্রণা। কাছাকাছি থাকবি, হয়তো দেখতেও পাবি—তবু তাকে কাছে পাবি না, ছুঁতে পাবি না—তাতে দেখবি জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছিস। মিছিমিছি সব জেনেশুনে কেন তুঁষের আগুনে পুড়তে যাওয়া!'

বলেছিল বারবারই, তবে তখন বর্তমান আকাঙ্ক্ষাটাই এত প্রবল যে এসব নিয়ে চিন্তা করার অবস্থা নয় যমুনার। ভবিষ্যৎ তখন অনেক দূরে—বর্তমান জীবনের নরক-কুণ্ড থেকে মুক্তি পাওয়া, তাঁর কাছাকাছি থাকা—এটুকুও তখন সুদূর এবং

সুদুর্লভ বোধ হয়েছিল।

আজ বুঝছে, এখন বুঝছে।

যন্ত্রণা হবে হয়ত, সেটুকু বোঝার মতো—বয়স না হোক—অভিজ্ঞতা হয়ে ছিল। তবু সে যন্ত্রণা যে এমন নিদারুণ, এমন তীব্র, দেহে ও মনে এমন সর্বক্ষণ আগুন জ্বালাতে পারে—শুধু একটা মানুষকে ছোঁবার জন্যে, গায়ে হাত দেবার জন্যে, তার দেহের গন্ধর জন্যে—যে মানুষটা সেদিন মাত্র ক'হাত দূরেই ছিল—তা অনুভব করার মতো অভিজ্ঞতা হয় নি।

এ জ্বালায় নিজে না জ্বললে অনুমান করা যায় না—পরে যতই বুঝিয়ে বলুক—অনুভব করা যায় না।

তুঁষের আগুন। ঠিকই বলেছিল মোহিনীদি।

আজ মনে হয়—সেও বোধহয় এত যন্ত্রণাদায়ক নয়।···

অতৃপ্ত দৈহিক কামনায় রাত্রে মাঝে মাঝেই উঠে গায়ে জল ঢেলে আসে। মেঝেয় মাথা খোঁড়ে।

এক এক সময় পাথরের মেঝেতে মুখ ঘষে রক্তাক্ত ক'রে ফেলে।

তবু চোখে তন্দ্রার আভাস মাত্র আসে না—রাতের পর রাত।

একেবারে যখন অসহ্য মনে হয়—ভাবে গায়ে তেল ঢেলে পুড়ে মরবে—আসল আগুনের জ্বালায় এ মানসিক দাহের সমাপ্তি ঘটিয়ে—আবার পরক্ষণেই শিউরে ওঠে।

আরও কেলেঙ্কারী, আরও লজ্জায় ফেলবে তাঁকে, তাঁর পরিবারকে।

অমন দেবীর মতো শাশুড়িকে। ছিঃ!···

এক-একবার, অনেকদিন আগে শোনা কীর্তনের একটা লাইন মনে পড়ে।

রামকমল বলে বিখ্যাত এক কীর্তনিয়া শান্তিপুরে গিছলেন, গান গাইতে।

পালাটা ছিল বোধহয় 'মান'।

"অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা
হরিবৈমুখী হামারি অঙ্গ মদনানলে দহনা—"

অন্য লাইন অত মনে নেই। শুধু মনে আছে কুসুমশয্যায় শুইয়ে সর্বাঙ্গে চন্দন লেপেও সখীরা সে দাহ নেভাতে পারেন নি।

আজ সে বুঝছে শ্রীমতীর সে দহনের তীব্রতা!

অবশেষে, আবারও তাকে রক্ষা করে রামরতিয়াই।

সে পাকা অভিজ্ঞ লোক। পাথরে মুখ ঘষার, কপাল ঠোকার চিহ্ন দেখে বুঝতে বাকী থাকে না তার কারণটা।

সে এসব ব্যাপারে অনাবশ্যক প্রশ্নও করে না। তবে তার কষ্টও হয়।

একদিন আর থাকতে না পেরে বলে, 'বহুদিদি (রাণী শব্দটা যোগ করতে বারণ করেছে যমুনা, লোকে নানারকম সন্দেহ করবে, কৌতূহল প্রকাশ করবে। তবু এক এক সময় পুরনো অভ্যেসে বেরিয়েও যায়), একটা কথা বলব? ছোট মুখে

বড় কথা—আমরা ছোট কাজ করি, তোমাদের মতো লিখাপড়া জানা মেয়ে নই—এসব বলা আস্পর্দার কথা, তোমার রকমসকম দেখে না বলেও থাকতে পারছি না। তোমার তো দীক্ষা হয়েছে, বৈষ্ণব মন্ত্র, আমরাও, এ ব্রজধামে সবাই বৈষ্ণব—আমাদের তো ইষ্ট উনি—গোবিন্দই বলো আর গোপীবল্লভই বলো—যে নামেই ডাকো কৃষ্ণ ভগবান বৈ তো নয়। আমরা মরদই হই আর মেয়েছেলেই হই—তাঁকে আমাদের খশম, মরদ—মালিক বলে মনে করি, তাঁর দুটি চরণ ভাবতে পারলেই আমাদের মনে শান্তি। তা তুমি কেন—কাকে নিয়ে মন্তর তা জানি না—যেই হোন—তাঁর সঙ্গে বড় গোসাঁইদাদাকে এক ক'রে দ্যাখো না। গোসাঁইদাদাকে ধ্যান করো, তাঁর দুটি চরণ ভাবো, তাঁকেই ভেবে পুজো করো—পেলে ফুলতুলসী দিয়েই—মনে অনেক শান্তি পাবে। এক এক সময় মনে হবে তিনি তোমার কাছেই আছেন, তাঁকে ছুঁতে পারছ। তাতে কোন দোষ নেই, গুরু গোবিন্দ এক। আর মন্তর পড়া মরদ—তার চেয়ে গুরু কে আছে?'

চমকে ওঠে যমুনা।

কে জানে কেন—হঠাৎই মনে হ'ল, এই অশিক্ষিত মেয়েছেলেটার মুখ দিয়ে আর কেউ বলাল কথাগুলো।

মনে হ'ল এ সাক্ষাৎ গোপীবল্লভেরই কথা। তাঁরই নির্দেশ, তাঁরই সান্ত্বনা।

সে সবেগে সবলে—প্রায় পাগলের মতো রামরতিয়ার দুটো হাত চেপে ধরে। বলে, 'আমার মা একটা কথা প্রায়ই বলতেন, ছোটবেলার কথা হলেও অনেকবার শুনেছি বলেই মনে আছে। বলতেন, 'গুরু দু রকম—দীক্ষাগুরু আর শিক্ষা-গুরু। এই যেমন কাটোয়ায় কাঁসারিদের দেখেছি—একজন শুধু ঘটি তৈরি ক'রে দিচ্ছে, আর একজন তাতে নক্সা কেটে পালিশ ক'রে তাকে দামী ক'রে তুলছে।... তুমি আমার প্রকৃত দিদি, আমার শিক্ষাগুরুর কাজ করলে। আমি আজ সত্যিই পথ দেখতে পেলাম!'

সত্যিই পথ দেখতে পায় একটু একটু ক'রে।

মনকে ধ্যানে একাগ্র করা কঠিন, মন কেবলই ছড়িয়ে পড়ে, ইষ্টচিন্তার সূত্র ধরেই শাখা-পথে চলে যায়। কিন্তু যেখানে ইষ্ট দেহধারী মানুষ, আর পরিচিত, উগ্র কামনার ধন—সেখানে অল্প সময়েই কয়েক দিনের চেষ্টায় সহজে একাগ্র হয়ে উঠতে পারে। উঠলও তাই। দু'চার দিনের মধ্যেই মন সেই বিশেষ ইষ্টে সমাহিত হয়। তাঁর দেহের ও স্নেহের স্পর্শ পায় যেন সে সময়টায়।

আগে, ওর অল্প ক'দিনের স্বামীসঙ্গের দিনে যেমন পায়ে মাথা রেখে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করত—এখন ধ্যানে তাই করে। দীর্ঘ, দীর্ঘ কাল ধরে সেই পা দুটিতে মাথা আটকে থাকে। আসল জীবনে যা ক'রে নি, ইচ্ছে থাকলেও করতে লজ্জা হয়েছে—তাই করে, চুম্বন করে বার বার।

মন সেই দেহের প্রতিটি অঙ্গ অনায়াসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে।

মনে মনে ফুল দিয়ে পুজোও করে, পরিক্রমা করে—আর চোখের জলে বুক

অন্ত্যেদ / ॰

তার পর—আর একটু এগিয়ে যায়। এখানের পূজারীজী ভেতরের সামান্য একটুখানি উঠোনে দু'চারটি ফুলের গাছ আর তুলসীর গাছ করেছেন। ওঁর মহাবীরের পূজার ফুল-তুলসীর আহরণ শেষ হয়ে গেলে যমুনাও দু'চারটে এনে রাখে। অনেক কষ্টে উঠোন থেকে খুঁজে বয়ে-আনা একটা প্রায় চারকোণা পাথরকে ঘরে এনে এক পাশে একটা বেদীর মতো ক'রে নিয়েছিল। যমুনার জল এনে দিতেন পূজারীজী মধ্যে মধ্যে, তাই দিয়ে ধুয়ে মুছে রাখত। ধ্যান জপ শেষ হলে ফুল দিয়ে পূজো করে, স্বরূপকে পূজো করছে মনে হয়।

শাশুড়িকেও স্মরণ ক'রে পূজো করে সেই সঙ্গে।

এত স্নেহে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, এত যত্নে রেখেছিলেন, অত বড় আঘাত আর ক্ষতির পরও কোনদিন কটু কথা বলেন নি বা কাউকে বলতে দেন নি। যা করেছেন তা আর কেউই করত না। এ শাশুড়ি যদি দেবী না হয় তো আর দেবী কে? নিজের মা তো অবর্ণনীয় লাঞ্ছনাই করেছেন। একবারও ওর দিকটা ভাববার চেষ্টাও করেন নি। কাছে ডেকে নিভৃতে প্রশ্নও করেন নি। শাশুড়িই ওর আসল মা।

মাঝে মাঝে এ ভয়ও জাগে—জীবিত লোককে পূজো ক'রে তাঁর অকল্যাণ করছে না তো? এ ভাবে কি পূজো করতে আছে?

আবার মনে জোর আনে, গুরুজনরা তো শিখিয়েই দিয়েছিলেন বিয়ের সময় —স্বামী আর শাশুড়িকে নিত্য প্রণাম করতে। তাঁরা সর্বাগ্রে প্রণম্য। তা যদি হয় তো তাঁকে—তাঁদের—দেবতার আসনে বসিয়ে ফুল দিয়ে পূজো করা যাবে না কেন?

একদিন রামরতিয়াকে এর মধ্যে বলেছিল ওঁর একটা ছবির কথা। সে এতখানি জিভ কেটে বলেছিল, 'সে আমি পারব না বহুদিদি। ও কথা আর তুমিও মনে রেখো না। ···এতদিন পরে হঠাৎ বড়গোসাঁইদাদার ছবি চাইলেই নানান কথা উঠবে। বড়মার যা বুদ্ধি—তখনই হয়ত ধরে ফেলবেন অন্য কারও জন্যে চাইছি, আর জেরা শুরু করবেন। তা ছাড়া—তেমন ছবি কোথাও আছে কি না তাই বা কে জানে!'

অগত্যা সে আশা ছেড়ে দেয়। গুরু গোবিন্দকে ঠিক নয়, ইষ্ট আর স্বামীকে এক ধ্যানে আনবার, মিলিয়ে দেখার দুরূহ চেষ্টা করে। কিন্তু মনের মধ্যে স্বামীই একক হয়ে ওঠেন বেশির ভাগ সময়ই।

তবু, চেষ্টার অসাধ্য নাকি কিছু নেই। মা বলতেন প্রায়ই ছেলেবেলায়— 'মন কিছুতে বসাবার নিত্য অভ্যাস করলে একাগ্র হতে বেশী দেরি হয় না।'

॥ ১২ ॥

ভাল ফুল ফুটলে তার সৌরভে শুধু মধুপ নয় মানুষও টের পায়।

কবির ভাষায় "গন্ধ তার লুকোবে কেমনে ?"

বহু দূর পর্যন্ত সে বার্তা পৌঁছয়।

অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে অকারণে আত্মগোপন ক'রে থেকে কৃচ্ছ্রসাধন করছে, কেবল নাকি নুন দিয়ে পোড়া রুটি খেয়ে দিন কাটাচ্ছে—এ সংবাদে মহিলাদের মনে নিদারুণ কৌতূলের সৃষ্টি হওয়া স্বভাবিক।

বিশেষ বাঙালী মহিলাদের মনে। কারণ কৌতূহল ও আলোচনার পাত্রীটিও এ ক্ষেত্রে বাঙালী।

কেউ কেউ উপযাচক হয়ে এসে দেখা করেন, বিনা আমন্ত্রণেই সেই-কোনপ্রকার-আসনহীন অনাবরিত চৌকীতে চেপে বসেন। অবশ্যই হাতে জপের মালা থাকে—কিন্তু নানা ভঙ্গীতে, নানা ধরনের ভাষায়—কেউ ঘুরিয়ে কথার জাল বিস্তৃত ক'রে জানতে চান ব্যাপারটা, কেউ বা সোজাসুজিই প্রশ্ন করেন।

'কেন এমন ভাবে আছ মা (বা ভাই—বয়স হিসেবে), তোমার কি কেউ কোথাও নেই ? তা আজকাল তো লেখাপড়া শিখে মেয়েরাও নানা ধরনের কাজ ক'রে রোজগার করছে। তুমি কেন এত কষ্ট করছ ?'

কেউ বা অন্য পথে যান, 'তোমার কোন্ পন্থের দীক্ষা মা ? তুমি কি কোন তান্ত্রিক সাধনা করো ? গুরু কোথাকার ? তা তাতেও তো এ ধরনের কষ্ট করতে দেখি নি কাউকে !' কেউ জানতে চান এ কোন্ ধারার সাধনা ? কিন্তু "তোমাপানে ধায় তার শেষ অর্থখানি"—সকলেরই মূল প্রশ্ন এক, 'এত কস্ট করছ কেন অকারণ ?' অকারণ শব্দটার ওপর জোর দিয়ে।

এই হ'ল মূল বক্তব্য।

কিন্তু মেয়েটা নাকি বড় ঢ্যাঁটা। কারও ভাষায় দেমাকে, ওর বড় 'ঢিটাই' বা 'মিজাজ'*—কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেয় না। পাথরের মেঝেতে বসে থাকে মাথা হেঁট ক'রে, একটাও কথা বলে না। বসে থেকে থেকে নিজেদেরই নিঃশ্বাস নষ্ট হয় শুধু। অগত্যা এক সময় উঠে চলে যেতে হয়।

যারা একেবারে নাছোড়বান্দা, একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন বসে বসে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা—তাঁদের উত্তর দেয়, 'আমার কথা কাউকে বলার মতো নয় মা (বা মাসিমা কি দিদি, বয়স অনুসারে), এর বেশী কিছু বলতে পারব না।'

একদিন আর এক মূর্তি অন্য রূপ ধরে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন।

রণাঙ্গনেও বলা যায়।

বয়স হয়েছে, তবু এককালে যে রূপসী ছিলেন তা বেশ বোঝা যায়, সব চিহ্ন লুপ্ত হয় নি।

শুভ্র থান ধুতি, যত্ন ক'রে কুঁচনো ; লেস বসানো শৌখীন সাদা চাদর গায়ে জড়ানো ; সুডৌল নাসিকায় সযত্ন অঙ্কিত তিলক, হাতে 'কেটে' কাপড়ের কুঁড়ো-

---

* ঢিটাই হ'ল Obstinacy, শিরতেড়া ; মিজাজ হ'ল স্পর্ধা।

জালি—উগ্র অথচ সুমিষ্ট আতরের গন্ধ ছড়িয়ে এক স্ত্রীলোক অনাহূতে এসে হাজির হলেন।

অন্যদের মতো তিনিও অনভ্যর্থিত ভাবেই তক্তপোশে জেঁকে বসলেন। কিন্তু তখনই কোন কথা বললেন না। বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে জপ করার পর কুঁড়োজালি মাথায় ঠেকিয়ে—বোধহয় একবারের মতো একশো আট নাম জপ শেষ হ'ল—মুখে একটা সস্নেহ মমতা মাখানো শব্দ ক'রে—যা ঠিক চু-চু বা অন্য কোন শব্দ দিয়ে বোঝানো যাবে না, যা সত্যকার মা কি ঠাকুমা দিদিমারা করতে পারেন, জিভ আর টাকরার যোগাযোগে—বললেন, 'আহা-হা, মরে যাই মরে যাই ! বাছা রে ! তোমার এমন দশা কে করলে মা ! কোন্ সে বজ্জাত হাড়-হারামজাদা লোক !··· দুধের মেয়ে, কিছু জানে না—ভুলিয়ে বের ক'রে এনে এইভাবে ছেড়ে চলে গেছে ! যাবে বলেই এনেছিল সে তো বুঝতেই পারছি, বে করার জন্যে আনে নি, মিছি-মিছি কোথাও থেকে সিঁদুর পরানো ! তবু তোমার ভাগ্যি ভাল যে বাজারে বেচে দিয়ে পালায় নি। কোন পাকা বেশ্যের হাতে পড়লে চির-জীবনটা নরককুণ্ডে কাটত !···এ তবু ভগবানের স্থানে এসে পড়েছ—কী ভাবে এসে পড়লে জানি না—যাই হোক, তোমার মা-বাবার যথার্থ পুণ্যের শরীল, সেই জন্যেই আসতে পেরেছ !···গোবিন্দ গোবিন্দ, রাধারাণী তুমিই ভরসা মা !'

তারপর আবার কিছুক্ষণ চলল নিঃশব্দ জপ (এর মধ্যে যমুনার আপাদমস্তক নিরীক্ষণের বিরাম নেই), কিছুক্ষণ পরে আবার তেমনি স্নেহ ঝরে-পড়া কণ্ঠে বললেন, 'তোমার কথা শুনে পজ্জন্ত আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে ক'দিন। তারপর বলি, না, এমন ভাবে হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকলে তো চলবে না, যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। বাঙালীর মেয়ে, শেষে আরও কী দ'কে গিয়ে পড়বে !'

আবার একটু জপ। কিন্তু এবার মনে হ'ল একশ' আটের আগেই মুখ খুললেন, 'তা সে যাই হোক, রাধারাণীর আশ্রয়ে যখন এসে পড়ছে—তিনি দেখবেন বৈকি ! কিন্তু এমন ভাবে বসে থাকলে তো চলবে না মা। থাকা-খাওয়ার কষ্ট তো দেখতেই পাচ্ছি—ঘরের আসবাব আর রান্নার ব্যবস্থা দেখে। এখন কাঁচা বয়েস—সব সইছে, কিছুদিন এমন চললে শরীল যে জবাব দেবে। তখন ?···দুঃখু পেয়েছ, ঘা খেয়েছ ঠিকই—কিন্তু বয়েস তো আর ফুরিয়ে যায় নি। প্রেথমেই বজ্জাত লোকের হাতে পড়েছেলে সে তোমার অদেষ্ট। আছে, ভাল লোকও আছে। তুমি—তোমাকে আমি ভাল কাপড় জামা এনে দোব—তোমাকে সঙ্গে নে ক'দিন বড় বড় মন্দিরে ঘুরব—সন্ধ্যেকালে যেতে হবে, তখন সব ওখানকার গোসাঁইরা ভিড়ের ভেতরে ভেতরে ঘোরেন—কিম্বা পেছনের কোন এক জায়গা থেকে নজর রাখেন। পয়সার তো অভাব নেই—টাকার কুমির একো একো জন, চোখে ধরলেই হ'ল—আর ধরবেও—ব্যাস ! তোমার হিল্লে হয়ে গেল। ভাল আশ্রয় পাবে। বাড়ি দেবে, আলাদা চাকরাণী-চাকর রেখে—যাতে রাজরাণীর মতো থাকতে পারো সে ব্যবস্থা করবে। নিজের বে-করা পরিবারের মতোই রাখবে। যদি চাও ভেক নিয়ে কণ্ঠিবদল করাও আশ্চয্যি নয়, তেমন যদি চোখে ধরে !'

আবার কিছুক্ষণ জপ

'তবে বোকামি করা চলবে না। আগাম পাঁচ সাত হাজার নিয়ে কোন মহাজনের গদীতে রেখে দেবে, চাই কি আজকাল কি ব্যাঙ্ক হয়েছে, সেখেনেও রাখতে পারো—তা বাদে ছোট বাড়ি একটা লিখিয়ে নেবে, তার সঙ্গে অন্তত পঞ্চাশ ভরি সোনা। যাতে আখেরে না আবার মানুষ খুঁজে বেড়াতে হয়! জয় রাধে! জয় রাধে!'

এতকাল পরে নতুন ক'রে চোখে জল এসে যায় যমুনার।

সে আর থাকতে না পেরে ছুটে গিয়ে মহাবীরের সেই ছোট্ট মন্দিরটির দরজার সামনে বসে পড়ে। তখন পুজারীজী মন্দিরে ছিলেন না, তবে কাছেই ছিলেন—দেখা যাচ্ছে।

মহিলার চোখে বা মুখে কোন ভাবান্তরই দেখা গেল না।

আরও কিছুক্ষণ তেমনি নিঃশব্দে জপ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন, বেশ শ্রুতিগম্য ভাবেই বললেন, 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ! জয় রাধে! প্রাণের গৌরহরি আমার! আজ আমি যাই মা। অবিশ্যি হ্যাঁ, ঠিকই তো, একদিনে কি আর মন থির করতে পারো, আমি বললুম আর তুমি নেচে উঠলে! বলি বাজারের রাঁড় তো আর নও। এই প্রেথম, বড় একটা ঘা খেলে এত কাঁচ বয়েসে। তা আসব, পরে আবার আসব। আমার কিছু না, তবে কথাটা শুনে পঙ্জন্ত ছটফট্ করছি যে। পিতিজ্ঞে করিচি, তোমার একটা ভালরকম হিল্লে না ক'রে ছাড়ব না। গোবিন্দ হে, তুমিই ভরসা!'

চার ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই মাছ এসে টোপে টান দেবে—এমন আশা করতে নেই—'মহিলা' ঘাগী লোক, এ তথ্য তিনি জানেন। এরপর চার পাঁচ দিন আর এলেন না। যমুনা একেবারেই অনভিজ্ঞ এ সব ব্যাপারে, তার যা বাপের বাড়ি, 'কুটনি' শব্দটাও বোধহয় কখনও শোনে নি, এ ধরনের বইও পড়ার সুযোগ ঘটে নি—দুদিন দেখেই, আর আসবেন না মনে ক'রে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

কিন্তু তিনি আবারও এলেন।

তেমনি প্রায় অপরাহ্ন বেলায়, তেমনি সুসজ্জিত বেশে।

কেবল তাই নয়, এমনি শুধু হাতে আসেন নি। হাতে একটা মোড়ক।

এসে সেদিনের মতোই জাঁকিয়ে বসলেন, তারপর বিনা ভূমিকায় বা বাক্যব্যয়ে বাঁ হাতে মোড়কের কাগজটা খুলে দিলেন। ডান হাতে জপ চলছে তখন। অবশ্যই হরিনাম।

মোড়কের মধ্যে শাড়ি, সাধারণ সাদা তাঁতের শাড়ি নয়। বেশ অসাধারণ গোছের রুপোলী জরির কাজ করা আশমানী রঙের মূল্যবান বেনারসী শাড়ি, সঙ্গে ঐ কাপড়েরই জামা।

আক্রমণটা অতর্কিত, সবে যমুনা রুটি খেয়ে বাইরে থেকে আঁচিয়ে ঘরে ঢুকেছে। আজকাল তার এমনিই দেরি হয় খেতে—পুজো-ধ্যান করতে করতে যেন ডুবে যায়—এক এক সময় মনে হয় সত্যিই সে স্বামীসঙ্গ পাচ্ছে। তাই আর উঠতে

ইচ্ছে করে না আসন ছেড়ে। ফলে এই সময়টা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

হয়তো সে ঘোরটা এখনো কাটে নি সম্পূর্ণ। ব্যাপারটা বুঝতে সময় লাগল অনেক। কিছুক্ষণের জন্যে বিহ্বল হয়ে চেয়েই রইল।

ওর শুভার্থিনীও তা বুঝলেন, জপের মালা মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, 'তুমি সরল মেয়ে, রাধারাণীর আশ্রয়ে এসে পড়েছ—তিনি হিল্লে একটা করবেনই, যা সেদিন বললুম তোমাকে। তাই বলে এত শিগ্‌গির এমন আশ্রয় পেয়ে যাবে তা ভাবি নি। মস্ত বড় মন্দিরের গোসাঁই মা, টাকা কোথায় রাখবে ভেবে পায় না—বয়েস বেশী নয়, চল্লিশের কোঠায়। দেখতে সুপুরুষ, কোন নেশা ভাঙ করে না, সবে বৌ মরেছে—এমনিই সে কাউকে খুঁজছেল যে বৌয়ের মতোই থাকবে—ভদ্দর গেরস্ত ঘরের মেয়ে। ছেলে মেয়ে রয়েছে তো, সৎমা ঘরে এনে বসালে তাদের দুর্গতির শেষ থাকবে না। সে তোমার বিত্তান্ত শুনেই লাফিয়ে উঠল একেবারে। তার আর তর সইছে না। আগাম বাড়ি লিখে দেবে একখানা, দশ হাজার জমা ক'রে দেবে এক মহাজনের গদীতে, দু সেট সোনার গয়না।...বল্ মা, এ তাঁর কৃপা ছাড়া কিছু নয়।'

এতদিন চুপ ক'রে সহ্য করে গেছে সব—আজ কে জানে কেন, যমুনা আর সহ্য করতে পারল না। দুঃসহ ক্রোধে তার দুই রগের শিরাগুলো ফুলে উঠল, মাথায় যেন মনে হ'ল আগুন জ্বলছে—সেই সঙ্গে অপমানে চোখে জল আসতে চাইছে তার মধ্যেই,—সে বোমার মতো ফেটে পড়ল একেবারে, 'কেন আপনি এসব কথা রোজ শোনাতে আসেন বলুন তো! কে বলেছে আমাকে ভুলিয়ে বের ক'রে এনেছে! কে বলেছে আপনাকে আমার হিল্লে করতে! আমি সধবা বামুনের মেয়ে, মাথায় সিঁদুর হাতে লোহা শাঁখা—তা দেখেও কি বুঝতে পারেন নি! আপনি চলে যান, আর কখনও আসবেন না। নবদ্বীপের দিদির মুখে শুনেছিলুম এমনি সব আপনার মতো মেয়েমানুষ এইসব কাজের জন্যে ওৎ পেতে বসে থাকে, দু'টাকা রোজগারের জন্যে পরের উপকার করতে চায়।...আজ দেখলুম আপনাকে। ছিঃ ছিঃ, আপনারও তো বয়েস হয়েছে। এখনও এত লোভ টাকার! আমাকে তার কাছে বেচে দু'পাঁচ হাজার ঘরে তুলবেন, সেই জন্যে এত ঝুড়ি ঝুড়ি মিছে কথা! বেরিয়ে যান বলছি! নইলে আরও কটু কথা শুনতে হবে।'

তার তখনও রাগে সমস্ত শরীর কাঁপছে, মুখ চোখ আগুনের মতো লাল—একেবারেই উগ্রচণ্ডা মূর্তি।

মহিলা কিন্তু এত অপমানেও ক্রুদ্ধ হলেন না। বরং হাসলেন একটু।

'ওমা, অমন অনেক দেখেছি। কত এমন সতীপনা দেখলুম, তারপর আবার আমার কাছে এসেই হেঁইগো মশাই হেঁইগো মশাই করতে হয়েছে। যাক্ দু'দিন। তবে আমি যখন মন ঠিক করেছি তোমার এ দুর্গতি ঘোচাবই—তখন এত সহজে হাল ছাড়ব না। রাধে রাধে! তুমিই জান মা, কি করবে আর কি করাবে!'

কাপড়ের পুলিন্দাটা আবার কাগজে জড়িয়ে নিয়ে বেশ ধীরে সুস্থে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময়, বাইরে বেরিয়ে দোরের কাছ থেকে বলে গেলেন, 'একটু শুয়ে

পড় বরং। নইলে হয়তো ফিট হবে এখ্নুনি। দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে গড়িয়ে নাও একটু।'

॥ ১৩ ॥

আক্রমণ শুধু এক ধরনের নয়, কেবল মহিলাদেরই নয়।

আরও হ'তে পারে, অন্যরকম, অন্যরূপ—তা ক্রমশ বুঝল যমুনা!

কৃষ্ণচন্দ্রের এক পূজারী লীলাধর—তরুণ, বছর সাতাশ-আটাশ বয়স হবে। আগ্রায় ধাড়ি, সুশ্রী স্বাস্থ্যবান ছেলে—এ বাড়ির পূজারীজীর কাছে মাঝে মাঝেই আসে, অবসর সময়—বেশির ভাগই বিকেলের দিকে।

পূজারীজী দরিদ্র—প্রায় নিঃস্ব হলেও তাঁর পড়াশুনো আছে, সেদিকে আগ্রহও আছে। এখনও এদিক ওদিক থেকে—বিভিন্ন মঠ-মন্দিরে ভাল ভাল সদ্‌গ্রন্থ জমে আছে দীর্ঘকাল ধরে—চেয়ে-চিন্তে কিছু কিছু শাস্ত্রগ্রন্থ আনেন। পড়ে আবার ফেরৎ দেন বলে সে মন্দিরের কর্তারাও এখন নিশ্চিন্ত হয়ে এক এক সময় মূল্যবান পুঁথিও দেন।

পূজারীজী এক একদিন যমুনার কাছেই আক্ষেপ করেন, পুরনো শহরে কোন এক মন্দিরে স্তূপাকার করা দুষ্প্রাপ্য পুঁথি আছে, দেখাশুনোর অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

শাস্ত্রজ্ঞান আছে, তবে প্রচারে তত আগ্রহী নন। বোধ হয় অত বুদ্ধিও নেই, কি ক'রে প্রচার করতে হয় তাও জানেন না। শাস্ত্রজ্ঞ বলে খ্যাতি রটে গেলে এদেশে—বিশেষ তীর্থস্থানে—অর্থাগমের পথ খুলে যায়, সে সম্বন্ধেও অবহিত নন।

এই ছেলেটি—লীলাধর, নির্বোধ নয়। সে জানত এই সত্যটা, মানে এই বয়সেই সংসার ও সাংসারিক জীবনের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো বুঝে নিয়েছিল। পূজারীর পদে বেতন সামান্যই। ত্রিশ টাকায় পূজাও করতে হয়, রান্নাও। তবে ধনীর মন্দির বলেই এই বেতন। পূজারীও তিনজন, কারণ ভোগের পর্বটা এখানে বেশী। পূজো ও ভোগ রান্না এদেরই করতে হয়, পালা ক'রে। নইলে এত মাইনে রাজামহারাজাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরেও পাওরা যায় না। শুধু যারা পূজো করে, ভোগের লোক আলাদা কিম্বা মালিক ব্রাহ্মণ নিজেরাই রাঁধেন—তাঁদের অন্তত দুই কুঞ্জে কাজ করতে হয়, নাহলে নিজের খরচ চালিয়ে দেশে কিছু পাঠানো যায় না। অবশ্য একটা করে পারস এদের প্রাপ্য। একটা নিজে খায়—আর একটা মাসিক দু টাকা বা তিন টাকায় বিক্রী করে। কৃষ্ণচন্দ্রের পারসও কেউ কেউ বিক্রী করে—সেক্ষেত্রে চার টাকা পাওয়া যায় মাসে।

লীলাধর বুঝেছে শাস্ত্র পাঠ, তার আগে কিছু শিক্ষাও প্রয়োজন, এই বয়সে হয়ে উঠবে না। নতুন ক'রে পাঠ নিতে গেলে জীবনের আরও প্রায় পাঁচ-ছ বছর কেটে যাবে। অত ধৈর্য নেই। বিয়ে করেছে দেশে, বাবা মা আছে, টাকার প্রয়োজন

অনেক—আর টাকা রোজগারের পথ তার সামনে এই একটিই আছে—কথকতা করা, আর তাতে কিছু প্রতিষ্ঠা বা সুনাম অর্জন করতে পারলে প্রৌঢ় বয়সে গুরু-গিরি করা। আর সে কাজ যদি করতেই হয়, কথক হিসেবে জনপ্রিয়তা কি প্রতিষ্ঠা পাওয়া প্রয়োজন। আর তা পেতে হলে (একটা মূলধন আছে, ভাল চেহারা, তবে তাতে কুলোবে না) একটু-আধটু শাস্ত্রজ্ঞান, রামায়ণ মহাভারত তো আছেই—অন্য পুরাণের গল্পও জানা দরকার, আর সেই সঙ্গে ব্যঞ্জনে ফোড়নের মতো লাগসই দু'চারটে সংস্কৃত শ্লোকও।

সেই জন্যেই তার এই দীনহীন সদা-কুণ্ঠিত পূজারীজীর কাছে আসা। কোন কোন দিন হয়ত শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ে শুনিয়ে তার অর্থ বুঝিয়ে দিতেন আবার কোন দিন তেমন মনে হ'লে স্মৃতি থেকে বিভিন্ন পুরাণের গল্প শোনাতেন। কোন দিন বা মনু-পরাশর থেকে কিছু কিছু তাঁদের বিশেষ বিশেষ অনুজ্ঞা শোনাতেন। সব বুঝুক বা না বুঝুক—তাদের অর্থ বা মূল্য—লীলাধর একটা খাতা নিয়ে আসত, এই শ্লোকগুলো সেই খাতায় লিখে নিত, মানে সুদ্ধ। এই জন্যেই সে বালির কাগজের একটা মোটা খাতা ক'রে খেরোয় বাঁধিয়ে নিয়েছিল। পূজারীজী অবশ্য ওর এত মতলব জানতেন না, তিনি ওকে জ্ঞানপিপাসু ভাবতেন এবং এতকাল পরে ভক্তিমান শ্রোতা পেয়েই খুশী ছিলেন।

এর পরিবর্তে পয়সাকড়ি বা মহাবীরের প্রণামী দেবার মতো অবস্থা তার নয়। তবে মাঝে মধ্যে একটা ক'রে 'পারস' বা এমনিই কিছু মিষ্ট প্রসাদ এনে দিত। কৃষ্ণচন্দ্রের সারাদিনের সেবায় একুশ রকমের ভোজ্য আবশ্যিক ছিল। বেশী হতেও আপত্তি নেই। জগন্নাথদেবকে ছাপ্পান্ন রকমের খাদ্য দেওয়া হয় ছ'বারে ভোগের উপাদান মিলিয়ে। এঁর মধ্যাহ্ন ভোগেই একুশ রকম।

এই সব দিনগুলোয় পূজারীর খুশির সীমা থাকত না। তাঁর মহাবীরের ভাগ্যে রুটি ও আলুর ভর্তা ছাড়া বিশেষ কিছু জুটত না, মিষ্টান্ন হিসেবে সঙ্গে একটু গুড়। এইসব হঠাৎ-চলকে-পড়া সৌভাগ্যের দিনগুলিতে—যমুনা আসার পর কিছু কিছু ভাল মিষ্টান্ন বা ব্যঞ্জন যমুনাকে দিয়ে যেতেন, জোর ক'রেই।

'ইয়ে পরসাদ হ্যায় মাতাজী, ইয়ে ওয়াপস দেনে সে পাপ হোগা, সাক্ষাৎ ভগবানজী কো অপমান হোতা হ্যায় উসমে—'

মেয়েটা কি খায় তা পূজারীজী জানতেন, এক এক দিনে চোখে জল এসে যেত তাঁর। এমনি একটি মেয়ে তাঁরও ছিল, বিয়েও হয়েছিল, তেরো চোদ্দ বছরে বিধবা হয়েছে। নিজের মেয়ের কথা মনে পড়েই আরও ব্যথা বোধ করেন এই প্রায়-বিধবার জন্যে।

এই প্রসাদের ভাগ দিয়ে আসা লক্ষ্য ক'রেই লীলাধর সচেতন হয়ে ওঠে, এখানের দ্বিতীয় বাসিন্দা সম্বন্ধে।

আর সচেতন হলে সক্রিয় হয়ে উঠতে দেরি হবে কেন?

চোখে পড়ে, একদিন ভাল ক'রেই দেখতে পায়। পুরো চেহারাটাই।

সাধারণত লীলাধর আসে দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর, দেড়টা দুটো নাগাদ,

কদাচিৎ আড়াইটেও হয়ে যায়, চারটের মধ্যে চলে যেতে হয় তাকে। এর মধ্যে ঘর থেকে বাইরে আসার কোন প্রয়োজন ঘটে না।

কিন্তু দৈবাৎ এক এক দিন প্রাকৃতিক প্রয়োজনও তো হয়ে পড়ে। অবশ্য সে সময়গুলোয় মাথাতে অনেকখানি ঘোমটা টেনে সাবধানে সর্বাঙ্গ ঢেকেই বেরোত সে, তাই বলে কোনদিন একটু অসাবধান কি অসম্বৃত হয়ে পড়বে না তাও সম্ভব নয়।

'আহা হা!' লীলাধর সেদিন কিছুক্ষণ স্থির হয়ে চোখ বুজে বসে থেকে পুনশ্চ বলে উঠল, 'আহা হা,—কী দেখলাম গুরুজী, এ কী দেখালেন কৃষ্ণচন্দ্র! এ তো সাক্ষাৎ রাধারাণী! তাঁরই অংশে জন্ম। এ ওঁর মুখের জ্যোতিতেই তো বোঝা যায়। শুধু মুখেই বা কেন—দেখলেন না, চারিদিকে যেন একটা জ্যোতির ছটা ঘিরে রেখেছে!'

পূজারীজী কোন প্যাঁচের ধার যারেন না, সরল মানুষ, বললেন, 'তা এক রকম তাই, বলতে পারো। তাঁর মতোই এই বয়সে কেঁদে কেঁদে দিন কাটে মেয়েটার!'

'কাঁদবেন বৈকি! কাঁদতেই তো আসা ওঁর। এ প্রেমের আনন্দের স্বাদ কি তিনি দেহ ত্যাগ করলেই ভুলতে পারেন? সে লীলা বার বারই আস্বাদ করতে ইচ্ছে করে যে! ভগবান গোবিন্দই গৌরের দেহ ধারণ ক'রে কাঁদতে এসেছিলেন, রাধার প্রেম আস্বাদ করতে, সেদিন গোপীনাথ মন্দিরে এক প্রভুপাদ, বড় নামকরা গোস্বামী এসেছিলেন, কথকতা করছিলেন, তাঁর মুখেই এ কথা শুনেছি। তার পাল্টা জবাব দিতে রাধারাণীকে আসতে হবে না?…তিনি কখন কার ঘরে কি ভাবে আসেন তা কি কেউ বলতে পারে?'

পূজারীজী বিহ্বল ভাবে শোনেন, তাঁর গায়ে কাঁটা দেয়।

এর পর প্রসাদের বৈচিত্র্য ও পরিমাণ বেড়ে যায়।

প্রায়ই আসে একটা পুরো পারস। তাও, ঐ একটা পারসেই কোন কোন দিন দু'খুরি ক্ষীর, দু'খুরি ক্ষীরসা থাকে।

এই প্রাচুর্য দেখে সরল মানুষ পূজারীজীও হাত খুলে বেশী ক'রে দেন যমুনাকে। নিজে বয়ে এনে ওর ঘরে পেঁছে দেন।

এর গূঢ়ার্থ বুঝতে বাকী থাকে না যমুনার। এতদিন একেবারেই সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল। এখানে আসার পর যা যা ঘটল তাতে অনেক কিছু শিখেছে সে, নবদ্বীপে অতদিন থেকেও এত শেখে নি। কারণ ওখানে মোহিনী ছিল ওকে অনেকটা আড়াল ক'রে।

দু'একদিন দেখে সে হাত জোড় করে। বলে, 'এত আমি খেতে পারি না। কখনই খাই নি। এখন তো আরও পারি না—মরা পেট। সহ্য হবে না।'

'আমারই বা এত কি হবে মা। কে খাবে! এ তো আমি দুবেলা খেয়েও শেষ করতে পারব না।'

'তাহলে বরং মাধুকরীতে দিন। অন্য কোন গরীব লোক ডেকে তাকে পেটভরে

খাইয়ে দিন। আর আপনার ছাত্রকেও নিষেধ ক'রে দিন এত দিতে। বলে দিন যে এসব প্রসাদ নষ্ট হয়, মিছিমিছি এত দেন কেন ?'

বলে একটু থেমে আবারও বলে, 'এ উনি পানই বা কোথা থেকে ? কিছুদিন ধরেই দেখছি হঠাৎ বড় বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে। উনি তো—আপনি যা বলেন, তিন নম্বর পূজারী, ছোট পূজারী—ওঁর তো এত পাওয়ার কথা নয়। উনি নিজে পয়সা খরচ ক'রে অন্যের পারস কিনে দেন না তো ! আপনি একটু কড়া হোন এবার—এমন ভাবে প্রশ্রয় দেবেন না।'

শেষের দিকে ওর গলাও একটু কড়া শোনায়। বলবার ভঙ্গীও।

পূজারীজী এত বোঝেন না—তিনি অপ্রতিভের মতো মাথা চুলকোন।

ঘা খেতে খেতেই মরীয়া হয়েছে যমুনা, কঠিন হতে শিখেছে। প্রত্যাঘাতও করতে হবে প্রয়োজন হলে। সর্বদা কুণ্ঠিত বিনম্র হয়ে থাকলে সংসার চলে না।

নবদ্বীপে এমন নগ্ন লালসা বা নির্লজ্জতার মুখোমুখি হতে হয় নি—তার কারণ মোহিনী তাকে যতদূর সাধ্য এসব থেকে আড়াল ক'রে ছিল। এমন বোধ হয় হ'তও না। একটু শিস দেওয়া কি জানলার সামনে ঘোরাঘুরি করা—তাতেই সে উগ্রচণ্ডা মূর্তি ধরে তাদের শাসন করেছে, শেষের দিকে বিশেষ কেউ আর বিরক্তও করত না। হাল ছেড়ে দিয়েছিল। এক হরেকৃষ্ণ, ছোঁক ছোঁক ক'রে বেড়াত, তবু—মোহিনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর তীক্ষ্ণতর বাক্যাঘাতের ভয়ে বেশীদূর এগোতে ভরসা পেত না।

ওটা গা-সওয়া হয়ে গিছল।

এটা সেও বুঝেছিল।

হরেকেষ্ট যে বেশীদূর এগোতে সাহস করবে না, একেবারে অনভিজ্ঞ আর প্রচণ্ড অকল্পিত আঘাতে বিমূঢ় অবস্থা হলেও কেমন ক'রে বুঝতে পেরেছিল আপনা-আপনিই।

বৃন্দাবনে এসেও প্রথম ক'মাস নিশ্চিন্ত ছিল, কোন উপদ্রব হয় নি, হতে পারে তাও ভাবে নি।

নিরালায় তপস্যা করছিল—নিজের মনে, নিজের মতো ক'রে।

তারপরই এইসব উপদ্রব শুরু হ'ল। তার 'উপকার' করার তিক্ত প্রচেষ্টা।

আর চলতেই লাগল সে প্রচেষ্টা। থেকে থেকেই।

কখন কোন্ দিক দিয়ে কি ভাবের আক্রমণ হবে তা ঠিক না থাকায় আরও ভয়ে ভয়ে, আরও অস্বস্তিতে থাকে।

তাতেই ক্রমে মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে এই জ্ঞানোন্মেষ হ'ল। বুঝতে চিনতে শিখল পৃথিবীকে, সংসারকে। মানুষ যে এমন হয়—এত লালসার্ত, লোভী, এত স্বার্থপর, এত মিথ্যাচারী, এত মতলববাজ—তা তো এতকাল ধারণার অতীতই ছিল।

তার ফলেই লীলাধরের এই আকস্মিক মুক্তহস্ত গুরুদক্ষিণার পিছনে কি আছে, সে সম্বন্ধে একটা কুটিল সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। আর তার ফলেই এই কণ্ঠস্বরের কাঠিন্য।

পূজারীজী অবশ্যই এমন ভাবে বলতে পারেন নি।

এ স্বভাবই তাঁর নয়। তিনি যেন নিজেকে সর্বদাই অপরাধী ভাবেন, সর্বদাই সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত ভাব তাঁর।

তবু মাথা-টাথা চুলকে তাঁর নাম ক'রেই বলতে হয় কথাটা।

লীলাধর অতি সহজেই বোঝে—এ উষ্মতার মর্মার্থ।

ও পক্ষও যে আর অত সরল নেই—সেটা বুঝে সতর্ক হয়। বাড়াবাড়ি বন্ধ করে, তবে হাল ছাড়ে না।

ভাল জিনিস পেতে হলে তাড়াহুড়ো করতে নেই। বাধা তো আসবেই, ধৈর্য ধরে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

হাত কমায়, অর্থাৎ প্রসাদের পরিমাণ কমে। প্রতিদিনও আর দেয় না। তবে যা দেয়—তা থেকে যাতে বেশ খানিকটা ও-ঘরে পেঁছিতে পারে, সে হিসেব ঠিক থাকে।

যমুনাও সেদিন পূজারীজীকে কথাগুলো বলে—প্রায় ধমকই বলা যায়—লজ্জিত হয়েছিল। সরল, ভালমানুষ, শুভার্থী, স্নেহপরায়ণ। ওঁকে আঘাত দেওয়া অপরাধতুল্য।

সে আর এ নিয়ে বেশী তেতো করে না। তবে মিঠাই পেঁড়া জাতীয় প্রসাদ তুলে রাখে—রামরতিয়াকে দিয়ে দেয়। সে তো দু'দিন একদিন অন্তরই আসে।

লীলাধরও 'সাক্ষাৎ রাধারাণী'র ধ্রুবপদটা ছাড়ে না। মাঝে মাঝেই গলাটা অতি সামান্য চড়িয়ে সরল প্রশ্ন করে, 'রাধারাণীজী কেমন আছেন গুরু মহা-রাজ? তেমনি প্রচণ্ড তপস্যা চলছে ওঁর? আহা, সাক্ষাৎ শক্তি যে, মহামায়ার অংশ, কী বিপুল শক্তি। নিজেদের স্বরূপ তো প্রকাশ করেন না—তা হ'লে সে তেজেই আমরা যে ইতর-সাধারণ ভস্ম হয়ে যেতাম!'

কোন কোন দিন বলে, আপনিই তো শাস্ত্রবাক্য পড়ে শুনিয়েছেন গুরুজী, সবই সেই এক আদ্যাশক্তি, মহামায়া। তিনিই বহু রূপে বহু নামে আবির্ভূতা হন। রাধারাণীও তো শক্তিরই এক রূপ। আহা হা!'

কোন দিন বা বলে, 'গুরুজী, ওঁকে বলুন এতটা গিয়ান ওঁর, ভক্তি আর তপস্যা যে কতদূর নিয়ে যাওয়া যায়, কত উঁচুতে ওঠে—সেটা একটু সাধারণ মানুষকে, আমাদের মতো আনপঢ় অগিয়ান লোকদের মধ্যে দান করা উচিত ওঁর। উনি আদেশ করলে আমি—মানে আমরা পাঁচজনকে জানালেই সে খরচ উঠে যাবে—এখনই আশ্রম বানিয়ে দিতে পারি। উনি যদি উপদেশ দেন, শিক্ষা দেন—বহু ভক্ত শিষ্য আসবে—ওঁকে কিছুই করতে হবে না—সব কিছু আপনিই হয়ে যাবে।'

'আমি ওঁর সেবক হয়ে থাকব, ওঁকে আশ্রমের দিকে তাকাতে হবে না'—এ কথাটা যোগ করতে গিয়েই সামলে নেয়। ও পক্ষ যে তাকে কিছুটা চিনেছে সেই তথ্যটা মনে পড়ে যায়।

এমন ঈষৎ-উচ্চকণ্ঠে বলে, যা ইচ্ছাকৃত বা চেষ্টাকৃত মনে হয় না, অথচ ও ঘরের

শ্রুতিগম্য হয়।

পূজারীজীকেও সে চিনে নিয়েছে। তাঁর যে ও কথা বলতে সাহস হবে না, তা জেনেই, এইটুকু গলা উঁচু করে।

এই ধরনের কথাই চলছিল মধ্যে মধ্যে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়। প্রতিষ্ঠা যশ সম্মানের লোভ দেখিয়ে। তাতে যখন কোন সাড়াই মিলল না, একদিন অন্য পথ ধরল।

কত্তকটা হতাশ হয়েই হয়ত। কিম্বা ধৈর্যের বাঁধ আর রাখা যাচ্ছিল না।

হঠাৎই একদিন যমুনার ঘরে ঢুকে পড়ে—এর আগে কোনদিনই সাহস হয় নি—গায়ের পিরানটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একেবারে নগ্নগাত্রে হাঁটু গেড়ে বসে ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে অর্ধনিমীলিত নেত্রে চেয়ে আদ্যাশক্তির স্তব শুরু করে দেয়।

তুমিই সেই মহাশক্তি, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণা তুমিই সেই মহাদেবী—জগৎ উদ্ধার করতে আবির্ভূতা হয়েছ—ইত্যাদি।

সুগৌর সুগঠিত পেশীবহুল দেহ; দেখার মতোই—তাতে সন্দেহ নেই। কোথাও অতিরিক্ত মেদ নেই, কোথাও অভাবও নেই। আদর্শ পুরুষ দেহের জন্যে যেখানে যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই আছে।

ভাদ্র মাস। এমনিতেই গুমোট—তাতে আবেগ, কামনা এবং কিছু আশঙ্কাও—আশার এই শেষ দানও যদি ব্যর্থ হয়—দেখতে দেখতে বুক পিঠ কপাল ঘেমে ওঠে, সে ঘাম দরদর ধারে গড়িয়ে পড়তে থাকে—কিন্তু লীলাধরের থামলে চলবে না। সে স্তব করেই যায়, কোন্ স্তবের সঙ্গে কোন্ স্তব যুক্ত হচ্ছে তাও হিসেব করে না।

এত কি এই নওজওয়ান ছোকরী বুঝবে?

ওঁর তপস্যা তো দিল্‌এ। পড়াশুনো আর কতটুকু?

যমুনা এখন অনেকটাই অভিজ্ঞতা—তা থেকে মানবচরিত্রের জ্ঞান লাভ করেছে। এ যে চরম লোভ দেখানো তাও বুঝতে পারে। ইদানীং বুঝতে শিখেছে। নিজেকে দিয়েই বুঝছে খানিকটা।

প্রথমটা তেমনি অপরিসীম ক্রোধ জেগেছিল কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিল।

কঠিন থেকে কঠিন হয়ে উঠল শুধু মুখখানা। দৃষ্টিও।

কিন্তু বাধা দিল না, প্রতিবাদ করল না। ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ারও চেষ্টা করল না। স্থির হয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল।

এক সময় তো থামতেই হবে। ক্লান্ত হয়েই থামতে হবে।

থামলও। দু হাত জোড় ক'রেই চাইল ওর মুখের দিকে—ভিক্ষার্থীর মতো।

যমুনাকে এই মুহূর্তের বুদ্ধি কে যোগাল কে জানে, পরে মনে হয়েছে, এ ওর ইষ্টেরই করুণা, তিনিই ওকে আত্মরক্ষার শক্তি যুগিয়েছেন।

মুখে ভাষা ও মাথায় বুদ্ধি।

এক পা কাছে এগিয়ে গিয়ে, বেশ শান্ত ভাবেই বলল; হিন্দীতেই বলল, 'বাবা,

তুমি তো আমাকে আদ্যাশক্তি বললে, মহামায়া, জগজ্জননী। তাই যদি হয়, যদি সত্যিই তা বিশ্বাস করো এ যদি মিথ্যে ছল না হয়—আমি তোমারও মা। তুমি আমার সন্তান। পুরুষের কাছে—মা আর কন্যা, দুই রূপই এক নয় কি? বাবা, আমি কন্যারূপেই তোমার শরণ নিচ্ছি, তুমি এই সব প্রলোভন থেকে, এই সব যন্ত্রণা থেকে আমাকে বাঁচাও, আমাকে রক্ষা করো। আমি তোমার মা, তোমার মেয়ে—তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি!'

কিছুক্ষণ মূর্ছাহতের মতো চোখ বুজে বসে রইল লীলাধর, একেবারে পাথরের মতো। মনে হ'ল কোন জ্ঞান নেই, জীবিত কি মৃত—সন্দেহ হয়।

শ্রান্তিতে ভেঙে পড়েছে তো বটেই, পরস্পরবিরোধী আবেগেও।

প্রচণ্ড আঘাতে বুঝিবা বুকের স্পন্দনও থেমে গেছে।...

তার পর—মূর্ছা থেকে জাগবার মতোই একসময় চোখ খোলে। পাথরের ওপরই সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে প্রণাম করে যমুনাকে, তবে পায়ে হাত দেয় না, স্পর্শ করার চেষ্টা করে না। ঘামেতে ধুলো মিশে কাদা হয়ে যায় সর্বাঙ্গে—সে হুঁশও নেই ওর।

অনেকক্ষণ এই ভাবে পড়ে থাকার পর উঠে পড়ে বলে, 'তাই হবে মা, তুমি আমাকে সন্তান বলেছ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষাই দিয়েছ। আমিও বলছি, কেউ আর যাতে তোমাকে বিরক্ত না করতে পারে, তোমার তপস্যায় বিঘ্ন না ঘটায়—এবার থেকে আমিই তা দেখব। জান দিয়েও। আমি আর তোমার সামনে আসব না—কিন্তু যখনই দরকার কি বিপদ বুঝবে—এই সন্তানকে স্মরণ ক'রো—ছুটে আসব।'

সে আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে যায়, কোনমতে পিরানে গা ঢেকে, পূজারীজীর দিকেও তাকায় না।

যমুনাও এবার চৌকিতেই বসে পড়ে—অবসন্ন দেহে ও মনে।

॥ ১৪ ॥

ইংরাজী ১৯২৪ সালে পুজোর আগে, দুর্গাপঞ্চমীর রাত্রি থেকেই সর্বনাশা বন্যা দেখা দিল গঙ্গা ও যমুনায়।

এ এক অভিনব ঘটনা।

অপ্রত্যাশিত, অস্বাভাবিক।

গঙ্গার জল বাড়ে, কাশী পাটনা ঐসব অঞ্চলে বেশির ভাগ বছরই বিপদ সীমা লঙ্ঘন করে, শহরে নৌকা চলে—কাশীতে এক উচ্চতার সীমা আছে, তাকেই বিপদ সীমা বলতে পারেন, তার ওপর জল উঠলেই বলা হয় 'ইন্দ্রদমন'—কিন্তু সে এসময় নয়, আষাঢ় শ্রাবণ মাসেই হয় অধিকাংশ সময়। হয়ত ভাদ্রেও বাড়ে অকস্মাৎ। তা ছাড়া বেশি বাড়ে নিচের দিকেই, উপনদীর উপরন্তু জল যোগ হয়ে। হরিদ্বার অঞ্চলে জল বাড়লেও ঘর বাড়ি ডুবিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তা এর আগে শোনা যায় নি।

যমুনাতে তো জলই থাকে না। যা একটু জল পাওয়া যায় তা এই বর্ষায়, তার পরই আবার শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হ'তে থাকে—আমি বলছি বিশেষ ক'রে বৃন্দাবনের কথা—সামান্য একটু পার্বত্য ঝর্ণা বা বড় নালার মতো জল। বাঁধানো ঘাট থেকে বহুদূরে, কচ্ছপে বোঝাই—বড় বড় ধাড়ি কচ্ছপ, বোধহয় শতাব্দীর ওপর বয়েস তাদের—ব্রজবাসীরা এসে জলে দাঁড়িয়ে পায়ে ক'রে ঠেলে বা হাতের বড় লাঠিটা দিয়ে সরিয়ে দিলে যাত্রীরা কোনমতে দুটো ডুব দিয়ে নেন। সেজন্যে এ শহরে কোন নৌকো নেই। মথুরাতে ঘাটের ধারে জল, তাও মাঝে মাঝে বড় চড়া বলে নৌকো সেখানেও বেশী নেই। বৃন্দাবনে রঙ্গজীর বাগানবাড়িতে যখন তাঁর প্রতিনিধিরূপে সুবর্ণমূর্তি দুবেলা বেড়াতে যান দোলের সময় পাঁচ-ছ'দিন কি বৈশাখে কোন কোন বিশেষ তিথিতে, তখন নৌকোয় চড়েন তিনি জলবিহারের উদ্দেশ্যে। সে জন্যে একটা পুকুর কাটানো আছে, সেই পুকুরের সঙ্গে মানানসই একটি ছোট নৌকো। সে নদীতে—বিশেষ প্রবলা নদীতে—চালাবার মতো নয়।

অর্থাৎ এই রকম ভয়াবহ সর্বনাশা আকস্মিক বন্যা সামলাবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না তখন।

এটা এত অতর্কিতে নেমেছে, এতই আকস্মিক—মনে হয় ওপরের দিকে পাহাড়ে কোথাও কোন "ক্লাউডবার্স্ট" মতো হয়েছিল। যেমন সাম্প্রতিক কালে বছর কতক আগে কাশ্মীর পহেলগাঁওতে এক ঘণ্টার মধ্যে বড় বড় ইমারৎ হোটেল-বাজার সব ভাসিয়ে ভেঙে শহরটা প্রায় বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল।

অবশ্য পাহাড়ে এত বড় রকমের কিছু না হলেও এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি—ঋষিকেশ থেকে লছমনঝুলা যাওয়ার পথে চন্দ্রভাগা বলে এক নদী পড়ে। (উড়িষ্যাতেও চন্দ্রভাগা নদী আছে, কোণারকের কাছে, সে এত শীর্ণ নয়।) বেশির ভাগ দিনই নদী শুকনো থাকে, তখন বর্ষার প্রবল স্রোতে ভেসে আসা বড় বড় পাথরের নুড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হ'ত। বর্ষায় জল বাড়ে, তবে সেও বড় জোর বুক-সমান জল, পার হওয়া যায়। এখন বাঁধানো পুল হয়েছে। গাড়ি বাস লরী সব চলে যায়। কেউ লক্ষ্যও করে না।

১৯১৯ সলের এপ্রিলে আমরা প্রথম ঋষিকেশ যাই। যে দিন গিয়ে পেঁছিলুম শুনলুম তার আগের দিন একটা বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ঋষিকেশে কালিকমলী বাবার নামাঙ্কিত সুবৃহৎ এক ধর্মশালার সঙ্গে একটি সত্র বা ছত্রও আছে সাধুদের জন্যে। বেলা এগারোটা নাগাদ সাধুরা এসে ভাত ডাল রুটি নিয়ে যান। বড় বড় ছ'খানা ক'রে রুটি, বিরাট এক হাতা ক'রে ভাত আর খানিকটা ক'রে ডাল। কোন কোন দিন আলুর ভর্তা কি অন্য কোন সবজির 'শাক' মেলে। এই 'ভিক্ষা' নিতে দূর-দূরান্তর থেকে সাধুরা আসতেন। তখন এত ছত্র ছিল না। এখন বহু ছত্র হয়েছে। তেমনি খাতায় নাম লিখে গোনাগাঁথা সাধুকে দেন। কালিকমলীর বিরাট ব্যবস্থা।

চন্দ্রভাগার ওপার থেকে অনেক সাধু আসেন প্রতিদিন। এক এক জন পাঁচ

ছয় সাত জনের খাদ্যও নিয়ে যান। এসে দাঁড়ালে প্রশ্ন হয়, ক' মূরৎ ? অর্থাৎ কটি মূর্তি বা ক'জন ? কেউ বলে পাঁচ কেউ বলে ছয়, সেই মতো দেওয়া হয়।

সেদিনও তেমনি আসছিলেন, ঐটুকু তো নদী, শীর্ণকায়াই বলতে হবে—তিন চার দল বিভিন্ন দিক থেকে আসছেন, মাঝামাঝি পৌঁচেছেন, হঠাৎ পর্বতসমান জলধারা নেমে তাঁদের কোথায় যে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, তা কেউ জানে না। দু-তিন দিন বাদে হরিদ্বারে গঙ্গার পাড়ে, জলের মধ্যেও কটা দেহ পাওয়া গেল। জলের মধ্যেও বড় পাথরের খাঁজে আটকে যায় কখনও কখনও।

এ সবই ক্ষণিকের ব্যাপার। আমরা পরদিন ভোরবেলা যখন গিয়েছি তখন এক জায়গায় পায়ের চেটো ডোবা জল ছাড়া আর কোন চিহ্নও নেই সে সাংঘাতিক স্রোতের।

কিন্তু পাহাড় থেকে এত দূরে, বৃন্দাবনে এমন সাংঘাতিক বন্যা নামবে—এদের ভাষায় 'বাঢ়'—তা কে জানত !

কনখলে পঞ্চমীর রাত্রিতেই নেমেছে জল, উন্মত্ত—যেন ষাঁড়ের মতো গুঁতো-গুঁতি করতে করতে—নদীর ধারে যাঁরা থাকতেন, নিচু ঘরে কি ঝোপড়ায়—তাঁদের চিহ্নও থাকে নি। গভীর রাতের ঘটনা। তখন সবাই ঘুমে অচেতন, জল নামার গম্ভীর গর্জনও অত কানে পেঁছয় নি। পেঁছলেও এ গর্জন কিসের বুঝে সে তন্দ্রাবিহ্বল অবস্থায় নিরাপদ স্থানে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন নি।

বহু সাধু মারা গেছেন, যে সব ছোট ছোট কুটিয়া ছিল তার চিহ্নও নেই। তাই বা কেন—বৃন্দাবনের কেশবানন্দ স্বামীর একটা পাকা আশ্রমও ছিল কনখলে নীল-ধারার পাড়ে—তারও চিহ্নমাত্র দেখা যায় নি—জল নামার পর।

এখানে ষষ্ঠীর দিন সকালে সেই বন্যার প্রাথমিক চেহারাটা প্রকাশ পেল। ক্রমে দিন যত বাড়তে লাগল সর্বনাশের আসন্ন চেহারাটাও অনুমান করা গেল। রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতাল ছিল নদীর তীরে পানিঘাটে—আগের রাত্রেই বিপদ বুঝে কোন-মতে তাঁরা রোগীদের নিয়ে কালাবাবুর কুঞ্জে তুললেন (শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রিয় ভক্ত বলরাম বসুদের ঠাকুরবাড়ি), মোটামুটি দরকারী জিনিসও সরানো হ'ল। তবু কিছু কিছু খাদ্যসামগ্রী, কাগজ খাতাপত্র অনেক নষ্ট হ'ল।

বিকেলের দিকে করাল চেহারাটা ফুটে উঠল। দিকে দিকে হাহাকার শুরু হ'ল। কত ঘরের চাল, বড় বড় গাছ ভেসে যাচ্ছে, তাতে লোকও আশ্রয় নিয়েছে যে পেরেছে—তারা কাতর কণ্ঠে চিৎকার করছে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে। কে কাকে বাঁচাবে ? একটি ছোট নৌকো তাতে দু'চারজন লোক উদ্ধার করা যায়। কিন্তু নৌকো যদি দরিয়ার মাঝখানে পড়ে কেউ সামলাতে পারবে না। যা দু-একজন ধারে কাছে পড়ছে তাদের টেনে তোলা গেল—সে বোধহয় বিপন্ন মৃত্যুপথযাত্রীর দু' শতাংশও নয়। এক পাঞ্জাবী সাধু, বলিষ্ঠ শরীর, ওরই মধ্যে সাঁতার দিয়ে ঐ পানিঘাট অঞ্চলটায় দু'একটা ভেসে যাওয়া গরু মোষ ঘোড়াকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসছিলেন—সন্ধ্যার দিকে তিনিও হার মানলেন। তখন মথুরা রোডের বড়

রাস্তাতেই বুক-সমান জল এসে গেছে।

সারা রাত ধরে চলল সে হাহাকার, আর্তনাদ এবং মধ্যে মধ্যে বাড়ি ভেঙে পড়ার শব্দ। জলাভাবের দেশ, বর্ষা বিরল। মাটিও খুব শক্ত, তাই অধিকাংশ পাকা বাড়িও গাঁথা হ'ত মাটি দিয়ে। বন্যার জল যত ভেতরে এগোচ্ছে, উঠছে ওপরের দিকেও, তত মাটি ভিজে গলে ভারী পাকা বাড়িগুলো ভেঙে পড়ছে। বরং যাদের মাটির দেওয়াল—এসব দেওয়াল পুরুই হয়—খাপরার চাল, তাদের সব মাটি গলে যেতেও সময় লাগছে। আর তাদের ওজনও তো এত বেশী নয়।

পাথরের বাড়ি বা মন্দির বা যাদের বাড়ি ভেতরে ইটের দেওয়াল হলেও বাইরে পাথর দেওয়া - তাদের বিপদ কম। এত ভারী ইমারত কেউ মাটিতে গাঁথত না। চুন সুরকি দিয়েই গাঁথা হ'ত। মেঝেও চুন পেটা—বিলিতি মাটির মেঝে সবে শুরু হতে আরম্ভ হয়েছে তখন—দু-চারখানা বাড়িতে মাত্র হয়েছে। বড় বড় অনেক বাড়ির মেঝেও পাথরের ছিল।

কেশবানন্দ স্বামীর প্রতিষ্ঠিত রাধাবাগের কাত্যায়নী বস্তুত দুর্গা মূর্তিই। সেই মতোই দেবীর পুজো হয়—সন্ধিপুজো প্রভৃতি সমস্ত ঠিক ঠিক, আয়োজনও বিশাল। বহু লোক নিমন্ত্রিত, সে সব স্তূপীকৃত বস্তু নষ্ট হ'ল। একতলার ঘর থেকে সামনের দোতলায় বা তার ছাদে মানুষ মাল যতটা সম্ভব সরানো হ'ল। কিছু কিছু মিষ্টান্ন তৈরী হয়েছিল, তাও উঠল, তাই খেয়েই জীবনধারণ করতে হবে অন্তত।

স্বামীজী একাই মন্দিরে রইলেন। মন্দির বেশ উঁচু। ছ'সাত ধাপ ভেঙে উঠতে হয়, তারও মধ্যে মায়ের মূর্তি আরও উঁচু বেদীতে বসানো। সেখান পর্যন্ত জল উঠল। স্বামীজী একটা চৌকি ভাসিয়ে নৌকোর মতো ক'রে তাতেই বসে রইলেন। জল দিয়েই মার পুজো সারলেন। কিছু লাড্ডু দিয়ে ভোগ। এটা উনি বিপদ বুঝে কুলুঙ্গীতে নিয়ে রেখেছিলেন বোধহয়।

রেঠিয়া বাজারের দুর্গামূর্তি পুজো করা হ'ল তিনচার-থাক-উঁচু-করা পর পর বেশ কটা চৌকির ওপর বসিয়ে, পুজারীরাও পুজো করলেন সামনের স্বতন্ত্র মঞ্চে বসে। জলেই পুজো, তবে এঁদের কিছু বিল্বপত্র জুটেছিল। আর হালওয়াইদের দেওয়া মিঠাই দিয়ে ভোগ। ভক্তরা প্রায় আবক্ষ জলে দাঁড়িয়ে দর্শন আর প্রণাম করতে লাগলেন।

সপ্তমীর দিন পর্যন্ত জল বাড়তেই থাকল। তার পর রাত্রিতে মন্দীভূত, অষ্টমীর দিন থেকে কমতে শুরু হ'ল। কিন্তু সে গতি মন্থর। শহরের ভেতরের জল বেরিয়ে যেতে আরও বিস্তর দেরি। বরং উঁচু জায়গার জল কিছু কিছু নিচু জায়গায় নেমে সেখানের জল দুচার ইঞ্চি বাড়িয়ে দিল।

বাড়ি বা মন্দিরের মধ্যেকার জল আটকেই রইল। বাগানগুলোতে জল বাড়া বন্ধ হ'ল যদি বা, পাঁচিলের জন্যে আর ফুলগাছের জন্যে আগেকার ঝরা পাতা নর্দমার মুখে জমে সরানো মুশকিল হ'ল। কেই বা সরাবে—এই প্রায়-ডুব-জলে

নেমে ? ফলে নিচু ফুলের গাছগুলো পচে দুর্গন্ধ উঠল, তার ফলে মশা—আর মশার জন্যে ম্যালেরিয়া।

ম্যালেরিয়া ক্রমে মহামারী ধারণ করল কিছু দিনের মধ্যেই।

শুধু ম্যালেরিয়াই বা কেন পানীয় জলের অনেক কুয়োতেও বন্যার জল ঢুকে গিয়েছিল। সে জল অগত্যাই পান করতে হয়েছে—মিষ্টি জলের কুয়ার সংখ্যা সীমিত—তার ফলেও নানা আন্ত্রিক রোগ, টাইফয়েড। জল ঘাঁটা ও ভেজার ফলে নিউমোনিয়াও বাদ গেল না। রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন সেক্রেটারী স্বামী বেদানন্দ বা প্রভাস মহারাজ—শরৎচন্দ্রের ভাই—তার একজন বলি হয়েছিলেন।

পূজারীজীর বাড়ি দেহাতে—কিন্তু কাছেই, নদীর নিকটবর্তী গ্রামে। তিনি ষষ্ঠীর সন্ধ্যাতেই বন্যার ভয়াল চেহারা দেখে রাতেই বাড়ি রওনা হয়ে গেলেন।

যমুনাকে বলে গেলেন, 'আমার উপায় নেই মা, ওখানে মাটির ঘর, তাও মেরামত হয় নি যে কত বছর—তা মনেও পড়ে না। ওরা যে কি করছে, বাঁচল কিনা জানি না। এ পাথরের বাড়ি, ভেতরের গাঁথুনি কিছু মাটির কিছু সুরকির, —এ আমার শোনা কথা, কোন্‌খানটায় কি তা বলতে পারব না মা। তেমন দেখলে সিঁড়ি তো আছে, ছাদে চলে যেও। কিম্বা সামনের ঐ বাঙালী বুড়ীমার কুঞ্জর সামনের অংশ পাকা, ওঁর কাছে যেও, উনি আশ্রয় দেবেন। সে যা হয় করো। আমার মাথার ঠিক নেই, আমি চললুম।'

তবু যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তবে সামনের ঘরগুলোরও চাবি রেখে যাচ্ছি। জল আসবে পিছন দিক দিয়ে। তুমি আজ রাত্রেই বরং সামনের ঘরটায় চলে যাও। তবু একটু উঁচু। তোমার লামটেনে কতটা তেল আছে জানি না। প্রদীপের তেল মন্দিরের কুলুঙ্গীতে রইল। ইচ্ছামত ঢেলে নিও, কোন সঙ্কোচ করো না। আর—আর আমি বরং লীলাধরকেও একটু বলে যাই, একটু খবর নিতে। কোন ভয় পেও না মা, ও এখন তোমাকে খুব ভক্তির চোখে দেখে, বলে উনি যেচে আমার বেটি হয়েছেন। এ আমার ভাগ্য। দেখেছ তো, আর তোমার সামনে আসে না, বা তোমাকে তোষামোদ করার চেষ্টা করে না। ওর দ্বারা আর কোন ভয় নেই।'

বলতে বলতে তিনি প্রায় এক রকম দৌড়েই চলে গেলেন সেই অন্ধকারে জল ভেঙে।

লীলাধরের কথাটা সত্যি, তা যমুনাও মানতে বাধ্য। লোকটা যেন বদলে গেছে একেবারে। কোনদিন দৈবাৎ সামনাসামনি পড়লে হেঁট হয়ে নমস্কার করে, কথা বলার চেষ্টাও করে না। বেশী বেশী প্রসাদ দেবার চেষ্টাও করে না। আগে যেমন মধ্যে মধ্যে আনত, তেমনিই আনে।

হ্যাঁ, লীলাধর ওর বিপদ শুনলে নিশ্চয় আসবে খবর নিতে।

কিন্তু যমুনা জানল না, পূজারীজী লীলাধরকে কিছু বলে যেতে পারেন নি। তখন কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরের মধ্যে জল ঢুকে গেছে। ওরা সবাই আপ্রাণ চেষ্টা

করছে, সেই একবুক জল ভেঙে দরকারী জিনিস কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার। চেঁচামেচি, অসহায় চিৎকার কিছু—হয়ত নিজেদের বুকেই সাহস সঞ্চারের জন্যে। তা ছাড়া পুজারীজী যেতেও পারলেন না! সামনেই অনেক জল তখন।

লীলাধরের হয়ত ওর কথা মনে হয়েছিল কিন্তু তখন এই বিপুল দায়িত্ব ফেলে যাওয়ার সময় নেই, সে উপায়ও নেই।

কিছুই করা হ'ল না যমুনার।

এতবড় বাড়িতে একা প্রায় অন্ধকারে বসে।

চারিদিকে এই আর্ত চিৎকার আর্তনাদ, ব্যাকুল কণ্ঠস্বর। এক এক জন চেঁচিয়ে অপরের খবর নিচ্ছে। সবটা জড়িয়ে এক আতঙ্কের আবহাওয়া। এরই মধ্যে চৌকির ওপর পা তুলে হাঁটুতে দাড়ি রেখে চুপ ক'রে বসে রইল। এ অবসরে কোন বদ লোক ঢুকতে পারে, ঘরের কপাটটা অন্তত বন্ধ করা দরকার, এটুকুও মনে পড়ল না।

সপ্তমীর দিন ভোরে জল ঢুকল ওর ঘরে।

ক্রমশ চৌকি পর্যন্ত পেঁছিল।

না হ'ল আটার কলসী বা চালের হাঁড়ি সরানো, না হ'ল আবার জলের কলসীটা নিরাপদে রাখা। অন্তত তক্তপোশের ওপর তোলা যেত, সে কথা মনেই রইল না ওর।

ক্রমশ জল উঠতে উঠতে চৌকির সমান হয়ে গেল।

আরও ওপরে উঠল।

তবু যমুনা নড়ল না। কিছুই করতে পারল না। কোথায় যাবে, কার আশ্রয়ে —তাও ভেবে পেল না।

সামনে কোণাচে-ভাবে কিশোরীমোহনের কুঞ্জ, এঁর যাঁরা সেবাইত বা প্রতিষ্ঠাতা তাঁরাও বাঙালী। তাই ইতিমধ্যেই বহু বাঙালী সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। সামনের রাস্তায় তখনও সামান্য জল। এইটুকু পথ বেশ উঁচু।

ঘরের মধ্যে ঢুকতে তখনও ঢের দেরি। একমাত্র এই অংশটাই পাকা গাঁথুনি। কিন্তু একতলার একটিমাত্র ঘর, সামনে দরদালান। লোকও ইতিমধ্যে অনেক এসে গেছে। ওপরে ওঁরা থাকেন। সেখানে মালও যথেষ্ট, বাইরের কাউকে থাকতে দেওয়ার মতো জায়গা নেই।

তাছাড়া কোনদিন যমুনা ও-মন্দিরে যায়নি, ওঁরাও আসেন নি। দুপক্ষের কেউ কাউকে চেনে না। এক্ষেত্রে কার কাছে আশ্রয় চাইবে? কোথায় তাঁরা আশ্রয় দেবেনই বা?···

জল যখন চৌকির ওপরও চার পাঁচ আঙুল উঠল, তখন হাল ছেড়েই দিল।

এই তো ভাল। জলে যদি ডুবিয়ে মারেন গোপীবল্লভ তাই মারুন।

তার আর বাঁচার সাধও নেই। এ মৃত্যুকে কেউ আত্মহত্যা বলতে পারবে না।

পায়ের চেটো ডুবল। আরও একটু।

একবার সে চোখ বুজে স্বরূপকে মনে করবার চেষ্টা করল, মনে মনে সেই বাঞ্ছিত পা দুটিতে চুমো খেল।

তারপর—যেন অপরিসীম ক্লান্তিতে এ জীবনের এইখানেই সমাপ্তি ঘটবে এই আশায় ও আশ্বাসে—সেই জলের ওপরেই এলিয়ে শুয়ে পড়ল।

হ্যারিক্যানটাই তোলা ছিল তক্তপোশের ওপরে, কিন্তু তাতেও বোধহয় জল ঢুকেছে, সেও দপদপ করছে। এখনই নিভে যাবে। যাক গে।

॥ ১৫ ॥

যমুনার কথাটা পূজারীজী না বলে গেলেও লীলাধরের মনে ছিল। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের পরিস্থিতিও এমন যে তার কিছুই করার উপায় ছিল না।

বন্যার জল মূল মন্দিরে ঢুকেছে, প্রধান বিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব মূর্তিই বিপন্ন। কালানুক্রমে নানা কুঁচো কুঁচো মূর্তি এসে জড়ো হ'ন, তাঁরা বেদীর অপেক্ষাকৃত নীচের ধাপে আশ্রয় লাভ করেন। এখন এঁদের কোথায় তোলা হবে সে এক বৃহৎ সমস্যা। কুলুঙ্গী তাক এসব আছে, তেমনি সেখানেও নানা খুচরো জিনিস থাকে, তাদেরও প্রয়োজন আছে। এঁদের সেখানে তুলতে গেলে সেগুলোর জন্যে অন্য স্থান ঠিক করতে হয়—কিন্তু কোথায়? কারও মাথাতেই তা তখন ঢোকে না। সকলেরই বিহ্বল অবস্থা প্রায়।

জল ক্রমে ক্রমে উঠছে, এদের সমস্যাও সেই সঙ্গে তাল ফেলে বাড়ছে। কোথাও থেকে চেয়ার কি বেঞ্চি এনে বিগ্রহ বা পটগুলো কি রাখা সমীচীন হবে—বহু ব্যক্তির ব্যবহৃত এই সব আসনে? তার মধ্যে কত ইতর ব্যক্তিও হয়ত বসে গেছে! চরম বিপদেও কেউ কেউ এ ধরনের প্রশ্ন তোলেন।

তারপর—বড় প্রশ্ন, ভোগ রান্না হবে কোথায়? অত 'প্রকার' যদি নাও হয়, অন্ন, রুটি, একটা ব্যঞ্জন, পায়স—এ তো দিতেই হবে। পূজারী বা সেবকদেরও তো খাওয়া প্রয়োজন। সেটুকু পাকের ব্যবস্থা করা ছাড়া তো উপায় নেই। কিন্তু সেই বা কোথায় হবে, কী ভাবে হবে? তা ছাড়া নিত্য সেবার প্রশ্ন। পূজারীরা একবুক জলে দাঁড়িয়ে করতে পারেন—কিন্তু উপাদান বা উপকরণ?

'দিন গেল সেই ভাবনা ভেবে'—এই অবস্থায় দিশাহারা কামদার থেকে পূজারী সেবক সকলেই। জল আরও বাড়ত এদিকে, মন্দির মূর্তি সবই ডুবিয়ে দিত হয়ত—বাঁচিয়ে দিল মজে-যাওয়া শুকনো ব্রহ্মকুণ্ডই। রঙ্গজীর মন্দিরও নীচু জমিতে, যমুনার ধাবে—সেখানে জলের সীমা এত উঠছে মুহুর্মুহু, যে তাঁরাও শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার জন্যেই, ব্রহ্মকুণ্ডের দিকের বড় ফটকটা খুলে দিতে বাধ্য হলেন। বিরাট ফটক, হাতীর ওপর চেপে মূর্তি (প্রতিনিধি) বার হন—সেই মাপের। ঐ ততখানি কিউবিক মাপের জল বিপুল গর্জনে পড়তে পড়তে চওড়া বাঁধানো রাস্তা ভেঙে গেল—তবু, প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে অবিরাম জল পড়াতেও ব্রহ্মকুণ্ড ভরল না।

তাতেই এদিকের অনেক বাড়ি রক্ষা পেল। সেই সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র ও আরও কিছু কিছু মন্দিরও চরম দুর্দশা থেকে বাঁচল।

অষ্টমীতে স্থিতি ; নবমীতে জল নামতে শুরু হ'ল তবে সে শম্বুক গতিতে।

দশমীর দিন একটু নিশ্বাস ফেলার অবকাশ মিলল।

সেই প্রথম—বাইরে যাওয়ার মতো একটু অবকাশ মিলতেই লীলাধর বেরিয়ে পড়েছিল।

মনে সবচেয়ে বড় উদ্বেগ ছিল যমুনার খবরের জন্যেই। এ যে কী আকর্ষণ, কোন্ শ্রেণীর তা লীলাধর বোঝে না। অত শিক্ষাদীক্ষা নেই। নবলব্ধ কন্যা সম্বন্ধে স্নেহ, তার চরিত্রবলের জন্যে শ্রদ্ধা—তার সঙ্গে পূর্বের সে রূপজ মোহ, দৈহিক লালসা—তাও কি কিছু মিশিয়ে নেই ?

মনকে সে শাসন করে, বোঝায় যে এটা ওর স্নেহ ও শ্রদ্ধা। সেটাই বিশ্বাস করতে চায়।

বাড়ির বাইরে পেঁছে 'পণ্ডিতজী' 'পণ্ডিতজী' বলে বারকতক হাঁক দেয়। পরে, শূন্য বাড়ি হা-হা করছে দেখে কিছু ইতস্তত ক'রে ঢুকেই পড়ে।

একেবারেই কি শূন্য ?

তাই তো মনে হয়।

জল যে কতটা উঠেছিল তার চিহ্ন তো স্পষ্ট। নিশ্চয় পূজারীজী নিজে কোন নিরাপদ স্থানে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, আর সঙ্গে কি যমুনাকে নিয়ে যান নি ?

ফিরেই আসছিল, তবু কি মনে হ'ল, শেষ মুহূর্তে যমুনার ঘরে একবার উঁকি মারল—এবং শিউরে উঠল।

হে প্রভু, হে কৃষ্ণচন্দ্র—এ কি দেখালে !

জল নেমেছে, বেশ খানিকটা—এখন ভিতরে সামান্য চেটো-ডোবা জল মাত্র আছে।

তবে যমুনা কোথাও যায় নি, কোথাও যাবার বোধ হয় চেষ্টাও করে নি।

পণ্ডিতজীও কোন ব্যবস্থা ক'রে যান নি নিশ্চয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ও যা শুনেছে—বাড়ি তাঁর নিকটবর্তী দেহাতে, নদীর কাছেই। এবং সেখানের বাড়িও মাটির। পরিবারের সর্বনাশের কথা ভেবেই দ্রুত চলে গেছেন—এ মেয়েটার কথা ভাবার অবকাশ পান নি।

রান্নার সাময়িক চুলাটার ইঁট মাটি গলে একাকার, আটার কলসীতে জল ঢুকে সেটা ডেলা পাকিয়ে গিয়ে পচা গন্ধ ছেড়েছে ; খাবার জলের খালি কলসীটা এক-দিকে কাৎ হয়ে পড়ে আছে ; তার নিচের খাঁজটুকুতে ময়লা জল খানিকটা পড়ে আছে ; চাকি-বেলুন বোধ হয় ভাসতে ভাসতে এসে চৌকাঠের কাছে আটকে গেছে ; ছোট্ট হালকা কড়াইটারও সেই হাল।

তারই মধ্যে চৌকির ওপর যমুনা পড়ে আছে। জল যে ওপরে উঠেছিল তার চিহ্ন প্রত্যক্ষ। কাপড় সেমিজ তখনও গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে—সম্ভবত ভিজে।

তার মানে জলেই ডুবে ছিল।

প্রথমে আঁৎকেই উঠেছিল লীলাধর। একটা অস্ফুট শব্দ আর্তনাদের মতো বেরিয়ে গিছল গলা দিয়ে। মরে গেছে। নিশ্চয়ই তাই। জলের মধ্যে ডুবে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়ে দম আটকে মরেছে—

মনে হয় বাঁচবার চেষ্টাও করে নি। নইলে দেওয়ালে যে দাগ দেখা যাচ্ছে—তাতে বসে থাকলে অন্তত দম বন্ধ হ'ত না। তেমন হলে দাঁড়িয়েও থাকতে পারত। যদি বেরিয়েও আসত। সামনের এই রাস্তাটায় অতি সামান্য জল উঠেছিল।

আসলে কোথায় যাবে, কার কাছে আশ্রয় নেবে, সে আশ্রয় নতুন বিপদের কারণ হবে কিনা—বুঝতে পারে নি। আহা বেচারী! দুই চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল লীলাধরের।

কিন্তু তারপরই হেঁট হয়ে খানিকটা চেয়ে থেকে মনে হ'ল যেন তখনও নিঃশ্বাস পড়ছে, গলার কাছটাও ধুক ধুক করছে।

খুব ক্ষীণ সে প্রাণ-লক্ষণ, তবু একেবারে মৃত নয়।

গায়ে হাত দিয়ে দেখতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল লীলাধর।

না, অন্য কোন সঙ্কোচে নয়। এ দ্বিধা-সঙ্কোচ উচিত-অনুচিত চিন্তার সময় নয়। ওর মধ্যেই চকিতে মনে খেলে গেল বাস্তব তথ্যগুলো।

তার অবসর কম, কতক্ষণ বা কতদিন সে ছুটি নিতে পারে। তা ছাড়া অর্থের প্রশ্নও আছে। অনাহারে দুর্বল শরীর, জলে পড়ে থেকে থেকে হয়ত শক্ত কোন অসুখই করেছে—সে কী বা কতটুকু করতে পারবে? এর কাছে থাকবেই বা কে!

ভাবতে ভাবতে রামরতিয়ার কথাই মনে পড়ে গেল। সে-ই নাকি মেয়েটাকে আগলে রেখেছে চিরদিন, তার জীবনধারণের উপায় বা ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এখনও নিয়মিত দেখাশুনো করে। এ কথা পুজারীজীই তাকে বলেছেন বহুবার। তাকেই আগে খবর দেওয়া দরকার।

কিন্তু ঠিকানা?

অনেক ভেবে মনে পড়ল কে যেন একবার বলেছিল—পুরনো শহর মণিপাড়ায় তার বাড়ি।

কেউ কি আর দেখিয়ে দিতে পারবে না? বিশেষ যখন দাইয়ের কাজ করে?

জিজ্ঞাসা করতে করতে খোঁজ মিলবেই। কেউ না কেউ দেখিয়ে দেবে।

আর ইতস্ততঃ করল না।

দরজার কপাটটা টেনে দিয়ে প্রায় দৌড়তেই শুরু করল।

নেহাৎ চারিদিকে জল তাই, নইলে এতক্ষণে শিয়াল কুকুরে ওকে শেষ ক'রে দিত!···

মনের আবেগের সঙ্গে পা পাল্লা দিতে পারে না। বিশেষ জল ঠেলে যাওয়া। তখনও বেশ জল আছে রাস্তায়। শুকনো রাস্তায় যত জোরে চলা যায়, জল ভেঙে যেতে তার দ্বিগুণ সময় লাগে। পা ভেরে ওঠে খানিক পরেই। রাস্তাও জোরে

চলবার মতো নয়। বেশির ভাগই বড় বড় গোল গোল পাথরে বাঁধানো। পা পিছলে যায়। গেলও দু-তিনবার। জলের মধ্যে কাঁচ টিন কত কি থাকতে পারে। তবু তাগড়া জোয়ান লীলাধর—কবিদের ভাষায় বলতে গেলে প্রায় তীরবেগেই ছুটল।

পথের লোক এইভাবে পাগলের মতো দৌড়তে দেখে খুব বিস্মিতও হ'ল না। প্রশ্ন ক'রে সময় নষ্টও করল না। এই সর্বনাশের সময় এরকম উদ্বেগের অসংখ্য ঘটনাই তো ঘটছে।···

অবশেষে একসময় মণিপাড়াতেই পেঁছিল। এবং দু-চারজনকে জিজ্ঞাসা করতেই রামরতিয়াদের বাড়ি দেখিয়েও দিল একজন।

রামরতিয়াকে কে না জানে। এই ভাবেই তো তাকে ডাকতে আসে লোকে। আঁতুড়ের ঝি ছিল, এখন নিজেই প্রসব করায়।

পুরনো শহরে জল পেঁছিলেও খুব একটা ভয়াবহ আকার ধারণ করে নি তার উচ্চতা।

তবু রামরতিয়াদের মাটির বাড়ি। চারিদিকে কত ঘর ভেঙে ভেঙে পড়ছে, সে হাহাকার ও আর্তনাদের মধ্যে মাথা ঠিক রাখা শক্ত। ওদের দুটো ঘর, তাতে জিনিস ও মানুষ ঠাসা। ওপরে একটা চালি আছে বটে, তাতে রেজাই কাঁথা থাকে। এধারে গরু ভঁইস আছে, কিছু কিছু গম-চানা জমানো থাকে, শুকনো গোহ্‌রি বা ঘুঁটের স্তূপ—জ্বালানি তো চলেই, বিক্রিও হয়। এ একটা প্রধান সম্পদ ওদের কাছে, এসব নিরাপদ স্থানে সরানো আশু প্রয়োজন কিন্তু সরাবে কোথায়? বিলাপ আর প্রলাপ—সেই ধরনের প্রস্তাব ছাড়া কিছু করা হয়ে ওঠে না। নিহাৎ রামরতিয়াদের বাড়ির দেওয়াল অন্যদের চেয়ে বেশী চওড়া তাই এখনও সব গলে যায় নি—নইলে কিছুই রক্ষা করা যেত না, প্রাণরক্ষাই কঠিন হয়ে উঠত।

এর মধ্যে অপরের কথা চিন্তা করা সম্ভব নয়। মনে ছিলও না। তাই লীলাধর প্রায় কান্নার মতো মুখ ক'রে এসে দাঁড়াতে খানিকটা বিহ্বল হয়ে চেয়েই রইল, কোথায় দেখেছে একে, কী যোগাযোগ—সেটা মাথায় পেঁছিতেই দেরি হয়।

তবে তারপর, যমুনার দুর্দশা—বুঝি বা চরম অবস্থার কথাই—শুনতে মুহূর্তে সক্রিয় হয়ে উঠল। জল কিছু কমলেও এখনও যা আছে ঢের কিন্তু সে চিন্তাও আর রইল না—জান ও মাল রক্ষার দায়িত্ব মরদের ওপর ছেড়ে দিয়ে প্রায় পাগলের মতোই ছুটল জল ভেঙে। এমন কি লীলাধরও তার সঙ্গে তাল রাখতে পারল না।

লীলাধর যতই বলে যাক, এ অবস্থা দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল না রামরতিয়া।

প্রথমটা দেখেই হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল। তবে চিরদিনই করিৎকর্মা তৎপর মানুষ সে, হাত পা গুটিয়ে শুধু বিলাপ করতে অভ্যস্ত নয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিল নিজেকে। গায়ে হাত দিয়ে দেখল গা পুড়ে যাচ্ছে যমুনার। জ্বরে ও অনাহারে এমন বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। দু-তিনদিন এইভাবে জলে ভিজে কাপড়

জড়িয়ে পড়ে থাকলে জ্বর তো হবেই, বোধহয় বুকে সর্দি বসেছে, 'নিমোনিয়া' না কি যেন বলে ডাক্তাররা—হয়ত তাই হয়েছে।

তা তো হ'ল, এখন সে কি করবে? ওপরে দড়ির আলনায় দ্বিতীয় শাড়ি ও সেমিজ তখনও ভেজে নি। এখন আগেই ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে তা পরিয়ে দেওয়া দরকার।

কিন্তু সেদিকে হাত বাড়াতে গিয়েও হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। ততক্ষণে তার বহুদর্শী মন উপস্থিত বুদ্ধির ত্বরিৎ গতি ফিরে পেয়েছে, চিন্তা বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এ অবস্থাকে কাজে লাগাতে না পারলে এমন সুযোগ আর আসবে না।

সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি এখানে কিছুক্ষণ পাহারা দিতে পারবে লীলাধরজী?'

লীলাধর ইতস্ততঃ ক'রে বলল, 'আমারও তো ওখানে অনেক কাজ বাকী। বড় জোর আর ঘণ্টাখানেক এখানে থাকতে পারি।'

'যথেষ্ট, যথেষ্ট। যাবো আর আসবো—এই গোপীবল্লভজীর মন্দিরে যাওয়া, কতটুকুই বা পথ। তুমি বাইরের দরজটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকো একটু।'

এর মধ্যেও লীলাধরের উপস্থিতির ফলাফল বা কুফলের সম্ভাবনাও তার মানসদৃষ্টি এড়ায় নি। সদাসতর্ক বহুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ওর।

আবারও প্রায় উর্ধ্বশ্বাসেই ছুটল সে।

স্বরূপ গোসাঁইকে চাই তার, এই অবস্থাটা তাকে দেখানো দরকার।

কিন্তু ভেতরমহলে ঢুকতেই প্রথম যাঁর চোখে পড়ে গেল—তিনি স্বয়ং কর্ত্রী, বড়মা। অর্থাৎ শ্যামসোহাগিনী।

'কি ব্যাপার রে, অমন ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছিস? তোরও ঘরদোর পড়ল নাকি? শুনেছি তো খুব মোটা দেওয়াল তোর—?'

'না বড় রাণীমা, অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছে। জল সরে যাচ্ছে, বোধ হয় আর কিছু হবে না।'

'তবে?'

'আমি—আমি বড় গোসাঁই দাদাকে খুঁজছিলুম। বড্ড দরকার।'

'সে আজই একটু বেরোবার মতো হতে, পঙ্গতের পরই গেছে ও-বাড়ির অবস্থা দেখতে। কদিন তো কোন খবরই পাওয়া যায় নি। যারা সেখানে আছে তাদেরই বা কী দুর্দশা হচ্ছে কে জানে!'

বলতে বলতে শ্যামসোহাগিনীর সূচীতীক্ষ্ন দৃষ্টি ওর আপাদমস্তক দেখে নিয়েছে।

তিনি বললেন, 'কেন বল্ দিকি? কী হয়েছে? অমন করছিস কেন? ঠিক ক'রে বল্ তো।'

কে জানে কেন, একটা কুটিল অজানা সন্দেহ তাঁর মনের মধ্যে রূপ নিচ্ছে ক্রমশ।

না, অভিনয় বা ইচ্ছাকৃত নয়—ভয়ে বা দুশ্চিন্তায় বা আবেগে—স্বরূপের দেখা

-না পাওয়ার জন্যে হতাশাতেও—কেঁদে ফেলল রামরতিয়া।

নিজের দু কান নিজেই ধরে বলল, 'আমার অপরাধ নেবেন না বড় রাণীমা—বহুরাণীর অবস্থা খুব খারাপ—সেই কথাই—'

কথা শেষ করতে পারল না, কতকটা ভয়েই—থেমে গেল।

'বহুরাণী! সে কি! তাকে কোথায় পেলি? এখানে আছে? কতদিন?'

এবার সবই খুলে বলল রামরতিয়া।

আছে তিন চার সাল। চরম দুর্দশায় আছে সে। ইচ্ছে ক'রেই সে কষ্ট করছে, তপস্যার মতো ক'রে। ঠিক এতটা কষ্ট না করলেও চলত, এটা যে কতকটা প্রায় প্রায়শ্চিত্তই করা—সে যে স্বামী আর শাশুড়িকে ইষ্টজ্ঞানেই প্রত্যহ 'ধেয়ান-পুজো' করে—সে কথাও। বোধ হয় কোন তথ্যই বাদ গেল না।

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল রামরতিয়া, কী কৃচ্ছ্রসাধন যে ঐ কাঁচ মেয়েটা করেছে, তার মধ্যেই কত প্রলোভন, কত আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে—সব বলল। কেমন ক'রে এসেছে বুড়ো বৈরাগীদের সঙ্গে, এক বস্ত্রে নিঃসম্বল অবস্থায়, খবর পেয়ে রামরতিয়াই এই আশ্রয়টুকু ক'রে দিয়েছে—কাকে কাকে ধরে জীবনধারণের ব্যবস্থাও ক'রে দিয়েছে—সে সব কথাও। এর থেকে একটু ভাল ব্যবস্থাও হয়ত ক'রে দিতে পারত, বহুরাণীই তা নেন নি। নুন দিয়ে শুকনো রুটি খেয়ে দিন কাটিয়েছে।

এমন কি, সর্বশেষে—গোপনে গিয়ে স্বরূপকে দেখে আসার সে মর্মন্তুদ বিবরণও।

বলা শেষ হলে আবারও কেঁদে ফেলল।

শুনতে শুনতে পাথর হয়ে গিছলেন শ্যামসোহাগিনী। এমন যে হতে পারে এমন যে সম্ভব—তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না, এর মুখ থেকে এমন ভাবে না শুনলে।...

প্রবল বিস্ময়ের এই আকস্মিক আঘাত সামলে নিতে এমন কি তাঁরও দেরি হ'ল। কি ঘটেছে সবটা ভেবে নিতেই তো সময় লাগল বেশ কিছুটা।

তার পর, যখন বাক্‌শক্তি ফিরে পেলেন, মন বাস্তবে নেমে এল, তখন প্রথমেই মনে জাগল—স্ত্রীলোকের পক্ষে যা স্বাভাবিক—আর একটা কুটিল প্রশ্ন।

'খোকা—মানে তোর গোসাঁইদাদা কিছু জানে এ সবের?'

'না না বড় মা। কী বলছেন! এত বড় বুকের পাটা আমার নেই। সে-ও এ কথা মুখে উচ্চারণ করে নি। মনেও আসে নি আমাদের—আজ এই বিপদে পড়েই—আমারও ত্যে অবস্থা বুঝতে পারছেন! এই প্রভুজীর ঘরে দাঁড়িয়ে বলছি, আপনি আমার গুরু—মিছে কথা বলে নরকে ডুবব না, তিনি কিছুই জানেন না। বহুরাণীদিদিও সে কথা মুখে একবার উচ্চারণ করে নি। এ দরজা যে বন্ধ হয়ে গেছে চিরকালের মতো তা সে জানে।'

অবিশ্বাসের কারণ নেই, করলেনও না কর্ত্রী। একটা বহুক্ষণ চেপে-থাকা নিঃশ্বাস ফেলে 'দাঁড়া' বলে ভিতরে চলে গেলেন, একটু পরে ফিরে এসে দুখানা

দশ টাকার নোট আলগোছা রামরতিয়ার হাতে ফেলে দিয়ে বললেন, 'যা, এখন ডাক্তার পথ্যি ওষুধ—অন্য জিনিস যা লাগে কিনে দে—তবে আমার নাম না করাই ভাল। তার ভালর জন্যেই বলছি!'

কে জানে এ নিঃশ্বাসটা কিসের। এমন মেয়ে তাঁদের কাজে লাগল না, মাঝখান থেকে তাঁর ছেলের জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল—এ জন্যেই কি?

মন্দিরের বাইরে এসে আবার জোরে পা চালাতে যাবে, ঠিক সেই সময় সামনে এসে পড়লেন স্বয়ং স্বরূপ গোসাঁই। সাইকেল ক'রে শ্রীরাধা-গোপীবল্লভের বাগান-বাড়ির হাল দেখে ফিরে আসছেন।

রামরতিয়ার কান্নায় ভেজা চোখ, হাতে দুখানা নোট দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন, 'কী হয়েছে দাই দিদি, তোমার ঘর-দোর ভাঙল নাকি? না অন্য কোন বিপদ-আপদ?···কই ওদিকে তো বাঢ়ের জল বেশী দূর ওঠে নি। তোমার ঘরের দেওয়ালও তো খুব চওড়া—!'

'না বড় গোসাঁইদাদা, এমন খুব একটা নুকসান হয় নি, এ অন্য লোকের কথা, অন্য ব্যাপার।'

এতেই নিশ্চিন্ত হয়ে ভেতরে চলে যাবার কথা গোসাঁইজীর, যাচ্ছিলেনও তাই, কিন্তু সেই সময়ই আবারও রামরতিয়ার দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরতে লাগল।

বোধ হয়—যাকে এসব কথা জানাতে চায়, জানানো উচিত বলে মনে করে তাকে জানাতে পারছে না—এই আকুলতায়।

স্বরূপ বুদ্ধিমান, সঙ্গে সঙ্গেই একটা সন্দেহ মনে এল, অন্য লোক অন্য ব্যাপার—তবে এত কান্নাকাটির কি আছে? ওঁকে দেখেই বা চোখে এত জল উপচে পড়ল কেন আবার? মা কি কোন ব্যাপারে খুব তিরস্কার করেছেন? এ অবস্থায় কেনই বা করবেন? তা ছাড়া মা রামরতিয়াকে স্নেহ করেন, বিশ্বাসও করেন, পুরনো লোক—একটু-আধটু বকাঝকা গা-সওয়াও হয়ে গেছে এতদিনে।

তিনি বললেন, 'ব্যাপার কি খুলে বল তো দিদি, কী হয়েছে ঠিক। কেউ কিছু বলেছে? এমন কি ঘটল? কোন বিপদ-আপদ—?'

আর থাকতে পারল না রামরতিয়া। এমনিই মেয়েদের পেটে কথা থাকে না, আর তা না হলেও—একেই তো বলতে চায় সে, একেই তো বলতে এসেছিল!

সে বলেই ফেলল, সমস্ত ইতিহাস, আনুপূর্বিক।

নবদ্বীপ থেকে যমুনার এখানে আসা, অসহায় নিরাশ্রয়, প্রায় একবস্ত্রে, কেবল মাত্র স্বামীকে দেখার জন্যেই এত আকুলতা; রামরতিয়া তার জীবনধারণ ও আশ্রয়ের কোন রকমে একটু ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে; তার প্রায়শ্চিত্ত বা তপস্যার জন্যে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা—পোড়া রুটি আর নুন খেয়ে; একবার দেখার জন্যে ব্যাকুলতা; লুকিয়ে দেখতে যাওয়া; তারপর ফিরে এসে আবেগের যন্ত্রণায় পাথরে মুখ ঘষে রক্তাক্ত ক'রে তোলা; স্বামী ও শাশুড়িকে ইণ্টের আসনে বসিয়ে ধ্যান

পূজা ; শেষে এই বন্যা। কী অবস্থায় পড়ে আছে—তবু কোথাও যায় নি।

যা ঘটেছে তা তো বললই, কিছু হয়তো বর্ণাঢ্য ক'রেই বলল। বহু বাড়িতেই যাতায়াত বড় বড় ধনীগৃহেও—তার ফলে কথা সে বলতে শিখেছে, বলতে জানে।

এও বোঝে যে, এ সুযোগ হারালে আর কোন সম্গতি হবে কিনা ইহজীবনে, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ।

স্থির হয়ে শুনতে শুনতে পাথরের মতোই হয়ে গিয়েছিলেন স্বরূপ গোসাঁইও।

মনে প্রচণ্ড ঝড় উঠলেও মুখে তা প্রকাশ পেল না। আরও কিছুক্ষণ সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে, উদ্গতোন্মুখ দীর্ঘনিঃশ্বাসটা প্রাণপণে দমন ক'রে শুধু বললেন, 'তুমি এসো, আমি সাইকেলে চলে যাচ্ছি।'

'চিনতে পারবেন তো?'

'হ্যাঁ, ও বাড়ি আমার চেনা।'

॥ ১৬ ॥

জ্বর কমলেও হুঁশ ফিরে আসতে আরও আট ন দিন সময় লাগল।

তবু স্বরূপ এখানে পা দেওয়ার পর ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি ঘটে নি। ঘর পরিষ্কার করা, শুকনো কাপড় জামা পরানো, তার আগে গা গরম জলে স্পঞ্জ করানো, একটা চলনসই বিছানা যোগাড় করা—সবই হয়েছে। রামরতিয়াই করেছে—ওঁর নির্দেশে এবং কোথা থেকে কি আসবে—আসতে পারে—তা বলে দেওয়ায়।

সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসার ব্যবস্থাও হয়েছে, এটা করেছেন তিনি নিজে।

রামরতিয়া গৌর ডাক্তারকেই ডাকতে চেয়েছিল, স্বরূপ ঘাড় নাড়লেন, 'না, এ শক্ত কেস, গৌরবাবুকে দিয়ে হবে না। আমি দেখছি।'

সোজা চ'লে গেলেন তিনি কালাবাবুর কুঞ্জে, প্রভাস মহারাজকে* বলে রামকৃষ্ণ মিশনের একজন প্রবীণ অভিজ্ঞ ডাক্তারকে ধরে আনলেন। জলের মধ্যে কোন ওষুধের দোকান খোলা পাবেন কিনা সন্দেহ প্রকাশ ক'রে মহারাজই বলে দিলেন, 'ওষুধপত্র যা লাগে এখান থেকেই নেবেন। পরে দাম দেবেন বা কিনে দেবেন।'

তাঁর দ্বারাই খোঁজ খবর ক'রে একটি সেবিকাও যোগাড় করা গেল। নার্স বা আয়া নয়—তখন ওখানে এসবের চল হয় নি—এক বয়স্কা ব্রাহ্মণ বিধবা মহিলা মাসিক দশ টাকা বেতনে এ কাজ করতে রাজী হলেন, তাঁর জন্যে কাছের এক কুঞ্জ থেকে একটা পারসের ব্যবস্থাও হয়ে গেল।...

এ কদিনে চোখ যে একেবারে মেলে নি তা নয়, তবে সে অসুস্থ বিহ্বল দৃষ্টি, তাতে পরিষ্কার কিছু দেখা যায় না। দৃষ্টি স্বচ্ছ হ'ল—শ্রান্ত হলেও পারিপার্শ্বিক দেখা বা বোঝার মতো—কৃষ্ণা ষষ্ঠী বা সপ্তমী তিথিতে।

কিন্তু চেয়ে দেখে যেন আরও বিহ্বল হয়ে পড়ল যমুনা।

* স্বামী বেদানন্দ, তদানীন্তন সেক্রেটারী। পূর্বাশ্রমে সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্রের অনুজ ছিলেন।

এ কোথায় সে, কোন্ পরিবেশে ? এ বিছানা, পাশে একটা প্যাকিং বাক্সর মতো কি উপুড় করা—তার ওপর ওষুধের শিশি, ফিডিং কাপ, জলের গ্লাস—এসব কোথা থেকে এল ? কী সব, কারা আনল ? তার ঘরে তো থাকার কথা নয়।

তাকে কি অন্য কোথাও এনেছে নাকি কেউ ? তবে কি হাসপাতালে এসেছে সে ?

কিংবা—। অবসন্ন মস্তিষ্কেও একটা আশঙ্কা দেখা দিয়ে ভয়ে যেন শিউরে উঠল। কেউ ওকে কোন কু-স্থানে নিয়ে এল না তো ?

কিন্তু ছাদটার দিকে চেয়ে, দেওয়ালগুলো, কাতার দড়ি দিয়ে টাঙানো আলনা—এগুলো দেখে তো আবার মনে হয়—সেই ঘরেই আছে। তবে ?

বেশী ভাবতে পারল না, চোখ বুজল আবার।

বেশ খানিকটা পরে আবার যখন চোখ খুলল, চোখে পড়ল পরিষ্কার থান ধুতি পরা এক বিধবা ভদ্রমহিলা।

এ আবার কে ? কোথা থেকে এল ? কেনই বা ?

মহিলা কাছে এসে সস্নেহে গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'ঘুম ভাঙল মা ? কেমন লাগছে এখন ?'

খুব আস্তে প্রশ্ন করল যমুনা, 'এ আমি কোথায় এসেছি, এ—এসব কি ? আপনি ? আপনাকে কে আনল ? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না !'

'তুমি কোথাও আস নি মা, সেই ঘরেই আছ। ঘর দেখে বুঝছ না ? তোমার যা অবস্থা হয়েছিল—যে অসুখ—নাড়ানো যায় কি ?···আমাকে তুমি মাসিমা বলেই ডেকো। আর একটু সুস্থ হ'লে সব পরিচয় পাবে। এখন বেশী কথা ব'লো না। ডাক্তারের নিষেধ আছে।'

কিছুই বুঝতে পারল না। যেন আরও ধুলিয়ে গেল চিন্তাটা মাথার মধ্যে।

সে আবারও চোখ বুজল।

বেশী কথা বলার শক্তিও নেই তার।··

হয়ত এবার সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে, হঠাৎ ঘুম ভাঙল খুব পরিচিত এক কণ্ঠস্বরে।

রামরতিয়া।

চুপি চুপি প্রশ্ন করছে, 'কেমন বুঝছেন বাহমন মা ? হুঁশ আসবে এবার মনে হচ্ছে ?'

মাসীমা খুশির সুরে বললেন, 'হুঁশ এসে গেছে, কথাও বলেছে মেয়ে—তবে এসব কিছু বুঝতে পারছে না তো, তাই আমিই বলেছি পরে সব জানতে চেও, এখন বেশী কথা ব'লো না।'

আবারও চোখ খুলল যমুনা, স্বচ্ছতর দৃষ্টি এবার, ক্ষীণকণ্ঠে ডাকল, 'রামরতিয়া !'

প্রায় এক লাফে বিছানার পাশে এল।

'হ্যাঁ বহুরাণী দিদি। আমি তোমার সেই নোকরীন্! বাব্বা, যা কাণ্ড বাধিয়েছিলে! ভাবিয়ে পাগল ক'রে তুলেছিলে সবাইকে!'

'এ—এসব কি? এত জিনিস, ওষুধ—এ তোমার কাজ। এত খরচ করতে গেলে কেন? আমাকে মরা বাঁচাতে গেলে কেন মিছিমিছি!'

এ সময় এতখানি সুসংবাদ শোনানো—অপ্রত্যাশিত, সুদূর আশা-কল্পনারও অতীত সুবার্তা—শোনানো উচিত নয়—এ জ্ঞান যে ছিল না তা নয়—তবু থাকতে পারল না রামরতিয়া, বলে উঠল, 'আমি? আমার এত কি সাধ্যি বহুদিদি, খাস মালিক তোমার, বড় গোসাঁইদাদা নিজে, খবর পেয়ে ছুটে এসে এই হাল দেখে ডাক্তার ডাকা, লোক রাখা, ওষুধ পথ্যি,—সব তিনি, সব কিছু তিনিই করেছেন, নিজে হাতে সব করেছেন!'

'কে—কে বললে—?' আর্তনাদের মতোই শোনাল।

'বড় গোসাঁইদাদা গো, তোমার মরদ!'

আর সহ্য হ'ল না, আবারও অজ্ঞান হয়ে গেল যমুনা।

মাসিমা যথেষ্ট তিরস্কার করলেন, রামরতিয়ারও লজ্জার পরিসীমা রইল না।

মহিলা অবশ্য ওকে বকতে বকতেই কাজে লেগে গেলেন। মুখে কপালে জল-হাত দিয়ে একটু বাতাস করতে বললেন, তারপর নিজে একটু চিনির জল গরম ক'রে নিয়ে ফিডিং কাপে ক'রে আধ চামচ হিসেবে খাওয়াতে লাগলেন মধ্যে মধ্যে।

তাতেও বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল—এ আঘাত সামলে নিয়ে চেতনা ফিরতে।

চোখ মেলতেও যেন কষ্ট হচ্ছে, এত দুর্বল।

আকস্মিক এত বড় আঘাত, সোজা বোধ হয় হার্টে গিয়ে লেগেছে। দুর্বলতা বেশী হয়ত সেই কারণেই।

চেয়ে দেখল কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে পারল না। ওকে চোখ মেলতে দেখেই রামরতিয়া বাইরে চলে গেছে। এরপর তাকেই এসব প্রশ্ন করবে, তার কাছেই সব জানতে চাইবে—আর নয়, খুব শিক্ষা হয়ে গেছে।

আর সে অনুমানটা মিথ্যাও নয়, কারণ কথা বলার মতো অবস্থা হতেই যমুনা ডাকল রামরতিয়াকেই।

'রাম—রামরতিয়া কোথা গেল?'

মাসিমা বললেন, 'সে বাইরে গেছে কী এক ওষুধ লাগবে, তারই খোঁজ করতে। তুমি আর এখনই এসব খবরের জন্যে ব্যস্ত হয়ো না মা, ক্রমশ নিজেই জানতে পারবে। বলতে গেলে মরণের মুখ থেকে ফিরে আসা—বেশী কথা বলা একেবারে বারণ ডাক্তারের।'

অগত্যা চোখ বুজল আবার যমুনা।

কতকটা বাধ্য হয়েও, কারণ বেশী কথা বলা বা শোনার শক্তি ছিলও না।

কিছু সচেতনতা, কিছু আচ্ছন্নতা—এর মধ্যেই ঘণ্টা তিনেক কাটল।

মধ্যাহ্ন অপরাহ্নে পৌঁছল।

তার ভেতরই কানে গেল দু'বার দুটি পুরুষের গলা। মনে হ'ল খুব দূরাগত সে প্রশ্নের শব্দ—'ক্যায়সা হ্যায় আভি বাহ্মন মা, ক্যায়সা সমঝতে হ্যায় আভি ?'

একটি সম্ভবত পুজারীজীর—আর একটা কি লীলাধরের ?

ঠিক বোঝা গেল না।

মাসিমা নিশ্চয়ই উত্তর দিলেন কিছু, তাও শোনা গেল না। এতই আস্তে বা ইঙ্গিতে দেওয়া হ'ল সে উত্তর।

তবে এ যে সেই বাড়ি সেই ঘর—তাতে আর সন্দেহ রইল না। কেবল পরিবেশটা ভিন্ন।…

সন্ধ্যার দিকে আরও পরিষ্কার হয়ে এল দৃষ্টি, যদিও কণ্ঠস্বর যেন দুর্বলতর শোনাল। মধ্যাহ্নের সেই প্রবল আবেগাঘাতের ফল।

তবু তারই মধ্যে ক্লান্ত দুটি চোখ মধ্যে মধ্যেই দরজার দিকে চাইতে লাগল।

না, আশা নয়—আশা করা বা মনে মনে সে চিন্তা পোষণ করা মূর্খতা।

যদি সত্যিই তিনি এসে থাকেন বা এ ব্যবস্থা তাঁরই হয়—আতুরের প্রতি, মৃত্যুপথযাত্রীর প্রতি করুণা।

নিতান্তই দয়া—বা মানবতার কর্তব্য। তাঁর মতো মহান মানুষেরই শোভা পায় এক্ষেত্রেও সে কর্তব্যবুদ্ধি স্মরণ রাখা।

বা দয়া। দয়াই।

উনিই পারেন, দয়া করতে গিয়ে লোকের বিদ্রূপকেও উপেক্ষা করতে। তাই বলে কি আবারও আসবেন ? কানে কি আর যায় নি যে তার জ্ঞান ফিরেছে।

আর কেন ? আবারও কেন !

যে সর্বাধিক ক্ষতি করেছে তাকেও দয়া ক'রে বাঁচিয়েছেন।

সে যে ওঁকে ঈশ্বরের এক রূপ ভেবে পুজো করেছে—কিছু ভুল করে নি। ঠিকই করেছে।

এমনিই সব এলোমেলো চিন্তা।

একটানা কি এক ভাবে নয়। মধ্যে মধ্যে চিন্তারও খেই হারিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ আসছে বিস্মৃতি, শ্রান্তি।

তন্দ্রার মতো আচ্ছন্নতা, আর একটু পরেই চমকে জেগে উঠে তাঁর কথাই ভাবছে। কী পেয়েছিল সে, কী হারাল !

চিরদিনের মতো।

যে হাতে অমৃত দান করতে চেয়েছিলেন, সেই হাতেই বিষ তুলে দিয়েছে সে।

পুড়িয়ে দিয়েছে সে হাত।…

বেচারী জানতেও পারল না—এসেছিলেন তিনি ঠিকই, সংবাদের আকস্মিকতায় ও অভাবনীনতায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথা শুনে ফিরে গেছেন। প্রায়-মুমূর্ষু রোগীকে প্রবল আবেগ আরও বেশী ক'রে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়।

শুধু আর কোন ওষুধ চাই কিনা প্রশ্ন ক'রে বা অন্য কোন পথ্য, রামরতিয়ার হাতে খুচরো খরচের মতো কিছু টাকা আছে কিনা জেনে সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেছেন।

পরের দিনটাও কাটল আশা-নিরাশার দোল খেয়ে।

তার পরের দিন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে, ডাক্তার অল্প দুধ ভাত খেতে বলেছেন, এবং তা খাওয়ানোও হয়েছে—খবর পেয়ে একেবারে অপরাহ্নের দিকে, চারটে নাগাদ হঠাৎই এসে ঘরে ঢুকলো—যমুনার আশাতীত আশার ধন, তার ইষ্ট, তার পূজ্য, তার প্রিয়তম।

তেমনিই প্রবল আঘাত—তেমনিই মনে হ'ল বুকের নিঃশ্বাস থেমে যাবে এখনই—কিন্তু ততটা দুর্বলতা আর নেই বলে, অন্ন পথ্য পেয়ে কিছুটা সহ্য করার শক্তি ফিরে পেয়েছে বলেই আর অজ্ঞান হয়ে পড়ল না। তবু বুকটা চেপে ধরতে হ'ল—আর স্বরূপ গোসাঁইয়ের সেটা চোখ এড়াল না।

রোগীর বিছানারই একপাশে বসে একেবারে গায়ে একটা হাত রেখে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'আজ কেমন আছ? একটু ভাল বোধ হচ্ছে?'

উত্তর দিতে গিয়েও দেওয়া হ'ল না, দেওয়া বুঝি সম্ভবও নয়—ঠোঁট দুটোই কাঁপল দু-একবার—শুধু দুই চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা নামল।

'এই দ্যাখো,' সস্নেহ তিরস্কারের স্বরে বললেন, 'এই ভয়েই তো দুদিন ভেতরে ঢুকি নি, বাইরে থেকে খবর নিয়ে চলে গেছি!...শরীরটা বেশী খারাপ করার ইচ্ছে হয়েছে?'

'দুদিন এসে ফিরে গেছেন' এই সংবাদটিই বলবর্ধক ইঞ্জেকশ্যনের কাজ করল। স্বরূপও তা বুঝেছিলেন, তাই সর্বাগ্রে এই খবরটা দিয়েছেন।

ক্রমে ক্রমে একটু সামলে নিল যমুনা।...

ঘরে কেউ নেই, স্বরূপকে আসতে দেখেই মাসীমা বাইরে চোখের আড়ালে চলে গেছেন।

যমুনা যে ওঁর স্ত্রী তা গোপন করেন নি স্বরূপ—কেউ প্রশ্ন না করলেও গোপন করার চেষ্টাও করেন নি। অত রাশভারী লোককে এ রহস্যের অর্থ কি তাও প্রশ্ন করতে সাহস হয় নি কারও।

বয়স্কা মহিলা, মাত্র পাঁচ ছ বছর আগের 'কেচ্ছা' কি আর কানে যায় নি! যতই নিঃশব্দে কাজ সারুন শ্যামসোহাগিনী, একেবারে গোপন করা সম্ভব নয়—তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী সে আশাও করেন নি।...

একটু সামলে নেওয়ার পর প্রথম অর্ধস্ফুট কণ্ঠে যে শব্দ উচ্চারণ করল যমুনা—তা হ'ল, 'পা—'

আর পারল না কিছু বলতে, ইঙ্গিতে পায়ের দিকটা দেখিয়ে দিল।

হয়ত এটাও জানতেন স্বরূপ, ওঁর পায়ের প্রতি স্ত্রীর দুর্বার আকর্ষণ, আশ্রয়ের জন্য ঐকান্তিক আকুলতা—

স্বরূপ বৃথা বাদানুবাদ করলেন না। পকেট থেকে রুমালটা বার করে পা একটু ঝেড়ে নিয়ে ঘুরে বসে পা তুলে দিলেন ওর দিকে।

কৃতার্থ যমুনা মাথাটা নামিয়ে কাছে এনে—যতটা ওর পক্ষে এ অবস্থায় সাধ্য—সবলে মুখখানা চেপে ধরল।

আবারও নামল অশ্রুর ধারা। বরং তাকে বর্ষণ বলাই উচিত।

এ সৌভাগ্য যে এ জীবনে আর কোনদিন আসবে—এ আশা কদিন আগেও তো ছিল না। এতদিনের এত মর্মান্তিক দুঃসহ দুঃখের ইতিহাস এই নীরব বর্ষণের মধ্যেই সে যেন নিবেদন করতে চায়।...

তিন চার মিনিট অপেক্ষা করলেন স্বরূপ, তারপর আস্তে আস্তে মাথাটা সরিয়ে আবার বালিশের দিকে তুলে দিয়ে নিজের পা নামিয়ে নিলেন।

শ্রান্ত যমুনা আঁচলে চোখ মুছে একটু পরে বলল, 'কেন এ কাজ করতে গেলেন। এত দয়া। ছি ছি! আমি যে এর যোগ্য নই। এর পর কি আর কারও কাছে মুখ দেখাতে পারবেন ?'

'মুখ দেখাবার জন্যে আমি খুব ব্যস্ত এ কথা কে বললে তোমাকে বিশাখা, আমি তো সমাজ-সংসার থেকে সরেই গেছি প্রায়—মধ্যে মধ্যে এক-আধ দিন এসে সকালের সেবাপূজো বা রাত্রের আরতি করতাম। যেদিন তোমার খবর পেয়েছি সেইদিন থেকে তাও বন্ধ করেছি। সোজা বাগানবাড়িতে চলে যাই, সেখান থেকেই আসি।'

বিশাখা! বহু—বহু দিনের মধু ও বিষের স্মৃতিমাখা নাম!

আরও একটু চুপ ক'রে থেকে বিশাখা বলে, 'মা খুব আঘাত পাবেন—'

'তা হয়ত পাবেন। পাবেন কেন, পেয়েছেন।'

'তিনি জানেন ? শুনেছেন ? আপনি এইভাবে দেখাশুনো করছেন—'

চমকে ওঠে বিশাখা।

'জানেন বৈকি। আমি তো তাঁর কাছে কোন কথা গোপন করি না। তা ছাড়া, রামরতিয়া তো আগে তাঁর কাছেই গিছল। মা-ই প্রথম টাকা দিয়েছেন ওর হাতে—তোমার চিকিৎসার জন্যে।'

'মা! মা দিয়েছেন ?'

একটু হাসেন স্বরূপ, 'তুমি নাকি বলেছ রামরতিয়াকে, তোমার দেবীর মতো শাশুড়ি, তাই তাঁকে পুজো করো। কথাটা কি তোমার মনের কথা নয় ?'

'মনেরই কথা। ও অবস্থায় উনি যা দয়া করেছেন, কেউ তা করে না।...এ, অপর কেউ শুনলেও বিশ্বাস করবে না।'

অতিকষ্টে থতিয়ে থতিয়ে কথা-কটা বলে। বলতে বলতেই মনে হয়—এ প্রসঙ্গ না তোলাই উচিত ছিল, ক্ষতর জ্বালা বাড়িয়ে তোলা শুধু শুধু।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। হেমন্তর সন্ধ্যা আসতে দেরি হয় না।

তার মধ্যেই খুব আস্তে, প্রায় চুপিচুপি বলে, 'কেন আমাকে এমনভাবে বাঁচাতে গেলেন আপনারা! আমাকে তো আর গ্রহণ করতে পারবেন না! আমাকে মরতে

দেওয়াই উচিত ছিল।'

'মা পারবেন না। আমাদের দেবতার সংসার, তাঁরই সম্পত্তি। আমরা সেবাইত মাত্র। আমাদের সেখানে হাত-পা বাঁধা। কিন্তু আমি কি তোমাকে ত্যাগ করেছি? সে কথা তো কেউ জিজ্ঞাসাও করে নি। আমিও কাউকে কখনও বলি নি। এ প্রশ্নই তো ওঠে নি।'

বলতে বলতেই স্বরূপ উঠে দাঁড়ান।

'আর না। এতটা কথা বলাই অন্যায় হ'ল। আমি যাই। দিন দুই তিন এদিকে আসা হবে না, গোকুলে যেতে হবে। তবে এদের সব বলা আছে। ডাক্তার-বাবুকেও বলেছি আমি থাকব না, তিনি রোজ আসবেন।'

আর কোন অনাবশ্যক কথা না বলে, বা কোন বিদায় সম্ভাষণ জানাবার চেষ্টা না ক'রে স্বরূপ একেবারেই ঘরের বাইরে চলে যান।

আবেগের পর আবেগের আঘাত দেওয়াটা এমন ভাবে—উচিত হ'ল না।

॥ ১৭ ॥

এ কী শুনল সে।

আশা? আশ্বাস? স্তোক?

রোগিনীকে দ্রুত সুস্থ করার জন্যে নতুন ওষুধের ব্যবস্থা?

তা ছাড়া আর কি হ'তে পারে! এ কেমন ক'রে হয়!

সত্যিই কি শুনল কথাগুলো?…এমনও একবার মনে হয়।

অবিশ্বাস্য, অবিশ্বাস্য! এ যে একেবারেই অবিশ্বাস্য! কোন মতেই সম্ভব হতে পারে না।…

সে পাগল হয়ে গেল না তো? সত্যিই কি স্বরূপ এসেছিলেন? না না, এসব কথা সত্যিই কেউ বলে নি। এ—এ ওর বিকারের ঘোর।…

তবু যেন কি হয়—এই নিদারুণ সংশয়ের মধ্যেও—

চারিদিকে যেন কত অদৃশ্য সহস্র যন্ত্রের অজানা অপরূপ সঙ্গীত বেজে উঠতে চায়।

মনে হয় আকাশ বাতাস জুড়ে বহু বাতি জ্বলে উঠেছে। হেমন্তের অপরাহ্ন-ম্লানিমা কোথাও কিছু নেই।

আলো গান আনন্দ আশা শুধু—চারিদিকে।…

তার মানেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর।

ক্লান্ত অবসন্ন বিশাখা—না, যমুনা কেন আর থাকবে ও, ঐ তো উনি সেই নামে ডাকলেন বিশাখা বলে; কলঙ্ক-লাগা নাম শুদ্ধ হয়ে উঠল শুদ্ধসত্ত্ব মানুষটার উচ্চারণে—চোখ বুজল।

কিছু আর ভাববে না সে।

এখন যদি এ অসুখ থেকে না ওঠে তো সবচেয়ে ভাল হয়।

আর, মরতেই তো চেয়েছিল।

আচ্ছা, সত্যিই সে মরে যায় নি তো? এ যা সত্যি মনে হচ্ছে তা সত্যি নয়। মরার পরের এক স্বপ্নলোক, মায়ালোক? মৃত্যুর পারে সবই হতে পারে।

স্বর্গ? হ্যাঁ, তাও হতে পারে। এই স্বর্গই রচনা করেছে সে মনের ইচ্ছা দিয়ে। কিন্তু—

চোখ খুলে প্রায়ান্ধকার ঘরে একবার চেয়ে দেখল। ঐ তো ছাদ দেখা যাচ্ছে—পাথরের বড় বড় টালি বসানো, কড়িও নেই বরগাও নেই। এই দরজা সেও তো তেমনি আছে—আলকাতরা দিয়ে রঙ করা। বাক্স উপুড় করা টেবিলে এসব ওষুধের শিশি, গ্লাস, ফিডিং কাপ—এও স্বপ্ন?

তবে অবশ্য এও মায়া বা স্বপ্নেরই অঙ্গ হতে পারে বৈকি।

সত্যি হলে এসব কোথা থেকে এল?

কে এত খরচা করবে—এ হতভাগীর জন্যে?

হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন তার নতুন পাওয়া মাসিমা।

'ওমা, বড় গোসাঁই কখন নিঃশব্দে চলে গেছেন তা টেরও পাই নি। তাই আরও ঘরে আসি নি। দুধ বার্লি জুড়িয়ে যাচ্ছে দেখে সাড়া দিয়ে ঘরে ঢুকব—দেখি জুতো নেই। তাতেই বুঝলুম বড়দা চলে গেছেন।···নাও, এখন এটুকু খেয়ে নাও দিকি!' বলতে বলতে এক হাতে একটু তুলে বসিয়ে দিয়ে বার্লির গ্লাস মুখে ধরলেন।

এও কি মৃত্যু পরপারের ঘটনা? স্বপ্ন বা মায়ালোকের?

কথা বলার ইচ্ছা বা শক্তিও যেন নেই। খেতে ইচ্ছে করছে না বললেই অনেক কথা উঠবে—তাই কোন মতে বার্লিটা খেয়ে নিয়েই আবার শুয়ে পড়ল।

'ও মা,এখনই আবার শুয়ে পড়লে কেন মা, একটু নিজে নিজে বসো না।'

'একটু পরে উঠে বসব মাসিমা, এখন থাক।'

চোখ বুজে বুজেই বলে।

'অনেকক্ষণ কথা বলেছ বুঝি! তাই ক্লান্ত লাগছে! তা শোও, আর একটুন শুয়ে থাকো। আমি বরং গা-হাত একটু টেনে দিই—'

গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে—মানে একটু জোর দিয়েই, কতকটা গা-টেপা ধরনেরই—হঠাৎ নিজেই হেসে উঠলেন মহিলা।

চমকে উঠল বিশাখা।

কোথায় যেন কি একটা যোগাযোগ মনে হতে লাগল, এই হাসির সঙ্গে স্বরূপের উপস্থিতির।

আড়ি পেতে শুনছিলেন নাকি? তা তেমন তো কোন কথা হয় নি!

ঐ, আবারও ঘুরে ফিরে স্বপ্নকে সেই বাস্তবের সঙ্গেই জুড়তে চাইছে সে।

যেন এসব বাজে চিন্তা মুছে ফেলার জন্যেই—হাত দিয়ে যেমন মাছি তাড়াতে চায় লোকে—সেই ভাবে, হঠাৎই প্রশ্ন করল—মনে হ'ল একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই—'অত

হাসছেন যে।'

'আর ব'লো না মা! হাসি কি আর সাধে! ঐ রামরতিয়াটা! ও লণ্ঠনটা মুছে তেল ভরে দিচ্ছিল, আমিই বলেছিলুম, ও-ই জ্বালবে ভাবছি—তাই একটু বাবা মহাবীরের ঘরে গেছি পেন্নাম করতে—মনে হ'ল বোধ হয় আড়ি পেতে কিছু শুনে থাকবে তোমাদের কথাবাত্তারার—ওমা বেরিয়ে দেখি সেই অন্ধকারের মধ্যে বুড়ো মাগী দু'হাত তুলে নাচের অঙ্গভঙ্গী করছে! আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে বলে, 'তুমি আলোটা জ্বালিয়ে ঘরে নিয়ে যাও বাহুমন মা, যদি মোড়ের দোকানটা খোলা থাকে আমি এখনই একটু পেঁড়া কিনে এনে মহাবীরজীর ঘরে দিই - তাজা তাজা।'…

আবারও জীবনের ছেঁড়া তারগুলো যেন আপনি আপনি এসে জোড়া লাগে। আবারও সেই হাজার বাজনা বেজে ওঠে; অন্ধকার বাইরের আকাশে অসংখ্য বাতি জ্বলতে চায়—দেওয়ালির মতো।

তাহলে কি যা শুনেছে তা সত্যিই!

নইলে রামরতিয়া সদ্য সদ্য মহাবীরের পুজো দেবার জন্যে দৌড়ত না। এ জগতে বোধ হয় এই একটিই লোক আছে, রক্তের সম্পর্ক'র থেকে অনেক অনেক বেশী আপন। একমাত্র নিঃস্বার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী।

ছোট কাজ করতে হয়, বলে সকলে। অথচ এটা তো একান্ত প্রয়োজনীয় কল্যাণ কর্মের অঙ্গীভূত। তবু ছোট জাতের মধ্যে ধরে নিয়েছে, ভেতর বাড়িতে যাবার জো নেই, দূর থেকে আলগোছা টাকা দেয়—ওকেও দুহাত পেতে নিতে হয়, প্রসাদ কি মিষ্টি খাবার দিতে হ'লে পাতায় ক'রে সামনে মেঝেতে নামিয়ে দেয়। অথচ বিশাখার তো মনে হয় এই মানুষ ওর সবচেয়ে বেশী প্রণম্য। মহাপ্রাণ মানুষ। দিদি তো বলেই—মন থেকেই বলে—রামরতিয়া নিজে লজ্জা পাবে তাই, নইলে নিত্য পায়ের ধুলো নিত।…

এতগুলো বিভিন্ন বিচিত্র ভাবাবেগের প্রতিক্রিয়াতেই সম্ভবত, আধো মূর্ছিত আধো তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে রইল। রামরতিয়া পেঁড়া কিনে আনিয়ে বাইরে থেকে পুজারীর সামনে রাখিয়ে দিয়েছিল, পুজারীজী প্রসাদ ক'রে এনে এ ঘরে দিয়ে গেছেন কখন—সে সব কিছুই জানে না বিশাখা।

ডাক্তারও একবার এসেছিলেন, বড় গোসাঁই নাকি খবর নিতে বলে গিছলেন। তিনি দেখে ইশারা ক'রে এদের বাইরে ডেকে বললেন, 'এটা মানসিক ক্লান্তি, রেস্ট-এ আছে, থাকুক। ঘুম ভাঙলে যা খাবার খাবে, তোমরা ডেকে ঘুম ভাঙিও না!'

ঘন্টাখানেক পরেই অবশ্য এ ভাবটা কেটে গেছে, সচেতনতা এসেছে।

মনেও পড়েছে সব কথা।

কিন্তু আগেকার বিপরীতমুখ ভাবোচ্ছ্বাসটা নেই আর, একটু প্রশান্তি এসেছে।

সচেতনতা যে এসেছে তা আর এদের জানাল না তখনই। চুপ ক'রে শুয়ে শুয়ে আদ্যন্ত নিজের কথাই ভাবতে লাগল।

ভগবান তাকে নিয়ে কি নিদারুণ নিষ্ঠুর খেলাই খেললেন! হয়ত এখনও

খেলছেন !

কেন ? কেন ? সেইটেই তো ভেবে পায় না ।

ওর কি কোন দোষ ছিল ? ওর চিন্তা বা কর্মের মধ্যে জ্ঞানত কোন কলুষের ছোঁয়া ?

তবে ?

তবে কেন সৌভাগ্যের চরম শিখরে তুলে এমন ভাবে লাঞ্ছনার অন্ধ শিলায় আছড়ে ফেলবেন ? এমন ভাবে পাপী অস্পৃশ্য ব'লে চিহ্নিত ক'রে দেবেন চির-জীবনের মতো ?

আজ অবিশ্বাস্য সৌভাগ্য বলে যা মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে মৃত্যুপারের ঘটনা এসব—এ কি নতুন ক'রে প্রাপ্য তার ?

বেশী যেন ভাবতেও পারে না, আবারও উত্তেজনার জট পাকিয়ে যায় মাথার মধ্যে কথাগুলো—

কিছুক্ষণ পরে সে ভাবটাও স্তিমিত হয়ে আসে । এবার চিন্তা-ভাবনাটা নিজের দিক থেকে স্বামীর দিকে চলে যায় । তাঁর কথা ভাবে, আপনিই মনে আসে কথা-গুলো, চিন্তাটা তাঁকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয় ।

নিজের সৌভাগ্যের কথা ভাবছে—এর জন্যে সে মানুষটাকে কী মূল্যই না দিতে হবে সারা জীবনভর । এক রকম অছুতের জীবন কাটাতে হবে না তাঁকে ?

এই তো, প্রথমেই তো শুনল, সংবাদ কানে যাওয়া মাত্র মন্দিরের সংস্পর্শ ছেড়ে দিয়েছেন, পূজো আরতি কিছুই করেন না । মার সঙ্গে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যান কিনা তাই বা কে জানে ! হয়ত—ওকে নিয়ে সে বাগানবাড়িতে থাকা তো চলবেই না, কারণ দোল ঝুলনের সময় বিগ্রহ সেখানে গিয়ে থাকেন দু-চার দিন—এখন নিশ্চয় কেউ দু বেলা প্রসাদ পোঁছে দিয়ে আসছে, তাও বন্ধ হবে । দূরে কোথাও হয়ত বাড়ি ভাড়া ক'রে থাকতে হবে, যদি বেশীদূরে হয়, কে-ই বা বারো-মাস তিনশ পঁয়ষট্টি দিন প্রসাদ দিয়ে আসবে ?

সে রান্না ক'রে দিতে পারে অবশ্যই । কিন্তু এর আগে শুনেছে সে, ঐ অল্প ক' দিনের দাম্পত্য-জীবনেই—দীক্ষা গ্রহণের পরে স্বপাক অথবা ভগবানের প্রসাদ ছাড়া খান নি কিছু ।

যেমন সে অহরহ অপমানিত লাঞ্ছিত বোধ করছে, তেমনি তাঁকেও ভোগ করতে হবে । হয়ত দীর্ঘ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত । তিনি কি আরও অকারণে এই শাস্তি ভোগ করবেন না !

ওর একটা আপাত কারণ আছে, তাঁর তো সেটুকুও নেই । নিষ্পাপ শুদ্ধসত্ত্ব মূর্তি ।

কর্তব্য, না ভালবাসা ?

কর্তব্য কিসের । কর্তব্য বোধ করার তো কোন কারণ নেই । দয়া করারও না । ওঁর জীবনে এসে পড়ে একটা মহৎ জীবন-সম্ভাবনাকে নষ্ট ক'রে দিল ।

তবে ভালবাসা ? কিন্তু এতখানি ভালবাসারই বা কি কারণ থাকতে পারে !

সে সময় পাওয়া গেল কই !

কেন, কেন সে মরতে পারল না, গলায় দড়ি দিয়ে কিম্বা নবদ্বীপে গঙ্গায় ডুবে !

হতভাগী, নিজেও জ্বলবি—জ্বলছিসই তো—ঐ ঈশ্বরের মতো মানুষটাকেও জ্বালাবি !…

মাসিমা ঘরে ঢুকলেন আচমকাই।

'এই তো ঘুম ভেঙেছে, বেশ পরিষ্কার চোখ চেয়ে আছ। আমাকে ডাকো নি কেন ? খাবার সময় পেরিয়ে গেল ! খাবে তো একটু দুধ আর রুটি চটকানো—ক' মিনিট বা লাগে ! নাও, এবার নিজে চেষ্টা ক'রে উঠে বসো, আমি দুধটা একটু গরম ক'রে আনি, কাঠের আঙরা রেখে দিয়েছি ঐ জন্যে— ।'

ক্লান্ত সুরে উত্তর দিল বিশাখা, 'না-ই বা এক রাত খেলুম মাসিমা, এ দেখছেন না যমের অরুচি। অততেও যখন মরি নি, একটু অনিয়মেও মরব না !'

'তা বললে তো হবে না মা, তোমার গোসাঁই যে বার বার বলে গেছে, একটুও অনিয়ম না হয়। নিমুনিয়া হয়েছিল, জলের ওপর শুয়েছেলে দু দিন—ডাক্তারটা খুব ভাল তাই, নইলে এত তাড়াতাড়ি সারতে না।

গোসাঁই বার বার বলে গেছেন অনিয়ম না হয়, ডাক্তারকে দু বেলা খবর নিতে বলেছেন—এও কি কর্তব্য ? না ভালোবাসা ?

সে প্রশ্নই ঘুরে ঘুরে আসে—কেন, কেন ?

পরের দিন আসার কথা নয়, তবু সারা বেলা স্বরূপের পথ চেয়েই কাটল।

রাত্রেও ভাল ক'রে ঘুম আসছে না। অনেক পরে—সমগ্র ব্রজপুরীতেই বোধ-হয় সুষুপ্তির নিস্তব্ধতা নেমেছে—কেউ আর কোথাও জেগে নেই—ওদের বাড়ির সামনের পথে স-সন্তর্পণ অতি মৃদু পায়ের শব্দ উঠল, একজন নয়—একাধিক ব্যক্তির।

মনে হয় দ্বিতীয় প্রহর পূর্ণ হয়েছে, বারোটাও বেজে গেছে। আগে হলে শেঠী-দের ও কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরে অল্প কিছুক্ষণ সানাই বেজে দ্বিপ্রহর পূর্ণ হওয়ার সংবাদ ঘোষণা ক'রে বাকী রাতের মতো নিস্তব্ধ হ'ত। তারও আগে—বিশাখার বিয়ের আগে নাকি গোবিন্দ মন্দিরেও প্রহরে প্রহরে বাজত—এখন প্রত্যুষে মধ্যাহ্নে আর সন্ধ্যায় একবার ক'রে নিয়ম রক্ষা হয়। তবে এই বন্যার ফলে সব মন্দিরেই এসব বাজা বন্ধ হয়ে গেছে, বাজনদাররা যে যার দেশে গেছে, নিজেদের ঘরদোর আত্ম-জনের খবর নিতে, সামলাতেও।

তা হোক, মোটামুটি সময়ের জ্ঞান আছে বিশাখার। রাত বারোটার কম নয় সময়টা।

অন্য দিন হ'লে ওর কানে এটুকু শব্দ যেত না। আজ ওর ঘুম ভাল হয় নি, সন্ধ্যা থেকে স্বামীর চিন্তাটাই মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে রোগদুর্বল মস্তিষ্ককে উত্তপ্ত ক'রে তুলেছে, তন্দ্রা পুরোপুরি গাঢ় হতে দেয় নি। কখনও কখনও ক্লান্তিতে চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে আসছে, আবার খানিক পরে কে যেন চাবুক মেরে সচেতন করছে—

পূর্বসূত্রের খেই ধরছে মন।

সে যাক—কে আসছে এরা? এত রাত্রে, এমন প্রায় নিঃশব্দে?

চোর? কিন্তু চোররা এখানে সাধারণত এত সাবধানে আসে না। চোর ঘরের ছাদে ছাদে আলসেয় ঘোরে—অনেকের চোখেও পড়ে, তারা বেপরোয়া—তাদের ভাবটা 'তোমরাও আছ আমরাও আছি, যেদিন যার সুবিধে হয়, সেই জিতবে!'

অন্তত এই রকম শুনেছে সে।

কোন বাদশা, আকবর না কে এখানের নাম দিয়েছিলেন ফকিরাবাদ। ফকিরের দেশ, চোর আর কত পাবে?

শ্বশুরবাড়ি ছিল চারদিকের কড়া পাহারার মধ্যে। এখানে সামলাবার মতো কিছু নেই, সাবধান হবে কেন, চোরই বা কে আসবে ওর এখানে।

এখানে তো বড় দরজার খিল বা ছিটকিনি নেই, কবে ভেঙে গেছে—সারানো হয় নি। কে সারাবে? মালিকেরা আসেন নি অনেক কাল, চিঠি নিয়ে এক আধ দল যা আসে মধ্যে মধ্যে—তাদের এত কি গরজ? দুদিনের মুসাফির, নিজেদের নির্দিষ্ট ঘরে তালা দেবার ব্যবস্থা থাকলেই হ'ল।

অবশ্য পূজারীজী বাইরে খাটিয়া পেতে শোন, বারো মাসই। নিজের কুটুরীর সামনেই শুতেন—বিশাখা আসার পর থেকে এদিক ঘেঁষে খাটিয়া পাতেন, কচি মেয়েটা না ভয় পায় বা কেউ না উত্ত্যক্ত করে—এই ভেবেই।

আজও তাই শুয়ে আছেন। এ ঘরেই নিচে মাসিমা ঘুমোচ্ছেন।

না, ওর ভয়ের কোন কারণ নেই।

তবু—

শব্দটা এই দরজার সামনেই থামল, মনে হচ্ছে এদিকেই আসছে, এই ঘরের দিকে।

এবার ভয় পেল সে। উঠে বসল, বুক কাঁপছে তার।

মাসিমাকে ডাকবে, তাও যেন পারছে না।

কিন্তু সে চেষ্টার আগেই ঘরে ঢুকল অতি পরিচিত এক মূর্তি।

রামরতিয়া!!

আস্তে আস্তেই বলল, স্বাভাবিক কলকণ্ঠে নয়, 'বহুরাণী দিদি, তুমি জেগে আছ এখনও! জয় বাঁকেবেহারে ভগবানজী! দ্যাখো কাকে এনেছি, কে এসেছেন!'

মাসিমাও ধড়মড় ক'রে উঠে বসেছিলেন, এখন পিছনের অবগুণ্ঠিত মানুষটিকে দেখেই বিছানাটা এক টান মেরে সরিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

কে এলেন? এত রাত্রে! বিশিষ্ট কেউ, সেটা একবার চেয়েই বোঝা গেছে! সামান্য আলোতেই—সারারাত হ্যারিকেন জ্বলে, কমানো থাকে—সাদা গরদের থান ধুতির ওপর সাদা সিল্কের চাদর জড়ানো—চিক্‌চিক্ ক'রে উঠল।

ঘরের ভিতরে আর দু'পা এগিয়ে আসতে চেনার কোন অসুবিধেই রইল না।

এর মধ্যে রামরতিয়া আলো বাড়িয়ে দিয়েছে।

শ্যামসোহাগিনী! স্বয়ং!

'মা!'

প্রায় কেঁদে ওঠার মতোই একটা ডাক দিয়ে বিশাখা উঠে এসে ওঁর পায়ের ওপর যেন উপুড় হয়ে পড়ল।

পায়ে মুখটা চেপে ধরে।

সত্যিকার চোখের জলই নামল এবার। অবিরল ধারে।

এই সুদীর্ঘকালের সমস্ত লাঞ্ছনা অপমান কষ্ট এবং কঠিন দুঃসহ তপস্যার বেদনা যেন পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল মনের মধ্যে—এখন পুঞ্জীভূত মেঘের মতোই তা অন্তহীন বর্ষণে পরম পূজ্য পা দুটি ধুয়ে দিতে লাগল।

॥ ১৮ ॥

এ ব্যথা-বেদনা-দুঃখের পরিমাণ বুঝতে শ্যামসোহাগিনীর কোন অসুবিধা হ'ল না।

তিনি সেই শ্রেণীর তীক্ষ্নদর্শিনী অভিজ্ঞা মহিলা, যিনি অনায়াসে অপরের মনটা দেখতে পান—শুধু বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে নয়, সহানুভূতি দিয়েও।

এ তিনি জানতেন। ঠিক এই চিত্রই তাঁর মনে আঁকা হয়ে ছিল আসতে আসতে। তারও পূর্ব থেকে মানসপটে দেখেছেন।

প্রস্তুত হয়েই ছিলেন।

তাই তিনি বাধা দিলেন না, পা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন না। স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন প্রায় চার-পাঁচ মিনিট। তারপর স্নেহকোমল কণ্ঠে বললেন, 'ওঠো মা, রোগা মানুষ, এভাবে ঠাণ্ডায় পড়ে থাকতে নেই। এবার ওঠো, ওপরে চৌকির ওপর স্থির হয়ে বসো।'

বলে, দু হাত দিয়ে এক রকম কোলে করার মতোই তুলে তক্তপোশে বসিয়ে দিলেন।

ইঙ্গিতে—বা হয়ত পূর্বেই নির্দেশ দেওয়া ছিল—রামরতিয়াও বাইরে চলে গেছে, মাসিমাকে ডেকে নিয়ে। যাবার সময় মাসিমার দিনের বেলায় বসার বা গা-গড়াবার জন্যে কেনা খেজুরপাতার চ্যাটাইটা নিতে ভুল হয় নি, বাইরে থেকে দরজার কপাট দুটো টেনে দিতেও। এখন মহাবীরের ঘরের সামনে চ্যাটাই বিছিয়ে দিয়ে বললে, 'বাহ্‌ণ মা, এখানেই একটু গড়াও এখন। বড়মা যখন নিজে এসেছেন, জরুরী কোন বাত আছে। দু'এক কথায় হবে না। তবে চাদরটা মুড়ি দিয়ে শোও, বাড়ের পর মচ্ছর বহুত বেড়েছে—মালেরিয়া দেখা দিয়েছে খুব, ঘর ঘর বুখার।'

মাসিমাকে চাদর চাপা দিয়ে রেখে নিজে উঠে গেল রামরতিয়া। তবে বাইরে গেল না অবশ্যই। আড়ি পেতে শোনা ওর ব্যাধি একরকম—বিশেষ এ ক্ষেত্রে কি কথা হচ্ছে সেটা না শুনলে ওর চলবেই না। বড়মা ওকে ডেকে পাঠিয়ে একা ওকে নিয়ে এত রাত্রে সবাইকে লুকিয়ে এখানে এসেছেন—কি এমন কথা, বাড়িতে ফিরিয়ে নেবেন কিনা—শুনতে না পেলে পেট ফুলে মরেই যাবে।

আর, এটা তো ওর বিজয়-গৌরবও।

এর পরও মিনিট তিন-চার সময় নিলেন শ্যামসোহাগিনী। বিশাখাকে শান্ত হবার অবকাশ দিতে চুপ ক'রেই বসে রইলেন।

এ যে কতখানি মানসিক আলোড়ন—বিপর্যয় বলাই উচিত—তা তিনি বুঝতে পারছেন। যদি অসুখ বেড়ে যায়, বুকে কিছু হয়, তো তাঁর বড় ছেলে, ডাক্তার, সবাই দায়ী করবে।

কান্নার বেগটা আছে তখনও, তবে সামলে নেবার চেষ্টা করছে বিশাখা।

এখন এ অন্য এক আলোড়ন। উনি হাতে ক'রে তুলেছেন, স্নেহকোমল কণ্ঠে কথা বলেছেন। বৌমা বলেন নি অবশ্যই কিন্তু মা বলেছেন। যে ভেল্কীর খেলা অসুখ থেকে ওঠবার পর সে দেখছে, এও তো তার মধ্যে একটা।

বরং বলা চলে সবচেয়ে অবিশ্বাস্য।

খানিক পরে শ্যামসোহাগিনী তেমনি আস্তে, তেমনি কোমলকণ্ঠেই বললেন, 'একটু বরং শুয়ে পড়ো না। আমার কথা শুনতে তো কোন অসুবিধে হবে না তাতে। অসুখ আবার বেড়ে না যায়—এই ভাবনা। অথচ আমার হাতেও আর সময় নেই।'

'না মা, আপনি বলুন। বসে থাকতে কষ্ট হবে না, দিনরাত শুয়ে থাকতেই বেশী খারাপ লাগে।'

মাথা হেঁট ক'রেই বসে ছিল, সেই ভাবেই উত্তর দিল সে।

সহজ হতে পেরেছে সে—এটা বোঝাবার জন্যেই আরও যেন এতগুলো কথা বলল।

বলেই আবার ভয় হচ্ছে, একটু বেশী প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পেল না তো? উনি কিছু ভাববেন না তো—!

শ্যামসোহাগিনীর মুখে তেমন কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেল না। পাবে না তাও জানে বিশাখা।

উনি একেবারেই কাজের কথা পাড়লেন।

সময় বেশী হাতে নেই, সব দিক দিয়েই।

গোপনে বেরিয়ে এসেছেন, আর কেউ না জানুক, রাত্রের চৌকিদার জানে। সে-ই ইঙ্গিতমাত্রে নিঃশব্দে কাটা দরজা খুলে দিয়েছে। সে অবশ্য বহুকালের লোক, কর্ত্রীর শাসন সম্বন্ধে সে অবহিত। তবু—আর কেউ না ওঠে, তাদের চোখে না পড়ে।

বললেন, 'মা, কি হয়েছিল, কে দায়ী—এসব কথা এখন অবান্তর। আমার কি বিশ্বাস, বা ছেলেদের—সে সব বিবেচনা এখন কাজে লাগবে না। আমাদের শাস্ত্রর শাসন থেকে আমরা বহু দূরে চলে এসেছি। স্মৃতির নির্দেশও আর কাজে আসে না। তা ছাড়িয়ে এখন বড় হয়ে উঠেছে লোকাচার। সে সব নির্দেশ আইন লোকের মুখে মুখে বেড়েই উঠেছে। অবশ্য শিথিলও হয়েছে ঢের, সে আমার এই জীবনেই দেখতে পাচ্ছি। তবু এখনও ঢের আইন-বিধি-নিষেধ আমাদের মেনে চলতে হয়।'

এতটা বলে একটু চুপ ক'রে রইলেন। শ্রোত্রীর মনের আধার এসব কথার যোগ্য নয়, অল্প বয়সে এসেছে, তেমন লেখাপড়ার সময় পায় নি নিশ্চয়। তবু যদি কিছুও বোঝে।

আবার পূর্ব প্রসঙ্গেরই খেই ধরলেন। বললেন, 'আমি তোমার চেয়েও অল্প বয়সে এ বাড়ি এসেছি। কিন্তু আমার শ্বশুর মশাই—গুরুদেবও তিনি—খুব যত্ন ক'রেই লেখাপড়া শিখিয়েছেন, সংস্কৃতও কাজ-চলা গোছের জানি, শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বেশীদূরেও যেতে হবে না, মহাভারতেই আছে কানীন আর সহোড় সন্তানের কথা। এদের গর্ভধারিণীর কোন শাস্তির ব্যবস্থা দেন নি তাঁরা, ত্যাজ্য বা অস্পৃশ্য করেন নি, বরং বলেছেন স্বামীকে এসব সন্তানের পিতৃত্ব নিতে, সন্তান বলে স্বীকৃতি দিতে এই সব সন্তানকে। যে জন্যে কর্ণকে শ্রীকৃষ্ণ আর কুন্তী বার বার লোভ দেখিয়েছেন পাণ্ডবদের সিংহাসন অধিকার করতে, মৃত্যুর পর পাণ্ডবরা জ্যেষ্ঠ অগ্রজের প্রাপ্য পিণ্ডদান করেছেন। তেমনি কন্যা যদি অপরের দ্বারা গর্ভবতী হয়ে বিবাহ করে, স্বামী সে-সন্তানকেও স্বীকার করবেন এ নির্দেশও দেওয়া আছে।'

আবারও থামলেন একটু।

এসব কথা কখনও শোনে নি বিশাখা, কারও মুখেই শোনে নি। শোনার কথাও না। সে স্তম্ভিত হয়ে যাবে সেটাই স্বাভাবিক। সেই জন্যেই সময় দিলেন খানিকটা।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কিন্তু এসব কথা লোকে ভুলে গেছে। কেউ জানেও না। এমন কি পণ্ডিতদেরও একথাটা বলতে গেলে পরবর্তী বহু বিধান দেখিয়ে দেবেন, শাস্ত্র-গ্রন্থের আদেশ শোনাবেন। কাজেই আমাদের হাত-পা বাঁধা মা, এসব জেনেও কোন উপায় নেই তোমাকে এ বাড়িতে ফিরিয়ে নেবার। তোমার স্বামী তা জানেন, কিন্তু তিনি তোমাকে ভালবাসেন এটা বুঝেছি। তিনি তোমাকে ঐ অপ্রীতিকর ঘটনার জন্যে দায়ীও ভাবেন না। আর বিবাহ করবেন না একথাও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে ছোট ভাইয়ের হাতে সেবাইতের সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন, সেই মতো তৈরী করছেন, বলতে গেলে হাতে ধরে শিখিয়েছেন, শেখাচ্ছেন। তুমি কোথায় আছ, বেঁচে আছ কিনা খবর পান নি, মনে হয় কোন আশাও রাখেন নি বলেই সাধনভজনে ডুবে যেতে চেয়েছেন। আমার মৃত্যু হলে এটুকু সম্পর্কও ত্যাগ করবেন—পুরোপুরি সাধকের জীবন গ্রহণ করবেন এই ছিল

তাঁর সঙ্কল্প।

'তবে বাস্তব বা সাংসারিক জীবনের বিধি-নিষেধ সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা বেশ স্পষ্ট। তোমার জীবিত থাকার আর এখানে থাকার সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি নিত্যসেবার সমস্ত কাজ ত্যাগ করেছেন, অর্থাৎ তোমাকে ত্যাগ করবেন না—গ্রহণই করবেন এ বিষয়েও তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প।'

এবার একটু বেশী সময় চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আমাকে ভুল বুঝো না মা। এতে আমি বাধা সৃষ্টি করতে আসি নি। করতে গেলেও কোন কাজ হবে না এও জানি। আমি ওকে তোমার চেয়ে বেশী চিনি অন্তত, যা করে তা ভেবেচিন্তেই করে, আর একবার মনস্থির করলে আর তা থেকে নড়ে না···অবশ্য কোন অসুবিধেও নেই তার, শ্রীরাধা-গোপীবল্লভের সম্পত্তির এক কড়াও তার স্পর্শ করার দরকার হবে না, যদিও সে আইনত অনেক নিতে পারে। আমরা গুরুগিরি করি তা তো তুমি নিজেই দেখেছ, প্রথম দিনই সে কথা বলে দিয়েছি, তার পৃথক আয় আছে। আমি ও কাজ প্রায় ছেড়ে দিলেও বছরে দেড় হাজার দু'হাজার টাকা প্রণামী আসে—একটা বড় সংসার তাতেই চলে যেতে পারে। আমার শ্বশুরমশাই আর স্বরূপের দাদামশাই দু'জনেই অনেক টাকার সম্পত্তি ওকে দিয়ে গেছেন। নগদ টাকা, কোম্পানীর কাগজ—বাড়িও, কাশীতে প্রয়াগে আজমেঢ়এ। জমি আছে কানপুরে, এটোয়াতে, রাজপুতনাতেও। তখনকার দিনে গুরুকে ভূসম্পত্তি উৎসর্গ করা লোকে পুণ্যকর্ম মনে করত। পাছে এখানে থাকলে তোমাকে বহু কথা শুনতে হয়, লোকে বাজে ইঙ্গিত করে, সেই কারণেই সে দূরে কোথাও চলে যেতে চাইছে। আজমেঢ়এ বাড়ি আছে, সেখানেও যেতে পারে—বা অন্য কোথাও বাড়ি তৈরি ক'রে নিতে পারে। এই ওর সঙ্কল্প। কাশী প্রয়াগে যেতে চাইছে না, সেখানে পরিচিত লোক বেশী বলেই সেখানকার কথা ভাবছে না।'

শুনতে শুনতে পাথর হয়ে যায় বিশাখা।

এত মহৎ লোকটা, এত মহাপ্রাণ!

কদিনের বা দেখা ওর সঙ্গে—তাতেই কেউ এত ভালবাসতে পারে!

শ্যামসোহাগিনী এবার বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন।

কোথায় যেন বাকী কথাটা বলতে সঙ্কোচে বাধছে।

তারপর কথাটা বললেন যখন, অনেক আস্তে, গাঢ় কণ্ঠে বললেন, 'এবার আসল কথাটা বলছি—তবে আবারও বলছি, ভুল বুঝো না। ওর—স্বরূপের—গোপীবল্লভঅন্ত প্রাণ। তাঁর পূজা সেবা, পাল-পার্বণ এছাড়া অন্য কোন চিন্তা নেই ওর। পড়তে গিছল কাশীতে সে যেন নিখুঁত ভাবে সেবা করতে পারে, এই সেবাইত পদের, গুরু হওয়ায় উপযুক্ত হতে পারে—সেবার সমস্ত মর্ম বুঝে, এই জন্যেই। সেই গোপীবল্লভ, সেই ব্রজধাম ছেড়ে গেলে ওর দেহটাই যাবে। মন পড়ে থাকবে এখানে। ওকে আমি চিনি,—একটা বিরাট হতাশা এসে যাবে জীবনে। এখন তোমার জন্যে যা করছে তার অনেকটাই হয়ত ভালবাসা—কিন্তু ঐ অল্প কদিনের সহবাসে ঠিক যথার্থ ভালবাসা আসে না। প্রথম ভালবাসার আবেগ ওটা, আর

অনেকখানি কর্তব্যবোধ। প্রথম ঝোঁকটা কেটে গেলে কি একটা শূন্যতা আসবে না?…জানি না, তুমি এসব কথার মর্ম বুঝবে কিনা, হয়ত এসব কথা এই দুর্বল শরীরে বলা ঠিক হ'ল না—কিন্তু আমারও যে আর সময় নেই মা।'

এবার বিশাখা কথা বলল। তেমনি ঘাড় হেঁট ক'রেই, ধীরে ধীরে—প্রায় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'বুঝতে পারছি ওঁর জীবনটা নষ্ট করতেই আমার এ দুর্মতি হয়েছিল। আপনি আদেশ করুন, আমি কি করব। কি করলে ওঁর মনে শান্তি আসবে, উনি সহজ শান্ত হতে পারবেন। যাতে উনি সুখী হন আমি তাই করব। মরতে আমার একটুও ভয় নেই মা—শুধু, যদি কোন দিনও ওঁর দেখা পাই সেই আশাতেই মরতে পারি নি।'

'না না মা, সে পাত্রও নয়। আমি সে কথা বলতে আসি নি। মনে হচ্ছে তুমি আমাকে ভুলই বুঝেছ। গোকুলে আমাদের একটা মাটির ছোট্ট বাড়ি আছে। গোকুল এখান থেকে এমন কিছু দূর নয়। ছোট্ট গ্রাম, ব্রজবাসীরাই থাকে। কিছু, কদাচ কখনও, কোন তীর্থযাত্রী রাত্রিবাস করে। যাওয়া মাত্রই বুঝেছিলুম ছেলের মনের গতি কোন্ দিকে যাবে। আমি বুঝেছিলুম, ছেলে বোঝে নি। আমি সেইদিন থেকেই মিস্ত্রি লাগিয়েছি বাড়িটা মেরামত করার জন্যে। কুয়া আছে। মিষ্টি জলের কুয়া যা এদেশে দুর্লভ—কিন্তু বাথরুম নেই। বন-পরিক্রমার পথে অনেক শিষ্য-আত্মীয়রা আসেন—এক-আধদিন থাকেন—তাঁদের এত বাথ-রুমের দরকার হয় না। আমি তোমার কথা ভেবেই সেই সব ব্যবস্থা করাচ্ছি। স্বরূপ এর মধ্যে দেখেও এসেছে, আজও গেছে। ও যদি গোকুলে থাকে তাহলে এক-আধ দিন মন্দিরে আসতে পারবে, রাতে হোক কি ভোরে হোক, এখানের খবর নিয়মিত পাবে। ওখানে পরিচিত লোক কদাচ কখনও যায়, একদিনের বেশী থাকে না, তোমারও বিব্রত হবার কোন কারণ ঘটবে না। তুমি যদি ওকে এই ব্যবস্থায় রাজী করাতে পারো—আমি তোমার কাছে ঋণী থাকব। তোমার মনেও তাতে শান্তি আসবে। এ ব্রজধামের নেশা বড় সাংঘাতিক নেশা মা, এতদিন এখানে এই পরিবেশে থেকে কানপুর কি রাজস্থানে কোথাও গিয়ে নির্বান্ধব স্বজনহীন দেশে বাস করতে তোমারই কি ভাল লাগবে?'…

বলতে বলতেই একেবারে উঠে দাঁড়ান শ্যামসোহাগিনী।

অনেক দেরি ক'রে ফেলেছেন তিনি।

নদীর দিক থেকে শিবারব ভেসে আসে, প্রহর ঘোষণা করছে এরা। মানে তৃতীয় প্রহর গত হ'ল। আর দেরি করা কোনমতেই উচিত নয়। অনেকে এই সময়ই উঠে পড়েন, জপ শুরু ক'রে দেন।

বোধহয় এখনও রামরতিয়া দ্বারলগ্ন ছিল, শ্যামসোহাগিনী উঠে দাঁড়াবার সামান্য শব্দও তার কানে গেছে। কর্ত্রী দরজার কাছে আসার আগেই সে ঈষৎ মৃদু কণ্ঠে 'রাধে রাধে' বলে কপাট খুলে দিল।

দুজনে যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ সময় লাগল বিশাখার কথাগুলো বুঝতে। কী শুনল, কী চান উনি, ওকে ঠিক কি করতে হবে—এতক্ষণের এত কথা থেকে তার মর্মার্থ গ্রহণ করা ওর পক্ষে এমনিই কঠিন—এখন তো এই দুর্বল শরীর, বেশীক্ষণ কিছু চিন্তাই করতে পারে না!

মাসিমা এসে আবার শুয়ে পড়েছেন, খানিক পরেই রামরতিয়া একবার উঁকি মেরে দেখে চলে গেল—সম্ভবত বাড়িই গেল এবার—তাও নিঃশব্দে দেখল শুয়ে শুয়ে। আসলে এগুলো বাইরে থেকে দেখা, যন্ত্রের মতোই দেখেছে, এ দেখার সঙ্গে যেন আজকের এ ঘটনার কোন যোগাযোগ নেই, ওর মনেরও না।

এ ঘটনার অভাবনীয়তা, অবিশ্বাস্যতাই তো তাকে বিহ্বল করেছে সেই প্রথম থেকেই। সুদূর কল্পনার অতীত, কোন দিবাস্বপ্নের মধ্যেও এ আকস্মিক আবির্ভাবের কথা ভাবতে পারে নি সে।

এ জীবনের মতো তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে—তাঁর পক্ষে কোন কারণেই ওর মুখ-দর্শন করা সম্ভব নয়। বুঝি উচিতও নয়।

স্বামীর এই করুণা—করুণা ছাড়া আর কি বলবে সে, প্রেম গড়ে ওঠার তো সময়ই হ'ল না। তাও যেটুকু অবসর মিলেছিল তার মনের পাষাণপ্রাচীর, অজ্ঞাত অপরাধবোধ সেটুকু সুযোগও গ্রহণ করতে পারে নি। তা সত্ত্বেও স্বামী ভালবেসেছিলেন, সে ভালবাসা আজও ভুলতে পারেন নি—এমন কথা ভাববে কেন? এমন আশা পাগল ছাড়া করা সম্ভব নয়।

তবু এও যদি বা বিশ্বাস করার চেষ্টা করা যায়, শাশুড়ি সম্বন্ধে সেটুকু অবসরও নেই, নেই কোন কারণের লেশ।

তিনি যে এসেছিলেন, মা বলে ডেকেছিলেন, সস্নেহে গায়ে হাত দিয়েছিলেন—এই তো এখনও পর্যন্ত বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এ সবটাই মায়া, অবাস্তব স্বপ্ন, অথবা স্বামীর করুণার অকারণ আকস্মিক এই প্রচণ্ড আঘাতে আবার বিকারগ্রস্ত হয়েছে, সেই বিহ্বলতাই আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে বুদ্ধি, বিচারশক্তি। যা দেখল তাও বিকার, যে কথাগুলো শুনল বলে মনে হচ্ছে—তাও।

বিহ্বলতা আছে ঠিকই, তবু এক সময়—যেন অনেক চেষ্টায় মনকে সক্রিয় করে তুলল। তাতেও চিন্তাগুলোকে মনের মধ্যে গুছিয়ে নিতে অনেক সময় লাগল।

প্রত্যূষের প্রহর ঘোষণা করে যে সব পাখীর দল, তাদের কারও কারও কাকলি শোনা যাচ্ছে; একটু পরেই উষা দেখা দেবে—তরুণ আলোর লালিমা ফুটবে প্রভাতের কপোলে ললাটে—অরুণ ও উষার প্রেমের সলজ্জ লালিমা।

তার পর আর সময় থাকবে না অনেকক্ষণ। বহু লোকের কলরবে—তীর্থযাত্রী পুণ্যার্থী বা দর্শনার্থীদের রাধারাণীর সরব জয় ঘোষণায় বা সশব্দ জপে বারে-

বারেই নিভৃত চিন্তার, মনকে সংহত করার প্রয়াস বাধা পাবে।...

বিহ্বলতা কাটল কিন্তু এই কলরবেই। পূজারীজী স্নান সেরে স্তোত্রপাঠ করছেন নানা দেবতার, মাসিমা উঠে প্রাতঃকৃত্য করতে গেছেন কিন্তু তিনিও জাগরণীর গানই গাইছেন মৃদুকণ্ঠে। রাঢ়ের লোক তিনি—গাইছেন সেই অতি পরিচিত গান—"রাই জাগো রাই জাগো, বলে শুকসারীর ডাকে—" এ ওঁদের প্রাত্যহিক জাগরণের গান, রাধারাণী নিকুঞ্জ বন থেকে লীলাবিহার-শেষে বেশবাস সম্বৃত ক'রে নিজ গৃহে যাবেন—সেই কারণেই এই সতর্ক সঙ্গীত।

প্রত্যহের এই আবেষ্টনী, এই নিত্য-স্বাভাবিক পরিবেশেই যেন স্বচ্ছ চিন্তার, ঘটনার যাথার্থ্য উপলব্ধি করা বা তার মর্মার্থ গ্রহণ করার শক্তি কিছুটা ফিরে এল।

তাকেও উঠতে হ'ল। মুখ হাত ধোওয়া, স্নান—এই সব প্রাত্যহিক কাজগুলো তো আছে। এই ঘরেরই পাশে একটু খাঁজকাটা মতো ছাদঢাকা খালি জায়গা ছিল, পূজারীজীর অনুমতি নিয়ে সেখানেই এখন পর্দা টাঙিয়ে স্নান ইত্যাদি সারে, এখন আর ঘরে এসব কাজ সারতে ইচ্ছা করে না। মাসিমাও বাধা দেন না। রোগী হয়ে তো বেশীকাল থাকা উচিত নয়। সে ভালও লাগবে না বিশাখার।

আরও ভয়—সেটা পূজারীজীর জন্যেই বেশী—অন্নকূট এসে পড়ল, যদি মালিকরা কেউ আসেন, সদলবলেও আসতে পারেন—তেমন অবস্থায় হয়ত অন্যত্রও স্থানান্তরিত করতে হবে, বা হতে পারে। একটু চালু হওয়াই ভাল।

অবসর মিলল মনকে গুছিয়ে নেবার, যখন মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহের স্নান অর্চনা নূতন বেশবাস ইত্যাদির পর লাড্ডুভোগের শঙ্খধ্বনি হয়। এগুলো সামান্য আগুপিছুতে প্রায় এক সময়ই বাজে।

তারপর অনেকটা শান্ত হয়ে আসে পরিবেশ। মধ্যে মধ্যে এক-আধটা যাত্রীদল কলরব করতে করতে যাওয়া-আসা করে—যারা গোবিন্দ-মন্দির থেকে বেরিয়ে সাক্ষীগোপালের শূন্য মন্দির* হয়ে এদিক দিয়ে লালাবাবুর মন্দির আর গোপেশ্বর দর্শনে যান। কিম্বা উলটোটাও।

তা হোক, তাতে অতটা ব্যাঘাত হয় না চিন্তাটা গুছিয়ে নেবার, বিকার না সত্য তা নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তির কারণ ঘটবার।

আস্তে আস্তে খানিকটা বিশ্বাস হয় যে শ্যামসোহাগিনী সত্যই ওর কাছে এসেছিলেন। কিন্তু কী সব বললেন? রোগক্লান্ত মস্তিষ্কে আরও অনেকক্ষণ সময় লাগে সে কথাগুলো, বিশেষ শেষ বক্তব্য বা অনুরোধ স্মরণ করতে, তার উদ্দেশ্য বুঝতে।

এবার বিশ্বাস হয় যে সত্যই শাশুড়ি স্বয়ং এসেছিলেন। তিনি ঋণী থাকবেন বলেছেন—যদি গোকুলে বাস করতে রাজী করাতে পারে তার স্বামীকে।

---

* বছর কতক আগে লেখক গিয়ে দেখেছেন, সে মন্দির একেবারেই ভেঙে পড়েছে।

হাসিও পায় এবার। অদৃষ্টের পরিহাস ? তাই বটে।

উনি এসেছেন, গুরুজন শুধু নন, গুরুও—সর্বতো-পূজ্য ব্যক্তি প্রার্থী হয়ে।

তাহলে সত্যিই কি তার স্বামী তাকে ভালবাসেন, তার জন্যে সমাজ সংসার সব ত্যাগ করবেন ?

একটু বিজয়গর্ব যে মনে জাগে না তা নয়। পরক্ষণেই প্রচণ্ড লজ্জিত হয়ে পড়ে। এ কী ভাবছে সে ! ছিঃ ছিঃ ! সে তো কোনমতেই এ ভালবাসার যোগ্য নয়। বাইরের বিচার ছাড়াও নিজেকে বিচার ক'রে দেখলে মনে হয়—কারণ যা-ই হোক, তার দায়িত্ব যত সামান্যই ভাবুক—সে ঘৃণ্য, সে এত বড় বংশকে কলঙ্কিত করেছে, সাত্ত্বিক বংশকে, অপরিমিত লজ্জার কারণ হয়েছে।

এর পরে যে ভালবাসা—সে তিনি দেবতা বলেই সম্ভব হয়েছে, এতটা স্বার্থ-ত্যাগ করতে পেরেছেন।

এতটা উর্ধ্বে বুঝি দেবতারাও উঠতে পারেন না।

রামচন্দ্রও পারেন নি, কোন কারণ নেই জেনেও লোকলজ্জা মেনে নিয়েছিলেন।

তবে তার মধ্যেই—মানুষের মন তো—একটা তুচ্ছ নীচ কথাও মনে উঁকি মারে।

এসেছিলেন শাশুড়ি নিজের স্বার্থেই, ছেলেকে হারাবার ভয়ে দিশেহারা হয়ে। ছেলের মতো ছেলে, গর্ব করার মতো ছেলে। মনে হয়—যা সে এ বংশের পূর্ব-পুরুষ প্রসঙ্গে শুনেছে—বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। শাশুড়ি তো ব্যাকুল হবেনই।

তবে সে দু-তিন মুহূর্তের বেশী নয়।

আবারও লজ্জার ধিক্কারের পরিসীমা থাকে না।

যে যতই সাধনা করুক, মনের দিক থেকে উর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা করুক—সাধারণ মানুষের যে চিরন্তন মানসিকতা, তাকে একেবারে দমন করতে পারে না।

এ কি শুধু তাঁর স্বার্থেরই কথা !

তিনি যার কল্যাণের কথা ভেবেই এত ব্যস্ত এত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন—সে কি ওরই স্বামী নয় ? যার ভালবাসায় গর্ববোধ হচ্ছে—যোগ্যাযোগ্য বিচার না ক'রেই—তার সুখের কথা শান্তির কথা, ভবিষ্যতের কথা কি সে ভেবেছে এমন ক'রে—একবারও ?

সত্যিই তো,—স্থিরমনে যেটুকু সে তার দেবতাকে, তার ইষ্টই বলতে গেলে—দেখেছে, এই ভাবে ব্রজধাম ছেড়ে রাধা-গোপীবল্লভকে ছেড়ে—এই ইষ্টগোষ্ঠী* চিরদিনের মতো ত্যাগ ক'রে অপরিচিত সব শহরে, যেখানে অর্থ কাম ছাড়া লোকে কিছু জানে না, বোঝে না—যা সংস্কৃতি শিক্ষা সাধনার সঙ্গে বলতে গেলে সম্পর্ক-হীন মরুভূমিতুল্য—সেইখানে একমাত্র এই স্ত্রীর সঙ্গে দিনের পর দিন, মাস,

---

*সমভাবাপন্ন, সমশিক্ষাদীক্ষা আদর্শ যাদের, তাঁরা মধ্যে মধ্যে একত্র হয়ে, পূর্বকালে গুরুগৃহেই গুরুকে সঙ্গে নিয়ে, যে আলোচনা বা রসবিচার আস্বাদন করেন—তাকেই ইষ্টগোষ্ঠী করা বলে।

বৎসরের পর বৎসর কাটাতে পারবেন ?

না, তা তিনি পারবেন না। তাঁর জীবন নষ্টই হয়ে যাবে। শাশুড়ি ঠিকই বলেছেন।

তাঁর অন্তরাত্মা ধীরে ধীরে শুষ্ক প্রাণশূন্য অস্তিত্বে পরিণত হবে—ক্রমশ শুকিয়ে যাবে তাঁর দেহও।

এই ত্যাগ—স্ত্রীকে গ্রহণ করা কর্তব্য বলেই,—হয়ত বিনাদোষে লাঞ্ছিতা বহু দুঃখ-কষ্টের অগ্নিতে শুদ্ধা পরিণীতাকে আশ্রয়দান ধর্মপালন বলেই বোধ করেছেন, তার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। ওঁর মানসিকতার কথা ভেবে দেখলে—সামান্য পরিচয়েও যা বুঝেছে, এ একেবারেই আত্মবলিদান।

তিনি পারবেন না, পারবেন না। কিছুতেই পারবেন না।

যতই মনকে দৃঢ় করতে চেষ্টা করুন—এ তাঁর পক্ষে সাধ্যের অতীত দায়িত্ব।

সেও কি সুখী হতে পারবে এতে ?

যাকে পাবার জন্যে, যার 'গাত্র-স্পর্শ' মাত্র পাবার জন্যে তার এ লালসা, কামনা, ব্যাকুলতা—একান্ত সাধনা—হ্যাঁ, সাধনা যে তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না—সেটুকুর জন্যে গর্ব বলে দোষ দিতেও না—তাকেই কি পাবে ? কী পাবে ? কতটুকু পাবে ? পরিপূর্ণ ভাবে পেয়ে তৃপ্তপূর্ণ হতে পারবে ?

শুষ্ক কর্তব্যবোধে আত্মত্যাগ মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করতে পারে—তা তো তিনি হয়েইছেন—কিন্তু সাধারণ পুরুষের স্ত্রী যা আশা করে, যার জন্য আকৈশোর স্বপ্ন দেখে—তা কি দিতে পারবেন ?

সাধারণ মানবীর প্রাপ্য দিতে, তাঁকে উপভোগ করতে পারবেন ?

ক্রমে ক্রমে মনই শুধু নয়—দেহটাও শুকিয়ে যাবে। আরও পরে উদ্‌ভ্রান্ত হওয়াও আশ্চর্য নয়। যার জন্যে বিশাখার এ আকূতি, এ আকুলতা—তাকে পাবে না, পাবে শুধু অনিচ্ছুক দেহটা, পরে সেটাও হয়ত শুষ্ক কঙ্কালে পরিণত হবে।

ভাবতে ভাবতে উত্তেজিতই হয়ে ওঠে। ভবিষ্যৎ জীবনের ছবিটা চোখে পড়ে।

কী দিতে পারবেন তিনি ? সাধারণ স্বামী-স্ত্রী যেমন পুত্র কন্যা প্রেম কলহ বিবাদ অশান্তি নিয়েও সুখে থাকে—তাদের এই প্রাকৃত আনন্দময় জীবনোপভোগের কণা মাত্র কি দিতে পারবেন ?

সংসারসুখ ? ঐ দাসী রামরতিয়া যা পেয়েছে ?

কলহ-কেজিয়া আছে, মারধোর গালিগালাজ আছে—তেমনি আনন্দও আছে। দেহজ তৃপ্তি, সন্তানসন্ততি নিয়ে সাংসারিক সুখ এও কি সামান্য ! এই যে রামরতিয়া যখন-তখন সংসারের সব দায়িত্ব স্বামীর ওপর চাপিয়ে দিয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়—বৃত্তি পালনের সময় ছাড়াও—পরিপূর্ণ অধিকারবোধ আছে বলেই, সে ভালবাসার বন্ধন নির্ভরতা আছে বলেই।

বিশাখা ওঁর সঙ্গে নির্বান্ধব দেশে গিয়ে কি এই নিশ্চিন্ততা, এই নির্ভরতা উপভোগ করতে পারবে ?

অহরহ কি তার মনে একটা আত্মধিক্কার পীড়ন করবে না—নিজের সামান্য দৈহিক সুখের জন্য এমন মানুষটার জীবন মরুভূমি ক'রে দিল ! তাই কি, তার পাওনাটাই কি পেল পরিপূর্ণ ভাবে !

শিউরে ওঠে সে বার বার—ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গিয়ে।

না না, এ কি করতে যাচ্ছে সে ! এ কী অন্তঃসারশূন্য তৃপ্তি বা পূর্ণতা বোধ !

এই তাঁর ভালবাসা ? ছিঃ !

শাশুড়ি তাঁর নিজের স্বার্থ দেখেন নি, বরং ওর স্বার্থই দেখেছেন।

সারাদিনই এই চিন্তায় কাটল তার—যেন একটা আচ্ছন্নতা, ঘোরের মধ্যে।

না, শ্যামসোহাগিনী যা বলছেন, সেটা আপস করা মাত্র, তাতেও ঐ মানুষটার মনে শান্তি বা তৃপ্তি আসবে না।

গোকুলও দূর। ব্রজমণ্ডলের মধ্যে কিন্তু ব্রজধাম নয়।

গোপীবল্লভই প্রধান আকর্ষণ। তাঁর সেবা স্বরূপ গোস্বামীর প্রাণ। তবে তা ছাড়াও বন্ধন আছে। গোবিন্দজী, গোপীনাথ, মদনমোহন, বঙ্কুবিহারী, রাধারমণ, রাধাবল্লভ—এই সব ঈশ্বরস্বরূপ বিগ্রহের সেবা-পরিচালনার সঙ্গেও ওঁর যোগাযোগ আছে। মধুসূদন গোস্বামী—যাঁকে 'একলাখী মধুসূদন' বলা হয়, অর্থাৎ এক লাখ শিষ্য, তিনি তো ওঁকে আদর ক'রে 'বেটা' বলে ডাকেন। শাস্ত্রমহাবিদ্যালয়ের তিনি কর্মসচিব। এই সব কর্মচক্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে—গোকুলে বাস ক'রে কতটুকু সান্ত্বনা পাবেন তিনি ! সকলেই জানবে এই স্বেচ্ছানির্বাসনের কারণ—কেউ পরিহাস করবে, টিটকিরি দেবে, সুযোগমত হুল ফোটাতেও ছাড়বে না। কেউ বা সত্যিই দুঃখিত হবে। উনি কি এইভাবে বাসা বাঁধলে আর এই সব আত্মীয় সুহৃদবর্গের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন ?—না সেই সব সেবা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারবেন ?

সে আরও বরং শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াবে।

সেই যে ছোটবেলায় কোন এক গ্রীক পুরাণের গল্প পড়েছিল—সেই অবস্থা হবে। কোন এক ব্যক্তিকে—ট্যাণ্টালাস না কি নাম—পাথরের সঙ্গে বেঁধে নাকি অর্ধেকটা মাটিতে পুঁতে রেখেছিল—প্রখর রোদে বা যন্ত্রণায় আকণ্ঠ শুকিয়ে গেছে বেচারীর, জলও রাখা হয়েছে তার সামনেই—সুমিষ্ট সুপেয় জল—ঠিক তার আয়ত্তের বাইরে, একটুখানি মুখটা বাড়াতে পারলেই সে জল পান করা যায়, সেইটুকুই সম্ভব হচ্ছে না। এ নাকি ওদেরই কোন দেবতা ঈর্ষিত হয়ে এই শাস্তি দিয়েছিলেন।

গোকুলে থেকে সব সংবাদ পাবেন, প্রসাদ আসবে মধ্যে মধ্যে—কিন্তু তবু ব্রজধামে যেতে পারবেন না—সে ঐ একই অবস্থা হবে না কি ?

না, দুজনের একজনকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। পূর্ণ ভাবে।

আর এক্ষেত্রে সে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে বিশাখাকেই।

তিনি তো করতে প্রস্তুতই, সেটা যখন ও গ্রহণ করতে পারছে না তখন নিঃ-

শব্দে সরে যেতে হবে ওকেই।

স্বরূপের জীবন মহামূল্যবান। মহাপ্রাণ মানুষটাকে তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে মারা হবে, সিন্ধবাদ নাবিকের কাঁধে চাপা সেই বৃদ্ধের মতো ঘাড়ে চেপে।

বিশাখার জীবনের কোন মূল্য নেই। সে-ই যাবে, ওঁর জীবন থেকে বিলুপ্ত হয়ে—মুছে যাবে। মধ্যের এই কটা দিন মুছে যেতে দেরি হবে না।···

তিনিই কি শুধু ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন? বিশাখা পারে না?

তাহলে কিসের ভালবাসা, এত কাল মনমন্দিরে তাঁকে বসিয়ে কি তপস্যা করল!

যাবে, কিন্তু কোথায়? সেই প্রশ্নটাই বড় হয়ে দাঁড়ায় এবার।

প্রথমেই মনে পড়ে তার নাম-স্বরূপা যমুনার কথা।

এখনও যথেষ্ট জল আছে নদীতে, খরস্রোতও। দেহ এলিয়ে দিলেই সব সমস্যার অবসান, পরম চরম শান্তি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে স্বামীর কথা, শাশুড়ির কথা। একবার তাঁদের বংশের, তাঁদের পরিবারের কলঙ্কের কারণ হয়েছে, তাঁদের লজ্জা ও বেদনার শেষ রাখে নি।

ওর মৃতদেহ যদি কোথাও আটকে যায়? যদি সনাক্ত করে কেউ? আবারও তো সেই লজ্জা, সেই অপমান। নানাবিধ রটনা। তিক্ত বিদ্রূপ।

না, ছিঃ! আর ওঁদের কোন ক্ষতি করবে না সে।

তাহলে? আর কোন পথ?

অনেক ভাবে সে, এলোমেলো অবাস্তব নানা উদ্ভট উপায় মাথায় আসে, কোন-টাই সম্ভাব্য বলে মনে হয় না।···

হঠাৎই মনে পড়ে যায় কথাটা।

সন্ন্যাস নিলে কি হয়? ছোট ক'রে চুল ছেঁটে গেরুয়া পরে—যদি কোনমতে হিমালয়ের কোথাও চলে যাওয়া যায়—তাহলেই কি সব দিক রক্ষা হয় না?

পূজারীজীকে প্রায়ই বলতে শুনেছে—হরিদ্বার ঋষিকেশের কথা—সেখানে নাকি অনেক বড় বড় সাধুদের আখড়া বা আশ্রম আছে। মহিলা সাধুদেরও ব্যবস্থা আছে। সেখানে অসংখ্য সত্র, বিনাব্যয়ে জীবনধারণের ব্যবস্থা। কোন আখড়া বা গোষ্ঠীতে স্থান না পেলেও গেরুয়াধারী লোকের খাওয়া-পরার কোন অভাব হয় না।

কিন্তু সে কোথায়, কি ক'রে সেখানে পৌঁছবে! তার জগৎ এতদিনেও শান্তি-পুর, নবদ্বীপ আর বৃন্দাবন-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ছোটবেলায় ভূচিত্রাবলী দেখেছিল, তাতে কোন প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না। তাছাড়া মাথা কামানো, গেরুয়া কাপড় যোগাড় করা—সেই বা কি ক'রে হবে, কে এত হ্যাঙ্গাম করবে?

এ ভাবনার কূলকিনারা মেলে না। দিশেহারা হয়ে পড়ে।

এক এক সময় মনে হয় উপবাস ক'রে থাকলেই তো হয়—একটু একটু ক'রে

মৃত্যুকে ডেকে আনা ?

নিজেরই হাসি পায় আবার—এ'রা ছাড়বেন কেন, চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। স্বামী মাসিমা রামরতিয়া ডাক্তার—আসল কাজ কিছু হবে না—শুধু এক নাটক করা হবে।

ক্রমশ ক্লান্তি নামে, অবসাদ আসে।

মূর্ছিতের মতো পড়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়েই পড়ে এক সময়।

॥ ২০ ॥

রামরতিয়া যেমন ঝড়ের মতো এসে হাজির হয়—তেমনিই এল সন্ধ্যার ঠিক আগেটায়।

'কিরে, সারাদিন দেখা নেই ?' ক্লান্ত কণ্ঠে বলে বিশাখা।

সঙ্গে সঙ্গেই তো টনক নড়ে, আর একটু কাছে এসে বলে, 'ওকি, অমন ভাবে কথা কইছ কেন ? আবার শরীর বিগড়োল নাকি ?'

'না না—অমনি শরীর খারাপ দেখলি। বেলায় ঘুমিয়েছি বলে তাই—। তুই কি করছিলি তাই বল্ না।'

'আমার কাজ তো জানই, হঠাৎ এসে হাজির হয়। আজ একটা প্রসব ছিল। দেরি হয়ে গেল মানে—একটু বেয়াড়া ভাব নিচ্ছিল। যাই হোক রাধারাণীর কৃপায় সব ঠিক হয়ে গেছে। এই সবে চান ক'রে উঠে একখানা টেক্‌রা মুখে দিয়েই চলে আসছি।'

'তা বোস্ না একটু স্থির হয়ে। দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? আর কোথাও যেতে হবে ?'

বিশাখা প্রশ্ন করে। এতদিনে ওর সব ভাবভঙ্গি বুঝে গেছে।

'যেতে হবে না বহুরাণী দিদি, যাবো। মানে নিজের গরজ। এক মস্ত বড় মাতাজী এসেছেন, মানে খুব বড় দরের সন্ন্যাসিন্, মহা মহা গোসাঁই মোহান্ত সব সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। শুনেছি পাহাড়ের দিকে যে সব সন্ন্যাসীদের আখড়া আছে —তাঁরাও খুব ভক্তির চোখে দেখেন, নাম শুনলেই কপালে হাত ঠেকান।… এসেছেন কদিন আগেই, আমাকে কেউ বলে নি। গোপেশ্বর মন্দিরের কাছে এক সাধুমা থাকেন—তাঁর কাছে এসেই আছেন, কালই নাকি সুবাহ্ চলে যাবেন। তাই এত তাড়া।…কেন, তোমার কোন কাম আছে ?'

'না না। এমনি বলছিলুম। যা তুই। দেখে আয় তোর মাতাজীকে।'

রামরতিয়া যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায়, ফিরে কাছে এসে বলল, 'বড়দাদা গোসাঁই তো কালই আসছেন—কথাটা বলবে তো বুঝিয়ে—বড়মা যা বললেন ? এতে তোমারও ভাল হবে, কোথায় কোন্ দেশে গিয়ে ফেলবে—সে তোমারও ভাল লাগবে না, দাদার তো লাগবেই না। তুমি ভাল ক'রে বুঝিয়ে বললে বড়দা রাজী তো হবেনই, শান্তিই পাবেন বরঞ্চ।'

বলে আর উত্তরের অপেক্ষা করল না। বলতে গেলে ছুটেই চলে গেল।

মাতাজীর ওখানে এই সন্ধ্যাটায় বড্ড ভীড় হয়। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে দর্শনের জন্যে।···

অথচ আর সময় নেই। একটুও সময় নেই।

যা করতে হবে আজই। আজ রাত্রের মধ্যেই।

একটা যেন পথও দেখতে পায়। সাধুসন্ন্যাসীর কথা ভাবছিল, গোপীবল্লভ বুঝি সেই জন্যেই ঐ মাতাজীকে টেনে এনেছেন!

কাল ভোরেই চলে যাবেন।

তিনি কি একটু আশ্রয় দিতে রাজী হবেন না?

উত্তেজিত হয়ে উঠে বসেছিল, তবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাস্তব দিকটা চোখে পড়ে।

তাঁর কাছে পেঁছিনো? কি ক'রে যাবে সকলের সামনে দিয়ে? এখানে যে কড়া প্রহরী চারদিকে!

আবার যেন একটা হিম হতাশা নেমে আসে বুকে।

সাধুমার কথা বিশাখাই তোলে মাসিমার কাছে, 'আপনি তাঁকে দেখেছেন মাসিমা?'

'কি করে দেখব মা,' কতকটা সক্ষোভেই বলেন, 'তোমাকে নিয়েই তো থাকতে হচ্ছে। সে যা ভীড় হচ্ছে শুনছি, একটু-আধটু এক নজরে দেখে আসা যাবে না তো!'

'তা আপনি এখন একটু-আধটু বাইরে যান না কেন, সত্যিই এমন দিনরাত বন্দী হয়ে থাকা কি ভাল লাগে? যান না, তাঁকে দর্শন ক'রে আসুন না। আমি তো এখন উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছি—একা থাকতে পারব না? আমার কিছু হবে না মাসিমা, অদৃষ্টে মৃত্যু নেই। নইলে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনবেন কেন আপনারা! আপনি ঘুরে আসুন।'

'কিন্তু—যদি ফিরতে দেরি হয়—তোমার খাওয়ার সময়—'

'হাসালেন মাসিমা। আমি কি কচি খুকী? এক আধ ঘণ্টা দেরি হলে ভির্মি যাবো কি ভোচকানি লাগবে?'

আর বেশী কিছু বলার প্রয়োজন হ'ল না। মাসিমা চাদরটা জড়িয়ে নিতে নিতে বলে গেলেন, 'তেমন দেরি অবশ্য হবে না, সে হুঁশ আমার আছে। সাধু দেখতে গিয়ে কি রাত কাটিয়ে আসব?'···

মাসিমা বেরিয়ে যাবার কিছু পরেই মহাবীরের আরতি আরম্ভ করলেন পুজারীজী। সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এলেই তিনি কাজটা সেরে নেন। কীই বা এমন আরতির ঘটা—আর শীতল বলতে তো দুখানা শুকনো প্যাঁড়া! কদাচিৎ কেউ পুজো দিয়ে গেলে মহাবীরের সামনে তবু ধরা যায়।

এ আরতি কেউ দাঁড়িয়ে দেখেও না—গোবিন্দজী কি রাধারমণের মতো। রাধাবল্লভের আরতি তো শুরু হয় আটটা সাড়ে আটটায়। সেজন্যে লোকে

অপেক্ষাও করেন। উনি কেন খামোকা দেরি করবেন ?

আরতির শব্দ পেতেই বিশাখা আস্তে আস্তে উঠে এল, মহাবীরের সংকীর্ণ কুটুরির সামনে যে সংকীর্ণতর ফালিমত রোয়াক—সেইখানে এসে বসল।

আরতি শেষ হলেই শীতল দেন পূজারীজী, তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন—অতিকষ্টে, সেটুকু স্থান রাখেন নি গৃহকর্তারা—বেরিয়ে আসেন। চারিদিকে চাইবার অবকাশ মেলে তখন।

আজ বিশাখাকে দেখে চমকে উঠলেন একেবারে।

'তুমি উঠে এসেছ মা, নতুন হিমের সময়—যদি ঠাণ্ডা লেগে যায় ?'

'আমার কিছু হবে না পূজারীজী, যম আমার দিকে সহজে হাত বাড়াবেন না।'

'তা কেন বলছ মা,' মৃদু অনুযোগের সুরে বলেন, 'এত লোক তোমার জন্যে উৎকণ্ঠিত, ব্যস্ত। তোমার স্বামী শাশুড়ি তাঁদেরও তো চিন্তার অন্ত নেই।'

প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে বিশাখা বলে, 'চাদর মুড়ি দিয়েছি তো, মাথায় ঘোমটাও আছে। আর এ যা চাপা বাড়ি—ঠাণ্ডা লাগবে কোথা দিয়ে ?'

এর পর দুজনেই চুপ ক'রে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর বিশাখা দু হাত জোড় ক'রে আস্তে আস্তে বলে, 'পূজারীজী, আমি আপনাকে আমার বাবার মতোই দেখি, তারও বেশী—আমার জন্যে আপনি যা করেছেন কোন আত্মীয় করতে পারত না। সেই ভরসাতেই একটা ভিক্ষা চাইতে এসেছি। যদি কিছু মনে না করেন—'

পূজারীজী ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, 'এসব কথা বলছ কেন মা, ভিক্ষা কি বলছ—তুমি মেয়ে, আবদার করবে। বলো কি করতে হবে ?'

সঙ্কোচ কাটানো কঠিন, একান্ত লজ্জারই কথা কতকটা।

তাই খানিক চুপ ক'রে থাকতে হয়। তারপর মাথা নিচু ক'রে বলে, 'বাবা, লীলাধর পূজারীকে একটু খবর দিতে পারবে ? যদি আমার সঙ্গে এখনই একবার দেখা ক'রে যায়—মাসিমা আসার আগেই।'

বিস্ময়ের শেষ থাকে না, আশঙ্কারও।

পূজারীজী যেন আর্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'মা—!'

'জানি বাবা। কিন্তু সে আমাকে মেয়ে বলেছে, আমি তাকে বাবা বলেছি। সে ঘটনার পর থেকে সে আসে এখানে কিন্তু এদিকে কোন দিন তাকায় না—তা আমি লক্ষ্য করেছি। আমার এই মৃত্যুমুখে পড়ে থাকার খবর সে-ই দিয়েছে রামরতিয়াকে—সে-ই খবর নিতে এসেছিল প্রথম। তার পরও বাইরে থেকে খবর নিয়ে গেছে। সে কৃতিত্ব দাবী করে নি কোনদিন বা সেই ছুতোয় ঘনিষ্ঠতা করতে আসে নি। আমি সেসব কথা ভেবে দেখেই বলেছি বাবা। আমি আজ এতকাল পরে অসৎ পথে পা দেবো—এমন ভয় আপনার মনে এল কি ক'রে ?'

'না না, তা নয়,' লজ্জিত হয়ে পড়েন পূজারী, 'তবু—। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি কিন্তু ওদের আরতি শুরু হয়েছে। ঘড়ি বাজার আওয়াজ আসছে, এই তো নহবৎও বেজে উঠল। যদি আরতির মধ্যে থাকে তো এখন ডাকা যাবে না। তাহলে আবার খানিক পরে যেতে হবে।'

তিনি তখনই নামাবলীটা গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

লীলাধর আরতিতে ব্যস্ত ছিল না, আজ তার এবেলা রসুইঘরের পালা। অকস্মাৎ পূজারীজীকে উঁকি মারতে দেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

কিন্তু বার্তা যা শুনল, তাতে বিস্ময়ের অন্ত রইল না বললে কিছুই বলা হয় না—বিহ্বল বললেও না—সে একেবারে পাথর হয়ে গেল।

অনেক কষ্টে যখন কথা কইতে পারল, তখন শুধু বলল বা বলতে পারল—'আমাকে ? জরুরী কথা আছে ? কী বলছেন গুরুজী !'

'ঠিকই বলছি। ঐ রকম আমিও তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম যখন কথাটা বলেন। কিন্তু কথা বলে বুঝলাম উনি সব দিক ভেবেই বলেছেন। সে আওরৎ নেই, মা একাই আছেন। খুব দরকারী কথা কিছু বলবেন। বাড়ি ফাঁকা, একা আছেন, আমি যাই। তা কী বলব তাঁকে ?'

'বলুন আমি এখনই যাচ্ছি, পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে। এ তো তাঁর হুকুম, যেতে আমাকে হবেই। তবে রসুইঘরের একটু ব্যবস্থা ক'রে ওদের না বলে যেতে পারব না তো। মোটে তিনজন আছি, আর একজনকে না বসিয়ে যাওয়া উচিত নয়।'···

লীলাধর এল ঠিক পাঁচ-ছ'মিনিটের মধ্যেই। রান্নাঘরে ছিল এতক্ষণ, চার-চারটে চুলি জ্বলছে, সেখানে খালিগায়েই কাজ করছিল। বাইরে ঠাণ্ডার আভাস থাকলেও ওদের সর্বাঙ্গে ঘাম—কোনমতে একটা উড়ুনি গায়ে জড়িয়ে চলে এসেছে, সে পাতলা কাপড় ভিজে উঠে সমস্ত গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে।

সে মাথা হেঁট ক'রেই ঘরের দরজায় দাঁড়াল, 'আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ বাবা, আমার একটা উপকার করতে হবে। সে কিন্তু তুমি ছাড়া কারও দ্বারা হবে না। তবে ঝুঁকি আছে, তাও বলে দিচ্ছি আগেই।'

'বাবা' সম্বোধনে এখনও একটা আঘাতের ভাব আসে বৈকি মনে।

তবে স্থিরভাবেই সেটুকু সামলে নিয়ে বললে, 'হুকুম করুন কি করতে হবে। আমার জন্যে ভাবি না, আপনি কোন লজ্জা কি বিপদের মধ্যে পড়বেন না তো ?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে সোজাসুজি নিজের বক্তব্যে এল বিশাখা।

'গোপেশ্বরের মন্দিরের কাছে কোন্ এক সন্ন্যাসিনী এসেছেন, তুমি জানো ?'

'খুব জানি। আমি দর্শন ক'রে এসেছি। পার্বতী মাতাজী। খুব উঁচুদরের সন্ন্যাসিনী। বড় বড় মহান্তরাও ওঁর পায়ে পড়েন। তবে উনি তো আজ শেষ রাত্রেই চলে যাবেন। উত্তরকাশী না কি তীরথ আছে, সেখানে। ভোরে যাবেন লোকের ভীড় বাঁচাতে। কোন বড় মণ্ডলেশ্বর গাড়ি পাঠিয়েছেন ওঁর জন্যে। বাস গাড়ি, তাতে ওঁর সঙ্গে যাঁরা থাকেন সবাই যেতে পারবেন।'

'সেই জন্যেই বলছি বাবা, আমি তোমার মেয়ে, আবদারই করছি ধরো, আজ বেশী রাত্রে সবাই যখন শুয়ে পড়বে—আমাকে নিয়ে সেখানে পেঁাছে দিতে পারবে ? আর কিছু দরকার নেই, তুমি বাইরে থেকে সে আস্তানাটা দেখিয়ে দিয়েই

ফিরে এসো, তোমার অন্য কোন দায়দায়িত্ব থাকবে না।'

চমকে ওঠে লীলাধর। 'সে কি, কি ক'রে যাবেন আপনি, এই শরীরে ? তা হলে তো ডুলির ব্যবস্থা করতে হয়। তবে তাতে তো লোক জানাজানি হবে—'

'না না। আমি হে'টেই যাবো, যেমন ক'রে হোক যাবো। মেয়েদের জানো না, সব পারি আমরা। তুমি তোমাদের পঙ্গত চুকলে কোন অজ্‌হাতে বেরিয়ে এসে শুধু এখানে দাঁড়িও—কিছু বলতে কি সাড়া দিতে হবে না—আমি বেরিয়ে আসব। ওঁদের না কারও ঘুম ভাঙে এমনি ভাবে যেতে হবে।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল লীলাধর, তারপর সোজাসুজি মাতৃসম্বোধন ক'রে বলল, 'লেকিন মা—আমার কোনও বদনামের জন্যে ভাবি না, এখানে চাকরি যায় অন্য কোথাও কাজ যোগাড় করতে পারব, নয়তো দেশে গিয়ে কথকতা করতে পারব গুরুজীর কৃপায়—আপনার নামে যদি কোন দুর্নাম রটে আমাকে জড়িয়ে, তাহলে আমাকে আত্মঘাতী হতে হবে।'

'কিচ্ছু হবে না। আমি সংসার ছাড়তে চাই, সন্ন্যাস নিতে চাই। এ ঘরগিরস্তি আমার সইবে না—সেই জন্যেই ওঁর পায়ে গিয়ে পড়তে চাইছি, তিনি যখন এত উচ্চকোটির সাধিকা, আমার বিপদ আমার মনের কথা বুঝে কি পায়ে ঠাঁই দেবেন না ?'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'জানি না কেন এমন সোনার সংসার ছেড়ে যেতে চাইছেন। তবে ঠিক সময় আসব, পথঘাট নির্জন হলে। আপনার হুকুম আমার কাছে দেবীর আদেশ।'

সে জেগেই আছে, কেউ নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেও দেখার কোন অসুবিধা হয় না। মাসিমার মশারি বাঁচিয়ে, দরজার একটা কপাট খুলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল বিশাখা।

কারও সঙ্গে কারও কথা বলার প্রয়োজন নেই, বাইরে আসা মাত্রই চলতে শুরু করল।

লীলাধরের আরও জোরে চলবার কথা, চলার কোন আওয়াজ না হয় সেজন্যে সেও কোন পাদুকা—চটি বা খড়ম পায়ে দেয় নি। সাধারণ ধুতি পরনে, গায়ে একটি খাটো-হাত-কুর্তা—মেরজাইয়ের মতো। সে দ্রুত চলার জন্যেই প্রস্তুত। তবে এটা সে জানত তার স্বাভাবিক গতিতে হাঁটা চলবে না। মুখে যা-ই বলুক বিশাখা, আদৌ হাঁটতে পারবে কিনা তাই সন্দেহ, জোরে যাওয়া তো অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে কাছে কাছেই যেতে হবে।

আর সে আশঙ্কা সত্য বলে প্রমাণিত হ'ল দু'চার পা যেতে না যেতেই—বারে বারেই পা টলছে, হয়ত মাথাও ঘুরছে, দুর্বল শরীরে কোনমতে লালাবাবুর মন্দিরের কাছাকাছি এসে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল, লীলাধরের সতর্ক দৃষ্টি ছিল বলেই--সে কোন দ্বিধা না ক'রে চোখের নিমেষে বাহুমূলটা ধরে ফেলল, নইলে তখনই একটা গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটত।

'আপনি পারবেন না এতটা যেতে দেবীজী, চলুন ফিরে যাই।' অতি অস্ফুট স্বরে বলে লীলাধর।

'না, আমি যাবোই। যদি বসে বসে কি হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয় তাও যাবো। তোমার পায়ে পড়ি—এইটুকু পৌঁছে দাও!'

আর কথা বাড়াল না। নিশীথ রাত্রে অতি সামান্য শব্দও বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছয়, কৌতূহলী কেউ জানলা খুলে দেখা আশ্চর্য নয়।

তবে বিশাখাও আর কোন সংকোচ করল না। সে-ই লীলাধরের ওপর হাতটা চেপে ধরল অবলম্বনের মতো, নইলে কতক্ষণ আর মাতালের মতো টলতে টলতে যাবে।

এখনও পুরুষের বক্ষরক্ত উত্তাল হয়ে ওঠে সে স্পর্শে।

তবে প্রাণপণেই চিত্ত দমন করে। শুধু শপথের কথা স্মরণ ক'রেই নয়—এই তরুণীর মনের দৃঢ়তা মনে ক'রেও।

কিন্তু সে ভাবেও আর বেশী দূর যাওয়া যায় না। অর্ধেক পথ কোনমতে যাবার পরই অসুস্থ, এতকালের শয্যাবদ্ধ দেহ একেবারেই এলিয়ে পড়ে যাবার মতো হয়, দু হাতে ধরে ফেলেও আর তাকে দাঁড় করানো যায় না, পায়ে মনে হয় আর বিন্দুমাত্র জোর নেই।

সময় নেই ইতস্তত করবার, উপায়ও নেই অন্য কোন।

বাধ্য হয়েই লীলাধর তাকে সবলে জড়িয়ে ধরে, বলতে গেলে বিশাখার দেহ সম্পূর্ণভাবে ওর দেহের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

বিশাখারও সাধ্য ছিল না বাধা দেবার, একেবারেই দেহে আর কোন শক্তি ছিল না। লীলাধর সেই ভাবেই বিশাখাকে জড়িয়ে ধরে তার সম্পূর্ণ ভারটাই এক রকম বহন ক'রে নিয়ে চলল। বিশাখার অর্ধমূর্ছিত অবস্থা, এ নিন্দনীয় পরিস্থিতির ফলাফল চিন্তা করাও সম্ভব নয়।

'কেউ যদি দেখে ফেলে' এ প্রশ্ন বিবেচনা করবে কে!

পুরুষটার বুকের রক্ত উত্তাল, বুকে দ্রুত রক্তপ্রবাহের প্রবল শব্দ, সে ধুক-ধুকানি বুঝি বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছে—তবু প্রাণপণেই নিজের মা-বাবাকে স্মরণ ক'রে কঠিন অনড় হয়ে রইল মনের দিক থেকে।

না না, বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না কামার্ত-আকাঙ্ক্ষাকে।

ঐ বাহুবন্ধনের কোথাও বিশেষ স্থানে চাপ দেওয়া কি ওর দিকে দেহটা বিন্দু-মাত্র ফেরাবার চেষ্টা করবে না—কিছুতেই না।…

এসব বোঝার বা ঐ পুরুষের কি অবস্থা হতে পারে, কিম্বা হচ্ছে—তা কল্পনা করার মতো মানসিক শক্তি নেই তখন বিশাখার, বিহ্বল অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থা, পা কাঁপছে থর থর ক'রে—কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে বোধ হয় সে জ্ঞানও নেই।

তবে কামনা কি প্রবৃত্তি—সে উপভোগের স্মৃতি দেহের থেকে বেশী শক্তিধর। কী হচ্ছে সে সম্বন্ধে অবহিত হবার আগেই একটা বিশেষ অনুভূতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল ধীরে ধীরে।

অল্পবয়সী বলিষ্ঠ পুরুষদেহের একটা বিশেষ গন্ধ আছে, তার মাদকতা, মোহ —বড়ই প্রবল। সে বলিষ্ঠ দেহের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থার উত্তেজনা অবশ্যই আছে কিন্তু সে এমন-সকল-ইন্দ্রিয়-শিথিল-করা অনুভূতি নয়। উত্তেজিত কামনায় চঞ্চল হয়ে ওঠার মতো নয়।

একটু একটু ক'রে চেতনা আসতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গেই মনে আসে আর এক বলিষ্ঠ সুন্দর দেহের সেই মনপ্রাণ-অবশ-করা দেহগন্ধ, স্বেদবিন্দুশোভিত প্রশস্ত বক্ষের আশ্চর্য আকর্ষণ; কঠোর বাহুবন্ধনের বিচিত্র মধুর শক্তি; তাঁর দেহের মধ্যে মুখ গুঁজে দেওয়ার ইন্দ্রিয়-শিথিল-করা এক আনন্দাস্বাদ।

সেই আকর্ষণ, সেই স্মৃতির জন্যই তো এতকাল পাগল হয়ে ছিল। এত দুঃখ-দুর্দশা, এত অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করেছে—এই সাড়ে তিন বছর কঠিন অস্খলিত তপস্যা করেছে—সে তো ঐ অদ্বিতীয় দেহের সংস্পর্শ-স্মৃতির পাগল-করা কামনায়।

তাঁকে ছেড়ে সন্ন্যাস নেবে? না, তা সম্ভব নয়।

* * *

এই অর্ধউন্মাদ অর্ধমৃত প্রায়-অজ্ঞান অবস্থায় লীলাধর কোনমতে এনে সেই কুঞ্জের দ্বারপ্রান্তে পেঁাছে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ঐ আপনার সামনে দাঁড়িয়েই আছেন পার্বতী মাতা—বোধ হয় আপনারই অপেক্ষা করছেন।'

তারপর কোনমতে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে যেন সামনের দিকে একটু ঠেলেই দিল লীলাধর। বিশাখাও প্রায় আছড়ে পড়ার মতোই মাতাজীর পায়ের ওপর পড়ল। পাগলের মতো বলে উঠল, 'আমি আপনার কাছে সন্ন্যাস ভিক্ষা করতে এসেছিলাম মা—কিন্তু সে পারব না, পারব না। এখন বুঝছি তাঁকে না পেয়ে ছাড়তে পারব না।'

বলতে বলতেই সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

পার্বতী মাতাজী কৌতুক-প্রসন্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সত্যিই তিনি যে এর প্রতীক্ষা করছিলেন।

॥ ২১ ॥

পার্বতী মাতাজী একটু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে—সেইখানে, কুঞ্জের পথের ওপরই বসে পড়লেন, তারপর বিশাখার মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে ডাকলেন, 'মা, এবার একটু সামলে নাও, আমাদের আর একটু পরেই রওনা দিতে হবে যে!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান হ'ল। কিন্তু সে মুখ তুলল না, বরং সন্ন্যাসিনীর পায়ের খাঁজে মুখ রেখে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

'কি হবে মা আমার। আমি ওঁকে ছেড়ে সন্ন্যাস নিতে পারব না। ওঁর সম্বন্ধে

আমার কামনা যে আজও যায় নি। অথচ—'

পার্বতী বললেন, 'পাগলী, সে কামনা যাবে কি ক'রে, তুই যে কঠোর তপস্যা করেছিস, সে তো স্বরূপকে কেন্দ্র ক'রেই, ইষ্ট গুরু সবই তো ঐ লোকটির সঙ্গে এক হয়ে গিছল। সাধনার নাম ক'রে কামনাতেই মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিস্ যে।'

'তাহলে কি হবে মা ? আমার জন্যে যে ওঁর জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে !'

'তা হয়ত যাবে। কিন্তু এ তোরও দোষ নয়, স্বরূপেরও দোষ নয়—দুজনেরই ভাগ্যের দোষ। কেন ভাগ্য এভাবে তোকে বঞ্চিত করলেন, বিনা দোষে এত কষ্ট দিলেন তাকেও—তাও বলতে পারব না। জন্ম-লগ্নের লিখন, পূর্বজন্মের কর্মফল —যাই বলুক লোকে তাতে কি ইহজন্মের দুঃখ কিছু কমে ?…চল্ ওঠ্, ভেতরে চল্, ঠাকুরের চরণামৃত খাইয়ে দিই, একটু সুস্থ হোক দেহ।'

এই বারই কথাটা মনে হ'ল, একটু বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু মা, আমার কথা, ওঁর কথা—নাম পর্যন্ত—এসব জানলেন কি ক'রে ? তাহ'লে লোকে যা বলে —আপনি সর্বজ্ঞ—তাই ঠিক !'

কতকটা জোর ক'রেই ওকে তুলে ধরে ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'পূর্ণিমা আমার বাল্যবন্ধু, আত্মীয়তাও একটু ছিল—বিবাহের সময় ওর শ্বশুর-মশাই শ্যামসোহাগিনী নাম দেন। ওর শ্বশুর, গুরুও বটে, বলেছিলেন, আমরা গোপীবল্লভের সেবক, আমাদের আত্মবৎ সেবা—সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে, বেদান্তবাদী তপস্বীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না রাখাই ভাল। আমাদের সেবা বা কর্তব্য দেহধারী লীলাময় ভগবানকে নিয়ে—দণ্ডী শংকর আমাদের আদর্শ নন। সেইজন্যেই পূর্ণিমা দেখা করত না। তবে দুজনেই দুজনের খবর রাখি। স্বরূপও আমার সঙ্গে কাশীতে, পুষ্করে নানা সময়ে দেখা করেছে. সে বেদান্তও ভাল ক'রে পড়েছে —স্বয়ং মধুসূদন সরস্বতীকে এক সময়ে শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করেছিল। তার মতো নীরব তপস্বী খুব কম আছে মা, তার মনে লীলাময় মায়াময় এক হয়ে গেছেন। আমি শুধু তাকে স্নেহ নয়, শ্রদ্ধাও করি।'

বলতে বলতেই ওকে মন্দিরের সামনের দালানে বসিয়ে চরণামৃতের সঙ্গে একটু শীতলের প্রসাদী দুধ মিশিয়ে খাইয়ে বললেন, 'তুমি যে এ কাজ করবে মা, আমার এখানে আসছ সন্ন্যাস নিতে—সে খবর আমি পূর্ণিমাকে দিয়ে পাঠিয়েছি। কাল সকালে এখানে এসে স্বরূপও সে সংবাদ পাবে। এ নিয়ে হয়ত কোন আলোচনা হতে পারে ভেবে আমি সেকথাও রটনা করেছি, আমি দিনকতক ওকে আমার কাছে রাখব বলে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

'তাহ'লে আমি এখন কোথায় যাবো আপনার সঙ্গে মা ?' একটু ব্যাকুল ভাবেই বলে, 'শুনেছি উত্তরকাশীতে যাবেন, সে তো বহুদূরে। তপস্বীদেরই জায়গা— আপনি কি আমার মন ঐ দিকে নিয়ে যাবার জন্যে, সন্ন্যাসের মতো ক'রে তৈরী করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছেন ? ওঁর সঙ্গে—ওঁর সঙ্গে কি আর দেখা হবে না !'

খুব খানিকটা হেসে নিয়ে পার্বতী মা বলেন, 'তোর আগে ঐ ভয়ই হ'ল ! দূর পাগল ! সন্ন্যাসের দিকে মন ফেরানো এত সহজ !…বিশেষ তুই তো ভগবানের

কথা ভাবিস নি, পুরুষের কথা, স্বামীর কথাই ভেবেছিস। তোর ও তপস্যার কোন জোর নেই ?'

তারপর একটু থেমে বলেন, 'শোন, ঈশ্বরমুখী যে সন্ন্যাস এক জন্মে তা হয় না বোধ হয়। কিম্বা ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া হয় না। তিনি যার সাধনা নেবেন, যাকে দিয়ে এ কাজ করাবেন, তাকে সেইভাবে তৈরী করেন। আমারও বিয়ে হয়েছিল। আট বছর বয়সে বিয়ে—আট বছরের মধ্যেই বিধবা হওয়া। বিয়ের সময়ে দু-তিনটে দিন ছাড়া আর দেখাও হয় নি। কোন স্মৃতিও ছিল না। বিয়ে হওয়া বা বিধবা হওয়া কিছুই বুঝি নি। আমাদের বাড়িতে স্বপ্নলব্ধ নারায়ণশিলা ছিলেন। মাছ-মাংস বাড়িতে ঢুকতই না, কাজেই সেদিক দিয়ে বোঝারও কোন কারণ ছিল না।

'আমার যখন এগারো বছর বয়স—হরিদ্বারে গিছলুম মা-বাবার সঙ্গে কুম্ভ মেলায়। গঙ্গার ওপারে তখন বিস্তীর্ণ চড়া ছিল, সেই মাঠে সন্ন্যাসীরা থাকতেন, হয়ত এখনও থাকেন, তবে সে খুব রাজকীয় ভাবে। তখন অনেকেই খোলা জায়গায় থাকতেন ধুনি জ্বালিয়ে। শুধু সন্ন্যাসীরাই নন, সন্ন্যাসিনীরাও থাকতেন অমনি ভাবে, একেবারে বিবস্ত্রা নির্বিকার সন্ন্যাসিনী দেখে তখন খুব অবাক লেগেছিল।

'মা যেন কার মুখে শুনেছিলেন যে ওখানে এক মাতাজী আছেন, তিনি নাকি ত্রিকালজ্ঞ। তাঁর কত যে বয়স তাও কেউ জানে না। মার কৌতূহল হওয়া খুব স্বাভাবিক, একদিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে করতে খোঁজও পাওয়া গেল—কিন্তু দেখা পাওয়া তার দুঃসাধ্য। চারিদিকে প্রচণ্ড ভীড়, বিশেষ সন্ন্যা-সিনীদের জন্যে ভীড় আরও বেশী। জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানা গেল যে মাতাজী থাকেন—ঐ মাঝখানটায়, পাতালতা দিয়ে তৈরী করা যে ছোট্ট ঝোপড়া—তার মধ্যে, অনুমতি না হলে দর্শন পাবার উপায় নেই। চারিদিকে বহু সন্ন্যাসিনী যেন চেড়ীর মতো ঘিরে আছেন। এদের দেখতেই বোধহয় বেশী ভীড়—তাদের ঠেলে অনেক কষ্টে যদি বা চেড়ীদের কাছে পেঁছনো গেল তাঁরা বললেন, নেই হোগা! মা কাকুতি-মিনতি করলেন কিছুক্ষণ, তাঁদের সেই এক কথা, হোগা নেই।

'ফিরেই যাবেন মা, অকস্মাৎ সবাইকে ঠেলে সরিয়ে ডিঙিয়ে বেরিয়ে এলেন সেই মাতাজী তার ঘর থেকে। আমার মুখখানা তুলে ধরে একটুখানি দেখেই বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, এ তুই-ই। এতদিন পরে আসার সময় হ'ল। তোর জন্যেই অপেক্ষা করছি যে।...তাই তো বলি, অকস্মাৎ সারা গায়ে এমন ক'রে কাঁটা দিয়ে উঠল কেন ? বুঝলুম তুই এসেছিস।" তারপর মায়ের দিকে ফিরে বললেন, "বেটী, তোর এ মেয়ের আশা ছাড়তে হবে। এর দেহে যা যা লক্ষণ—তুই, তোরা কেউ বুঝিস নি। এর জন্যেই পথ চেয়ে এতকাল বসে আছি, আমাদের যে সাধনার ধারা—তা কাউকে না জানিয়ে তৈরী না ক'রে যেতে পারছিলুম না। এবার ছুটির হুকুম হয়েছে বুঝতে পারলুম।"

'মা খুব একটা প্রতিবাদ ক'রে উঠতে যাচ্ছিলেন, মাতাজী হাসলেন, বললেন,

"ব্রাহ্মণের মেয়ে—আট বছরে বিয়ে হবে, আট বছরেই বিধবা—অক্ষতযোনি—কেমন, সব মিলছে তো ? আমার যিনি ইষ্ট তিনি এ সব তৈরী ক'রে রেখেছেন যে, আমি যাঁর কাছে মানুষ তিনি এসব জানিয়ে রেখেছেন। আর দ্যাখ্, বাড়িতে রেখেই বা কি হ'ত ? বিয়েও তো দিস নি আর একটা, এই কিশোরী মেয়ে—যখন পূর্ণ যৌবন হবে, সামলাতে পারবি ? তোরা মলে এর কি দুর্গতি হবে, তা ভেবেছিস ?"

'মা অত বোঝেন নি। তিনি আমাকে নিয়ে বলতে গেলে পালিয়ে এলেন ধর্ম-শালায়। কিন্তু আমার কি যে হ'ল—মন সেই তাঁর কথাই ভাবতে লাগল, কে যেন দড়ি দিয়ে টানতে লাগল তাঁর দিকে। ভোরবেলা উঠে বাইরে এসেছি, দেখি তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। কিছুই বললেন না, আমার হাত ধরে নিমেষে সেই ভীড়ের মধ্যেই কোথায় মিশে গেলেন। তার পর কি হয়েছে জানি না। আমার সেই মাতাজী গুরু—তিনি কুম্ভের স্নানও করলেন না। সেই দিনই চলে গেলেন হিমালয়ের সুদূর এক প্রান্তে।

'তা ঠিক সেদিনই কি মন পুরোপুরি সন্ন্যাসের দিকে ফিরেছিল ? অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে মনের সঙ্গে, অনেক বিদ্রোহ করেছি—বিশেষ যখন ভরা যৌবন এল। যুদ্ধ করেছেন সে মাতাজীও মন ফেরাবার জন্যে। শেষ অবধি তাঁরই জয় হয়েছে।'

'তা এখন তাহ'লে আমাকে নিয়ে কি করবেন ?'

'ভয় নেই, ভয় নেই। গাড়ি এসেছে, আমি দিন দুই তিন ঋষিকেশে থাকব, বলাই আছে। ওদেরও বলে দিয়েছি ঐখানে গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসতে। তা হ'লে রটনাটাও সত্যি হয়। আমার বুদ্ধিমতো একটু পরামর্শও দিয়েছি। মনে হয় সেটা ওদের মনে লাগবেও। তবে একটা কথা বলছি, তোমার যা শক্তি, সন্ন্যাসের পথে গেলেই ভাল হ'ত। শান্তি পেতে, কামনাও শান্ত হ'ত একদিন। ভাগ্যের যে কাঁটা তোমার জন্মপত্রে বিঁধে আছে, তা কি তোমায় সহজে অব্যাহতি দেবে ? অবশ্য এও আমার বলা ভুল, সে কাঁটা তোমাকে এ পথে আসতে দেবে কেন !'

ঋষিকেশ এই নতুন দেখল বিশাখা। কী বা দেখেছে সে, বিয়ের দৌলতে যেটুকু দেখা—তা ছাড়া শান্তিপুর নবদ্বীপ। পাহাড় বলতেও এই দেখল, গোবর্ধন হয়ত কোনকালে পাহাড় ছিল, শিলা সংগ্রহ করতে করতে তা প্রায় ভূমিসাৎ হতে বসেছে।

চারিদিকে পাহাড়, মাঝখান দিয়ে খরস্রোতা গঙ্গা, ভাল লাগারই কথা।

ত্রিবেণী ঘাটে স্নান ক'রে যখন পাহাড়গুলোর দিকে চায়, গঙ্গার প্রবল স্রোত বড় বড় পাথরে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে শুধু শুভ্র ফেনারই সৃষ্টি করছে না, অস্প গর্জনেরও সৃষ্টি করছে। মনটা ঐ দিকেই যেতে চায়—আরও ওপরে না জানি কি আছে, আরও, আরও ওপরে ?

তবু সম্প্রতি বন্যায় অনেক ক্ষতি হয়েছে, অনেক সাধুদের আশ্রম ভেসে গেছে, বহু সাধুর মৃত্যু ঘটেছে, কতদিনের বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ে কোথায় ভেসে গেছে।

এমন কি সাধুদের বড় বড় আশ্রম আখড়া—এসবেরও বিপুল ক্ষতি হয়েছে। তবে বিশাখা তো আগে সে সব কিছু দেখে নি, এখন যা দেখছে তাও খুব ভাল লাগছে। গঙ্গার সে প্রলয়ঙ্কর রূপও তো নেই—প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে।

প্রথমে স্তবপাঠ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছে মুগ্ধ দৃষ্টিতে—নদীর ওপারে নিবিড় শ্যামলতা মাখা পাহাড়গুলোর দিকে—মাতাজী কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছেন টের পায় নি—আস্তে আস্তে বললেন, 'মনটা এতেই ওপরের দিকে টানছে, আরও ওপরে উঠলে ফিরতে ইচ্ছে করবে না।...তোকে সংসারে ফিরতেই হবে, তবে বড় শান্তি মা, বিশেষ এই গঙ্গা। শুধু পবিত্র নন, বড় স্নেহময়ী। মানুষের দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা নিবৃত্তির জন্যে মা যেন কোল পেতে আছেন।'

তৃতীয় দিনের সকালেই শ্যামসোহাগিনী এসে গেলেন, স্বরূপও।

স্বরূপ নীরবেই প্রণাম ক'রে বসলেন, মা এবং মায়ের বন্ধু দীর্ঘকাল পরে মিলিত হয়েছেন—সেখানে তিনি কি কথা বলবেন। বিশেষ যে সন্ন্যাসিনী ত্রিকালজ্ঞ সর্বজ্ঞ বলে বিদিত।

পার্বতী মাতাজী এগিয়ে এসে বান্ধবীর হাত ধরলেন, 'কতকাল পরে তোর সঙ্গে দেখা হ'ল। ভাগ্যিস বৌমার ভূত চেপেছিল—'

'ভূত চেপেছিল না তুই চাপিয়ে দিলি কে জানে। নইলে ঘটনার আগেই সে বার্তা পেঁছে গেল কি ক'রে? কেন কখন সবই তো জেনে বসে ছিলি। আরও আগেই খবরটা পাঠালি না কেন, তাহলে এই টানাপোড়েনটার দরকার হ'ত না।'

'তাহ'লে দেখাটা হ'ত না যে।'

'তা বটে। তোর চালচলন কথাবার্তায় মনে হয় অতি সাধারণ গ্রাম্য মেয়েছেলে, অথচ এই সব ঘটনার কথা শুনলে যেন গা শিউরে ওঠে—ত্রিকালজ্ঞ বলে যারা, ঠিকই বলে।'

'যাক গে ওসব কথা। স্নান তো করবিই, বাবা স্বরূপ তুমিও যাও। এখানে তোমার পাণ্ডা আছেন, তাঁকে খবর দিয়েছি। তিনি ঘাটে অপেক্ষা করছেন। স্নান ক'রে এসো, যদি তোমার মা সঙ্কল্প ক'রে বিধিমতো স্নান করেন তাই আনিয়েছি। আগে তো বোধ হয় আসে নি। পুজোর ঘর এখানে আছে, সাজানোই আছে—এমন কি রাধাগোবিন্দর পট পর্যন্ত আছে। ধ্যান পুজার কোন অসুবিধা হবে না।'

বিশাখা আগেই এসে প্রণাম করেছিল—দুজনকেই। মাতাজীর দৃষ্টি সর্বত্র। ওদের পথের কাপড়, অথচ এসে দাঁড়ানো মাত্র প্রণাম করা উচিত—এ জন্যে উনি পট্টবস্ত্রের ব্যবস্থা রেখেছিলেন, শাড়ির ওপর চাদর জড়ানো। শ্যামসোহাগিনী মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন মাত্র, স্বরূপকে দূর থেকে প্রণাম করা—সেক্ষেত্রে আশীর্বাদের প্রশ্নই ওঠে না। গুরুজন-স্থানীয়দের সামনে স্বামীকে স্পর্শ ক'রে প্রণাম করা অবিধেয়—তাও মাতাজী বলে দিয়েছিলেন, আগে শাশুড়িও বলেছেন। শাশুড়ি এসে পর্যন্ত একটি কথাও বলেন নি। ওঁরা রাগ করেছেন

নিশ্চয়ই—এই ভেবেই মাথা হে'ট ক'রে বসেছিল। ও তরফ থেকে সম্ভাষণ মাত্র না করায় এই হেমন্তর শীতলার্ত দিনেও কপাল গলা ঘামে ভিজে উঠল।

একবার মাত্র সে দিকে চেয়েই মাতাজী বললেন, 'বৌমা আমার সঙ্গে গিয়ে স্নান করেছেন, পুজোটা করতে দিই নি, স্বরূপ যখন আছে, দুজনে একসঙ্গে ধ্যান পুজো করবে, সেই তো ভাল।'

এর পর কে কথা বলবে! বলবার আছেই বা কি। সহজ সরল কথা। এ'রা দুজনেই স্নানে চলে গেলেন।

স্নান পুজো শেষ হলে এ মঠের যিনি অধিষ্ঠাতা দেবতা তাঁর বাল্যভোগের প্রসাদ এলো। জলযোগ শেষ ক'রে শ্যামসোহাগিনী বললেন, 'তারপর ? তুমি যখন এত কাণ্ডই ঘটালে—এবার বলে দাও ব্যবস্থাটা কি হবে! আমি গোকুলের কথাই বলেছিলাম বৌমাকে, সে জন্যে পুরোনো বাড়ি নতুন ক'রে তৈরী হ'ল বলতে গেলে—সম্ভবত তাতেই তাঁর মনে হয়েছে এতেও আমাদের শ্রীরাধা-গোপীবল্লভ থেকে এটুকু দূরত্ব, তাও স্বরূপের ভাল লাগবে না। সে-ই এত সমস্যার কারণ, স্বামীর শান্তি নষ্টের কারণ হচ্ছে দেখে সন্ন্যাস নিয়ে নিজেই দূরে কোথাও চলে যাবেন ভেবেছিলেন। তার পর যা করবার, যা করা উচিত তুমিই জানো—তুমি ত্রিকালজ্ঞ কিনা জানি না, অলৌকিক জ্ঞান দূরদৃষ্টি কিছু আছে তা জানি, বহুবার সে পরিচয় পেয়েছি—তুমিই পথ দেখাও, কি করবো বলো!'

পার্বতী মা অতি সাধারণ ভাবেই বললেন, 'তা এত সৃষ্টি করতেই বা যাচ্ছ কেন তোমরা ? অস্বাভাবিক কিছু করতে গেলে—নতুন কোন ব্যবস্থা—তাতে তো এ ধরনের সমস্যা দেখা দিতে বাধ্য। আমি তো জানি স্বরূপ বাবা আমার দীর্ঘকাল ধরে গোপীবল্লভের বাগানবাড়ির মধ্যে অথচ মূল দেবগৃহ থেকে খানিকটা দূরে একাই বাস করেন, ধ্যান ধারণা নিয়ে থাকেন—'

চমকে উঠলেন মা এবং ছেলে দুজনেই, শিউরে উঠলেন বলতে গেলে—এত পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর এ'র জানবার কোন কারণই তো নেই।

পার্বতী মা বলেই চললেন, 'সোজাসুজি এখান থেকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে তুললেই তো হয়। কোন রকম আড়ম্বর বা বিশেষ ব্যবস্থা করবার দরকার কি ? বন্যার পর নিশ্চয়ই খাট বা চৌকির ব্যবস্থা হয়েছে সে ঘরে—স্বামী স্ত্রী তাতেই শোবে, অথবা যদি সে চৌকি একজনের মতো হয়—দুজনেই ভূমিশয্যা করুক। কোন রকম বিশেষ ব্যবস্থা করতে গেলেই মানুষ সচেতন হয়। যেখানে বৌমা ছিলেন সে পুজারীজীকে কিছু প্রণামী দিও—স্বরূপ নিজ হাতে দিয়ে এলেই ভাল হয়। যে মেয়েটি সেবা করেছে এত দিন তার যোগ্য প্রাপ্য চুকিয়ে বলে দেবে তিনি নিজের বাড়িতে চলে গেছেন।...আর, কৃষ্ণচন্দ্রের পুজারী যে ছেলেটি বৌমাকে এনে আমার কাছে পে'ছে দিয়েছিল, বড় ভাল ছেলে, অসাধারণ মনের জোর—যদি তার কোন উপকার করতে পারো তো করো।'

এবার শিউরে ওঠার পালা বিশাখার।

এই তিন চার দিনে ওঁর অনেক অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়েছে—তবু এত-খানি অন্তর্দৃষ্টি দেখে—বিশেষ যে এক লহমার বেশী সামনে ছিল না বোধ হয়—চমকে উঠতে হয় বৈকি !…

কিন্তু এসব কথায় শ্যামসোহাগিনীর কান ছিল না। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে প্রত্যক্ষ সমস্যার কথাই ভাবছিলেন। হয়ত সে সমস্যা স্বরূপের মনেও উঠেছিল, তবে যেখানে মা আছেন, মাতৃস্বরূপা আরও একজন—কথা যা কিছু এঁরাই বলছেন, সেখানে চুপ ক'রে থাকাই উচিত।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে যথেষ্ট কুণ্ঠার সঙ্গেই বললেন—বিশাখা আছে বলেই এত কুণ্ঠা —'কিন্তু ঝুলনে দোলে, বৈশাখী ফুল-কামরার দিনে, বিগ্রহ এক এক দিন ওখানে যান—তা নিয়ে কোন কথা উঠবে না তো, যদি কোন প্রশ্ন ওঠে—বৌমা অপমানিত বোধ করতে পারেন।'

'প্রশ্ন তুললেই ওঠে। সহজ স্বাভাবিক ভাবে চললে কেউ এসব প্রশ্ন তুলবে না—মনেই হবে না তাদের। বিগ্রহ যখন আসেন কত কি লোক আসে তার সঙ্গে, চতুর্দোলা বহন ক'রে আনে যারা তারাও সেসব দিনে ঐখানেই থাকে। ঐ বাড়িরই এক অংশে নিশ্চয় দারোয়ানরা থাকে। পটে নিত্য পূজা বজায় রাখতে হয়, সেজন্যে পূজারীও থাকেন। এত লোক ওখানে থাকে, তার জন্যে কার কি মনে হয়? বিশেষ যখন স্বরূপ এতকাল ধরে ওখানেই বাস করছে। সে শুনেছি পূজা করাই ছেড়ে দিয়েছে, যদিও আমি এর কোন কারণ বুঝি না। নিত্য-শুদ্ধ নিষ্পাপ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বাদ দিয়ে মাইনে করা পূজারীর সেবায় গোপীবল্লভ বেশী তুষ্ট হবেন? না স্বরূপ পূজা করলে কারও মনে কোন প্রশ্ন উঠবে?…যাই হোক, কোন রকম কথা ওঠবার কারণই তো নেই আর!'

'বাঁচালি ভাই, তুই যখন বলছিস আমি নিশ্চিন্ত।'

'চিন্তা মেলা করিস কেন? গোপীবল্লভ তোর সময়ের অনেক আগে থেকে আছেন, পরেও থাকবেন। তাঁর চিন্তা তাঁর ওপর ছেড়ে দিস না কেন?'

তারপরই, বাদানুবাদের আর অবসর না রেখে বললেন, 'বাবা স্বরূপ, আমি এখানে বহু লোককে বলে রেখেছি—তুমি আজ বিকেলে একটু ভাগবত পাঠ আর হিন্দীতে ব্যাখ্যা ক'রে শুনিয়ে দিও।'

স্বরূপ মৃদু হেসে দুই মাকে প্রণাম ক'রে শুধু বললেন, 'কেন বলেছেন তা বুঝেছি। যে জন্যেই হোক আপনার আজ্ঞা যখন, পালন করব নিশ্চয়ই!'

পরের দিনের জন্য মাতাজী ওঁর ভক্তের গাড়িই ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন। প্রত্যূষে যাত্রা করা হবে, সেইমতো তৈরী হলেন এঁরা। কথা রইল গোকুলোর বাড়িতে সেদিন রাত কাটিয়ে শ্যামসোহাগিনী একেবারে ভোরে বাড়িতে চলে যাবেন, এরা দিনটা কাটিয়ে সন্ধ্যার আগে বাগানবাড়িতে। এ ব্যবস্থা শ্যামসোহাগিনীর। ওখানে চৌকি ঠিক একজনের মতো—বাড়ির যে বিশ্বস্ত পুরোনো দারোয়ান, তার হাত দিয়ে—নতুন কেনা কিছু নয়—স্বরূপের এ বাড়ির ঘরে যে গালিচা তোশক

চাদর প্রভৃতি আছে তাই ও বাড়ি চালান করা হবে, চৌকি বার ক'রে মেঝেতেই দুজনের মতো বিছানা পাতা হবে। নতুন কিছু কিনে পাঠালেই লোকের চোখে পড়বে। যার বিছানা সে নিয়ে যাচ্ছে তাতে কোন প্রশ্ন ওঠে না। বাকী বৌমার যা কিছু প্রয়োজন হতে পারে সেসব জিনিস রামরতিয়াকে দিয়ে পাঠাবেন সন্ধ্যার পর।

যাত্রার আগে আরও একবার কান্নায় ভেঙে পড়ল বিশাখা। মাতাজীর পা দুটি ধরে বলল, 'মা আপনি সর্বজ্ঞ। দয়া করে বলুন আমার কি এতেই প্রায়শ্চিত্তর শেষ হ'ল, না আরও কোন শাস্তি বাকী রইল ? কলঙ্কের ছাপ তো রইলই মা, নিজের বাড়িতে চোরের মতো বাস করতে হবে—এ ছাড়া ? স্বামীর সেবা ক'রে শান্তি পাবো তো ? তাহলে সব দুঃখ সইবে।'

বিশাখাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে তেমনি স্নেহকোমল কণ্ঠে বললেন, 'মা, আমি আগেই বলেছি ভাগ্য সর্বাপেক্ষা বলবান, অমোঘ তার ব্যবস্থা। কোন কিছুতেই তার বিধানের অন্যথা ঘটে না। হয়ত তেমন কোন আশ্চর্য শক্তিধর সাধক কিছু নড়চড় করতে পারেন, তবে অত উচ্চে যাঁরা উঠেছেন তাঁদের নাগাল পাওয়াই দুঃসাধ্য, তা ছাড়া এত তুচ্ছ কারণে তাঁদের শক্তি প্রয়োগ করতে চান না। আমি অন্তত পারি না, সে শক্তি নেই। তাই ভাগ্যে কি আছে নিজেও কখনো জানতে চাই নি। তোমাকেও সেই পরামর্শ দিই, কোন অশুভর সম্ভাবনা আছে, মনে যদি এ সন্দেহ থাকে—তাকে আগ বাড়িয়ে জানতে গিয়ে লাভ কি ? ঈশ্বর আছেন মাথার ওপর—তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে।—সেই পরম ও চরম ব্যবস্থাকে মাথা পেতে নেওয়াই কি ভাল না ?'

॥ ২২ ॥

বহুদিন পরে পতি-পত্নীর মিলন।

এক বিছানায় শোওয়া, একটি ছোট ঘরে কাছাকাছি থাকা।

এত ঘনিষ্ঠতা, এমন একান্ত সান্নিধ্য, বিয়ের পরে যে তিন চার মাস শ্বশুরবাড়ি ছিল, তখনও ঘটে নি।

বড় ঘর, বড় খাট আলমারি, বিরাট বিলিতি আয়না ধরেও অনেকটা খালি থাকত। যাকে বলে হাত-পা মেলে থাকা—সেই রকম ব্যবস্থা।

তা ছাড়া দিনে দেখাশুনো হ'ত কদাচিৎ। স্বরূপ দুপুরে ঘুমোতেন না—বোধ হয় এখনও সে অভ্যাস আছে—বিশ্রাম করতেন নিচে পড়ার ঘরে। পড়াশুনো করতেন, কিছু কিছু টীকা প্রভৃতিও লিখতেন, ছোট ভাইকে পড়ানোর চেষ্টা করতেন।

তার পাশের ঘরটা ছিল বৈঠকখানার মতো। কাজেকর্মে কেউ দেখা করতে এলে, কামদারের সঙ্গে কোন বৈষয়িক কথা থাকলে সেই ঘরেই বসতেন। দুপুরের বিশ্রাম বা কাজ বেশির ভাগ ঐ দুটো ঘরেই সারা হ'ত।

সেই ভাবে যার থাকা অভ্যাস, সে কি এইটুকু ঘরে, আর একটা প্রায়-অপরিচিত মানুষের সঙ্গে থাকতে পারবে ?

এই ঘরটা তৈরি করা হয়েছিল—পালে-পার্বণে পূজারীরা ছাড়া বাইরের কোন লোক, অতিথি ধরনের কেউ যদি এসে পড়েন—তাঁদের জন্যে।

সে অবস্থা দেখা দিলে যাতে কোন অসুবিধা না হয়—একটি বড় তোরঙ্গে শতরঞ্জি তোশক বালিশ একপ্রস্থ তোলা থাকত দারোয়ানের জিম্মায়। একটা মশারীও।

স্বরূপ যখন বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন তখন সেই বিছানাই নামানো হয়েছিল।

একজনের পক্ষে যথেষ্ট।

তারপর যখন চৌকি পেতে কিছু ছবি, বিগ্রহের পট বসিয়ে ধ্যান-পূজার ব্যবস্থা হ'ল, তখনও অসুবিধা হয় নি। বন্যার সময় কদিনের জন্যে যে তক্তপোশ আনা হয়েছিল—সেও একজনের মাপে—যাকে 'একানে' বলে তাই।

আজ ঘরটা যেন আরও ছোট লাগছে। রাত্রে শীতলের প্রসাদ যখন এসে পেঁছিল তখন দুজনের মতো আসন পাতারও জায়গা নেই—এমন অবস্থা।

স্বরূপকে খাবার সাজিয়ে দিয়ে বিছানারই এক প্রান্তে বসতে হ'ল বিশাখাকে। স্বরূপ খাওয়া শেষ ক'রে আচমনের পর বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ওর জন্যেই এই ভাবে দাঁড়াতে হচ্ছে মনে হলে খেতেও লজ্জা বোধ হয়।

অবশ্য খাওয়াও সামান্য, শরীর এখনও সুস্থ সবল হয়ে ওঠে নি, বেশী খাওয়ার শক্তিও নেই, উচিতও নয়।

যে ব্রাহ্মণ সেবকটি প্রসাদ নিয়ে এসেছিল, সে-ই বাকী খাবার, বাসন নিয়ে চলে গেল। পাশে যে সদ্য খেজুর পাতার চ্যাটাই দিয়ে ঘিরে একটা স্নানঘরের মতো হয়েছে তা আগেই দেখে নিয়েছিল বিশাখা, এসে সেখানেই হাত পা ধুয়েছে, কাপড় কেচেছে। সেখানে একটা তেলের দেওয়াল-আলোও জেবলে রাখা হয়েছে সন্ধ্যের আগে থেকে। জলও আছে বড় বড় দুটো বালতিতে। সেখানেই মুখ ধুয়ে এসে খাওয়ার জায়গাটা পেড়ে নেবে—এসে দেখল দারোয়ানটি সে কাজও সেরে চলে গেছে।

একটু ক্ষুণ্ণই হ'ল বিশাখা। এমন ভাবে সকলেই যদি তটস্থ হয়ে সব কাজ ক'রে দেয়—তাহলে সে কি করবে ? স্বামীর সেবা করবে কখন ?

মনে হ'ল অন্তর্যামীর মতোই মনের কথাটা বুঝে বাইরে থেকে স্বরূপ বললেন, 'মা বলেছেন ঐ স্নানঘরের পাশটাও ঘিরে দেবেন পাকা ক'রে, কিছু বাসনকোসনও রাখবেন—তুমি যদি কখনও কিছু খাবার কি অন্য কোন রান্না করতে চাও—করতে পারবে।'

অতঃপর কি ?

উনি শুতে আসবেন না সে যাবে ওঁর কাছে ?

বড় বেশী স্পর্ধা হয়ে পড়বে না সেটা ?

কিছু ঠিক করতে না পেরে সেখানেই কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

বোধ হয় সেটা বাইরে থেকে লক্ষ্য ক'রেই স্বরূপ ঘরে এলেন। বললেন, 'তোমার শরীর ভাল নয়, তুমি শুয়ে পড়ো। আমি রাত্রে শোবার আগে একটু জপধ্যান করি—এখানে থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে গেছে। আমি সেটা সেরে শুতে যাবো।'

বিশাখা বিছানায় গিয়ে বসল। তবে এক্ষেত্রে শোওয়া যায় না।

একা আলাদা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়াই কি তার অদৃষ্টে লেখা আছে নাকি?

ভাবতে ভাবতে চোখে জল এসে গেল।

ভগবান কি তার অদৃষ্টে কেবল এই কথাই লিখেছেন!

স্বরূপ প্রায় আধ ঘণ্টা পূজার আসনে বসে রইলেন। হ্যারিকেনের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঠাকুরের চৌকিতে শুধু একটি প্রদীপ জ্বলছে। হয়ত ওটা সারারাতই জ্বলবে।...

আধ ঘণ্টার বেশী থাকাই অভ্যাস। এক একদিন বহু রাত কেটে যায় সম্বিৎ ফিরে পেতে। আজ অন্য নিয়মের অর্থাৎ সাংসারিক জীবনের কথা ভেবেই, প্রণাম ক'রে উঠে এসে আস্তে আস্তে বিছানায় শুলেন, বোধ হয় বিশাখা শুয়ে পড়েছে কি ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবেই।

শোবার পর সচেতন হয়ে উঠলেন ওদিক চেয়ে।

'ওকি! তুমি ঘুমোও নি এখনও!...শরীর খারাপ হবে যে!'

এবার একটু কাছে এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিল বিশাখা। প্রথম প্রথম মার নির্দেশমতো যেমন ভাবে হাত বুলতো—তেমনিই।

'ও হরি! তুমি সেই জন্য বসে আছ! না না, সে অব্যেস কি আমার এখনও আছে। তাছাড়া আমি কি জমিদার। না না, শুয়ে পড়ো শুয়ে পড়ো।'

শুয়ে পড়তে পারল না। দুটো পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

কত দিনের কত বেদনা, কত হতাশা, কত শাস্তি—আজকে ঐ দুটি পায়ে সঁপে দিতে না পারলে এ মিলনের কোন অর্থই হয় না যে!

এ কি শুধু একত্রে থাকার জন্য—স্বামীর অসুবিধে ক'রে, হয়ত তাঁর বিরক্তির কারণ হয়ে?

স্থিরভাবেই কিছুক্ষণ শুয়ে রইলেন স্বরূপ।

এ বেদনা, এই চোখের জল এতদিনের দুঃসহ কষ্ট ধুয়ে দেবারই প্রচেষ্টা—বুঝতে পারেন বৈকি!

তখনও, বিবাহিত জীবনের প্রথম অধ্যায়ে এমনি ভাবেই পায়ে পড়ে থাকত অনেকক্ষণ ধরে, তার অর্থ তখন বোঝেন নি। আশ্রয়ই চেয়েছিল প্রাণপণে, ওঁর আশ্রয়।...

খানিক পরে স্বরূপ উঠে জোর ক'রেই টেনে নিলেন, পাশে রাখা বালিশে মাথা রেখে হাত দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতে লাগলেন।

শুধু পাশে শোওয়াই!

সেই তখনকার বলিষ্ঠ কঠিন হাতের সুদৃঢ় আলিঙ্গনের স্মৃতি মনে রেখেই যে

ওর এ দুশ্চর তপস্যা।

চোখের জল আরও বেড়েই যায়।

স্বরূপ তাও বোঝেন।

সেই তিনটে মাসের সব কথাই মনে আছে তাঁর। তাঁরও। বোধ হয় প্রতিটি রাত্রির কথাই।

হ্যাঁ, সে গায়ের খাঁজে মুখ গুঁজে দেওয়ার কথাও।...

বহু ব্যবধান এর মধ্যে রচিত হয়েছে। আশা ভঙ্গ, অপমান—সংসার করার স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া।

হয়ত ক্রমে ক্রমে কাছে আসবেন, হয়ত কিছুটা ক্ষতিপূরণ হবে জীবনে।

কিন্তু আজই সে এত আশা করতে চায় কেন?

চোখের জল ওঁরও তো আসার কথা। কিন্তু সে জল যেখান থেকে আসতে পারত সে উৎসমুখ জ্বলে আঙরা হয়ে গেছে বোধ হয়।

তবে আজও ওঁর বিশ্বাস—স্ত্রী নিরপরাধ। সে বোঝেও নি কী সর্বনাশ হয়েছে। সম্ভবত বিবাহের সময় কারও মুখে আভাস পেয়ে থাকবে, তাই অমন ব্যাকুল হয়ে আশ্রয় বা আশ্বাস চাইত। বেচারী!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্ত্রীর দিকে পাশ ফিরে শুলেন স্বরূপ—বুকের মধ্যে টেনেও নিলেন।

দীর্ঘনিঃশ্বাস হয়ত বিশাখারও পড়ত, প্রাণপণে সেটা দমনই ক'রে নিল।

সেদিনকার সে আলিঙ্গনের একান্ত মাধুর্য, সেই কঠোর পেষণ যদি আজ আশা করে তাহলে সেটা হয়ত পাগলামিই হবে।

যা পেয়েছে তাই যথেষ্ট।

ব্যবধান ধীরে ধীরে ক্ষয় হবে, দুজনেই দুজনের কাছে আসবে—এই ভাবাই স্বাভাবিক।

ভেবেও ছিল, বা ভাববার চেষ্টা করেছিল।

দুটি ঘরই তৈরী হ'ল। কিছু কিছু রান্নার সরঞ্জাম, আঙোটি, কাঠ কয়লাও রাখা হ'ল নতুন ঘরে। স্নানঘর পাকা হ'ল। এক কোণে চৌবাচ্চা। ভোরে আর বিকেলে দুবার ভরে দিয়ে যায় মালী। এ কুয়ার জলে স্নান করা চলে শুধু, 'ক্ষারীকুয়া' যাকে বলে—অর্থাৎ নোনা জল। এখানে বেশির ভাগই এই। যার ভাগ্যে মিষ্টি জল উঠল সে খুব ভাগ্যবান।

অবশ্য সকলকেই পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হয়। এঁদেরও পাশে একটি কুঞ্জ আছে। তাদের কুয়ায় মিষ্টি জল—সেখান থেকে জল এনে আলাদা পাত্রে ভরে রাখা হয়— খাওয়া ও রান্নার জন্যে। এখানে অনেককেই এ বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়। স্বয়ং বঙ্কুবিহারীর জন্যে পানীয় জল আসে যমুনা থেকে।

সবই হ'ল, কিন্তু তারপর? স্বপ্ন যেন স্বপ্নবৎই দূরে থাকে, বা দিগন্তে মিলিয়ে যায়।

কাছে আসেন অবশ্যই। পাশাপাশি শোয়াও হয়। এদিকে ফিরেই শোন খানিকটা। আলিঙ্গনও করেন। স্ত্রী জড়িয়ে ধরলে হাত ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন না। ঠাণ্ডার দিনেও দু'জনের সে আলিঙ্গনে স্বেদসিক্ত হয় দু'জনের বক্ষ। কিন্তু তাতে সে উষ্ণতা কই ?

যা সে আগে পেয়েছিল—সে গভীর উন্মত্ত আলিঙ্গন—যা স্নেহে সান্ত্বনায় প্রশ্রয়ে বুক ভরিয়ে দিয়েছিল ওর, কেন স্ত্রী সহজ হ'তে পারছে না সেই উৎকণ্ঠায় ওকে আরও বেশী করে ভালবাসার চেষ্টা করত—?

বিশাখা মনকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে, সে পরিস্থিতি তো এখন নেই—তাহ'লে সে উৎকণ্ঠা সে উদ্বেলিত আবেগ—আদর দিয়ে ওর জীবন মাধুর্যে ভরিয়ে দেবার সে চেষ্টা এখনও থাকবে কেন ?

তবু শাশুড়ির এত আয়োজন, ওদের, বিশেষ ক'রে ছেলের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের—মনকে সহজ ক'রে তোলবার—কথাও ভাবে সে।

কিন্তু কি করবে ভেবে পায় না।

খাবার করা কিছু শেখে নি। বাপের বাড়ি লেখাপড়ার ফাঁকে একটু-আধটু মাকে যা সাহায্য করা, তবে সে তো নিত্যকার সাধারণ রান্না ডাল ভাত।

ভোগের রান্না ছোঁয়ার হুকুম নেই—দীক্ষা না হলে সে অধিকার পাবে না।

শ্বশুরবাড়ি এসেও কিছু করতে হয় নি। ভোগ রান্নার জন্যে তিন চার জন ব্রাহ্মণ আছেন। সবাই তো সেই প্রসাদই খায়। কখনও কখনও কোন বিশেষ মিষ্টান্ন, পিঠেপুলি প্রভৃতি করার সময় শাশুড়ি ওদের শিখিয়ে দিতেন, দাঁড়িয়ে থেকে করাতেন। ওর সেই সামান্য কদিনের বিবাহিত জীবনে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার কথা কেউ ভাবে নি। কানে শোনা আছে এই পর্যন্ত।

তারপর তো এই সুদীর্ঘকালের মরুজীবন। নবদ্বীপে দরিদ্রের সংসারে থাকা। দেবতার ভোগ হ'ত ঠিকই—তবে সে ঐ নিজেদের মতো। এক পোয়া দুধে একটু ভাত ফেলে দিয়ে তাতে কখানা বাতাসা দিয়ে একবার নেড়ে নেওয়া—এই তো, পরমান্ন।

এখানে এসে এই ক'বছর—পোড়া রুটি আর নুন।

মাঝে মাঝে লীলাধরের কল্যাণে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদ আসত, অনেক রকমের খাদ্য-বস্তু। তা খাওয়া এক কথা—সেও কোনমতে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে—কিন্তু প্রস্তুত করার প্রণালী শেখার কোন প্রশ্নই ছিল না।

তা হলে এ রান্নার আয়োজন নিয়ে সে কি করবে ?

কী তৈরী করবে ? যদি বা কিছু হয়—উনি কি খাবেন ?

স্বরূপ তো প্রসাদ ছাড়া কিছুই মুখে দেন না। এখানেও একটা ছোটোখাটো পুজার ব্যবস্থা আছে—কিন্তু ওর হাতের তৈরী খাবার উনি কি দেবতাকে নিবেদন করবেন ?

একমাত্র, ওখান থেকে এই দুজনের জন্য দুধ আসে, সেইটে গরম করে দেয় সে, সেটা উনি প্রাভাতিক প্রসাদের সঙ্গে পান করেন। তবে সেও নাম-মাত্র। বলেন,

'তোমার শরীর ভাল নয়, তুমি বেশী ক'রে খাও ।'

প্রয়োজন হয় না। গোপীবল্লভের প্রসাদ যা আসে—অনেক বেশী। রাত্রের প্রসাদ থেকে কিছু মিষ্টান্ন শিকেয় টাঙিয়ে তুলে রাখা হয়। আবার লাড়ু ভোগ হবার পরও একজন সাইকেল ক'রে এসে পেঁছে দেয়। এই নিয়ে সে বেচারীর দিন কাটে। তিনবার পেঁছে দেওয়া, আবার সে সব পাত্র নিয়ে যাওয়া।

ক'দিন পরে ও জোর ক'রেই একটা ব্যবস্থা করল।

যখন কিছু বাসন মা পাঠিয়েছেনই, তখন সে লোকটি তীর্থের কাকের মতো বসে থাকবে কেন? বিশাখা খাবার এলেই এখানে পাত্রে প্রয়োজন মতো আজড়ে নিয়ে বাহককে বিদায় ক'রে দেয়। খাওয়া শেষ হলে নিজেই সে বাসন মেজে ধুয়ে তুলে রাখে। দাসী এখানে একজন আছে, কিন্তু তাঁকে হাত দিতে দেয় না বিশাখা। মনে হয় তাতে স্বরূপ খুশীই হয়েছেন।

এহ বাহ্য।

রাত চারটেয় ওঠেন স্বরূপ, প্রাতঃকৃত্য স্নান সেরে প্রায় দেড় ঘণ্টা ওখানেই জপ ধ্যান করেন। বিশাখাও সে শিক্ষা নিয়েছে। সেও সেই সময় উঠে বিছানা গুটিয়ে রেখে স্নান সেরে নেয়। তারপর নিজেও সে জপধ্যান করে। ঘরের মধ্যে শ্বশুর শাশুড়ির ছবি আছে, তাঁদেরও ফুল দিয়ে পুজো করে—না, স্বরূপকে দেখাবার জন্য নয়, আগেও সে শাশুড়ির পুজো করত। তাঁকে সত্যিই দেবীর মতো দেখত, এখনও দেখে। তিনি অতুলনীয়া, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

স্বরূপ এখানের পুজো সেরে, গোপীবল্লভ বিগ্রহ এখানে এলে যে কুঞ্জগৃহে অধিষ্ঠান করেন—সেখানে তাঁর পট ও গৌর নিতাইয়ের মূর্তি আছে—স্বরূপ এখানে থাকলে প্রতিদিনই সেই ঘরে চলে যান। পুজারী একজন আছেন কিন্তু স্বরূপ থাকলে তিনিই পুজো করেন।

এরপর তিনি ঘরে ফিরলে জলখাবার সাজিয়ে দেয় বিশাখা। কিছু কিছু ফল আসে এ বাগান থেকে, কিছু কেনাও হয়। ফল দুধ আর মিষ্টি প্রসাদ। স্বরূপ নিজের মতো খেয়েই আচমন সেরে কোন কোন দিন স্তূপীকৃত পুঁথি থেকে কোন একটা বেছে নিয়ে বাগানে লকেট গাছের তলায় দুপুর পর্যন্ত বসে পড়াশুনো করেন, কিছু কিছু লেখেনও।

কোন দিন বা সাইকেল ক'রে কোথাও বেরিয়েও যান। বৃন্দাবনের বহু কাজকর্মে ওঁর ডাক পড়ে, অনেক বিদ্যালয় ধর্মসভার সঙ্গেও যুক্ত আছেন। এটা সেই সময়ই শোনা। পরে রামরতিয়া অবশ্য বলেছে যে ঐ লজ্জাজনক ঘটনার পর বহু কর্ম বা প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়েছেন, নিমন্ত্রণেও কোথাও যান না—তবে যারা খুব অন্তরঙ্গ বা যাদের সঙ্গে আত্মীয়তার যোগ আছে তাদের ত্যাগ করতে পারেন নি। হয়ত সেই সব জায়গাতেই যান।

দুপুরের প্রসাদ গ্রহণ করার পরও কিছু পড়াশুনো করেন, চিঠিপত্রও বিস্তর আসে—ছোট ভাই অত লেখালেখি পারে না—তার উত্তর দিতে হয়। সে যেদিন

ধরেন, সারা বেলাই কেটে যায়। হিসেবও দেখতে হয় মধ্যে মধ্যে।

অবশ্য বিশাখাকে বারবারই বলেন, 'তুমি একটু শুয়ে নাও না, আমার অভ্যেস নেই বলেই—। তাই বলে সবাইয়ের এমন অভ্যেস থাকবে কেন!' বিশাখা এক আধ দিন আঁচল পেতে শোয় একটু। তবে ঘুমোনো ওরও ভাল লাগে না—জেগেই থাকে। দু-একটা বই পড়ারও চেষ্টা করে।

বিকেলে আবার বেরিয়ে পড়েন স্বরূপ।

মনে হয়—যা শুনেছে—রাত্রে শয়ন আরতির সময় প্রতিদিনই মন্দিরে যান। কোন কোন দিন ভাইয়ের পীড়াপীড়িতে আরতিও করেন, নয়ত দালান থেকেই আরতি দেখে মাকে প্রণাম ক'রে চলে আসেন।

উনি স্ত্রীকে ভালবাসেন সেই জন্যেই সব ত্যাগ করেছিলেন, দূর দেশে চলে যেতে চেয়েছিলেন।

এই নিয়েই তো এত কাণ্ড হয়ে গেল।

ঠিক বিশ্বাস করতে ভরসা হয় নি—তবু এক এক সময় ইচ্ছা করত বিশ্বাস করতে, সমস্ত শরীরে পুলক রোমাঞ্চ জাগত—কিন্তু সে ঐ কয়েক মুহূর্তের জন্যেই।

গত তিন-চার বছরে অনেক শিক্ষা হয়েছে মানবজীবন-রহস্যে—তাই কেবলই মনে হ'ত—এ কখনও সম্ভব!

কর্তব্য বলে মনে হয়েছে তাই!

তাও মহৎ মানুষের পক্ষেই সম্ভব—এটাকে কর্তব্য বলে ভাবা।

তবু সেইটুকু অবলম্বন ক'রেই একটা অসম্ভব আশা অঙ্কুরিত হয়েছিল মনে মনে। তার জন্যে রামরতিয়াও দায়ী অনেকটা। সে-ই আরও জাগিয়েছিল এ আশাকে, সত্য-মিথ্যার ইন্ধন দিয়ে বড় দাদাবাবু সম্বন্ধে বহুরাণীজীর ঐকান্তিক আসক্তি, ভক্তি, সর্বত্যাগী সাধনার কথা জেনেই হয়ত স্নেহ জেগেছে। তাকে ভালবাসা বলা ভুল হবে।

তারপরও—এতদিন, যাকে বলে ঘর করা হ'ল—এখনও বুঝতে পারছে না যে ঠিক কি এটা।

ভালবাসা? করুণা? স্নেহ? কর্তব্যবোধ?

হ্যাঁ, উদ্‌ভ্রান্তি জাগার কারণও আছে।

শুধুই আলিঙ্গন নয়—স্ত্রীকে কোনমতে সহ্য করা নয়—একদিন সহবাস যাকে বলে তাও হয়ে গেছে।

সেদিনও গা শিউরে উঠেছিল, পুলক রোমাঞ্চে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

একেবারেই যা অবিশ্বাস্য তাও তো ঘটল।

সত্যিই এতটা আশা করতে সাহস হয় নি।

মনে হয়েছিল সে অবিচারই করেছে স্বামীর ওপর, এটা সত্যিকার ভালবাসাই। তবে সকলে তো কামবুভুক্ষু নয়। তা ছাড়া প্রথম জীবনের সে উদ্দাম প্রেম বা

আসক্তি এত দিন, এত কাণ্ডর পরও তেমনি থাকবে—তা সম্ভব নয়।

তা ছাড়া—সেই শ্রেষ্ঠ বস্তু নারী জীবনের—স্বামীর প্রেম, তার মুকুল ওর আঘাতেই তো জ্বলে শুকিয়ে গেছে। সে-ই তো দায়ী।

বোঝে, তবু কষ্টও বোধ করে বৈকি। যা গেছে তা গেছেই ; কিন্তু মরীচিকার মতো মনের মরুভূমে এই স্নেহ বা প্রেমের সুমিষ্ট স্নিগ্ধ পানীয় সামনে ধরে—যেন জ্বালা আরও বাড়িয়েই দেয় যে।

আলিঙ্গন, সহবাস এও বুঝি কর্তব্যই।

চুম্বন—সেও যেন কর্তব্য পালনের মতোই।

সেদিনের সে দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন অবশ্যই আজ আর আশা করে না, তবু এক মুহূর্তের জন্য ওষ্ঠে ওষ্ঠে বদ্ধ হওয়া—এ যেন আরও অসহ্য বোধ হয়।

এখানে এই ঘরে এই ভাবে থাকা, সে লোকটারও যে যন্ত্রণাদায়ক তা একটু একটু ক'রে পরিষ্কার হয় মনে, এ শুধুই কর্তব্য, এটা বেশ বুঝতে পারে।

এক এক সময় মনে হয়—স্বরূপকে পরিষ্কারই বলে, এ কর্তব্য পালনে প্রয়োজন নেই, কিন্তু সেটা বড়ই স্পর্ধা হয়ে দাঁড়াবে।

এ ধরনের, এমন কথা বলার অধিকার ও রাখে নি।

অপরাধিনীর পক্ষে দয়াই যথেষ্ট।

দোলের কাছাকাছি একদিন হঠাৎই শ্যামসোহাগিনী এসে উপস্থিত হলেন ডুলিতে চড়ে।

একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

কারণ একটা ছিল। দোলের পঞ্চম দিনে বিগ্রহ এখানে আসেন, থেকেও যান সে রাত্রি, বিশেষ পুজো হোম ইত্যাদি হয়। বহু লোক প্রসাদও পায়।

তবে এ তো প্রতি বছরই হয়। আয়োজন শুরু হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। প্রতিবারই কি কর্ত্রী আসেন এমন ক'রে ? হয়ত আগের দিন এসে থাকেন রাত্রে—গোপীবল্লভের অভ্যর্থনার না ত্রুটি ঘটে।

তিনি এসে অবশ্যই একবার চারিদিক ঘুরে দেখলেন, আয়োজন কেমন হচ্ছে। পুজো হোম ভোগ—তা ছাড়া প্রায় পাঁচ-ছশো লোকের প্রসাদ পাওয়া—অনেক লোক দরকার, কাঠ ঘুঁটে থেকে শুরু ক'রে তেল ঘি চাল ডাল মশলা লাড়ুর উপকরণ—কয়েক মণ নাকি লাড্ডু তৈরী হবে—বহু আয়োজন, পাকা লোকের সতর্ক দৃষ্টিপাত দরকার।

তবে সে জন্যে তো বড় গোসাঁই আছেনই। ক'দিন কঠোর পরিশ্রম করছেন। মাল স্তূপীকৃত হয়েছে, বাগানে বড় চালা বাঁধা হয়ে গেছে—কোথাও কোন ত্রুটি ঘটেছে বলে মনে হয় না।

মনে শ্যামসোহাগিনীরও হ'ল না। একবার সবটা দেখে নিয়ে, মন্দির পরিষ্কার হয়েছে কিনা খুঁটিয়ে দেখে, দু'চারজন কর্মীকে কিছু প্রশ্ন ক'রে—একেবারে এসে

হাজির হলেন এদের ঘরে।

এখানে আসতে দেখেই চমকে উঠেছিল বিশাখা।

তবে এও বুঝেছিল, তিনি এখানে শুধু তদারকি করতেই আসেন নি। এদের ঘরকন্নাও একবার দেখে যাবেন —হয়ত সেটাই মূল উদ্দেশ্য।

সে আগেই বিছানা সরিয়ে—যাতে ছোঁয়ানেপার আশঙ্কা না থাকে—স্বরূপের পূজার আসন পেতে—দরজার কাছে ঘটি ক'রে জল নিয়ে অপেক্ষা করছিল, কাঠ হয়ে।

এলেনও তিনি।

বিশাখা পা ধুইয়ে নিজের আঁচলে মুছিয়ে দিল।

শ্যামসোহাগিনী কোন প্রতিবাদ করলেন না। সে ধরনের লৌকিকতা ওঁর ভালও লাগে না। অতি সহজেই এ অভ্যর্থনা মেনে নিয়ে আসনে এসে বসলেন, এবং একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে বিশাখার হাত ধরে টেনে কাছে বসালেন।

সেও ওঁর পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে প্রণাম করল।

এর পর এটা ওটা প্রসঙ্গ ও ছোট ছোট প্রশ্ন।

কথা মুখে বলছেন, কানে উত্তর শুনছেন, ওঁর দৃষ্টি কিন্তু চারিদিকে। বেশ খুঁটিয়ে সব দেখছেন। দেখছেন বধূকেও। মনে হয় না যে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে ভাল ক'রে লক্ষ্য করছেন, কিন্তু বিশাখা জানে যে, ঐ সহজ দৃষ্টি যাকে মনে হয় তা একেবারে অন্তর্ভেদী, উনি যেন বাইরে থেকে মনের মধ্যের সব কিছু দেখতে পান।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মৌনী হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। দৃষ্টি দূরে, জানলার মধ্য দিয়ে যে গাছগুলো, দূরের চালা দেখা যাচ্ছে সেই দিকেই।

প্রায় পাঁচ মিনিট এই ভাবে রইলেন।

তারপর ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে—দেখে বোঝা গেল, শব্দ হ'ল না—বললেন, আমি বোধ হয় ভুলই করলুম মা। মনে হয়েছিল এখান থেকে দূরে গেলে খোকার জীবনে অন্তরের দিকটা শুকিয়ে যাবে—জীবন্মৃত হয়ে থাকবে। আজ বুঝছি, এখানে তোমরা কেউ সুখে নেই। ছেলের মুখ দেখে তার দিকটা বুঝি, আজ তোমার অবস্থাও বুঝলুম। হয়ত দূরে কোন জায়গায় গেলে—যেখানে এসবের সংস্পর্শ থাকবে না, এখানের স্মৃতি ভুলতে পারতো। এক সময় সহজ হতে পারত।

চমকে উঠল বিশাখা। শাশুড়ি সম্বন্ধে ও'র বিস্ময়ের সীমা খুঁজে পায় নি কখনই, তবু আজও ও'র শক্তি নব নব বিস্ময়ে বিমূঢ় ক'রে দেয়।

সামান্য একটু দেখে, অল্প কটা কথা বলে এমন সত্যিকারের অবস্থাটা বুঝে নিলেন।...

আবারও একটু চুপ ক'রে থেকে ওর পিঠে হাত দিয়ে শ্যামসোহাগিনী ধীর ভাবে বললেন, 'তবু বলব মা, তুমি আশা ছেড়ো না। তোমার ধৈর্য্যের আর সহ্যের সীমা নেই তা জানি,শুনেছি সব কথাই। সেইজন্যেই বলছি—হয়ত জয়

ক'রে নিতে পারবে একদিন। সুখী হতে আর সুখী করতে পারবে। হাল ছেড়ো না, হতাশ হয়ো না।'

বলতে বলতেই উঠে দাঁড়ালেন ও'র অভ্যাস মতো।

এখানের কাজ সারা হয়ে গেছে, সোজা গিয়ে ডুলিতে বসলেন। ঘেরাটোপ টেনে দিয়ে বেয়ারারা ডুলি তুলে রওনা দিল।

এই শেষ উপদেশের প্রবলতর বিস্ময়ের মধ্যেই কথাটা মনে হ'ল বিশাখার।

উনি কেবল মা-ই বলেন, এখনও একবারও বৌমা বলেন নি।

॥ ২৩ ॥

পঞ্চম দোলের দিন প্রত্যূষে শ্রীরাধাগোপীবল্লভের বিগ্রহ তাঁর বাগান-বাড়িতে আসেন। স্নান প্রসাধন লাড়ুভোগ সেই ভোরেই সারা হয়। তারপর এখানে এসে অভিষেক, তার সঙ্গে পূজা আরতির পর রঙ খেলা হয়। ফাগ গোলাপজলে গুলে ছোঁড়া রীতি। গোলাপজল যেখানে প্রস্তুত হয় তা এঁরা জানেন, গাজীপুর, সেখানকার জল ঠাকুরের গায়ে দেওয়া যায় না, গোলাপী গন্ধওয়ালা ফাগই ছোঁড়া হয়। অথবা পিচকিরিতে যমুনার জল গায়ে দিয়ে কুমকুম ছুঁড়ে মারেন। বাকী অতিথি অভ্যাগতরা বাইরে রীতিমতো রঙ খেলেন।

অতঃপর বিগ্রহকে পুনশ্চ স্নান করিয়ে আর একদফা বাল্যভোগ হয়। অবশ্য তাই বলে গোপীবল্লভের আহারে অনিয়ম ঘটতে দেওয়া হয় না ; সাড়ে এগারোটার মধ্যেই ভোগ দেওয়া হয়ে গেল। সাড়ে বারোটা থেকে পঙ্গত বসতে শুরু করল। সে দীয়তাং ভুজ্যতাং চলল প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত।

বিগ্রহ এখানে একরাত্রি বাস করেন, এটা স্বরূপের পিতামহর ব্যবস্থা। সুতরাং সন্ধ্যারতি, শৃঙ্গার বেশ, রাত্রের ভোগ, শয়ন-আরতি সবই নিয়মমতো চলে।

স্বরূপ ঊষাকালেরও পূর্বে স্নান সেরে নিয়েছেন, তাঁর জন্যও এক ঘড়া যমুনার জল আনানো হয়েছিল। তার পর থেকেই তিনি ব্যস্ত—দেবতাকে নিয়ে এই উৎসবে। তিনি আর শ্যামসোহাগিনী এঁরা সারা দিনরাতই চরকির পাক ঘুরছেন। কাজের অন্ত নেই। এই মহোৎসবের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা, চারিদিকে চোখ রাখা—এ একমাত্র কর্ত্রীই পারেন এবং জানেন। তাঁর ইচ্ছা বা সাধ ছিল স্বরূপের বিবাহ হলে তিনি নববধূকে এইভাবেই তৈরী করবেন। হায় রে! ছোট ছেলের বিবাহের কথা উঠেছে—তবে তিনি আর কোন আশা রাখেন না। গোপীবল্লভের যা ইচ্ছা তা-ই হবে।

এই মহোৎসবে সবাই ব্যস্ত, আনন্দিত, বেল বিশাখা ছাড়া।

তার কথা কে ভাববে, কেনই বা ভাববে।

স্বরূপের সময় নেই, তিনি আরতিগুলো করছেন, পূজার আসনে বড় পূজারীর সঙ্গে জোর ক'রে ছোট ভাইকে বসিয়েছিলেন, সে পর্ব চোকা মাত্র

গায় পাঞ্জাবি চড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট দাদাঠাকুর। স্বরূপের মনে পড়েছিল কি না তা তিনিই জানেন, কেবল বেলা এগারোটা নাগাদ রঙখেলার পাট চুকতে শ্যামসোহাগিনী এক দাসীকে ডেকে বললেন, 'ওরে বিশাখা একবারও এল না, ওকে বল এখন ভীড় কম, একবার দর্শন ক'রে যেতে।' সেই দাসীই এসে ওকে নিয়ে গেল, নিঃশব্দে মাথায় ঘোমটা দিয়ে এসে ঠাকুর প্রণাম ক'রে, শাশুড়ীর পায়ে মাথা দিয়ে প্রণাম ক'রে আবার নিঃশব্দেই নিজের কোটরে ফিরে গেল।

ভোগ সরলে আরতির পর যখন পঙ্গতের ব্যবস্থা হচ্ছে তখন এক কনিষ্ঠ পূজারী বড় থালায় ক'রে একজনের মতো প্রসাদ সাজিয়ে পাতা চাপা দিয়ে এসে রেখে গেল, বলে গেল, 'বড় ঠাকুরজী ওখানেই প্রসাদ পাবেন। এখনও ওঁর কিছু কাজ বাকী আছে, ওঁর খেতে দেরি হবে, আপনার শরীর খারাপ, মাইজী বলে দিয়েছেন, আপনাকে খেয়ে নিতে।'

অর্থাৎ আজ পরিষ্কার বোঝা গেল এখানে তার স্থান কোথায়।

সে অস্পৃশ্য—এরা যাকে বলে 'অচ্ছুৎ'।

এটা সে জানত।

সত্যিই তো, এ উৎসব-পূজার আয়োজনে ওরই প্রধান কর্মীর স্থান নেবার কথা, শাশুড়ি সঙ্গে থাকবেন, ভুল হলে সস্নেহ তিরস্কার করবেন বড় জোর। কিন্তু আজ? সেই বা কোন্ অধিকারে, কোন্ মুখ নিয়ে সেখানে গিয়ে এ বৃহৎ কর্মের অংশ নেবে, তাঁরাই বা ওকে ডাকবেন কেন? এটা জলের মতোই পরিষ্কার। তবু যে ডেকে পাঠিয়েছেন, প্রণাম করতে বলেছেন, সকলের আগে ওর জন্যে প্রসাদ পাঠিয়েছেন মনে ক'রে—এই তো অবিশ্বাস্য প্রাপ্তি ওর। এটুকুও আশা করে নি সে, আশা করার কোন কারণও নেই।

না, ওর নিজের জন্যে কোন বেদনাবোধ করছে না সে। যা পেল, যা পাচ্ছে এ তো স্বপ্নেরও অগোচর। তার বাপের বাড়ির কোন লোক—বা যে-কোন আত্মীয়-স্বজন—এ কথা শুনলে বিশ্বাসই করবে না।

ওর যে কষ্ট বোধ হচ্ছে সে স্বরূপের জন্যেই।

তিনি পূজা ধ্যান জপ, এই নিয়েই থাকতে চান, গোপীবল্লভের সেবাই ওঁর পরম কাম্য। বিবাহ করেছিলেন—স্ত্রীকে সহধর্মিণীরূপে পাবেন এই আশায়—যেমন তাঁর পিতৃদেব, ওর শ্বশুর পেয়েছিলেন।

তার পর—কর্তব্যবোধ বা করুণা—এর ফল যে এই রকম হবে তা বোধ হয় তিনিও ভাবেন নি। অথবা, ভেবেছিলেন বলেই দূরে, তীর্থসম্পর্কহীন স্থানে যেতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধিমতী শ্যামসোহাগিনীই ভুল করলেন।

কর্তব্য যেটুকু সেটুকু নিক্তির ওজনে পালন ক'রে যাচ্ছেন স্বরূপ।

তাই বা কেন ভাবছে সে।

কোন কর্তব্যই তাঁর ছিল না। সে পাট তো চুকেই গেছে, সেই পাঁচ ছ বছর আগে। আর বিয়ে করেন নি, সে তাঁর মহানুভবতা, অথবা ভয়। অদৃষ্ট তাঁকে

নিয়ে যে নিষ্ঠুর খেলা খেলেছেন আবার না তার পুনরাবৃত্তি হয়—এই ভয়। নতুন যে বধূ আসবে, সে কেমন হবে—তাই বা কে জানে।

যদি কিছু থাকে সে দয়া। নিতান্তই দয়া। সদ্য কৈশোর-যৌবন সন্ধিক্ষণে সে ওঁদের বাড়ি আসে, বরং বালিকা বলাই উচিত, বালিকার মতোই সরল, কোমল, এবং ভীত—এ-ই ভেবেছিলেন। ওর আচরণ আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুলতা—প্রেম নয়। সে অবসর সে বয়স ওদের ছিল না, স্নেহই বোধ করেছিলেন। আশ্বাস দিয়ে আশ্বস্ত করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন স্নেহের পক্ষপুটে সব আঘাত থেকে ঢেকে রাখতে।

সেই স্নেহই—ওর আশ্রয় পাবার জন্য ব্যাকুলতা থেকে যার উদ্ভব, আজ বুঝি করুণায় পরিণত হয়েছে।

কিন্তু সে কি আজ সেই মনোভাবেরই সুবিধা নিচ্ছে না! অকারণে তাঁর জীবনটাকে বিড়ম্বিত ক'রে?

আরব্য উপন্যাসের সিন্ধুবাদ নাবিকের গল্প বাবার মুখে শুনেছে ছোটবেলায়। এক বৃদ্ধ তার ঘাড়ে উঠে সরু সরু সাঁড়াশির মতো দুই পা দিয়ে চেপে ধরেছিল। তখন সে যা বলত তাই শুনতে হ'ত সিন্ধুবাদকে। বেচারীর জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল।

সেও বুঝি সেই বৃদ্ধের মতোই ওঁর বোঝা হয়ে উঠছে। দয়া ক'রে তিনি স্বেচ্ছায় বোঝা চাপিয়েছেন নিজের কাঁধে—এখন আর ঘাড় থেকে নামাবার কোন পথ নেই।...

মাগো! এই বোঝা, দুর্বহ এই ভার চিরজীবন টেনে বেড়াতে হবে মানুষটাকে।

প্রথম দাম্পত্যজীবন অনেক সাধ ছিল নিশ্চয়ই, ভালবাসবার—ভালবাসা পাবার—দুর্ভাগ্যের আগুনে তা পুড়ে আঙরায় পরিণত হয়েছে—আজ সেই ভালবাসা বা প্রেমের (?) ভস্মাবশেষ ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই তাঁর হৃদয়ে। আজ নতুন ক'রে তা জ্বালানো যায় না। মোহিনীদির ভাষায় বৃদ্ধবেশ্যার তোবড়ো গালে পুরু ক'রে রঙ চাপানোর মতো।

তার নিজের জীবন তো গেছেই, ও লোকটাকে অনর্থক দেহে ও মনে কষ্ট দেবার দরকার কি?

মুক্তি আর শান্তি দেওয়াই তো উচিত!

স্বরূপ ফিরলেন গভীর রাত্রে, বারোটারও পর।

রাত্রের প্রসাদও যথানিয়মে দশটার মধ্যে পে'ছে গিয়েছে।

সে থালা বিশাখা একবার মাথায় ঠেকিয়ে—প্রসাদকে অবহেলা করতে নেই, শাস্ত্রে নাকি আছে 'প্রাপ্তিমাত্রেণ ভক্ষয়েৎ'—সরিয়ে রেখেছে।

সেটা অত রাত্রেও ঘরে ঢুকেই নজরে পড়ল স্বরূপের। একটু যেন ব্যস্ত হয়েই বললেন, 'ওকি, তুমি এখনও খাও নি?...কি, শরীর ভাল নেই?'.

সমস্ত অপরাহ্ন ও সন্ধ্যা, এই দ্বিতীয় প্রহর পর্যন্ত মনকে বুঝিয়ে কঠিন ক'রে

এনেছিল। মুক্তি, মুক্তিই দেবে সে স্বামীকে। বোঝা বয়ে এমনভাবে জীবনটাকে নষ্ট করতে দেবে না।

এখন স্থিরভাবে বসে কোন্ পথে কি ক'রে সে উপায় হবে—সেইটেই চিন্তা করছিল।

কিন্তু এই স্নেহার্দ্র উদ্বেগেই সে দৃঢ়তা ভেসে গেল।

দুই চোখ ছাপিয়ে জল এসে গেল, অবাধ্য চোখকে শাসন করা গেল না কিছুতেই।

অনেক কষ্টে শুধু বলল, 'ক্ষিদে ছিল না, অনেক খেয়েছি তো তখন।'

বুঝলেন স্বরূপ।

বসে পড়ে চিবুকটা উঁচু ক'রে ধরতেই চোখের জল ওঁর চোখে ধরা পড়তে দেরি হ'ল না।

একটা অর্ধ-উদ্গত দীর্ঘশ্বাস কষ্টে দমন করলেন স্বরূপ।

তারপর রেশমের উত্তরীয়ে বিশাখার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'এ আমি জানতুম, তাই বহুদূরে তীর্থস্থান নয় এমন জায়গায়—যেখানে এসব প্রশ্ন উঠবে না—চলে যেতে চেয়েছিলুম তোমাকে নিয়ে। মা বাধা দিলেন, তাঁর মন বুঝেই পার্বতী মাসিমাও এই ব্যবস্থা করলেন। অবশ্য এক্ষেত্রে এইটেই সহজ, সব চেয়ে কম বেদনাদায়ক ব্যবস্থা—তা ঠিকই।···আসলে মা আমার দিকটাই দেখে-ছিলেন। তোমার অবস্থাটা কি হতে পারে তা অত ভাবেন নি। তবে আমিই কি খুব ভাল আছি? তুমি আমার দিকটাও ভেবে দ্যাখো।'

তারপর—ওঁর কথাটা বলা ঠিক হয় নি,—এতে ওর বেদনার কারণ লজ্জার কারণ আরও বড় হয়ে উঠবে—সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়ামাত্র কথাটা ঘুরিয়ে দিলেন, বললেন, 'তুমি তো অনেক দুঃখ অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছ—আরও কিছুদিন সয়ে থাকো, কে জানে দুঃখের ভার অসহ হলে গোপীবল্লভ হয়ত একটা উপায় ক'রে দেবেন। তুমি ওঠো, যা পারো যেটুকু পারো—খেয়ে নাও।···আমি খেয়ে এসেছি, মা-ই জোর ক'রে ভাইয়ের সঙ্গে বসিয়ে দিলেন—তা ছাড়া শরীরও আর বইছে না। মনে হচ্ছিল ঐখানেই কোথাও শুয়ে পড়ি।'

তিনি পা ধুয়েই ঘরে ঢুকেছিলেন, এখন যেন কোনমতে রেশমের বস্ত্র বদলে তখনই শুয়ে পড়লেন। আজ আর অত্যন্ত নির্জনে ধ্যানজপের চেষ্টাও করলেন না, কিম্বা হয়ত সেটুকুও সেরে এসেছেন মন্দিরেই—কে জানে!

বিশাখাও নিঃশব্দে উঠে একটা প্রসাদী কালাকাঁদ মুখে দিয়ে একটুখানি জল খেয়েই শুয়ে পড়ল।

ততক্ষণে হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন স্বরূপ।

ক্লান্ত বিশাখাও—অবসন্নই হয়ে পড়েছে বলতে গেলে।

তবু তার চোখে ঘুম এল না।

স্বামীর এত অন্তরঙ্গ কথাতেও সান্ত্বনা পেল না সে। পাওয়া বুঝি সম্ভবও নয়।

সহ্য করার উপদেশ কাল শাশুড়িও দিয়েছেন, আজ ইনিও দিলেন।
হে গোপীবল্লভ, আর কত সহ্য করতে হবে!
আরও কত!

॥ ২৪ ॥

সেদিনও প্রত্যুষেই বিগ্রহের স্নান-বেশ পরিবর্তন-প্রসাধন শেষ হলে—সূর্যোদয়ের মুহূর্তেই তিনি শহরের মূল মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তার সঙ্গে অন্যরাও। কেউ বা কোন যানে—কেউ বা পদব্রজে।

অধিকাংশই চলে গেলেন—অতিথি অভ্যাগত, কর্মী—সকলেই প্রায়।

রাধাবল্লভের 'উদ্যান বাটিকা' দেখতে দেখতে ফাঁকা হয়ে গেল।

যে সব লোকজন ঠিকে হিসেবে কাজ করতে এসেছিল, তারাও যে যার প্রাপ্য বুঝে নিয়ে চলে গেল—একটা ক'রে ঠাকুরের প্রসাদী ক্ষীরসা হাতে ক'রে। কেউ বা মন্দিরে গিয়ে কামদারের কাছ থেকে মজুরী নেবে এই বন্দোবস্ত আছে। তারা খালি হাতেই গেল, একটু চিন্তিত ভাবে। কারণ কামদার মশাই নানা কাজের মানুষ। যদি বা টিকি দেখা গেল—'বোস একটু, আমি আসছি' বলে কোন একটা কাজে চলে গেলেন, সেই দুপুর বেলায় হয়ত এসে ক্যাশ বাক্স খুলবেন।

দু-চারজন থেকে গেল, বাগান-মাঠ ঘরদোর পরিষ্কার করতে।

আরও কাজ আছে সাফাই ছাড়াও। তেরপল দিয়ে ঢেকে বিশাল একটা হল-ঘরের মতো করা হয়েছে, আহার্য ভান্ডারজাত করা ও পঙ্গত বসানো—এই দুই উদ্দেশ্যে। তবে সে কাজ যারা করবে তারা এখনও আসে নি। হয়তো বেলায় আসবে, নয়তো কাল কিম্বা তার পরের দিন খুলবে। সে দায়িত্ব তাদের।

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই লক্ষ্য করছিল বিশাখা। সেও উষার বহু পূর্বে উঠেছে।

প্রসাদ এসে গেছে এখানকার লাড়ুভোগের। নানাবিধ মিষ্টান্ন। এসব ব্যাপারে কোন ত্রুটি কোনদিনই ঘটে না।

গত রাত্রির প্রচুর প্রসাদ প'ড়ে আছে, তার ওপর এই যাত্রাভোগের* প্রসাদ এসে স্তূপীকৃত হচ্ছে। প্রসাদ গ্রহণ করার লোক কই?

বিশাখা এখনও পর্যন্ত কিছুই মুখে দেয় নি।

স্বরূপ অন্যদিন প্রাত্যহিক পূজার্চনা সেরে এসে এখানেই জলযোগ করেন, বিশাখা দুধ গরম ক'রে দেয়, তাও পান করেন।

আজ তিনি দেববিগ্রহের সঙ্গেই চলে গেছেন মূল মন্দিরে। সম্ভবত অভিষেক

---

* পুরীতে জগন্নাথের ভোগ দেয় ৬ বার; প্রথম ভোগকে বলে বাল্যভোগ। আর চন্দন-যাত্রার সময় যখন ওঁর প্রতিনিধি মদনমোহন বিগ্রহ যাত্রা করেন তখন একটা বিশেষ ভোগ হয়—যাত্রাভোগ।

ও পূজা শেষ ক'রে ফিরবেন, অথবা দ্বিপ্রহরের পঙ্গত সেরে। (বিগ্রহ কোথাও গেলে ফেরার পর—অভিষেক করতে হয় তা বিশাখা জানে।)

একা, এই শূন্য ঘরে বসে সে খাবে ?

সে তো প্রেতপুরীতে বসে খাওয়া এক রকম—শুধু পেট ভরানোর জন্যে।

সে অবস্থা ভাবতে গেলেই যে মাথা কুটতে ইচ্ছে করে।

একদৃষ্টে দূরে বাগানের উত্তর দিকের সীমানা-প্রাচীরের দিকে চেয়ে আছে বিশাখা। কি ভাবছে তা সে নিজেই জানে না। এলোমেলো, কত কি কথা—অতীত বর্তমানের চিন্তা মানেই তো দুর্ভাগ্যের অন্তহীন মরুভূমি। তার কি কোন শেষ আছে ?

চোখ ওদিকে নিবদ্ধ থাকলেও—চিন্তায় ডুবে ছিল বলে কাউকে দেখেও নি, কারও আগমনের শব্দও পায় নি।

হঠাৎ অপরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এল, 'মাঈ, দেবী—মাতাজী !'

খুব পরিচিত হলেও, প্রায় অতলে ডুবে যাওয়া মনকে সংহত ক'রে বাস্তব পরিবেশে ফিরিয়ে আনতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল।

চমকে যেন কেঁপে উঠল বিশাখা।

পূজারীজী ! এখানে ! কেমন ক'রে খুঁজে বার করলেন ?

এখানের ঠিকানা তো কাউকে দেওয়া হয় নি !

তবে ?

এক বিহ্বলতা থেকে আর এক বিহ্বলতা। তাই উত্তর দিতে আরও একটু দেরি হ'ল ?

'মা আমাকে চিনতে পারছ না ?'

এবার সম্বিৎ ফিরল। দ্রুত তিন চার ধাপ নেমে এসে গলায় আঁচল দিয়ে সেই পবিত্র ধুলোর ওপরই ভূমিষ্ঠ প্রণাম করল।

'আপনি—মানে আমাকে কি ক'রে খুঁজে বার করলেন পূজারীজী, এ—এখানকার ঠিকানা তো কাউকে বলা হয় নি ?'

'যে করবার সে-ই করেছে মা। তোমার ছেলে,—লীলাধর !···ও, না না, তুমিই তো ওকে বাবা বলেছ, লীলাধর তো বলে—আমার বেটী। সাক্ষাৎ ভগবতী মাঈ দয়া ক'রে আমাকে পিতা বলে ডেকেছেন।'

লীলাধর !

আর এক চমক লাগল।

'কিন্তু সে-ই বা কেমন ক'রে জানল ?' শুধোয় বিশাখা। লীলাধর বোধ হয় রামরতিয়াকে মিনতি ক'রে জেনেছে। কিন্তু রামরতিয়ার এত সাহস হবে ! আর লীলাধরেরই বা এত মাথাব্যথা কেন !

এই সব নানা চিন্তা মুহূর্তের মধ্যে খেলে যায়। একটু বিরক্তি বোধ করে।

'সে খুঁজে বার করে নি মা। গোপীবল্লভ এই দিন এখানে আসেন, খুব কড়

উৎসব হয় সে জানত। কৃষ্ণচন্দ্রের ভোগ রান্না শেষ ক'রে এখানে চলে আসে সে। কালও এসেছিল। সেই সময় তুমি নাকি মন্দির থেকে বেরিয়ে এই ঘরে চলে আসছিলে। মাথায় মুখে ঘুঙট্ চাপা থাকলেও তোমাকে চিনতে পেরেছে। তা-ই আমাকে এসে বলল, একটু খবরটা জেনে আসবেন গুরুজী? আমি তো তাঁকে পার্বতী মার কাছে পেঁাছে যেতে দেখেছি, তাঁর সঙ্গেই যাবার কথা ছিল বোধ হয়। সন্ন্যাস নেবার ইচ্ছা বলেই মনে হয়েছিল। উনি এখানে কি ক'রে এলেন—তবে কি শ্বশুরালয়ে ফিরে এসেছেন আবার?'

বিরক্তিটা মুছে গিয়ে কৃতজ্ঞতাই বোধ করল।

'আমি পেঁাছে দিয়েছি' বলে নি, বলেছে 'পেঁাছে যেতে দেখেছি'। তার মানে কাউকেই বলে নি, পুজোরীজীকেও না।

কিছুক্ষণ মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল বিশাখা, তারপরই মনে পড়ল ওর পরম হিতাকাঙ্ক্ষী সাধুচরিত্রের এই মানুষটিকে এখনও পর্যন্ত বসতে বলে নি, দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

সে তাড়াতাড়ি জল এনে ওঁর পা ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়ে ঘরে নিয়ে এল। একটি কুশাসন ছিল সেইটিই পেতে বসালো ওঁকে।

পুজোরীজী সেকেলে মানুষ, কৌতূহল চেপে রাখার কৌশল শেখেন নি। বসেই বললেন, 'মা, তাহলে তো তুমি শ্রীরাধা-গোপীবল্লভের মোহান্তজীরই স্ত্রী। ওঁকে আসতে দেখেছি। তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থাও উনিই করেছেন। তাতেই বুঝেছিলুম। তার পর উনি এসে সেই মেহ্‌রারুকে টাকা চুকিয়ে দিলেন—কিছু বেশী টাকাও দিলেন। আমিও মা তোমার কল্যাণে মোটা টাকা প্রণামী পেয়েছি। সেই মেয়েছেলেটির মুখেই শুনেছি—লীলাধরকেও উনি বেশ কিছু টাকা—বুঝি পুরো একশো টাকাই দিয়েছেন। তা ভালই করেছেন উনি—দেবতার মতো মানুষ মা, এক এক সময় মনে হয় সত্যিই স্বর্গের মানুষ। খুব ভাল কাজ করেছেন গোসাইজী, সত্যিই তো লীলাধর ছুটে গিয়ে সেই সময়ে রামরতিয়াকে খবর না দিলে বোধ হয় তোমার জীবনটাই বাঁচত না। বহুত নেক্ লেড়কা।'

এই পর্যন্ত বলে একটু থেমে বললেন, 'কিন্তু মা, তুমি এখানে এ ঘরে থাকো কেন? ঘর দেখে যা মনে হচ্ছে, তুমি অত বড় মোহন্তের স্ত্রী, রাজরাণী—! তবে কি—?'

কথাটা বলতে পারলেন না। বোধহয় আটকে গেল।

বিশাখা হাত জোড় ক'রে বলল, 'বাবা, আপনি তো কোনদিনই কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি, চিরদিন দয়াই ক'রে এসেছেন। আজও আর না-ই প্রশ্ন করলেন! এটুকু যে অধিকার পেয়েছি সেও ও'র অসীম দয়া। দেবতার মতো মানুষ নন বাবা, দেবতাই।'

তার পরই বলল, 'বাবা, অনেক প্রসাদ আছে এখানে। কেউ তো খাবার লোক নেই। সকলেই প্রচুর খেয়েছে—আপনি, আপনি নিয়ে যাবেন অনুগ্রহ ক'রে?'

'ছিঃ মা, প্রসাদ মাথা পেতে নিতে হয়—প্রসাদ শব্দটির সঙ্গে দয়া অনুগ্রহ

এসব শব্দ ব্যবহার করতে নেই !'

অনেক খাবার ছিল, গত রাত্রের, আজ সকালের।

অব্যবহৃত পাতা ও কুল্লড় বা ভাঁড় আছে—সব ব্যবস্থাই শ্যামসোহাগিনীর—কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না, সংসার পাততে গেলে যা যা লাগার কথা, সবই তাঁর নখদর্পণে—তাতেই খাবার সাজিয়ে পূজারীজীর গামছাতেই বেঁধে দিল বিশাখা।

শুধু এক খুরি ক্ষীরসা রাখল, প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করতে নেই, সে কথাটা মনে পড়ে গেল খাবার সাজাতে সাজাতেই।

'আর কিছু রাখলে না মা ?'

'দরকার হবে না বাবা, এখনই তো আবার অন্নভোগের প্রসাদ এসে যাবে।'

একা বসে খেতে হ'ল না বিশাখাকে।

এক অঘটনই ঘটল বলতে গেলে।

প্রসাদ নিয়ে আসে যে লোকটি, তার সাইকেলের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল—বা শব্দ পাওয়া গেল, সহস্র সাইকেলের মধ্যেও ওঁর সাইকেলের ঘণ্টার আওয়াজ চিনতে পারে বিশাখা—স্বরূপও আসছেন।

ঘণ্টা শুনেই ছুটে বাইরে এসেছিল সে, দুটো সাইকেল প্রায় একসঙ্গে আসছে—দেখতে অসুবিধা হ'ল না।

প্রথমটায় একটু খুশির ভাব জেগেছিল মনে—কিন্তু এখনও পূজোর গরদ-ধুতি ও উত্তরীয় ছাড়েন নি—ঐ বেশেই আসছেন দেখে অমঙ্গল আশঙ্কাই দেখা দিল, তবে কি কোন বিপদ-আপদ ঘটেছে—?

উদ্বিগ্ন, শুষ্ক মুখেই রক থেকে নেমে ফটকের দিকে এগিয়ে গেল সে—কতকটা নিজের অজ্ঞাতেই।

ওর সেই মুখের দিকে চেয়েই ওর মনোভাব বুঝতে পারলেন স্বরূপ, গাড়ি থেকে নামতে নামতেই হেসে বললেন, 'ভয় নেই, তেমন কোন বিপদ-আপদ ঘটে নি। তবে আমাকে এখনই একবার মথুরায় যেতে হবে, ওখানে পঙ্গতে বসতে গেলে দেরি হবে বলে আমি এখানেই চলে এলুম।…একসঙ্গে বসে খাওয়া যাবে।'

বলে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন স্বরূপ।

সাধারণত স্বামীর কাজকর্ম বা কোথায় কখন যাচ্ছেন—এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই করে না বিশাখা, আজ আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'এখনই মথুরায় যেতে হবে—ওখানে কি কিছু—?'

পূজোর কাপড় ছাড়তে ছাড়তে স্বরূপ উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, ওখানে একটা গোলমাল বেধেছে। ওখানে আমাদের একটা বাড়িতে—আমাদের কয়েকখানা বাড়িই আছে ওখানে, সবই প্রায় শিষ্যদের কাছ থেকে পাওয়া, এটা বাবা পেয়েছিলেন এক শিষ্যার কাছ থেকে—ভাড়াটে বসানো ছিল। সেকালের ভাড়া তো, তেতলায় একখানা ঘর ধরে সাতখানা ঘর বাড়িতে মাসিক দশ টাকা ভাড়ায় ছিল।

ভাড়া দেয় না ওরা অনেককাল, আমাদেরও মামলা-মকদ্দমা করার লোক নেই, কিছু করা হয় নি। ওরা ভাড়া তো দেয়ই না, বাড়িটা ভেঙে যাচ্ছে কিনা তাও দেখে নি। গতকাল দোতলার খানিকটা ভেঙে পড়েছে। একজন লোক নাকি সাংঘাতিক জখম হয়েছে—সম্ভবত এতক্ষণে মারাও গেছে। ভাড়াটেরা পুলিসকে জানিয়েছে যে বাড়িওলা মাসে মাসে টাকা নেয়, কখনও রসিদ দেয় নি আজ পর্যন্ত ; বাড়িও সারায় না—তাদের গাফিলতিতেই আমাদের একজন মারা গেল—এর কি বিহিত হবে ?··· তাতেই ওখানের থানা থেকে লোক এসেছে—আমাকে য়্যারেস্ট ক'রে নিয়ে যাবার জন্যে। অতটা অবশ্য করে নি ওরা—তবে খবর দিয়ে ওখানে অপেক্ষা করছে, আমাকে গিয়ে প্রথমত একটা জামিন নিতে হবে—তারপর মামলা-মকদ্দমার ব্যবস্থা। একজন উকিল ওখানে আছেন, তবে মনে হচ্ছে আরও বড় উকিল একজনকে রাখতে হবে। বহু ঝঞ্ঝাট, আজ তো ফেরা হবেই না, কালও ফিরতে পারব কিনা সেও অনিশ্চিত।'

ততক্ষণে বিশাখা ওঁর থালা সাজিয়ে ফেলেছে।

একসঙ্গে খাওয়াটা কথার কথা, সেরকম জায়গাও নেই ঘরে, তাছাড়া একসঙ্গে খাওয়া নাকি শাস্ত্রের নিষেধ, ওর বাপের বাড়িতেও এ রেওয়াজ ছিল না। স্বরূপেও বোধ হয় অন্য ব্যবস্থা আশা করেন নি, তিনি অন্য দিনের মতো খেতে বসলেন একাই।

খেতে খেতে বোধ হয় কথাটা মনে পড়ে, বলেন, 'আর হ্যাঁ, মা বলছিলেন কাউকে এখানে রেখে যেতে। মন্দির থেকে কাউকে পাঠাতে চান না, বলেন, ওদের বহুদিনের নানা প্রশ্ন পেটে জমা আছে, কি সব বলবে, তার ঠিক কি, মেয়েটা বিব্রত হয়ে পড়বে। তুমি বরং রামরতিয়াকে বলে যাও, সে যদি থাকে তো সব দিক দিয়েই ভাল, না হয় একটা খাটিয়া এনে বাইরে শোবে এখন, চাদর মুড়ি দিয়ে—'

কথার মধ্যেই প্রতিবাদ ক'রে উঠল বিশাখা—যা এত দিনে কখনও করে নি, 'না না, আমার লোক লাগবে না। এমনি তো দারোয়ান পূজারীরা আছে, তাছাড়া দরজা বন্ধ ক'রে শোব। লোক কেন লাগবে!'

'পারবে থাকতে ?' চিন্তিত ভাবে বলেন স্বরূপ, 'দিনকাল বড় খারাপ, জায়গাও বড় নির্জন, বলতে গেলে শহরের বাইরে—!'

'অনেক দিন তো একা কেটেছে, সেখানে সে বাড়ির দরজাও তো বন্ধ হ'ত না বেশির ভাগ দিন। মাকে ভাবতে বারণ করবেন, আমি ইষ্টদেবের কৃপায় ঠিক থাকব!'

এ দৃঢ়তা কখনও শোনেন নি বা দেখেন নি স্বরূপ। একটু যেন চমকেই উঠলেন।

॥ ২৫ ॥

স্বরূপ সেদিন তো এলেনই না। তার পরের দিন, এমন কি তৃতীয় দিনেও এলেন না।

লোক দিয়ে খবরটা পাঠিয়েছেন অবশ্য, বহু ঝামেলা, খানিকটা সু-বন্দোবস্ত না ক'রে তিনি আসতে পারবেন না। বরং জেদ না ক'রে রামরতিয়াকেই যেন আনিয়ে নেয় বিশাখা।

অনুযোগ করার কিছুই নেই। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় রামরতিয়াকে পাঠিয়েছিলেন শাশুড়ি, সে কি এসে থাকবে ? বড়মা বলে পাঠিয়েছেন কবে খোকা আসবে তার তো ঠিক নেই, ওঁর একা থাকা ঠিক নয়।

রামরতিয়াকে হাত ধরে এনে বসিয়েছিল—বিশাখা অন্তত রামরতিয়াকে অচ্ছুৎ ভাবে না—ঘরে মিষ্টির স্তূপ জমে, ওকে খাইয়ে ওর ছেলে মেয়ে মরদ—তাদের জন্যেও এক পুঁটুলি দিয়েছিল। কিন্তু রাখতে রাজী হয় নি। বলেছিল, 'তুই তো জানিস কত বছর আমি একা কাটিয়েছি। ওখানে মোহিনীদি ছিলেন বটে, এখানে তো শুধু পূজারীজী ভরসা—তিনি কি আমার বিশেষ খবর রাখতেন ? একাই তো শুয়েছি বলতে গেলে। উনি সন্ধ্যার মধ্যে মহাবীরের আরতি আর কখানা বাতাসা—কি কেউ দিয়ে গেলে—দু' একখানা প্যাঁড়া দিয়ে রাতের পর্ব সেরে আটটার মধ্যে শুয়ে পড়তেন। কোনদিন কেউ এসে গেলে সে আলাদা কথা। আমার খবর রাখার সময় কোথা তাঁর ? না, আমি বেশ থাকব, তুই যা।'

আসলে সে একটু ভাবতে চায়।

ভাবছে তো এর আগে থেকেই।

এ দুদিনও ভাবছে। বলতে গেলে আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রেই।

আসলে মনে হয় ওর, এতদিন যা চেয়েছিল তা স্বরূপকে নয়, তার দেহকে। ওটা কামনা—দৈহিক। বিবাহিত জীবনের অমৃতস্বাদ পূর্ণ উপভোগ করতে পারে নি—দূর থেকে শিশুকে লোভনীয় কোন বস্তুর স্বাদ দিয়ে কেড়ে নিলে যা হয় ওর সেই অবস্থা।

এখন বুঝতে পারছে তা পাওয়া আর সম্ভব নয়, সে সম্ভাবনা ওর জন্য না হোক, ও-ই নষ্ট করেছে। রবিঠাকুরের একটা 'গান' বলে বই বাপের বাড়িতে ছিল, মাঝে মাঝে উল্টেপাল্টে দেখত—একটা গানের কথা তার খুব মনে আছে—'বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে/এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে'—তার অদৃষ্টে এই স্ব-কৃত ভাগ্যের পরিহাসই ঘটেছে !

না, যা গেছে তা নিয়ে পরিতাপ ক'রে লাভ নেই।

কারো ভাগ্যে এমন সৌভাগ্যও ঘটে নি, এমন দুর্ভাগ্যও না !

পেয়েও পাবে না—এই তো গোপীবল্লভ তার অদৃষ্টে লিখেছেন।

এখন সে ভাবছে স্বরূপের কথাটা। কেবল তাঁর কথাই। হয়ত এত দিনে কামনা প্রেমে পরিণত হয়েছে।

যদি না এটা আত্মবঞ্চনা হয়।

দেবতার মতো মানুষ—মনে হয়। মনে হয় কোন দেবতাও এর সমান নেই। অন্তত পুরাণ-টুরাণের যে সব গল্প সে শুনেছে, তার কোন ঋষি তপস্বী দেবতাই ওঁর মতো ক্ষমাপরায়ণ নন—বরং অধিকাংশই ক্রোধী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। ওর মামা

বলতেন গ্রীক দেবতারাও তাই, হয়ত বেশী। গ্রীক দেবতা কারা তা জানে না বিশাখা—এঁদের কথা জানে।

এঁর মতো অপমান লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে মানুষ এমন ক্ষমাপরায়ণ এমন দয়া-পরবশ হতে পারে! যে সব থেকে ক্ষতি করেছে ওঁর জীবনে—যার জন্য—বলতে গেলে ইহকাল পরকাল সব নষ্ট করতে বসেছেন!

এই ঈশ্বরের তুল্য মানুষকে কি দিচ্ছে সে, প্রতিদানে?

ছিঃ ছিঃ! নিজের মনের মধ্যেই নিজের প্রতি ধিক্কার ঘনিয়ে আসে।

এর আগেও মনে হয়েছে, নিজেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে এ লোকটাকে বাঁচবার অবকাশ দেবে। ও'র ঐ পবিত্র আত্মার ও বুকের ওপর থেকে জগদ্দল পাথরটা সরিয়ে দেবে।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। অন্তত তাই মনে হয়েছিল।

উপায়? যমুনা! না, যমুনায় প্রাণ দিতে গেলে সে দেহটা হয়তো কেউ দেখতে পাবে, তুলবে। সনাক্তও করবে তার পর। আরও কেলেঙ্কারী, আরও ছিছিক্কার অতবড় বংশের—দেবতারও অধিক স্বামী, দেবীর মতো শাশুড়ির মাথা আবারও ছোট হবে।

দূরে কোথাও যাবে সে। কেন, গঙ্গা তো আছেন। মনে হয় এ অবস্থাটা সেই সিদ্ধ সাধিকা দেখতে পেয়েছিলেন তখনই, তাই—পরিত্রাণ পাবার এই ইঙ্গিতটা দিয়েছিলেন. গঙ্গার বুকে পরম শান্তি আছে, মধুর সমাপ্তি আছে।

মন স্থির করে, বা মনে করে সে স্থির করেছে—কিন্তু বয়সটা যে এখনও কম। আশা যে কিছুতেই যেতে চায় না। স্বামীর দুটো স্নেহ সম্ভাষণে, উদ্বেগ প্রকাশে হতাশ চিত্ত আবার নবীন আশায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

যথেষ্ট বয়স হয়নি বলেই। মরীচিকাকেই সুপেয় অমৃত মনে করে যৌবন। মনে হয় শেষ পর্যন্ত ভাগ্য দয়া করবে এই অকরেণে-লাঞ্ছিতা মেয়েটাকে।

দয়া নয়, মনে করে ভালবাসাই পাবে সে।···

তবে আর নয়। মন স্থির হয়েছে।

মুক্তি দেবেই সে ওঁকে, সত্য সত্যই মুক্তি দেবে। জীবন থেকে মুছে যাবে ওঁর।

হয়ত আর বিয়ে করবেন না, সে মানুষ নন, সংসার ক'রে সুখী হবার পথ সে রাখে নি। তবে নিশ্চিন্ত তো হতে পারবেন।

সবই তাঁকে করতে হবে, গোপীবল্লভের সংসার—যতদিন উনি জীবিত আছেন—ওঁকেই দেখতে হবে। সে অদৃশ্য হলে কে জানে আরও কি ইঙ্গিত শ্লেষ ওঁকে প্রতিনিয়ত বিদ্ধ করবে—তবু কতকটা নিশ্চিন্ত, কতকটা স্বাধীন হতে পারবেন বৈ কি।···

মন স্থির করেছে সে. কেবল একটা প্রশ্নে দ্বিধাগ্রস্ত আছে এখনও, গঙ্গা মা না পার্বতী মা?

আশা বুঝি গিয়েও যেতে চায় না, কোথায় একটুখানি থেকেই যায়।

রামরতিয়াকে বিদায় দেবার পরও অনেকক্ষণ বসে রইল বিশাখা—তেমনি পাথরের মতো। চমক ভাঙল একেবারে ঠাকুরঘরে আরতি শুরু হওয়ার শব্দে। এখানের পূজারীজী অন্য এক কুঞ্জেও কাজ করেন—এখানেরটা সেরে উনি সেখানে যাবেন, তাই এত তাড়া। নইলে এখনও পশ্চিম আকাশে একটু দিনের আভা আছে।

গলায় কাপড় দিয়ে ঘরের বেদীতে প্রণাম ক'রে উঠে পড়ল। অন্য দিন এখানের এই সংকীর্ণ রোয়াক পর্যন্ত আসে, প্রতি দিনই। আজ সেখান থেকে নেমে পায়ে পায়ে খানিকটা এগিয়েও এল ফটকের দিকে।

কেউ কোন দিকে নেই দেখলে এমনি আসে, তবে বাইরে যায় না। এ নাকি ওদের যেতে নেই, এ বাড়ির বধূদের রাস্তায় পা দেওয়া নিষিদ্ধ—অন্তত সধবাদের।

আজও ফটক পর্যন্ত গিয়েই থামল।

এতক্ষণ এসেছিল অন্যমনস্ক হয়ে, এখন ঠিক কাঠের বিরাট কপাট পর্যন্ত এসে তেমনি ভাবেই সামনের পথের দিকে চোখ পড়ল।

এ স্থানটা শহরের বাইরে, নির্জন। কোন পূজো-পার্বণ ছাড়া এ পথে সন্ধ্যা বা তার পরে কেউ হাঁটে না, কোন জরুরী দরকার না থাকলে। আজও কাউকে দেখবে আশা করে নি তাই নিশ্চিন্ত হয়েই এতদূর এসেছে। কিন্তু হঠাৎ চোখ তুলে চাইতে নজরে পড়ল একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, আর সে পুরুষমানুষ।

তাড়াতাড়ি ফিরে আসত—কেমন যেন মনে হ'ল পরিচিত মানুষ—ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখল—লীলাধর !

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ওর দিকেই চেয়ে।

অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড ক্রোধ যেন তার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত প্রচণ্ড জ্বালা ছড়িয়ে দিল।

সে দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে এসে রূঢ় কণ্ঠে বলল, 'লীলাধর, তুমি কেন এসেছ এখানে ? মাঝে মাঝেই আসো—আমি খবর পেয়েছি। তোমার স্বভাব এখনও যায় নি। ছিঃ ! তোমাকে না আমি বাবা বলেছি !'

লীলাধর বিচলিত হ'ল না। দুই হাত জোড় ক'রে বলল, 'হ্যাঁ মা, তা আমি জানি, এ যে আমার কাছে কতবড় সম্মান সে বোধ আমার আছে। কন্যাকে মা-ই বলে বাপেরা, আমিও তোমাকে তাই মা বলেই ডেকেছি। না, বোধ হয় তোমাকে পার্বতী মায়ের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যেই—বড় গোসাঁইজী আমাকে যা বকশিশ করেছেন, অত টাকা একসঙ্গে জীবনে কখনও দেখি নি। দু'শ টাকা দিয়েছেন। তাতে আমার দেশে আমার বাড়ি আগাগোড়া সারানো হয়েছে, নতুন খাপরা এনে, নইলে বোধ হয় এ বছর বন্যায় বাড়ি ভেঙে পড়ে যেত। এ সবই তোমার কৃপা মা। তুমি বিশ্বাস করো, আমি কোন অন্য ভাব নিয়ে আসি নি। আমি এমনিই সেদিন ঠাকুর দর্শন করতে এসে তোমায় দেখতে পাই, তাই পূজারীজীকে বলে ছিলুম।

পূজারীজী তখনই দেখতে আসেন তোমাকে।…তাঁর মুখেই শুনলুম—মাপ করবেন, অপরাধ নেবেন না—পূজারীজী—আমার গুরুজী গিয়ে বললেন, 'মাতাজীর মনে সুখ নেই বলে মনে হ'ল।' সেই থেকেই মনটা বড় অশান্ত হয়ে আছে। আজ থাকতে না পেরে ছুটি নিয়ে এসেছি—যদি আমার বেটির, আমার মাতাজীর কোন কাজে লাগতে পারি এই আশায়।'

লজ্জিত হ'ল বিশাখা।

সেদিন সেই রাত্রে সম্পূর্ণ বলতে গেলে ওর বুকে সমস্ত দেহ এলিয়ে দিয়েছিল, সে জড়িয়ে ধরে এনেছে সমস্ত পথ—ইচ্ছা করলেই অন্য কিছু করতে পারত—কিন্তু নিজেকে সংযতই করেছে। সেটা এমন কি পার্বতী মাও লক্ষ্য করেছেন বা তাঁর অসাধারণ শক্তিতে অনুভব করেছেন। তাকে এমন ভাবে বলাটা ঠিক হয় নি।

সেও হাত জোড় ক'রে বলল, 'আমার অন্যায় হয়েছে বাবা, সত্যিই অন্যায় হয়েছে। একজন যে এমন ভাবে আমার সুখদুঃখ চিন্তা করে—এ গোপীবল্লভেরই কৃপা।'

বলতে বলতেই কথাটা মনে হ'ল। 'কৃপা' কথাটা যেন একটা ধাক্কা মারল তাকে।

এ পার্বতী মার সঙ্ঘটন নয় তো ?

সে একটু ব্যাকুলভাবে বলল, 'লীলাধর, পূজারীজীকে বলবে একটু—উনি যদি একটু দয়া ক'রে আমাকে নিয়ে ঋষিকেশে পেঁছে দেন ? বড় উপকার হয়। সেবার তো গিয়েছি এসেছি ওঁদের গাড়িতে—পথঘাট কিছুই জানি না, শুনেছি সোজা রেলপথ কিছু নেই। পারবেন না উনি ? যত তাড়াতাড়ি হয়। আসা-যাওয়ার খরচ সব আমি দেব।'

এটা এখনই মনে পড়ল। শ্যামসোহাগিনী ছেলেকে বলেছেন, ওর সামনেই, 'ওর হাতে মাঝে মাঝে পাঁচ-দশ টাকা দিল। কত কি ইচ্ছে হয়, কাউকে হয়ত কিছু দান করার কথা মনে হ'ল—সেজন্যে কিছু থাকা দরকার। ফী হাত তোর কাছে চেয়ে নিতে হবে, সে বড় বিশ্রী।'

ওর হাসি পেত—যখন মাঝে মাঝেই ওর বালিশের তলায় একটা ক'রে দশ টাকার নোট রেখে যেতেন স্বরূপ। কি করবে এ টাকা নিয়ে—এই কুয়ার মতো জায়গায় বাস ক'রে ? কে বা এখানে আসছে। একটা ফিরিওলাও তো এ পথ দিয়ে যায় না। আর এলেই বা কি, কিছু কেনার কথা মনেও তো হয় না।

লীলাধর বলল, 'পূজারীজী পারবেন না, উনি ঐ আগ্রা—তাও ঠিক না—ওঁর ঐ গাঁয়ের পথটুকু ছাড়া কিছু চেনেন না।'

'তুমি—তুমি একটু ছুটি নিতে পারো না ? না, অসুবিধে হবে ?'

মাথা হেঁট ক'রে আস্তে আস্তে উত্তর দেয় লীলাধর, 'পারি, কিন্তু এ আদেশ করবেন না মা। প্রথমত সেটা ভাল দেখাবে না—বার বার—লোক জানলে কে কি ভাববে। তাছাড়া আপনার কাছে আজ সত্যিই বলছি, আপনি আমাকে ঘৃণাই করবেন একথা শুনে—মনের ভেতরকার রাক্ষসটা যে মরেও মরে না। বারে বারে

পরীক্ষায় ফেলবেন না আমাকে। এমন ক'রে।'

কথাটা বুঝতে একটু দেরি লাগে। তার পর শব্দের পিছনে গূঢ়ার্থটা যখন বুঝতে পারে, তখন গাঢ় কণ্ঠে বলে, 'ঘৃণা নয় লীলাধর। আজ বুঝলুম তুমি সাচ্চা মানুষ।'

'হ্যাঁ মা, বড় যন্ত্রণা।'

'তাহলে—কোন উপায় হবে না?'

'হবে মা। আমাদের এক পূজারী ঋষিকেশের লোক, বয়েস হয়েছে, বোধহয় ষাট হবে। কি আরও বেশী, কিছুদিন ধরেই শরীর ভাল যাচ্ছে না, সেই ম্যালেরিয়া থেকেই—ছুটি চাইছিল, কামদার ছুটি দিয়েছেনও। দিন তিনেক পরে যাওয়ার কথা। আপনি যদি আজকেই যেতে চান, আমি ঠিক ক'রে দিতে পারি।'

'আজ—আজ হলে বড় ভাল হয়।' স্বরূপের সঙ্গে দেখা হবার আগেই যেতে চায় সে। যদি ও'র সঙ্গে দেখা হয়ে আবারও দুর্বল হয়ে পড়ে? এ টানাপোড়েনে আর দগ্ধে মরতে চায় না। টানাপোড়েন তো তাঁরও। তাঁকেই বা এ যন্ত্রণায় ফেলে কেন?

'বেশ, বলুন কটার সময়। রাত চারটে? সে সময় সবাই ঘুমিয়ে থাকবে। আমি একটা কুলিও ঠিক ক'রে দেব—তবে খানিকটা দূরে তারা থাকবে। একটু হেঁটে যেতে হবে। ওদের জানতে না দেওয়াই ভাল। আপনি কোথা থেকে বেরোচ্ছেন তা দেখলেই বুঝতে পারবে।···ঠিক জায়গা বুঝে টাঙ্গার ব্যবস্থা ক'রে নেবেন গঙ্গা-নন্দজী।···আপনি কোথায় যাবেন জানি না—যদি পার্বতী মার আশ্রমে যেতে চান উনি তাও পেঁছে দিতে পারবেন, উনি চেনেন। তবে আপনি সে পথে হেঁটে যেতে পারবেন না। ঝাম্পান চাই। তার খরচ লাগবে।'

'বোধ হয় পৌনে দুশো টাকার মতো হাতে আছে—হবে না?'

'কাফি—কাফি। অতও লাগবে না। পারেন তো গঙ্গানন্দজীকে কিছু দেবেন, অসুস্থ লোক—চিকিৎসা করাতেই যাচ্ছেন।'

বলতে বলতে অকস্মাৎই—এতক্ষণের সহজ আচরণ, সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে যে মানুষটা এত যন্ত্রণা এত সংশয়-বেদনা সহ্য করছে তা বিশাখা বোঝে নি—ওর হাত দুটো ধরে লীলাধর হু-হু ক'রে কেঁদে উঠল, 'মা, আত্মহত্যা করবেন না তো? আমিই তার নিমিত্ত হবো না তো?'

ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সস্নেহ কণ্ঠেই বলল বিশাখা, 'না বাবা, যদি কিছু ঘটেই তার জন্যে তুমি দায়ী হবে না, হয়ত আমিও না।'

বলতে বলতে সেও পিছন ফিরে ঘরের দিকে চলে গেল।

তার চোখেও জল ভরে আসছিল, সেটা বাঁচাতেই প্রায় ছুটে চলে এল লীলাধরের সান্নিধ্য থেকে।

বেচারা। আজ বুঝল—বুঝি বা নিজেকে দিয়েই—লীলাধরের বেদনা।

সংযমে আর কামনায়, দেবত্বে ও পশুত্বে কী অবিরাম যুদ্ধ-যন্ত্রণা সহ্য করেছে লোকটা!

'বাবা' ডাকের ইমান রাখতে তার বুঝি বুকটা পিষে গেছে, তবু পশুত্বের কাছে হার মানে নি সে।

এ যদি মহান মানুষ না হয় তো মহান কে?

*   *   *   *   *

বিশাখার যাত্রার ঠিক ন'ঘণ্টা পরে স্বরূপ ফিরে এলেন, সোজা এই বাগান-বাড়িতে। স্নান পুজো শেষ ক'রে মথুরা থেকে বেরিয়েছেন, এখানে প্রসাদ পাবেন, এই ভেবেই এখানে চলে এসেছেন।

ঘরের সামনে এসে সাইকেল থেকে নামতেই নজরে পড়ল, যে লোকটি প্রসাদ বয়ে আনে, সে একটু বিপন্ন মুখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

ভেতরের দিকে চেয়ে দেখলেন ঘর খালি, বিশাখা নেই, বোধ হয় তাকে দেখতে না পেয়েই প্রসাদের পুঁটুলিটি নামিয়ে অপেক্ষা করছে—কী করবে, কাউকে ডাকবে কিনা সেটা বুঝতে না পেরে।

'কী ব্যাপার পূরণ, সে কই?'

'কি জানি বড় দাদা-গোসাঁইজী, আমি এসে দেখলাম, কপাটে শেকল দেওয়া। বহুরাণীদিদি হয়ত ঠাকুরঘরে গেছেন কি বাগানে কোথাও ছায়ায় বসেছেন—ভেবে অপেক্ষা করছি কিন্তু সে তো আধঘণ্টার ওপর হ'ল। উনি তো জানেন এই সময় প্রসাদ আসে—ঠিকই বসে থাকেন এখানে—কি জানি কি হ'ল।'

প্রথম চৈত্র হলেও রোদের তেজ বেড়েছে। এই রোদে আট-ন মাইল সাইকেল চালিয়ে এসেছেন স্বরূপ, ঘর্মাক্ত ধূলিধূসর সমস্ত শরীর, পাও আর চলছে না। এরকম দেখলে বিশাখা নিঃশব্দে পাখা নিয়ে বাতাস করত, ভিজে গামছা দিয়ে গা মুছে নিত—ক্লান্ত শরীরে সেই ভরসাতেই এসেছেন তিনি।

সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে রেখে জুতো খুলে ভেতরে ঢুকলেন স্বরূপ, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল ঠাকুরের পটের নিচে একখানা কাগজ ভাঁজ করা।

আস্তে আস্তে সন্তর্পণে টেনে নিলেন কাগজটা—হাত-পা ধোওয়া নেই, এ অবস্থায় ইষ্টের পটে হাত দিতে নেই, তাই এ সাবধানতা।

কাগজটা খুলে দেখলেন, তাঁর আশঙ্কাই ঠিক।

চিঠি। বিশাখার চিঠি।

তার হাতের লেখা দেখেন নি, তবে অনুমান করতে অসুবিধে হ'ল না।

দীর্ঘকাল লেখার কোন প্রয়োজন হয় নি, হাতের লেখা খারাপ, লাইন বাঁকা, তবু পড়তে পারলেন। লিখেছে—কিছু শব্দ যোগ ক'রে কিছু বর্ণাশুদ্ধি শুদ্ধ ক'রে নিয়ে যা দাঁড়ায়—

"শ্রীচরণেষু,

আপনার মতো কোন মানুষ হয় তা আমি জানতুম না। উদার মানুষ দেখেছি—তবে তারা মানুষই, আপনি দেবতা, দেবতার চেয়েও বড়। ঢের বেশী বড়। বুঝি গোপীবল্লভই দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন। আমার মতো ঘৃণ্য জীবকে আপনি বহু অপমান লাঞ্ছনা টিটকিরি সহ্য ক'রেও যে করুণা করেছেন এ না দেখলে,

সে দয়ায়-স্নেহে স্নান না করলে বিশ্বাস করতুম না। কিন্তু আপনি এই নিদারুণ দোটানায় ক্রমশই ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন দেখে মন স্থির করেছি। আপনার পায়ের এ বেড়ি খুলে দিলাম। আপনার জীবন থেকে আমাকে মুছে ফেলবেন এই আমার কাতর প্রার্থনা। আমি যা পেয়েছি তা কেউ পায় না—সমস্তরকম আশার অতীত। এখন আমারও কিছু করার আছে ভেবেই সরে যাচ্ছি। এর জন্যেও আপনাকে অনেক সহ্য করতে হবে—আপনি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করতে পারবেন এই আমার বিশ্বাস।

আপনার করুণায়
চিরসৌভাগ্যবতী সেবিকা
বিশাখা।"

অনেক—অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলেন স্বরূপ। কতকটা পাথরের মতো, চোখে অপরিসীম ক্লান্তি আর বেদনা—হয়ত বা কিছু অনুযোগও। তার পরই যেন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'তুমি এ প্রসাদ ফিরিয়ে নিয়ে যাও পূরণ কিংবা এখানের কাউকে দিয়ে দাও। আমি ও-বাড়ি যাচ্ছি।'

পূরণ ঠিক পূজারী শ্রেণীর না হলেও বহুদিনের লোক, প্রায় শৈশব থেকেই এখানে আছে, সে এবার স্বরূপের পথ আটকে দাঁড়াল।

'বড় দাড়া, প্রসাদ অভুক্ত এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, আপনিও অভুক্ত বেরোবেন—এ যে প্রসাদের অপমান। আপনি অন্তত কিছু মুখে দিন। আমি পা ধুইয়ে দিচ্ছি।'

স্বরূপ বুঝলেন, পূরণের পিঠ চাপড়ে ওকে নীরব বাহবা জানালেন, তার পর নিজেই পা ধুয়ে এসে মেঝেতেই বসে পড়ে—ততক্ষণে পুঁটলি খুলেছে—গোটা চার-পাঁচ দানা অন্ন তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে মুখে দিলেন, তারপর পরমান্নর বাটিটা টেনে নিয়ে সেইটেই একটু খেলেন।

আচমন করার পর আর দাঁড়ালেন না। তখনই সাইকেল ঘুরিয়ে ও-বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

ওপারের জানলা থেকেই ছেলেকে দেখতে পেয়েছিলেন শ্যামসোহাগিনী।

ঐরকম ঘর্মাক্ত দেহ, রজে প্লাবিত, মুখে দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তির গভীর কালিমা। একটা বড় রকমের কোথাও বিভ্রাট ঘটেছে তা বুঝতে এক মুহূর্তের বেশী দেরি লাগল না। তিনি এসে সিঁড়ির মুখেই অপেক্ষা করতে লাগলেন।

স্বরূপ উঠে এসে তখনই কিছু বললেন না, ইঙ্গিতে মাকে ঘরে যেতে বললেন, তারপর একটা টুলের ওপর বসে পড়ে নীরবে চিঠিখানা মায়ের হাতে দিলেন।

মার পড়তে দেরি লাগল, এ হাতের লেখাতে তিনি অভ্যস্ত নন। শেষ পর্যন্ত যখন মোটামুটি চিঠির বক্তব্যটা বুঝলেন, তখন একেবারে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, 'এ কী কাণ্ড! মেয়েটা বদ্ধ পাগল। তুই যা বাবা, তাকে যেমন ক'রে হোক ফিরিয়ে

আন। বেশী দূর যেতে পারে নি নিশ্চয়, কালও রাত্রে প্রসাদ দিয়ে এসেছে তখনও বিশাখা ঘরেই ছিল।…খোঁজ ক'রে দেখ—হয়ত ঋষিকেশেই গেছে, গঙ্গায় ডুববে বলে। সেদিন পার্বতীর কথাটা আমার কানে পেঁাছেছিল, মনে হ'ল এ কি কোন বিশেষ ইঙ্গিত। কিন্তু দ্যাখ দ্যাখ। এখানের পথ-ঘাট কিছুই চেনে না, কোন না বিপদে পড়ে। বরং একটু লীলাধর বলে যে ছেলেটা, তার কাছে খোঁজ ক'রে দেখ—সে কিছু জানে কিনা, কাউকে সঙ্গে নিয়েছে কিনা।…ওরে, তুই বুঝতে পারছিস না—ও যে অন্তঃসত্ত্বা, তোর সন্তান ওর পেটে। পোড়ার হাঁদা মেয়েটা কি কিছুই বোঝে নি! ইস্—!'

স্বরূপ যেন চাবুক খাবার মতোই একটা আঘাত পেলেন।

'অন্তঃসত্ত্বা! কই, আমিও তো কিছুই বুঝতে পারি নি।'

'আঃ! এ কি তোর বোঝবার কথা! পঞ্চম দোলের দিন ওকে দেখেই বুঝেছি। যা, যা, যত কষ্টই হোক—এখনই যা!'

স্বরূপ একটা যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এখনই যাচ্ছি মা। কিন্তু আমার মনে হয় যে সে মরে নি, পার্বতী মা অন্তর্যামিনী, তিনি কি আর জানতে পারবেন না?'…

শ্যামসোহাগিনী বললেন, 'আমারও তাই মনে হয়।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'তবে একটা কথা বলছি, যদি খুঁজে পাস এখানে আর ফিরিস নি। ঐ দিকেই তীর্থ হোক, কোন পাহাড়ে শহর হোক—সেইখানেই থাকিস! তুইও শান্তি পাবি, সেও পাবে। আমারই দোষ—স্বার্থপরতা বলতে পারিস—তোকে কাছে রাখতে চেয়েছিলুম, দোটানায় পড়ে তোর শারীরিক আর মানসিক যে অপরিমাণ কষ্ট তা আমি লক্ষ্য করেছি, লজ্জিত বোধ করেছি। আর না। তুই, তোরা শান্তিতে থাক—ছেলে-মেয়ে যা হবে তোর মত ক'রেই মানুষ করিস। তবে হ্যাঁ, যদি কখনও শুনিস আমি মরণাপন্ন বা মারা গিয়েছি—তখন একবার আসিস, আমার শেষকৃত্য না হয়, শ্রাদ্ধটা করিস।'

বলে আর দাঁড়ালেন না, দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন—যেন ছুটেই।

স্বরূপও বাধা দিলেন না। প্রয়োজনও ছিল না। অমানুষিক মনের জোরে মা কান্না চেপে রেখেছেন—তা তাঁর দুপাশের শিরা ফুলে ওঠাতেই বুঝেছিলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস আজকাল আর পড়ে না স্বরূপের। দমন করতে করতে সেটা বোধহয় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আজও সে নিঃশ্বাস পড়ল না। কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

বোধ করি চিরদিনের মতোই।

প্রভাত-সূর্য্য

মৃত্যুলোকে

বধূর রূপের খ্যাতি অনেক দিন হইতেই শোনা ছিল, সুতরাং শুভদৃষ্টির সময় রমানাথ ভাল করিরাই চোখ মেলিয়া চাহিল। চারিদিকে তীব্র আলো, অসংখ্য লোকের কণ্ঠস্বর এবং বন্ধুদেব পরিহাস; তাহার মধ্যে লজ্জায় দৃষ্টি যেন ঝাপসা হইয়া আসে, ভাল করিয়া দেখা যায় না। তবু উহারই ভিতর রমানাথ যেটুকু দেখতে পাইল, তাহাতে ইন্দ্রাণীর সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কোন সংশয় রহিল না। লজ্জায় ইন্দ্রাণীর চোখ দুটিও কেবলই বুজিয়া আসিতেছিল কিন্তু তবুও তাহার আয়ত নেত্রের চঞ্চল দৃষ্টিটুকু রমানাথের চোখ এড়ায় নাই, মুহূর্ত-খানেকের জন্য তাহার চোখে সে চোখ মিলিয়াছিল; তাহার রক্তিম, সরস পরিপূর্ণ ওষ্ঠে সেই মুহূর্তটিতে একটু সলজ্জ হাসিও বোধহয় খেলিয়া গিয়াছিল, কপোলে ফুটিয়া উঠিয়াছিল লজ্জার রক্তিমা।

কেবলমাত্র ঐটুকু। বাসর ঘরে, বিবাহের পরদিনকার নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও রমানাথ তাহার দিকে চাহিতে পারে নাই। কদাচিৎ হয়তো চুরি করিয়া চাহিতে গিয়া তাহার সুডৌল হাত কিম্বা সুন্দর পা-দুটির দিকে নজর পড়িয়াছে কিন্তু মুখ পর্যন্ত তাহার দৃষ্টি পেঁছায় নাই। রাত্রি তো কালরাত্রি, পরদিন সকালেও একবার মাত্র বিদ্যুৎরেখার মত ইন্দ্রাণী তাহার সামনে দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহাতে শুধু তাহার অপরূপ দেহযষ্ঠির একটা আভাস পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং কেবল মাত্র সেই শুভদৃষ্টির স্মৃতিটুকু লইয়াই রমানাথকে এক বৎসরের মত কারাবাসে যাইতে হইল। কেমন করিয়া, তাহাই বলি—

বৌভাতের বাজার করিতে রমানাথ নিজেই হাটে গিয়াছিল। বাজার সব করাই ছিল, শুধু মাছটা! মথুর জেলে পূর্বাহ্নেই সংবাদ পাইয়াছিল, সুতরাং মাছ পাইতেও বেশী দেরি হয় নাই। ওজন করাও হইয়াছে, শুধু মুটের মাথায় তুলিবার অপেক্ষা, সেই সময় চটকলের গ্রেগরী সাহেব সেইখানে আসিয়া পড়িলেন এবং বিনা বাক্যব্যয়ে সবচেয়ে বড় মাছটা ছড়ির অগ্রভাগ দিয়া দেখাইয়া মথুরকে আদেশ দিলেন ঝুড়িতে তুলিয়া দিতে।

একে সাহেব তায় কোন্ ম্যাজিস্ট্রেটের সম্বন্ধী, সুতরাং মথুর অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল। শুষ্ক মুখে বার-তিনেক ঢোক গিলিয়া সে রমানাথকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, 'বাবু নিয়েছেন সব—'

সাহেব রমানাথের দিকে চাহিয়া ইংরাজীতে কহিলেন, 'তোমার অতগুলি নিশ্চয়ই লাগবে না, আমার বিশেষ দরকার।'

রমানাথ বিনীতভাবেই জবাব দিল, 'ওতেও আমার কম পড়বে সাহেব, আমার বাড়িতে ভোজ আছে।'

সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, কহিলেন, 'তবে অন্য মাছ দেখে নাও, আমার এটা দরকার। এই, উঠা দেও—'

রমানাথ ঈষৎ উষ্ণকণ্ঠেই কহিল, 'আমার দাম দেওয়া হয়ে গেছে, এ মাছ তুমি পাবে না; অন্য মাছ দেখ।'

সাহেবের মেজাজ মুহূর্তে গরম হইয়া উঠিল, কহিলেন 'What damned impertinence! আমি বলছি আমার ওটা দরকার—তুমি মিছিমিছি বিরক্ত করছ কেন? এই উঠাও জল্দি—'

সাহেবের চাকর আদেশ-মত মাছ উঠাইতে যাইতেছিল, কিন্তু রমানাথ তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিল। বাজারের কোনও লোকই বোধহয় এ সাহস করিত না; কিন্তু রমানাথ চিরকাল কলিকাতায় থাকিয়া স্কুল-কলেজে পড়িয়াছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবার মত শিক্ষা সে পাইয়াছে, তাই তাহার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে চাকরটাকে কহিল, 'এই শুয়ারকা বাচ্ছা, কিসকা মাল উঠাতা হ্যায়?'

সাহেব এ ধৃষ্টতা সহিতে পারিলেন না, বিশেষ করিয়া বাজারের এতগুলি লোকের মধ্যে, হাতের ছড়ি দিয়া তিনি সজোরে রমানাথের হাতের উপর মারিলেন এক ঘা, যন্ত্রণায় রমানাথ হাত ছাড়িয়া দিল।

ঠিক সেই মুহূর্তটির কথা তাহার আর কিছুমাত্র স্মরণ নাই; দেহের সমস্ত রক্ত তাহার এক নিমেষে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া সাহেবের মুখে এক ঘুষি মারিল, সাহেব ছিট্‌কাইয়া গিয়া পড়িলেন প্রায় হাত-তিনেক দূরে, তাঁহার ঠোঁট কাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল।

চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। হাটসুদ্ধ লোক ছুটিয়া আসিল। জনকতক বৃদ্ধ রমানাথকে তিরস্কার করিলেন, ছোকরারা চুপি চুপি বাহবা দিল। রমানাথ চাকরের মাথায় মাছগুলি চাপাইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহার বাবা কথাটা শুনিয়া ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিলেন, কারণ জেলার হাকিম সাহেবের মেজাজের কথা তাঁহার জানা ছিল। রমানাথ কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিল; কহিল, হাটসুদ্ধ লোকের মধ্যে যে অপমান হয়েছে, আর কিছু করতে সাহস করবে না!

কিন্তু রমানাথের বাবার আশঙ্কাই সত্য হইল। বেলা তিনটা নাগাদ ইন্‌স্‌-পেক্টর প্রভাতবাবু জন-দুই কনস্টেবল্ লইয়া দেখা দিলেন। রমানাথের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। এখনই হাজতে লইয়া যাইতে হইবে।

দেশের মাতব্বর প্রায় সব কয়জনই উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা হা-হা করিয়া আসিয়া পড়িলেন,—আজ বৌ-ভাত, ফুলশয্যা; আজকের দিনে কি করে হয়!

প্রভাতবাবুকে সামনে এবং আড়ালে অনেক অনুরোধ করা হইল। টাকার লোভ দেখানোর চেষ্টাও দু-একজন করিলেন, কিন্তু দেখা গেল প্রভাতবাবুর কোনও হাতই নাই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজে হাতে চিঠি দিয়েছেন, immediate arrest হওয়া চাই। প্রভাতবাবু কহিলেন, 'বরং আপনারা কয়েকজন যান, যদি সাহেব জামিন দেন সেই চেষ্টা দেখুন গে—'

রমানাথ ও প্রভাতবাবু একখানা গাড়ি করিয়া থানায় গেল। এধারে রমানাথের বাবা কেদারবাবু এবং জনচারেক লোক তখনই আর একখানা গাড়ি ডাকাইয়া হাকিমের বাংলোয় গেলেন কিন্তু কোনও ফল হইল না। যদি বা দেখা দিলেন,

বলিলেন, জামিন দেওয়া চলিবে না, very dangerous character.

অনুনয়, হাতজোড়, কান্নাতে পর্যন্ত তাঁহার মন টলিল না।

একথা শুনিবার পর আর কাহারও ভুরি-ভোজনের অবস্থা রহিল না। সমস্ত আহার্য নষ্ট হইল, উৎসব-বাড়িতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। ইন্দ্রাণী সমস্ত শুনিয়া এক কোণে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল, কেহ তাহার খোঁজও করিল না।

ইহার পর প্রায় মাসখানেক ধরিয়া মোকদ্দমা চলিল; রমানাথের বাবা কলিকাতা হইতে উকিল আনাইলেন। সাক্ষীসাবুদ ডাকা হইল; গ্রেগরী সাহেবকেও তলব করা হইল কিন্তু ফল শেষ পর্যন্ত দাঁড়াইল রমানাথের ছয়-মাসের কারাদণ্ড। কিছুতেই কিছু হইল না। কেদারবাবু বলিলেন, 'আমি আপিল করব!'

রমানাথ নিষেধ করিল। কহিল, কী ফল হবে তার ঠিক নেই, মিছিমিছি পয়সা নষ্ট করে লাভ কি? আমি তো কোন অন্যায় ক'রে জেলে যাইনি, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়েই জেলে যাচ্ছি। তাতে আমার কোনও অগৌরব নেই। ছ'টা মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

কেদারবাবু অন্য লোককে দিয়া জানিতে চাহিলেন, বৌমাকে রমানাথ দেখিতে চায় কিনা। সে জিভ কাটিয়া কহিল, 'ছি, স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হবে হাজতে বসে! সে আমি সইতে পারব না; ফিরে আসি আমি, তারপর অবসর পাওয়া যাবে ঢের।'

শুধু দুই-ছত্র একখানি চিঠি ইন্দ্রাণীর জন্য লিখিয়া দিল এবং কেদারবাবুর কাছ হইতে বিদায় লইবার আগে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'বাবা, এর জন্য যেন তাকে না কেউ দায়ী করে বা কড়া কথা বলে।

কেদারবাবু কহিলেন, 'বৌমা আমার ঘরের লক্ষ্মী, তাঁকে কড়া কথা বলবে কে? তার সব দায়িত্ব আমার রইল, তুই কিছু ভাবিস নি।'

॥ ২ ॥

ইন্দ্রাণী প্রথম দুই তিন দিন এই অভাবনীয় ব্যাপারে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কেহ তাহাকে এজন্য দায়ী করে নাই, কেহ একটি মন্দ কথাও বলে নাই, কিন্তু তবু তাহার মনে এই ব্যাপারের জন্য সঙ্কোচের অবধি ছিল না। সকলেরই নীরব সহানুভূতির দৃষ্টি যেন বিশেষ করিয়া বলিতেছে, এই মেয়েটির অদৃষ্টক্রমেই এমনটা ঘটিল!

আর সত্যিই তো তাহার অদৃষ্ট ছাড়া আর কি? এত মেয়ের বিবাহের কথা সে শুনিয়াছে, এত মেয়ের বিবাহ সে চোখে দেখিয়াছে, কৈ কাহারও তো এরূপ ঘটে নাই! বিদ্বান, চরিত্রবান, কন্দর্পকান্তি (অন্ততঃ তাহাই সে লোকমুখে শুনিয়াছে) এমন স্বামীই বা কাহার জোটে এবং এমন ফুলশয্যার পূর্বে বিচ্ছেদই বা কাহার হয়?

ইন্দ্রাণীর পাষাণ-ভার বুক হইতে নামিতে চাহিল না আরও যে কারণে সেটা

বাড়িতে লোকজন বেশী না থাকায়। দেবর-ননদ কেহ নাই, কুটুম্ব-কুটুম্বিনী যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা দুর্ঘটনার প্রারম্ভেই চলিয়া গিয়াছেন; শাশুড়ীর দিন কাটিতেছে চোখের জলে আর দুশ্চিন্তায়, শ্বশুর ছুটাছুটি করিতেছেন মামলার তদ্বিরে—তাহার দুঃখের দিন কাটে কি করিয়া?—স্বামীর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে, একথা সে শুনিয়াছে কিন্তু সে-ও সম্ভবতঃ মামলার জন্য ব্যস্ত, এক-আধবার চকিতে তাহার আগমনের কথা শুনা যাইতেছে বটে—দেখা মিলিতেছে না।...

মোকদ্দমার শেষ দিনে ফলাফল আগেই পৌঁছিয়াছিল, শাশুড়ী চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, কিন্তু ইন্দ্রাণী কাঁদিতেও পারিল না। সে শুষ্ক মুখে বিমূঢ়ভাবে বসিয়া রহিল। এমন কি সন্ধ্যার কিছু পূর্বে যখন শ্বশুর ম্লানমুখে রমানাথের চিঠিখানি লইয়া ঘরে ঢুকিলেন তখনও তাহার চোখে জল আসিল না। বরং চিঠিখানি হাতে করিতে অতিশয় মলিন একটা হাসির রেখাই তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

যে স্বামীর সহিত পরিচয় ঘটিল না, ভাল করিয়া চোখের দেখা হইল না, যাহারও চেহারাটা পর্যন্ত মনে ধারণা করা যায় না—সেই প্রায়-অপরিচিত লোকের কাছ হইতে আসিয়াছে প্রেম-সম্ভাষণ। হাতের লেখা অপরিচিত, লেখকও তাই, তবুও স্বামীর এই প্রথম প্রেমপত্র, ইহারই আশায় কৈশোরের বহু রাত্রি বিনিদ্র কাটিয়াছে!

হায় রে অদৃষ্ট!

চিঠিতে ঠিক গোণা দুটি ছত্রই ছিল—

"রাণী আমার,

এই আমাদের বিধিলিপি, এর জন্য দুঃখ করো না। তোমার সঙ্গে অন্ততঃ পরিচয়টুকু হলেও আমার ক্ষোভ থাকত না। যাক্—যতীন রইল, সে আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু; তার কাছে কোনও সঙ্কোচ ক'রো না, যদি কিছু প্রয়োজন হয় তাকেই বলো।

তোমার হতভাগ্য স্বামী"

কেদারবাবু একটু গলা ঝাড়িয়া বলিলেন, 'বৌমা, এই তোমার যতীন-ঠাকুরপো এসেছে। আমার রমা আর যতীনে কোনও প্রভেদ নেই, ছেলেবেলা থেকে দুটিতে এক-প্রাণ। লজ্জা ক'রো না, যতীনের সঙ্গে কথাবার্তা বলো। বাবা যতীন, তোরা বসে গল্প কর্, আমি আসছি—'

যতীন এই পাড়ারই ছেলে, আবাল্য রমানাথের বন্ধু, এ বাড়িতে ছেলের মতই মানুষ হইয়াছে। তাহার সহিত রমানাথের আকৃতি ও প্রকৃতিগত যথেষ্ট পার্থক্য ছিল, রমানাথের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, গৌরবর্ণ—যতীনের ছিল শ্যামল, ক্ষীণ দেহ; রমানাথের দৃঢ়চিত্ততা, সাহস, ন্যায়পরতার কথা দেশে বিখ্যাত ছিল, কিন্তু যতীন ছিল ঠিক তাহার বিপরীত, অত্যন্ত কোমল মন তাহার, তবুও দুজনের ছিল আশ্চর্য, অকৃত্রিম বন্ধুত্ব!

যতীনের কথা এ বাড়িতে পা-দিবার অনেক আগে হইতেই ইন্দ্রাণী শুনিয়াছে,

যতীনই তাহাকে প্রথম দেখিতে যায়, যতীনের মধ্যস্থতাতেই বিবাহের অধিকাংশ কথাবার্তা হয়, তাহাও সে জানে। যতীন পাঠশালা হইতে এম-এ ক্লাস পর্যন্ত রমানাথের সহিত একসঙ্গে পড়িয়াছে, আজ পর্যন্ত দু'জনের কখনও মনোমালিন্য হয় নাই, যতীনের জীবনের অধিকাংশ দিনই এই বাড়িতে কাটিয়াছে—এ সব কথাও সে এ বাড়িতে আসিবার পর শাশুড়ীর কাছে শুনিয়াছে। কিন্তু তবু, 'লজ্জা করিও না' বলিলেই লজ্জা ত্যাগ করা যায় না—সে চকিতে একবার যতীনের দিকে চাহিয়া লইয়া চোখ নামাইল।

যতীন আসিয়া তক্তাপোশেরই একটা দিকে বসিয়া কহিল, 'আপনার বাবা চিঠি লিখেছেন যে, ফুলশয্যা না হলে আপনার বাপের বাড়ি যেতে নেই। এখন তা'হলে ছ-মাস অন্ততঃ আপনাকে এখানেই থাকতে হবে!...বাপের বাড়ির জন্য মন-কেমন করছে, না? আপনার খুব কষ্ট হবে বোধ হয়!'

ইন্দ্রাণী একটুখানি মলিনভাবে হাসিল মাত্র; কথাও কহিল না, মাথাও তুলিল না।

যতীন মুহূর্ত-কয়েক জবাবের আশা করিয়া পুনশ্চ কহিল, 'কিন্তু খুব মন খারাপ করে থাকলে আপনার চলবে না বৌদি, অনবরত আপনার ম্লান মুখ দেখলে আমাদের কষ্ট আরও অসহ্য হয়ে উঠবে।'

এ কথারই বা কি জবাব দিবে? তা ছাড়া ইন্দ্রাণীর একটু লজ্জাও করিতেছিল। পল্লীগ্রামের মেয়ের মত ঠিক সে মানুষ হয় নাই বটে, কিন্তু প্রথম হইতেই স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলিবার মত শিক্ষাও সে পায় নাই।

যতীন কিন্তু হাল ছাড়িবার পাত্র নয়, সে আবারও নিজেই কথা কহিল, 'আমার সঙ্গে কথা না কয়ে উপায় নেই বৌদি, এ বাড়িতে দেওর-ননদ কেউ নেই, কার সঙ্গে কথা কইবেন? দুদিনেই হাঁপিয়ে উঠতে হবে যে!'

কথাটা খুবই সত্য; রমানাথ বাপ-মার একমাত্র সন্তান। বাড়িতে কথা কহিবার মত ঠাট্টা-তামাসা করিবার মত একটিও দেবর কি ননদ নাই। জ্ঞাতি কুটুম্বরা তো অনেক দিনই যে যাহার বাড়িতে চলিয়া গিয়াছেন, জন-দুই শাশুড়ী-পর্যায়ভুক্ত মহিলা ছিলেন, তাঁহারাও আজ গিয়াছেন, বাড়ি একেবারে খালি।

কিন্তু তবুও ইন্দ্রাণী কথা কহিতে পারিল না, কী কহিবে তাহাও বোধকরি খুঁজিয়া পাইল না। সে নীরবে নতমস্তকে বসিয়া বিছানার চাদরের একটা খুঁট আঙ্গুলে জড়াইতে লাগিল।

মিনিটখানেক পরে কৃত্রিম ক্ষুন্নস্বরে যতীন কহিল, 'আপনি যখন আমাকে এতই পর ভাবছেন, তখন আর আপনাকে বিরক্ত করে লাভ কি? চললুম আমি—'

ইন্দ্রাণী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল। কোনও মতে ঢোক গিলিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, 'বসুন না—'

যতীন কহিল, 'না, ওটা নিতান্ত চক্ষুলজ্জায় পড়ে বলছেন বইতো নয়, মনের কথা হচ্ছে যে এ আপদটা গেলেই বাঁচি।'

তাহার পর বাহিরে আসিয়া অভিমানের সুরে কহিল, 'মা, আপনার বৌ

আমার সঙ্গে কথাই কয় না, তা আমি আর কি ভোলাব ? আপনি তো বললেন, বৌমাকে একটু ভুলিয়ে-টুলিয়ে রাখ্ বাবা ক'দিন !'

রমানাথের মা কহিলেন, 'ও কি কথা বৌমা, যতীনের সঙ্গে কথা কইবে তার আর লজ্জা কি ? আমি কতদিন বলেছি তোমায়, রমার সঙ্গে ওর কোনও ভেদ দেখবে না।...আর তা-ছাড়া আর-একটা দেওর-ননদ নেই, ওর সঙ্গেও কথা না বললে বাঁচবে কি করে মা ?'

যতীন মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল, তাহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'তোরাই বা কি রকম সব আজকালকার ছেলেপুলে, একটা বৌকেই যদি কথা না কওয়াতে পারলি তো কি লেখাপড়া শিখলি ? রমার মেজকাকা বিয়ের রাত্রেই আমাকে কথা বলিয়ে তবে ছেড়েছিল !'

যতীন ভালমানুষের মত কহিল, 'যাক্, প্রথমবারটা কিছু বললুম না। মনটাও ভাল নেই। তবে বার বার কি আর ছেড়ে দেব ?'

রমানাথের মা সারদা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'আর বাবা মন ! বৌমার কাছে যেন মুখ দেখাতেও লজ্জা করছে !'

ইন্দ্রাণী যতীনের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া আরক্ত-নতমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এই সময় আস্তে আস্তে আবার ঘরে ঢুকিল। একটু পরেই বাহিরে পায়ের আওয়াজে বুঝিল যতীন বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, তখন সে জানলার ধারে কাগজের টুকরাটি পুনরায় মেলিয়া ধরিয়া ছত্রকয়টি বারকতক পর পর পড়িল। শুভদৃষ্টি ও বিবাহের অনুষ্ঠানের মধ্যে ঝাপ্সা ঝাপ্সা যতটা সে স্বামীকে দেখিয়াছে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া স্বামীকে মনে করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই মনে পড়িল না। শুধু মনে আছে বলিষ্ঠ, দীর্ঘ তাঁহার দেহ এবং গৌরবর্ণ। মাসী-শাশুড়ী আজ যাত্রাকালে উপদেশ দিয়া বলিয়া গিয়াছেন, 'স্বামীকে মনে মনে ধ্যান করিস, ছ-টা মাস ছ-টা দিনের মত কেটে যাবে।' কিন্তু যাঁহার সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নাই মনে, কী করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিবে ?

সহসা শাশুড়ীর ডাক কানে গেল। ইন্দ্রাণী চিঠিখানা তাড়াতাড়ি ভাঁজ করিয়া বুকের মধ্যে রাখিয়া বাহিরে আসিল। সারদা তখন পা ছড়াইয়া বসিয়া কী একটা মশলা বাছিতেছিলেন, স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, 'বাড়িটা আজ যেন একেবারেই ফাঁকা হয়ে গেল, না বৌমা ? বড় মন খারাপ লাগছে !'

একটু থামিয়া কহিলেন, 'তুমি আমার কাছে বসো মা, একলা চুপ করে ঘরের মধ্যে থাকলে আরও বিশ্রী লাগবে !'

ইন্দ্রাণী তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া নীরবে পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল ; দুটো-একটা অন্য কথা বলিবার পর সারদা যতীনের কথা তুলিলেন। কহিলেন, 'কথা কইলে না কেন মা ? ও আবার বড় অভিমানী, কথায় কথায় ব্যথা পায়।'

ইন্দ্রাণী নতমুখে জবাব দিল, 'আমার বড় লজ্জা করে !'

সারদা হাসিয়া কহিলেন, 'প্রথম প্রথম একটু লজ্জাই করে বটে। দুটো একটা

কথা শুধু বলবার চেষ্টা করো। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলোনি শুনলে রমাও দুঃখ করবে।'

ইন্দ্রাণী কহিল, 'আমি চেষ্টা করব মা!'

কিন্তু সেদিন আর কথা বলিবার অবকাশ রহিল না, রাত্রে যতীন আর-একবার আসিল বটে, কেদারবাবুর ঘরে বসিয়া তাঁহার সহিত খানিকটা গল্প করিল। ইন্দ্রাণীও রান্নাঘরে সারদার কাছে বসিয়াছিল, যতীন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিবার পথে দোরের কাছ হইতে শুধু সারদার নিকট বিদায় লইয়া গেল।

পরদিন সমস্ত বেলাটা কাটিল ইন্দ্রাণীর কর্মহীন সুদীর্ঘ অবসরের মধ্যে। কাজ কিছুই নাই, যাহা সামান্য কাজ তাহার জন্যই গুটি-তিনেক দাসী-চাকর আছে। সারদা তাহাকে আগুনের ধারেও যাইতে দেন না। একলা এই জনহীন পুরীতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার যেন কান্না পাইতেছিল। বাপের বাড়ির কথা, ভাইবোনের কথা মনে হইতেছিল, সেখানে সমস্ত দিন কাটিত অবিচ্ছিন্ন উৎসবের মধ্যে। তাহার বাপ-মা দরিদ্র, কিন্তু সেখানে কোনও দিন আদরের অভাব হয় নাই—লোকও সেখানে কম নয়।

শ্বশুরবাড়িতে মেয়েরা আসে কতক ভয় এবং অনেকখানি আশা বুকে লইয়া, কিন্তু তাহার সে ভয়ও নাই, আশাও যাহা ছিল সব চুরমার হইয়া গিয়াছে। এখন এইভাবে, আশাহীন, আনন্দহীন অবস্থায় সুদীর্ঘ ছয়মাস কাল তাহার কাটিবে কি করিয়া?

বিকালবেলা শাশুড়ীর তাগিদে সে মাথা বাঁধিয়া গা ধুইয়া আসিল বটে, কিন্তু তখন তাহার মনের একটা অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থা। সন্ধ্যার সময়ে তাই যতীনের কণ্ঠস্বর কানে যাইতে সে যেন অন্ধকারে একটু আলো দেখিতে পাইল। সহসা উৎফুল্লভাবে সোজা হইয়া বসিল।

যতীন ঘরে ঢুকিল কতকগুলি গোলাপফুল লইয়া। সেগুলি ইন্দ্রাণীর সামনে ধরিয়া কহিল, 'আমার গাছের ফুল বৌদি, দেখেছেন কত বড বড় ফুল ফুটিয়েছি।… নিন, রেখে দিন ভাল করে।'

ইন্দ্রাণী মাথার ঘোমটাটা আর একটুখানি টানিয়া দিয়া ফুলগুলি লইয়া ফুল-দানিতে সাজাইয়া রাখিল; তাহার পর সলজ্জ-হাসিমুখে টেবিলে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যতীন কহিল, 'বৌদি বসুন, বাঃ, দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে কেন?'

ইন্দ্রাণী কোনমতে তক্তাপোশটারই এক কোণে বসিল। যতীন কথা বলিয়াই চলিল, 'সমস্ত দিন আপনার খবর নিতে পারি নি, তার প্রধান কারণ ঐ রমাই—। দুনিয়ায় যত পুয়োর ফণ্ড, শিল্প-বিদ্যালয়, লাইব্রেরী সব ছিল তার ঘাড়ে—এখন সে তো হঠাৎ ডুব মারল, মারা যাচ্ছি আমি বেচারা।'

এই পর্যন্ত বলিয়া সে থামিয়া সহসা ইন্দ্রাণীর দিকে চাহিয়া কহিল, 'কিন্তু আমিই একলাই বকে যাচ্ছি, আপনি তো কথা কইছেন না!'

ইন্দ্রাণীর কথা কহিবার ইচ্ছা খুবই ছিল কিন্তু কোথা হইতে বিশ্বের যত দুর্নিবার লজ্জা যেন তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। সে লাল হইয়া ঘামিয়া উঠিল।

যতীন অভিমানের সুরে কহিল, 'আপনি যদি কথা না বলেন তো আমারই বা কি দরকার আপনাকে বিরক্ত করার—'

সে নিতান্তই উঠিতে যায় দেখিয়া ইন্দ্রাণী খুবই ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু কি বলিবে এবং কি করিয়া বলিবে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না। শেষ পর্যন্ত দিশাহারা হইয়া সহসা যতীনের ডান হাতখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিল।

মুহূর্তকয়েক মাত্র। তাহার পর নিজেই আরও লজ্জিত হইয়া হাতটা ছাড়িয়া দিল। যতীনও প্রথমে যেন কতকটা অভিভূত হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর ইন্দ্রাণীর মানসিক দ্বন্দ্বটা বুঝিতে পারিয়া আবার বসিয়া পড়িল। হাসিয়া কহিল, 'আচ্ছা লজ্জা তো আপনার!···তবু কথা বলবেন না?'

ইহার পর আর কিছুক্ষণ যতীন একতরফা আলাপ চালাইল। কথায় কথায় ইন্দ্রাণীরও একটু একটু করিয়া লজ্জা ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল, প্রথম প্রথম ঘাড় নাড়িয়া, তাহার পর কোনও মতে 'হাঁ' 'না' বলিয়া দুই-একটি কথার জবাব দিল। শেষ পর্যন্ত যতীন উঠিবার সময় যখন বলিল, 'এখন তবে আসি বৌদি'; তখন সে ভরসা করিয়া বলিয়া ফেলিল,'আবার আসবেন!'

যতীন খুশী হইয়া কহিল, 'আসব বৈকি, কাল একটু বেলাবেলি এসে আপনাকে নদীর ধারে ঘুরিয়ে আনব।'

সেদিন সে তখনই বাড়ি চলিয়া গেল। কেদারবাবুর আহ্বান সত্ত্বেও সে কাজের অজুহাত দেখাইয়া সরিয়া পড়িল।

॥ ৩ ॥

যতীন বাল্যকাল হইতেই সচ্চরিত্র বলিয়া খ্যাত। কিন্তু সেটা তত বড় কথা নয়, যতটা বড় কথা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাহার অসীম নিরাসক্তি। যৌবন আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই শতকরা নিরানব্বুইটা পুরুষমানুষ স্ত্রীলোকের স্বপ্ন দেখে, বন্ধুবান্ধবদের সহিত মেয়েদের কথা আলোচনা করে এবং পথে-ঘাটে মেয়েছেলে দেখিলে তাকাইয়া থাকে। কিন্তু যতীন কেমন করিয়া সৃষ্টিছাড়া হইয়া সেই বাকী একজনের দলে গিয়া পড়িয়াছিল। বন্ধুবান্ধবরা এজন্য প্রথম প্রথম তাহাকে অনেক ধিক্কার দিয়াছে, ইদানীং আর কিছু বলে না, সকলেই হাল ছাড়িয়া দিয়াছে।

সেদিন কিন্তু নিজের অবস্থায় যতীন নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল। সে যে ইন্দ্রাণীর সহিত বেশীক্ষণ কথা কহিল না কিম্বা কেদারবাবুর কাছে বসিল না, শুধু পারিল না বলিয়াই। রাস্তায় যখন পা দিল তখনও তাহার সমস্ত শরীর যেন নেশার মত আচ্ছন্ন হইয়া আছে। উত্তেজনায় তখনও হাত-পা অল্প অল্প কাঁপিতেছে!

এই তাহার জীবনে প্রথম নারীর স্পর্শলাভ না হইলেও রূপসী কিশোরীর

অঙ্গ-স্পর্শ এই তাহার প্রথম! কি তাহাতেই বা এমনটা হইল কেন? সে এই অকারণ উত্তেজনার কারণ খুঁজিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনও কারণেই মনে পড়িল না। শুধু ক্ষণে ক্ষণে অতি কোমল, স্বেদসিক্ত দুইখানি হাতের স্পর্শ মনে পড়িয়া তাহার দেহ শিহরিয়া উঠিতে লাগিল; বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিল।

বাড়িতে গিয়া সে সকাল সকাল আহার করিয়া শুইয়া পড়িল বটে, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। ইন্দ্রাণীর লজ্জারক্ত মুখ, তাহার আয়তনেত্রের সলজ্জ চাহনি এবং তাহার হাতের সেই স্পর্শ মনে পড়িয়া এমনই উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, কিছুতে কোন অবস্থাতেই তাহার চোখে তন্দ্রা নামিল না। অবশেষে সেই বিশেষ মুহূর্তটিকে বারবার নানা ভাবে রং ফলাইয়া কল্পনা করিবার পর শেষরাত্রে সে নিজের মনের কাছেই স্বীকার করিল যে এমনি একটা বিশেষ মুহূর্তের জন্যই তাহার মন এতদিন ধরিয়া, নিজের অজ্ঞাতসারেই, অপেক্ষা করিতেছিল এবং এই রকম মুহূর্ত যাহার জীবনে কখনও আসিল না তাহার জীবনের কোন অর্থ নাই।··

ভোরের অনেক আগেই সে উঠিয়া পড়িল এবং গ্রামের বসতি ছাড়াইয়া মাঠের দিকে বেড়াইতে গেল। সারারাত ঘুম হয় নাই, তাহা সত্ত্বেও সে কোন গ্লানি বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিল না। এ যেন কী এক নেশায় ধরিয়াছে তাহাকে, সেই নেশাই তাহাকে স্থির থাকিতে দিতেছে না।

কিন্তু যতীন অসচ্চরিত্র নয়, তাহার উপর সে লেখাপড়া শিখিয়াছে, এ নেশার অর্থ একটু পরেই তাহার মনে ধরা পড়িল। সে শিহরিয়া উঠিল! বন্ধুপত্নী, বিশেষ করিয়া যে বন্ধু তাহাকেই সবচেয়ে বিশ্বাস করে, তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধে এই শ্রেণীর মোহ, স্বপ্ন বা নেশা কোনটাই ভাল নয়—ইহার গতি ও পরিমাণকেই লোকে প্রেম বলে এবং তাহার কাহিনীও সে অনেক কেতাবে পড়িয়াছে।···

সে জোর করিয়া নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিল এবং বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া নিজে যাচিয়া সংসারের বহু কাজকর্ম করিয়া দিল। অকারণে আর রমানাথের বাড়িতে যাইবে না, এমন একটা প্রতিজ্ঞাও মনে মনে করিল। যদিবা কারণ থাকে তো, নির্জনে আর ইন্দ্রাণীর সহিত দেখা করিবে না—বার বার মনকে এমনি একটা নির্দেশ দিতে লাগিল।

কিন্তু বিপদ বাধাইলেন সারদা দেবীই। সারাদিন যতীন গেল না দেখিয়া সন্ধ্যাবেলায় চাকর পাঠাইলেন তাহাকে ডাকিতে। তবু তখনই সে গেল না, লাইব্রেরীতে কাজ আছে এই অছিলা দেখাইয়া চাকরকে বিদায় দিল। অকারণে অনেকটা দেরি করিল, তাহার পর আর দেরি করার সঙ্গত-অসঙ্গত কোন কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া এক সময়ে এ বাড়িতে আসিয়া হাজির হইল।

সারদা তাহাকে দেখিয়াই বিলাপে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, 'আমার খোকা থাকতে তো এই বাড়িতেই আড্ডা ছিল বাবা, সে নেই বলে আমার সঙ্গেও কি তোর সম্পর্ক ঘুচে গেল? তোদের দুজনের একজনকেও না দেখলে কি করে প্রাণে বাঁচি বলু

দেখি ! আমার কি মানুষের প্রাণ নয় ?'

তা বটে !

যতীন নিমেষে অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। নানা মিথ্যা কাজের ফর্দ দিয়া, কাজগুলি যে রমানাথেরই, বহু প্রমাণে তাহা বুঝাইয়া সে সারদার অভিমান দূর করিল, তাহার পর বহুরাত্রি পর্যন্ত দালানে বসিয়া তাঁহার সঙ্গে গল্প করিল। সারদা ইন্দ্রাণীকেও ডাকিয়া কাছে বসাইলেন। নির্জন ঘরে যে দুর্নিবার লজ্জা অপরিচিত যুবক-যুবতীর প্রথম পরিচয়ের পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়ায়, অপরের সামনে সে লজ্জাটা অনেক কমিয়া যায়। সারদাকে মধ্যস্থ করিয়া প্রথম প্রথম একটি দুটি কথা ক্রমে আলাপে পরিণত হইল। তাহার উপর ইন্দ্রাণীই তাহাকে জলখাবার আনিয়া দিল, খাওয়া শেষ হইলে হাতে জল ঢালিয়া দিল, সুপারী-মশলা প্রভৃতি আনিয়া দিল—ফলে সম্পর্কটা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া উঠিল। বাড়ি ফিরিবার সময়ে সেদিনও ইন্দ্রাণী বলিয়া দিল, 'কাল আবার আসবেন।'

আজ যতীন অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিল, মনকে প্রবোধ দিল সকলকার সামনে এমনি প্রকাশ্য আলাপে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, মোহগ্রস্ত হইবার কারণও বিশেষ নাই। শুধু সে যে সেদিনও গভীর রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া সেদিন-কার সমস্ত কথোপকথনটাই বারবার আদ্যোপান্ত মনে মনে চিন্তা ও আলোচনা করিল, সেই বিপজ্জনক তথ্যটাই তাহার চোখে ধরা পড়িল না। সহজ আলাপটা আকর্ষণের পথটাকে স্বচ্ছন্দ করিয়া দিয়াছে—একথাটাও জানিতে পারিল না।

॥ ৪ ॥

এমনি করিয়াই আরও মাসখানেক কাটিয়া গেল। যতীন এখন নিয়মিত ভাবেই এ বাড়িতে যাতায়াত করে। হয়ত আজকাল সে একটু বেশীক্ষণই থাকে এখানে—কিন্তু তাহার মধ্যে যে অস্বাভাবিক কিছু আছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। আগেও সে দিনরাতের অধিকাংশ সময় এখানে কাটাইত, এখনও কাটায়—সুতরাং তাহাতে আর কাহার কি বলিবার আছে ? শুধু রমানাথের কাজগুলিতে যে যতীন কখন ধীরে ধীরে ঢিল দিয়াছে এবং যে সময়টা সে রমানাথের বাড়িতে থাকে না, সে সময়টাও যে নির্জনে বসিয়া সে ঐ বাড়িরই স্বপ্ন দেখে, সেটা যতীনের নিজের কাছেই যেন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। তবে তখন আর তাহার উপায় ছিল না। তাহার মনের ভিতরের পতঙ্গটা আগুনের জ্যোতিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে তখন—ফিরিবার পথ আর কোথাও নজরে পড়িতেছে না।

ইন্দ্রাণীও আজকাল প্রতিটি দিন যতীনেরই পথ চাহিয়া থাকে। ইহার মধ্যে যে দোষের কিছু আছে, তাহা সে তখনও বুঝিতে পারে নাই। সঙ্গীহীন, কর্মহীন দীর্ঘ অবসরগুলি একটি বন্ধুর সাহচর্যে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, এইটুকুই সে শুধু জানিত। সকালে যতীন আসিত ঘণ্টা-দুয়েকের জন্য, তখন প্রায়ই কেদারবাবু বাহিরে বিষয়-কর্মে ব্যস্ত থাকিতেন, মিনিট তিন-চার তাঁহার সহিত কথা কহিয়া

সে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িত। সারদা দেবীও ঠিক সেই সময়টাই পূজায় বসিতেন, ঠাকুরঘরের দুয়ার হইতে তাঁহাকে একটা হাঁক দিয়া সে দালানেই মেঝের উপর বসিয়া পড়িত। ইন্দ্রাণী সে সময় প্রতিদিনই সেইখানে বসিয়া শ্বশুরের জলখাবার প্রস্তুত, ফল ছাড়ানো, কুটনা-কোটা প্রভৃতি কয়েকটি খুচরা কাজ করিত—তাহারই ফাঁকে ফাঁকে চলিত গল্প। যতীনের ভদ্র মন আকর্ষণটাকে মনে মনে স্বীকার করিলেও নির্জনতার প্রয়োজনকে স্বীকার করে নাই। সে শুধু ইন্দ্রাণীকে চোখে দেখিয়া, তাহার সহিত গল্প করিয়াই খুশী ছিল। ইন্দ্রাণীও তাই। সে জন্যে সারদা পূজা করিয়া বাহির হইলেও ইহাদের অসুবিধা হইত না, গল্প চলিতেই থাকিত। বাড়ির দাসী-চাকররাও ইহাতে সেইজন্য দোষ দেখিতে পাইত না, কুৎসার রসনা বন্ধ থাকিত।

অপরাহ্নেও, যতীন কোন মতে সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিত। বন্ধু-বান্ধব তাহার রমানাথ ছাড়া আর ঘনিষ্ঠ কেহ ছিল না, সুতরাং তাহার অনুপস্থিতি কেহ লক্ষ্য করিত না। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সে এ-বাড়িতে ঢুকিত, সারদা দেবীর সামনে বসিয়াই গল্প করিত, চা-জলখাবার সেখানেই চলিত। সারদা আহ্নিকপূজো করিতেন, তাহাতেও কিছু অসুবিধা ছিল না, এমন কি কেদারবাবুও আসিয়া এক-এক দিন ইহাদের গল্পে যোগ দিতেন, বহুরাত্রি পর্যন্ত আড্ডা চলিলেও তাহা তাই অশোভন হইয়া ওঠে নাই। পরস্পরের প্রতি আকর্ষণটা সকলের দৃষ্টির গোচর ছিল বলিয়াই বোধ হয় সকলের, এমন কি তাহাদের নিজেরও মনের অগোচর ছিল। হয়তো চিরকালই অগোচর থাকিত, যদি না অদৃষ্ট-দেবতা এমন বিচিত্র খেলা খেলিতেন—

সেটা মাঘের শেষ। শীত আর নাই, বসন্ত দেখা দিয়াছে ফাল্গুনের আগেই। গরম হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছে, বাতাসে দেখা দিয়াছে ফুলের গন্ধ। ইন্দ্রাণীর মন অপরাহ্নের দিকে আজকাল যেন কেমন হু-হু করে, যতীনেরও কিছু ভাল লাগে না। কেন তাহাও বোঝা যায় না।

সেদিন সন্ধ্যার সময় রমানাথের বাড়ি ঢুকিয়া যতীন চমকিয়া উঠিল। সমস্ত বাড়িটা অস্বাভাবিক নির্জন—অন্য দিন সকলে নীচের দালানেই থাকে, আজ কাহারও চিহ্ন পর্যন্ত নাই।

কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া যতীন একটু ভীতভাবেই ডাকিল, 'মাসীমা!'

মাসীমার সাড়া আসিল না কিন্তু উপর হইতে ইন্দ্রাণীই নামিয়া আসিল। যতীন কহিল, 'ব্যাপার কি, এমন সব চুপ-চাপ কেন?'

ইন্দ্রাণী মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, 'মায়ের দুপুর বেলা থেকে বড্ড মাথা ধরেছে, কিছুই খান নি, তবুও যন্ত্রণায় দুবার বমি করেছেন।'

এ রোগটা সারদার বহুদিনের। মধ্যে মধ্যে হয়—তিন-চার দিন থাকে। যতীন তাহা জানিত। কহিল, 'তার পর?'

ইন্দ্রাণী বলিল, 'সন্ধ্যার সময় ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, একটা ঘুমের ওষুধ

দিয়ে গেছেন। সেইটে খেয়ে এখন একটু তন্দ্রা-মতন এসেছে।···বসুন—'

যতীন কিন্তু তখনই বসিতে পারিল না। সে কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেছিল। বলিল, 'এরা সব কোথায় ?'

অর্থাৎ ঝি-চাকররা।

ইন্দ্রাণীও যেন সহজভাবে কথা কহিতে পারিতেছিল না। একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, 'সুখদা মায়ের কাছে আছে। অনুকূল গেছে বাবার সঙ্গে সদরে। ফিরতে বোধ হয় রাত হবে। আর ঠাকরুণ-দি রান্নাঘরে—'

বলিয়া অকারণেই একটু হাসিল। তাহার পর কহিল, 'ওপরে যাবেন ?'

'না। মাসীমা সবে ঘুমিয়েছেন, এখন আর ওপরে যাওয়া ঠিক হবে না। আমি এখন যাই বরং—'

'বা-রে! আমি বুঝি এই একটা বাড়িতে একা চুপচাপ থাকব ? বাবা আপনার ভরসাতেই অনুকূলকে পর্যন্ত নিয়ে গেলেন।'

যতীন বিষম বিব্রত হইয়া পড়িল। মনের ইচ্ছা তাহার স্বভাবতই থাকার দিকে, এধারেও যুক্তি এবং অনুরোধের অভাব নাই সুতরাং খানিকটা ইতস্তত করার পরে মনের অস্পষ্ট ভয়টাকে অমূলক বলিয়া চোখ রাঙাইয়া সে দালানে ঢুকিল এবং কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে উপরে ইন্দ্রাণীরই শয়নকক্ষে আসিয়া দুজনে বসিল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। ইন্দ্রাণীর বুকের মধ্যে কেমন একটা ধুক-ধুক শব্দ হইতেছিল, সারা দেহে কিসের একটা মৃদু কম্পন, তাহার কারণ সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না। খাটের ওপাশের খুঁটিটায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া সে নীরবে ঘামিতে লাগিল।

যতীনও সহস্র চেষ্টাতেও সহজ হইতে পারিল না। তাহারও মনে হইতেছিল দেহের মধ্যেকার রক্তকণাগুলো যেন বিদ্রোহী হইতে চায়—কিসের একটা উদ্দাম চাঞ্চল্য তাহাদের মধ্যে। সে মনে মনে বার বার ঐ প্রশ্নই করিতেছিল—কেন ? কেন ?

মিনিট দুই-তিন পরে যতীন অকারণেই একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি বুঝি এর আগে আর ওঁর এই মাথাধরা দেখ নি, না ?'

কিছুদিন যাবৎ তাহার 'আপনি' এবং 'তুমি'র ব্যবধানটার গোলমাল হইতেছিল। সে ইন্দ্রাণীকে 'তুমি'ই বলিতে শুরু করিয়াছিল, কিন্তু তবু সঙ্কোচটা যায় নাই।

ইন্দ্রাণী মাথা নাড়িয়া কহিল, 'না।' তাহার পর গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, 'সেই বিয়ের আটদিনের মধ্যেই নাকি একদিন ধরেছিল, তবে সে এতটা বাড়াবাড়ি হয় নি। তা ছাড়া তখন লোকজনও ছিল ঢের—আমি ব্যাপারটা কি দেখবার অবসরই পাই নি।'

যতীনের কণ্ঠস্বরটা যেন কিছুতেই সহজ হয় না, আশ্চর্য! সে ওপাশের টেবিলটার একটা পায়ার দিকে চাহিয়া কেমন যেন একরকম আলগা ভাবে কহিল, 'ওঁর যখন হয় তখন এমনিই হয়—ভীষণ ব্যাপার!···থাকেও তিন-চার দিন—'

ইন্দ্রাণী জবাব দিল না। উত্তর দিবার মত কোন কথাও সে খুঁজিয়া পাইল না। দুজনেই আবার খানিকটা চুপচাপ বসিয়া রহিল। তাহাদের সহস্র গল্পের উৎস যেন আজ একেবারেই শুকাইয়া গিয়াছিল। কথা কহিতে পারে না, কহিতে গেলে নিজের কণ্ঠস্বর নিজেদের কাছেই কেমন বিকৃত শোনায়। ইহার কারণটাও তাহারা ভাবিতে চাহে না, মনের অবচেতন অবস্থায় কিসের একটা ভয় চৈতন্যের দ্বারকে রাখে বন্ধ করিয়া।

একটু পরে যতীনের দৃষ্টিটা ঘরের তুচ্ছতম বস্তুগুলিতে ঘুরিয়া আসিয়া এক সময়ে পুনরায় ইন্দ্রাণীর উপর পড়িল। এতক্ষণ পরে সে কথা কহিবার একটা বিষয় পাইল, কহিল, 'তোমার হাতে অত জল কেন ? হাত ধুয়ে এলে নাকি ?'

ইন্দ্রাণী অপ্রস্তুতভাবে হাসিয়া কহিল, 'জল নয়, ঘাম।'

সহসা যতীন তাহার বাঁ-হাতখানা টানিয়া লইয়া চোখের সামনে ধরিল, 'ইস—হাতের তেলো এত ঘামছে তোমার ?···এখনও তো তবু গরম পড়ে নি—'

বস্তুত শুধু হাত নয়, ইন্দ্রাণীর সর্বাঙ্গ দিয়া তখন ঐ ভাবে ঘাম ঝরিতেছিল। তাহার জন্য সে মনে মনে লজ্জা অনুভব করিলেও কোন উপায় ভাবিয়া পাইতেছিল না। মৃদুকণ্ঠে কহিল, 'কে জানে, আজ এত গরম বোধ হচ্ছে কেন।··· চলুন, না হয় দালানে গিয়ে বসি—'

যতীন সে কথার কোন জবাব দিল না। ইন্দ্রাণীর হাতখানাও ছাড়িল না. নিজের মুঠোর মধ্যে ধরিয়াই অন্য দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, তবে তাহার অজ্ঞাতসারেই মুঠিটা যেন ক্রমশ দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। ইন্দ্রাণীও একবার হাতখানা ছাড়াইবার সামান্যতম চেষ্টা করিয়া স্থির হইয়া রহিল, শুধু তাহার বক্ষস্পন্দন যেন আরও বাড়িয়া গেল।

যতীনের দৃষ্টি আবার চারিদিকের আসবাবপত্রে ঘুরিয়া আসিল। অবশেষে যখন আর একবার সে ইন্দ্রাণীর দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল তখন তাহার মাথার মধ্যে যুক্তি বিবেচনা সংস্কার সব যেন কেমন তাল পাকাইয়া গিয়াছে। সে বলিল, 'তুমি অসম্ভব ঘামছ ইন্দ্রাণী—'

কথাগুলো বিজড়িত-কণ্ঠের অর্ধ স্বগতোক্তি, অস্ফুট—ইন্দ্রাণী তাহা শুনিতে না পাইলেও যতীন তাহার হাত ধরিয়া ঈষৎ যে একটু আকর্ষণ করিল তাহা অনুভব করিয়া সে কতকটা যন্ত্রচালিতের মতই যতীনের দিকে একটু সরিয়া আসিল। যতীন তাহার হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া এক হাতে তাহার কোমল বাহুমূলটা চাপিয়া ধরিল, আর এক হাতে নিজের কোঁচার কাপড়টা তুলিয়া তাহার ললাট ও কণ্ঠের স্বেদরাশি মুছাইয়া দিতে গেল।

এই স্পর্শটুকুই হইল তাহার সর্বনাশের কারণ। যেটুকু জ্ঞান তাহার ছিল তাহাও লোপ পাইল। অকস্মাৎ তাহার দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় চড়িতে লাগিল এবং সেই প্রবল উন্মাদনায়, আবেগের সেই উন্মত্ত বন্যায় সমস্ত হিতাহিত বিবেচনা কোথায় ভাসিয়া তলাইয়া গেল। চোখের ও মনের সামনে অতি সুন্দর এক নারীদেহের একজোড়া সরস রক্তিম ওষ্ঠাধর মাত্র জাগিয়া রহিল। সেই মুহূর্তে পাগলের মত

সে কী কতকগুলো কথা বলিয়াছিল বা বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহা সে বা ইন্দ্রাণী কেহই শোনে নাই। ইন্দ্রাণীও সেই মুহূর্তে চেতনা হারাইয়াছিল, সহসা এক সময়ে অনুভব করিল যে প্রবল এক আকর্ষণে সে একেবারে যতীনের বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে এবং যতীন তাহার ললাটে, কণ্ঠে, ওষ্ঠে, গাত্রে, বাহুমূলে, স্কন্ধে সর্বত্র উন্মত্তের মত চুম্বন করিতেছে। সে চুম্বন তেজস্কর সুরার মত তাহার দেহের লোমকূপ দিয়া শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করিয়া তাহাকেও যেন উন্মত্ত করিয়া তুলিল।

॥ ৫ ॥

আরও মাস-তিনেক পরে একদিন সংবাদ আসিল যে রমানাথের মুক্তির দিন আগত-প্রায়। এ বাড়িতে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। সারদা দেবী কহিলেন, 'একেবারে বৌভাতের আয়োজন করে রাখো, রমা ঠিক যেমন ভাবে গিয়েছিল তেমনি ভাবেই একেবারে সেই দিনটিতে এসে পড়ুক—'

কিন্তু কেদারবাবু রাজী হলেন না। বলিলেন, 'সে আগে বাড়ি আসুক। তার শরীর কেমন আছে জানি না, সে আসুক, সুস্থ হোক—তারপর সব হবে।'

তবু চারিদিকে যেন উৎসবেরই লক্ষণ দেখা দিল। দাসী-চাকররা পর্যন্ত চঞ্চল মুখর হইয়া উঠিল। শুধু এ আনন্দে সাড়া দিতে পারিল না একমাত্র ইন্দ্রাণী, সে যেন কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে দিন দিন শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। সারদা দেবী তাহার এই অপরিসীম শুষ্কতার কোন কারণ খুঁজিয়া পান না, শুধু মনে মনে কুণ্ঠিত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের কোন ব্যবহারে সে দুঃখ পায় কিনা খুঁজিতে চেষ্টা করেন। ছেলে না মনে করে যে তাঁহারা ইন্দ্রাণীকে দুঃখ দিয়াছেন—এই তাঁহার আশঙ্কা।

আরও একজন এ বাড়িতে প্রায় দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে—সে যতীন। সারদা বারবার তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলে তবে সে আসে, বলে, 'অনেক কাজ মাসীমা। এই ক' মাস রমানাথের সমস্ত কাজে ফাঁকি দিয়েছি, সেগুলো সেরে রাখতে হবে তো!'

এবং এই অছিলাতেই অল্পক্ষণ থাকিয়া সরিয়া পড়ে। ইন্দ্রাণীর সহিত তাহার আজকাল আলাপ প্রায় হয়ই না, বরং চোখোচোখি হওয়াটাকেও যেন সে এড়াইয়া চলে। আর যতীন যত অনায়াসে মিথ্যা বলিয়া ব্যাপারটাকে সহজ করিয়া লয়, ইন্দ্রাণী ততই নিঃসংশয়ে বোঝে যে এই শ্রেণীর ছলনা তাহার পক্ষে সম্ভব নয় এবং ততই সে যতীনকে ঘৃণার চোখে দেখে।

কিন্তু তবু সেই ভয়ঙ্কর দিনটিকে ঠেকানো গেল না। চতুর্দিকের অসংখ্য লোকের আনন্দ-কোলাহল এবং মায়ের স্নেহাশ্রুর মধ্য দিয়া একদিন সকালে রমানাথ বাড়ি ফিরিল। বাবা পাগলের মত ছুটোছুটি করিতে লাগিলেন, মা বুকে চাপিয়া ধরিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন আর ইন্দ্রাণী ঘরের মধ্যে

কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

রমানাথ জেলে যেন কিছু কালো হইয়া গিয়াছে, কৃশও হইয়াছে, তবে স্বাস্থ্য তাহার খুব খারাপ হয় নাই। সে বাড়ি হইতে ছুটি পাইয়াই গ্রামটা ঘুরিয়া আসিল—কিন্তু তাহার উৎসুক চোখ সব চেয়ে যাহাকে খুঁজিতেছিল সেদিন ভোর হইতে, সেই যতীনের কোথাও দেখা পাওয়া গেল না। সে যে কেন আসে নাই সারদা দেবীর কাছে প্রশ্ন করিয়া তাহার কোন সদুত্তর মিলিল না। তিনি একটু ভাবিয়া কহিলেন, 'তার যেন এদানী কি হয়েছে খোকা, আসেও না তেমন, তাছাড়া যেন কেমন মন ভার করে করে থাকে—'

কিন্তু 'তেমন না আসা' আর প্রিয়তম বন্ধুর প্রত্যাবর্তনের দিনটিতে না আসায় অনেক তফাৎ। রমানাথ বিস্মিত না হইয়া পারিল না। যতীনের মাকেও সে প্রণাম করিতে গিয়াছিল, তিনিও অবাক হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'সে কি রে? তোর ওখানে যায় নি? আমি তো ভোরে উঠে আর তাকে বাড়িতে দেখি নি, শেষ রাত্তিরেই উঠে কোথায় বেরিয়েছে। আমি ভাবলুম যে তোকে এগিয়ে আনতে সদরেই গেছে—'

অর্থাৎ কিছুই বোঝা গেল না। রমানাথ তবুও প্রথমটা মনে মনে আশা করিয়াছিল যে, সে হয়তো ভোরের ট্রেনে কলিকাতা গিয়াছে, প্রচুর ফুল-টুল আনিয়া একটা নাটক করিবে নয়ত কাগজে ছবি ছাপিবার জন্যই খবরের কাগজের অফিসে অফিসে ঘুরিতেছে। কিন্তু প্রভাত যখন ক্রমশঃ মধ্যাহ্ন এবং মধ্যাহ্ন অপরাহ্নে ঢলিয়া পড়িল তবু যতীনের দেখা পাওয়া গেল না, তখন রমানাথ চিন্তিত না হইয়া পারিল না। যতীনের বাড়ি হইতেও দুবার খোঁজ করিয়া গেল, তাঁহারাও ভাবিতেছেন।

রমানাথ অপ্রসন্ন মুখে কহিল, আমার বরাতই এমনি। ও হতভাগাটা শেষ মুহূর্তে এমন ডোবাবে তা কে ভেবেছিল! চিরদিনই সমানে গেল, বুদ্ধি-সুদ্ধি বলে আর কিছু হল না ওর! আজকের দিনটাতেই—আশ্চর্য!

অথচ, সেদিন ফুলশয্যা বন্ধ করা যায় না কিছুতেই। বৌভাতের খাওয়ানোটা স্থগিত রহিল ভাল করিয়া আয়োজন করিবার অপেক্ষায়, কিন্তু ফুলশয্যাটা সেদিন কোনমতে সারিতেই হইবে। পরের দিন খরবার—পুরোহিত বিধান দিলেন, তাহার পরের দিন পর্যন্ত বিলম্ব করিতে সারদা দেবীর ঘোরতর আপত্তি। তিনি আর ভাগ্যকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নন।

তাড়াতাড়ি আশেপাশের বাড়ির দুই-একটি এয়োস্ত্রী বা সধবা মহিলাকে সংবাদ দেওয়া হইল। ফুল নিজেদের বাগান হইতেই তোলা হইল প্রচুর। কোনমতে নিয়ম-কর্ম সারা হইবে স্থির হইল—উৎসবের সময় নাই।

যতীনের জন্য যতই মন খারাপ হউক, তাহার অভাব আগামী স্মরণীয় ঘটনার আনন্দকে যতই ম্লান করিয়া দিক, তবু রমানাথ আসন্ন শুভলগ্নটির জন্য কম্পিত বক্ষে সাগ্রহ-প্রতীক্ষা না করিয়া পারে না। বিবাহ-রাত্রির সেই শুভ দৃষ্টির স্মৃতিটা স্পষ্ট থাকিলেও ছবিটা মনের মধ্যে ঝাপসা হইয়া গিয়াছিল, অনেক চেষ্টা করিয়াও

আর সে মনে করিতে পারিত না—সুতরাং এখানে আসিয়া সহসা যেন নূতন করিয়া সে ইন্দ্রাণীকে দেখিল। দেখিবার পর বরং প্রথম দর্শনের ছবিটা কিছু কিছু মনে পড়িল। না, চেহারা তখনকার চেয়েও সুন্দর হইয়াছে। মুখের ভাবটা যেন কিছু ম্লান—সে কি এই দুর্ভাগ্যের জন্য পাছে রমানাথ তাহাকেই দায়ী করে, সেই আশঙ্কায় ?

রমানাথ আপন মনেই হাসিয়া উঠিল। ছেলেমানুষ আর কাহাকে বলে !…

অবশেষে সেই পরম-মুহূর্তটি আসিল। সমাগতা বধূদের হাস্য-পরিহাস এবং কোলাহলের মধ্য দিয়া নিয়ম-কর্মগুলি সারা হইয়া গেল। ঠিক উৎসব-বাড়ি না হইলেও, জনকতকের জন্যও অন্তত আহারের আয়োজন করিতে হইয়াছিল, সকলকার খাওয়া শেষ করিয়া নিয়মকর্ম সারিতে রাত্রি বারোটাই বাজিল। সারদা দেবী বাহির হইতে হাঁক দিয়া কহিলেন, 'ওলো তোরা বাইরে আয়. বাছাদের ঘুমোতে দে। খোকা আমার ছ মাস বাড়ি ছাড়া, বিছানা কেমন তা ভুলেই গেছে—'

তরুণী আত্মীয়াদের উদ্যত রসনা প্রতিবাদের জন্য প্রস্তুত হইয়াই সহসা থামিয়া গেল। সত্যই, সাধারণ নব-দম্পতিদের সহিত ইহাদের তুলনাই হয় না যে ! শেষে দুই-একটি লঘু পরিহাসের পর সকলেই বিদায় লইলেন। রমানাথ দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল—এ বাড়িতে আড়ি পাতিবার মত কেহই নাই, মস্ত সুবিধা।

কিন্তু এইবার পরিপূর্ণভাবে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রমানাথ সহসা যেন একটু বিস্ময় বোধ করিল। ইন্দ্রাণী বিছানা হইতে নামিয়া গিয়া ওপাশের রুদ্ধ জানালার কাছে দাঁড়াইয়াছে। তাহার মুখে আসন্ন মিলনের এতটুকু আনন্দাভাস নাই, সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন সে মুখ—মার্বেল পাথরের মতই বিবর্ণ এবং কঠিন।

রমানাথ কেমন যেন বিব্রত বোধ করিল। ফুলশয্যার অভিজ্ঞতা তাহার নাই সত্য কথা, প্রথম বিবাহের পূর্বে কাহারও পক্ষে থাকা সম্ভব নয়—কিন্তু বন্ধুদের অভিজ্ঞতা তো খুঁটিনাটি তথ্য-সমেত বহুবারই শুনিয়াছে, তা ছাড়া বইও সে কম পড়ে নাই। সে সব অভিজ্ঞতা হইতে মনের মধ্যে যে ছবি প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার সহিত ইহার মিল কোথায় ? নবীন আশা ও সুখের অঞ্জন কই সে আয়ত নেত্রে ? লজ্জার অপরূপ রক্তিমাই বা কোথা গেল ? আশা ও আশ্বাসের সে অপূর্ব বর্ণচ্ছটা ?

তবুও রমানাথ ভুল বুঝিল। ভাবিল এ ভয়। ইন্দ্রাণীর জীবনে যে অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল, এই বয়েসের মধ্যে বোধ হয় কল্পনা করাও সম্ভব নয়। সে মৃদু হাসিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দুই হাতে তাহার ডান হাতখানি ধরিয়া অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে কহিল, 'ইন্দ্রাণী ভয় পেয়েছ ?'

মনে হইল যেন ইন্দ্রাণী একবার থর্‌-থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার হাত যে বরফের মতই ঠাণ্ডা। স্বেদ-সিক্ত হাত ঠাণ্ডা হয় বটে, কিন্তু আসন্ন প্রিয়-মিলনের উত্তেজনায় হাত ঘামিলেও তো তাহার উষ্ণতা যায় না। সে ভাল করিয়া ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে চাহিল, তাহার ললাট, কণ্ঠ, এমন কি কাঁধও, যতটা

ব্লাউজের অবসরে উন্মুক্ত আছে, সবটাই ঘামে ভাসিয়া যাইতেছে। গরম আছে সত্য-কথা, তবে এত গরম নাই। এমনই বা কি ভয়!

সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিল, 'ইন্দ্রাণী তোমার কি শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে?'

ওপক্ষ হইতে কোন উত্তর নাই, বরং ইন্দ্রাণী হাতখানা ধীরে ধীরে রমানাথের অঞ্জলির মধ্য হইতে টানিয়া লইল।

এবার রমানাথ বিপন্ন বোধ করিল। বধূর বর্ণহীন মুখের স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার ভয়ও হইল—মূর্ছা হইবে না তো? একবার ভাবিল মাকে ডাকে, পরক্ষণেই কুটুম্বিনী ও প্রতিবেশিনীদের বিদ্রূপখর-রসনা স্মরণ করিয়া থামিয়া গেল।...অথচ করাই বা যায় কি?...

শেষ পর্যন্ত সে প্রায় মরিয়া হইয়া উঠিয়া জোর করিয়া ইন্দ্রাণীর হাত ধরিয়া খাটের উপর আনিয়া বসাইল। কহিল, 'হাওয়ায় এসে একটু বসো দেখি? উঃ—যা ঘামছ, এখনই অজ্ঞান হয়ে যাবে যে!'

কিন্তু ইন্দ্রাণী বোধ হয় এক মুহূর্তের বেশী খাটের উপর বসিল না, সে জোর করিয়া নামিয়া খাটের একটা পায়া জড়াইয়া শিয়রের দিকের কোণে মেঝেতে বসিল।

রমানাথ এবার যেন একটু বিরক্তি বোধ করিল। লজ্জা বা ভয়ের একটা মাত্রা থাকা প্রয়োজন তো! তবু প্রাণপণে নিজেকে দমন করিয়া কহিল, 'তুমি অমন করছ কেন রাণী? বলো আমাকে কেন ভয় পাচ্ছ!'

সেও নামিয়া ইন্দ্রাণীর পাশে আসিয়া বসিল।

এবার যেন মনে হইল, প্রাণপণ চেষ্টায় ইন্দ্রাণী কণ্ঠে স্বর আনিল। কহিল, 'আ-আপনি আমাকে ছোঁবেন না!'

'আপনি'ই যথেষ্ট—তাহার উপর 'ছোঁবেন না' শব্দে রমানাথের যেন সমস্ত রক্ত নিমেষে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সে ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, 'ছোঁব না পর্যন্ত? কেন, জেলে গেছি বলে?'

ইন্দ্রাণীর মাথা আরও নত হইল কিন্তু এবারে যে মনকে কঠিন করিয়া ফেলিয়াছে। আপ্রাণ চেষ্টার ফলে তাহার কণ্ঠস্বর কেমন যেন বিকৃত শোনাইল, তবু সে বলিল, 'আমার হয়তো আত্মহত্যা করাই উচিত ছিল কিন্তু পারি নি। এখন যদি আপনি হুকুম দেন তো তাই করব!'

রমানাথ বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া শুধু ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মাথা খারাপ হইয়াছে, না ইন্দ্রাণীর? অনেকক্ষণ পরে সে কোনমতে প্রশ্ন করিল, 'এ সব কি বলছ রাণী? ছিঃ, এমন দিনে ওসব কথা মুখে উচ্চারণ করতে আছে!'

কেমন একটা আচ্ছন্নভাবে, তেমনি অশ্রুবিকৃত কণ্ঠেই ইন্দ্রাণী বলিয়া চলিল, 'বলা আমার উচিত নয় জানি, আপনাকে এমনভাবে আঘাত করার আগেই আমার মরে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কিছুতেই পারি নি।...কদিন ধরেই ভাবছি—কিছু কূল-কিনারা পাচ্ছি না।...কী করব?'

অধীর কণ্ঠে রমানাথ জবাব দিল, 'কী বলছ মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না যে! ...কেন এমন করছ তাও জানি না।...আমাকে কি তোমার পছন্দ হয় নি?... আমি তোমাদের কথা ভাল করে বুঝতে পারি না। মেয়েদের সঙ্গে বেশী মেশবার তো আমার সুযোগ হয় নি।'

কয়েক মুহূর্ত ইন্দ্রাণী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। চারিদিক নিস্তব্ধ, দেওয়ালের উপর বড় ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ মাত্র পাওয়া যাইতেছে—আর দুজনের বক্ষ-স্পন্দনের শব্দ শুধু। সে দিকে কান পাতিয়া থাকিয়া রমানাথের যেন মনে হইল কয়েক যুগ কাটিয়া গেল।

অবশেষে ইন্দ্রাণী কথা কহিল। আরও শুষ্ক, আরও বিকৃত-কণ্ঠে ইন্দ্রাণী বলিল, 'কী বলতে হবে তা আমিও জানি না। কিন্তু আমি—আমি আর আপনার উপযুক্ত নেই—আমার মুখ দেখাও আপনার পক্ষে পাপ!'

তবু রমানাথ বুঝিল না। একবার মনে হইল—এ কী পরিহাস? ইন্দ্রাণী কি তাহাকে পরীক্ষা করিতে চায়?

সে ঈষৎ আশান্বিত ভাবে ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু সে মুখ তখনও সাদা পাথরের মতই বিবর্ণ এবং যেটা সে এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, দুই চোখের কোলে গাঢ় কালিমা। ইহার মধ্যে পরিহাসের সে কৌতুকচাপল্য কোথায়?...

রমানাথ আবারও ভাল করিয়া চাহিল। ইন্দ্রাণীর সুন্দর মুখখানি এখনও তেমনি সুন্দর, সুন্দরশুভ্র ললাটে সযত্ন-রচিত কবরী হইতে খসিয়া আসা একটি-দুটি স্বেদসিক্ত চূর্ণ কুন্তলের মধ্যে সিন্দুর-বিন্দুটি তেমনি উজ্জ্বল, অনাবৃত সুডৌল কণ্ঠে তেমনি মোহ এখনও—সেদিকে চাহিয়া খারাপ কিছু, অমঙ্গলকর কিছু বিশ্বাস করা কঠিন। রমানাথও পারিল না, সে উজ্জ্বল চোখে কৌতুক ভরিয়া কহিল, 'তুমি মানুষকে আচ্ছা নাচাতে পার রাণী, চলো—শোবে চলো—'

সে জোর করিয়া ইন্দ্রাণীর একটা হাত ধরিয়া টানিল। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার পায়ের কাছে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া যেন চাপা একটা আর্তনাদের সুরে বলিয়া উঠিল, 'আমি, আমি কিছুতে বলতে পারছি না যে! কিন্তু তবু বিশ্বাস করুন, এ সত্যি, সত্যি! আমি আর জীবনে কোন দিন আপনার পাশে শুতে পারব না।'

এতক্ষণ পরে রমানাথের মনে হইল কোথা দিয়া কী করিয়া যেন আসল কথাটার আভাস সে পাইয়াছে। একটা নিদারুণ শৈত্য, একটা মর্মান্তিক অথচ অবিশ্বাস্য আঘাত তাহার সমস্ত চৈতন্যকে, সমস্ত দেহ-মনকে যেন অনড় অবশ করিয়া দিয়া গেল। সে বিহ্বল, আচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলিয়া ভূলুণ্ঠিতা বধূর দিকে চাহিয়া রহিল শুধু—অনেক চেষ্টাতেও সেই আবছায়া সর্বনাশা সন্দেহটাকে মনের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া ধারণা করিতে পারিল না। এসব কি?...না, না, সে কোনমতে সম্ভব নয়!

খানিকটা পরে সে পাগলের মত ইন্দ্রাণীর কাঁধটা ঝাঁকি দিতে লাগিল, 'এসব

কি বলছ রাণী, বলো বলো—যে এর এক বর্ণও সত্যি নয়—বলো বলো, তুমি তামাশা করছ ?'

এবার ইন্দ্রাণী উঠিয়া বসিল। তাহার চোখে জল নাই, কাঁদিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু পারে নাই। যেদিন হইতে সে নিজের সর্বনাশের পরিমাণ বুঝিতে পারিয়াছে সেদিন হইতেই তাহার চোখে জল নাই। যে অপরিসীম দাহ সে অন্তরের মধ্যে দিনরাত অনুভব করিতেছে সেই প্রলয়ঙ্কর বহ্নিই যেন তাহার সমস্ত চোখের জল নিঃশেষে শুষিয়া লইয়াছে। তাহার আরক্ত শুষ্ক চক্ষু একবার যেন ব্যাকুলভাবে কী একটা অসম্ভব আশা লইয়া রমানাথের দৃষ্টিতে আসিয়া মিলিল, তাহার পরই সে মাথা নত করিয়া জবাব দিল, 'আপনাকে না বলিলেই হয়তো ভাল হ'ত—সে কথাও ভেবেছি অনেকবার, কিন্তু আপনার সব কথা শুনে আপনাকে এমন করে ঠকাতে পারলুম না কিছুতেই—'

কথাগুলি বলিল সে অনেক চেষ্টায়, অনেকবার থামিয়া, দম লইয়া। যেন সে হাঁপাইতেছিল। কিন্তু রমানাথের সেদিকে মন ছিল না, সে অবাক হইয়া চাহিয়াছিল ইন্দ্রাণীর পানে—সে মুখ দেখিয়া তাহার কথাগুলো অবিশ্বাস করা কঠিন, বিশ্বাস করা আরও কঠিন। সে চাহিয়াছিল, কেমন একটা নির্বোধ দৃষ্টিতে —সত্যের সামান্য যে অংশটুকু সে বুঝিতে পারিয়াছে, সেইটুকুর আঘাতই তাহার চৈতন্যকে যেন জড়, অবসন্ন করিয়া দিয়া গিয়াছে—বেদনাবোধের শক্তিও তাহার নেই।

শুধু তাহাই নয়—হঠাৎ যেন কতকগুলি বহুদিনের ভুলিয়া যাওয়া ছবি তাহার চোখের সামনে দিয়া ভাসিয়া গেল—যে সব চিত্রের সহিত, যে সব স্মৃতির সহিত আজিকার এ ঘটনার কোন যোগাযোগ নাই। তাহার ছেলেবেলাকার সব কথা, তাহার কলেজ-জীবনের কত অর্থহীন ছোট ছোট ঘটনা, সম্প্রতিকার জেল-খানার অভিজ্ঞতা—আরও কত কি ?···সে কি পাগল হইয়া যাইবে নাকি ? রমানাথ একবার কপালের উপর জোরে দুইটা আঙ্গুল ঘষিয়া দিয়া নিজের আচ্ছন্ন ধারণাশক্তিকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিল।

অনেক, অনেকক্ষণ বাদে যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া সে জাগিয়া উঠিল। না, স্বপ্ন নয়, তন্দ্রা নয়—এমন কি বোধ হয় তামাশাও নয়। ঐ তো ইন্দ্রাণী পাষাণের মত ভাবহীন বিবর্ণ মুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে !

সে আর্তস্বরে ডাকিয়া উঠিল, 'ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রাণী, শুনছ—আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না। এ মিথ্যা—কি বল, মিথ্যা না ? বলো, বলো—উঃ, আমি যে আর সইতে পারছি না !'

কিন্তু ইন্দ্রাণী তবু স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল।···রমানাথ কথা বলিতে বলিতেই ইন্দ্রাণীর মুখের কাছে মুখ আনিয়া ব্যগ্র ব্যাকুল চোখে তাহার দিকে চাহিয়াছিল। যেন সে তাহার মুখের কঠিন আবরণ তীক্ষ্ন দৃষ্টির আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া সত্যটাকে দেখিতে চায়। বোধ হয় সেটাকে মিথ্যা প্রমাণ করিতেও চায় সে ! কিন্তু কিছুই হইল না, ইন্দ্রাণীর ভাবলেশহীন মুখে সে নিজের সর্বনাশের

আভাসই দেখিতে পাইল শুধু!

সে পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল কিন্তু সে-ও মুহূর্তের জন্য। অকস্মাৎ আর একটা অত্যন্ত বীভৎস সন্দেহ এতক্ষণ পরে মনে জাগিয়া উঠিতে যেন সে বিদ্যুৎপৃষ্টের মত তীব্র যন্ত্রণায় লাফাইয়া উঠিল। না, না—সে কি সম্ভব! সে নামিয়া আসিয়া আর একবার ইন্দ্রাণীর একটা বাহুমূল ধরিয়া ঝাঁকি দিতে দিতে বলিল, 'তা হ'লে সেই জন্যই কি যতীন গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে, সেই জন্যই কি আমার সঙ্গে দেখা করতে এল না? শিগ্‌গির, শিগ্‌গির জবাব দাও—এক সেকেণ্ড দেরি হলে তোমাকে নখে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব আমি! বল—আমাকে সর্বনাশের সবটা শুনতে দাও—'

ইন্দ্রাণী মাথাটা আর একটু নত করিয়া কোন মতে শুধু বলিল, 'হ্যাঁ।'

তাহার পর, মনে হইল যেন পূর্বেকার একটা সংকল্প মনে করিয়াই, প্রাণপণ চেষ্টায় আর কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করিল—'কিন্তু সে আমারই দোষ।'

গত কয়েকদিন ধরিয়া যতীনের শুষ্ক মুখ ও কোটরগত চক্ষু দেখিয়া ঘৃণায় সে বারবার এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে সমস্ত অপরাধের বোঝা নিজের উপরই তুলিয়া লইবে সে—কাহাকেও দায়ী করিবে না!

সেদিকে অবশ্য তখন রমানাথের কান ছিল না। সে স্খলিত পদে কোনমতে গিয়া আবার বিছানাতেই বসিয়া পড়িল। তাহার মনে হইতেছিল বাতাস যেন কোথাও নাই—সমস্ত প্রকৃতি দম বন্ধ হইয়া মরিয়া যাইবে। সে উদ্‌ভ্রান্তভাবে চারিদিকে চাহিল, জানালা খোলাই আছে, বাতাসও একটু আছে বোধ হয়, নহিলে খাটের সহিত বাঁধা রজনীগন্ধার শীষ ও গোলাপের ডালগুলি দুলিবে কেন!...

কতক্ষণ নীরবতার মধ্য দিয়াই কাটিল। চারিদিকের অসংখ্য পুষ্পস্তবক নীরবে গন্ধ বিতরণ করিতে লাগিল, বিস্তৃত খাটের উপর শুভ্র সুন্দর শয্যা বিছানোই রহিল, ছত্রিতে জড়ানো গোড়ে-মালাগুলি তেমনি দুলিতে লাগিল, শুধু যাহাদের এই সমস্ত বিলাসোপকরণ সম্ভোগ করিবার কথা, তাহারাই স্তব্ধ হইয়া নিষ্পলক নত-নেত্রে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে 'উঃ' বলিয়া একটা আর্তনাদ করিয়া রমানাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে ভগ্ন মৃদু কণ্ঠে বলিল, 'পূর্ব-জন্ম এতদিন মানতুম না। কিন্তু আজ মানছি। নিশ্চয় সমস্ত গতজন্ম ধরে শুধু পাপই করেছিলুম, নইলে এমন শাস্তি পাব কেন? বহু লোকের বহু বিয়ের কথাই শুনেছি কিন্তু ফুলশয্যার দিন হাজতে কাটিয়েছে কেউ, এমন কখনো শুনি নি।...শুধু তাই! এই অকারণ দুঃখভোগের পরও এত শাস্তি তোলা ছিল আমার জন্যে, এতবড় আঘাত! আর সে আঘাত এল কার কাছ থেকে, না একজন আমার স্ত্রী আর, আর একজন আমার—'

রমানাথের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। বেদনায় যেন মুহূর্ত-কয়েকের জন্য তাহার দৃষ্টিও ঝাপসা হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অকস্মাৎ সে ইন্দ্রাণীর সামনে

আসিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রু-বিকৃতকণ্ঠে কহিল, 'কেন, কেন তুমি আমায় এত আঘাত দিলে ? কি করেছিলুম তোমার ! ···তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করলে না কেন ? কেন তুমি সত্য বলতে গেলে ? শুধু আজকের দিনটা মিথ্যা বললে কী ক্ষতি হ'ত তোমার ? কেন আমার সমস্ত স্বপ্নকে এমনভাবে ভেঙ্গে-চুরে মাড়িয়ে দিলে—!'

মুহূর্তকয়েক যেন উত্তরের একটা বৃথা আশায় অপেক্ষা করিয়া সে আবার পায়চারি করিতে লাগিল। তাহার পর অসহায়ভাবে বিছানায় বসিয়া পড়িয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিল।···'কেন আমার এমন হ'ল, কেন ? কেন ?'

এইবার ইন্দ্রাণী আবার কথা কহিল। সে রমানাথের আঘাতের পরিমাণ মনে মনে একটা হিসাব করিয়া রাখিলেও বোধ করি এই বুকফাটা আর্তনাদের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে অত্যন্ত মৃদু, অর্ধস্ফুট কণ্ঠে কহিল, 'আমি কী শাস্তি নেব বলুন। কী হলে আমার সামান্য প্রায়শ্চিত্ত হয় বলে দিন—আমি কিছু বুঝতে পারছি না !'

অকস্মাৎ রমানাথের সজল চোখে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল, সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া কহিল, 'চুপ ! ···শাস্তি ! তোমার এতবড় পাপ, বড় অনাচারও সয়েছি কিন্তু নাটুকেপনা সইব না ! প্রায়শ্চিত্তর নাম মুখে আনতে লজ্জা বোধ হ'ল না ?··· ন্যাকামি ! অপমান করেও সুখ হ'ল না, আবার অভিনয় করতে এসেছ ?··· তোমাকে, তোমাকে একটু একটু করে পুড়িয়ে মারলেও তোমার উপযুক্ত শাস্তি হয় না, তা জানো ? অকারণে আমার যে সর্বনাশ তুমি করলে, কোন সংহিতায় তার কোন প্রায়শ্চিত্ত লেখা নেই ! আবার কথা কইছ !'···

মনে হইল দুঃসহ রোষে যেন সে ইন্দ্রাণীকে আঘাতই করিয়া বসিবে। প্রাণপণ চেষ্টায় সে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইল বটে কিন্তু উত্তেজনা সহজে গেল না। সে পায়চারি করিতে করিতেই চাপা রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, কী প্রায়শ্চিত্ত করবে ? হয় আত্মহত্যা করবে, নয়তো কিছুই না করে বাপের বাড়ি গিয়ে বসবে—এইতো ? কিন্তু তাতে আমার কি লাভ হবে বলতে পার ? যাই কর না কেন—মা-বাবার মুখে কলঙ্ক লেপে দেবে। আমার হয়তো এ আঘাতও সহ্য হবে, কিন্তু মা-বাবা এই বুড়ো বয়সে যদি এই সব শোনেন কিংবা তাঁদের নাম জড়িয়ে এই সব কলঙ্ক রটনা হয় তো তাঁরা বাঁচবেন ভেবেছ ?···না, সে আঘাত পেতে তাঁদের আমি কিছুতে দেব না—কিছুতে না !'

ইন্দ্রাণীর মুখ আরও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে মাথা নত করিতেও ভুলিয়া গেল, কেমন যেন অবাক হইয়া রামানাথের হিংস্র জ্বলন্ত দৃষ্টির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। রমানাথও এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া হাঁপাইতেছিল— সে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে তখন চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে কয়েকটি জোনাকি জ্বলিতেছে শুধু—বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে হেনার গন্ধ। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রকৃতি যেন মানুষের জন্যে অপূর্ব শান্তি ভরিয়া রাখিয়াছেন। সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া আবার রমানাথের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে সেই হিমশীতল জানালার গরাদেতে উত্তপ্ত ললাট চাপিয়া

ধরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এই ভাবেই বহুক্ষণ কাটিল। কতক্ষণ, সে হিসাব রাখা সম্ভব নয়—বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে এক সময়ে রমানাথের চমক ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখিল পূর্বদিক অনেকখানি ফরসা হইয়া গিয়াছে—গাছের ডালে ডালে পাখীর সাড়া পড়িয়া গিয়াছে ইতিমধ্যেই। সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। ততক্ষণে নিজেকে সে সংযত করিয়া লইয়াছে। আঘাত যত বড়ই হউক, ভিতরে ভিতরে নিঃশব্দ দহনে যতটাই পুড়িয়া যাক্—বিচলিত আর সে হইবে না। নিজের কর্মপন্থাও সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে। পুরুষ মানুষ সে, পুরুষের মতই সহ্য করিবে—অন্তত সে শিক্ষাই এতদিন সে পাইয়াছে। অধীরতা প্রকাশ করা তাহার পক্ষে লজ্জার কথা।

সে নতমুখী ইন্দ্রাণীর দিকে চাহিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, 'আমার মন আমি ঠিক করেছি। আমি চাকরি নিয়ে আজ-কালের মধ্যেই বিদেশ চলে যাব। তোমাকে এখানেই থাকতে হবে। যেমন আছ তেমনি থাক—। তোমার সঙ্গে একই বাড়িতে থাকা যেমন আর সম্ভব নয়, তেমনি তুমি আমার পৈতৃক ভিটেতে আছ, আমার বাপ-মায়ের সেবা করছ, এ চিন্তাও অসহ্য! কিন্তু কি করব, এসব কথার সামান্য মাত্র আভাসেও তারা এত আঘাত পাবেন যে সত্যটা কোন দিনই তাঁদের জানানো চলবে না। এই বুড়ো বয়সে তাঁদের এতবড় আঘাত করা বা তাঁদের মাথার ওপর এতখানি কলঙ্ক তুলে দেওয়ার অধিকার তোমার আমার কারুর নেই। আমার সর্বনাশ তুমি করেছ, কিন্তু আমার বংশকে, আমাদের সুনামকে পাঁকে ডোবাতে দেব না কিছুতেই—'

ব্যবস্থাটা এতই অবিশ্বাস্য, এত অপ্রত্যাশিত যে ইন্দ্রাণীর ক্লান্ত মস্তিষ্কে কথাটা ঢুকিতে কিছু বিলম্ব হইল। সে মুহূর্ত-কয়েক স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবার পর সহসা মাথা তুলিয়া ব্যাকুলভাবে কী যেন বলিতে গেল। বোধ হয় দুই-একটি শব্দও সে উচ্চারণ করিয়াছিল, কিন্তু রমানাথ ঈষৎ রূঢ় কণ্ঠেই একটা চাপা ধমক দিয়া উঠিল। কহিল, 'চুপ!···কথা বলবার সমস্ত অধিকার তুমি হারিয়েছ, মনে রেখো। ভেবেছ যে কোথাও পালিয়ে গিয়ে কিংবা আত্মহত্যা করে তুমি বাঁচবে আর তোমার সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমরাই করব বসে বসে, না?···তুমি একটু আগে নাটক করে শাস্তি চাইছিলে না, বেশ মনে কর এইটেই তোমার শাস্তি—!'

কথা কয়টা শেষ করিয়া রমানাথ আর কোনদিকে না চাহিয়াই বাহির হইয়া গেল।

॥ ৬ ॥

ইন্দ্রাণী এ কয়দিনে মনে মনে যত রকম প্রায়শ্চিত্ত, যত রকম শাস্তির কথা চিন্তা করিয়াছে, তাহাতে নিজের কল্পনায় যতটা কঠোরতা ভাবা সম্ভব সবটাই জুড়িয়া

দিয়াছিল। কিন্তু সর্বপ্রকার দৈহিক লাঞ্ছনা বা প্রকাশ্য-অপমান-বর্জিত এই অদ্ভুত শাস্তির কথা সে কখনও ভাবিতে পারে নাই। এ কি হইল? যে সম্মান, যে আদর সে এখান হইতে পাইবে তাহার অসারতা কি প্রতিনিয়ত, প্রতি মুহূর্তে তাহাকে বিদ্রূপ করিবে না! মিথ্যার অকূল সমুদ্রের মধ্যে এ কি তাসের দ্বীপ গড়িয়া উঠিল তাহার!…আর সবচেয়ে বড় কথা তাহার স্বামী, তাঁহার সহিত কথা কওয়া যাইবে না, পরস্পরকে প্রীতি বা প্রেমের একটা কথাও জানানো যাইবে না—অথচ লোকে জানিবে যে সে তাহার স্বামীর প্রিয়তমা। এত বড় মিথ্যা সে সহিবে কেমন করিয়া? তা ছাড়া, তা ছাড়া হয়তো—স্বামীকে কোনরূপ সেবা করিতে পারিবে না, এমন কি হয়তো ঘৃণায় তাহার হাতে জল পর্যন্ত খাইবেন না—না, না, সে কিছুতেই হয় না, এমন করিয়া সে থাকিতে পারিবে না।

উত্তেজিতভাবে ইন্দ্রাণী উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িয়া গেল—'থাকিতে পারিব না' একথা বলিবার অধিকার আজ তাহার নাই। সে অপরাধিনী, দণ্ড মাথা পাতিয়া লইবারই কথা তাহার, শাস্তি ভালই হইল কি মন্দ হইল, সুবিধাজনক হইল কিম্বা অসুবিধাজনক হইল, সে বিচার তাহার সাজে না। বিচারক রায় দিয়া গিয়াছেন—এখন শুধু সে শাস্তি প্রাণপণে বহন করিবারই কথা তাহার।

উপায় অবশ্য আছে, মানুষ মৃত্যুর উপর কোন কর্তৃত্বই খাটাইতে পারে না, আত্মহত্যা করার পথ তো তাহার খোলাই থাকিবে চিরদিন। সে পথে ইন্দ্রাণী যাইবে না। রমানাথ সত্য কথাই বলিয়াছে—বিনা অপরাধে অকারণে তাহার অনেক সর্বনাশ করিয়াছে ইন্দ্রাণী, তাহার উপর কলঙ্কের কালি আর তাহার মুখে লেপিয়া দিবে না। বিশেষত বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ী—বধূর আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করিয়া যে সব দুর্নাম ও কাহিনী চারিদিকে রচিত হইবে—সেই অপমানের বোঝা তাঁহাদের মাথায় চাপিয়াছে, ইন্দ্রাণী তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। না, যাহা হইবার হউক, শাস্তি যত কঠিন হয় হউক—সে সমস্তই সহ্য করিবে। রূপ, বিদ্যা, বুদ্ধি, সম্পদ, যশ, বাপ-মা-বন্ধু-বান্ধবদের স্নেহ—এককথায় পুরুষমানুষের যাহা কিছু কাম্য থাকিতে পারে রমানাথের সবই ছিল, তবু জীবনের মধুরতম মুহূর্তে, যখন সুখের পাত্র পূর্ণ করিয়া পান করার কথা তাহার তখনই ইন্দ্রাণী যে নিজের অমার্জনীয় দুর্বলতায় সে পাত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে, তাহা, বয়স যতই অল্প হউক তাহার, সে ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। হয়তো সেদিন, ফাল্গুনের সেই আবেশ-বিহ্বল সন্ধ্যায়, চরম সর্বনাশের পরিণামটা বুঝিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না, সেদিন হয়তো আঠারো বছর বয়সের মাদকতাটাই হইয়া উঠিয়াছিল তাহার কাছে সব চেয়ে বড় কথা—কিন্তু তবু নিজের অন্যায়টা বুঝিবার মত জ্ঞান বা বয়স তাহার হয় নাই একথা আজ আর সে কাহারও কাছেই বলিতে পারিবে না, নিজের কাছে তো নয়ই! বোধ হয় সাতটি কি আটটি দিন মনে নেশা ছিল, চোখে ছিল রং—তাহার পরই নিজের অপরাধের গুরুত্ব সে বুঝিয়াছে। তারপর কত কান্নাই কাঁদিয়াছে সে, কত বিনিদ্র-রজনীতে কঠিন মেঝেতে বারবার মাথা ঠুকিয়াছে, বারবার নিজেকে অভিসম্পাত করিয়াছে, কিন্তু জীবনের যে সুযোগ চলিয়া গিয়াছে তাহা

আর ফিরাইয়া আনিবার পথ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই !

হয়তো স্বামীকে প্রতারণা করা চলিত—এমন অনেকেই করে, তাহা সে শুনিয়াছে। মিথ্যা বলিতে হইত না, পদস্খলনের সামান্য ইতিহাসটি শুধু চাপিয়া গেলেই চলিত। তাহা হইলে আর দুটি জীবন এমন করিয়া ব্যর্থ হইয়া যাইত না। অন্ততঃ রমানাথের জীবনের স্বচ্ছন্দ গতি কোথাও ব্যাহত হইত না এটা ঠিক—ইন্দ্রাণীর মানসিক অবস্থা সে প্রতারণার ফলে যেমনই দাঁড়াক। আজ যাহা করিল, তাহার ফলও সে জানে। রমানাথের জীবনের একটা দিক, আনন্দ ও উপভোগের দিক চিরকালের মত মরিয়া গেল। হয়তো ইহার পর সে অন্য স্ত্রীলোকে আসক্ত হইতে পারে, পুনরায় বিবাহ করাও আশ্চর্য নয়, কিন্তু প্রথম যৌবনের এই আবেগ-থর-থর স্বপ্ন, এই আবেশ আর সে ফিরিয়া পাইবে না। এ সবই ইন্দ্রাণী জানিত, এমন কি আরও সাংঘাতিক যে সন্দেহটা ইদানীং তাহার মনে দেখা দিয়াছে, সে সন্দেহ সত্যে পরিণত হইলেও হয়তো তাহার মিথ্যা চিরদিনই নিজের অন্তঃসার-শূন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকিত,—তত বড় প্রবঞ্চনাও চালাইয়া দেওয়া যাইত—এমনতর ইতিহাসও তাহার এই অল্প বয়সেই সে একাধিক শুনিয়াছে। কিন্তু তবু সে কিছুতেই সামান্য ঐটুকু মিথ্যাচরণ করিতে পারে নাই। তাহার যে আদর্শনিষ্ঠ পিতামহের কাছে সে ছেলেবেলায় মানুষ হইয়াছে, তাঁহার প্রধান শিক্ষাই ছিল ঐ –মিথ্যা বলার চেয়ে মিথ্যা আচরণ বেশী আত্মাবমাননাকর। তা ছাড়াও যে প্রেম, যে চুম্বন, যৌবন ও সৌন্দর্যের যে স্তুতি তাহার প্রাপ্য নয়, দিনের পর দিন স্বামীর কাছ হইতে সেই অর্ঘ্যই তাহাকে মিথ্যা জানিয়াও হাসি-মুখে গ্রহণ করিতে হইবে—এ চিন্তা সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারে নাই। দিনে দিনে মিথ্যার প্রাসাদ অভ্রংলিহ হইয়া উঠিবে, তাহার বোঝা প্রতিনিয়ত নিষ্পেষিত করিবে তাহাকে, তবু কোন দিনই সে মুখ ফুটিয়া স্বামীকে বলিতে পারিবে না যে, 'ওগো আগাগোড়াই আমি তোমাকে ঠকিয়েছি, তুমি যা মনে করে এত ভালবাসছ আমাকে, আমি তা নই !'···এ কল্পনাও অসহ্য। সেই জন্যই এমন দিনটিতেও এত বড় আঘাত রমানাথকে দিতে পারিয়াছিল সে !

কিন্তু এ কি হইল ! যেটা সব চেয়ে অসহ্য হইবে বলিয়াই সে অকারণে এত দুঃখ দিল এবং লইল—সেইটাই কি বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাসে আবার শাস্তি-স্বরূপ তাহার কাছেই ফিরিয়া আসিল ? সেই মিথ্যা সম্মান তাহাকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে, যে স্বামী চিরদিনের মত পরস্যাপি পর হইয়া গেলেন, যাহার প্রেম তো দূরের কথা, ঘৃণা পাইবার অধিকারও বোধ হয় সে হারাইয়াছে—পৃথিবীসুদ্ধ লোক জানিবে তাঁহারই প্রিয়তমা সে ! স্বামীর সহিত অভিনয় করিতে হইবে না বটে কিন্তু পৃথিবীর বাকী সকলের সহিতই সে অহোরাত্র করিতে হইবে—এবং তাহার অপমান প্রতিনিয়ত তাহাকে কঠিন আঘাতে জর্জরিত করিবে।

ইন্দ্রাণী তাহার লজ্জা ও অগৌরবের কথাটা যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল, সে শুধু বিহ্বল ভাবে অস্থির হইয়া বারবার মনে মনে উচ্চারণ করিতে লাগিল, 'এ কী করে সইব আমি, পারব না, পারব না কিছুতেই—'

ইন্দ্রাণী যখন অবশেষে কোনমতে নিজেকে সংযত করিয়া বাহিরে আসিল তখন তাহার অপরিসীম ম্লান শুষ্ক মুখ এবং আরক্ত চক্ষু দেখিয়া সারদা ভুল বুঝিলেন। ঈষৎ হাসিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, 'যাও মা, তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিয়ে একটু কিছু জল খেয়ে নাও। কাল সারাদিন খাটাখাটুনি গেছে—একটু বিশ্রাম করে সুস্থ হও আগে—'

লজ্জায় ইন্দ্রাণীর কর্ণমূল পর্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সে একরকম ছুটিয়া গিয়াই বাথরুমে ঢুকিল···

রমানাথ যখন ভোর-বেলা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে, তখনই সারদা উঠিয়া পড়িয়াছে; সেবারেও, তিনি রমানাথের মুখের চেহারা দেখিয়া ভুল বুঝিয়াছিলেন। ছেলের ফুলশয্যায় প্রথম বাধা পড়ার পর হইতে এই দিনটির জন্য তাঁহার ভয় ও উদ্বেগের সীমা ছিল না,—শেষ পর্যন্ত যে সে রাত্রিটি নির্বিঘ্নে কাটিয়াছে এবং পুত্র-পুত্রবধূ সুখীই হইয়াছে কল্পনা করিয়া তিনি সে মুহূর্তে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন।

রমানাথ ভোরবেলা ঘর হইতে শুধু নয়, বাড়ি হইতেই বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। বহুক্ষণ মাঠে মাঠে ঘুরিয়া, স্টেশনের ওপারে হোগলা বনের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া গিয়া তাহাদেরই বড় ঝিলটার ধারে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে সে যে কি ভাবিতেছিল—তাহা বোধ হয় ঈশ্বরেরও জানা সম্ভব নয়, তাহার তো নয়ই। ইতস্ততঃ কল্পনা ও চিন্তার একটা ঘূর্ণাবর্ত বোধহয় পৃথিবীর প্রচণ্ডতম সাইক্লোনের অপেক্ষাও বেগে তাহার মনের ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। কত অসম্ভব কথাই ভাবিল যে সে—এই সর্বনাশের প্রতিকারের কত অসম্ভব উপায়ই ভাবিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু কোথাও কোন পথ দেখা গেল না, কোন কল্পনাই সম্ভব বা বিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হইল না।

অবশেষে, সূর্যদেব যখন প্রায় মধ্যাহ্ন গগনে পৌঁছিয়াছেন, তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল, এ কী করিতেছে সে! মা এতক্ষণ উদ্বিগ্ন হইয়া বোধ হয় চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। না, এসব চলিবে না কিছুতেই—কোন মতে কাহাকেও জানিতে দিবে না সে, তাহার চরম সর্বনাশের কথা। এতক্ষণ চিন্তার ফলে আর কোন পথ সে খুঁজিয়া না পাক—একটা বিষয়ে সে মন স্থির করিয়াছে যে, কাপুরুষের মত জীবনের এই কঠিনতম পরীক্ষায় সে পিছাইয়া আসিবে না কিছুতেই। পৌরুষকে সে খর্ব করিবে না—সমস্ত আঘাত সমস্ত বেদনা সহ্য করিবে নিঃশব্দে, ইহার কণামাত্র ভাগ দিয়া সে কাহাকেও বিড়ম্বিত করিবে না, তাহার বোঝা অপরের ঘাড়ে চাপাইবে না!···

যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিল তখন সে অনেক শান্ত হইয়াছে, মুখভাবও প্রাণপণ চেষ্টায়, স্বাভাবিক না হউক—প্রশান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এমন কি মা যখন এতক্ষণ দেরি করার জন্য বকাবকি শুরু করিয়া দিলেন, তখন সে মুখে একটু হাসিও টানিয়া আনিল, কহিল, 'বেড়াতে গিয়ে ঝিলের ধারে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মা!'

এই নিদ্রার কি কদর্থ হইতে পারে তাহা বুঝিয়া, ইচ্ছা করিয়াই রমানাথ মিথ্যা বলিল। মা যদি সান্ত্বনা পায় তো পাক।

সারদা শঙ্কিত কণ্ঠে কহিলেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলি? ঝিলের ধারে? ওমা কি হবে! এই বর্ষাকাল—সাপ-খোপ যদি কামড়াত!

রমানাথ আর একটুখানি হাসিয়া উপরে উঠিয়া গেল। সে আশঙ্কা সত্য হইলে আজ তাহার জীবনের অনেক সমস্যাই মিটিয়া যাইত!

॥ ৭ ॥

সেদিনও রাত্রে যথা-সময়ে ইন্দ্রাণী শয়ন ঘরে আসিয়া পেঁাছিল। এ তাহার অভিনয়েরই অঙ্গ, উপায় নাই। শাশুড়ীর পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাঁহার ঘুম আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিল, তিনিই জোর করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

রমানাথ একখানা চেয়ার বাগানের দিকে জানালার ধারে টানিয়া লইয়া গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। স্ত্রী ঘরে ঢুকিতেও সে মুখ তুলিয়া চাহিল না, তেমনি স্তব্ধ হইয়া রহিল। ইন্দ্রাণী মুহূর্তে তিন-চার ইতস্ততঃ করিয়া বিছানা হইতে একটা বালিশ টানিয়া লইয়া খাট হইতে যতটা সম্ভব দূরে মেঝেতেই শুইয়া পড়িল। রমানাথ তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; এমন কি ইন্দ্রাণী শুইয়া পড়িল বুঝিতে পারিয়াও ঘাড় ঘুরাইয়া দেখিল না সে কোথায় শুইল। নিজের প্রতি অদৃষ্টের এই তীব্র বিদ্রূপে, ভাগ্যের এই অপরিসীম বিড়ম্বনায় তিক্ততা তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিতেছে তখন, সে এই বাড়িটার ইটগুলা সুদ্ধ ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া দিতে পারিলে যেন বাঁচে।

জেলে সে কাগজ কলম পাইয়াছিল—তাহাতে চিঠি লেখে নাই, লিখিয়াছিল ইন্দ্রাণীর উদ্দেশে কবিতা। তাহার পর সে-কবিতা লজ্জায় স্ত্রীর কাছে পাঠাইতে পারে নাই—সুপারিন্টেন্ডেন্টের অনুমতি লইয়া সঙ্গে আনিয়াছিল। এখন সেই কথাটা মনে পড়িয়া গেল—সেগুলা এখন ছুঁইতেও ঘৃণা বোধ হয়, কিন্তু তবু কাছে রাখা আরও অসম্ভব। সে অস্থির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ডেস্কের মধ্য হইতে সেগুলা বাহির করিয়া কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল, তাহার পর আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল।

কিন্তু ঘুমের আশা তখন দুরাশা। যদিও আগের দিন একটি মুহূর্ত ঘুমাইতে পারে নাই, তাহার আগের দিনও না, নিদ্রায় চোখের পাতা ভারী হইয়া আছে—তবু চোখে কিছুতেই তন্দ্রা নামিল না। ঘরের অপর পাশে যে শুইয়া আছে, সেও যে জাগিয়া আছে তাহা রমানাথ অন্ধকারেই বুঝিতে পারিল। এমনি করিয়া পৃথিবীর ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কের দুটি তরুণ-তরুণী, একই ঘরে পাঁচ-ছয় হাত মাত্র ব্যবধানে সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া দিল—না পারিল কেহ কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে, না পারিল একটা সান্ত্বনার বাণী মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে। নিজেরা একটু চোখের জল ফেলিতে পারিলেও বাঁচিত বোধ হয়—কিন্তু সেটুকু

সান্ত্বনাও ভগবান তাহাদের অদৃষ্টে লিখেন নাই।

পরের দিন সকালেই রমানাথ কেদারবাবুর কাছে কথাটা পারিল। কহিল, 'বাবা, একটা কথা আপনাকে বলা হয় নি। জেল থেকেই আমি একটা চাকরি ঠিক করে রেখেছি, সেখানে আর না গেলে নয়।'

'চাকরি ?' কেদারবাবুর কণ্ঠে নিরতিশয় বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।

'না ঠিক চাকরি নয়। অন্য চাকরি হলে নিতুম না, এ একটা প্রোফেসারের পোস্ট, জানেনই তো ছেলেবেলা থেকে আমার ছেলেপড়ানোর দিকে ঝোঁক। আর তা ছাড়া শুধু শুধু বসে থেকে কীই-বা করব।'

কেদারবাবু বহুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর ঈষৎ ক্ষুন্নকণ্ঠে কহিলেন, 'কিন্তু আমি তো বুড়ো হচ্ছি, বিষয়-আশয়গুলো দেখে শুনে নেওয়া তো উচিত।'

রমানাথ জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, 'আপনার বুড়ো হওয়ার এখনও ঢের দেরি বাবা। ততদিন, অন্তত দুটো-তিনটে বছর সখটা মিটিয়ে নিই না!'

কেদারবাবু কখনই ছেলের ইচ্ছায় বাধা দেন নাই! তাঁহার ভাল ছেলে, গর্ব করিবার মত ছেলে—খারাপ কাজ কখনই করিবে না, তাহা তিনি জানেন। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'সে কোথায় ?'

একটুখানি, বোধ হয় মুহূর্তমাত্র ইতস্তত করিয়া, রমানাথ জবাব দিল, 'রংপুর।'

'সে কবে যেতে হবে ?'

'আজ-কালের মধ্যেই গেলে ভাল হয় বাবা।'

'আজকালের মধ্যেই! সে কি ?' কেদারবাবু চমকিয়া উঠিলেন, 'এত তাড়াতাড়ি কি করে হবে ?'

কথার ইঙ্গিতটা বুঝিয়া রমানাথ বুকে যেন একটা জ্বালা অনুভব করিল। অকারণেই কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া কহিল, 'কিন্তু কলেজে যে সব খুলে গেছে, তা তো আপনি জানেনই। এখন না গেলে তাদের ক্ষতি হবে। দরকারের সময় লোক না পেলে তারা রাখবে কেন ?'

মিনিট দুই-তিন চুপ করিয়া থাকিয়া কেদারবাবু কহিলেন, 'তোমার গর্ভধারিণীকে বলেছ ?'

মাটির দিকে চাহিয়া রমানাথ জবাব দিল, 'আপনি বললেই ভাল হয় বাবা, মা তো এসব কথা বুঝবেন না, হয়তো চেঁচামেচি করবেন!'

কেদারবাবু আবারও একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'দেখ, যা ভাল বোঝ কর—'

রমানাথ একেবারে বাড়ি হইতেই বাহির হইয়া পড়িল। কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। প্রোফেসারীর সখ তাহার ছিল সত্য কথা, সে রকম একটা সংকল্প বরাবরই ছিল কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কিছু করিবার কথা কখনই সে ভাবে নাই। মাস-কতক দাম্পত্য-জীবন উপভোগ করিবার পর ধীরে-সুস্থে চেষ্টা দেখিবে, এই ছিল তাহার

ইচ্ছা—জেলখানায় বসিয়া চাকরির তদ্বির করা দূরে থাক—সে সেসব কথা ভাবিতেই পারে নাই। সেখানে দিন-রাত সে শুধু ভাবিয়াছে স্বল্প-পরিচিতা নববধূকে, স্বপ্ন দেখিয়াছে চকিতে দেখা এতখানি চন্দনচর্চিত সুন্দর মুখ।…

কিন্তু এখন আর এখানে থাকা যায় না। এই মুহূর্তে কোথাও পলাইয়া যাইতে পারিলে সে বাঁচে। ঘরে থাকা অসম্ভব, বাহিরে আরও। বিবাহের পূর্বে যতগুলি প্রতিষ্ঠান সে নিজের চেষ্টায় গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহার অবর্তমানে সবগুলিই নষ্ট হইয়া গিয়াছে—এবং হইয়াছে যতীনের জন্য। তাহার উপরই ভার ছিল, সে একটাও দেখে নাই। এখন আবার সেই সব নতুন করিয়া গড়িয়া তোলা তাহার সাধ্যাতীত, সে পরিশ্রমের শক্তি আর তাহার নাই, উৎসাহের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাছাড়া পুরাতন বন্ধু বা সহকর্মীদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলে যতীনেরই প্রশ্ন উঠিবে। যতীনের আকস্মিক অন্তর্ধানে ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে। এবং যতীন ফিরিয়া আসিলেও রমানাথ আর তাহার সহিত মিলিয়া কাজ করিতে পারিবে না—কথা কহিতে তো পারিবেই না!

না—তাহাকে পলাইতেই হইবে—আর যত তাড়াতাড়ি হয়।

রমানাথ বাড়ি ফিরিতেই মা চেঁচামেচি শুরু করিয়া দিলেন। এত কালের পর ছেলে বাড়ি আসিল, তিনি তাহাকে কিছুতেই কাছ-ছাড়া হইতে দিবেন না। এই ক'মাস অনাহারে কষ্টে তাঁহার সোনার ছেলে কালি হইয়া গিয়াছে, আবার সেই বিদেশ-বিভুঁয়ে গিয়ে কষ্টে পড়িলে সে কি আর বাঁচিবে? তাছাড়া নূতন বিবাহের পর এই সবে দুটা দিন ঘর করিতে না করিতেই এ সব কি কথা? বৌভাতের ভোজটাও তাঁহার সারা হয় নাই—সুবিধা মত সেটা তাঁহাকে করিতেই হইবে।… এখন যাওয়া অসম্ভব, অমন চাকরিতে দরকার নাই।

রমানাথ সব কথাই ধীরভাবে শুনিয়া গেল, তখন প্রতিবাদ করিল না। আহারাদির পর সে মায়ের কাছে গিয়া বসিয়া, আদরে আবদারে বুঝাইয়া রাজী করিল। এই কেলেঙ্কারির পর বৌভাতের আয়োজন করা বড় লজ্জাকর, তাহাতে রমানাথকে লজ্জায় পড়িতে হইবে,—তারপর একবার যখন বাধা পড়িয়াছে, তখন ওসব হাঙ্গামা না করাই ভাল। আবার কি গোলমাল বাধে কে জানে! তা ছাড়া প্রোফেসারের পদ যে রমানাথের আবাল্য কাম্য তাহা তো মা জানেনই। এ কাজ এখন হাতছাড়া করিলে আবার কবে মিলিবে তাহার ঠিক কি—এক বছরের আগে তো নয়ই! কলেজের চাকরির বছরে সাত মাস ছুটি,—সব সময়েই তো সে বাড়ি আসিয়া থাকিতে পারিবে!

বহুক্ষণ বোঝানোর পর সারদা শান্ত হইলেন, একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'কিন্তু বৌমা ছেলেমানুষ, এখনই কি পারবে বিদেশে গিয়ে সংসার চালাতে?'

সর্বনাশ। এ ব্যাপারটার জন্য রমানাথ মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাহার মুখ নিমেষের জন্য বিবর্ণ হইয়া গেল। সে বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, 'আমি তো

এখন একলা যাব মা ! বিদেশ-বিভুঁই, কোথায় বাড়ি ঘর, কি না, কিছুই ঠিক নেই—এখন মেয়েছেলে নিয়ে গিয়ে কি করব ?'

সারদা ব্যাকুল-কণ্ঠে কহিলেন, বৌমাকে নিয়ে যাবি নে ? ওমা, তবে কি করে যাওয়া হবে ! এই এতদিনের অনাচার গেল, শরীর খারাপ, আবার বিদেশে গিয়ে একা থাকা কখনও হয় ৷ না, সে হবে না ৷'

রমানাথ মায়ের দৃঢ় কণ্ঠস্বরে বিব্রত হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু হাল ছাড়িল না ৷ কহিল, 'বিদেশে কি এই প্রথম থাকছি মা, হোস্টেলে কি এর আগে থাকি নি কখনও, তা ছাড়া কে বললে শরীর আমার খারাপ, শরীর ভালই আছে, বিশ্বাস কর ৷ আমি তোমাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, স্বাস্থ্যের দিকে খুব কড়া নজর রাখব ৷'

তবু সহজে মাকে রাজী করানো গেল না ৷ শেষ পর্যন্ত ধরিলেন, 'কিন্তু তাই বলে এত তাড়াতাড়ি যাওয়া হয় না ৷ এই সবে বাড়ি এলি—সত্যনারায়ণ সুবচনী হ'ল না—অষ্টমঙ্গলা বাকী, তা ছাড়া বৌমাই বা কি মনে করবে ? তার দিন কাটে কি করে বল্ দেখি ?'

রমানাথ জানালার ফাঁক দিয়া দূরে পশ্চিম দিগন্তের দিকে চাহিয়া জবাব দিল, সে তো অবুঝ নয় মা, আমার বিশ্বাস সে আপত্তি করবে না ৷'

তাহার কণ্ঠস্বরে সারদা কি বুঝিলেন কে জানে ৷ সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, 'হ্যাঁ রে রাগারাগি করে যাচ্ছিস না তো ? ছেলেমানুষ সব হয়তো বোঝে না, তার ওপর অভিমান করিস নি তো ?'

প্রাণপণ চেষ্টায় কণ্ঠস্বর সহজ করিয়া রমানাথ জবাব দিল, 'পাগল হয়েছ মা !'

অগত্যা সারদা পাঁজি আনাইলেন, পাঁজিতে দেখা গেল আগামী পরশু অর্থাৎ রবিবার দিনই ভাল দিন আছে—তাহার পর এক সপ্তাহ মোটে দিন নাই ৷

'পরশু ! সে কি করে হবে ?'

'আর তার চেয়ে বেশী দেরি করা যায় না মা কিছুতে ৷ তাহ'লে যাওয়া আর না যাওয়া সমান হবে ৷'

সারদা ব্যাকুলকণ্ঠে পুনশ্চ কথাটা তুলিলেন, 'কিন্তু অষ্টমঙ্গলা ?'

রমানাথ হাসিল ৷ অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে না হাসিয়া পারিল না ৷ কহিল, কোন্‌টা নিয়মমত হ'ল বলতে পারো মা ? আট দিন যখন পেরিয়ে গেছেই—তখন না হয় আরও দুদিন দেরিই হ'ল ৷ পুজোর সময়ে তো আসবই—তখন বরং দেবীপক্ষের মধ্যে যা করবার সেরে নিও !'

কথাটা সারদার মন্দ লাগিল না ৷ মাকে রমানাথ ভাল করিয়াই চিনিত—সেই জন্যই সে দেবীপক্ষের কথাটা তুলিল ৷ অর্থাৎ এক কথায় রবিবার দিনই রমানাথের যাত্রার দিন ধার্য হইয়া গেল ৷

সে রাত্রি এবং তাহার পরের রাত্রি সেই ভাবেই কাটিল ৷ বরং, দুপুরের দিকে রমানাথ একা শুইয়া একটু ঘুমাইতে পারে, কিন্তু রাত্রে, শুধু ইন্দ্রাণী ঘরে থাকার জন্যই ঘুম অসম্ভব হইয়া ওঠে ৷ এটা ঘৃণা, ক্রোধ কিংবা আর কিছু, তাহা

সে বোঝে না। শুধু প্রবল একটা উত্তেজনায় মাথা গরম হইয়া ওঠে—সারারাত্রির মধ্যে চোখের পাতা একবারও বুজিতে পারে না। ইন্দ্রাণীও খুব সম্ভব জাগিয়াই থাকে কিন্তু সে এত নিথর হইয়া পড়িয়া থাকে যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে কিনা বোঝা যায় না, শুধু চোখের কোলে গাঢ় কালিমা তাহার রাত্রি জাগরণের সাক্ষ্য দেয়।

তবু দুই-রাত্রি রমানাথ দাঁতে দাঁত দিয়া কোনমতে চিত্তদমন করিয়া সেই ভাবেই কাটাইল। বাহিরের ঠাট বজায় রাখিতেই হইবে। এই দুরপনেয় লজ্জা ও কলঙ্কের পঙ্ককুণ্ডে সে বাবা-মাকে ফেলিতে পারিবে না কিছুতেই। তাহার ফলে, যাহাকে এই শাস্তি দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত দণ্ডদাতাকেও সমান যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল—কিন্তু উপায় কি?···

অবশেষে যাত্রার সময় ঘনাইয়া আসিল। রমানাথ এ কয়দিন গ্রামের কোথাও যায় নাই—কাহারও সহিত দেখাও করে নাই, সুতরাং তাহার যাত্রার কথা কেহ জানিত না, দেখা করিতেও আসিল না। শুধু মা সাশ্রুনেত্রে যাত্রার সময় দধির মঙ্গলটিকা আঁকিয়া দিলেন। আর ইন্দ্রাণী, অভিনয়ের প্রতিটি খুঁটিনাটি পালন করিতে সে বাধ্য—সারদার' নির্দেশে যাত্রার কিছু পূর্বে পানের ডিবা হাতে তাহাকে ঘরে আসিতে হইল! রমানাথও এ ব্যাপারটার জন্য প্রস্তুত ছিল, সে একবার মাত্র সে-দিকে চাহিয়া দেখিয়াই জানালার ধারে গিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। ইন্দ্রাণী কয়েকমুহূর্ত ইতস্তত করিল, তাহার পর যেখানে সে দাঁড়াইয়াছিল সেইখানেই ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

তাহার অলঙ্কারের শব্দ দূরে মিলাইয়া যাইতে রমানাথ আর কোন দিকে না চাহিয়া স্যুটকেশটা হাতে করিয়া নামিয়া আসিল। গাড়ি প্রস্তুতই ছিল, কেদারবাবুর কাছে এক মিনিট দাঁড়াইয়াই সে এক-রকম ছুটিয়া আসিয়া গাড়িতে চাপিল। তাহার বাড়ি, তাহার ঘর, বাপ-মা, বন্ধু-বান্ধব, তাহার অতি প্রিয় গ্রাম, আবাল্য-শত-স্মৃতি বিজড়িত এই মাতৃভূমি—আজ যেন সহস্রবাহু বিস্তার করিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিয়াছে—এই আবহাওয়া হইতে এখনই মুক্তি না পাইলে সে আর বাঁচিবে না। অপমান ও লজ্জার এই পঙ্ককুণ্ড হইতে তাহার অব্যাহতি চাই-ই!···

গাড়ি অদৃশ্য হইল, এমন কি তাহার শব্দও দূরে মিলাইয়া গেল—ইন্দ্রাণী তবু তাহার ঘরের গরাদে ধরিয়া রমানাথের গতিপথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর—বোধ হয় বহুক্ষণ পরে—সে মেঝেতে পড়িয়া পাগলের মত মাথা খুঁড়িতে লাগিল, 'ঠাকুর, আর এমন করে কোনদিন কিছু চাই নি. আমাকে তুমি মৃত্যু দাও। অনন্ত আত্মহত্যা করবার সাহস দাও—আর কিছু চাই না।'

॥ ৮ ॥

রংপুরটা রমানাথ প্রথমে বলিয়া ফেলিয়াছিল ঝোঁকের মাথায়। কোথাও তাহার কোন-কিছুরই ঠিক ছিল না—ঐ শহরটার নামই প্রথম মুখে আসিয়াছিল।

কিন্তু এখন কলিকাতায় পেঁাছিয়া মনে পড়িল একটা অবলম্বন তাহার আছে সেখানে—মনের অবচেতন অবস্থায় তাই সেইখানকার নামটাই আগে আসিয়াছে। তাহার এক সহপাঠী, একটু অন্তরঙ্গই ছিল সে এককালে, গৌরীশঙ্কর এম এ. পাস করিয়া রংপুর কলেজে অধ্যাপকের কাজ লইয়াছে, এবং গত কয়েকমাস যাবতই তাহাকে রংপুর যাইবার জন্য চিঠি লিখিতেছে। সে আর ইতস্তত না করিয়া কলিকাতায় পেঁাছিয়াই রংপুর যাত্রা করিল।

গৌরীশঙ্কর তাহাকে স-কলরবে অভ্যর্থনা করিল বটে কিন্তু রমানাথের আসল কথাটা সে একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বলিল, 'তুই ঠাট্টা করছিস, না ক্ষেপেছিস ?'

'কেন ?'

'প্রফেসারীর চাকরি শুনতেই। বাংলাদেশের এই সব কলেজে কত মাইনে দেয় তা জানিস ? তোর একমাসের হাতখরচও তাতে কুলোবে না !'

রমানাথ একটু ম্লান হাসিয়া কহিল, 'সে সব দিন-কাল আর নেই রে ! সে ছিল বাবার পয়সাতে নবাবী। তা ছাড়া, টাকার কথাও আমার বড় নয়, আমি চাই যে-কোন একটা কাজ। এই দিকেই ছেলেবেলা থেকে এক ঝোঁক ছিল তা তো জানিসই—আর কোন কাজ পারব না।…আমার নিজের খরচটা চলে গেলেই আমি খুশী—বাড়িতে তো আর পাঠাতে হবে না ! ইচ্ছা আছে পড়াতে পড়াতে একটুখানি রিসার্চ আরম্ভ করে দেব—'

তবু গৌরীশঙ্কর কথাটা বিশ্বাস করিতে চায় না। বলে, 'তোমার বাবা সব চালাকি ! ঘরে সুন্দরী বৌ, বাপের অগাধ পয়সা—তুমি আসবে চাকরি করতে ! যা যা—বাড়ি ফিরে যা, তুই কি দুঃখে এ সব কাজ করবি ?'

কিন্তু রমানাথও নাছোড়বান্দা। তখন গৌরীশঙ্কর একটু চিন্তিতকণ্ঠে কহিল, 'এখানে তো কোন কাজ খালি নেই। যা একটা হতে পারে—সে আবার তোর সাবজেক্ট নয়। বরং এক কাজ কর—খাগড়া কলেজে একটা পোস্ট খালি আছে, চেষ্টা করে দেখগে যা। আমার শ্বশুরমশাইয়ের কিছু হাত আছে সেখানে, আমি একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি, কালই গিয়ে তুই তাঁর সঙ্গে দেখা কর্। মাইনেও খুব খারাপ নয়, বোধ হয় শ'খানেক পাবি।'

অগত্যা রমানাথ রংপুর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। যাইবার পূর্বে কেদারবাবুকে একখানা চিঠি লিখিয়া জানাইয়া দিল, 'এখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঠিক বনল না—আর একটা কাজের সন্ধান আছে, আপনাকে পরে জানাব।'

কিন্তু কলিকাতাতে আসিয়া তখনই খাগড়া যাইতে তাহার ইচ্ছা হইল না। মন এত বিক্ষিপ্ত যে, রাস্তায় বাহির হইয়া ভুলিয়া যায় কোথায় যাইবার কথা। ট্রামের স্টপেজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকে, ট্রামে উঠিবার কথা মনে পড়ে না। রাত্রে তো নিদ্রা নাই-ই—এ অবস্থায় বিদেশে গিয়া চাকরির উমেদারী করা প্রায় অসম্ভব। সব চেয়ে এই কষ্টটাই তাহার বেশী, রাত্রে ঘুম না হইলে সে বাঁচিবে কি করিয়া ? অথচ কেন যে ঘুম হয় না তাহা সে জানে না। কী সব এলোমেলো ভাবে

তাহারও ঠিক নাই। ইন্দ্রাণীর প্রতি খুব যে বিদ্বেষ অনুভব করে তাহাও না—শুধু একটা অপরিসীম তিক্ততা তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া ওঠে দিনরাত। রাত্রে শয়নের পর মনে হয় যে তাহার বিবাহের স্মৃতিটা পাষাণের মত বুকে চাপিয়া বসিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া দিতেছে—কোন মতে, পরমায়ুর দশটা বছর বিসর্জন দিয়াও, যদি সে বিবাহ-রাত্রির আনন্দ-উৎসবকে ফিরাইয়া লইতে পারিত তো যেন বাঁচিয়া যাইত—নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিত।

অনেকদিন পরে কলিকাতায় আসিয়া প্রথম প্রথম কোলাহলটা তাহার ভালই লাগিয়াছিল। কিন্তু সাত আট দিন থাকিবার পরই ভুলটা চোখে পড়িল। শুধু বাহিরের কোলাহল ভাল লাগে না। বন্ধু-বান্ধব যাহারা ছিল, তাহাদের অনেকেই এখানে নাই, কাজ-কর্মে দেশে বা বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। যাহারা আছে তাহাদের সঙ্গেও যে মিশিতে পারে না, এটা সে দেশে থাকিতেই অনুভব করিয়াছে। লজ্জার কোন কারণ নাই—অন্তত ইহাদের কাছে নাই, তবু একটা দুর্নিবার লজ্জা যেন সমস্ত পরিচিত লোকের সহিতই মিশিবার পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। অথচ, মনের এই অবস্থায়, একা নিঃসঙ্গ শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ানো বা হোটেলে আসিয়া সুপ্তিহীন রাত্রি কাটানো একেবারেই অসম্ভব।

ভুল ভাঙ্গিবার সঙ্গে-সঙ্গেই এই জড়তায় সে হাঁফাইয়া উঠিল। সেই দিনই সে গৌরীশঙ্করের শ্বশুরমহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিল। কিন্তু তিনি কোন আশা দিতে পারিলেন না, কারণ পদটি বহুদিন ধরিয়াই খালি আছে, হয়তো এত দিনে লোক লওয়াই হইয়াছে। তবু একখানা চিঠি দিলেন।

রমানাথ সেদিন সন্ধ্যার ট্রেনেই খাগড়া যাত্রা করিল। তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন—সে যেদিন পৌঁছিল সেই দিনই নির্বাচন হইবার কথা—লোকও একরকম ঠিক ছিল কিন্তু রমানাথ ফার্স্ট-ক্লাস-ফার্স্ট বলিয়া শেষ মুহূর্তে সে-ই চাকরিটা পাইল। মাহিনাও খারাপ নয়, প্রায় এক শত টাকা—মফঃস্বল কলেজ হিসাবে বরং ভালই। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় এক জমিদার-গৃহে একটা মোটা মাহিনার ট্যুইশনও জুটিয়া গেল। এত টাকার ঠিক প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু অলস সময় যাপন তাহার পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়াই রমানাথ এই অতিরিক্ত কাজটি বাছিয়া লইল।

মফঃস্বলের শহর, বিশেষত পুরাতন শহর বলিয়া অধিকাংশ বাড়িই জরাজীর্ণ। গলিগুলি অন্ধকার, সংকীর্ণ। ইহার মধ্যে বাসের বাড়ি যদি বা বিস্তর খালি পাওয়া যায়—কোনটাতেই রমানাথের মন ওঠে না। তাহাদের বাড়ির বিস্তৃত বাগানের কথা মনে পড়িয়া যায়—তাহার শয়ন-ঘরের পূর্বে ও দক্ষিণে অবারিত মুক্ত বাতাস। সেই সুন্দর বাসা, দেশের উন্নতির সাধনা—লেখাপড়া শেষ হইলেই যে ব্রত মাথায় তুলিয়া লইবে বলিয়া বাল্যকাল হইতে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল—সর্বোপরি তাহার দেবতুল্য বাপ-মার স্নেহ—এই সমস্ত হইতে কেন সে বঞ্চিত হইবে? কেন তাহাকে এমন করিয়া নির্বাসিত হইয়া এই নির্বান্ধব দেশে নিঃসঙ্গ দিন কাটাইতে হইবে?···কথাটা মনে হইলেই একটা দুর্বার অথচ অসহায় ক্রোধে তাহার কপালের শিরাগুলো দপ্‌দপ্‌ করিতে থাকে—অথচ কোন উপায়ই

তাহার চোখে পড়ে না।

যাহা হউক—অনেক খোঁজাখুঁজির পর সয়দাবাদ অঞ্চলে গঙ্গার কাছাকাছি একটা বাড়ি সে পাইল। ছোট্ট বাড়ি—নীচেটা প্রায় অব্যবহার্য কিন্তু উপরের ঘর দুটি ভাল। পাশাপাশি দুটি ঘর, একটি ঘেরা বারান্দা ও রান্নার জায়গা—সামান্য একটু ছাদ। একার পক্ষে যথেষ্ট। সে প্রথমে যে হোটেলে উঠিয়াছিল তাহারই ঠাকুরের (মালিকও বটে) চেষ্টায় সে একটি 'কম্‌বাইন্‌ড্' চাকর পাইল এবং সস্তা দামে একটা তক্তাপোষ আর কাজ করিবার জন্য একটা চেয়ার-টেবিলও সেই ঠাকুরটিই সংগ্রহ করিয়া দিল।

অর্থাৎ তাহার গৃহস্থালী পাতা হইল—শুধু তাহাই নয় তাহা সাজাইতেও হইল। প্রয়োজনীয় বাসনপত্র হাঁড়িকুড়ি সবই চাই। তাহার আবার গৃহস্থালী—মনে হইলেও রমানাথের হাসি পায়। কিন্তু হোটেলও এমন ভাল নয় যে সেখানে বারোমাস থাকা যায়। হোস্টেলে একটা ঘর পাইলে সব চেয়ে ভাল হইত কিন্তু সম্প্রতি সেখানেও স্থানাভাব। অগত্যা এই ব্যবস্থাই তাহাকে করিয়া লইতে হইল। এমনিই হয়—বাসা বাঁধিবার ভাগ্য যাহার একেবারেই নাই, তাহাকেই বার বার এমনি করিয়া বাসা বাঁধিবার অভিনয় করিতে হয়।

কলেজের কাজ ঠিক হইবার পরই রমানাথ বাবাকে সংবাদ দিয়াছিল। এখন বাসা ঠিক করিয়া সে মাকে একখানা সুদীর্ঘ চিঠি লিখিল। কত সুন্দর বাসা এবং ভাল চাকর সে পাইয়াছে তাহার একটি চমকপ্রদ বিবরণ দিয়া—তাহার যে কোন অসুবিধা নাই, আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা প্রায় বাড়ির মতই আরামপ্রদ করিয়া লইয়াছে—এই কথাটা বার বার করিয়া লিখিয়া কথাটাকে প্রায় বিশ্বাস-যোগ্য করিয়া তুলিল। চিঠি শেষ করিয়া ডাকে দিয়া তাহার মনে হইল যে ইহার পর আর মা-বাবার দুশ্চিন্তার কোন কারণ থাকিবে না। এমন ভাবেই সে চিঠি লিখিয়াছে যে লিখিতে লিখিতে তাহার নিজেরই মনে হইতেছিল যে সে সুখেই আছে।

দিন পাঁচেক পরেই বাবার চিঠি আসিয়া পোঁছিল। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বার-বার সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হইলে সে যেন বাড়ি ফিরিয়া যায়। ওখানকার এক সরকারী উকিলের সহিত তাঁহার বহুদিন হইতেই বাধ্য-বাধকতা আছে, তাঁহার নামেও একখানা চিঠি লিখিয়া দিয়াছেন—কিছু প্রয়োজন হইলেই রমানাথ তাঁহার সাহায্য পাইবে। সর্বশেষে তিনি বধূমাতার সংবাদ দিয়াছেন। বেহাই কয়েকদিনের জন্য ইন্দ্রাণীকে লইয়া গিয়াছেন—বিবাহের পর একদিনের জন্যও পিত্রালয়ে যাইতে পারে নাই—বোধহয় সেইজন্যই ইদানীং সে শুকাইয়া যাইতেছিল, গোপনে নাকি কান্নাকাটিও করিত—কয়েকদিন ঘুরিয়া আসা ভাল। আশা করি রমানাথের ইহাতে কোন আপত্তির কারণ থাকিবে না। ইত্যাদি—

এক কথায় রমানাথ নিশ্চিন্ত হইল ! কলেজে পড়াইয়া, ট্যুইশনি করিয়া এবং অবসর সময়ে বইয়ের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া মনকে অপেক্ষাকৃত শান্ত করিতে

পারিয়াছিল সে। ইদানীং রাত্রে একটু-আধটু ঘুমও হয়। বন্ধু বান্ধবও বিস্তর জুটিতে পারিত, অনেকেই তাহার সহিত আলাপ করিতে উৎসুক—কিন্তু মানুষের সঙ্গ তাহার ভাল লাগে না বলিয়া সে-ই এড়াইয়া যায়। এড়াইতে পারে নাই খালি দুটি লোককে—একটি তাহার পিতৃবন্ধু উকিল অক্ষয়বাবু, আর একটি তাহার নিজস্ব ছাত্র কমল। এই ছেলেটি সময়ে-অসময়ে আসিয়া তাহার নিকটে নানা কথা জানিতে চাহিত—তাহার এই জ্ঞান-পিপাসা ভালই লাগে রমানাথের। সে থাকাতে অনদিকে কিছু সুবিধাও হইয়াছে তাহার। ছোটখাটো ফাই-ফয়মাশ, গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি সে-ই দেখে—আর অক্ষয়বাবু লোকটি অসাধারণ প্রাণশক্তিসম্পন্ন লোক, তিনি শিষ্টাচার আদর-আপ্যায়নের ধার ধারেন না, জোর করিয়া আসেন, জোর করিয়াই ধরিয়া লইয়া যান, নিমন্ত্রণ খাওয়ান, এমন কি নিজে খাবার বহিয়া লইয়া আসেন। এই দুটি মানুষেয় প্রীতিই তাহার অন্তরের সেই অপরিসীম দাহ, যাহা প্রাণবন্যার উৎসমুখ পর্যন্ত শুষ্ক করিয়া দেয়, তাহাকে কিছু শান্ত করিয়াছে। তিক্ততা তেমনিই আছে বটে আকণ্ঠ —কিন্তু জ্বালাটা কমিয়াছে।

মাসখানেক পরে রমানাথ একদিন কলেজ হইতে একটু দেরি করিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিয়া দেখিল একটা ভাড়াটে গাড়ি তাহার বাসার সামনে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই চাকর হরিদাস গাড়ি হইতে মালপত্র নামাইতেছে। তাহার এই সুদূর বাসা-বাড়িতে কে আসিতে পারে অনুমান করিতে না পারিয়া একটু বিস্মিতভাবেই রমানাথ কাছে আসিয়া দেখিল কেদারবাবু দাঁড়াইয়া মালপত্রের তদ্বির-তদারক করিতেছেন এবং একেবারে দ্বারপ্রান্তে তাহাদের দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে একটি তরুণী। পিছন ফিরিয়া থাকিলেও তাহাকে চিনিতে রমানাথের বিলম্ব হইল না—সে ইন্দ্রাণী।

রমানাথ প্রথমটা যেন চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে অত্যন্ত রূঢ় আঘাত পাইয়াছে সত্যকথা, কিন্তু তবু এ-কয়দিনে তাহার অনেকখানি তীব্রতা সে ভুলিয়াছে—এতদিনে একটু নিশ্চিন্তও হইয়াছিল, অন্তত ইন্দ্রাণী সম্বন্ধে। সে যে আবার এত শীঘ্র তাহার জীবনের পথে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে তাহা রমানাথ কল্পনাও করে নাই।...

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অসহ্য ক্রোধে অকস্মাৎ যেন যে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। এ কী অন্যায় কথা, বিনা দোষে বার বার তাহাকেই সব অত্যাচার সহিতে হইবে? ঘরদুয়ার আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করিয়া এই সুদূরে বিদেশে পড়িয়া আছে; শুধু এতটুকু নির্জনতা, তাও তাহাকে কেহ দিবে না? সে কাছে আসিয়া বেশ একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই প্রশ্ন করিল, 'এ সব কি বাবা? এর মানে কি?'

তাহার কণ্ঠস্বরে কেদারবাবু বিস্মিত হইলেও মুখে কোন অনুযোগ করিলেন না। বরং স্নিগ্ধকণ্ঠেই জবাব দিলেন, 'বলছি রে খোকা, একটু হাঁপ নিই। এমন তোদের লাইন—এক কাপ চা পর্যন্ত মেলে না!...মা লক্ষ্মী আর দাঁড়িয়ে থেকো

না—গিয়ে একটু দেখে শুনে নাও গে! বাউণ্ডুলের ঘরকন্না, এখানে আর কে তোমাকে দেখিয়ে-শুনিয়ে দেবে, নিজেকেই সব বুঝে নিতে হবে!'

ইঙ্গিত পাইয়া ইন্দ্রাণী চলিয়া গেল। কেদারবাবু তখন অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে কহিলেন, 'আমার বাপু কোন দায়িত্ব নেই এর মধ্যে, তোমার গর্ভধারিণী একেবারে কেঁদেকেটে অস্থির। তিনিই বেহাইকে চিঠি লিখে বৌমাকে আনিয়েছেন, তাঁরই হুকুমে আমি পোঁছে দিতে এসেছি। চেনোই তো তাঁকে, হুকুম তামিল করা ছাড়া উপায় নেই।'

তারপর সেই অন্ধকারেই, যেন তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলিয়া রমানাথের মুখখানা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, 'অবশ্য আমার কোন আপত্তিও ছিল না। সত্যিই তো বাসা যখন ভাড়া করেইছ তখন আর কষ্ট করবার দরকার কি।'

ততক্ষণে রমানাথও নিজের রূঢ়তায় নিজেই লজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। সে-ই তো অভিনয় আরম্ভ করিয়াছে, এখন তাহার ফলাফলে পশ্চাদ্‌পদ হইলে চলিবে কেন? মা যাহা করিয়াছেন স্নেহ-বশতই করিয়াছেন, সাধারণ মা-বাবার কাছে যাহা কর্তব্য বলিয়া বোধ হয় সেই কর্তব্যটুকুই পালন করিয়াছেন মাত্র, রাগ সে কাহার উপর করিবে? সে প্রাণপণ চেষ্টায় সমস্ত বিরক্তি দমন করিয়া হরিদাসকে যথাযথ নির্দেশ দিয়া কেদারবাবুর সঙ্গে উপরে উঠিয়া গেল।

সমস্যা অনেক। প্রথমত আহারাদির—কেদারবাবু নিশ্চয়ই হরিদাসের হাতে খাইবেন না, সেটা হয়তো ইন্দ্রাণী ব্যবস্থা করিবে কিন্তু দ্বিতীয় অর্থাৎ শয়নের সমস্যাটাই গুরুতর। ঘর তো মোটে দুইটি, হরিদাস নীচেই শুইবে কিন্তু বাবাকে একটা ঘর ছাড়িয়া দিলে বাকি একটা ঘরে তাহাদের দুইজনের আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এখানের শয্যা সঙ্কীর্ণ—মশারীও মোটে একটি। সবটা ভাবিয়া রমানাথের কপালে ঘাম দেখা দিল।...

কেদারবাবু উপরে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া ছেলের ঘরেই জাঁকিয়া বসিলেন। তাহার পর একটা হাত-পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে দেশের নানা খবর দিতে শুরু করিয়া এক সময়ে বলিলেন, 'সত্যি, যতীনের কি হ'ল বল্ তো।...সেই যে ডুব মারলে তারপর আর কোন পাত্তা নেই। ওর মা তো কেঁদে কেটে অস্থির—খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, পুলিসে ডায়েরী করে কিছুতেই খবর পাওয়া যায় না। আমরাও ভেবে মরি—তোর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করলে না, হঠাৎ গায়েব হয়ে গেল, ব্যাপার কি! তারপর একেবারে এই গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে জলপাইগুড়ি থেকে তোদের কে এক বন্ধু অমিয় ওদের বাড়িতে চিঠি লিখলে যে যতীন নাকি তার ওখানে গিয়েছিল, এখন টাইফয়েডে একেবারে শয্যাগত, বাঁচবার আশা কম। ওর মা-দাদা সব ছুটে গেল, ওর ভগ্নিপতি সুরেশ ডাক্তার, সে-ও গেল; কোনক্রমে একটু ভাল করে পরশু নিয়ে এসেছে। একেবারে কঙ্কাল...ওর কি যে হ'ল, কেনই বা হঠাৎ বাড়ি ছাড়লে—কিছুই বোঝা গেল না।'

রমানাথের কণ্ঠ ভেদিয়া যেন স্বরই বাহির হইতে চাহে না—তবু বাবা

তাহারই মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন দেখিয়া একটা জবাব দিতে হইল। কোনমতে গলা পরিষ্কার করিয়া কহিল, 'কী জানি, চিরদিনই ঝোঁকের মাথায় কাজ করে ফেলা অভ্যেস ওর। আমাকে একখানা চিঠিও দেয় নি।'

কথা-কয়টা শেষ করিবার পর মনে হইল যেন কটু ওষুধ খাইয়া সমস্ত মুখটা বিস্বাদ হইয়া গেছে।

কেদারবাবু ততক্ষণে অন্য প্রসঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন। রমানাথ যখন ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহার কথায় আবার মন দিল তখন তিনি বলিতেছেন, 'বেয়াই এবার বড্ড দুঃখ করলেন। মেয়ে-জামাইকে আট দিনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া তাঁদের কুলপ্রথা, তা তো হলই না, জামাই এসেছেন শুনেই তাঁদের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনরা আসতে আরম্ভ করে ছিলেন, হঠাৎ শুনলেন তুই চলে এসেছিস। আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করেন, তুই তাদের ওপর কিংবা বৌমার ওপর কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছিস কিনা। বৌমা নাকি ওখানে গিয়ে দিনরাত কেঁদেছেন, কারুর সঙ্গে ভাল করে কথা কন নি—এইসব।...সত্যি, তেমন কিছু হয় নি তো রে?'

স্নেহপ্রবণ পিতার কাছে রমানাথ কোন মিথ্যা বলে নাই—মিথ্যা বলিতে যেন মুখে বাধে। তবু তাঁহার জন্যই মিথ্যা বলিতে হইল, প্রাণপণ চেষ্টায় কণ্ঠস্বর সহজ করিয়া উত্তর দিল, 'না বাবা, কী হবে!'

ইহারই মুহূর্ত কয়েক পরে ইন্দ্রাণী চা ও জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল। কেদারবাবু মাত্র একজনের মত ব্যবস্থা দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, 'ও কি, রমাকে দিলে না?'

ইন্দ্রাণীর মাথা আরও নত হইয়া গেল। রমানাথ ব্যস্ত হইয়া কহিল, 'আমি এখন কিছু খাব না বাবা, আমি এইমাত্র ছাত্রদের ওখান থেকে খেয়ে আসছি।'

কেদারবাবু প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, 'না, না, সে কোন কাজের কথা নয়। বৌমা তুমি চা দাও ওকে, চা আর বাড়ি থেকে যে মিষ্টি এনেছি—। বৌমা বড় খাসা চা করে রে, খেলে আর ভুলতে পারবি না।'

রমানাথের কোন মিথ্যা সংস্কার ছিল না, তবু যেন সেই চায়ের প্রতিটি বিন্দু মুখের মধ্যে বিষাইয়া উঠিতে লাগিল, মিষ্টান্ন যেন গলায় নামিতেই চাহে না। আজ সে প্রথম বুঝিল যে মানুষের প্রতি ঘৃণাই খাদ্যাখাদ্য বিচারের মূল কথা।

ইন্দ্রাণী চলিয়া গেলে কেদারবাবু বলিতেছিলেন, 'বড় লক্ষ্মী মেয়ে রে! তুই চলে আসবার পরের দিনই ওর আবার সেই রকম মাথা ধরে। অনুকূলের অসুখ, ঝি একজন দেশে গেছে, ঠাকুরুণ মেয়ের আমাশা—সে যে কী বিপদ, কি বলব। কিন্তু বৌমা আমার একাই এক হাতে রান্নাবান্না, রুগীর সেবা, মায় বাড়ি ধোওয়া-মোছা সমস্ত করলেন, কেউ টেরই পেলে না যে বাড়িতে কাজ করার লোকের অভাব। রান্নাও হাতের ভারি মিষ্টি, এই বয়সে এত শিখলে কোথায় তাই ভাবি।...সেই জন্যই তো উনি বললেন যে বৌমাকে রেখে এসো, রমার জন্য আর

কোনো ভাবনা থাকবে না—ছেলেমানুষ হলে কি হবে বৌমা আমার পাকা গিন্নী।'

সহসা কেদারবাবুর উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া রমানাথ বলিয়া উঠিল, 'আপনি তা'হলে এখন একটু বিশ্রাম করুন বাবা, আমি চট্ করে একবার ঘুরে আসি।'

বিস্মিত হইয়া কেদারবাবু কহিলেন, 'এখন আবার কোথায় যাবি রে? এত রাত্রে?'

'একটু দরকার আছে! এই এখানে, কাছেই যাব।'

কোনমতে জামাটা আবার কাঁধে গলাইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

॥ ৯ ॥

বহুক্ষণ পর্যন্ত গঙ্গার ধারে ধারে ঘুরিয়া রমানাথ যখন বাড়ি ফিরিল তখন কেদার-বাবু রীতিমত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। হরিদাস বলিয়াছে যে দাদাবাবু সন্ধ্যার পর কোন দিনই আর বাহির হন না। আজই এত রাত্রে তাহার এতক্ষণ পর্যন্ত বাহিরে থাকিবার কী কারণ ঘটিতে পারে তাহা বুঝিতে না পারিয়া, আর একটা কুটিল সন্দেহ কেদারবাবুর মনে দেখা দিয়াছে। বিশেষত ছেলের স্বভাববিরুদ্ধ সেই উষ্ণ কণ্ঠস্বর এখনও তাঁহার কানে বাজিতেছিল। রমানাথ বাড়ি আসিতেই তাই তিনি তাহাকে ডাকিয়া কাছে বসাইলেন, তাহার পর সস্নেহে গায়ে হাত রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'খোকা, একটা সত্যি জবাব দিবি? আমি জানি তুই সহজে মিথ্যা কথা কারুর কাছেই বলিস না, কিন্তু মানুষের লজ্জা অনেক সময়ে সত্যকে প্রকাশ করতে দেয় না।'

রমানাথ পিতার প্রশ্নটা অনুমান করিয়া লইয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিল, তবু কোন মতে গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, 'সত্যি জবাবই দেব বাবা। আপনি বলুন।'

তবুও কেদারবাবু মুহূর্ত-দুই ইতস্তত করিয়া কহিলেন, 'আমরা আসাতে কি তুই বিরক্ত হয়েছিস?'

তাঁহার একটা পায়ের দিকে চোখ রাখিয়াই রমানাথ জবাব দিল, 'না—বিরক্ত কেন হব!'

আবারও একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কেদারবাবু প্রায় চুপি চুপি কহিলেন, 'বৌমাকে—বৌমার ওপর কি কোন কারণে তুই রাগ করেছিস?'

রমানাথের কণ্ঠস্বর যেন আটকাইয়া যাইতেছিল, কোন মতে ঢোঁক গিলিয়া কহিল, 'সে কিছু না।'

কেদারবাবু ছেলেকে বরাবরই বিশ্বাস করেন, সেদিনও করিলেন। স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, 'বৌমা আমার বড় লক্ষ্মী রে। ভুল ভ্রান্তি মানুষের হয়ই—সে সব মানিয়ে না নিলে কি সংসার চলে? বয়স আর একটু হলে বুঝবি যে এমন কোন অপরাধই নেই মানুষ যা ক্ষমা করতে না পারে।'

রমানাথের ওষ্ঠে সামান্য মাত্র ব্যঙ্গের হাসি দেখা দিল। হা বৃদ্ধ! যদি সত্যের কণামাত্র তোমার কানে যাইত তাহা হইলেই এই মুহূর্তেই তুমি স্বীকার করিতে যে এমন অপরাধও আছে যাহা মানুষের পক্ষে কোনদিনই ক্ষমা করা সম্ভব নয়!

আহারের সময়ে একবার রমানাথ ভাবিয়াছিল যে অসুখের ছুতা করিবে কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে শাসন করিল। এ-সব দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া শিক্ষিত লোকের পক্ষে শোভা পায় না। তথাপি ভোজ্যের সামনে বসিয়া কেমন একটা গ্লানি তাহার আহারের রুচিকে বিড়ম্বিত করিতে লাগিল, সহস্র চেষ্টাতেও সে তাহাকে দূর করিতে পারিল না। অল্প সময়ে অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে ইন্দ্রাণীকে রন্ধনের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। তবু সে ইতিমধ্যেই অনেকগুলি পদ রাঁধিয়াছে। তাহাদের চেহারায় ও সুঘ্রাণে তাহাদের স্বাদ সম্বন্ধেও সন্দেহের অবসর থাকে না—বিশেষত পরিবেশনের পারিপাট্য এমনই পরিচ্ছন্ন যে আহারের রুচি বৃদ্ধি পাওয়াই উচিত। কেদারবাবুও নিরতিশয় তৃপ্তির সহিতই আহার করিয়া যাইতে লাগিলেন, আহারের ফাঁকে ফাঁকে তাহার প্রশংসারও বিরাম নাই, কিন্তু রমানাথের মুখের মধ্যে সেই সুস্বাদু আহার্য যেন পিণ্ডের মতই বিস্বাদ ঠেকিতে লাগিল। সে কোনমতেই পুরা খাইতে পারিল না, বাবার অনুযোগ সত্ত্বেও একসময় হাত গুটাইয়া বসিল।

কেদারবাবুর বিছানা ইতিমধ্যেই পাশের ঘরে প্রস্তুত হইয়াছিল, তিনি আহার শেষ করিয়াই শুইয়া পড়িলেন। রমানাথের ঘরে সেই সংকীর্ণ তক্তাপোশের উপরই পাশাপাশি বালিশ দিয়া দুইটি লোকের শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে—সেদিকে একবার মাত্র চাহিয়াই রমানাথ মুখ ফিরাইয়া লইয়া চেয়ারে গিয়া বসিল, তারপর টেবিল-ল্যাম্পটাকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়া একখানা দর্শনশাস্ত্রের মোটা বই লইয়া বসিল পড়িতে।

চাকরকে খাইতে দিয়া, রান্নাঘরের কাজ সারিয়া ইন্দ্রাণী অনেক দেরিতে এ ঘরে ঢুকিল। হয়তো তাহারও খাওয়া হয় নাই—কিন্তু সেটা দেখিবার লোক এখানে কেহ নাই। রমানাথ মুখ তুলিয়া চাহিল না, শুধু কপাটটা বন্ধ করিবার আওয়াজ পাইতে বইয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কহিল, 'আমি আজ ঘুমোব না, পড়াশুনো আছে। তুমি স্বচ্ছন্দে বিছানায় শুতে পার।'

ঐ পর্যন্তই। এমন কি ইন্দ্রাণী যে শেষ অবধি একটা বালিশ টানিয়া লইয়া মেঝেতেই শুইল তাহা টের পাইয়াও রমানাথ কোন প্রতিবাদ করিল না। গভীর রাত পর্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বইটাই পড়িয়া যাইতে লাগিল।

অবশেষে, গভীর রাত্রে মশার কামড় অসহ্য হওয়াতে, সে উঠিয়া পড়িল। দুইজনেরই কষ্টভোগ করার কোন অর্থ হয় না—জাগিয়া থাকিবার তো নয়ই। কিন্তু উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাহার ছায়াটা সরিয়া গিয়া টেবিল ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলো ইন্দ্রাণীর মুখের উপর পড়িল। বোধ করি সেই জন্যই, কতকটা নিজের

অজ্ঞাতসারেই রমানাথ সে দিকে চাহিয়া দেখিল এবং স্ত্রীর সম্বন্ধে অপরিসীম ঘৃণা বুকে জমিয়া থাকা সত্ত্বেও মুহূর্তকয়েক চোখ ফিরাইতে পারিল না। তাহার স্ত্রী যে এত সুন্দর তাহা সে এতদিনে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল—আজ যেন নূতন করিয়া সেই তথ্যটি চোখে পড়িল। পথশ্রমে ও মানসিক ক্লান্তিতে ইন্দ্রাণী তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য মাথার কাপড়টি সরিয়া তাহার সুপ্ত সুন্দর মুখের ছবিটি পরিপূর্ণ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কপালের উপর কবরীর প্রান্তে প্রান্তে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমিয়াছে, মশার কামড়ে শুভ্র ললাটে ও কপোলে দুই একটি রক্তবর্ণ দাগ পড়িয়াছে ইতিমধ্যেই। ঘুমের ঘোরে ঠোঁট-দুইটি ঈষৎ ফাঁক হইয়া মুক্তার মত সুন্দর দাঁতের আভাস পাওয়া যাইতেছে। রূপের সেই অপূর্ব দ্যুতিতে যে-কোন যুবকেরই মোহগ্রস্ত হইবার কথা কিন্তু সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া রমানাথের তৃষ্ণার্ত অন্তর শুধু আরও খানিকটা জ্বলিয়াই গেল—সে কোনমতে আলোটা নিভাইয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

॥ ১০ ॥

খুব জরুরী একটা মোকদ্দমার দিন ছিল বলিয়া কেদারবাবুকে পরের দিনই বাড়ি ফিরিতে হইল। সেজন্য বিস্তর দুঃখ প্রকাশ করিয়া, পুত্র-পুত্রবধূকে সংসার সম্বন্ধে যথেষ্ট উপদেশ দিয়া এবং যে কোন একটা ছুটিতে ইন্দ্রাণীকে লইয়া একবার তাহার পিত্রালয় ঘুরিয়া আসিবার অনুরোধ জানাইয়া তিনি দুইটার ট্রেনে রওনা হইলেন। রমানাথের সেদিন মাত্র এক ঘণ্টা ক্লাস ছিল, সে তাঁহাকে স্টেশনে পৌঁছাইয়া দিয়া, ক্লাস সারিয়া আরও খানিকটা অকারণে গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া একেবারে সন্ধ্যা নাগাদ বাসায় ফিরিল। কাল তবু বাবা ছিলেন, আজ একা কী করিয়া ঐ স্ত্রীলোকটির সাহচর্য্যে কাটাইবে ভাবিতে ভাবিতে সে বাড়ি ফিরিতেছিল কিন্তু উপরে উঠিতেই তাহার চোখে পড়িল হরিদাসই রান্নাঘরে রান্না করিতেছে এবং ইন্দ্রাণী দূরে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখাইয়া দিতেছে। এই ব্যবস্থায় সে যেমন নিশ্চিন্ত হইল, তেমনি ইন্দ্রাণী কাল তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছে জানিয়া একটু লজ্জিতও হইল।

হরিদাস রাত্রে তাহাকে খাবার দিয়া নিজেই কথাটা পাড়িল, 'বৌমা এলেন, আমি ভাবলুম যে এবার ভালমন্দ খেয়ে প্রাণটা বাঁচবে, নিজের যা রান্না—এ কি আর খাওয়া যায়, কোনমতে গর্ত বুজানো!···তা অভ্যেস তো নেই, কাল-আজ উপরি উপরি আগুন-তাতে গিয়ে এমন মাথা ধরল, সারা দুপুর ছট্‌ফট্‌ করেছেন। তাই বল্লুম যে আপনিই বরং দেখিয়ে শুনিয়ে দেন—আমি রাঁধি!···তা আজ কেমন হয়েছে বাবু, অন্যদিনের চেয়ে একটু ভাল হয়েছে কি?

ইন্দ্রাণীর এই অভিনয়টুকু বুঝিয়া রমানাথ মনে মনে একটু খুশীই হইল। এই সব আভ্যন্তরীণ গোলমালে ভয় সবচেয়ে ঝি-চাকরকেই, কারণ ইহারাই মুখে মুখে ঘরের কেলেঙ্কারি বাহিরে ছড়ায়।

ঘরে ঢুকিয়া রমানাথের আর একটা বড় ভয়ও দূর হইল। বিছানাতে শুধু তাহারই মস্ত বালিশ—পাশের ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল সেখানে ইতিমধ্যেই একটি নূতন ছোট তক্তাপোশ পাতিয়া ইন্দ্রাণীর শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। সে নিশ্চিন্তে পড়ার টেবিলে গিয়া বসিল।

সেখানেও আজ কিছু নূতন ব্যবস্থা চোখে পড়িল। বইগুলি এক পাশে পরিপাটি করিয়া সাজানো—অন্যপাশে খাতাপত্র কাগজ-কলম এমন সুবিধাজনক ভাবে রাখা হইয়াছে যে রমানাথ খুশি না হইয়া পারিল না। যদিচ পরক্ষণেই, সে সজ্জার মধ্যে কাহার হাতের স্পর্শ ও সেবা করিবার ইচ্ছা আছে বুঝিয়া, ঘৃণায় তাহার মন রি রি করিয়া উঠিল। মনে হইল বইগুলিই অপবিত্র হইয়া গিয়াছে। সে খানিকটা পড়িবার চেষ্টা করিয়াও পারিল না, তখন জোর করিয়া আবার সমস্তটা এলোমেলো করিয়া লইয়া তবে শান্ত হইয়া পড়াশুনায় মন দিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা দর্শনের বই পড়িবার পর সে প্রায় সেটাতে ডুবিয়া গিয়াছে এমন সময় খুব মৃদু একটা অলঙ্কারের শব্দ পাইয়া চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল ইন্দ্রাণী ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দরজার ঠিক পাশটিতে দাঁড়াইয়া আছে। এই অলঙ্কারের শব্দে চমক ভাঙ্গিবার কত স্বপ্নই দেখিয়াছে সে এককালে। কিন্তু সে জন্য নয়—তাহার আহারের পর বহুক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে, চাকরের কাজ করার শব্দও বন্ধ হইয়াছে প্রায় এক ঘণ্টার উপর—সমস্ত বাড়ি নির্জন হইয়াছে তখন হইতেই। অকস্মাৎ এত রাত্রে এই উপদ্রবের ঠিক কারণটা অনুমান করিতে না পারিয়া শুধু বিরক্তি নয়, আতঙ্কেও মন ভরিরা উঠিল।

ইন্দ্রাণী যতটা সম্ভব অন্ধকারেই দাঁড়াইয়াছিল। বোধ হয় রমানাথের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়াই সে দ্রুত কথাটা সারিয়া লইল। খুব মৃদু অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে কহিল, 'চাকর ঘুমিয়ে পড়ার জন্য অপেক্ষা করছিলুম বলেই এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করতে হ'ল। চাকরের মুখে-মুখেই অনেক কথাই বাইরে ছড়ায়—অন্তত ওর সামনে যদি দরকার-মত দু-একটা কথা না বলেন তা'হলে ও বিশ্রী সব সন্দেহ করবে।...এই আলাদা ঘরের জন্যই ওকে অনেক মিথ্যা কথা বলতে হয়েছে।'

কথা কয়টা শেষ করিয়াই সে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু রমানাথ আর কিছুতেই পড়ায় মন দিতে পারিল না। ইন্দ্রাণীর কথাগুলি খুবই সত্য—কিন্তু চাকরের সামনেই হোক্ আর যে ভাবেই হোক্ স্ত্রীর সহিত সহজভাবে সে কথা বলিতেছে এটা যেন কিছুতেই কল্পনা করিতে পারা যায় না!

পরের দুই-তিনটা দিন নিরুপদ্রবেই কাটিল। রমানাথ ভোরবেলাই বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়, বেড়ানো ও ছেলে পড়ানো শেষ করিয়া ফেরে একেবারে দশটা নাগাদ, তাহার পর আহার করিয়াই কলেজে বাহির হয়—সকালে ক্লাস না থাকিলেও প্রোফেসরস্ রুমে গিয়া নিজের বই লইয়া পড়াশুনা করে! অপরাহ্ণেও স্নান ও জলযোগ শেষ করিয়াই সে বাহির হইয়া পড়ে—কোনদিন গঙ্গার ধারে, কোনদিন বা লাইব্রেরীতে। সে দিন রাত্রে ইন্দ্রাণীর কথাটার যাথার্থ্য বুঝিয়ে

পরের দিন সকাল বেলাতেই চাকরের সামনে তাহাকে ডাকিয়া সংসার খরচের টাকা বুঝাইয়া দিয়াছিল। তা-ছাড়া 'ভাত দিতে বলো' 'হরিদাসকে ডেকে দাও' ইত্যাদি দু-একটি কথাও সে চেষ্টা করিয়া বলে।

ইন্দ্রাণী সাধ্যমত তাহার দৃষ্টির আড়ালেই থাকে। হরিদাসই সব কাজ করে, রান্না করা, জলখাবার দেওয়া, ভাত দেওয়া সব—যদিও সমস্তটার অন্তরালে ইন্দ্রাণীর সজাগ সতর্ক দৃষ্টি এবং নির্দেশ থাকে। জলখাবার সে-ই সাজাইয়া দেয় কিন্তু পাঠায় হরিদাসের মারফত। হরিদাস যখন পরিবেশন করে তখন সে রান্নাঘরে থাকে বটে কিন্তু সেইখান হইতেই রমানাথের থালার দিকে নজর রাখে। ইচ্ছা হয় খাওয়ার সময় একটা পাখা লইয়া অন্ততঃ পিছন হইতে বাতাস করে কিন্তু সাহসে কুলোয় না—যদি তাহার খাওয়া বন্ধ হয়!

খালি একটি ব্যাপারে রমানাথ তাহার উপস্থিতি কিছুতেই ভুলিতে পারে না। বিছানা, টেবিল, জামা-কাপড় প্রভৃতি গৃহশয্যার পারিপাট্যে সে বুঝিতে পারে যে হরিদাস নয়—তাহার মনিবপত্নীর হাতের স্পর্শ আছে ইহার মধ্যে। এবং সে-শৃঙ্খলার মধ্যে সে আরাম পাইলেও অধিকাংশ সময়ই তাহার মন রি রি করে। প্রতিদিনই শয়নের সময় মনে হয় কোন ক্লেদাক্ত বস্তুকে স্পর্শ করিতে যাইতেছে। অথচ এখনকার এই কোমল উষ্ণ শুভ্র শয্যার সহিত আগেকার ময়লা বিছানার যে তুলনাই হয় না, তাহা অন্তত নিজের কাছে যে স্বীকার করিতে বাধ্য।

যাহা হউক তবু তিন-চারদিনে রমানাথ খানিকটা সওয়াইয়া লইয়াছিল, সহসা শনিবার দিন অপরাহ্নে সে বাহির হইয়া পড়িবার পূর্বেই তাহার বাবার উকীল-বন্ধু অক্ষয়বাবু সপরিবারে আসিয়া হাজির হইলেন। অক্ষয়বাবু বাড়ি ঢুকিয়াই কহিলেন, 'এই যে বাবাজী, শুনলাম কেদার এসেছিল, তা আমার সঙ্গে দেখা না করেই পালাল! সেখানে গিয়ে চিঠি লিখেছে যে যেতে পারিনি মোকদ্দমা ছিল অমুক-তমুক—এইসব! তার চিঠিতেই জানলুম যে বৌমা এসেছেন আর এখানেই আছেন। আজ চিঠি পেয়েই তোমার খুড়ীমাকে বললুম, আর এক মিনিট দেরি নয়—চলো বৌমার খবর নিয়ে আসি।'

রমানাথের বুকের মধ্যে যেন হিম হইয়া গেল। দূর প্রবাসে এ সব সামাজিকতার প্রয়োজন হইবে না, এই ছিল তাহার বিশ্বাস। বাবা যে এমন সর্বনাশ করিবেন—তাহা সে কল্পনাও করে নাই। এইসব ব্যাপারে হয় তাহাকে ইন্দ্রাণীর সহিত কিছু কিছু সহজ কথোপকথন মেলামেশা করিতে হইবে, নহিলে আসল সত্যের সবটা না হউক খানিকটা প্রকাশ করিতে হইবে। দুইটাই সমান অসম্ভব!

অবশ্য অক্ষয়বাবু তাহাকে বেশীক্ষণ চিন্তারও অবসর দিলেন না! 'আমার বৌমা কোথায় গো!' বলিয়া একেবারে রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রাণী পূর্বেই তাঁহাদের আগমনের শব্দ পাইয়াছিল। তাহাদের কথোপকথনের মধ্য হইতে ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইতেও বাধে নাই—কতকটা সেই জন্যই বিবর্ণ মুখে রান্নাঘরে আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু এখন আর উপায় নাই দেখিয়া বাহির হইয়া আসিয়া অক্ষয়বাবু ও তাঁহার স্ত্রীকে প্রণাম করিল।

অক্ষয়বাবু 'বৌ' দেখিয়া হৈচৈ করিয়া উঠিলেন। পিছন ফিরিয়া রমানাথের পিঠে একটা চাপড় মারিয়া কহিলেন, 'Congratulations'! রাস্কেল, তুমি এমন বৌ নিয়ে এখানে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছ!...ওসব হবে না, আমি এখনই নিয়ে সারা খাগড়া ঘুরে আসব। আমার এমন সোনার মা-লক্ষ্মী এসেছেন—দেখাবো না!'

রমানাথ জবাব দিল না, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কোন মতে নিজেকে সামলাইয়া লইল। ইন্দ্রাণীও প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের বিবর্ণ মুখে সলজ্জ হাসি ফুটাইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে লইয়া গেল!

তাহার পর রাত্রি নয়টা পর্যন্ত চলিল গল্প-গুজব হাসি-হল্লা। তাহার মধ্যে আতিথেয়তার কোন ত্রুটি হইল না—খাদ্য চা সেই সব আড্ডারই ফাঁকে ফাঁকে প্রস্তুত হইল, ইন্দ্রাণীর তরফ হইতে অনুরোধ উপরোধেরও ত্রুটি হইল না—এক কথায় সে তাহার গৃহিণীপনার কর্তব্য সম্পূর্ণরূপেই পালন করিল।

রমানাথের বিমূঢ় ভাবটা কাটাইয়া লইতে বিলম্ব হইলেও শেষ পর্যন্ত সে সামলাইয়া লইল, কিন্তু কিছুতেই বিস্তর চেষ্টা করিয়াও ইন্দ্রাণীর মত সহজ হইতে পারিল না। সে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল স্ত্রীর দিকে, কত সহজে কেমন সুন্দর মুখোশ পরিয়া সে কথা কহিতেছে, হাসিতেছে, লজ্জিতমুখে অক্ষয়বাবুর বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ কৌতুকগুলির প্রতিবাদ করিতেছে—কী সহজেই অভিনয় করিয়া যাইতেছে সে! ইহাতে তাহার মনে নূতন করিয়া বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেলেও ইন্দ্রাণী যে বাহিরের লোকের কাছে এমন করিয়া সমস্ত গ্লানিকে ঢাকিয়া লইতে পারিয়াছে সে জন্য কৃতজ্ঞ না হইয়াও পারিল না।

অক্ষয়বাবু বিদায় গ্রহণের পূর্বে পরের দিন তাঁহার বাড়ি নিমন্ত্রণ জানাইয়া গেলেন। রমানাথ সেটাকে এড়াইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, দেরী করিয়া বাড়ি ফেরার অজুহাত জানাইল, শরীর খারাপের কথাটাও পাড়িল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—অক্ষয়বাবুর আন্তরিকতার কাছে সমস্ত যুক্তি ভাসিয়া গেল। ইন্দ্রাণীও নিমন্ত্রণ এড়াইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু একে সে ছেলেমানুষ তায় নূতন বধূ, অনেক কথাই তাহাকে চুপ করিয়া মানিয়া লইতে হয়—বেশী জেদ করা তাহার শোভা পায় না।

অক্ষয়বাবু চলিয়া গেলে রমানাথ অনেকক্ষণ নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শুধু একবারের মত হইলে কোন মতে সহ্য করা যায়, কিন্তু ইহা যে সামাজিকতার সবে শুরু নয় তাহার প্রমাণ কি? একটা মিথ্যা যে সহস্র মিথ্যার ঘূর্ণিপাকে টানিয়া লইয়া যায়—তাহা সে ইতিমধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছে। কী কুক্ষণেই সে নিজের দুর্ভাগ্যকে ছদ্মবেশ পরাইতে গিয়াছিল! এখন আর পলায়নের পথ পর্যন্ত খোলা নাই। সে খাগড়া ছাড়িয়া যাইতে পারে কিন্তু যেখানেই যাক—মানুষের মধ্যে বাস করিতে হইবে তো!

রমানাথ 'আলোটা নিভাইয়া দিয়া অন্ধকারেই বসিয়াছিল। সহসা কী একটা শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল দ্বারপ্রান্তে ইন্দ্রাণী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে সেইখান

হইতেই কহিল, 'হরিদাস আপনার খাবার দিয়েছে !'

তাহার পর একটুখানি ইতস্তত করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া অর্ধস্ফুট কণ্ঠে কহিল, 'কাল—কাল যদি আমি অসুখ করার অজুহাতে না যাই ?'

প্রাণপণে বিরক্ত দমন করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও রমানাথের কণ্ঠ তীক্ষ্ণ শোনাইল, সে জবাব দিল, 'অসুখের অজুহাতে কটা নিমন্ত্রণ এড়াবো ? মিছিমিছি অক্ষয়বাবুর মত লোককে মনঃক্ষুণ্ণ করে লাভ কি ?'

ইন্দ্রাণীর আর দীর্ঘনিঃশ্বাসও পড়ে না। সে অন্ধকারে খানিকটা নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

॥ ১১ ॥

সে যেন একটা দুঃস্বপ্ন ! কলেজের ফেরত আসিয়া সকাল করিয়া স্নান সারিয়া প্রসাধন করিতে হইল। তাহার পর গাড়ি ডাকাইয়া একই গাড়িতে মুখোমুখি বসিয়া যাত্রা করিতে হইল অক্ষয়বাবুর উদ্দেশ্যে। সংকীর্ণ গাড়ি হাঁটুতে হাঁটুতে না ঠেকিয়া উপায় নাই। তবু পাশাপাশি বসার চেয়ে ভাল বলিয়া রমানাথ সামনেই বসিয়াছিল। যদিচ এ ব্যবস্থায় আর একটা যে বড় রকমের অসুবিধা আছে সেটা সে আগে বুঝিতে পারে নাই। এত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে অসাধারণ রূপবতী এবং সুসজ্জিত একটি কিশোরী যদি ঠিক সামনেই বসিয়া থাকে তো ঘৃণা যত বড়ই হউক্ —চোখ বার বার সেই দিকেই ফিরিয়া ফিরিয়া যায়। তাহাতে শুধু যে নিজের অপরিসীম দুর্ভাগ্যের কথাটাই বার বার মনে পড়ে তাই নয়—চিত্তদাহের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বিদ্বেষটা আরও বাড়িয়া যায়। মনে হয় এ অভিনয় এই মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া এই সর্বনাশীকে দূর করিয়া দিয়া এখান হইতে ছুটিয়া আসিয়া কোথাও পলাইয়া যায়, অথচ শেষ পর্যন্ত তাহাও পারে না। নিষ্ফল ক্রোধের দহনে শুধু জ্বলিতে থাকে !

অক্ষয়বাবু কেবল রমানাথদেরই নিমন্ত্রণ করেন নাই—আরও জনকতককে বলিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল রমানাথকে পরিচিত করা—দলে ভিরাইয়া দেওয়া। রমানাথ যে কাহারও সহিত মিশিতে চাহে না, তাহা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেটা তাঁহার ভালো লাগে নাই। সেই জন্যই তিনি এই কৌশলে রমানাথকে অধিকতর সামাজিক করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

রমানাথ প্রথমটা দুই চারিজন লোক দেখিয়া খুশী হইয়াছিল—বেশী লোকের মধ্যে স্ত্রীর সান্নিধ্যটা তেমন অন্তরঙ্গ বলিয়া বোধ হয় না—অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকা যায়। কিন্তু তাঁহারা যখন আলাপ করিতে শুরু করিলেন, এমন কি একজন স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে তিনি পরের দিন আলাপ করিতে রমানাথদের বাসায় যাইবেন তখন সে প্রমাদ গণিল—বুঝিল তাহার আশঙ্কাই সত্য, উপদ্রবের এই সবে শুরু।

আহারাদি ও আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে সন্ধ্যা কাটিয়া ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। পুরুষদের চোখে স্পষ্ট ঈর্ষা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা রমানাথের বুঝিতে

দেরি হয় না। এই মিথ্যা ঈর্ষাটাতেই তাহার আপত্তি সবচেয়ে বেশী, কিন্তু উপায় কি ? বিদায়ের সময় অক্ষয়বাবুর স্ত্রী বলিয়া দিলেন, 'কী লক্ষ্মী বৌ বাবা, রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। বহু জন্মের তপস্যা ছিল তাই তোমার মা এমন লক্ষ্মী পেয়েছেন। আমাদের যেমন বরাত !'

তাঁহার নিজের পুত্রবধূর বর্ণ শ্যাম—এই ক্ষেদোক্তি বোধকরি সেই কারণেই। কিন্তু রমানাথের ওষ্ঠের কোণে আজ সন্ধ্যার পর হইতে এই প্রথম অতি ক্ষীণ একটা ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী ! তাই বটে।

পরের দিন হইতেই দুই একটি করিয়া প্রতিবেশীরা আসিতে শুরু করিলেন। কলেজের অন্য অধ্যাপকরা এতদিন ঘনিষ্ঠতা করিবার সুযোগ পান নাই, অক্ষয়বাবুর বাড়িতে সেদিন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের দেখাদেখি যাঁহারা ছিলেন না, তাঁহারাও উৎসাহ পাইয়া আসিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রাণান্ত হইতে লাগিল দুইজনেরই—রমানাথকে আতিথ্যের খাতিরে ইন্দ্রাণীর সহিত কথা কহিতে হয়, আর ইন্দ্রাণীকেও অভিনয় নিখুঁত করিবার জন্য—তাহার সৌভাগ্য যে কত বড়, সলজ্জ হাস্যে তাহাই প্রমাণ করিতে হয়। এই অভিনয়ের অসারতা, ইহার মিথ্যা দুইজনকেই আঘাত করে প্রতি মুহূর্তে অথচ কেহই ইহার ক্লেদাক্ত নাগপাশ হইতে মুক্তি পায় না। শুধু রমানাথের সমস্ত বিরক্তি অধিকতর বিদ্বেষে পরিণত হইতেছে। বুঝিয়া ইন্দ্রাণী শঙ্কিত হইয়া উঠে।

অথচ, এই সব মেলামেশায়, আতিথেয়তায় ইন্দ্রাণীর যে সহজ সুন্দর গৃহিণী-রূপটি ফুটিয়া ওঠে, তাহার দিকে চাহিয়া রমানাথ মুগ্ধ না হইয়াও পারে না। সে যে প্রাণপণে অভিনয় করিতেছে রমানাথেরই সম্মান রক্ষার জন্য, তাহাতে তো সন্দেহ নাই। রমানাথ যে নিষ্ঠুর শাস্তি তাহাকে দিয়াছে, তাহার গুরুভার নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত ইন্দ্রাণীর সারা অন্তর দলিয়া পিষিয়া দিতেছে—অথচ সে কেমন হাসিমুখে সে শাস্তি বহন করিতেছে। এটুকু যদি সে না করিত তো রমানাথকেই লজ্জায় পড়িতে হইত, অপমানিত হইতে হইত।...

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি নিমন্ত্রণে যাইতে হইল। আবার সেই সাজসজ্জা, সেই নির্জন গাড়িতে পীড়াদায়ক সান্নিধ্য। কিন্তু রমানাথ এই উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইবার কোন পথই খুঁজিয়া পায় না। এমন কি তরুণ বন্ধুদের বাড়ি গিয়া অনেক সময়ে পরিহাসের ঘূর্ণাবর্তেও জড়াইয়া যাইতে হয়—পরস্পরের সহিত লোক দেখানো দুই একটি রসিকতাও না করিয়া পারে না।

এমনি করিয়া মাসখানেক কাটিবার পর একটা কথা রমানাথ না বলিয়া পারিল না। হরিদাসকে দিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইয়া অপরদিকে চাহিয়া কথাটা পাড়িল, 'আমরা সবাইকার বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াচ্ছি—এক আধবার ওঁদের না করলে বড় খারাপ দেখাচ্ছে !'

ইন্দ্রাণী নতমুখেই জবাব দিল, 'সে কথা আমিও ভেবেছি কিন্তু সাহস ক'রে বলতে পারি নি।' তাহার পর মুহূর্ত-দুই চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'অক্ষয়-

কাকাবাবুদেরও তো বলতে হয় তা'হলে—'

কথাটার গূঢ় অর্থ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া রমানাথ ঈষৎ বিস্মিত হইয়া কহিল, 'হ্যাঁ, তা বলতে হবে বৈকি !'

একটুখানি ইতস্তত করিয়া ইন্দ্রাণী বলিল, 'হরিদাসের রান্না ভালও নয়, তা ছাড়া অক্ষয়বাবু কি ওর হাতে খাবেন ?'

রমানাথ খানিকটা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া কহিল, 'তুমিই রেঁধো। আর বরং গাড়ী ডাকিয়ে হরিদাসকে সঙ্গে করে অক্ষয়বাবুদের নিমন্ত্রণ করে এসো।'

ইন্দ্রাণী মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'কবে হবে, আর কাকে কাকে বলতে হবে বলে দিন।'

'হবে—তোমার সুবিধে—ধরো রবিবার ? তুমি শুধু অক্ষয়বাবুদেরই বল—বাকী যাদের বলবার আমিই বলব।'

'ক জন ?'

রমানাথ মনে মনে একটা হিসাব করিয়া বলিল, 'জন-কুড়ির বেশী না।'

'কুড়ি জন !' ইন্দ্রাণীর প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার মুখ দিয়া কথাটা বাহির হইয়া গেল। অপাঙ্গে একবার তাহার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রমানাথ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, 'হ্যাঁ, তার কমে হয় না। তা নইলে দু'দিন ধরে করতে হয়। ওসব ঝামেলা আমার ভাল লাগে না।'

ইন্দ্রাণী আর কথা না কহিয়া চলিয়া গেল। এখানে আসিবার পর আজই প্রথম নির্জনে তাহাদের এতগুলি কথা হইল। অতি ম্লান এবং ক্ষীণ একটা হাসির রেখা তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটিয়া উঠিল।

ঠিক সেই সময়ে রমানাথও ঐ কথাটাই ভাবিতেছিল। তাহার মনে হইল যে এতগুলি কথা কহিয়া, তা সে যে কথাই হউক—যেন বড় বেশী প্রশ্রয় দেওয়া হইল ইন্দ্রাণীকে। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, যেমন করিয়াই হউক, এই সব সামাজিকতা বন্ধ করিতে হইবে, নহিলে নিজের অনিচ্ছাতেও স্ত্রীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে বাধ্য হইয়া পড়িবে !

ইন্দ্রাণীর বাপের বাড়ির পরিবার ছোট, তাছাড়া সেখানে মা আছেন, রান্না শিখিলেও নিজের দায়িত্বে বেশী লোকের রান্না করিতে হয় নাই কখনও। শ্বশুর বাড়িতেও দুটি কি তিনটি দিন রাঁধিয়াছিল বটে, কিন্তু সে-ই বা লোক ক' জন ? সহসা কুড়ি বাইশটি লোকের দায়িত্ব ঘাড়ে চাপায় সে একটু বিপন্ন বোধ করিল। কিন্তু উপায়ও নাই, রমানাথ একদিনেই সব ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া দিতে চায়। সে যখন নিজে হইতে বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নয় তখন ইন্দ্রাণীও তাহাকে কোন অনুরোধ করিবে না। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে।

লোক রবিবারে কুড়ি ছাড়াইয়া তেইশে উঠিল, বাড়ির লোক তো আছেই। শনিবার রাত্রে রমানাথ হরিদাসকে প্রশ্ন করিল, কী রে, তোরাই পারবি, না ঠাকুর দেখব ?'

হরিদাস ইন্দ্রাণীকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই উত্তর দিল 'খু-ব, খুব! মা আমার একাই একশ'টা ঠাকুরের সমান।'

অবশ্য ইন্দ্রাণী জানিলেও ঠাকুর আনিতে দিত না, যেমন করিয়াই হউক সে অসাধ্য সাধন করিবে, এই ছিল তাহার প্রতিজ্ঞা।

রবিবার সকাল হইতেই সে শুরু করিয়া দিল। অনেক রকমের রান্না—শনিবার রাত্রি দুইটা পর্যন্ত জাগিয়া হরিদাসের সাহায্যে সে সব যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল—তবুও কম সময় লাগিবে না। ইহারই ফাঁকে ঝোল ভাত করিয়া সে রমানাথ আর হরিদাসকে খাওয়াইয়া দিয়াছিল—কিন্তু নিজের শুধু এক গ্লাস জল ছাড়া আর কিছু খাওয়ার সময় হইল না! সমস্ত দিন উপবাসে আর আগুন-তাতে কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় সে খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তবু তাহারই উপর প্রসাধন করিয়া মুখে হাসি টানিয়া অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করিতে হইল এবং দুই-তিন দফায় পরিবেশন করিয়া অতগুলি লোককে খাওয়াইতে হইল। সব শেষ করিয়া, হরিদাসকে খাওয়াইয়া রান্নাঘরের কাজ সারিয়া গভীর রাত্রে যখন তাহার সত্য-সত্যই অবসর মিলিল তখন মাথা ঘুরিতে শুরু হইয়াছে—তাহার আর তখন আহারের অবস্থা নাই। তবু একটি প্লেটে করিয়া একটু দই আর একটি মাত্র মিষ্টান্ন লইয়া যেমন সে সামান্য একটু মুখে তুলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত দেহ আলোড়িত হইয়া উঠিল। ছুটিয়া নর্দমার ধারে গিয়া বমি করিতে করিতেই অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

রমানাথ তাহার উপবাসের খবর না রাখিলেও পরিশ্রমের পরিমাণটা বুঝিয়াছিল এবং অপরিসীম শুষ্ক মুখটাও লক্ষ্য না করিয়া পারে নাই। সবচেয়ে সে বিস্মিত হইয়াছিল একটা ব্যাপারে—ইন্দ্রাণী অত পরিশ্রমের পরেও শুধু যে অভ্যর্থনার সমস্ত ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিল তাহাই নয়—তাহার পুরুষ অতিথি-গুলিকেও স্বল্প পরিচয়ের সমস্ত জড়তা কাটাইয়া তাহার সুমধুর অথচ আত্মসম্মান-বিশিষ্ট অন্তরঙ্গতায় অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাতে রমানাথের দায়িত্ব অনেকখানি কমিয়া যাওয়াতে সে সত্য সত্যই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল বটে, কিন্তু মনের কাছে স্বীকার করিয়া পারে নাই যে ঠিক এই রকম স্ত্রীই সমস্ত পুরুষের কাম্য। তাহার ফলে নিজের হিমালয়-সদৃশ দুর্ভাগ্যের বোঝা বৃহত্তর হইয়াই দেখা দিয়াছিল।

সে অন্ধকারে বসিয়া প্রাণপণে এই চিন্তা হইতেই নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে হরিদাস ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া সংবাদ দিল, 'বাবু, শিগগির আসুন—বৌমা কেমন করে পড়ে আছেন নর্দমার ধারে!'

রমানাথ এ সংবাদটার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। ইন্দ্রাণীর অপরিসীম সহ্যগুণ দেখিয়া সে ভাবিয়াছিল অপরাধিনীর সহনশীলতার বুঝি শেষ নাই। সে মুহূর্ত-কয়েক শূন্যদৃষ্টিতে হরিদাসের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই সংবাদটার পিছনে আরও কত কী থাকিতে পারে কল্পনা করিয়া তাহার ললাটে

ঘাম দেখা দিল। ইন্দ্রাণী আত্মহত্যা করে নাই তো! সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু অপ্রিয় প্রসঙ্গ এবং সম্ভাবনা মনে ভিড় করিয়া আসিল।

হরিদাস ঈষৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিল, 'বাবু আসুন!'

রমানাথ যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিল কহিল, 'যাচ্ছি, আলোটা নে।' তাহার পর তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া ইন্দ্রাণীকে ধরিয়া তুলিল। গায়ে হাত দিয়াই বুঝিতে পারিল যে ভয়ঙ্কর কিছু নয়—এমনিই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। তখন হরিদাসকে জল দিতে বলিয়া সে নিজেই তাহার মুখটা ধুইয়া দিল, তাহার পর কোন মতে ধরিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া ইন্দ্রাণীর নিজের বিছানাতে শোয়াইয়া দিল।

হরিদাস উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে কহিল, 'ডাক্তার ডাকব, বাবু?'

রমানাথ কয়েক-মুহূর্ত ইন্দ্রাণীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, 'বোধ হয় ডাক্তার লাগবে না, তুই পাখাটা এনে মাথায় একটু বাতাস করা!'

সে নিজে একটা গ্লাস হইতে জল লইয়া তাহার মুখে মাথায় ছিটাইয়া দিতে দিতে হরিদাসকে সহসা প্রশ্ন করিল, 'হ্যাঁ রে, ও দুপুরবেলা ভাত খেয়েছিল?'

হরিদাস বিহ্বল-দৃষ্টিতে মনিবের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'ভাত? তা খেয়েছেন বৈ কি!'

'তুই দেখেছিস খেতে?'

তখন হরিদাকে স্বীকার করিতেই হইল যে সে দেখে নাই। তাহার পর মনে মনে সারাদিনের ঘটনাকে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, 'না বাবু, খান নি বোধ হয়। কৈ, কখন খেলেন? ইস্…তাইত, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে তো আমাদের!'

'হুঁ। এইবার বোধ হয় জ্ঞান হচ্ছে একটু একটু ক'রে। তুই এক কাজ কর—বাতাস দে ভাল ক'রে। তারপর একটু ঘোল তৈরি ক'রে দিস বেশী ক'রে লেবুর রস দিয়ে। এখন আর সারাদিনের পর অন্য কিছু যেন না খায়।'

তারপর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়া যেন ঈষৎ একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, 'কেমন থাকে শুতে যাবার আগে খবর দিস্।'

সে এ ঘরে আসিয়া অন্ধকারের মধ্যেই চেয়ারখানা টানিয়া আনিয়া জানালার ধারে বসিল। এখন ঘুম আসা উচিত নয়—সম্ভবও নয়। মনের মধ্যে উদ্বেগও ছিল যথেষ্ট। সে বসিয়া হরিহাসের খবরের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল নিজেদের বিচিত্র সম্পর্কের কথা। স্বামী-স্ত্রী, নিতান্ত সহজ ভাবেই বাস করিতেছে তাহারা, সামাজিক সমস্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব একত্রে পালন করিতেছে, তাহার প্রতিটি ইচ্ছা সমস্ত শক্তি দিয়াও তাহার স্ত্রী পূর্ণ করিতেছে—ইহা অপেক্ষা সাধারণ এবং বাঞ্ছনীয় ব্যাপার কি আছে? অথচ এত কাছে বাস করিয়াও সেই স্ত্রী সারাদিন অনাহারে থাকিয়া তাহারই নিমন্ত্রিত অতিথিদের সম্মানরক্ষার্থ অমানুষিক পরিশ্রম করিল—সে তাহার খবরও রাখিল না। এমন কি তাহার মনের মধ্যে ভদ্রবংশের সমস্ত সংস্কার এখন যে অনুতপ্ত হইতে চাহিতেছে—তাহাতেই তাহার যেন বিস্ময়! এ তাহাদের কী জীবন? সে প্রাণপণে বাহিরের অন্ধকারের

দিকে চাহিয়া কাহাকে যেন বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিল, 'কবে এ প্রহসনের শেষ হবে—কতদিন আর এমন করে কাটাব ?'

সহসা তাহার চমক ভাঙ্গিল হরিদাসের কণ্ঠস্বরে, সে অন্ধকার দেখিয়া বাহির হইতেই প্রশ্ন করিতেছে, 'বাবু কি ঘুমিয়ে পড়েছেন ?'

'না রে। ভেতরে আয়।'

হরিদাস ভিতরে আসিয়া কহিল, 'মার জ্ঞান হয়েছে বাবু। এখন অনেকটা ভাল বোধ করছেন।'

'ঘোল খাইয়েছিস ?'

'হ্যাঁ বাবু। খেতে চাইছিলেন না, আপনার নাম করে বললুম তখন খেলেন।'

'খাবার পর আর বমি-টমি হয় নি তো ?'

'না। এখনও কিছু হয় নি।'

'চুপ করে শুয়ে থাকতে বল কিছুক্ষণ—ঘুমিয়ে পড়তে পারে তো ভাল হয়। তুই এবার শুতে যা।'

হরিদাস একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'এখন কি শুতে যাওয়া ঠিক হবে ?'

রমানাথ কহিল, 'আমি তো জেগেই আছি, আমি দেখবে'খন তুই যা।'

হরিদাস চলিয়া গেলে রমানাথ ছাদে বাহির হইয়া পড়িল। আরও কিছুক্ষণ না দেখিয়া সকলের ঘুমাইতে যাওয়া উচিত নয় তাহা সে-ও জানিত অথচ সারাদিন হরিদাসের যে পরিশ্রম হইয়াছে তাহার উপর এক মুহূর্তেও বিলম্ব করানো উচিত নয়। তবু হরিদাস যে ইন্দ্রাণীর শয়ন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিল, সেই জন্যই সে মনে মনে নিজেকে কৃতজ্ঞ বোধ না করিয়া পারিল না।

রাত্রি গভীর হইয়াছে, বোধ হয় শেষ হইবারও বেশী দেরী নাই। রমানাথ অনেকক্ষণ ঘড়ি দেখে নাই, তবু আকাশের দিকে চাহিয়া অনুমান করিল যে রাত দুইটার কম হইবে না।…দ্বাদশীর চাঁদ পশ্চিম আকাশের শেষ প্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছে—গঙ্গার দিক হইতে তখনই ভোরাই হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছে।

বহুক্ষণ পায়চারি করিবার পর রমানাথ ইন্দ্রাণীর ঘরের সামনে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। ভিতর হইতে কোন শব্দই পাওয়া যাইতেছে না, বোধ করি ঘুমাইয়াই পড়িয়াছে। তবুও একবার খবর লওয়া কর্তব্য কি না বুঝিতে পারিয়া সে দ্বিধায় পড়িল। যদি শরীর আরও খারাপ বোধ হয় তাহা হইলে ইন্দ্রাণী নিজে হইতে স্বামীকে ডাকিবে না এটা ঠিক—চাকরকেও কষ্ট দিতে চাহিবে না। এমনি নানা কথা ভাবিয়া সে খবর লওয়াই প্রয়োজন স্থির করিল এবং আর একটু ইতস্তত করিয়া এক সময়ে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

নিজে হইতে স্বেচ্ছায় স্ত্রীর খবর লইতে আসা এই-ই তাহার প্রথম। এরূপ অবস্থা যে কোনদিন হইতে পারে তাহা সে মাসখানেক আগে কল্পনাও করিতে পারিত না। শুধু তাহাই নয়, কে জানে কেন, বোধ হয় কোথায় একটু অনুতাপের সুর তাহার মনের মধ্যে বাজিয়াছিল বলিয়াই, সে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

বিছানার পাশেই টুলের উপর আলোটা জ্বলিতেছে, তাহারই আলোতে একবার মাত্র ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে চাহিয়াই রমানাথ বুঝিল যে সে ঘুমাইয়াছে। তখনই চলিয়া আসিতেছিল, সহসা তাহার সন্দেহ হইল যে আবার মূর্ছা হয় নাই তো? দরজার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিয়া রমানাথ আলোটা বাড়াইয়া দিল, তারপর হেঁট হইয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল যে মূর্ছা নয়, ইন্দ্রাণী ঘুমাইয়াই পড়িয়াছে।

সে নিশ্চিন্ত হইল বটে কিন্তু তখনই চোখ ফিরাইতে পারিল না। ইন্দ্রাণীর অসাধারণ সুন্দর মুখ সারাদিনের উপবাস, পরিশ্রম এবং আগুনের তাপে ঈষৎ শুকাইয়া এমন এক অপূর্ব পাণ্ডুরতা লাভ করিয়াছে যে সেদিকে চাহিলে কোন লোকেরই চোখ ফিরানো সম্ভব নয়। সন্ধ্যার সযত্ন রচিত কবরী জলে ভিজিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই চূর্ণ-কুন্তলে ঘেরা মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ রমানাথের বুকের মধ্যটা যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল। ঐ যে সুন্দর তনুলতা শুভ্র শয্যার উপর এলাইয়া পড়িয়াছে, সুগোল, সুগৌর ঐ যে বাহুখানি শয্যার প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে এ যেন একটা স্বপ্ন—যে স্বপ্ন সে কৈশোরের প্রথম দিনটি হইতে কোন্ এক নামহারা লগ্নে দেখিতে শুরু করিয়াছে, যে স্বপ্ন যৌবনের প্রতি দিন-রাত্রিটি আচ্ছন্ন করিয়াছিল—বিবাহের পরেও কারাগারে বসিয়া বসিয়া যে স্বপ্ন সে দেখিয়াছে। ইহার সহিত কোন বাস্তবের সম্পর্ক নাই, কোন রূঢ় সত্য যেন ইহাকে কোনদিন কলঙ্কিত করে নাই—বহুদিন পরে আজ যেন সেই স্বপ্নই বহু বিষাক্ত মুহূর্তকে অতিক্রম করিয়া তাহার অন্তরের মধ্যে একান্ত ভাবে ধরা দিয়াছে।

রমানাথ একবার প্রাণপণ চেষ্টায় সোজা হইয়া দাঁড়াইল কিন্তু তবু চলিয়া যাইতে পারিল না। স্থান-কাল-পাত্র সমস্তই তখন তাহার মাথার মধ্যে যেন গোলমাল হইয়া গিয়াছে। এ যেন কী এক ভয়ঙ্কর নেশায় তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, কিছুতেই কোন মতে সে-নেশা হইতে সে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছে না। রমানাথ সহস্র চেষ্টাতেও ইন্দ্রাণীর দিক হইতে চোখ ফিরাইতে পারিল না—এবং সেদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার বুভুক্ষু যৌবনের তৃষ্ণা যেন অত্যুগ্র অসহ্য হইয়া উঠিল, দেহের রক্তকণাগুলি যেন তরল অগ্নির মত শিরা-উপশিরা বাহিয়া ক্রমে ক্রমে মাথায় উঠিতে লাগিল। সে বিহ্বল আচ্ছন্ন ভাবে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে এক সময়ে পাগলের মত শয্যার উপর বসিয়া পড়িয়া নিদ্রিতা ইন্দ্রাণীকে সবলে নিজের বুকের ভিতর টানিয়া লইল।

॥ ১২ ॥

ইন্দ্রাণীর দুর্বল শরীরের ঘুম ভাঙ্গিতে দেরি লাগিল। ঘুম ভাঙ্গিয়াও কিছুক্ষণ সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত, এতই অতর্কিত যে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে সমস্তটাকে স্বপ্ন বলিয়া মনে করিল। কিন্তু তাহার ওষ্ঠের উপর রমানাথের উষ্ণ চুম্বনে একটু পরেই যখন তাহার চৈতন্য স্পষ্ট

হইয়া উঠিল তখন সে লজ্জায় এবং নিজের প্রতি অপরিসীম ঘৃণায় যেন মরিয়া গেল। হাত-দুইটা প্রাণপণ চেষ্টায় মুক্ত করিয়া লইয়া রমানাথকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে করিতে চাপা অথচ আর্তকণ্ঠে কহিল, 'এ কী করছেন আপনি, আমার অপরাধের যে শেষ থাকবে না! আমাকে ঘৃণা করুন—কিন্তু এ নয়, এ নয়। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন—'

ততক্ষণে রমানাথের উন্মত্ততা চলিয়া গিয়া সম্বিৎ ফিরিয়া আসিয়াছে। ইন্দ্রাণীর কথাগুলা তাহার নিজের বিবেকের উপর যেন চাবুকের মতই আসিয়া পড়িল। সে ইন্দ্রাণীকে ছাড়িয়া দিয়া সবেগে শুধু ঘর হইতে নয়, বাড়ি হইতেই বাহির হইয়া পড়িল এবং তত রাত্রেই গঙ্গার ধারে আসিয়া পৌঁছিল।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

একটা বিপুল আত্মধিক্কার যেন তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত উপচাইয়া উঠিয়াছে। লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে তাহার চোখে জল আসিয়া গিয়াছিল। ছিঃ! এ কী করিল সে। সমস্ত ভদ্র সংস্কারকে ছাপাইয়া উঠিল একটা পশু! আর কোথায় এ হীনতা পৌঁছিল, কাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহার রক্তের মধ্যেকার দানব জাগিল—যাহার প্রতি তাহার সবচেয়ে ঘৃণা, যেখানে সকলের চেয়ে বড় বিদ্বেষ—সেইখানে।...রমানাথের সেই মুহূর্তে পাথরে মাথা কুটিয়া মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল।

বহুক্ষণ পাগলের মত গঙ্গার ধারে ঘুরিবার পর যখন তাহার চৈতন্য হইল তখন পূর্বদিক ফরসা হইয়াছে, দুই একজন স্নানার্থীও তত সকালেই আসিতে শুরু করিয়াছে। তাহার মধ্যে একজন তাহাকে ঐ ভাবে উদভ্রান্তের মত ঘুরিতে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া চাহিল—কতকটা যেন তাহার চাহনিতেই লজ্জিত হইয়া রমানাথ বাড়ির দিকে ফিরিল। কিন্তু বাড়ির দ্বার পর্যন্ত আসিয়া তাহার এই কথাটাই আবার মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল—সে ইন্দ্রাণীর কাছে মুখ দেখাইবে কী করিয়া? এতদিন পর্যন্ত সে ছিল অপরাধিনী—লজ্জিত হইবার, শাস্তি ভোগ করিবার কথা শুধু তাহারই—আজ কিন্তু রমানাথেরও অপরাধ বড় কম নয়। আজ আর কোন্ অধিকারে সে বিচারকের আসনে বসিবে?

সে চোরের মত নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া আসিয়া দেখিল, ইন্দ্রাণী যথারীতি উঠিয়া স্নান সারিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে এবং হরিদাসকে কাজকর্মের নির্দেশ দিতেছে। পাছে চোখোচোখি হয় সেই ভয়ে রমানাথ সেদিক হইতে পিছন ফিরিয়া নিজের শয়নঘরে ঢুকিল। কিন্তু তাহাকে যেন লজ্জা হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্যই ইন্দ্রাণী একবারও তাহার সামনে আসিল না, হরিদাসই স্নানের জল হইতে শুরু করিয়া খাবার পর্যন্ত তাহার ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।

আহারের ফাঁকে রমানাথ একবার হরিদাসকে প্রশ্ন করিল, 'ও কেমন আছে রে?'

হরিদাস কহিল, 'ভাল আছেন বাবু। আমাকে কালকের কথা সব জিজ্ঞাসা করছিলেন, কি করে আমরা টের পেলুম, কে ঘরে নিয়ে গেল এই সব। আপনাকে খবর দিয়েছি শুনে রাগ করতে লাগলেন, উনি ভেবেছিলেন যে আপনি ঘুমিয়ে

পড়েছিলেন, আপনাকে ডেকে তুলেছি—যখন শুনলেন যে আপনি জেগেছিলেন তখনও বললেন, তাই বা কেন ডাকলি—না হয় অমনি মরেই পড়ে থাকতুম। তুই-ই একটু মুখে জল দিলি না কেন ?…এইসব।'

তাহার পর একটু থামিয়া কহিল, 'আপনাদের বোধ হয় রাগারাগি চলছে বাবু, না ?…আজ সকালে মা খুব কাঁদছিলেন, আপন মনেই।

রমানাথ ধমক দিয়া কহিল, 'তুই বড় জ্যাঠা হয়েছিস হরিদাস, আপনার কাজে যা!'

হরিদাস কিন্তু ধমক গ্রাহ্য করিল না। কহিল, 'না বাবু, আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না। আমি অনেকদিনই বুঝেছি।…কিন্তু এমন কাজ আর করবেন না বাবু, মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।'

রমানাথ আবার একটা প্রচণ্ড ধমক দিতে তবে সে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু কলেজে গিয়াও রমানাথ স্থির হইতে পারিল না। যে দুর্নিবার লজ্জা তাহাকে অর্ধরাত্রে পাগলের মত বাড়ির বাহির করিয়াছিল সে লজ্জা এখনও তাহার যায় নাই। তাহার দুষ্কৃতির কথা কেহই জানে না, তবু যেন কাহারও চোখের দিকে সে চাহিতে পারিতেছিল না। আর সব চেয়ে তাহাকে পীড়া দিতেছিল ঐ কথাটাই—যাহাকে ছোট মনে করিয়া, যাহাকে ঘৃণা করিয়া এতদিন এতদূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহারই কাছে সে এত ছোট হইয়া গেল। ইহার পরেও কেমন করিয়া বর্তমান জীবন যাপন করিবে, অপরাধিনীর কাছে ছোট হইয়া প্রতিদিন তাহারই সহিত ঘর করিবে! ··

সারাদিন ভাবিয়া ভাবিয়া সে স্থির করিল যে ইন্দ্রাণীকে কিছুতেই এখানে রাখা হইবে না। সে যখন নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে তখন আর কোথাও কোন ভরসা নাই—এ শুধু লজ্জার কথা নয়, এ আত্মরক্ষারও কথা বটে। কিন্তু কি করিয়া যে সে কাজটা সম্ভব হইবে তাহার কোন উপায়ই সে খুঁজিয়া পাইল না। এক বাপের বাড়ি লইয়া গিয়া সেখানে রাখিয়া আসিতে পারে বটে কিন্তু তাই বা কতদিনের মত নিষ্কৃতি পাইবে ? সেখানে রাখারও একটা শোভন সীমা আছে। বাড়িতে রাখা যাইবে না—মা আবার জোর করিয়া তাহার কাছে পাঠাইয়া দিবেন। এখান হইতে খুব দূরে কোন দেশে যাইতে পারিলে হয় বটে কিন্তু মা কি রাজী হইবেন ? হয়তো কান্নাকাটি করিবেন, নয়তো অন্নজল ত্যাগ করিবেন।

যাহা হউক—আগামী ছুটিতে সে নিশ্চয়ই ইন্দ্রাণীকে লইয়া শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করিবে—বাবার আদেশই আছে, সুতরাং কাহাকেও কোন কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজন হইবে না।

সেদিন বাড়ি ফিরিবার সময় একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা তাহার মনে মনে ছিল যে, হয়তো ইন্দ্রাণী এতদিনের এই কঠোর শাসনের একটা প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবে। হয়তো এইবার তাহার কণ্ঠে স্পর্ধার সুর শোনা যাইবে—তাহার সেই অতি-কুণ্ঠিত ভঙ্গির মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে একটা দৃপ্ত বলিষ্ঠতা। কিন্তু বাড়ি ফিরিয়া

দেখিল যে সকালেও যেমন এখনও তেমনি—ইন্দ্রাণী যেন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাহার দৃষ্টিসীমা হইতে সরাইয়া ফেলিয়াছে। এ কয়দিনের, অনিচ্ছাকৃত হইলেও অবশ্যম্ভাবী মেলামেশায় ইন্দ্রাণী যেন একটুখানি সহজ হইয়াছিল। প্রকাশ্যেই দুই একটা রান্না করিত, চা-জলখাবারও এক আধ দিন তাহার সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে এ ঘরে রাখিয়া গিয়াছে—এমন কি সে উপস্থিত থাকিলেও প্রয়োজনমত ঘরে ঢুকিত। কিন্তু আজ সে যেন ইচ্ছা করিয়াই কোথায় লুকাইয়া রহিয়াছে। তাহার এ লজ্জার কারণ কি রমানাথ কিছুতেই বুঝিতে পারিল না।···তবে কি সে স্বামীকে লজ্জা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই নিজে আত্মগোপন করিয়াছে? কথাটা মনে হইতেই তাহার সমস্ত মন যেন রি রি করিয়া উঠিল—যাহাকে সে পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বেশী ঘৃণা করে, তাহারই নিকট হইতে আজ যদি তাহাকে অনুগ্রহ লইতে হয় তাহা হইলে সে-অপমান সে সহিবে কেমন করিয়া?···

রাত্রে আহারাদির পর যথারীতি বই লইয়া পড়িতে বসিয়াছে, এমন সময়ে পিছনে পদশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল ইন্দ্রাণী। আজ আর অন্য দিনের মত বিরক্তিতে তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল না—বরং কেমন যেন কানের কাছটা অকারণে গরম হইয়া উঠিল। আজ প্রথম সে যেন স্ত্রীর কাছে কেমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

ইন্দ্রাণী বেশী ভনিতা করিল না, কোন দিনই করিত না। আগেকার মতই মাথা নীচু করিয়া কহিল, 'এখানে এ পাড়ার সকলে মিলে একটা প্রসূতি-আগার খুলেছেন, সেখানে সেবা করবার লোকের বড় অভাব। টাকা কম—নার্স বেশী রাখতে পারেন না। তাই পাড়ার মেয়েরাই পালা করে কিছু কিছু কাজ করছেন। আমার ইচ্ছা দুপুরের দিকে আমিও কিছু কাজ করি—যদি আপনার অমত না থাকে!'

রমানাথ খাতার মলাটের উপর পেন্সিলটা ঘষিতে ঘষিতে কহিল, 'নার্সের কাজ কি তুমি জানো কিছু?'

ইন্দ্রাণী উত্তর দিল, 'না। তবে ওঁরাই শিখিয়ে নেবেন বলেছেন।···দুপুরে তো কোন কাজ থাকে না—অবশ্য কোনদিন কাজ পড়লে তো থাকতেই পারব।'

রমানাথ একবার মনে করিল যে আগামী ছুটিতে শ্বশুরবাড়ি যাইবার কথাটা পাড়ে কিন্তু পারিল না। মুহূর্ত দুই চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'তোমার ইচ্ছা হলে যেতে পারো, আমার আর আপত্তি কি?'

তারপর কথাটা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। সে কলেজ হইতে ফিরিয়া প্রত্যহই দেখিত ইন্দ্রাণী যথারীতি গৃহকর্মে ব্যস্ত আছে—এমন কি রবিবারেও দুপুর বেলা যে সে বাড়িতে ছিল না তাহাও রমানাথ লক্ষ্য করে নাই, কারণ এমনিতেই ইন্দ্রাণী থাকে খুব নিঃশব্দে, নিজের উপস্থিতিকে যতদূর সম্ভব স্বামীর দৃষ্টি ও মনের আড়ালে রাখিতেই চায় সে। সহসা সেদিন কলেজে দর্শনশাস্ত্রের এক অধ্যাপক ভুপেনবাবুর কথাতে সে রীতিমত চমকাইয়া উঠিল, 'হ্যাঁ মশাই, সার্থক বিয়ে করেছেন বটে! সুন্দরী মেয়েই তো একে বাংলা দেশে দুর্লভ, তার ওপর এতগুলো

গুণ ভাবতেই পারিনে আমরা। আমরাও তো বিয়ে করেছি মশাই—তখন এ সব মেয়ে ছিল কোথায় ?'

অন্য দিনের মতই রমানাথের একটা রূঢ় আঘাত লাগিল, স্ত্রীর প্রসঙ্গমাত্রেই লাগে তাহার—তবে আজ যেন সে আঘাতের তীব্রতা কম ! আজ আর তাহার মুখ অপমানে লাল হইয়া উঠিল না ; কানের মধ্যে শব্দগুলি তেমন করিয়া জ্বালা করিয়া উঠিল না, বরং কেমন একটা কৌতূহলই বোধ করিল। সে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া আছে দেখিয়া ভূপেনবাবু পুনশ্চ কহিলেন, 'আপনার স্ত্রীর কথাই বলছি—সবে বোধ হয় পাঁচ দিন না ছ'দিন আমাদের শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠানে আসছেন মশাই এরই মধ্যে ওখানকার চেহারা পর্য্যন্ত পালটে দিয়েছেন ! আমার স্ত্রীর মুখে শুনতে পাই কি না—কিছু জানতেন না, ওখানকার নার্স আর ডাক্তারের কাছে একবার সব শুনেই এমন শিখে নিয়েছেন যে পাসকরা দাই কোথায় লাগে ! আর তেমনি নাকি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মেথডিক্যাল কাজ সব। সবাই ধন্য ধন্য করছে !'

আরও কত-কি তিনি বলিয়া গেলেন কিন্তু রমানাথের সেদিকে কান ছিল না। বহুদিনের ক্ষতটার কথা সে প্রায় ভুলিতেই বসিয়াছিল, আজ যেন আবার নূতন করিয়া সেটা বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। সে একটু পরেই সেখান হইতে ছুতা করিয়া উঠিয়া নির্জন গঙ্গাতীরে গিয়া বসিয়া পড়িল।

কয়েকদিন পরেই পূজার ছুটি পড়িয়া গেল। মা দেশ হইতে আগেই চিঠি দিয়া জানাইয়াছেন, বেয়াই বার বার দুঃখ করিয়া চিঠি দিতেছেন—রমানাথ যেন ছুটিতে আগে শ্বশুরবাড়ি যায়, পরে দেশে আসে। এই চিঠি পাইয়া রমানাথ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, মায়ের চিঠি ইন্দ্রাণীর হাতে দিয়া কহিল, 'তুমি প্রস্তুত হয়ে থাকো, রবিবারের দিনই বেরিয়ে পড়তে হবে। তোমাকে ওখানে রেখে আমি বাড়ি চলে যাবো। আমার ইচ্ছা কিছুদিন তুমি ওখানেই থাকো।'

ইন্দ্রাণী নত মস্তকেই আদেশ মানিয়া লইল কিন্তু পরের দিনই অক্ষয়বাবু প্রভৃতি কয়েকজন হৈ-হৈ করিয়া আসিয়া পড়িলেন। ভূপেনবাবু প্রায় রাস্তা হইতেই চেঁচাইতে চেঁচাইতে ঢুকিলেন, 'বেশ ভদ্রলোক তো আপনি মশাই, বলে ভাল করতে পারব না মন্দ করতে পারব, কি দিবি তা বল !'

রমানাথ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। অক্ষয়বাবু তখন কথাটা খোলসা করিয়া কহিলেন, 'বাবাজী, বৌমাকে নাকি তুমি শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাচ্ছ ?'

তাহার এই নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারের সহিত ইঁহাদের কি সম্পর্ক বুঝিতে না পারিয়া তেমনি জিজ্ঞাসুনেত্রেই রমানাথ চাহিয়া রহিল।

অক্ষয়বাবু কহিলেন, 'শিশু মঙ্গলটা তো প্রায় উঠে যাবারই দাখিল হয়েছিল, এই মাস-খানেকের মধ্যে বৌমা একেবারে তার চেহারা পাল্‌টে দিয়েছেন। শুধু এধারের কাজ-কর্ম্মই নয়—অফিসের কাগজপত্র, হিসাব, চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা, সব ভার এমন ভাবে হাতে তুলে নিয়েছেন, যে এখন কাজ চলছে যেন সরকারী

হাসপাতালের মত। এই মুখেই উনি যদি বেশী দিনের জন্য চলে যান তা'হলে আবার সব মাটি হয়ে যাবে!'

রমানাথ যেন অকারণে বিরক্ত হইয়া উঠিল। এ কী পৃথিবীব্যাপী ষড়যন্ত্র তাহার বিরুদ্ধে! সে ঈষৎ তীক্ষ্মকণ্ঠেই কহিল, 'কারুর জন্যই কারুর কাজ আটকে থাকে না কাকাবাবু, আপনারা তো আর ওর ভরসায় এ-সব করেন নি আর ওর জন্য সত্যই কিছু আটকে থাকবে না!'

ভূপেনবাবু কহিলেন, 'আপনি মশাই বড় বাঁকাবাঁকা কথা বলেন। আপনার স্ত্রী যদি, ভগবান না করুন, মারা যান তা'হলে কি আর আপনারই আটকাবে—কিন্তু তাই বলে আপনি এখন তাকে সহজে ছেড়ে দেবেন? এমন একটা লোকের অভাবে যদি সত্যিই উঠে যায়—সেটা কি কম আপসোসের কথা হবে?'

ধ্বক্ করিয়া কথাটা যেন রমানাথের বুকে আঘাত করিল। তাহার যেন মনে হইল তাহাকে বিদ্রূপ করার জন্যই ভূপেনবাবু কথাটা বলিলেন। সে বেশ একটু ঝাঁজের সহিতই জবাব দিল, 'এমন একটা প্রতিষ্ঠান যদি একটা লোকের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়, তা'হলে যাওয়াই ভাল।'

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই রমানাথ অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার ভুলটাও সে ইতিমধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছিল। ভূপেনবাবু কী একটা জবাব দিতে যাইতেছিলেন, অক্ষয়বাবু ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, 'তুমি রাগ করো না বাবাজী, এ রকম খাটতে যে কেউ পারে তা-ই আমাদের জানা ছিল না। কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখানো হয়েছে কিনা, তাই আমরা একটু স্বার্থপর হয়ে উঠেছি।··· তা ছাড়া বৌমা যখন যান নি তখন থাকত কেস্ মোটে তিন-চারটি, এখন, এরই মধ্যে এত নাম ছড়িয়ে গেছে যে, বারোটা বেডে জায়গা দিতে পারছি না আমরা। তার ওপর আর একজন যিনি প্রধান কর্মী ছিলেন সেই মিসেস বিশ্বাস শয্যাগত, এস্-ডি-ও সাহেবের স্ত্রী নিজে আঁতুড়ে, কে দেখে আর কে করে।·· এর ভেতরে আমরা আবার সরকারী গ্র্যাণ্ট-এর জন্য দরখাস্ত করেছি—সে ইন্‌স্‌পেকশানের ডেট্ পড়েছে লক্ষ্মীপূজার পরদিন। সে সময় যদি উনি না থাকেন তা'হলে গ্র্যাণ্ট পাবার কোন আশাই নেই। গ্র্যাণ্টটা পেলে বরং আমরা আর একজন নার্স রাখতে পারি, তখন বৌমার খাটুনি কিছু কমবে হয়তো।'

রমানাথ হতাশ হইয়া একবার চারিদিকে চাহিল—পৃথিবীসুদ্ধ লোক ষড়যন্ত্র করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে—লজ্জা ও অপমানের এই পঙ্কশয্যা হইতে তাহার আর রেহাই নাই!

সত্যেনবাবু ওপাশ হইতে কহিলেন; 'মশাই ক'টা দিনের জন্য একটু স্যাক্রিফাইস্ করতে পারবেন না?'

রমানাথ তবুও চুপ করিয়া বসিয়া আছে দেখিয়া অক্ষয়বাবু কহিলেন, 'বাবাজী কী বলছ তা'হলে?'

রমানাথ ক্যালেণ্ডারের ছবিটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া জবাব দিল, 'ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়েছে কাকাবাবু—নিয়ে একবার আমাকে যেতেই হবে।

বরং তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনতে পারি।'

অক্ষয়বাবু খুশী হইয়া কহিলেন, 'বেশ বেশ, তাতেই হবে। এই ক'টা দিন যেমন করেই হোক্ চালিয়ে নেব।'

ভূপেনবাবু এতক্ষণ গোঁজ হইয়া বসিয়াছিলেন, তিনিও রাগ ভুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তা'হলে আপনি লক্ষ্মীপুজোর আগেই নিয়ে আসবেন কথা দিচ্ছেন তো?'

সত্যেনবাবু যোগ করিয়া দিলেন, 'ওয়ার্ড অফ অনার?'

রমানাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'হ্যাঁ তাই!'

আর একদফা তাহার স্ত্রীর স্তুতিবাদ করিয়া তাঁহারা বিদায় লইলে রমানাথ ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল। ইন্দ্রাণী স্তব্ধ হইয়া সিঁড়ির মুখেই দাঁড়াইয়াছিল, খুব সম্ভব সমস্তই শুনিয়াছে—রমানাথ কাছে আসিতে সে কতকটা কৈফিয়ৎ দিবার সুরেই কহিল, 'আমি ওঁদের অনেক বুঝিয়েছিলাম—ওঁরা কিছুতেই ছাড়তে চাইছেন না।'

রমানাথ সে কথার কোন জবাব না দিয়াই নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। যে স্তুতি এইমাত্র দু কান ভরিয়া শুনিয়া আসিল সে, ইহাকে, সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে আজ সে নিজেকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি বলিয়া বোধ করিত!—অথচ সে মুহূর্তে সেই স্তুতির গুরুভারই জগদ্দল পাথরের মত তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়া তাহার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ করিয়া দিতেছিল।

হে ঈশ্বর—এ অবস্থার কি শেষ হইবে না কোন দিন।

॥ ১৩ ॥

পুজোর ছুটির আরম্ভেই রমানাথ ইন্দ্রাণীকে লইয়া বর্ধমান যাত্রা করিল। স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া এই তাহার প্রথম ভ্রমণ—ইহার কত রস, কত মাধুর্যের কল্পনাই ছিল তাহার—স্বপ্ন ছিল স্ত্রীকে লইয়া সে মধুচন্দ্রিমা যাপন করিতে কাশী যাইবে! আজ সেই ভ্রমণই তাহার কাছে ভীতিপ্রদ—বিভীষিকা হইয়া উঠিয়াছে। তবে একটা কথা সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে যে একই বাড়িতে একই সঙ্গে দিনের পর দিন বাস করিয়া কিছুতেই দুইটি মানুষ পরস্পরকে দূরে রাখিতে পারে না। প্রথম যখন ইন্দ্রাণী এখানে আসে তাহার সহিত কথা কহিবার কথা রমানাথ ভাবিতেই পারিত না—দুই একদিন বাধ্য হইয়া যে দু-একটি কথা কহিতে হইয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়া, বিষক্রিয়া বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, চলিয়াছে বহুক্ষণ ধরিয়া। কিন্তু আজ সে দেখিয়া নিজেই অবাক হইয়া গেল যে, সে অতি সহজেই ইন্দ্রাণীর সহিত কথা কহিতেছে—এমন কিছু রূঢ় আঘাত আর লাগে না। হরিদাসকে বাসায় রাখিয়া আসিতে হইয়াছে, সুতরাং কাহারও মারফৎ কথা কওয়া সম্ভব নয়—প্রয়োজনমত দুটি-একটি কথা তো কহিতে হইলই—স্ত্রীর হাত হইতেই খাবার লইয়া খাইতে হইল। এমন কি সহসা এক সময়ে সে পলাশী পার হইবার সময়ে পার্শ্ববর্তিনীকে নিজের অজ্ঞাতসারেই বলিয়া ফেলিল, 'ঐ সেই পলাশী, ঐ

মাঠে যুদ্ধ হয়েছিল।'

বলিয়া ফেলিয়াই লজ্জার অবধি রহিল না। এ লজ্জা শুধু আজিকার নয়—সঙ্গে সঙ্গে সে দিনের উন্মত্ততার সমস্ত কাহিনী মনে পড়িয়া তাহার কান-মাথা গরম হইয়া উঠিল।

তাহার পর হইতেই সে সতর্ক হইয়া গেল। যদিচ তার সতর্কতার অত কারণও ছিল না। সে সাময়িকভাবে ভুলিয়া গেলেও ইন্দ্রাণী স্বামীর সহিত নিজের সম্পর্কের কথা ভোলে নাই। সে খুব প্রয়োজন ছাড়া একটি কথাও কহিল না—স্বামীর পাশে থাকিয়াও প্রাণপণে বাহিরের দিকে চাহিয়া কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিল। স্বামীর আকস্মিক বিস্মৃতির কোন সুযোগই সে লইল না, কোন প্রশ্রয় বোধ করিল না। শুধু বর্ধমানে পেঁীছিয়া ঘোড়ার গাড়িতে যাইবার সময় একবার, যেন বহুক্ষণের চেষ্টার পর অর্ধস্ফুট স্বরে কয়েকটি কথা বলিল, 'আমার আসবার ইচ্ছে ছিল না। মা···মা যদি সন্দেহ করেন যে আমি সুখে নেই—যদি অন্য রকম বোঝেন তাহ'লে বড় আঘাত পাবেন।···আমি তাঁর বড় আদরের মেয়ে।'

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর কান্নায় বিকৃত হইয়া উঠিল। এবং এতদিন পরে, এই প্রথম রমানাথ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, ইন্দ্রাণীর দুই চোখ ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। সে অবশ্য সান্ত্বনার কথা একটিও কহিতে পারিল না, ইন্দ্রাণীও তাহা আশা করে নাই। কিন্তু অপরাধিনীর যে বেদনা প্রাপ্য তাহারই প্রত্যক্ষ একটা রূপ দেখিয়া কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে সে-ও ব্যথা অনুভব করিল। যদিচ, তাহারই মধ্যে ভাগ্যের অদ্ভুত পরিহাস দেখিয়া মনে মনে একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিল না—তাহারই দত্ত শাস্তির অংশ আজ তাহাকেও ভোগ করিতে হইবে—অর্থাৎ আজ অভিনয়টা শুধু শুধু ইন্দ্রাণীকে নয়, তাহাকেও করিতে হইবে।···

বাড়িতে পেঁীছিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় রমানাথ মুখে হাসি ও প্রসন্নতা টানিয়া আনিল। শ্বশুর-শাশুড়ী শালা-শালীদের সহিত সহজভাবে মিশিয়া সেই সলজ্জ সুখের হাসিটি ফুটাইয়া তুলিতে তুলিতে প্রথম অনুভব করিল যে, ইন্দ্রাণীর এই কয়মাসে প্রায়শ্চিত্ত বড় কম হয় নাই।

শাশুড়ীঠাকরুণ কন্যার মুখেই প্রথম শুনিলেন যে তাহাদের দুই দিনের বেশী থাকা হইবে না—যেহেতু চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই আবার খাগড়ায় ফিরিতে হইবে। তিনি জামাতার কাছে মৃদু অনুযোগ করিলেন, এসব কী বাবা, এত দিন পরে এলে যদি, সাত দিনও থাকবে না ?···তিন দিনও না—মোটে দু দিন! সে কেমন করে হবে ?

ইন্দ্রাণী যে ইতিমধ্যেই এতটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছে ব্যাপারটা রমানাথ তাহা ভাবিতেও পারে নাই, নিজে হইলে বোধ হয় ঠিক দুই দিনের কথা তুলিতেই পারিত না। সে এখন একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'আমাকে কেন বলছেন মা, দরকার তো আমার নয়—দরকার আপনার মেয়ের। ও সেখানে এমন মাতব্বর হয়ে গেছে যে না থাকলে নাকি তাদের চলে না!'

সে কেমন সহজে অভিনয় করিতে পারে—এখানে আসিয়া অবধি তাহার প্রচুর প্রমাণ পাইয়া রমানাথ নিজেই বিস্ময় বোধ করিতেছিল।

শাশুড়ীঠাকরুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'তাই তো শুনছি বাবা। আমার ভাগ্যে সবই দেখি বিপরীত। জামাই কাজের বায়না করে না--করে মেয়ে। কত করে বললুম—কিছুতেই রাজী হ'ল না।'

শ্বশুরও দুই-একবার অনুরোধ করিলেন—কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশও করিলেন কিন্তু কন্যাগর্বে এমনই মশগুল হইয়া গিয়াছিলেন তিনি যে বেশী পীড়াপীড়ি করিলেন না! এই দুইটি ফাঁড়া কাটাইয়া দিবার জন্য মনে মনে ইন্দ্রাণীকে ধন্যবাদ না দিয়া সে পারিল না।

রাত্রে শয়নের সময় ইন্দ্রাণী ঘরে ঢুকিয়া এদিক ওদিক অনেক খুঁজিয়াও যখন মাদুর একটা জোটাইতে পারিল না, তখন এমনিই একটা বালিশ টানিয়া লইয়া আঁচলটা পাতিয়া মেঝেতেই শুইয়া পড়িল।

রমানাথ যে খাটটাতে শুইয়াছিল সেটা বিরাট খাট—পাশাপাশি তিনজন শুইয়া থাকিলেও খানিকটা জায়গা ফাঁক থাকে। একবার নিজের পাশের সেই শূন্যতার দিকে আর একবার ইন্দ্রাণীর দিকে চাহিয়া তাহার কেমন চক্ষুলজ্জা বোধ হইতে লাগিল! এ লজ্জাবোধটাই যে অস্বাভাবিক তাহা তখন একবারও রমানাথের মনে হইল না—সে খানিকটা ইতস্তত করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, 'খাটে অনেক জায়গা ছিল, এখানে এসে শুলে না কেন? এখন ঠাণ্ডার দিন—'

ইন্দ্রাণী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'আমার দিকে আপনি চাইবেন না··· আপনি আমায় দয়া করছেন একথা মনে হলে···লজ্জায় আমার মাথা কুটতে ইচ্ছা করে।···তা ছাড়া ঠাণ্ডা লেগে আমার অসুখ করবে না—আমার মৃত্যু অত সহজে হবার নয়!'

অস্পষ্ট ভগ্ন-কণ্ঠে জড়াইয়া জড়াইয়া কথা কয়টা বলিলেও কণ্ঠস্বরে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল যে রমানাথ আর পীড়াপীড়ি করিল না। শুধু বিস্তৃত শুভ্র শয্যার শূন্যতা বার বার কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিতে লাগিল। বহুরাত্রি পর্যন্ত এপাশ ওপাশ করিয়া একেবারে শেষরাত্রের দিকে তবে তাহার চোখে তন্দ্রা নামিল।

বোধ হয় সেই জন্যই, পরের দিন সকালে তাহার ঘুম ভাঙ্গিতে একটু দেরি হইল। সে যখন উঠিল তখন জানলার মধ্য দিয়া প্রচুর রৌদ্র ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে-- বাহিরের গাছপালাগুলি শরতের রৌদ্রে ঝলমল করিতেছে। সে এমনিতেই একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল কিন্তু তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না যখন দেখিল ইন্দ্রাণী তখনও ঘুমাইতেছে! ইন্দ্রাণী কোনদিনই বেলা অবধি ঘুমায় না, বিশেষত এখানে যে এই ব্যাপারে লজ্জার কারণ আছে তাহা সে নিশ্চয়ই জানে!···এখন কি করা উচিত বুঝিতে না পারিয়া রমানাথ মহা দ্বিধায় পড়িল। সে বাহিরে গেলেই শালা-শালীরা ঘরে ঢুকিয়া পড়িবে—জামাতার পরে কন্যার ঘুম ভাঙ্গা এসব সংসারে অত্যন্ত লজ্জার কথা—তাহার উপর মেঝেতে শোয়ার জন্য ইন্দ্রাণীকে বিস্তর

কৈফিয়ৎ দিতে হইবে।

খানিকটা ইতস্তত করিবার পর আর কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া সে তাহাকে ঠেলিয়াই ডাকিল—দুইবার তিনবার ধাক্কা দিবার পর ইন্দ্রাণী যখন চোখ মেলিয়া চাহিল তখন তাহার অসম্ভব আরক্ত চোখের দিকে চাহিয়া রমানাথ ভয় পাইয়া গেল। ইন্দ্রাণীর দুটি চোখ জবাফুলের মত লাল—চোখের দৃষ্টিও কেমন যেন বিহ্বল। শাড়ির উপর হইতে গা ঠেলিয়াছিল বলিয়া রমানাথ আগে টের পায় নাই—এখন ভয় পাইয়া গায়ে হাত দিয়া দেখিল গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। সে চাপা গলায় ডাকিল, 'শুনছ, তোমার যে জ্বর, ভীষণ জ্বর!'

এতক্ষণে ইন্দ্রাণীর যেন চৈতন্য হইল! সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল—রমানাথ সবলে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, 'এখন বাইরে যেতে হবে না। চুপ করে শুয়ে থাকো, আমি ওদের ডেকে দিচ্ছি,···কালই আমি বারণ করেছিলাম মেঝেয় শুতে. কথা না শুনে এই কাণ্ডটি করলে।'

রমানাথের দৃঢ় কণ্ঠস্বরের জন্যই হউক, তার নিজেরও শক্তিতে আর কুলাইতেছিল না বলিয়াই হউক—ইন্দ্রাণী আর জোর করিল না। আস্তে আস্তে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। রমানাথ তাহার বালিশটা তুলিয়া রাখিয়া মেঝেতে শুইবার সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া দিয়া বাহিরে আসিল।

দরজা খুলিয়া দালানে পা দিতেই প্রথম দেখা হইল তাহার শ্বশুর মশায়ের সঙ্গে, কোনমতে মুখ-চোখ লাল করিয়া বলিয়া ফেলিল, 'ওর—ওর বড় জ্বর হয়েছে শেষ রাত থেকে—'

'তাই নাকি!' শ্বশুর মহাশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে বাড়ির সকলেই আসিল, ডাক্তার ডাকাও হইল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'সর্দি-টর্দি বসে নি—ম্যালেরিয়াও হতে পারে, তবে ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়াই সম্ভব। ঠাণ্ডা লেগেছিল কি খুব?'

রমানাথ একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, 'কাল খুব গরম লেগেছিল বলে শেষ রাত্রের দিকে মেঝেতে এসে শুয়েছিল—'

ডাক্তার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, 'তাতেই এতটা হয়েছে বলে মনে হয় না। আগেও অত্যাচার হয়েছিল বোধ হচ্ছে—'

তিনি একসঙ্গে দুইটা ঔষধ লিখিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু রমানাথ বিষম বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহার গোনা দিন, তাহার উপর শ্বশুরবাড়ি থাকিবার ইচ্ছা তাহার একেবারেই নাই। অথচ এ অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া যাওয়াও অশোভন। কবে যে জ্বর ছাড়িবে তাহারও ঠিক নাই—বাঁকা দাঁড়াইবে কি না তাহাও বলা কঠিন।

সমস্ত সকালটা এদিক ওদিক ঘুরিয়া রমানাথ ফিরিল দশটারও পর! শাশুড়ী অনুযোগ করিলেন, 'সামান্য জ্বর হয়েছে বাবা, তাইতেই এত অধৈর্য হলে চলে কি? মুখ-হাত ধোয়া নেই, জল খাওয়া নেই, এত বেলা অবধি কোথায় ঘুরে বেড়ালে বলো দিকি। নাও সোজা এখন বাথরুমে যাও, আমি কোন কথা শুনতে চাই নে।'

কলঘরে গিয়া মুখ-হাত ধুইতে ধুইতে রমানাথের শাশুড়ীর কথাগুলো মনে পড়িয়া হাসি পাইল। সমস্ত জগতের সহিত কি এমনি করিয়াই তাহাকে মিথ্যা অভিনয় করিয়া যাইতে হইবে চিরকাল ? তাহার উদ্বেগকে কী অনায়াসেই শাশুড়ী পত্নীপ্রেম বলিয়া মনে করিলেন !

জলযোগ শেষ করিয়া সে কর্তব্যবোধে শয়নঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইন্দ্রাণীর ছোট একটি বোন দিদির কাছে বসিয়া ছিল, সে রমানাথকে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া গেল এবং যাইবার সময় দরজাটা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া গেল। অর্থাৎ সে ধরিয়াই লইয়াছে, রমানাথ এখন স্ত্রীর কাছে বসিবে এবং সেবা করিবে। উপায় না দেখিয়া রমানাথ বিছানার পাশেই আসিয়া বসিল।

ইন্দ্রাণী তখন আচ্ছন্ন ভাবে পড়িয়া আছে, ঘুমাইয়া আছে কি না বোঝা যায় না। গায়ে হাত দিয়া দেখিল, তখনও প্রবল জ্বর—বোধ হয় একশ তিন-চার হইবে ! মাথায় জল-পটি দেওয়া আছে এবং পাশে একটা বাটীতে জলও রহিয়াছে দেখিয়া সে একটুখানি জল তুলিয়া পটিটা ভিজাইয়া দিল এবং একটা পাখা হাতে করিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

এ যেন তাহার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা ! যে স্ত্রী অবিশ্বাসিনী, যে স্ত্রী ঘৃণ্য, যাহার সহিত জীবনে কোনদিন কোন মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হইল না—কোনদিন একটা মিষ্ট কথা পর্যন্ত বিনিময় হইল না—তাহারই রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে সেবা করিতে হইবে—একথা সে কল্পনাও করে নাই। অথচ এ তাহার নিজেরই পাতা ফাঁদ—এ জাল কাটানো আজ তাহারও বোধহয় সাধ্যাতীত।

রমানাথের কিন্তু মনে আর একটা প্রচণ্ড বিস্ময়ের ধাক্কা লাগিয়াছে—এই অভিজ্ঞতা আজ তাহাকে খুব বেশী পীড়া দিতেছে না তো ! অসম্ভব তো নয়ই, ব্যাপারটা যেন খুব অস্বাভাবিক বলিয়াও তাহার মনে হইতেছে না। ইন্দ্রাণীর গায়ে হাত দিয়া জ্বর দেখিতে বা তাহার তপ্ত ললাটে জল দিতেও ঘৃণায় তাহার হাত সংকুচিত হইতেছে না। রমানাথ বিস্মিত হইল কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও এই বিচিত্র অনুভূতির কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না। একবার মনে হইল, তবে কি —তবে কি সে নিজের অজ্ঞাতসারেই ইন্দ্রাণীর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে ? তবে কি সেদিনের রাত্রির সে ঘটনা নিতান্তই আকস্মিক রূপোন্মত্ততা নয় ?···

না, না, না—রমানাথের সমস্ত অন্তর আলোড়িত হইয়া প্রতিবাদ উঠিতে চাহিল। তাহার এতদিনের সমস্ত বেদনা, অপমান, লজ্জা একযোগে যেন মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। যে সব সংস্কারগুলির সহিত সে পরিচিত, তাহাদেরই কঠিন বিদ্রোহের অগ্নিতে তাহার সামান্য সহানুভূতিটুকু শুকাইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল। সে হাতের পাখা নামাইয়া রাখিয়া দাঁড়াইল।

ঠিক সেই সময় ইন্দ্রাণী একবার চোখ খুলিল। তেমনি আরক্ত, বিহ্বল দৃষ্টি। সেদিকে চাহিয়া রমানাথ আবার একটু দুর্বল হইয়া পড়িল—তখনই আর চলিয়া যাওয়া সম্ভব হইল না।

ইন্দ্রাণী চোখ খুলিয়া যেন ব্যাকুলভাবে কাহাকে খুঁজিয়া আবার অবসন্নভাবে

চোখ বুজিল।

ঠিক সে কি চাহিতেছে বুঝিতে না পারিয়া রমানাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া হেঁট হইয়া ডাকিল, 'কাকে খুঁজছিলে, কাউকে ডেকে দেব ?'

'অ্যাঁ'—বলিয়া ইন্দ্রাণী আবার চোখ মেলিল।

রমানাথ মৃদুকণ্ঠে পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, 'কী খুঁজছিলে ?···জল চাই ?···কাউকে ডেকে দেব ?'

ইন্দ্রাণী তেমনি বিহ্বলভাবে খানিকটা চাহিয়া থাকিবার পর কহিল, 'জল ? কিন্তু সে কি দিতে পারবে তুমি ? তৃষ্ণায় যে বুক শুকিয়ে গেল।'

পাশেই গ্লাসে জল ছিল—রমানাথ মুখে ঢালিয়া দিতে গেল। কিন্তু ইন্দ্রাণী কম্পিত ডান হাতখানা দিয়া তাহার হাত সরাইয়া দিয়া কহিল, 'না, না, না! তোমার হাতের জল খেতে পারব না—ও যে আগুন। তুমি পাথরের দেবতা, তুমি শুধু মানুষকে অভিশাপ দিতে পারো—তোমার কাছে জল নেই। না না —'

অকস্মাৎ আর্তকণ্ঠে শেষের কথাগুলি বলিয়া ক্লান্ত ইন্দ্রাণী চোখ বুজিল। রমানাথ জলের গ্লাস রাখিয়া বাহির হইতে যাইবে এমন সময় আবার ইন্দ্রাণী চোখ চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, 'কে ?'

রমানাথ হেঁট হইয়া প্রশ্ন করিল, 'কিছু বলছ ?'

ইন্দ্রাণী পিপাসাতুর ওষ্ঠে জিভ বুলাইয়া কহিল, 'একটু জল। আর কেউ নেই ?'

রমানাথ তাহার মুখে জল ঢালিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, 'আর কিছু খাবে ? মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে ?'

ইন্দ্রাণী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, 'না।' তাহার পর কহিল, 'আমি কি এর আগে কিছু বলছিলুম ?'

'বিশেষ কিছু না।'

ইন্দ্রাণী একটু যেন ইতস্তত করিয়া কহিল, 'আপনি এখানে থাকবেন না···আমি হয়ত কী বলে ফেলব। তাছাড়া···আপনার সেবা নেওয়ার যন্ত্রণা আমার সহ্য হবে না।···আপনি বাড়ি যান···আমি মাকে বলে দিচ্ছি···দুদিন নিশ্বাস ফেলে বাঁচুন, আমার বিষ-সংসর্গ থেকে রেহাই পান—'

রমানাথের কণ্ঠস্বর কী এক বেদনায়, যেন শুষ্ক অন্তরের মধ্যে লুকাইয়া থাকা একটু অভিমানেও, কাঁপিয়া গেল। তবু সে প্রাণপণে চিত্তদমন করিয়া কহিল, 'আচ্ছা, সে হবে এখন। আজ কেমন থাকো দেখি—কাল যা হয় ঠিক করা যাবে।···তুমি এখন ঘুমোও—'

ইন্দ্রাণীর কণ্ঠে আবার যেন সেই বিকারের আর্ত আকুলতা ফুটিয়া উঠিল, 'আপনি যান। আপনার পায়ে পড়ি, কাউকে পাঠিয়ে দিন—'

রমানাথ বিস্মিতকণ্ঠে কহিল, 'কেন, আমি কি—'

'না, না—আপনি আমাকে দয়া করবেন না। আপনি আমাকে শাস্তি দিন—মাড়িয়ে পিষে যান—'

শ্রান্তভাবে কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়া ইন্দ্রাণী হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া কহিল, 'আমি আবারও কি বলে ফেলেছি। মাথা আমার কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আপনি কিছু মনে করবেন না—কিন্তু আপনি যান, বিশ্রাম করুন গে—'

রমানাথ আর কথা কহিল না—ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

॥ ১৪ ॥

পরের দিন ভোরবেলাই ইন্দ্রাণীর জ্বর ছাড়িয়া গেল। ডাক্তারবাবু বলিলেন, ম্যালেরিয়া, কুইনাইন ইঞ্জেক্‌শন দিলেই ঠিক হইয়া যাইবে কিন্তু আর তিন চার দিন না দেখিয়া ছাড়া উচিত নয়। রমানাথ সারাদিন আর ইন্দ্রাণীর ঘরে যায় নাই—কর্তব্যবোধে ও লোকলজ্জার খাতিরে সন্ধ্যার সময় একবার খবর লইতে গিয়াছিল। পাশে ছিলেন শাশুড়ী, জামাইকে দেখিয়া উঠিয়া যাইতেছিলেন, ইন্দ্রাণী তাঁহার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া নিষেধ করিল, খুব মৃদু কণ্ঠে কহিল, 'তুমি যেও না মা—একটু বসো।'

রমানাথের কানে সে অস্ফুট অনুরোধ পেঁৗছিয়াছিল—সে কুশল প্রশ্নের পরই বাহির হইয়া আসিল।

রাত্রে তাহার শয্যাও হইয়াছিল পৃথক ঘরে। সুতরাং কী ভাবে ইন্দ্রাণী কি ব্যবস্থা করিয়াছে, বুঝিতে না পারিলেও বুঝিল যে সে-ই একটা ব্যবস্থা করিয়াছে, কারণ, ভোরে জ্বর ছাড়িবার খবরের সঙ্গেই শাশুড়ী কহিলেন, 'রাণী বলছিল, তোমার বাড়ি যাওয়া বিশেষ দরকার, অথচ খাগড়াতেও ফিরতে হবে লক্ষ্মীপুজোর আগে—তা তুমিই না হয় বাবা বাড়ি চলে যাও, ফেরবার পথে ওকে নিয়ে যেও।··· একথা বলছি বলে তুমি অন্য কিছু ভেবো না বাবা—আমি তো তোমাকে এক দিনের জন্যেও ছাড়তে চাই না। রাণী কাল সারারাত আমাকে পাগল করেছে। বলে, তুমি বললে উনি হয়ত থাকবেন কিন্তু এখানে ওঁর বড্ড অসুবিধা হবে, তাছাড়া পুজোর সময় আমার শাশুড়ীও ছেলেকে দেখতে না পেলে দুঃখ করবেন। ···এমনিতেই তো আজ সপ্তমী হয়ে গেল—'

রমানাথ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কহিল, 'তাই করব মা। মোদ্দা ফেরবার পথেও এতটা উজানে আসা আবার—এখান থেকে কেউ—'

প্রবল বেগে ইন্দ্রাণীর মা ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, 'না বাবা, সে হবে না। তোমাকে একবার আসতেই হবে। এ দুদিন কিছুই করতে পারলুম না, মেয়েটাও পড়ে রইল—এ যে আমার কী দুঃখ তা কেউ বুঝবে না। না, না, আমি কোন কথা শুনব না, আমার মাথা খাবে বাবা যদি না আসো—'

অগত্যা রমানাথকে কথা দিতে হইল।

সেইদিনই দুপুরের গাড়িতে সে বাড়ি রওনা হইল। যাত্রার পূর্বে ইন্দ্রাণীর মা কহিলেন, 'একবার দেখা করে যাবে না বাবা ?'

অদ্ভুত একটা হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল রমানাথের মুখে। বাহিরে যাইবার

জন্যে প্রস্তুত হইয়া সে পায়ে জুতা গলাইয়াছিল, জুতাটা আবার খুলিয়া ঘরে ঢুকিল। ইন্দ্রাণী তখন ওপাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল, পায়ের শব্দে মুখ ফিরাইয়া রমানাথকে দেখিয়া মাথায় কাপড়টা টানিয়া দিল।

রমানাথ একবার মাত্র তাহার শুষ্ক ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। জানালার মধ্য দিয়া দূরে রাজবাড়ির দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, 'কেমন আছ ?'

ইন্দ্রাণীও চোখ বুজিয়াছিল, তেমনিভাবেই জবাব দিল, 'জ্বর এখন নেই। মাকে আমার প্রণাম দেবেন···আর বাবাকে···তাঁরা হয়ত ব্যস্ত হবেন···একটু বুঝিয়ে বলবেন যে আমি ভাল আছি···বুঝিয়ে দেবেন যে আমার কোন দিন কিছু হবে না। বলবেন যে আমার···'

সে যেন আরও কিছু বলিতে গেল কিন্তু ঠোঁটই নড়িল শুধু, কোন স্বর বাহির হইল না, তাহার পরিবর্তে দুই চোখের কোণ বাহিয়া দুটি ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি সেটা আঁচলে মুছিয়া আবার ওপাশ ফিরিয়া শুইল।

রমানাথের বাড়ি ফিরিবার পথে এবার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইল। বহুক্ষণ হাতের একটা নভেলে মন দিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া সে ট্রেনের জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া এই কথাটাই ভাবিতে লাগিল। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতেছে—যাত্রার সময়ে যে স্বাধীনতা, যে নিঃসঙ্গতার আশায় উল্লাসে অধীর হইয়াছিল সেই নিঃসঙ্গতাই যেন এখন কেমন পীড়া দিতেছে। প্রথম প্রথম যে বিষাক্ত চিন্তা অহোরাত্র তাহার বুকে পাষাণভারের মত চাপিয়া বসিয়া নিরন্তর তাহাকে বেদনা দিত আজ তাহা অনেক সহিয়া গিয়াছে—আজ আর নূতন করিয়া সে কথা মনে পড়ে না। কিন্তু আজিকার এ শূন্যতা কিসের ? কিসে যেন মন অভ্যস্ত হইয়াছে, কি যেন সে খুঁজিতেছে—কী যেন কাছে নাই। এমন কিছু পীড়াদায়ক নয় ব্যাপারটা—তবু অন্যমনস্ক করিয়া দিতেছে বৈ কি !

তবে কি তাহার মন ইন্দ্রাণীরই সঙ্গ প্রার্থনা করে ? এক সময়ে এই অবিশ্বাস্য সন্দেহটাই তাহার মনে দেখা দিল এবং ক্রমে যতই রমানাথের মন কথাটা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল ততই তাহার অবিশ্বাস্যতা কমিয়া যাইতে লাগিল। এমন কি এক সময়ে—প্রায় বাড়ির কাছাকাছি পেঁছিয়া এই কথাটাই সে মনের কাছে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে ইন্দ্রাণী আজ তাহার সঙ্গে থাকিলে তাহার সাহচর্য মনকে পীড়া দিত না—বরং সেইটাতেই সে অভ্যস্ত ছিল—হয়ত বা আশাও করিয়াছিল—

বাড়ি পেঁছিতে তাহার মুখে ইন্দ্রাণীর অসুখের খবর পাইয়া কেদারবাবু ও সারদা দুজনেই অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কথাটা আলোচনা করিতে করিতে নানারূপ কু-সম্ভাবনার আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত কেদারবাবু এমন কথাও বলিয়া ফেলিলেন, 'আমি একবার বর্ধমান যাব নাকি ?'

যদিও রমানাথের মনে আগেকার সে ঘৃণার তীব্রতা আর ছিল না—তবু, বোধহয় সেই সত্যটার জন্যই, সে মনে মনে বিরক্ত ছিল, এখন বাবার এই ছেলেমানুষিতে সে-বিরক্তি আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না, ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠেই কহিল, 'কী এমন ব্যাপার ঘটেছে যে আপনাকে বেহাই-বাড়ি দৌড়তে হবে? সামান্য ম্যালেরিয়া জ্বর—তাও দেখে এসেছি ছেড়ে গেছে—তা নিয়ে আধিক্যেতা করার কি আছে?'

তাহার কণ্ঠস্বরের অনাবশ্যক তীক্ষ্ণতায় কেদারবাবু চমকিয়া উঠিলেন। সেই খাগড়ার কথা মনে পড়িয়া গেল তাঁহার। তিনি সন্দিগ্ধভাবে রমানাথের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'তা তুই-ই বা এত গরম হচ্ছিস কেন?'

'আপনাদের বাড়াবাড়ি আমার ভাল লাগে না।' বলিয়া রমানাথ উপরে চলিয়া গেল।

রমানাথ বাড়ি আসিয়াছে শুনিয়া বন্ধু-বান্ধব দুই-একজন দেখা করিতে আসিল। এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে অসহ্য, গত কয়েক মাসে যত মানসিক স্থৈর্যই আসুক, বন্ধুদের বিশেষ করিয়া বাল্যবন্ধুদের সহিত হাসিঠাট্টা করিবার মত মনের অবস্থা তাহার নয়। তাহারা এখনও চাপল্য করিতে চায়, তাহার সুন্দরী স্ত্রীকে উপলক্ষ করিয়া লঘু উপহাসের জাল বিস্তার করে, তাহাদের কলহাস্যের শব্দ বহুদূর পর্যন্ত বাতাসকে তরল করিয়া তোলে। রমানাথ শুধু যে তাহাদের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে না তাহাই নয়—এই সমস্তর ফাঁকে ফাঁকে বারবার তাহার অন্তরের সুর কাটিয়া যায়, মানসিক শান্তি নষ্ট হয়। বহু বেদনা, বহু জ্বালা—গত কয়েক মাসে যা অনেকখানি চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, আজ আবার তাহাই যেন নূতন করিয়া অনুভব করে। রবীন্দ্রনাথের একটা গানের লাইন তাহার বার বার মনে পড়িয়া যায়—

'তোদের এই হাসিখুশি দিবানিশি, দেখে মন কেমন করে!'

তবুও এটা তাহার সহিয়াছিল, কিন্তু ভয় ছিল তাহার যতীন সম্বন্ধে। যদি যতীন দেখা করিতে আসে? যতীন যে এখানে আছে তাহা সে শুনিয়াছিল। সারদাও এ বিষয়ে একদিন প্রশ্ন করিয়াছিলেন তবে প্রশ্নটা একবার করিয়াই থামিয়া গিয়াছিলেন। কেমন করিয়া যেন সকলেই জানিয়াছিল যে যতীনের সহিত আগেকার সে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক আর নাই। যদিচ কারণটা ছিল সকলেরই অনুমানের বাহিরে।

যতীনের খোঁজ-খবর ইতিমধ্যে অযাচিতভাবেই তাহার কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল—সে সেই যে বিদেশে গিয়া ভারি অসুখে পড়িয়াছিল, এখনও ভাল করিয়া সারিয়া উঠিতে পারে নাই—ভারি দুর্বল। কী একটা চাকরি পাইয়াছিল কিন্তু অসুস্থতার জন্যই লইতে পারে নাই। কাহারও সহিত ভাল করিয়া মেশে না—কোন কাজেই উৎসাহ নাই। সংবাদগুলি প্রধানত শুনাইল নিবারণ—সে সব কথা শেষ করিয়া কহিল, 'তুইও চলে গেলি, তোর চেলাও সমস্ত সম্পর্ক তুলে

দিলে আমাদের সঙ্গে—সবগুলো প্রতিষ্ঠানই উঠল, লাইব্রেরীটা এখনও টিকে আছে বটে, কিন্তু তাও টিম্‌টিম্‌ করছে।…যতীনটার কি হ'ল বল্‌ দেখি? সে ছোঁড়াটাকেও যদি পেতুম তো কাজ হ'ত—সে তবু বহুদিন তোর সঙ্গে কাজ করেছে, অনেকটা জানে শোনে—'

রমানাথের মুখ, প্রসঙ্গের সূচনায় একবার লাল হইয়া উঠিয়া সেই যে বিবর্ণ হইয়াছিল, আর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিতে পারে নাই। তাহার কপালে বড় বড় ফোঁটা ঘাম দেখা দিল, সে অন্যমনস্কভাবে জামার হাতায় কপাল মুছিয়া জানলা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, একটা কথারও জবাব দিল না।

অকস্মাৎ একটা কথায় যেন চাবুক খাইয়া সে জাগিয়া উঠিল। নিবারণ হাসিয়া বলিতেছে, 'একদিনের কথা রমা তোকে বলা হয় নি। এর মধ্যে যতীনের আবার জ্বর হয়েছিল—ম্যালেরিয়া বোধ হয়,—জ্বর ছিল বেশী। আমরা ক'জন দেখতে গেছি—হঠাৎ কী কথাতে সুরেশ গাঙ্গুলীদের মেজবাবুর কথা তুলেছে। সুরেশ বলছিল যে লোকটা বেশ্যাবাড়ী গিয়ে যা করে করুক ঘরের ঝি-বৌ নিয়ে লাম্পট্য করা কিছুতেই বরদাস্ত হয় না। আমাদের উচিত সবাই মিলে ওকে ঠাণ্ডা করা। আমরা সকলেই ওর কথাতে সায় দিলুম—এমন কি কীভাবে ওকে জব্দ করা যায় সে প্ল্যানও একটা ভাঁজা হচ্ছিল। যতীনের কি হ'ল—কোথাও কিছু নেই, একেবারে যেন ক্ষেপে উঠল। চেঁচিয়ে, মুখচোখ লাল করে অস্থির। আমরা তো প্রথমটা মনে করলুম যে বিকার হল বুঝি। ওর প্রতিপাদ্য হ'ল যে ওরকম লাম্পট্য সবাই করে, এরকমভাবে একজনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার কোন মানে হয় না। এ হ'ল নাকি আমাদের নীচতা। এই বলে সে তখনই প্রমাণ করার চেষ্টা করতে লাগল যে গ্রামের সবাই লম্পট—এমন কি আমরাও সেই কলেজ লাইফে কবে কি করেছি তার এক লম্বা ফিরিস্তি দিতে বসল।…সে উত্তেজনা ওর তুই কল্পনা করতে পারবি না। হঠাৎ কি হ'ল বল্‌ দেখি? সেই টাইফয়েডের পর থেকেই ওর কী রকম মাথাটা গোলমাল দেখছি। আর তাই বা বলি কি করে—তার আগেই যদি গণ্ডগোল না বাঁধবে তা হলে বাড়ি থেকে পালাবেই বা কেন… ?'

রমানাথের সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়াই ছিল, এখন পুনরায় রক্তবর্ণ ধারণ করিল, সহসা যেন মনে হইল, তাহার নিঃশ্বাস লইতেও কষ্ট হইতেছে। সে কোন মতে একটা ছুতো করিয়া বাহিরে আসিল। বাড়ি আসা মানেই প্রতিনিয়ত এমনি সব যন্ত্রণা ভোগ করা—তাহার চেয়ে সেই দূর প্রবাসেই সে ভাল ছিল।

তাহার সবচেয়ে ভয় ছিল বিজয়ার দিনটা সম্বন্ধে। হয়ত যতীন সে দিন বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইবে, সে দিনটা সামনাসামনি পড়িলে মিষ্ট সম্ভাষণ না করিয়া উপায় থাকিবে না, অথচ কেন কে জানে, এইখানটায় সে যেন কেমন একটা জ্বালা অনুভব করে। ইন্দ্রাণীর স্বামীর সহিত পরিচয় পর্যন্ত ছিল না, সুতরাং তাহার অপরাধ যতীনের কথা ভাবিলে অনেক কম বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যতীন—তাহার আবাল্য সহচর—তাহার অপরাধের সীমা হয় না। সে বার বার নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু প্রতিবারই প্রসঙ্গটা মনে পড়িয়া

একটা দুর্বার অথচ অসহায় ক্রোধে তাহার সমস্ত অন্তর বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, যতীনকে আলিঙ্গন করা তো দূরের কথা, তাহার সহিত কথা বলিবার চিন্তাটাও ধীরভাবে করিতে পারে নাই।

অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিয়াছিল যে যতীন যখন বাড়ি থাকিবে না, সেই ফাঁকে সে যতীনের মাকে প্রণাম করিয়া আসিবে এবং বহুরাত্রি পর্যন্ত বাহিরের মাঠে ঘুরিয়া এমন সময় বাড়ি ফিরিবে যখন আর যতীনের থাকিবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। কিন্তু সহসা বিজয়ার দিন সকালে নদীর ধারে বেড়ানো শেষ করিয়া বাড়ি ঢুকিতে-ঢুকিতেই একটা অত্যন্ত পরিচিত এবং এককালে-অত্যন্ত প্রিয় কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিল। যতীন আসিয়াছে এবং তাহার মায়ের সঙ্গে গল্প করিতেছে। বোধ হয় সারদার অনুযোগের উত্তরেই বলিতেছে, 'আমি তো মাসীমা অসুখে অসুখে এমনি হয়ে গেছি, আমাকে মানুষের বাইরেও ধরে নিতে পারেন কিন্তু সে-ই বা কেমন, এতদিনে একটা খবর তো নিলেই না, এখানে এসেও দেখা করলে না!'

সহসা, বোধকরি সারদারই দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া রমানাথকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত শুষ্ক মূঢ় একটা হাসি হাসিয়া কহিল, 'এই যে, নাম করতেই—!'

এই কয়দিন ধরিয়াই সে রমানাথের সহিত দেখা করার কথা ভাবিয়াছে। ইন্দ্রাণী যে কোন-কথা রমানাথকে বলিতে পারে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। প্রথমত মেয়েরা এসব কথা নিজে হইতে কখনও বলে না, দ্বিতীয়ত রমানাথ জানিতে পারিলে আবার তাহাকে লইয়া বিদেশে ঘর করিতে পারিত না। এই দুটি তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই সে নিশ্চিন্ত ছিল। সঙ্কোচ বা লজ্জা যা কিছু ছিল তাহার নিজের বিবেকের কাছে। সেই সঙ্কোচেই সে রমানাথ ফিরিবার দিনটাতে পাগলের মত বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, সেই লজ্জাতেই সে আজ পর্যন্ত তাহাকে চিঠি লিখিতে বা দেখা করিতে পারে নাই। কিন্তু বিজয়া দশমীর সন্ধ্যা আর এড়ানো সম্ভব নয় তাহাও সে জানিত, অথচ রমানাথের সহিত তাহার যে সম্পর্ক, তাহাতে শুধু সেই মুহূর্তটিতে নিতান্ত পরের মতও দেখা যায় না। অনেক ভাবিয়া সে আজ সকালে এক-রকম মরীয়া হইয়াই বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং সারদার সহিত এমনভাবে গল্প করিতে বসিয়াছে যাহাতে রমানাথের সঙ্গে সাক্ষাৎটাও তাঁহারই সামনে ঘটে।

রমানাথ এ অবস্থাটার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। যতীনের সহিত চোখোচোখি হওয়া মাত্র একটা বিপুল বিদ্যুতের শিখা যেন মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত খেলিয়া তাহাকে মুহূর্তের জন্য অনড় করিয়া দিয়া গেল। প্রথমটা মনে হইল সে যতীনের ঐ নির্লজ্জ হাসিটায় কালি লেপিয়া দিয়া চলিয়া যায়—প্রতিসম্ভাষণ না করিয়াই! কিন্তু তখনই মনে পড়িল তাহার মা তাহার দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন এবং এ অভদ্রতার জন্য তাহাকে যে পরিমাণ জবাব-দিহিতে পড়িতে হইবে, তাহাতে বহু কুৎসিত সন্দেহের পথ খোলা হইবে মাত্র। অনেক কষ্টে সে শুষ্ক কণ্ঠে স্বর বাহির করিল, কহিল, 'কিরে ভাল তো?'

তাহার মুখের অপরিসীম বিবর্ণতার কারণটা ঠিক না অনুমান করিতে পারিলেও যতীন বোধ হয় নিজের অপরাধের একটু আভাস পাইয়াছিল। সে চোখ না নামাইয়া জবাব দিল, 'ভাল আর কৈ ? রোগে কেমন যেন হয়ে গেছি, মাথাটাও মাঝে মাঝে গোলমাল লাগে।'

সারদা সহানুভূতির সুরে কহিলেন, 'কী বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে দেখ্ না, চেনাই যায় না···তোর মাথাটাই বাপু আগে গোলমাল হয়ে গেছল—নইলে অমন করে বাড়ি ছেড়ে পালাবিই বা কেন ? বিশেষ করে খোকার সঙ্গে দেখা না করেই।'

যতীনের উত্তরটা পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই রমানাথ কহিল, 'মা, বাইরে দু-তিনটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, আমি একটু কাজে যাচ্ছি, ফিরতে বোধ হয় বেলা হবে। তুমি যেন বাবাকে বসিয়ে রেখো না, আমি তোমার সঙ্গে খাব'খন—'

বলিয়া কোনমতে যতীনের উদ্দেশে, 'আচ্ছা তুই বোস্ তা হলে'—না এমনি কি একটা বলিয়া সে প্রায় ছুটিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরের বাতাসে আসিয়া রমানাথ যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচল। যতীনের নির্লজ্জতা ক্লেদাক্ত বস্তুর মতই তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে এবং এখনও লাগিয়া আছে—এমনিই মনে হইতেছিল তাহার। সে বহুক্ষণ বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া তাহার বিষ-জর্জর মনকে সুস্থ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে এই কথাটাই বারবার নিজেকে বুঝাইতে লাগিল যে, সে পারিবে না, মা দুঃখই পান আর যাহাই হউক, দেশে আসা তাহাকে কমাইতে হইবে। তা ছাড়া আরও একটা কথা যেন কতকটা এলোমেলো ভাবেই তাহার এই সব চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে মনের মধ্যে হঠাৎ দেখা দিতে লাগিল, ইন্দ্রাণীর সম্বন্ধেও আগের মতই কঠোর হওয়া প্রয়োজন—এবং ওখানকার কাজ একটু কমিলেই দীর্ঘদিনের জন্য তাহাকে বর্ধমানে বা এখানে পাঠাইয়া দিতে হইবে।···

যে ভয় সে করিয়াছিল, বাড়ি ফিরিবামাত্র তাহাকে সেই কৈফিয়তের মধ্যেই পড়িতে হইল। মা অবশ্য বেশী পীড়াপীড়ি করিলেন না, মৃদু অনুযোগ করিলেন মাত্র, 'যতীনের সঙ্গে তুই কথা পর্যন্ত কইলি না—দ্যাখ দেখি, বেচারী মুখটি চুন করে চলে গেল।···একে রোগে ভুগে ভুগে মরতে বসেছে ! না হয় মাথার গোলমালে হঠাৎ চলে গিয়েছিল তোর সঙ্গে দেখা করতে পারে নি—তা বলে কি এমনি কঠিন হতে হয় রে !···বন্ধুর কাজ বিচার করা নয়—ভালবাসা। ওর অপরাধ তোকে নিতে নেই।'

বোধ হয় উত্তরের আশাতেই মুখ তুলিয়া ছেলের দিকে চাহিলেন কিন্তু সেই মুহূর্তে এমন একটা হিংস্রতা রমানাথের মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, সেটা কি এবং তাহার কারণ কি না বুঝিয়াও তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

সে দিন রাত্রে সন্ধ্যার সময় নিজের বাড়ির প্রণামটা সারিয়াই সে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। যে কটা বাড়ি না গেলেই চলিবে না - সেইগুলি সাবধানে সারিয়া লইয়া সে মাঠে-মাঠেই ঘুরিল বেশী। সাবধানে অর্থাৎ যতীনের গলা পাওয়া যায় কিনা সেটা আগে শুনিয়া। পল্লীগ্রামে ছেলেরা সাধারণত দল পাকাইয়া ঘোরে,

রমানাথকেও বন্ধুর দল টানিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সে অতিকষ্টে এড়াইয়া গেল। পথে চাঁদের আলোয় দু-একবার সে যতীনের আভাস পাইয়াছিল—অন্য পথে গিয়া সেই দেখা হওয়াটা এড়াইয়া গেল এবং এমনিই একটা সুযোগে যতীনের বাড়িতে প্রণাম করাটাও সারিয়া লইল। যতীনের মা অনেক অনুযোগ করিলেন কিন্তু বহু লোক আসিয়া পড়াতে তাহার উত্তর দেওয়ার দায় হইতে সে বাঁচিয়া গেল।

অবশেষে রাত্রি গভীর হইয়া আসিলে, হাত ঘড়িটাতে এগারোটা বাজিয়াছে দেখিয়া রমানাথ উঠিয়া পড়িল। অত রাত হইয়াছে, তবু সদর রাস্তাটা ছাড়িয়া সে গলিপথে গলিপথে অনেকটা ঘুরিয়া গেল। কিন্তু ঠিক বাড়ির রাস্তাটাতে পড়িতেই সহসা একটি অত্যন্ত ক্ষীণমূর্তি গাছের ছায়া হইতে উঠিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল। রমানাথ ভাল করিয়া না দেখিয়াই চিনিল—সে যতীন। এক সময়ে তাহাদের গাতবিধি পরস্পরের এতই পরিচিত ছিল যে বহু দূর হইতে যে-কোন রকম অঙ্গভঙ্গী দেখিলেই দুজনে দুজনকে চিনিতে পারিত—রমানাথ যেন কতকটা আশ্চর্য হইয়া লক্ষ্য করিল যে, সে অভ্যাসটা এখনও যায় নাই, অন্ধকারে থাকিতেই সে অনায়াসে যতীনের ওঠার ভঙ্গীটা চিনিয়াছে।

যতীন আলোতে আসিয়া দাঁড়াইয়া কেমন একটা করুণ ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া অত্যন্ত অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, 'অনেকক্ষণ ধরে হিমের মধ্যে বসে আছি রে!··· আবার জ্বর আসছে—এই জ্বরই শেষ জ্বর হয় তো বাঁচি।'

সকালবেলা রমানাথ তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে নাই। এখন দেখিল—সত্যই যতীনের চেহারা বিশ্রী হইয়া গেছে—শীর্ণ, ক্ষীণ সেই অতি পরিচিত মুখের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ যেন তাহার বুকের স্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিল, সে দ্রুততা কতটা আবেগে আর কতটা দুর্বল হইয়া পড়িবার ভয়ে বুঝিতে না পারিয়া শুধু নির্বোধের মত চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যতীন একটু পরে আবার তেমনিভাবেই কহিল, 'আমি, আমি হয়ত আর তোর সামনে আসতুম না, সন্ধ্যা বেলা তুই আমাকে কতবার এড়িয়ে গেছিস তা আমি লক্ষ্য করেছি কিন্তু হঠাৎ মনে হ'ল যে তুই তো কাল-পরশুই চলে যাবি, আর যদি দেখা না হয়—অপরাধের ক্ষমা চাওয়া তো হবে না তাই—তাই এই পথে এসে বসলুম, জানি তুই তো ফিরবিই এক সময়ে! এইখানটা—চিনতে পারিস?'

রমানাথের কথাটা মনে পড়িল। বাল্যকালে সকলের সামনে তাহারা বিজয়ার কোলাকুলি করিত না, গভীর রাত্রে বিশেষ করিয়া এইখানটাতে, নির্জনে সে কাজটা সারিত। কথাবার্তা কিছু বিশেষ হইত না, শুধু পরস্পরকে গভীরভাবে দীর্ঘ সময় ধরিয়া বুকে চাপিয়া রাখিত মাত্র; এমন কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়—তবু মনে হইত যেন লোকচক্ষুর সামনে সেটা করিলে তাহাদের সম্পর্কটা নিতান্তই সাধারণ হইয়া যাইবে। কথাটা মনে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বাল্যকালের সেই স্বপ্নময় বন্ধুত্বের আবেগ যেন বুকের মধ্যে উদ্বেল হইয়া উঠিয়া দৃষ্টিকে বাষ্পাকুল করিয়া তুলিল।

যতীন গলা আরও নামাইয়া কহিল, 'কোলাকুলি করবি তুই এমন দুরাশা আমার নেই, এমন কি মাপ চাহিবারও সাহস নেই। হয়ত···হয়ত আমার অপরাধের সব কথা তুই এখনও জানিস না—কিন্তু আমি তো জানি। শুধু যদি আর কখনও দেখা না হয়, বিদেশেই আমার মৃত্যুর কথা শুনতে পাস, তখন চেষ্টা করিস আমাকে ক্ষমা করতে। আমি তো চিরদিনই দুর্বল, তুই আমার সব অন্যায়ই মানিয়ে নিয়েছিস, আজও সেই ভরসাতে তোর সামনে দাঁড়িয়েছি রমা—।··· কথাগুলো নাটকীয় শোনাচ্ছে, না? কিন্তু আজ বিশ্বাস কর, মিথ্যা করে তোর সঙ্গে অভিনয় করতে আসি নি আজ।'

অপরাধের গুরুত্ব এতদিনের সমস্ত ব্যথা-বেদনার, সমস্ত জ্বালার ইতিহাস লইয়া কোথায় যেন তলাইয়া গেল, আবাল্যের অভ্যাসই রমানাথের মনের মধ্যে বড় হইয়া উঠিল সেই মুহূর্তে। সত্যই যতীন বড় দুর্বল চিরকাল, তাহার বহু অপরাধই রমানাথকে ক্ষমা করিতে হইয়াছে। আজও সমস্ত কথা ভাসিয়া গিয়া মনের মধ্যে শুধু জাগিয়া উঠিল সেই বাল্যের সহস্র স্মৃতি, আর চোখের উপর বন্ধুর রোগকাতর শীর্ণ করুণ মুখ। সে সহসা দুই হাত বাড়াইয়া যতীনকে টানিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল এবং বহুক্ষণ পরে ছাড়িয়া দিয়া ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে কহিল, 'তোর যে খুব জ্বর যতীন। এমন করে রোগ পুষে রাখছিস কেন, ভাল করে ডাক্তার দেখা—।'

যতীনের দুই চোখ দিয়া তখন জল ঝরিয়া পড়িতেছিল, সে চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, 'ইচ্ছে নেই আর বাঁচবার রমা,—কেমন যেন হয়ে গেছি।'

তাহার পর আর কোন কথা না কহিয়া, এমন কি রমানাথকে কোন বিদায়-সম্ভাষণ না জানাইয়াই সে বাড়ির পথ ধরিল। রমানাথও তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিল না, শুধু বহুক্ষণ পর্যন্ত স্থির হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

॥ ১৫ ॥

রমানাথ একাদশীর দিনই বাহির হইয়া পড়িল। শ্বশুরবাড়ি হইয়া তাহাকে লক্ষ্মীপুজার মধ্যে খাগড়া পেঁৗছিতে হইবে, সে কথা দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আবার সেই প্রেমহীন, বিশ্বাসহীন, নির্ভরহীন দাম্পত্য জীবনের মধ্যে তাহার যেন কিছুতেই ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা ছিল না তবু দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকে চাপিয়া সেই পথেই তাহাকে পা বাড়াইতে হইল।

যতীনকে সে ক্ষমা করিতে পারিয়াছে কিনা তাহা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখে নাই, কারণ হৃদয়াবেগের উপর বিশ্বাস তাহার কোনদিনই ছিল না। তবে তাহার সেই তীব্র জ্বালাটা যেন কমিয়াছে। তাহার সেই বিদায়ের পূর্বেকার কথাটাও যেন সারাদিনই মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করিতেছিল। তাই সে যাত্রা করিবার পূর্বে অনেক ইতস্তত করিয়া কেদারবাবুর ঘরে ঢুকিয়া তাহারই প্রসঙ্গ তুলিল, 'বাবা, যতীনের কালও দেখলুম জ্বর—ওর কী অসুখ ভাল করে দেখা দরকার।'

কেদারবাবু একটু বিস্মিত হইলেন। সারদার মুখে কাল সকালের বিবরণটা তিনি পাইয়াছিলেন—ঠিক কারণটা না জানা থাকিলেও দু'জনের আশ্চর্য বন্ধুত্বের এই শোচনীয় পরিণতিতে তিনি দুঃখিতই হইয়াছিলেন। মুখ তুলিয়া ছেলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'কাল তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল নাকি রে?'

'হ্যাঁ, দেখা হয়েছিল।' রমানাথ যেন অকারণে লাল হইয়া উঠিল।

কেদারবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'কী জানি। ওর দাদা যে কী করছে বুঝি না।'

রমানাথ আর একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, 'ওর দাদার তো অবস্থা খুব ভাল না, আপনি যদি সদর থেকে কাউকে এনে দেখান তো ভাল হয়। একজন বড় ডাক্তার দেখানো উচিত।'

কেদারবাবু কহিলেন, 'কিন্তু আমি উপযাচক হয়ে ডাক্তার দেখালে ওরা কিছু ভাববে না তো!'

'আমার নাম করলে আর কিছু ভাববে না।'

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া যেন রমানাথ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। ক্ষমা করা অন্তরের কাজ, হয়ত ভবিষ্যতে একদিন তাহাও সম্ভব হইতে পারে—কিন্তু মনুষ্যত্বেরও একটা কর্তব্য আছে, রমানাথ এই কথাটাই বার বার মনকে বুঝাইতে লাগিল।

ইন্দ্রাণীর জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে কিন্তু তখনও অন্নপথ্য করে নাই, সেইদিনই করিবে। এই অজুহাতে শাশুড়ী একদিন তাহাকে আটকাইয়া রাখিলেন।

একেবারে রাত্রে দুইজনের দেখা হইল। ইন্দ্রাণী সেদিন আর মেঝেতে শুইতে সাহস করিল না, অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত দূর হইতে একটা প্রণাম করিয়া কোনমতে খাটের একপাশে শুইয়া পড়িল। রমানাথ তাহার সহিত একটিও কথা বলিল না, এমন কি একটা সহজ কুশল-প্রশ্ন পর্যন্ত করিল না। যতীন সম্বন্ধে তাহার মন যে মুহূর্তে দুর্বল হইয়াছে সেই মুহূর্ত হইতেই কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে ইন্দ্রাণীর উপর অধিকতর তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এ সমস্ত গোলযোগের যেন ইন্দ্রাণীই একমাত্র কারণ—বোধহয় এইরকমই ছিল তাহার মনোভাব। সে কঠিন হইয়া বিছানার অপর পাশে শুইয়া রহিল এবং পরের দিন ইন্দ্রাণীর শরীর দুর্বল আছে জানিয়াও থার্ডক্লাস টিকিটই কিনিল। ভিড়ের মধ্যে সান্নিধ্যটা পীড়াদায়ক হইয়া উঠিবে না—এই ছিল তাহার বিশ্বাস। আসিবার সময়কার স্মৃতিটা তাহার মনে ছিল।

কিন্তু ফলটা হইল বিপরীত। এত ভিড় যে থার্ডক্লাসে কিছুতেই উঠিতে পারিল না, মেয়েগাড়িতেও কোনমতে ইন্দ্রাণীর স্থান হইল না। তখন অগত্যা ইন্টারক্লাসে উঠিয়া সেই পাশাপাশিই বসিতে হইল এবং ভিড়ের জন্য ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বসায় প্রতিমুহূর্তে স্ত্রীর কোমল উষ্ণ স্পর্শ তাহার সর্বাঙ্গে বিষ ছড়াইতে লাগিল। ইন্দ্রাণী দুই একবার অপাঙ্গে তাহার মুখের কঠিন রেখার দিকে চাহিয়া কেমন যেন ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, সে যতদূর সম্ভব আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

স্বামীর নিকট কোমলতা সে আশা করে না, বরং যাইবার পথে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সহজ দেখিয়া বিস্মিতই হইয়াছিল, তবু সহসা নূতন করিয়া এতটা কাঠিন্যের কোন অর্থ সে খুঁজিয়া পাইল না। শ্বশুর-শাশুড়ী কেমন আছেন এ প্রশ্নটা বহুবার মুখে আসিয়াছে, প্রশ্ন না করাটা বোধহয় অন্যায়ই হইল, তবু ভরসা করিয়া কিছুতেই কথাটা বলিতে পারিল না।

খাগড়ায় পেঁছিয়া গাড়ি করিয়া বাসায় যাইতে যাইতে রমানাথ প্রথম কথা বলিল, কহিল, 'আমার ইচ্ছা কিছুদিন আমি একা থাকি—তুমি এখানকার কাজটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গুছিয়ে নিয়ে কিছুদিন ওখানে গিয়ে থাকতে পারো সেই চেষ্টা করো। অন্য কাউকে তৈরি করে নাও।'

ইন্দ্রাণী উত্তর দিল না, শুধু অনেকদিন পরে আবার যেন একটা হিম-শৈত্য অনুভব করিল। স্বামীর কোন সেবা সে নিজে হাতে করিতে পারিত না সত্য কথা, তবু এই কাছে থাকারই একটা মোহ আছে যেন—এটুকু সুখ হইতেও তাহার নির্বাসন আসন্ন জানিয়া কোথায় একটা বেদনা যেন নূতন করিয়া পীড়া দিতে লাগিল। সে অশ্রুর আশঙ্কায় প্রাণপণে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

ইন্দ্রাণী এখানে ফিরিয়াই কাজের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া গেল। শহরের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যেন বিপুল এই প্রতিষ্ঠানটির সমস্ত ভার তাহার উপর তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। এমন কি সহকারিতা করিবারও আর লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহার মাঝে মাঝে মনে পড়িয়া যায়—সেই ছেলেবেলায় পড়া দৈত্যের গল্প। এক মাঝি দৈত্যকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছিল যে কবে সে এই পারাপারের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। দৈত্য হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, কী আশ্চর্য, আর কাহারও হাতে দাঁড়টা তুলিয়া দিলেই তো হয়। ফলে এক রাজার হাতে দাঁড়টা তুলিয়া দিয়া মাঝি অব্যাহতি পায়। আজ ইন্দ্রাণীই যেন সেই রাজা হইয়া পড়িয়াছে—দাঁড়টি একবার হাতে করিয়া এখন আর কাহারও হাতে দিবার মত লোক খুঁজিয়া পাইতেছে না।

রমানাথ এসব খবর রাখে না। শুধু সহকর্মীদের কাছে মাঝে মাঝে অযাচিত প্রশংসা শোনে আর ভ্রূকুঞ্চিত করে। তাহার ছাত্র কমলের পরীক্ষা আসন্ন, তাহাকে সে যাচিয়া বলিয়াছে বাড়ি আসিয়া প্রত্যহ—অর্থাৎ সামান্য যে সময়টা তাহাকে বাড়িতে থাকিতে হয় সেটাও সে আর একা থাকিতে চায় না।

কিন্তু একদিন কমল পর্যন্ত কথাটা পাড়িল। সহসা বলিয়া ফেলিল, 'সমস্ত খাগড়াতে তো আর অন্য কোন কথা নেই মাস্টার মশাই, সবাই ওঁর প্রশংসা করে।'

রমানাথ সত্যই কথাটা বুঝিতে পারে নাই। বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, 'কার?'

ইন্দ্রাণীকে কি বলা উচিত বুঝিতে না পারিয়া উত্তরটা কমল এড়াইয়া গেল। কহিল, 'মফঃস্বলে এমন একটা হাসপাতাল চলতে পারে তা আমরা কখনও ভাবি

নি। কী ডিসিপ্লিন্—কি সুন্দর কাজ। সরকারী গ্র্যাণ্ট তো একটা আদায় করেছেনই, আরও একটা পাওয়া যাবে বোধহয়। মিউনিসিপালিটিও গ্র্যাণ্ট বাড়িয়ে দেবে কথা দিয়েছে।…বাবা বলছিলেন যে আমাদের ভাগ্য যে আপনি এখানে এসে পড়েছিলেন, আপনার নাকি চাকরি করার কথা নয়।…আপনি না এলে তো ওঁকে পেতুম না—'

এতক্ষণে কথাটা বুঝিয়া রমানাথ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু কমলের কোন-দিকে লক্ষ্য ছিল না, সে বলিয়াই চলিল, 'এখন আবার কি কথা চলছে জানেন, আমাদের রামকৃষ্ণ সমিতিরই উদ্যোগে একটা সাধারণ হাসপাতাল খোলা হবে, মানে এই মেটারনিটি হোমটাকেই বাড়িয়ে—। সরকারী হাসপাতালে কেউ যেতে চায় না, এই রকম একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে আমরা সবাই তার অ্যাডভাণ্টেজ পাব। উনি যদি ভার নেন তা'হলে তা সাক্‌সেস্‌ফুল হ'তে বাধ্য।'

রমানাথ একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বলিয়া উঠিল, 'কিন্তু এইভাবে ওঁকে জড়িয়ে ফেলা কি ঠিক হচ্ছে? ওঁর হেল্‌থটাও দেখা উচিত।'

কমল একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিল কথাটা, কহিল, 'খাটলে ওঁর শরীর খারাপ হবে এ আমরা কল্পনাই করতে পারি না। উনি কত সহজে সব ব্যবস্থা করেন। শুধু দুপুরবেলা তো যান কিন্তু বাকী সময়টাতে ঘড়ির কাঁটার মত কাজ চলে শুধু ওঁর শাসনে। সেইটাই তো সব!'

রমানাথ মনে মনে বিষম বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। কহিল, 'কিন্তু ওঁর ভরসায় এতবড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা তো ঠিক হচ্ছে না। আমরা তো বিদেশী, আজ আছি কাল নেই। হয়ত শিগ্‌গিরিই চলে যাব।'

এবার কমলের মুখ শুকাইয়া উঠিল। একটু থতমত খাইয়া গিয়া কহিল, 'চলে যাবেন স্যার?'

'যেতেও তো পারি। আমার তো এখানে কোন বন্ধন নাই।'

'আর কিছুদিন থেকে যান—ততদিনে কেউ কি আর ওঁর কাছে থেকে তৈরি হয়ে উঠবে না?'

অর্থাৎ বন্ধন তাহার জন্য নয়—সকলেই ধরিয়া রাখিতে চায় ইন্দ্রাণীকে, তাহার অপরাধিনী স্ত্রীকে! জ্বালা কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিলেও কমলের উদ্ভাসিত সরল মুখের দিকে চাহিয়া নিজেকে সংযত করিয়া লইল। ছেলেমানুষকে আর আঘাত করিতে ইচ্ছা হইল না।

কমল আরও দুই-চারিটি কথা বলিয়া চলিয়া গেল। রমানাথ আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, ছাদে আসিয়া ইন্দ্রাণীর ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল ঘর খালি, রান্নাঘরেও হরিদাস একা উনানে আঁচ দিতেছে, ইন্দ্রাণী বোধহয় বাড়িতে নাই, খুব সম্ভব এখনও ফেরে নাই। রমানাথ হাত ঘড়িটা দেখিল পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে, শীতের সন্ধ্যা আসন্ন। তাহার দুই ভ্রূর মধ্যে অধিকতর বিরক্তি ঘনাইয়া উঠিল। সে ছাদেই পায়চারি শুরু করিয়া দিল।

একটু পরেই বাহিরে গাড়ির শব্দ হইল; মহারাজার একটা গাড়ি ব্যবস্থা করা

হইয়াছে, সেই গাড়িই লইয়া যায় এবং পেঁছাইয়া দিয়া যায়, সঙ্গে থাকে শিশু-মঙ্গলের ঝি। পিছনে ইন্দ্রাণীর পদশব্দ পাইয়া রমানাথ মুখ ফিরাইতেই অকস্মাৎ যেন তাহার উদ্যত রসনা স্তব্ধ হইয়া গেল। দেরি হওয়ার জন্য ইন্দ্রাণী নিজেই মনে মনে অপ্রতিভ ছিল, তাহার উপর রমানাথের সামনে পড়িবে আশা করে নাই; সেই লজ্জা এবং সিঁড়ি কয়টা দ্রুত উঠিয়া আসার শ্রম, দুই-য়ে মিলিয়া মুখে তাহার একেই একটা নিবিড় রক্তিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে সন্ধ্যা-সূর্যের শেষ রশ্মির আভাসটুকু। সমস্তটা জড়াইয়া সেই মুহূর্তে তাহাকে এমন আশ্চর্য সুন্দর লাগিল যে রমানাথ স্থান-কাল পাত্র সব ভুলিয়া অপলক নেত্রে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া সেই দিকেই চাহিয়া রহিল। অবশেষে ইন্দ্রাণীই অধিকতর লজ্জা পাইয়া মাথা নামাইতে তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল, সে মনকে পুনরায় কঠিন করিয়া ডাকিল, 'শোন'—তারপর নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

ইন্দ্রাণী বিস্মিত হইলেও কোন প্রশ্ন করিল না, শুধু তাহাকে অনুসরণ করিয়া দ্বারপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল।

রমানাথ তাহার দিকে পিছন ফিরিয়াই কহিল, 'পুজোর পর এখানে ফেরবার সময় যে কথাটা বলেছিলাম মনে আছে?'

ইন্দ্রাণী মৃদু কিন্তু স্পষ্ট-কণ্ঠেই জবাব দিল, 'আছে।'

রমানাথ কহিল, 'আমার ইচ্ছা তুমি মাঘমাসের প্রথমেই ওখানে চলে যাও—পারবে তো?'

মুহূর্ত দুই-তিন চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দ্রাণী জবাব দিল, 'বোধহয় তা সম্ভব হবে না।'

বহুক্ষণের চাপা বিরক্তিতে রমানাথের কণ্ঠস্বর একটু বেশী-রকম তীক্ষ্ণ শোনাইল, 'কেন?'

কিন্তু সে তীক্ষ্ণতায় বিস্মিত হইলেও ইন্দ্রাণী ভয় পাইল না। উত্তর দিল বেশ সহজ ভাবেই, 'এখানে কাজ এখন অনেক বেড়ে গিয়েছে, অথচ এমন কাউকে এখনও পাই নি, যে কিছুদিন এ ভারটা নিয়ে চালাতে পারবে। আমি—আমি হঠাৎ চলে গেলে এঁরা বড় বিপদে পড়বেন।'

'এমন বোঝা বাড়ালে কেন? আমি তো আগেই সাবধান করে দিয়েছিলুম, তুমি প্রথম থেকেই সতর্ক হলে পারতে!'

'অনেক চেষ্ট করেছিলুম, কিছুতেই এড়াতে পারি নি, বরং ক্রমশই বেশী করে জড়িয়ে গেছি!'

রমানাথের বিরক্তি আর চাপা রহিল না, কহিল, 'এখানের জিনিস, এদের যদি গরজ না থাকে তো তোমার কিসের দায়?...তা ছাড়া আমরা তো এখানকার বাসিন্দে নই—আমরা যদি না-ই থাকি। তুমি কাকাবাবুদের বুঝিয়ে বলে একটা ব্যবস্থা করো।'

ইন্দ্রাণী আজ আর তাহার আদেশ ঠিক নতমস্তকে মানিয়া লইল না, বোধহয়

উপায় ছিল না বলিয়াই। সে একটু ইতস্তত করিয়া জবাব দিল, 'চেষ্টা আমি অনেকদিন থেকেই করছি, ওঁরা কিছুতেই ছাড়তে চান না।'

রমানাথ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, 'ধরো আমি যদি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাই? তখন ও'রা কি করবেন?'

ইন্দ্রাণী মুখ আরও নত করিয়া কহিল, 'সে ভয়ও আমি দেখিয়েছিলাম, কাকাবাবু বলেন, তা'হলে অন্তত নতুন হাসপাতালটা না খোলা পর্যন্ত তিনি তাঁর বাড়িতেই রাখবেন, আরো তাতে যদি আপনার খুব আপত্তি থাকে তা'হলে ঐখানেই একটা ঘরে কোয়ার্টারের মত করে দেবেন।'

ব্যঙ্গ আর জ্বালা একই সঙ্গে রমানাথের কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিল, 'বারে মজা তো মন্দ নয়। আমি কি বিয়ে করেছি ওঁদের একটি বিনামাইনের নার্স দেবার জন্য?'

কথাটা বলিবার সঙ্গে-সঙ্গেই রমানাথ যেন নিজের কথার আঘাতে নিজেই স্তব্ধ হইয়া গেল। উহার আসল বিদ্রূপটা চাবুকের মতই আসিয়া তাহার গায়ে লাগিল, বিবাহ করিয়াছে সে কী জন্য, আজ তাহার পক্ষে বলা কঠিন—এ স্ত্রী তাহার কি কাজে আসিবে?...

সে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া কহিল, 'আচ্ছা কাকাবাবুকে আমি নিজেই বলব'খন।'

ইন্দ্রাণী আরও মুহূর্ত-দুই চুপ করিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

॥ ১৬ ॥

রমানাথ মুখে যাহাই বলুক, শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রাণীকে পাঠাইবার প্রস্তাব পর্যন্ত করিতে পারিল না। শুধু একটা গোপন এবং অহেতুক ক্রোধ মনের মধ্যে পুষিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। বড়দিনের ছুটিতে মা বাড়ি যাওয়ার কথা লিখিয়াছিলেন, ইন্দ্রাণীরও সে সম্বন্ধে একটা ভয় ছিল কিন্তু রমানাথ নানা অজুহাতে সেটা এড়াইয়া গেল। বাড়ি সেও যাইতে চায় না, পূজার স্মৃতি তখনও তাহার মনের মধ্যে অনেকখানি জায়গাকে বিষাক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

ইন্দ্রাণী এ সব কথা লইয়া মাথা ঘামাইবার অবকাশ নাই, বস্তুত নিজেকে এমন নিশ্ছিদ্রভাবেই কাজের মধ্যে সে জড়াইয়াছে যে কোথাও নিঃশ্বাস ফেলিবারও ফাঁক রাখে নাই। এক এক সময় সে যেন নিজেই নিজের বয়সের কথা ভুলিয়া যায়, তাহার সহিত যাহারা কাজ করে তাহারা তো ভুলিয়া গিয়াছেই।...ভুলিয়া না গেলে এত বড় গুরু দায়িত্ব ঐ একফোঁটা মেয়ের উত্তর তাহারা ছাড়িয়া দিতে পারিত না এবং এমন নির্বিচারে তাহার আদেশও পালন করিত না।

ইহারই মধ্যে বড়দিনের পরে হরিদাস তাহার বাবার অসুখের খবরে দেশে চলিয়া গেল। রমানাথ দুই-একদিন এদিকে ওদিকে চাকরের খোঁজ করিয়া পুনরায় নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল। এ-সব সাংসারিক ব্যাপারে মাথা ঘামানো তাহার

কোনদিনই অভ্যাস নাই। ফলে বাহিরের সমস্ত কাজ ছাড়া সংসারের ছোটখাটো কাজগুলিও ইন্দ্রাণীর উপর আসিয়া পড়িল।

ইন্দ্রাণী নিঃশব্দে সব কাজই করিয়া যাইতে লাগিল। অক্ষয়বাবু খবর পাইয়া তাহার ঝিকে পাঠাইতে শুরু করিলেন, সে শুধু বাসনটা মাজিয়া দিয়া যায়। বাকী যা কিছু কাজ, রান্না হইতে ধোওয়া-মোছা সমস্তই ইন্দ্রাণীর উপর পড়িল। কিন্তু সমস্ত কাজেই সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সারিয়া লইতে লাগিল, তাহার বাহিরের বিপুল কর্ম-ব্যবস্থার কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না।

প্রথম প্রথম রমানাথের মনে কোথায় একটা নিষ্ঠুর আনন্দের আভাস ছিল, সেটা বোধ হয় এই ভাবিয়া যে অক্ষয়বাবুদের স্বার্থপরতা এইবার বোধ হয় ঘা খাইবে। কিন্তু যখন দেখিল যে ঘর এবং বাহিরের কোন কাজেই ইন্দ্রাণীর বিন্দুমাত্র শৈথিল্য বা ত্রুটি নাই তখন তাহার মনোভাব শ্রদ্ধায় পরিণত হইতে বাধ্য হইল। বিশেষত, মনে মনে সে স্বীকার না করিয়া পারিল না, ব্যঞ্জনগুলায় এখন অধিকতর স্বাদ লাগিতেছে, পরিবেশনের পারিপাট্য তাহার মত নিস্পৃহ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ঘর-দুয়ারের শ্রী আগের চেয়ে অনেক বেশী ফিরিয়াছে—এমন কি মনের মধ্যে, এতদিন ইন্দ্রাণীকে এই সব কাজ হইতে দূরে রাখিবার জন্য, কোথায় যেন একটা ক্ষোভও অনুভব করে।

মাঘ মাসের প্রথম দিকে হঠাৎ রমানাথের একদিন জ্বর আসিল। দুটি লোকের সংসার, মধ্যস্থ হইয়া কথা কহিবার লোক না থাকায় আবশ্যকীয় কথা বলিতেই হইতেছিল, আজও ইন্দ্রাণীকে ডাকিয়া বলিতে হইল, 'আমার জ্বরের মত হয়েছে, এবেলা কিছু খাব না।'

ইন্দ্রাণীর মুখ যেন নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল এবং সেটা আজ, কী এক আকস্মিক কারণে, রমানাথের চোখ এড়াইল না। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, 'সামান্য জ্বর, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই।'

ইন্দ্রাণী অল্প একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'বড্ড টাইফয়েড হচ্ছে এদিকে, ডাক্তারবাবুকে ডাকলে হ'ত না?'

রমানাথ না হাসিয়া পারিল না। জবাব দিল, 'টাইফয়েডই যদি হয় তো পাঁচ ছ'দিনের আগে ধরা যাবে না। কাজেই ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই।'

রমানাথ যদিও বলিয়াছিল সে কিছুই খাইবে না, তবু ইন্দ্রাণী ঝিকে দিয়া বার্লি আনাইল। বার্লি প্রস্তুত করিয়া রাত্রে যখন সে রমানাথের বিছানার কাছে দাঁড়াইল, তখন তাহার পদশব্দে চোখ মেলিয়া রমানাথ কাঁচের গ্লাসে বার্লি দেখিয়া আর প্রতিবাদ-মাত্র করিল না, হাত বাড়াইয়া বার্লিটা গ্রহণ করিয়া এক নিঃশ্বাসে সবটা পান করিল। তাহার সেই আগ্রহ দেখিয়া ইন্দ্রাণীর জ্বরের সামান্যতা সম্বন্ধে দারুণ সন্দেহ জাগিল—যে প্রবল পিপাসায় ইহা সম্ভব হইয়াছে, তাহার পিছনে জ্বর নিশ্চয় খুব কম নয়। সে অনেক ইতস্তত করিল। তাহার গায়ে হাত দেওয়াকে রমানাথ অন্য কিছু মনে না করে, ঘৃণায় না সঙ্কুচিত হইয়া ওঠে—এই ছিল

তাহার ভয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উৎকণ্ঠারই জয় হইল। সে সন্তর্পণে রমানাথের ললাটে ও কণ্ঠে হাত দিয়া দেখিল, তাহার অনুমানই ঠিক, গা পুড়িয়া যাইতেছে।

ইন্দ্রাণীর হাতের স্পর্শে রমানাথ বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া চাহিল, কেমন কেন খাপছাড়া ভাবে প্রশ্ন করিল, 'কে ? কী—'

ইন্দ্রাণীয় গলা কাঁপিয়া গেল। কহিল, 'আপনার যে বড্ড জ্বর, তিনের কম নয়।'

রমানাথ কহিল, 'তা হোক, ভয়ের কোন কারণ নেই। ইনফ্লুয়েঞ্জা নিশ্চয়, যেমন মাথা ব্যথা করছে, তেমনি গা-হাত-পা কামড়াচ্ছে। ইনফ্লুয়েঞ্জাতে প্রথমে একটু বেশী জ্বর হয়ই।'

সে আবার চোখ বুজিল। কিন্তু ইন্দ্রাণীর দুই চোখ জ্বালা করিয়া জল ভরিয়া আসিল। সে একেবারেই অসহায়, সহসা কিছু হইলে ডাক্তার ডাকিবারও লোক নাই। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া রমানাথের উপর এমনই একটা নির্ভরতা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার মনে যে, তাহার এই আকস্মিক অসুখে সে যেন দিশাহারা হইয়া গেল। তাহার উপর, সবচেয়ে যেটা ক্ষোভের কারণ, প্রতিদিন কত পরস্যাপি পর তাহার হাতের সেবায় তৃপ্ত ও বেদনামুক্ত হইয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া যাইতেছে, অথচ সেই সেবায় যাঁহার সর্বাপেক্ষা বেশী অধিকার তাঁহার গায়ে হাত দিবার সাহস পর্যন্ত তাহার নাই।

বহুক্ষণ নিঃশব্দে রোদনের পর সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পাশের বাড়ির পলটু তখনও হয়ত জাগিয়া আছে, তাহার মাকে বলিলে তিনি পলটুকে পাঠাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু সে ছেলেমানুষ। কমলের বাড়িও অনেকটা দূরে তা ছাড়া এতরাত্রে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া রমানাথের সেবা করিতে বলিলে সে-ই বা কি মনে করিবে ? সুস্থ স্ত্রী কাছে থাকিতে পরকে সেবা করিবার জন্য ডাকা—ইহার চেয়ে লজ্জার কথা আর কি থাকিতে পারে ?

এক পলটুকে ডাকিয়া ডাক্তারের কাছে পাঠানো যাইতে পারে বটে, কিন্তু এই ক'দিনের হাসপাতালের অভিজ্ঞতাতে এ কথাটা সে ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে যে, এত তাড়াতাড়ি ডাক্তারের চিকিৎসা করার কিছু নাই।...সে সব কাজ সারিয়া তাহার নিজের ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া আবার এ ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ সে এ ঘরেই থাকিবে, রমানাথ যা-ই বলুক আর যা-ই মনে করুক। ঘড়িতে দেখিল রাত্রি মোটে নয়টা—পলটুরা এগারোটার আগে কোনদিন শোয় না, সুতরাং ডাক্তারের কাছে পাঠানোর লোক আর কিছুক্ষণ পরেও মিলিতে পারে।

রমানাথ জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্নের মত পড়িয়াছিল। কিন্তু কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে বোঝা গেল যে সে তাহারই মধ্যে, বোধকরি শারীরিক যন্ত্রণায় গোঙাইতেছে। ইন্দ্রাণী কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া তেমনি মূঢ়ের মতই দাঁড়াইয়া রহিল ! রমানাথ যেন 'মা' 'ওমা' বলিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কণ্ঠ ভেদিয়া শুধু একটা অস্ফুট শব্দই বাহির হইতেছে। নিজের অসহায় অবস্থায়

ইন্দ্রাণীর যেন মাথা কুটিয়া মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল। অপমানে তাহার কান-মাথা দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল, সেই মাঘ মাসের শীতেও কবরীর প্রান্তে ঘাম দেখা দিল।

অবশেষে গোঙানিটা আরও স্পষ্ট হইতে সে আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। নিজের ঠান্ডা হাতটা শাড়িতে ঘষিয়া সে একটু গরম করিয়া লইল, তাহার পর সন্তর্পণে বিছানারই একপ্রান্তে বসিয়া রমানাথের মাথায় 'মাসাজ' করিতে লাগিল।

প্রথমটাই রমানাথ কিছু বুঝিতেই পারে নাই, তারপর তাহার আচ্ছন্ন চৈতন্যে ধীরে ধীরে আরামটা সঞ্চারিত হইতে সে সোজা হইয়া শুইল এবং এক সময় চোখ চাহিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল, 'কে ? মা ?···মা এলে ?'

অপমানের আশঙ্কায় ইন্দ্রাণীর কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছিল, সে সাড়া দিতে পারিল না। তখন রমানাথ মাথাটা ঘুরাইয়া তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, 'কে ?'

তাহার দুই চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, দৃষ্টিও কেমন আচ্ছন্ন। সে দিকে চাহিয়া ইন্দ্রাণীর হাত-পা যেন মুহূর্তের জন্য অবশ হইয়া আসিল। বাড়িতে থার্মোমিটার পর্যন্ত নাই—জ্বর কত দেখা সম্ভব নয়। জলপটি দেওয়া উচিত কিনা তাহাও ঠিক করিতে পারিল না।

রমানাথ আবারও প্রশ্ন করিল, 'কে ?'

এবার আর উত্তর না দিয়া উপায় রহিল না। ইন্দ্রাণী একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, 'আমি।'

'তুমি ? তুমি কে ?' তাহার পর গলা আর একটু নামাইয়া কহিল, 'ও, তুমি !'

ভয়ে ইন্দ্রাণীর বুক কাঁপিতেছিল কিন্তু তিরস্কারসূচক কোন শব্দই বাহির হইল না। বরং খানিকটা পরে, কতকটা যেন আপন মনেই রমানাথ কহিল, 'মাথাটা যেন খসে যাচ্ছিল, এত অসহ্য যন্ত্রণা···এখন অনেকটা আরাম বোধ হচ্ছে।···হঠাৎ, হঠাৎ যেন মনে হ'ল মা—তাঁরও এমনি নরম হাত।'

ইন্দ্রাণীর এতক্ষণের আশঙ্কা যেন গুরুভার পাষাণের মত তাহার হৃদয়কে পিষিয়া দিতেছিল, এইবার তাহা কিছু হাল্‌কা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার চোখে জল ভরিয়া আসিল। যেখানে তাহার সত্যকার অধিকার সেখানেই তাহার কত সঙ্কোচ, কত আতঙ্ক।

তবুও, রমানাথ জ্বরের ঘোরে ঠিক তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে কিনা, সে ভয় একটা ছিলই। কিন্তু সেটা কিছুতেই বোঝা গেল না। রমানাথ অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া স্থির হইয়া পড়িয়া থাকিবার পর আর একবার মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল। আরও অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, 'হাত-পা কোমর যেন কিসে চিবুচ্ছে—অসহ্য যন্ত্রণা ইন্দ্রাণী !'

ইন্দ্রাণীর হৃদ্‌পিন্ড প্রবল বেগে একবার দুলিয়া উঠিয়া যেন স্থির হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। এ ডাক যে আবার কোনদিন রমানাথের কণ্ঠে সে শুনিবে সে আশা ছিল না। সে যেন কিছুক্ষণ নড়িতে পারিল না, তার পর প্রাণপণ

চেষ্টায় মুখ নামাইয়া কহিল, 'টিপে দিচ্ছি।'

সে নীচের দিকে সরিয়া আসিয়া লেপের মধ্যে হাত চালাইয়া পা টিপিতে শুরু করিল। প্রথমটা হাত যেন চলেই না, স্বামীর অঙ্গস্পর্শ এই তাহার প্রথম, গায়ে হাত দিলেই কেমন শিহরণ লাগে, সে শিহরণ কিছুকালের জন্য সমস্ত স্নায়ুকে যেন অবশ করিয়া দিয়া যায়। এই কয়মাসের ঘনিষ্ঠ বসবাসে, দূর হইতে কতবার তাহার অবাধ্য চক্ষু রমানাথের সুন্দর দেহের দিকে প্রশংসমান, তৃষ্ণার্ত চোখে চাহিয়া দেখিয়াছে—সে দেহ যে কোনদিন এমন অন্তরঙ্গভাবে স্পর্শ করিতে পারিবে সে আশা তাহার ছিল না। সে স্থান-কাল-পাত্র সমস্ত ভুলিয়া কিছুক্ষণের জন্য কেমন একটা অসহ্য পুলকানুভূতিতে যেন ডুবিয়া বসিয়া রহিল।

একটু পরেই তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। ছি, ছি, অসুস্থ স্বামীর সেবা করিতে বসিয়া এ সব কি ভাবিতেছে সে! কঠোর শাসনে মনকে সংযত করার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুর কার্যক্ষমতা ফিরিয়া আসিল। সে তাহার এতদিনের সমস্ত শিক্ষা প্রয়োগ করিয়া রমানাথের হাত-পা-কোমর-পিঠে 'মাসাজ' করিয়া দিতে লাগিল··· কিন্তু মনকে যতই শাসন করুক, মাঝে মাঝে তবু যেন গোলমাল লাগে! হউক জ্বরতপ্ত দেহ, স্বামীরই দেহ—বহুদিনের বাঞ্ছিত, দুরাশার ধন ; এ সেবা করিবার স্বপ্ন পর্যন্ত দেখিতে সে সাহস করে নাই। হাত নিজের অজ্ঞাতসারেই কখন যেন থামিয়া যায়, হৃদ্‌পিণ্ডের দ্রুত স্পন্দনে বুকে যেন ব্যথা অনুভব করে মধ্যে মধ্যে।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ করিয়া সে সেইভাবে সেবা করিয়া চলিল। রমানাথ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে বুঝিয়া 'মাসাজ' করা বন্ধ করিয়া শুধু পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। হাত অবিরাম সঞ্চালনে অবশ হইয়া আসে তবু ছাড়িতে পারে না,— মনে হয় আজিকার রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে এ স্বপ্ন কোন্ রূঢ় আঘাতে ভাঙ্গিয়া যাইবে—আবার হয়ত সেই দূরত্ব, সেই ব্যবধান দেখা দিবে। যে সৌভাগ্য অভাবনীয় ভাবে হাতে আসিয়া ধরা দিয়েছে, তাহাকে সে নিঃশেষে পান করিয়া লইতে চায়—ইহার কণামাত্র না পড়িয়া থাকে···

ক্রমে একটু একটু করিয়া রমানাথের গায়ে ঘাম দেখা দিতে লাগিল, মনে হইল জ্বর কমিতেছে। ঘুমের মধ্যেই, জ্বর ছাড়িবার অস্বস্তিতেই দুই-একবার এপাশ-ওপাশ করিল। ইন্দ্রাণী নিজের আঁচল দিয়া খুব সন্তর্পণে মাথার ও গায়ের ঘাম মুছিয়া লইল কয়েকবার কিন্তু হাওয়া করা প্রয়োজন কিনা বুঝিতে পারিল না। আসল কথা হয়ত মাথায় সামান্য হাওয়া করিলে ঘুমটা আরও গাঢ় হইতে পারিত কিন্তু পায়ে হাত বুলাইবার প্রলোভন ছাড়িয়া ইন্দ্রাণী বহুবার উঠি-উঠি করা সত্ত্বেও উঠিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ পরে, বোধ হয় শেষ রাত্রের দিকে রমানাথ একবার চোখ মেলিয়া চাহিল। প্রথমটা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কিছুক্ষণ শুধু নিঃশব্দে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া কহিল, 'তুমি এখনও শুতে যাও নি। রাত কটা হ'ল দেখ তো—'

ইন্দ্রাণী উঠিয়া হাতঘড়িটা দেখিল, 'চারটে বেজে গেছে—।'

'ইস্—তুমি এত রাত অবধি জেগে আছ! আবার তো ভোর হলেই খাটুনি শুরু হবে। যাও, যাও শুতে যাও।'

এতদিন পরে এই প্রথম স্নেহের সুর স্বামীর কণ্ঠে শুনিয়া ইন্দ্রাণী আর কিছুতেই নিজেকে সংযত করিতে পারিল না। তাহার দুই চক্ষু প্লাবিয়া এতদিনের সমস্ত ব্যথা যেন অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

তাহার সেই কান্না হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোতেও রমানাথের চোখ এড়াইল না। কিন্তু সে ভুল বুঝিল, মৃদু তিরস্কারের সুরে কহিল, 'এত রুগী রোজ দেখে এসে এই সামান্য জ্বরে অত অস্থির হচ্ছ কেন?'

তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'একটু জল দাও তো!'

ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া লইয়া অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে চুপিচুপি কহিল, 'মিশ্রীর জল দেব? ভিজানো আছে। আপনি তো কিছুই খান্নি কাল—'

'এতরাত্রে মিশ্রির জল?...না শুধু জলই দাও।'

জল খাওয়া হইলে কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া রমানাথ কহিল, 'এইবার আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুতে চলে যাও, আর এক মিনিটও না।'

চরম সাহসে ভর করিয়া ইন্দ্রাণী যেন ভিক্ষার সুরে কহিল, 'এই ঘরের মেঝেতে থাকব? যদি কিছু দরকার হয়?'

'না, দরকার হবে না।'

ইন্দ্রাণী আর কথা কহিতে সাহস করিল না। আলোটা নিভাইয়া দিয়া কপাট বন্ধ করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিল।

যে যখন বাহিরে আসিল, তখন শুক্ল পক্ষের চাঁদ আর নাই, চারিদিকে অন্ধকার থমথম করিতেছে। ভোরের তখনও বহু বিলম্ব, দুই-তিন ঘণ্টা অনায়াসে ঘুমাইয়া লওয়া যায়। কিন্তু ইন্দ্রাণী তখন ঘুমাইবার কথা ভাবিতেই পারিল না। রমানাথের অসুখ বলিয়া নয়—আজ তাহার জীবনে যে অঘটন ঘটিয়া গেল তাহার পর আর চোখে ঘুম আসা সম্ভব ছিল না। রমানাথ তাহার শেষ অনুরোধ রাখে নাই বটে কিন্তু সেটা তাহার চরম দুঃসাহস, স্পর্ধা। ভিখারীকে প্রশ্রয় দিলে তাহার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াই চলে, সে লোলুপতা মেটানো যায় না। জ্বর কমিবার পর অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ অবস্থাতেও রমানাথ তাহার সহিত মিষ্ট কথা কহিয়াছে, তাহার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে—এইটাই কি কম, এ যেন স্বপ্নেরও অতীত, কল্পনা করিতেও ভয় করে। সে ওপাশের হিমসিক্ত আলিসাতে নিজের উত্তপ্ত ললাট চাপিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, নিজেরই উত্তেজিত রক্তকণাগুলি শিরা-উপশিরায় যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে, একান্ত ভাবে কান পাতিয়া যেন সেই সঙ্গীতই সে শুনিতে লাগিল।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে পাখীর ডাকে তাহার চৈতন্য হইল। ভোর হইয়াছে বটে, গঙ্গার দিক হইতে ঠাণ্ডা কন্কনে ভোরাই হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছে।

তাহার যে এত শীত করিতেছিল সেটাও যেন সে এতক্ষণ বুঝিতে পারে নাই। কত কী যে সে ভাবিতেছিল তাহা খেয়ালও নাই, দুটি ফোঁটা আনন্দের জল তখনও তাহার পল্লব-প্রান্তকে সিক্ত করিয়া রাখিয়াছিল—সে সেই আর্দ্রচক্ষু মেলিয়া উদয়াচলের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার পর একটা প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া আসিল। মনে মনে ঈশ্বরের কাছেও বোধ হয় এ প্রশ্নটা করিতে সাহস করিল না, প্রায়শ্চিত্ত কি কিছু শেষ হইয়াছে ভগবান ?···

সে তখনই বাড়ির কাজে লাগিয়া গেল। কাল তাহার নিজের খাবার তৈরী করে নাই—কিছু খাওয়াও হয় নাই। কিন্তু সে কথা তাহার মনেই পড়িল না। আজ গোটা বাড়িটা বিশেষ পরিপাটি করিয়া ধুইয়া মুছিয়া ঝকঝকে করিয়া তুলিল। ঝিয়ের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া অল্প যে দুই-একখানা বাসন ছিল নিজেই মাজিয়া উনানে আঁচ দিয়া যখন স্নান সারিয়া উপরে আসিল তখনও সাতটা বাজে নাই, প্রভাতের তখনও বরং কিছু বিলম্ব আছে।

রমানাথের একটা খবর লওয়া প্রয়োজন কিন্তু ইন্দ্রাণীর যেন ভরসায় কুলাইতেছিল না। গতকালের সুরটা যদি নিষ্ঠুর আঘাতে কাটিয়া যায়, বোধ হয় এই ছিল তাহার আশঙ্কা। অথচ দেরি করারও উপায় নাই—অগত্যা রমানাথ তখনও হয়ত ঘুমাইতেছে এই আশায় সে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল রমানাথ জাগিয়া দরজার দিকেই চাহিয়া আছে।

ভয়ে ইন্দ্রাণীর বুকটা ঢিপ্ করিয়া উঠিল, কিন্তু তবু প্রাণপণে কণ্ঠ সংযত করিয়া কহিল, 'এখন কেমন বোধ করছেন ? ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠাবো ?'

রমানাথ কহিল 'না। জ্বর অনেক কম, বোধ হয় আজই ছেড়ে যাবে। ইনফ্লুয়েঞ্জা।'

তাহার পর একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, 'মুখটা ধোব—বিশ্রী লাগছে।'

ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি কহিল, 'আমি এইখানেই গামলাটা নিয়ে আসছি—'

বাধা দিয়া রমানাথ কহিল, 'না, না, তার দরকার হবে না। বাইরেই যেতে পারব। তবে একটু গরম জল হ'লে ভাল হ'ত—

ইন্দ্রাণী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'জল চাপিয়ে এসেছি, এক মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে। কিন্তু আপনার বাইরে যাবার দরকার নেই, আজ বড্ড ঠাণ্ডা—'

রমানাথ আর কোন কথা কহিল না। ইন্দ্রাণী গরম জল, টুথ-ব্রাস, মাজন, গামছা আনিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া দিল—জলও একটু একটু করিয়া ঢালিয়া দিতে লাগিল। রমানাথ মুখ ধুইতে ধুইতে নিজের মানসিক অবস্থাতে নিজেই একটু বিস্মিত হইল। ইন্দ্রাণীর এত নিকট সঙ্গ বা তাহার এই সেবা—কোনটাই আজ তাহার মনে বিশেষ কোন বিদ্বেষের সৃষ্টি করিতেছিল না। কাল রাত্রির কথা সবটা তাহার ভাল মনে নাই। শুধু এইটুকু মনে আছে যে বহুক্ষণ ধরিয়া ইন্দ্রাণীই তাহার সেবা করিয়াছে এবং সে-সেবার প্রার্থনা সে-ই বোধহয় প্রকারান্তরে জানাইয়াছিল।···কিছু মিষ্টবাক্যও সে সময়ে বলিয়াছিল কিনা জানিবার জন্য প্রবল কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও সে প্রশ্ন করিতে পারিল না, পারা সম্ভব নয়। তবে

হয়ত সেই কৃতজ্ঞতাই আজ তাহার মনকে ইন্দ্রাণীর দিকে কিছু সহজ ও কোমল করিয়া আনিয়াছে—নিজেকে এই সান্ত্বনা দিল।

মুখ ধোয়া হইলে ইন্দ্রাণী প্রশ্ন করিল, 'এখন কি খাবেন, মিশ্রীর জল দেব, না বার্লি? বার্লি সবে চেপেছে।'

তাহার হাত হইতে তোয়ালেটা লইয়া মুখ মুছিতে মুছিতে রমানাথ জবাব দিল, 'মিশ্রীর জলই দাও।'

ইন্দ্রাণী চলিয়া গেলেই মনে হইল যে কাল হইতে যে মিশ্রী ভিজিতেছে সে এতক্ষণে বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া উঠিয়াছে—একটু গরম করিতে বলিয়া দিলে হইত।...এখন আবার চিৎকার করিয়া ইন্দ্রাণীকে ফরমাশ করিতেও কেমন যেন সঙ্কোচে বাধে বলিয়া সে চেষ্টা আর করিল না। কিন্তু ইন্দ্রাণী যখন গ্লাস লইয়া আসিল তখন দেখা গেল সেটা হইতে সামান্য ধোঁয়া উঠিতেছে—ঠিক যতটুকু গরম করা প্রয়োজন, সে ততটুকুই গরম করিয়া আনিয়াছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই খুশীতে রমানাথের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, হঠাৎ সে মুখ তুলিয়া কহিল, 'তোমারও বোধহয় রাত্রে কিছু খাওয়া হয় নি—এখন কিছু খেয়েছো?'

ইন্দ্রাণী যেন এই প্রশ্নে শিহরিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, 'না। খাব এখন।'

রমানাথ আর কিছু বলিল না। নিজের এই আকস্মিক হৃদয়াবেগে নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, খাওয়া শেষ করিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িল।...

অনেকক্ষণ পরে গরম টোস্ট্ ও আদা দেওয়া চা লইয়া ইন্দ্রাণী আবার যখন প্রবেশ করিল তখনও রমানাথ এই কথাটাই মানিতে বাধ্য হইল যে, এটাও তাহার মন চাহিয়াছিল। কিন্তু এবার সে সতর্ক ছিল, কোন কথা কহিল না, শুধু চায়ে চুমুক দিতে দিতে মাটির দিকে চোখ রাখিয়াই কহিল, 'তুমি ওখানে যাও কখন?'

ইন্দ্রাণী কহিল, 'আজ আর যাব না।'

ব্যস্ত হইয়া রমানাথ কহিল, 'না না, তার দরকার নেই। আমি কয়েকঘণ্টা বেশ থাকব'খন্—'

ইন্দ্রাণী নম্র অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, 'আমি ঝিকে দিয়ে অক্ষয়বাবুকে বলে পাঠিয়েছি।'

রমানাথ ব্যাকুলভাবে আর একটা কি বলিতে গেল, 'কিন্তু এতগুলো লোকের দায়িত্ব—শুধু শুধু—'

ইন্দ্রাণী বলিল, 'আমার নিজের অসুখ হলেও তো কামাই করতে হ'ত। তা ছাড়া হাতে-কলমে করবার মত আরও লোক আছে।'

সে আর বাদানুবাদের অবসর না দিয়াই বাহির হইয়া গেল।

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইন্দ্রাণী অনেকক্ষণ আর এ ঘরে আসিল না। পাছে লোলুপতা স্পর্ধা প্রকাশ পায় এই ভয়ে বার বার দরজার সম্মুখ দিয়া ঘোরাঘুরি করিল কিন্তু ভিতরে ঢুকিতে পারিল না। প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক পরে বার্লির গ্লাস

হাতে লইয়া যখন আবার খাওয়াইতে আসিল, রমানাথ তখন দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া আছে। এতই স্থির হইয়া আছে যে, ঘুমাইতেছে কিনা বোঝা যায় না।

ইন্দ্রাণী শব্দ করিয়া বার্লির গ্লাসটা টেবিলের উপর রাখিল কিন্তু তাহাতেও ওপক্ষ হইতে কোন সাড়া মিলিল না। আরও খানিকটা ইতস্তত করিয়া সে সন্তর্পণে বিছানার কাছে আসিয়া যেমন হেঁট হইয়া দেখিতে গেল রমানাথ ঠিক ঘুমাইতেছে কিনা, কাপড়ের মধ্য হইতেই একগুচ্ছ চুল স্খলিত হইয়া তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। সেই স্পর্শেই রমানাথ চমকিয়া উঠিয়া পাশ ফিরিল, 'কী, কিছু বলছিলে?'

এক মুহূর্তে ইন্দ্রাণীর সুন্দর মুখে কে যেন আলতা মাখাইয়া দিল। সে অতি-কষ্টে কহিল, 'ঘুমোচ্ছিলেন কিনা বুঝতে পারি নি তাই—বার্লি এনেছিলাম।'

রমানাথ নিজের অজ্ঞাতসারেই সেই লাজরক্ত অপূর্ব মুখের দিকে চাহিয়াছিল, অত্যন্ত চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'দাও।'

তারপর বার্লি খাওয়া শেষ হইলে শূন্য গ্লাসটা ইন্দ্রাণীর হাতে ফিরাইয়া দিতে দিতে কহিল, 'তোমার খাওয়া হয়েছে?'

ইন্দ্রাণী লজ্জিতমুখে ঘাড় নাড়িয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

তাহার ভাত প্রস্তুতই ছিল, শুধু ভাতে-ভাত—একা নিজের জন্য কিছু রান্নার কথা ভাবিতেও পারে না সে—কিন্তু তবু যেন খাওয়ার কথা মনেই পড়িতেছে না। বহুদিনের কঠিন হিমবর্ষণে যখন মনে হইতেছিল অন্তর-প্রকৃতি বুঝি-বা মরিয়াই গিয়াছে, সেই সময় কোন্ সুরলোক হইতে এক ঝলক দক্ষিণা হাওয়া বহিয়া আসিয়াছে—তাহার শিহরণ এখনও যেন ইন্দ্রাণীর সর্বাঙ্গে লাগিয়া রহিয়াছে। সামান্য ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা মনেই পড়ে না—

তবু এবারে আসিয়া সে আহারে বসিল। সেই কোন্ এক সুদূর অতীতে, যে ভুলিয়া-যাওয়া দিনে সে প্রথম নিজের দুষ্কৃতির পরিমাণ সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিল, সেই দিনটি হইতে এই কাজটিই তাহার কাছে সবচেয়ে বেদনাদায়ক, সবচেয়ে অপমানকর মনে হইয়াছে, মনে হইয়াছে এই ব্যাপারটিই তাহার প্রয়োজন-হীন, উদ্দেশ্যহীন জীবনের অস্তিত্বকে আরও বাড়াইয়া দিতেছে।···কিন্তু আজ, আজ সেই সামান্য উপকরণ দিয়াই ভাত খাইতে বসিয়া বহুদিন পরে প্রথম যেন মনে হইল—তাহারও জীবনধারণের কিছু প্রয়োজন ছিল এবং আছেও—

খাওয়া হইলে রান্নাঘরের কাজ শেষ করিয়া আর একবারের মত বার্লি লইয়া যখন সে আবার এ ঘরে আসিল তখন রমানাথ সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে বার্লিটা ঢাকা দিয়া রাখিল, তাহার পর ওঘর হইতে বুনিবার সরঞ্জাম লইয়া আসিয়া জানালার ধারে মেঝেতে বসিয়া বুনিতে লাগিল।···

রমানাথ দীর্ঘ একটা ঘুম দিয়া যখন চোখ মেলিল তখনও ইন্দ্রাণী বুনিয়া চলিয়াছে। অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া উঠিয়া প্রথমটা সে কিছু বুঝিতেই পারিল না। খানিকটা নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিবার পর তবে যেন ব্যাপারটা মাথায় গেল। কিন্তু

তবু সে কোন কথা কহিল না, কিংবা সাড়াও দিল না, ইন্দ্রাণীর বসিয়া থাকিবার ভঙ্গিটা এতই মধুর লাগিল যে সে শুধু অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। ইন্দ্রাণী একমনে বুনিয়াই যাইতেছিল, সে-ও চোখ তুলিয়া চাহিল না—হাতির দাঁতের সাদা কাঠিগুলির ওঠা-নামার সঙ্গে তাহার সুন্দর আঙুলগুলি সঙ্কুচিত প্রসারিত হইতেছিল এবং নিঃশ্বাসের জন্য বুকটা মধ্যে মধ্যে ফুলিয়া উঠিতেছিল—এ ছাড়া সমস্ত অঙ্গ স্থির, মন একাগ্র।

সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া রমানাথের মনে হইল যেন সে এতদিন ধরিয়া একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। আসলে তাহার জীবন মধুরই। ঘরে তাহার সেবারতা, কর্মপরায়ণা স্ত্রী, যেমনটি সে চাহিয়াছিল।

কিন্তু একটু পরেই বাস্তব সত্যটা রূঢ় আঘাতে সচেতন করিয়া দিল, এইটাই স্বপ্ন! মধুর স্বচ্ছন্দ জীবনই তাহার পক্ষে দুরাশা—কল্পনা মাত্র।

তাহার দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে ইন্দ্রাণীর চমক ভাঙিল! সামান্য একটু লজ্জিত হাসির সঙ্গে সঙ্গে বোনাটা নামাইয়া রাখিয়া প্রশ্ন করিল, 'এখন কেমন বোধ করছেন? থার্মোমিটারটা দেব?'

কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া রমানাথ উত্তর দিল, 'থার্মোমিটার? দাও।'

খুব সামান্য জ্বর—এত সামান্য যে তাহাকে অবজ্ঞা করা যায়। ইন্দ্রাণী জ্বর-কাঠিটা খাপে পুরিতে পুরিতে কহিল, 'এটুকু আশা করা যায় সন্ধ্যাবেলা ছেড়ে যাবে।'

রমানাথ অতি ক্ষীণ একটু হাসির সঙ্গে কহিল, 'যদি না যায়? যদি আবার আসে?'

পলকের মধ্যে ইন্দ্রাণীর মুখ যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। সে উদ্বিগ্ন, কম্পিত কণ্ঠে কহিল, 'কেন, কিছু কি—'

'ভয় নেই' রমানাথ হাসিয়া ফেলিল, 'ওটা চলেই যাবে। কাল আর তোমাকে পাহারা দিয়ে থাকতে হবে না।'

ইন্দ্রাণীর আঘাত খাওয়া সহ্য হইয়া গিয়াছিল কিন্তু এ যে অভিমানের আঘাত! সে চকিতে মুখ তুলিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিল। কহিল, 'আপনি কি ওখানে যাওয়ার জন্য বিরক্ত হন? তা হ'লে কিছুতেই যাব না। আমি ঠিক বুঝতে পারি নি বলেই—'

ব্যস্ত হইয়া রমানাথ কহিল, 'না, না—সে কি কথা! সে কথা আমি বলি নি, সত্যিই বলি নি।'

ইন্দ্রাণী উদ্গত অশ্রু কষ্টে দমন করিলেও কণ্ঠস্বরে চাপা রহিল না! বলিল, 'নইলে আপনি কেমন করে ভাবতে পারলেন যে আমি দুপুরে আটকে থাকার জন্যই—'

কথাটা বলিতে বলিতেই মনে পড়িয়া গেল যে, এ অভিমান প্রকাশের কোন অধিকার পর্যন্ত তাহার নাই। নিজের চৈতন্যের আঘাতেই সে বিবর্ণ হইয়া

অকস্মাৎ চুপ করিয়া গেল।

রমানাথ তাহার এই সূক্ষ্ম অনুভূতির সবটা না বুঝিলেও কথাটা ঘুরাইয়া দিল, 'আমায় কিছু খেতে দাও—।'

ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, 'বার্লি খাবেন তো? ফলটল তো আনাতে পারি নি, অক্ষয়বাবুকে চিঠি দিয়েছি, বোধহয় কোর্টের ফেরত নিজেই পেঁছে দিয়ে যাবেন···এখন বার্লিই দিই?'

'দাও—।'

ছোট স্পিরিট-স্টোভটা জ্বালিয়া দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই বার্লি গরম করিয়া লেবু চিনি মিলাইয়া যখন ইন্দ্রাণী লইয়া আসিল তখন রমানাথ উঠিয়া বসিয়াছে। বসিয়াছিল আগেই—ইন্দ্রাণী কি বুনিতেছে সে কৌতূহল অসম্বরণীয় হইয়া ওঠাতে সে ইহারই মধ্যে দেখিয়া লইয়াছে যে সেটা একটা স্কার্ফ। তবু বার্লি খাওয়া হইলে ইন্দ্রাণীর দেওয়া তোয়ালেতে মুখ মুছিতে মুছিতে প্রশ্ন করিল, 'ওটা কি বুনছ?'

ইন্দ্রাণী মাথা নিচু করিয়া জবাব দিল, 'মায়ের জন্য একটা স্কার্ফ। আহ্নিক-পুজো, তাছাড়া সকালের কাজ-কর্মের সময় গায়ের কাপড় গায়ে দিতে পারেন না, কাজের অসুবিধা হয়—এ আমাকে উনি অনেক আগেই বলেছিলেন। জামা তো পরবেন না তাই—মনে করছি ডাকেই না হয় পাঠিয়ে দেব।'

রমানাথ বিস্মিত হইয়া কহিল, 'মা মানে,—আমার মা?'

ইন্দ্রাণী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।···সামান্যই বাকী আছে আর।'

রমানাথ শুধু প্রশ্ন করিল, 'এ তুমি কখন বোনো?'

'রাত্রে—দুপুরে ওখানে, যখন সময় পাই।'

রমানাথ আর কথা কহিল না। টেবিলের উপর হইতে একখানা বই টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু কিছুতেই, বহু চেষ্টার পরও, তাহার এক বর্ণও পড়িতে পারিল না। অনেকক্ষণ পরে একবার শুধু ঘাড় ঘুরাইয়া ইন্দ্রাণীর দিকে চাহিয়া দেখিল যে, বুনিতে বুনিতে কখন তাহারও হাত থামিয়া গিয়াছে, স্তব্ধ নতনেত্রে শুধু বোনাটার দিকেই চাহিয়া বসিয়া আছে।

॥ ১৭ ॥

রমানাথ শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিল। আবার সেই আগের জীবনযাত্রা, শুধু সে কঠোরতাটা আর রাখা সম্ভব হইল না। দুই-একবার চেষ্টা করিতে গিয়াও রমানাথ দেখিল, কোথায় যেন একটা চক্ষুলজ্জাতে বাধে। এখন তাই, বাধ্য হইয়া নয়, প্রয়োজন হইলে সহজভাবেই কথাবার্তা বলে। এমন কি হরিদাস বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসা সত্ত্বেও ইন্দ্রাণী যে রন্ধনের কাজটা আর তাহার হাতে ছাড়িয়া দিল না—এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়া রমানাথ মনে মনে খুশীই হইল।—

মাঘ-ফাল্গুন কাটিয়া চৈত্র আসিল। ১৩৪৯ সালের চৈত্র। চালের দাম হু-হু

করিরা বাড়িতেছে। সকালে একরকম দাম থাকে, সন্ধ্যায় আর এক রকম—আবার পরের দিন ভোরে বাজার খোলে নূতন দাম লইয়া। চালের সহিত হয়ত সম্পর্ক-মাত্র নাই, দাম বাড়িতেছে। একই গুদামে চাল আছে, পুরা টাকাও হয়ত কেহ দিল না, শুধু বায়নার জোরে মোটা টাকা লাভ পাওয়া যাইতেছে। মালিকানা হাত বদলাইতেছে মাত্র—মাল নয়।

তবু তখনও সেটা ভয়াবহ হইয়া ওঠে নাই। চাষীরা যে পতঙ্গের মত চড়াদামের আগুনে অমন সর্বস্ব হারাইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে তাহা কেহ কল্পনা করে নাই। শুধু একটা আশঙ্কাতেই ভদ্র গৃহস্থরা কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু বৈশাখ আসিতেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মহাজনরা ভুল করে নাই, মোটা অঙ্কের প্রলোভনে লোকে নিঃস্ব হইয়া চাল বেচিয়াছে। বাংলা দেশে এমন চালের অভাব হইতে পারে তখন সেটা ছিল স্বপ্নের অগোচর—মহাজনদের অনুগ্রহে সেই অসম্ভবই সম্ভব হইল, সুজলা সুফলা ধনধান্যভরা বাংলাদেশ হইতে অন্নলক্ষ্মী কয়েকজন অবাঙ্গালী মহাজনের উপর ভর করিয়া কোথায় মিলাইয়া গেলেন। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের চৈতন্য হইল অনেক পরে—বাঘের ভোজ শেষ হইলে শকুনির দল যেমন অস্থির মধ্যে ঠোকর মারিয়া প্রসাদ খুঁজিবার চেষ্টা করে, তেমনিই তাহারা শেষকালে বাংলা দেশের পঞ্জরের মধ্যে ঠোকর মারিতে লাগিল।

কিন্তু তবুও ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত, এত অভাবনীয় যে বৈশাখ মাসে যখন বুভুক্ষুদের মৃত্যু শুরু হইল তখনও, অপেক্ষাকৃত যাঁহারা সক্ষম তাঁহাদের জড়তা কাটিল না। স্তম্ভিতভাবে শুধু তাঁহারা দাঁড়াইয়া সেই মৃত্যুর তাণ্ডব দেখিতে লাগিলেন এবং স্ত্রীর গায়ের গহনা বেচিয়া, যাঁহাদের গহনা নাই তাঁহারা বাসন-কোসন, জমি, গরু-বাছুর বেচিয়া পাগলের মত চাল কিনিয়া রাখিতে লাগিলেন। ত্রিশ-বত্রিশ-চল্লিশ পর্যন্ত—যত দামই হোক—চাল চাই।

কিন্তু এত দুঃখের অন্নও মুখে তোলা যায় না। ভোর হইতে রাত্রি বারোটা-একটা পর্যন্ত মুমূর্ষু ভিখারীর দলের আর্তনাদের মুখের খাদ্য বিষাইয়া উঠে—অথচ এই বাজারে কে কত ভিক্ষা দিতে পারে? বাড়ির সদরের কাছে কঙ্কালসার মৃতদেহগুলি পড়িয়া থাকে। কঙ্কালসার বলিতে যাহা বোঝাইত এতদিন এ তাহা নয়—ডাক্তারখানায় যেমন শুধু অস্থি সাজাইয়া কঙ্কাল খাড়া করিয়া রাখে—তাহারই উপর কাগজের মত একটা পাতলা চামড়া মাত্র ঢাকা। সেই সব মৃতদেহ বা মুমূর্ষু দেহের পেট বলিয়া আর কিছুই নাই—বুকের পাঁজরের পরই সামনের আস্তরণটি মেরুদণ্ডের সঙ্গে গিয়া মিশিয়াছে। সেদিকে চাহিলে মাথা ঝিম ঝিম করে, নিজেরই হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া আসে।

শুধু যে এইসব নরদেহধারীদের আকৃতি বদলাইয়াছে তাহা নয়, প্রকৃতিও বদলাইয়াছে। মা ছেলের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খায়—এটা আর বড় কথা নয়, ছেলের মৃতদেহ কোলে করিয়া কাঁদিতেও ভুলিয়া যায়—কোথাও কণামাত্র খাদ্য পাইলে সেই অবস্থাতেই আগে পাগলের মত খাইতে শুরু করে। যাহারা এককালে সম্পন্ন চাষী ছিল—অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ ছিল—এমন অনেকে সন্তানের মৃতদেহ বহিয়া আনিয়া সদর

রাস্তায় ফেলিয়া যায়। শোকও করে না, সৎকারের চেষ্টাও করে না—শুধু জড়ের মত বসিয়া পরবর্তী মৃত্যুর অপেক্ষা করে। ডাঁটার ছিবড়া লইয়া কুকুরের সঙ্গে মানুষের বিবাদ চলে সারাদিন-রাত্রি ধরিয়া আঁস্তাকুড়ের ধারে—একটি চোখ এড়াইয়া যাওয়া চিনাবাদামের দানার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাঁক ঘাঁটে।

রমানাথও দিনের পর দিন এই দৃশ্য দেখে এবং অন্তরে অন্তরে পীড়িত হইতে থাকে। এই বিপুল ক্ষুধার যে কোন রকম প্রতিকার করা সম্ভব—মৃত্যুর এই তাণ্ডব যে এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ করা যায়—এ কল্পনাও তাহার মাথাতে আসে না। শুধু তাহার নিজের মুখের গ্রাস বিষাইয়া ওঠে, রাস্তায় চলিতে ইচ্ছা করে না, বুভুক্ষু ও মুমূর্ষুদের আর্তনাদের স্মৃতি উপরের ঘরেও তাহার পড়াশুনা, তাহার চিন্তা সব ভুলাইয়া দেয়।

সহসা একদিন কলেজের ভূপেনবাবু লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া বলিলেন, 'না মশাই, হিংসে না করে পারি না। হ্যাঁ, স্ত্রী পেয়েছিলেন বটে।...আমি পুরো একটি জন্ম তপস্যা করতে রাজী আছি এ রকম বৌয়ের জন্য।'

বহু আঘাত সহিয়া সহিয়া রমানাথ পাথর হইয়া গেছে, তা ছাড়া অভ্যাসে বেদনার তীব্রতা কমিয়াই যায়, তবু স্ত্রীর প্রশংসা শুনিলে এখনও তাহার বুকের মধ্যে ধ্বক্ করিয়া ওঠে। আজও সে বিবর্ণ মুখ তুলিয়া ভূপেনবাবুর দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কথা কহিতে পারিল না।

ভূপেনবাবু মুহূর্তখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, 'কৈ, এতগুলো তো মানুষ আছে, কারুর মাথাতে কথাটা গিয়েছিল কি? আমরা সকলেই সাধ্যমত ভিক্ষে দিচ্ছি, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মিনিস্টারের কাছে দরখাস্ত করছি—আর সবাই মিলে হা-হুতাশ করছি।...আপনার স্ত্রীই সেদিন প্রথম অক্ষয়বাবুর কাছে প্রস্তাব করেছেন যে আমরা কিছু কিছু চাঁদা তুলে এই পাড়ায় একটা অন্নসত্র খুলি, তাহ'লে আমাদের দেখাদেখি অন্য পাড়ার লোকেরাও খুলবে—আর আমরা কাজে নেমেছি শুনলে সরকারী সাহায্যও পাওয়া যেতে পারে। অন্তত হিন্দুমহাসভা বা ঐ রকম সব রিলিফ কমিটিগুলোর কাছ থেকে তো কিছু আদায় হবে।'

ভূপেনবাবু কথাগুলো শেষ করিয়া যেন বিজয়গর্বে রমানাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমানাথ একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'সেই ব্যবস্থাই কি করলেন তাহ'লে?'

'তৎক্ষণাৎ। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, কাল থেকে খোলা হবে। সেই কথাই বলতে এসেছি আপনাকে, আপনার চাঁদাটাও কাল নেব—'

তারপর আর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, 'আবার প্রথম চাঁদা আমাদের কে দিয়েছে জানেন? সেও আপনার স্ত্রী। তাঁর হাতের একজোড়া কঙ্কণ খুলে দিয়েছেন—'

ঈষৎ তীক্ষ্নকণ্ঠে রমানাথ প্রশ্ন করিল, 'কী দিয়েছেন?'

'ওঁর কঙ্কণ। লক্ষ্য করেন নি বুঝি? উনিও বোধহয় কিছু বলেন নি, না?...'

এই কঙ্কণটা এবার বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় রমানাথের শাশুড়ী দিয়েছেন কন্যাকে। এ অলঙ্কারটি নাকি বরাবরই তাঁহার দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিবাহের সময় অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য দিতে পারেন নাই—পরে নিজের কী একটা অলঙ্কার ভাঙ্গিয়া গড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। এ সব কথাই রমানাথ তাঁহার মুখে শুনিয়াছে।

ভূপেনবাবু তখনও বলিয়া চলিয়াছেন, 'তা সোনা বেশ আছে মশাই, ভরি-তিনেকের কম নয়। সোনার দামই দুশো টাকা হবে। আমরা গলাই নি, যদি এমনি কেউ কিনে নেয় তাহ'লে কিছু মজুরীও ধরে নেওয়া যায়।'

রমানাথের মুখ লাল হইয়া উঠিল কথাটা বলিবার সময়, তবু সে প্রাণপণ চেষ্টায় বলিল, 'ওটা আমাকেই বিক্রী করুন না, আমি আড়াই শ' টাকা দেব।'

'নিশ্চয়ই করব,' ভূপেনবাবু লাফাইয়া উঠিলেন, 'কেন করব না! আমি এখনই আনিয়ে দিচ্ছি।··· ও, আপনি ওটা কিনে নিয়ে গিয়ে আবার শ্রীহস্তে পরিয়ে দিতে চান—এই তো? ইস্—আপনারা এখনও এত রোম্যাণ্টিক আছেন, আশ্চর্য! দেখে হিংসে হয় মশাই, দেখে হিংসে হয়।'

রমানাথের কণ্ঠস্বর জড়াইয়া গেল যেন, 'না না, ওটা আমার শাশুড়ী দিয়েছেন কিনা, বড় শখের জিনিস তাঁর—'

'থামুন না মশাই! আসল কথাটা কি আর আমার কাছে চেপে যেতে পারবেন, আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড মনে রাখবেন, আমরাও রোম্যাণ্টিক বয়স পেরিয়ে এসেছি।'

বিজ্ঞতার সহিত কৌতুক মিশানো এক প্রকার হাসিতে মুখ রঞ্জিত করিয়া ভূপেনবাবু চলিয়া গেলেন। লজ্জায় অপমানে রমানাথের দুই কানের পাশটা যেন জ্বালা করিতে লাগিল। কী প্রয়োজন ছিল তাহার শাশুড়ীর প্রতি এই দরদ দেখানোর? নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজের মুখেই চড় মারিতে ইচ্ছা হইল।

একটু পরেই, ভূপেনবাবু কঙ্কণ-জোড়াটা হাতে করিয়া আবার দেখা দিলেন, 'এই নিন আপনার জিনিস, ঠিক আছে তো?'

রমানাথ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া পকেট হইতে একখানা চেক বাহির করিয়া ভূপেনবাবুর হাতে দিয়া কহিল, 'সাড়ে তিনশ টাকাই লিখে দিয়েছি। আড়াইশ কঙ্কণটার দাম, বাকী একশ আমার চাঁদা—সবই লেখা আছে, খালি সেক্রেটারীর নাম জানি না বলে লিখি নি। ওটা আপনারা বসিয়ে নেবেন।'

সেদিন রমানাথ ছুটির পরই বাড়ি গেল না। আজকাল রাস্তায় চলা যায় না, এমম কি গঙ্গার ধারও মৃতদেহে ও মুমূর্ষুতে বোঝাই—সেজন্য বেড়ানো সে ছাড়িয়াই দিয়াছে, তবু আজ জোর করিয়া গঙ্গার ধারেই খানিকটা ঘুরিয়া বেড়াইল। কেমন যেন মাথার মধ্যে চিন্তা ও সংস্কারের ধারাগুলো গোলমাল হইয়া যায়, সকল প্রকার যুক্তির উপরে হৃদয়বৃত্তি মাথা তুলিতে চায়—অকারণ আবেগে বুক কাঁপে। অন্তরের এই অর্থহীন দ্বন্দ্বে রমানাথ ক্লান্ত, মধ্যে মধ্যে একটু নির্জনতা না পাইলে সে যেন পাগল হইয়া ওঠে।

প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া সে যখন বাড়ি ফিরিল তখন ইন্দ্রাণী

স্তব্ধ হইয়া সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া আছে, উদ্বেগে তাহার মুখ বিবর্ণ। রমানাথকে দেখিয়া সে আর কিছুতেই নিজেকে সামলাইতে পারিল না, সেই অসতর্ক মুহূর্তে তাহার মুখ দিয়া প্রশ্নটা বাহির হইয়া গেল, 'এত রাত হ'ল যে আপনার?'

এ প্রশ্ন তাহার পক্ষে স্পর্ধার, প্রশ্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রাণী সেটা বুঝিয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল কিন্তু রমানাথ বেশ সহজভাবেই উত্তর দিল, 'এমনিই একটু গঙ্গার ধারে ঘুরছিলুম!'

ইন্দ্রাণী আর কোন কথা কহিল না। রমানাথের মুখ হাত ধুইবার জল, তোয়ালে, কাচা কাপড় প্রভৃতি নিঃশব্দে ছাদে সাজাইয়া দিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল। একটু পরে জলখাবার ও চা লইয়া যখন ঘরে ঢুকিল রমানাথ তখনও স্থির হইযা বসে নাই, সেই ছোট ঘরেব সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যেই পায়চারি করিতেছে। ইন্দ্রাণী তাহার এই চাঞ্চল্যে বিস্মিত হইলেও প্রশ্ন করিল না, নিজের অধিকার এবং দাবী কতটুকু সে-কথা সে ভোলে দৈবাৎ।

কিন্তু আজ রমানাথই তাহাকে ডাকিল, 'শোন—।'

আবার কোথায় কি অপরাধ ঘটিল, কোথায় তাহার অজ্ঞাতসারে মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কিতচিত্তেই ইন্দ্রাণী ঘুরিয়া দাঁড়াইল। রমানাথ একেবারে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি যে এখানে অন্নসত্র খুলতে চাও, তা তো আমাকে বলোনি?'

এ কথার জবাবে ইন্দ্রাণী অনেক কিছুই বলিতে পারিত, অন্তত এই কথাটা বলা চলিত যে, তাহার কোন কথাই বলিবার সম্পর্ক তাহাদের নয়, তবু সে চুপ করিয়াই রহিল। রমানাথ পুনশ্চ কহিল, 'তোমার কি বিশ্বাস আমি বাধা দিতুম? এত বড় একটা জিনিস তুমি করতে যাচ্ছ, অথচ তোমার স্বামী কিছুই জানে না, পরের মুখ থেকে তাকে শুনতে হয়—এটা কি অশোভন দেখায় না?'

ইন্দ্রাণী এ কথারও জবাব দিতে পারিল না—বহুদিনের বহু লাঞ্ছনার স্মৃতি তখন তাহার মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসিয়াছে, এ অভিযোগের সহস্র জবাব তাহার কণ্ঠে ঠেলাঠেলি করিতেছে, তবু সে একটি কথাও কহিতে পারিল না এবং সেই উত্তর দিতে না পারার বেদনাতে তাহার দুই চোখ জ্বালা করিয়া জল ভরিয়া আসিল।

রমানাথ একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'আর এ সব কাজে যখন তোমার টাকার দরকার হবে তখন আমার কাছেই ব'লো, তাতে অগৌরবের বা লজ্জার কিছু নেই।' তারপর হাতের মুঠা খুলিয়া কঙ্কণটা ইন্দ্রাণীর সামনে মেলিয়া ধরিয়া কহিল, 'তোমার অন্য গয়না না দিয়ে এটাই বা দিয়েছিলে কেন? তোমার মায়ের কত শখের জিনিস তা তো তুমি জানতে!...তুমি বোধ হয় ভেবেছিলে যে অন্য গয়নাগুলি আমাদের গয়না, আমরা হয়ত রাগ করতে পারি, না?...ছি, আমাকে এত নীচ ভাবো তুমি? গয়না যা কিছু তোমার আছে, সবই তোমার নিজস্ব। তুমি যা খুশী ক'রো।...কিন্তু এটা মায়ের নিজের গয়না ভেঙে গড়ানো বলেই—যাক্, আমি ওদের কাছ থেকে এটা কিনে এনেছি, হাতে পরো আবার—'

এবার আর ইন্দ্রাণীর অশ্রু কিছুতেই বাধা মানিল না, দীর্ঘ পল্লব ভিজাইয়া

ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। রমানাথ বোধ হয় ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না, একটু অপ্রস্তুত হইয়া একবার পিছন ফিরিয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল, 'আমি, আমি তোমাকে ঠিক তিরস্কার করতে চাই নি, অনুযোগ করতেই চেয়েছিলাম। তুমি ভুল বুঝো না।'

ইন্দ্রাণীর যেটুকু সংযম ছিল এতক্ষণ, এবার আর রাখা সম্ভব হইল না। চোখের জল যেন বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতই বাহির হইয়া আসিতে চায়। সে কোন মতে কঙ্কণ জোড়াটা রমানাথের হাত হইতে টানিয়া লইয়া ছুটিয়া গিয়া নিজের ঘরে বিছানার উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িল। এ কান্না তাহার বেদনার না অভিমানের তা সে নিজেই জানে না, শুধু দুর্নিবার এবং অবোধ সেই অশ্রু যেন কিছুতেই থামানো যায় না, অবিরল বাহির হইয়া আসিতে চায়।

রমানাথও কাঠের পুতুলের মতই নিথর ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পেয়ালার চা ঠাণ্ডা হইয়া গেল, রেকাবিতে খাবার জুড়াইয়া অখাদ্যে পরিণত হইতে চলিল কিন্তু সে সব কোন দিকেই তাহার খেয়াল ছিল না। পাশের ঘর হইতে স্ত্রীর কান্নার শব্দটা ঠিক তাহার কানে না আসিলেও কেমন করিয়া সে যেন সেটা অনুভব করিতে লাগিল—এবং জীবনে এই প্রথম, স্ত্রীর অন্তর-বেদনার সেই সজল প্রকাশ তাহার দৃষ্টিকেও ঝাপসা করিয়া তুলিল।

॥ ১৮ ॥

পরদিন যথারীতি অন্নসত্র খোলা হইয়া গেল। একটু ঘটা করিয়াই খোলা হইল, কে এক ধনী ব্যবসায়ী আসিয়া প্রথম অন্ন বিতরণ করিলেন, হিন্দু মহাসভার কোন্ নেতা আসিয়া বক্তৃতা করিলেন—ফলে নাকি ঐ মহাজনের কাছ হইতে একশ ত্রিশ মন চাল পাওয়া যাইবে, হিন্দু মহাসভাও যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

ইন্দ্রাণী আটটার মধ্যেই রমানাথের অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া গরম জলে বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল, কথা ছিল হরিদাস মনিবকে খাওয়াইয়া নিজেও খাইবে এবং ইন্দ্রাণীর জন্য ঢাকা দিয়া রাখিবে। কিন্তু ইন্দ্রাণী সেদিন দিনের বেলা আর কিছুতেই ফিরিতে পারিল না, সত্রের কাজ শেষ হইতে হইতে হাসপাতালের সময় আসিয়া পড়িল, সেখান হইতে একটা দুগ্ধ-বিতরণ কেন্দ্র খুলিবার প্রস্তাব ছিল, তাহার ব্যবস্থা করিয়া বাড়ি ফিরিল সে একেবারে সন্ধ্যার মুখে। এই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির জন্য সে লজ্জিতও হইয়াছিল, একটু শঙ্কিতও বোধ করিতেছিল মনে মনে। সে জন্য বাড়ি ঢুকিয়াই একেবারে স্নান সারিয়া সোজা রান্নাঘরে যাইতেছিল, অকস্মাৎ পিছন হইতে রমানাথের কণ্ঠস্বর কানে আসিল, 'একবার শুনে যাও—।'

কণ্ঠস্বর কোমল, এত কোমল যে বিস্ময় বোধ হয়, তবু কী একটা আশঙ্কায় ইন্দ্রাণীর বুক কাঁপিতে থাকে। রমানাথ তাহাকে ডাকিয়াই চেয়ারে আসিয়া বসিয়াছিল, ইন্দ্রাণী ঘরে ঢুকিতে সে আঙ্গুল দিয়া বিছানা দেখাইয়া দিল। কহিল,

'বোসো ওখানে।...আজ সারাদিন খাও নি, তার ওপর অসম্ভব পরিশ্রম করেছ—এখন আর রান্নাঘরে গিয়ে কাজ নেই। আমি হরিদাসকে বলেছি এ বেলা রান্না করবে।...ও-ই জলখাবার তৈরী করছে, চা আর খাবার দিয়ে যাবে এখন—।'

ইন্দ্রাণী লজ্জায়, কুণ্ঠায়, ভয়ে এবং কিছুটা আনন্দেও, মুহূর্ত-কয়েক কোন কথাই কহিতে পারিল না, তাহার পর ব্যাকুলভাবে কহিল, 'না না, ওতে আমার কিছু হবে না, একবেলা না খেলে মেয়েদের কিছু হয় না।...চাকরে জলখাবার আনবে আমি বসে থাকব—ছি, ছি—'

রমানাথ ঈষৎ দৃঢ়কণ্ঠেই জবাব দিল, 'একবেলা চাকরে জলখাবার আনলেও কিছু হয় না। একদিন সে করলই বা! বোসো।'

ইন্দ্রাণী এ কন্ঠস্বর আর অবহেলা করিতে পারিল না, কিন্তু সে বিছানাতেও বসিল না, ঘরের একমাত্র যে কোণ খালি ছিল, সেইখানে মেঝের উপরই বসিয়া পড়িল। একটুখানি পরে হরিদাস দুটি প্লেটে লুচি, আলুভাজা, হালুয়া এবং দুই কাপ চা রাখিয়া গেল। এত বিবেচনা এবং তৎপরতা হরিদাসের নিজের বুদ্ধিতে হয় নাই তাহা ইন্দ্রাণীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। নিশ্চয় এ নির্দেশ আগেই দেওয়া ছিল এবং যখন সে নীচে স্নান করিতেছে তখনই যে রমানাথ তাহাকে খাবার প্রস্তুত করিতে বলিয়াছে সে সম্বন্ধেও সন্দেহ নাই—নহিলে এত শীঘ্র গরম লুচি ও চা তৈরী হয় না...লজ্জায় কুণ্ঠায় ইন্দ্রাণীর মাথা খুঁড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল। বিশেষ করিয়া হরিদাস তাহার সামনে চা ও জলখাবার দিয়া যখন বাহির হইয়া যায় তখন মুখে তাহার যে আনন্দ ও কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা এতই অর্থপূর্ণ যে এক নিমেষে গত কয়েক মাসের দুঃখ ও লাঞ্ছনার স্মৃতিটা মনে পড়িয়া লজ্জায় ইন্দ্রাণী যেন মাটির সঙ্গে মিশাইয়া যাইতে চাহিল।

রমানাথ নিজে একখানা লুচি ছিঁড়িয়া মুখে পুরিয়া কহিল, 'খাও, খাও, খেয়ে নাও,—এখনই চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। একদিন আমার সামনে বসে একটু চা খেলে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। আমি বলছি—খাও।'

অগত্যা খাবারও মুখে দিতে হয়। কিন্তু এ কী মর্মান্তিক স্নেহের অভিনয়! ইন্দ্রাণী কিছুই বুঝিতে পারে না, শুধু চোখের দুই পাশের শিরা-দুইটা অসহ্য বেদনায় টনটন্ করিতে থাকে।

খানিক পরে চায়ের পেয়ালাটা হাতে করিয়া রমানাথ কহিল, 'তোমাদের দুধ দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল?'

ইন্দ্রাণী একটু বিস্মিত হইল। এত খবর তো রমানাথের রাখিবার কথা নয়, তবে, তবে কি সে আজকাল ইন্দ্রাণীর সংবাদও রাখিতেছে?

সে কোনমতে গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আপাতত শ'খানেক কার্ড বিলি করা হবে। কার্ড-পিছু একপোয়া—'

'এত দুধ পাবে?'

'দুধ ঠিক পাওয়া যাবে না। গুঁড়ো দুধ গরম জলে তৈরী করে তাই দেওয়া হবে।'

আবার কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপচাপ। চা খাওয়া শেষ হইয়া গেছে, প্লেট কাপগুলি বাহিরে রাখিয়া ইন্দ্রাণী পুনশ্চ নিজের জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া বসিল। এটা সে বুঝিতে পারিয়াছে যে রমানাথ আজ তাহাকে কাছেই রাখিতে চায় কোন কারণে—হয়ত কোন কথা আছে। কিন্তু মিনিটের পর মিনিটই শুধু কাটে, কথা কেহই বলিতে পারে না।

অবশেষে একসময়ে ইন্দ্রাণীই বলিয়া ফেলিল, 'কৈ সকালে তো আপনি গেলেন না?'

'না-না, ও আমার ভাল লাগে না।'

কথাটা বলিয়াই সচেতন হইয়া উঠিল রমানাথ, তাড়াতাড়ি কহিল, 'সদনুষ্ঠানটা ভাল লাগে না তা নয়, কিন্তু যাকে তোমরা এনে আজ উদ্বোধন করালে সেও যে এই মৃত্যুর জন্য দায়ী তা জানো কি? এটা তার প্রধান ব্যবসা। কোটি কোটি লোক উপবাস করছে, আর ওরা লক্ষ লক্ষ মণ চাল ধরে রেখেছে আরও চড়া দরে বেচবে বলে। তারই মধ্যে থেকে একশ' দেড়শ' মন চাল দিয়ে নাম কেনা—ওটা বড় অসহ্য বিদ্রূপ।'

ইন্দ্রাণী নতমস্তকে কহিল, 'কিন্তু তাও তো পাওয়া যেত না ওর কাছ থেকে। ধরুন, এই একশ' ত্রিশ মন চালও হয়ত ও চল্লিশ টাকা দরে বেচত। সবই যখন গেছে, যেটুকু আদায় করা যায় ক্ষতি কি? বলতো আমাদের নেই, তাই কৌশল করে ওদের কাছ থেকে উদারতা আদায় করতে হয়।'

'তা বটে কিন্তু মনটা বড় ছোট হয়ে যায়। কী দৃশ্য চোখের সামনে দেখছি প্রতিদিন তা তুমি হয়ত সব জানো না, প্রতিদিন দেখেও মনে হয় যে এ সব সত্যি নয়, স্বপ্ন দেখছি। বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। অথচ এই বীভৎস কাণ্ড ওদের মত জনকয়েক লোভী শকুনির জন্য সম্ভব হচ্ছে এটা যখন মনে পড়ে তখন আর কোন কারণেই ওদের মুখ দেখতে যে ইচ্ছা করে না!'

ইন্দ্রাণী আস্তে আস্তে জবাব দিল, 'কিন্তু এর কোন প্রতিকারই কি নেই?'

'প্রতিকার আছে বৈ কি! অন্য কোন সভ্য দেশে কি এ ব্যাপার ঘটতে পারত? কোন গবর্ণমেণ্টই এত বড় অনাচার সহ্য করত না। কিন্তু আমাদের দেশে সবই সম্ভব, তাই আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছি, আর মরছি। ভিক্ষে করে বাঁচাবে এই বিপুল দেশটাকে? তাই কখনও সম্ভব?'

ইন্দ্রাণী কহিল, 'কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে। ভিক্ষা ছাড়া আমাদের হাতে আর কি আছে বলুন?'

'চেষ্টা করতে হবে বৈ কি। যে কটা লোক বাঁচে সেই ক-টাই আমাদের লাভ। কিন্তু আমার মন এ ভণ্ডামী একেবারেই সইতে পারে না। শুধু এই জন্যই আমি গেলুম না ইন্দ্রাণী, নইলে—সহানুভূতি আমার কম নেই!'

আবার সেই ডাক, এবারে আর ঘুমের ঘোরে নয়, বিকারের প্রলাপে নয়, সোজাসুজি সহজ ডাক! ইন্দ্রাণীর সমস্ত স্নায়ু মুহূর্তের জন্য অবশ হইয়া গেল। আবার যখন চৈতন্য হইল তখন শুনিল রমানাথ বলিতেছে, 'সেইটেই তো আমার

সবচেয়ে দুঃখ ! শুধু যদি গোটাকতক লোক একটু শক্ত হ'ত, যদি কয়েকটা লোক একটু চেষ্টা করত, তাহ'লেও এই ভয়াবহ কাণ্ডটা ঘটতে পারত না। ইংরেজীতে একে কি বলে জান ? ভিসিয়াস্ সার্ক্‌ল্—এ পাপচক্রের একটি মানুষও লোভ সামলাতে পারল না !'

রমানাথ অধীরভাবে উঠিয়া পায়চারী করিতে লাগিল। কহিল, 'আজ যারা আমাদের সর্বনাশ করছে, তাদেরই কাছ থেকে দয়া ভিক্ষা করে সত্র খুলতে হচ্ছে, বাঙ্গালীর এই চরম দুর্দিনে বাঙ্গালীর কিছুই করবার উপায় নেই। নিজের ভাষাও তাদের ভুলে যেতে হচ্ছে, অন্নসত্রের নাম হ'ল লঙ্গরখানা। অথচ এখনও বোধহয় মৃত্যুর এই তাণ্ডব বন্ধ করা যায়, এখনও বোধহয় কিছু লোক বাঁচানো যায়—সে উপায় আজও আছে।'

ইন্দ্রাণীর দুই চোখে জল টল্‌টল্ করিতেছিল, সে রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'কিন্তু তা কি সম্ভব হবে ?'

'হবে না। এমন কি এ সব কথা আলোচনা করবারও ক্ষমতা নেই আমাদের, সে আমাদের অনধিকার চর্চা। আমরা শুধু মরতে পারি আর, আর পরস্পরের কাছে ভিক্ষা করতে পারি। অথচ ঐ শোন—আজই না তোমাদের লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে ? ঐ শোন, সেই একঘেয়ে কান্নার সুর, একটু ফ্যানের জন্যে, ডাঁটার ছিবড়ে কিংবা ফেলে-দেওয়া উচ্ছিষ্টের জন্যে। আমাদের দোরে, মোড়ের সাহাদের দোরে, তারপর ওপাশে পুঁটুদের বাড়ি—সব দোরেই একজন না একজন আছে।··· চাঁদা তুলে খিচুড়ি খাইয়ে কটা লোক বাঁচাবে ইন্দ্রাণী,···ওদের কথাও আর বোঝা যায় না। শুধু নাকে কাঁদছে, কান্নাও যাচ্ছে গলায় জড়িয়ে, এমনই দুর্বল ওরা—শুধু সকলের কান্না এক হয়ে মিলে ওপরে ভেসে আসছে। একটা একঘেয়ে সুর, যেন সমস্ত বাংলা দেশের আত্মা কাঁদছে এক মুঠো ভাতের জন্যে, যে ভাত সে চিরকাল সবাইকে বিলিয়েছে।'

রমানাথ নিজের উত্তেজনার ঝোঁকে আপন মনেই বকিয়া যাইতেছিল। সহসা ইন্দ্রাণীর দিকে চোখ পড়িয়া অপ্রতিভ ভাবে থামিয়া গেল। তাহার দুই চক্ষু বিস্ফারিত, স্থির-দৃষ্টি মেলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া আছে, আর সেই আয়ত দুটি চক্ষুর কোণ বাহিয়া কপোল প্লাবিয়া ধারায় ধারায় জল ঝরিয়া পড়িতেছে তাহার বুকের কাপড়ের উপর। ইন্দ্রাণী রূপসী—এই কথাটাই রমানাথ জানিত। আজ এই করুণার জ্যোতিতে তাহাকে এমনই মহিমময়ী দেখাইল যে রমানাথের অন্তর শ্রদ্ধায় অবনত না হইয়া পারিল না।

সে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, 'তুমি বোধ হয় ভাবছ যে যারা কিছু করে না, তারাই এমনি করে করে বক্তৃতা করে। সত্যিই আজকাল যেন কেমন অপদার্থ হয়ে গেছি। আগে আমিও ঢের করেছি, বরং আমিই করেছি বলা চলে, আমি আর—আর আমার এক বন্ধু। কিন্তু আমার সমস্ত মানসিক গঠনের মূল পর্যন্ত এমন ভাবে নাড়া খেয়েছে যে আর কোন কাজেই উৎসাহ করে লাগতে পারি না।···বোধহয় সেই জন্যই বক্তৃতা করার

ঝোঁকটা একটু বেশী।'

বলিয়া রমানাথ একটু ম্লান হাসিল। কিন্তু ততক্ষণে অপরাধিনীর মাথা হেঁট হইয়া গিয়াছে। কথা কয়টা ইন্দ্রাণীকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই বলিতে গিয়াছিল কিন্তু অসতর্ক অবস্থায় যে পুরাতন ক্ষতে হাত পড়িবে তাহা ভাবে নাই। এখন সে আরও অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরাইয়া লইল। বলিল, 'কালও কি সকালবেলা যেতে হবে ?'

জবাব দিতে ইন্দ্রাণীর কয়েক-মুহূর্ত সময় লাগিল, কিন্তু কথা যখন কহিল তখন কণ্ঠস্বরে কোন আবেগ প্রকাশ পাইল না, এমন কি জড়তাও না। বলিল, 'না, দশটার পর যাবো।'

রমানাথ কহিল, 'তোমাদের ক্যান্টিনের কি হবে ?'

ইন্দ্রাণী মেঝেটা খুঁটিতে খুঁটিতে জবাব দিল, 'সে অন্য লোক আছে। তা ছাড়া দশটার আগে তো আর কাউকে দেওয়া হবে না—'

রমানাথ কথাটা বুঝিল। কহিল, 'কিন্তু একজনের খাবার সুবিধের জন্য এতগুলো ক্ষুধার্তের কাজে অবহেলা করা কি ঠিক ? হরিদাস তো চালিয়েছিল অতদিন, না হয় আরও দু'চারদিন চালাত।'

ইন্দ্রাণী জবাব দিল, 'আমারও তো খাওয়া-দাওয়া আছে।'

রমানাথ আজ ইন্দ্রাণীর সম্বন্ধে বহু তথ্যই সংগ্রহ করিয়াছে। সেই কথাটাই হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িল, 'তবে যে কাকাবাবু বলছিলেন তাঁর বাসাতেই তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন—'

ইন্দ্রাণী একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'সে আমার সুবিধা হবে না। তা ছাড়া আমারও পরিশ্রমের তো সীমা আছে—দশটার আগে আমি যেতে পারব না।···আমি যাই, বোধ হরিদাসের রান্না হয়ে এল।'

সে বাহির হইয়া গেল। একটা প্রশ্ন রমানাথের ঠোঁট পর্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছিল, 'তুমি কি দশটা পর্যন্ত থাকতে চাইছ বিশ্রাম করবার জন্য, না আরও বেশী পরিশ্রম করার জন্যে ?" কিন্তু সেটা সে শেষ পর্যন্ত চাপিয়াই গেল। ইন্দ্রাণী চলিয়া যাইবার পর শূন্য ঘরে মিনিট-কয়েক বসিয়া থাকিবার পর বরং এই কথাটাই তাহার বার বার মনে হইতে লাগিল যে, সহসা ইন্দ্রাণীকে কাছে ডাকিয়া এতটা অন্তরঙ্গ হইবার কি প্রয়োজন ছিল ? এ প্রশ্নের যে সহজ জবাব সেটা সে কিন্তু সাহস করিয়া মনের কাছেও আনিতে পারিল না।

ইন্দ্রাণীদের দেখাদেখি শহরে আরও কয়েকটা অন্নসত্র খোলা হইল—কিন্তু তাহাতে ফল খারাপই দাঁড়াইল। খাদ্যের সন্ধান পাইয়া দূরদূরান্তর হইতে যে সব ক্ষুধার্তের দল ছুটিয়া আসিতে লাগিল তাহাদের সকলকে এক চামচ করিয়াও খাদ্য দেয় ঐ কয়টি সত্রের এমন ক্ষমতা ছিল না। ফলে রাস্তায় মৃতদেহ এবং মুমূর্ষুর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, ক্ষুধার্তদের অবিরাম আর্তনাদে গৃহস্থদের দিনরাত্রি বিষাক্ত হইয়া গেল। রমানাথ কোনমতে একবার কলেজে যায় এবং প্রায় ছুটিয়া আসিয়া ঘরের

মধ্যে ঢোকে। প্রতিদিন এক-এক রকমের বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়ে। রাস্তার ধারে যে সব মৃতদেহ পড়িয়া থাকে তাহাদের পেট বলিয়া কোন পদার্থ কোনকালে ছিল বিশ্বাস করা যায় না—পেটের সূক্ষ্মতম চামড়াখানি পিঠের আরও পাতলা চামড়ার সঙ্গে গিয়া মিশিয়াছে, মধ্যে আর যেন কিছুই নাই। আর সব চেয়ে অদৃষ্টের নিদারুণ বিদ্রূপ এই যে বহুদিন উপবাসের ফলে এই সব কঙ্কালগুলি যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, সেই মুহূর্তে হয়ত কেহ তাহাদের মুখের কাছে খাদ্য আনিয়া হাজির করে। সে যন্ত্রণা অবর্ণনীয়। রমানাথ এক দিন বাড়ি ফিরিবার পথে দেখিল এমনি একটি মুমূর্ষুর একেবারে মাথার কাছে একটি ছাতুর ডেলা কে বসাইয়াই দিয়াছে—তখন তাহার শ্বাস উঠিয়াছে, তবু সেই চরম মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যেও, সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে ছাতুটাকে মুখে পুরিবার, জিভ পর্যন্ত নাড়িবার ক্ষমতা নাই বলিয়া শুধু চোখ দুইটাই ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, খাদ্য মুখে পেঁছাইতেছে না। সে যন্ত্রনা মৃত্যু-যন্ত্রণার চেয়ে বোধ বোধ হয় অনেক বেশী।

প্রতিদিনই এমনি একটি না একটি দৃশ্য চোখে পড়ে রমানাথের—নিজের ও জাতির অক্ষমতায় নিজেরই মাথা কুটিতে ইচ্ছা হয়, অথচ প্রতিকারের কোন উপায়ই খুঁজিয়া পায় না। যাহারা কাজ করিতেছে তাহাদের মধ্যেও গিয়া কোন মতে দাঁড়াইতে পারে না। কেমন যেন একটা মানসিক জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কোথায় যেন একটা সঙ্কোচ বাধে।

শেষে একদিন ইন্দ্রাণীর কাছেই কথাটা বলিয়া ফেলিল, 'আমি মনে করছি দিনকতক ছুটি নেব কলেজ থেকে—'

ইন্দ্রাণী তখন চা দিতে আসিয়াছিল, সহসা তাহার হাত কাঁপিয়া গেল। ঈষৎ ভীত, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'কেন, শরীর কি আবার খারাপ মনে হচ্ছে ?'—

রমানাথ জবাব দিল 'না না, শরীর নয়। রাস্তার যা অবস্থা আর আমি দেখতে পাচ্ছি না—এইবার বোধ হয় পাগল হয়ে যাবো—'

ইন্দ্রাণী অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইয়া চোখ নামাইল, কিন্তু কথাটার কোন উত্তর দিল না। ইহারই দিন-দুই পরে রমানাথ লক্ষ্য করিল কতকগুলি ইস্কুলের ছেলে একটি স্ট্রেচার সংগ্রহ করিয়া রাস্তার ধার হইতে এইসব মুমূর্ষুদের সরাইতেছে। কলেজে পেঁাছিয়া খুশী হইয়া ভূপেনবাবুকে বলিল, 'ছেলেদের এ সুবুদ্ধি কে দিলে মশাই ? আর এদের হচ্ছেই বা কি ?'

ভূপেনবাবু একটু বিস্মিত হইয়াই তাকালেন, 'এ সুবুদ্ধি কে দিলে সত্যি সত্যিই কি জানেন না? আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর কি কথা বন্ধ নাকি রমানাথবাবু ?'

কথাটা আজও চাবুকের মতই রমানাথকে আঘাত করিল, কিন্তু আজ আর সে মাথা হেঁট করিল না, বরং পরিহাস করিয়া ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া লইল, 'কথা কইবার মত ফুরসুৎ কোথায় দিচ্ছেন বলুন—দিনরাতই তো তাঁকে আপনাদের কাছে আটকে রেখেছেন !'

'তা বটে!' তৎক্ষণাৎ ভূপেনবাবু সায় দিলেন, ওঁকে না পেলে আমাদের কি হ'ত তাই ভাবি। এ প্ল্যানও ওঁর। ওঁরই প্রস্তাবে আমরা ভলাণ্টিয়ার ঠিক করেছি; ওরা তুলে নিয়ে আমাদের সেবাশ্রমে বা সরকারী হাসপাতালে বা এ-আর-পি সেণ্টারে পেঁাছে দেয়। আমাদের কাছে যারা আসে, আমরা তো ভেতরে রাখতে পারি না, বাইরে একটা চালা করেছি, সেইখানে ওষুধ আর দুধ দিয়ে বাঁচাই, তারপরে দু-একদিন রেখে একটু সুস্থ করে ছেড়ে দিই—মরেই যায় অধিকাংশ—যে কটা বাঁচে আবার দুঃখভোগ করে। ওদের কোন চিরস্থায়ী সুবিধে তো করতে পারি না, শুধু শুধু টানা-হেঁচড়া করা আর কি। যাক্—আমাদের কর্তব্য তো আমরা করি—ফল যা হয় হোক!···মোদ্দা এ ক্রেডিটও আপনার শ্রীমতীর, এমন কি ওখানের ফার্স্ট এড-ও উনি নিজেই দিচ্ছেন।'

ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রাণী!

চিরকাল এই একই স্তুতি সকলের মুখে, প্রশংসার সেই একই দীপ্তি! অথচ এ দুর্লভ নারীরত্নে যাহার সর্বাধিক অধিকার সে-ই আজ সকলের অধিক বঞ্চিত! গৌরব যাহার সব চেয়ে বেশী—সে-ই বেশী লজ্জিত! যন্ত্রণায় রমানাথের বুকের ভিতরটা টন্ টন্ করিয়া ওঠে। আগের সে জ্বালাটা আর নাই বটে কিন্তু বোধ করি সেই জন্যই বেদনাটা এত মর্মান্তিক।

চোখের সামনে বই-এর পাতা ঝাপসা হইয়া আসে। এ বাষ্প দুঃখের নয়, অভিমানের। এবং সে অভিমান নিজের অদৃষ্টের উপর।

বড়দিনের ছুটিতেও বাড়ি যাওয়া হয় নাই, গরমের ছুটিতেও না। মা ও বাবা চিঠি লিখিয়া হার মানিয়াছেন, অভিমান, ক্ষোভ, রাগ—সব শেষ হইয়াছে কিন্তু তবু যাওয়া হয় নাই। প্রথমটায় যাওয়া হয় নাই, রমানাথের ইচ্ছা ছিল না বলিয়া, পরে যাওয়া হয় নাই ইন্দ্রাণীর যাওয়া সম্ভব নয় বলিয়া। ইন্দ্রাণীকে অক্ষয়বাবু কয়েক দিন নিজের বাড়িতে রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রমানাথ তাহাতে রাজী হয় নাই। আপত্তিটা তাহার ঠিক কোথায় তাহা সে নিজেই ভাল করিয়া জানিত না। ইন্দ্রাণী সঙ্কোচ বোধ করিবে, তাছাড়া মা-বাবার কাছেও জবাবদিহি করা কঠিন হইবে—তবু সেইটাই হয়ত সব নয়।···সে নিজে বিস্তারিত চিঠি লিখিল, অক্ষয়বাবুও বধূমাতার কার্যের ও দায়িত্বের সম্যক বিবরণ দিয়া কেদারবাবুকে চিঠি দিলেন। তাহার ফলে কেদারবাবু ও সারদা দুজনেই আশীর্বাদ জানাইয়া লিখিলেন যে, যে কাজ তাহারা করিতেছে তাহাতে বংশেরই মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে—সুতরাং পুত্র পুত্রবধূকে না দেখিতে পাইবার ক্ষোভ আর তাঁহাদের নাই।

তবু এ চিঠি যে কর্তব্য-পালন তাহা রমানাথ জানিত, তাঁহাদের অন্তরের কথাটি তাহার কাছে চাপা ছিল না। কিন্তু উপায় কি? অন্তত দুই-একদিন ঘুরিয়া আসিবার মত অবসরও সে কোন মতে খুঁজিয়া পাইল না। এমনই নিশ্চিদ্র ইন্দ্রাণীর কার্যতালিকা যে তাহার মধ্য হইতে একটি দিনও বাহির করা যায় না, তাহা হইলে বহু দুর্গতকে বঞ্চিত করা হয়। অগত্যা মায়ের ম্লান মুখ বার বার মনে

পড়া সত্ত্বেও, তাহাকে বাধ্য হইয়া অপেক্ষা করিতে হয়।

অথচ, এধারে যে ইন্দ্রাণীর শক্তি ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে তাহাও রমানাথ লক্ষ্য করে এবং শঙ্কিত হয়। কাজ সে একটিও বাদ দেয় না বটে কিন্তু চোখে মুখে তাহার সুগভীর ক্লান্তি ফুটিয়া ওঠে আজকাল। তাহার শুষ্ক মুখ আর অপরিসীম বিবর্ণতা, একবার মাত্র তাহার দিকে চাহিলেই চোখে পড়ে। তাহার এই অমানুষিক পরিশ্রমের প্রতিক্রিয়া যে খুব সামান্য হইবে না তাহার রমানাথ জানিত কিন্তু কোন উপায়ই খুঁজিয়া পায় নাই সে। বিশ্রাম তো ইন্দ্রাণী করিবেই না, কোন পুষ্টিকর খাদ্যও তাহাকে গ্রহণ করানো যাইবে না—কারণ তাহা হইলে রমানাথকে নিজে অনুরোধ করিতে হয়, পীড়াপীড়িও করিতে হয়। কথাটা মনে করিতেই তাহার মুখ লাল হইয়া ওঠে, সে সম্পর্ক তাহাদের নয়, আজ আর বোধ হয় নূতন করিয়া স্থাপন করাও সম্ভব নয়। খুব সম্ভব সে ভাষাই মুখ দিয়া বাহির হইবে না।

না—সে অসম্ভব!...

একদিন ছিল, যে দিন রমানাথ মনের অবচেতন অবস্থায় ইন্দ্রাণীর মৃত্যুই কামনা করিত বোধ হয় কিন্তু আজ সে তাহারই স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে—অথচ এই পরিবর্তনের মধ্যে অদৃষ্টের যে নিষ্ঠুর পরিহাস রহিয়াছে সেটাও তাহার আর চোখে পড়ে না।...সে দুই তিন দিন অক্ষয়বাবুকে কথাটা বলিতে গিয়াছিল কিন্তু নিদারুণ লজ্জায় শেষ পর্যন্ত তাহা আটকাইয়া গিয়াছে, বলা হয় নাই।

অবশেষে একদিন অক্ষয়বাবুই কথাটা পাড়িলেন। আদালতের কাজকর্ম আজকাল কম, তিনি সোজা কলেজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, 'বাবাজী করছ কি? মেয়েটা যে মরে যাবে!'

রমানাথ ঈষৎ তীক্ষ্নকণ্ঠে কহিল, 'তবু ভাল যে আপনারা সেটা এতদিন লক্ষ্য করেছেন।...আমি তো অনেকদিন ধরেই আপনাদের জানাচ্ছি কিন্তু আপনারাই ছুটি দিতে চান নি ওকে।'

অক্ষয়বাবু অভিযোগটা মানিয়া লইয়া জবাব দিলেন, 'আমাদের যে স্বার্থ বাবা, আমরা তো ছুটি দিতে চাইব না। মা-লক্ষ্মীও আমার এমন যে তিনি নিজে মরবেন সে ভাল তবু ঐ হতভাগাগুলোকে ছেড়ে যেতে চাইবেন না। এ ক্ষেত্রে তোমাকেই শক্ত হতে হবে বাবা, তোমাকে জোর করে নিয়ে যেতে হবে।'

রমানাথ একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'কিন্তু তখন আবার আপনারাই হয়ত আমাকে দুষবেন!'

লোক-নিন্দা কর্তব্যের চেয়ে বড় নয় বাবাজী, তা ছাড়া যাদের চোখ আছে তারা দুষবে না, যাদের নেই তাদের কথা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। অন্তত দিন-দশেকের জন্যও ওঁকে কোথাও নিয়ে যাও—'

রমানাথ ভিতরে ভিতরে অধীর হইয়াই ছিল, অক্ষয়বাবু চলিয়া যাইবার পর আর একটুও ইতস্তত না করিয়া তখনই দশদিনের ছুটির দরখাস্ত করিয়া দিল। তারপর অনেক দিন পরে অপেক্ষাকৃত শান্তচিত্তে বাড়ি ফিরিল।

রমানাথ যখন বাড়ি ফিরিল তখনও ইন্দ্রাণী আসে নাই, আজকাল অবশ্য সে কোনদিনই এমন সময়ে ফিরিতে পারে না। এই গরমের দিনেও তাহার পেঁৗছিতে পেঁৗছিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়, সুতরাং রমানাথ স্নান করিয়া অন্য দিনের অভ্যাসমত নিশ্চিন্তভাবেই একটা বই টানিয়া লইয়া বসিল, এমন কি হরিদাস যখন চা জলখাবার দিয়া গেল তখনও সে মুখ তুলিয়া চাহিল না, বইয়ের পাতার দিকে চোখ রাখিয়াই খাবারের থালায় হাত বাড়াইল।

সহসা তাহার চমক ভাঙ্গিল হরিদাসেরই কণ্ঠস্বরে, 'বাবু, আমি একটু সেবাশ্রম পর্যন্ত এগিয়ে যাচ্ছি—'

নিজের অজ্ঞাতসারেই রমানাথের হাত কাঁপিয়া গেল, সেই কণ্ঠস্বর সংযত করিবার চেষ্টা-মাত্র না করিয়া প্রশ্ন করিল, 'কেন রে? কী হয়েছে? সে বলে গেছে?'

'না বাবু, বলে তিনি যান নি। কিন্তু তেনার শরীর বড্ড খারাপ ছিল। খেতে বসে দু-গাল মুখে দিয়েই বমি করেছেন সমস্ত। তারপর একটুও তো জিরোবার সময় পান নি, গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল, তখনই গিয়ে গাড়িতে চাপতে হয়েছে। যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছেন তখনও তেনার পা থর-থর করে কাঁপছে।··· আমি খুব রাগারাগি করতে বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, আজ আমি সকাল করে ফিরে আসব এখন। নিশ্চয়ই আসব।···কিন্তু এখনও তো এলেন না—তাই ভাবছি।'

খাবারের গ্রাস নামাইয়া রাখিয়া রমানাথ একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, 'তুই থাক্—আমিই যাচ্ছি।'

কিন্তু জামাটার জন্য হাত বাড়াইয়া আবার কী মনে করিয়া হাত নামাইয়া লইল। কহিল, 'না তুই-ই যা। বরং আমার নাম করিস, বাবু বড্ড ভাবছেন··· আচ্ছা কিছু বলতে হবে না—তুই যা।···মোড় থেকে একটা গাড়ি ধরে নিয়ে যাস না হয়, হেঁটে যেতে দেরি হবে—এই নে টাকা—'

হরিদাস টাকাটা লইয়া নীচে নামিয়া গেল কিন্তু রমানাথও আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না, সে ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল। হরিদাস তখনও বাড়িতে ছিল, তাহার নিজের ঘরে ঢুকিয়া বোধহয় জামা গায়ে দিতেছিল কিন্তু সেই কয় মুহূর্তই যেন রমানাথের কাছে কয় যুগ মনে হইল। ইন্দ্রাণীর জন্য সে যে এতদূরে উৎকণ্ঠা ভোগ করিতে পারে এটা বোধহয় কিছুদিন পূর্বেও ছিল তাহার স্বপ্নের অগোচর—কিন্তু তবু আজ সে বিস্মিত হইবারও অবকাশ পাইল না, ভাল করিয়া ভাবিবারও না। সমস্ত দ্বন্দ্ব, সমস্ত সংশয় ভুলিয়া, এতদিন ধরিয়া যে তথ্যটা ধীরে ধীরে তাহার মনের অগোচর সত্য হইয়া উঠিয়াছে অন্তরের অন্তস্তলে—আজ এই মুহূর্তে সে সেই পরম সত্যকেই মানিয়া লইল—নিজের উৎকণ্ঠা ঢাকিবার এতটুকু চেষ্টা করিল না।

সে সিঁড়ির মুখে আসিয়া ডাকিল, 'হরিদাস বড্ড দেরি হচ্ছে!'

তাহাদের প্রথম দাম্পত্য জীবনের কথাটা স্মরণ করিয়া হরিদাসের মুখে এত

উদ্বেগের মধ্যেও একটা কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল—সে কোন মতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া উত্তর দিল, 'এই যে বেরিয়েছি বাবু !'

কিন্তু সে সদরে পা দিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল, 'গাড়ি আসছে বাবু, আমাকে আর যেতে হ'ল না।'

রমানাথের তবু যেন বিশ্বাস হইল না। কহিল, 'সেই গাড়িই তো রে ?'

হরিদাস জবাব দিল, 'এই তো পেঁছে গেছে—'

সত্য সত্যই একটা গাড়ি আসিয়া তাদের বাড়ির সামনে থামিল এবং একটু পরে স্বয়ং ইন্দ্রাণীই গাড়ি হইতে নামিয়া খুব আস্তে আস্তে পাশের দেওয়ালটা ধরিয়া ধরিয়া সিঁড়ির মুখটায় আসিয়া দাঁড়াইল। পশ্চিম দিগন্ত হইতে তখনও আলো একেবারে বিদায় লয় নাই বটে কিন্তু নীচের তলায় পেঁছিয়া তাহা অনেকখানি ছায়া-মলিন হইয়া পড়িয়াছিল, তবু সেই ম্লান আলোতেই ইন্দ্রাণীর মুখের অপরিসীম বিবর্ণতা ও শুষ্কতা রমানাথের চোখ এড়াইল না। সে লাফাইয়া দুই তিনটা ধাপ নামিয়া আসিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'তোমার, তোমার কি অসুখ করেছে রাণী ?'

দুটি অক্ষরের ছোট্ট একটি ডাক—কিন্তু ইন্দ্রাণীর মনে হইল তীব্র বিদ্যুতের মতই অক্ষর দুইটি তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত মর্মমূলকে পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়া গেল। সে একবার মাত্র বিস্ফারিত অবিশ্বাসভরা চোখে স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিয়া সেই সিঁড়ির উপরই অজ্ঞান হইয়া পড়িল গেল।

॥ ১৯ ॥

বাধার পর্বত জমে বহুদিন ধরিয়া, মুঠিমুঠি ধুলা আবর্জনা স্তূপে পরিণত হয় কিন্তু প্লাবন যখন আসে তখন তাহা নিঃশেষে দূর করিতে, নিশ্চিহ্ন করিতে এক মুহূর্তের বেশী সময় লাগে না। যুগান্তর ঘটে এক লহমায়। রমানাথেরও এতদিনের সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত সংশয় এমনি কোন্ প্রাণ-প্রবাহিণী বন্যায় ধুইয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল। হরিদাসই কাছে ছিল, তবু সে পেঁছিবার পূর্বেই রমানাথ আসিয়া ইন্দ্রাণীকে কোলে তুলিয়া লইল। মৃত্যু নয়—দুর্বলতায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, এটা সে গায়ে হাত দিয়াই বুঝিতে পারিল। নিঃশ্বাস পড়িতেছে, নাড়ী দুর্বল হইলেও নিয়মিত, সুতরাং খুব ভয়ের কারণ নাই বুঝিয়া রমানাথের কর্তব্যবুদ্ধি ফিরিয়া আসিল, সে হরিদাসকে কহিল, 'তুই ছুটে যা, মোড়ের ওই ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়, আমিই ওকে ওপরে নিয়ে যাচ্ছি।'

তাহার পর পরম স্নেহে ও একান্ত যত্নে স্ত্রীর মূর্ছিত দেহখানি বুকের মধ্যে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি কয়টা উঠিয়া আসিল। ইন্দ্রাণীর দেহ খুব হালকা নয় কিন্তু সে মুহূর্তে রমানাথের যেন নিজের দেহে কোন সাড় ছিল না—শুধু মনের মধ্যে এই কথাটাই বড় ছিল যে তাহাকে দোতলায় লইয়া যাইতে হইবে এবং এ কাজে চাকরের সাহায্য সে লইবে না।...উপরে আসিয়া ইন্দ্রাণীকে সে ও-ঘরে

লইয়া গেল না, নিজেরই বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া তাহার মাথায়, মুখে জলের ছিটা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

ইহার আগের মূর্ছা সম্বন্ধে রমানাথের যে অভিজ্ঞতা ছিল তাহাতে সে এই পরিচর্যাটুকুই যথেষ্ট মনে করিল। ডাক্তার আসিবার পূর্বেই ইন্দ্রাণীর জ্ঞান হইবে—এই ছিল তাহার বিশ্বাস। কিন্তু পনেরো-কুড়ি মিনিট কাটিয়া গেল, জোরে জোরে বাতাস করিয়া রমানাথের হাত অবশ হইয়া আসিল তবু ইন্দ্রাণীর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল না। রমানাথ ব্যাকুলভাবে বার বার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিতে লাগিল, তখনও ডাক্তারের দেখা নাই, বোধ হয় কোথাও তিনি বাহির হইয়াছেন, হরিদাস তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

সহসা এক সময়ে রমানাথের মনে একটা সংশয় দেখা দিয়া কিছুক্ষণের জন্য তাহাকেও যেন অনড় অবশ করিয়া দিয়া গেল—ইন্দ্রাণী যদি না বাঁচে? আর যদি জ্ঞান না হয়?…ভগবান কি এত রকমেই তাহাকে বঞ্চিত করিবেন? এতদিন পরে যদি বা সে স্ত্রীকে মনের মধ্যে পাইল, তৎক্ষণাৎ কি তিনি কাড়িয়া লইবেন।…সে পাগলের মত ইন্দ্রাণীর কাঁধটা ধরিয়া নাড়া দিতে দিতে আকুল-ভাবে ডাকিতে লাগিল, রাণী, রাণী, ইন্দ্রাণী,…আমার দুটো কথা শোনো, আমার যে পরিচয় তুমি পেলে এতদিন সেইটাই আমার সত্য পরিচয় নয়—এইটে শুধু আজ বিশ্বাস করে যাও—।'

হরিদাস পিছন হইতে ডাকিল, 'বাবু—'

কখন ডাক্তারবাবু সুদ্ধ ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন রমানাথ টের পায় নাই। সে অপ্রস্তুতভাবে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া পড়িল। বয়স্ক ডাক্তারবাবু স্নিগ্ধভাবে হাসিয়া বলিলেন, 'আপনি শিক্ষিত লোক, অত অধীর কেন, ছি!… দুর্বল দেহ, এখনও অজ্ঞান হয়ে আছেন, আপনার ঐ ঝাঁকুনিতে যে আরও অনিষ্ট হচ্ছিল।'

কিন্তু রোগিনীকে পরীক্ষা করিতে করিতে ডাক্তারবাবুর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। একটা ব্যাগ তিনি সঙ্গেই আনিয়াছিলেন। তখনই একটা ইঞ্জেকসান দিলেন এবং এক টুকরা কাগজে কী একটা ওষুধের নাম লিখিয়া হরিদাসকে ডাক্তারখানায় পাঠাইয়া দিলেন। তারপর একহাতে নাড়ী টিপিয়া অপর হাতে ঘড়ি খুলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

মিনিট-পাঁচেক পরে আর একটা ইঞ্জেকসানের ব্যবস্থা করিতে করিতে কহিলেন, 'এতদিন কী কিছুই দেখেন নি আপনি! অতিরিক্ত পরিশ্রম করেছেন, অথচ পুষ্টিকর খাদ্য এবং বিশ্রাম কিছুই পান নি—ফলে দেহে আর কিছুই নেই। এঁর কথা তো আমি সবই শুনেছি, আপনার সৌভাগ্য যে এমন স্ত্রী পেয়েছেন— হেলায় হারাবেন না এমন করে।'

রমানাথ শিয়রে বসিয়া নত মুখে বাতাস করিতেছিল, তেমনিই বসিয়া রহিল—চিরকাল সেই একই কথা, কিন্তু আজ বুঝি তাহারও অন্তরের কথা এটি, আজ আর তাই একথায় কোন জ্বালা নাই।

পর পর তিনটি ইঞ্জেকসান করা সত্ত্বেও যখন ইন্দ্রাণীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল না, তখন রমানাথ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, কম্পিত ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, 'কী হবে ডাক্তারবাবু? জ্ঞান কী আর হবে না?'

ডাক্তারবাবু একটু হাসিয়া জবাব দিলেন, 'জ্ঞান হওয়াটা বড় কথা নয় রমানাথ-বাবু, নাড়ীর অবস্থা ছিল বিষম খারাপ। এখন নাড়ী অনেক ভাল—আশা করছি ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই জ্ঞান হবে। আমি এখন একটু বাড়ি যাচ্ছি, খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার আসব।...হরিদাসের হাতে একটা ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি—তাই এক ড্রাম আন্দাজ আউন্স-দুই গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে জ্ঞান হওয়া মাত্র খাইয়ে দেবেন, বরং যদি ফ্লাস্ক থাকে তো দুধ গরম করিয়ে রেখে দিন—'

তিনি হরিদাসকে লইয়া চলিয়া গেলেন কিন্তু রমানাথের যেন এ প্রতীক্ষা অসহ্য বোধহয়, ঘড়ির কাঁটা চলে মন্থর গতিতে, এক একটি মুহূর্ত মনে হয় এক যুগ। ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জ্ঞান হইবে কিন্তু আধঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর তাহার মনে হইল যে সে বোধহয় এইবার পাগল হইয়া যাইবে—

তাহাকে বাঁচাইলেন ডাক্তারবাবুই। তিনি ঠিক একঘণ্টার মাথায় যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন রমানাথ উন্মাদের মত পায়চারি করিতেছে। ডাক্তারবাবুকে দেখিয়াই সে বলিয়া উঠিল, 'একঘণ্টা যে হয়ে গেল ডাক্তারবাবু!'

ডাক্তার আর একবার নাড়ী দেখিয়া কহিলেন, 'খুব শীগগির জ্ঞান হবে—মোদ্দা কোন চেঁচামেচি গোলমাল করবেন না, কোন রকম শক্ না পান—'

আরও মিনিট-পাঁচেক দুজনে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এক একটি মিনিট যেন এক এক ঘণ্টা। অবশেষে এক সময়ে সত্যই ইন্দ্রাণী চোখ মেলিল। কিন্তু সে দৃষ্টিতে যে তখনও পূর্ণ চৈতন্য ফিরিয়া আসে নাই তাহা সেদিকে একবার মাত্র চাহিলেই বোঝা যায়। ঘোলাটে আচ্ছন্ন চাহনি—মুহূর্ত-কয়েক বিহ্বলভাবে শূন্যপানে চাহিয়া থাকিয়া ক্লান্ত চোখ আবার বুজিয়া গেল। —রমানাথ কি প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, ডাক্তারবাবু ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন—আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা দরকার।

এইবার ইন্দ্রাণী চাহিয়া দেখিল মিনিট খানেক পরেই। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার আচ্ছন্নভাব কাটিয়া গিয়াছে, এবার বেশ স্বচ্ছ দৃষ্টি। একবার যেন একটু বিস্মিতভাবে ডাক্তারবাবুর দিকে তাকাইয়া চারিদিকে চাহিতেই ঘরের পরিচিত আসবাবপত্রগুলির স্মৃতিতে আঘাত করিল। এ ঘর এবং এ শয্যা তাহার বিশেষ পরিচিত—এ যে তার স্বামীর!—সে, সে এখানে কেন?

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতে গেল কিন্তু দুর্বল দেহ সামান্যমাত্র চেষ্টা করিয়াই আবার এলাইয়া পড়িল। ডাক্তারবাবু ইঙ্গিতে দুধটা ঠিক করিতে বলিয়া ইন্দ্রাণীকে কহিলেন, 'উঠবেন না বৌমা, এখন একটুও নড়বেন না। আপনি এখনও সুস্থ হন নি, খুব দুর্বল।'

ইন্দ্রাণী ঐ সামান্য পরিশ্রমেই হাঁপাইতেছিল, সে ক্ষীণ কণ্ঠে কি বলিতে গেল,

'আমি—আমি এখানে—মানে—উনি—'

রমানাথ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, মাথা নীচু করিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল, 'এই যে আমি ইন্দ্রাণী, তোমার কাছেই বসে আছি। এখন ব্যস্ত হয়ো না লক্ষ্মীটি, একটুখানি চুপ করে শুয়ো থাকো—'

এ যেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার! ইন্দ্রাণীর দুর্বল মস্তিষ্ক ধারণাও করিতে পারে না। স্বামীর কণ্ঠস্বর সে স্বপ্ন দেখিতেও সাহস করে নাই কোন দিন। এখনও সে স্বপ্নই দেখিতেছে, না কোন মন্ত্রবলে তাহার জীবনে অসম্ভব সম্ভব হইয়া গেল ভাবিতে গিয়া তাহার চিন্তাশক্তি যেন আবার আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। সে-চেষ্টা সে ছাড়িয়া দিয়া অবসন্নভাবে চোখ বুজিল…

দুধ ও ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ডাক্তারবাবু ডাকিলেন, 'বৌমা এই ওষুধটুকু খেতে হবে যে!'

ইন্দ্রাণী বুঝিলও না কী তাহার ঔষধ, কেন সে এখানে আছে, ঔষধই বা কেন প্রয়োজন—এ সব কথা ভাবিবার মত শক্তি সে তখনও ফিরিয়া পায় নাই। সে শুধু নীরবে চোখ বুজিয়াই আদেশ পালন করিল।

রমানাথ তখনও তেমনি হেঁট হইয়া ইন্দ্রাণীর পুনরায় চোখ চাহিবার অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু ইন্দ্রাণী বহুক্ষণ সেইভাবে স্থির হইয়া পড়িয়া থাকিবার পর এক সময়ে রমানাথ তাহার নিজের ভুল বুঝিতে পারিল, নিশ্বাস তাহার নিয়মিত হইয়া আসিয়াছে, শান্ত ইন্দ্রাণী ঔষধ ও পথ্যের উত্তেজনায় আরাম বোধ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

ডাক্তারবাবু উঠিয়া ইঙ্গিতে রমানাথকে বাহিরে লইয়া গিয়া বলিলেন, 'আর ভয় নেই, এই ঘুম যখন ভাঙবে তখন বেশ সুস্থ বোধ করবেন। তবে একজনের জেগে থাকা দরকার—হঠাৎ যদি কোন কষ্ট হয় তো চেঁচিয়ে কাউকে ডাকতে পারবেন না—অত্যন্ত দুর্বল তো!…খাওয়া? না, আজ রাত্রে আর কিছুই দেবার দরকার নাই। একটু দুধবার্লি তৈরি রাখতে পারেন, যদি উনি খিদে বোধ করেন তো দেবেন।…নমস্কার!'

রমানাথ হরিদাসকে আহার সারিয়া লইতে বলিল কিন্তু নিজে একটু কিছুই মুখে দিতে রাজী হইল না। দুধবার্লি ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইয়াছিল, সেটা ফ্লাস্কে রাখিবার নির্দেশ দিয়া হরিদাসকে পাশের ঘরেই ঘুমাইতে বলিয়া সে আবার আসিয়া ইন্দ্রাণীর শয্যাপার্শ্বে বসিল।

সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, প্রহর—রমানাথের কাটিতে লাগিল গুনিয়া গুনিয়া, মনে হইতে লাগিল আজিকার এ অতন্দ্র প্রতীক্ষার বুঝি শেষ হইবে না। ইন্দ্রাণী ঘুমাইতেছে একভাবে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সামান্য বক্ষস্পন্দন ছাড়া জীবনের কোন লক্ষণ কোথাও নাই—সেদিকে চাহিয়া থাকিলে কেমন যেন ভয় করে, বারবার হাত দিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, সেটুকুও আছে কি না।…তাহার সেই সুগভীর নিদ্রার দিকে চাহিয়া চাহিয়া রমানাথের কেবল এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, বহুদিনের অতৃপ্ত নিদ্রা আজ যেন পূর্ণ বিশ্রাম পাইতেছে, অশান্ত আত্মা যুগ-যুগান্তর ভ্রমণের

পর শান্তি পাইয়াছে। বার বার তাহার অনুতপ্ত অন্তর আপন মনেই বলিয়া উঠিতে লাগিল, 'আহা বেচারী!'

অবশেষে এক সময় শেষ-রাত্রের দিকে ইন্দ্রাণী একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিল, ঘুমের ঘোরেই দুই-একটা অস্ফুট শব্দ করিবার পর বোধ হয় পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিতে গিয়া সহসা চোখ চাহিল। সে চাহনিতে তখনও গাঢ় নিদ্রার ঘোর লাগিয়া, প্রায় মিনিট-খানেক রমানাথের দিকে চাহিয়া থাকিবার পর তবে সে নিদ্রাতুর দৃষ্টিতে পরিচয়ের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই রমানাথ মুখটা নামাইয়া ডাকিল, 'এখন কেমন বোধ করছ রাণী,···আর কোন কষ্ট নেই তো?'

ইন্দ্রাণী আবারও তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতে যাইতেছিল, রমানাথ ক্ষিপ্রগতিতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, 'উঠো না উঠো না লক্ষ্মীটি, এখন ওঠবার চেষ্টা করো না!'

ইন্দ্রাণীর উঠিবার মত খুব শক্তিও ছিল না, সে আবার বালিশে ঢলিয়া পড়িয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। আবার যেন সেই সব অবিশ্বাস্য ব্যাপার, বহুদিনের প্রতীক্ষা করা, বহুদিনের স্বপ্ন দেখা সেই আদরের ডাক, যাহার জন্য তাহার তৃষিত অন্তর প্রতিদিন অসহ দাহে জ্বলিয়া পুড়িয়া গিয়াছে, অথচ কল্পনা করিতেও সাহস করে নাই কোন দিন!···তবে কি তবে কি তাহার মাথাই গোলমাল হইয়া গেল?···

অতি সন্তর্পণে তাহার একটা হাত ধরিয়া রমানাথ ডাকিল, 'ইন্দ্রাণী!'

ইন্দ্রাণীর হাত সেই হাতের মধ্যে থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে স্পর্শে যেন বিদ্যুৎ আছে, বহু আনন্দ ও বহু বেদনা জড়ানো সে স্পর্শ।·· সে ধীরে ধীরে, অতি ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'আমার কি হয়েছিল?'

একেবারে কানের কাছে মুখ আনিয়া যেন চুপি চুপি অতি স্নিগ্ধকণ্ঠে রমানাথ উত্তর দিল, 'তুমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলে রাণু! অনেকক্ষণ ধরে তোমার আর জ্ঞান আনাতে পারা যায় নি।'

তাহার পর সস্নেহ অনুযোগের সুরে কহিল, 'আমাদের সকলকে কী ভাবিয়েই তুলেছিলে তুমি! ডাক্তারবাবুর পর্যন্ত মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।···তিনি মোটেই নাড়ী খুঁজে পান না—তিনটে ইনজেকশান করবার পর তবে তিনি হাঁপ ছাড়লেন!···শরীরটাকে কি এমনি ভাবেই মাটি করে ফেলতে হয়!'

ইন্দ্রাণী অনেকক্ষণ ওপাশের দেওয়ালের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর অশ্রুরুদ্ধ অথচ কেমন একটা আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'ভগবান যদি এতদিন পরে মুখ তুলে চেয়েই ছিলেন, কেন আপনারা ফিরিয়ে আনতে গেলেন! ···আমার প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও শেষ হয় নি? কিন্তু, আর, আর যে আমি পারছি না—'

রমানাথেরও তখন দুই চোখ ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে, সে কহিল, 'তোমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হলে কি হবে রাণী, আমার প্রায়শ্চিত্ত যে এখনও অনেক বাকী।··· আমার স্পর্ধার শেষ নেই তাই তোমার বিচার করতে গিয়েছিলাম!···তবে

আমাকে বিচার করবার সময় একটা কথা মনে রেখো, তোমাকে কষ্ট দিয়েছি বটে—আমিও কম কষ্ট পাই নি।…আমার দিকটা ভেবে দেখে আমাকে মাপ করো।'

ইন্দ্রাণী যেন তাহার কানকেও বিশ্বাস করিতে পারে না—অশ্রু-প্লাবিত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'ওগো—এ কি সত্যি, বলো বলো এ সত্যি। অন্তত মিছে করেও বলো—আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়েছে!'

ইন্দ্রাণীর গলার নীচে হাত দিয়া তাহার মাথাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া রমানাথ জবাব দিল, 'কোন পাপ তোমাকে কোন দিন স্পর্শ করতে পারে নি রাণী, প্রায়শ্চিত্তই তোমার মিছে!'—তাহার পর ইন্দ্রাণীর ললাটে নিজের গালটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, 'ভুল যদি ভাঙলই, আমাকে তুমি এবার তোমার কাছে টেনে নাও, আমিও আর পারছি না!'

ইন্দ্রাণী অনেকক্ষণ পরে অবসন্ন ভাবে কহিল, 'আমি যেন কিছু ভাবতে পারছি না, সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।…'

রমানাথ মুহূর্তে অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, 'আমি ঘোর স্বার্থপর রাণী…তুমি যে কত দুর্বল ভুলে গিয়েছিলুম! তুমি ঘুমোও—আমি তোমার পাশেই বসে আছি, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও!'

একটু পরে ইন্দ্রাণী চোখ বুজিয়াই আরও ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, 'মনে হ'ল যেন তুমি শিয়রে বসে বাতাস করছিলে, হয়ত স্বপ্ন!'

অস্ফুট কণ্ঠে রমানাথ জবাব দিল, 'স্বপ্ন নয়, আমিই ছিলাম তোমার শিয়রে।'

সহসা চোখ খুলিয়া ইন্দ্রাণী কহিল, 'ওগো আমার যে কিছুতে বিশ্বাস হচ্ছে না, বলো, বলো না গো—এ কি সত্যি?'

তাহার দুইটা হাত নিজের হাতের মধ্যে মুঠা করিয়া ধরিয়া রমানাথ কহিল, 'সত্যি সত্যি সত্যি!'

ইন্দ্রাণীর মুখে অনেকদিন পরে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তৃপ্তির হাসি। সে কহিল, 'এইবার আর আমার মরতে ভয় নেই—এখন আমি সুখেই মরব!'

শিহরিয়া উঠিয়া রমানাথ কহিল, 'তোমাকে আমি কিছুতে মরতে দেবো না রাণী, যমরাজের সাধ্য নেই, আমার হাত থেকে তোমাকে কেড়ে নিয়ে যায়।…আমার যে সব প্রায়শ্চিত্ত বাকী।…তোমার কাছে মাথা হেঁট করে তোমার কাজের অংশ চেয়ে নেবো, পালন করব তোমার আদেশ, তোমার মনের সব বেদনা আমার ভালবাসায় ধুইয়ে দেবো—আমার এ স্বপ্ন সার্থক যে করতেই হবে।'

এত কথা এমন করিয়া রমানাথ বোধ হয় কখনও বলে নাই। কিন্তু এই বিশেষ রাত্রিটিতে এই নরনারীর হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি একটা বিশেষ আবেগের পর্দায় বাঁধা ছিল, স্নায়ুগুলি যেন কী একটা বিপুল উত্তেজনায় রিণ্ রিণ্ করিতেছে—সুস্থ অবস্থায় যে সব কথা বলিতে পারা যায় না, নাটকীয় শোনায়, এখন তাহাই অনায়াসে মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসে।

ইন্দ্রাণী যেন বাহিরের দিকে কান পাতিয়া ছিল, অন্যমনস্কভাবে কহিল,

'পাখী ডাকছে না? ভোর কি হ'ল…ওগো, আমাকে একটু বাহিরে নিয়ে যাবে? আমি আর শুয়ে থাকতে পারছি না!'

রমানাথ একান্ত স্নেহে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে লইয়া আসিল। পূর্বাকাশে তখন সবেমাত্র লালের ছোঁয়া লাগিয়াছে, কিন্তু গঙ্গার ভোরাই হাওয়ায় পাখীগুলো কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছে প্রভাতের আর দেরি নাই।…ইন্দ্রাণী শ্রান্ত মাথা রমানাথের কাঁধে রাখিয়া কহিল, 'আঃ, কী মিষ্টি হাওয়া। কিন্তু, কিন্তু আবার সকালের সঙ্গে সঙ্গে তুমি বদলে যাবে না তো?'

রমানাথ তাহার কানের উপর নিজের ঠোঁটটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, 'কাল আমাদের জন্মান্তর হয়েছে রাণী। আগের জীবনের কথা ভুলে যাও—সেটা ছিল দুঃস্বপ্ন, এইটেই সত্য।…আমি দশদিন ছুটি নিয়েছি, তোমাকে নিয়ে দেশে যাবো—এই দশদিন তুমি শুয়ে থাকবে, আমি তোমার সেবা করব।…না, না, আমি কোন কথা শুনব না।'

ইন্দ্রাণী ছেলেমানুষের মত মাথা নাড়িয়া কহিল, 'তুমি যা বলবে আমি তাই শুনব। কিন্তু দেখো, আমার আর শরীর খারাপ হবে না, এইবার আমি আপনিই সেরে উঠব।…যেতে কি চাই না সাধ করে—ঐ শোন কান পেতে, এখনই চেঁচাতে শুরু করেছে ওরা, ওদের ভার কার হাতে দেবো?'

রমানাথ ইন্দ্রাণীর রুক্ষ চুলের গোছার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া জবাব দিল, 'নব-জন্মের প্রণামটা মা-বাবাকে পৌঁছে দিয়ে এসে আমরা দু'জনেই ওদের ভার নেব—কেমন?…এবার আর কোন কাজে আমাকে দূরে সরিয়ে রেখো না রাণী, তোমার সব কাজ যেন আমাদের দু'জনের কাজ হয়।'

পূর্বাকাশ তখন আরও অনেকখানি লাল হইয়া উঠিয়াছে, আর তাহারই আভা ইন্দ্রাণীর শুষ্ক পাণ্ডুর মুখে পড়িয়া যেন অপরূপ লাবণ্য আনিয়া দিয়াছে। রমানাথ নিষ্পলক চোখে সেই দিকে চাহিয়া ছিল, অকস্মাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল যখন ইন্দ্রাণী হাত তুলিয়া সূর্যদেবতাকে প্রণাম জানাইল। ইন্দ্রাণী নমস্কার শেষ করিয়া কহিল, 'এবার ঘরে চলো!'

রমানাথ ঘরের দিকে ফিরিয়া চুপি চুপি কহিল, 'এবার তাহ'লে তুমি যতীনকেও মাপ করো রাণী, তার বড় শরীর খারাপ, আসবার সময় তাকেও নিয়ে আসতে চাই কিছুদিনের জন্য—'

ইন্দ্রাণী তাহার ঈষৎ-শঙ্কিত চোখ দুইটি স্বামীর মুখের উপর রাখিয়া প্রশ্ন করিল, 'তুমি কি আমায় পরীক্ষা করতে চাও?'

'ছি!' রমানাথ জিভ কাটিয়া কহিল, 'আমার কোথাও কোন ভয়, কোন সংশয় নেই ইন্দ্রাণী—সেই জন্যই তাকে কাছে ডেকে নিতে চাই। সেও দুঃখ বড় কম পায় নি। আজ আনন্দের দিনে তাকে দূরে রাখতে চাই না! সে যে আত্মার মতই আমার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল!'

ইন্দ্রাণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'বেশ তো, তাঁকে ডেকে নাও,

আমারও আর কোন সংশয়, কোন ভয় নেই।'

তাহার পর সহসা সেইখানেই থামিয়া গিয়া গলায় আঁচল দিয়া স্বামীকে প্রণাম করিল।

চির সীমন্তিনী

উৎসর্গ

সাহিত্যিক ও সাহিত্য-ঐতিহাসিক

শ্রীমান সুজিতকুমার সেনগুপ্তের

করকমলে —

এ কাহিনী কল্পিত উপন্যাস, রামায়ণের অনুসরণ নয়। তবে তখনকার দিনে ঐ অঞ্চলে যে সমাজ-ব্যবস্থার চিত্র রামায়ণে পাওয়া যায়—আমি তাকে লঙ্ঘন করেছি বলে মনে করি না। বিবাহবন্ধন তখনও ওখানে প্রচলিত হয় নি, 'ভার্যা', 'স্ত্রী', 'পতি' এসব শব্দ আর্যদের রীতি অনুসারেই ব্যবহৃত হয়েছে; কারণ দেখা যাচ্ছে, বালী নির্দ্বিধায় রুমাকে সম্ভোগ করছেন, অপরপক্ষে সে রুমাকে পুনর্গ্রহণ করতে সুগ্রীবের কোন আপত্তি দেখা দেয় নি—বরং আগ্রহই দেখা গেছে। আবার অতি সহজেই তিনি তারাকে নিয়ে বসবাস করতে লাগলেন—সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন বা কৈফিয়ৎ কোথাও নেই। রাময়ণকারও স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাপারটা গ্রহণ করেছেন।

কিষ্কিন্ধ্যাবাসীদের সত্যসত্যই আমদের পরিচিত স-লাঙ্গুল শাখামৃগ মনে করার কোন কারণ নেই। দেখা যাচ্ছে, তাঁরা বস্ত্র পরিধান করিতেন, পুষ্পমাল্য স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। প্রসাধন বস্তু অন্যান্য গন্ধদ্রব্য ব্যবহৃত হ'ত। মহার্ঘ্য শিবিকা, সুকোমল শয্যারও অতি মনোহর বর্ণনা আছে। এগুলি আর যাই হোক. লাঙ্গুলধারী বানরের ভোগ্য নয়।

—লেখক

॥ এক ॥

অবশেষে সত্যিই এক সময় সীমন্তিনী তার সুবর্ণ দর্পণ সরিয়ে রেখে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন।

দীর্ঘ সময় লাগে তাঁর প্রতিদিনই, অপরাহ্নের এই প্রসাধন বা রূপসজ্জায়। তিন দণ্ডের কমে হয় না কোনদিন, আজ বোধহয় কিছু বেশীই লেগেছে। অনেকবারই মনে হয়েছে, এতক্ষণে ত্রুটিহীন হল—কবরী বিন্যাস সমাপ্ত, ললাটের চূর্ণ কুন্তলগুলি স্বেদবিন্দুর অনুকম্প হিসাবে সুশোধিত চন্দন তৈল প্রয়োগে পরিচ্ছন্ন ললাটে লিপ্ত করা হয়েছে—সযত্নে অবিন্যস্তভাবে সুবিন্যস্ত করা, যাতে বাতাসে না সেগুলিকে স্থানচ্যুত করতে পারে, মুখের চিত্র না বদলে যায়; কদম্ব কেশরের সঙ্গে কেতকীর রেণু মিশ্রিত ক'রে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণকে গৌর না হোক, উজ্জ্বলতর করতেও দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়; সে ঔজ্জ্বল্য যে স্বাভাবিক নয়, তাঁর চর্ম-বর্ণ যে এতটা সুগৌর নয়—তা কেউ না বুঝতে পারে, সেই জন্যই এত যত্ন নিতে হয়।

ঠিক এইভাবেই কঙ্কন কেয়ূর মণিহার সীমন্তচন্দ্রিকা নির্বাচনে বিলম্ব হয়ে যায়। কোন্‌টার সঙ্গে কোন্‌টা ঠিক শোভন হয়—এ তিনি যেন কিছুতেই স্থির করতে পারেন না, কোন পারিপাট্যই শেষ অবধি তাঁর মনঃপূত হয় না। সেই জন্যই দর্পণ ও প্রস্তর-নির্মিত প্রসাধনপেটিক,—তার মধ্যে প্রস্তরপুটে রূপসজ্জার অসংখ্য উপকরণ—বারবার সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন, বারবারই সেগুলিকে আবার কাছে টেনে নিতে হয়েছে।

অথচ এর যে কোন প্রয়োজন নেই—তা তারাদেবী জানেন।

কিষ্কিন্ধ্যার পট্টমহাদেবী—এ বিশেষণ উত্তরাখণ্ডের সভ্যতাগর্বী আর্যরা ব্যবহার করে তিনি শুনেছেন, এদেশে তাঁকে 'বড়রানী' বলেই অভিহিত করা হয়; কিন্তু তিনি চান আর্যদের ব্যবহৃত বিশেষণেই পরিচিত হতে, মনে হয়, শব্দটা ঢের বেশী মর্যাদাব্যঞ্জক—যে সুন্দরী, তা তিনি নিজেও যেমন জানেন, বহু দূর দূর দেশের লোকও জানে। তাঁর রূপের খ্যাতি বহু বিস্তৃত, এ সংবাদ তিনি নিঃসন্দিগ্ধ নিশ্চিতভাবে জেনেছেন। শুধু এইজন্যই বহু অর্থব্যয়ে বিশ্বস্ত চর প্রেরণ করেছেন দেশ-দেশান্তরে।

উত্তরাখণ্ডের আর্যরা হয়ত তা স্বীকার করবে না। তাঁরা ওঁদের বলে অনার্য, বর্বর। এমন কি পশু, দানব, দৈত্য, রাক্ষস প্রভৃতি অভিধায় বিশেষিত করে। ওঁরাই তো আর্যদের কাছে বানর নামে পরিচিত। অথচ তাঁদের যতই উজ্জ্বল গৌরকান্তির গৌরব থাক—এমন নমনীয়তা, এমন সুচারু গঠন, এমন কোমল দেহভঙ্গিমা ওখানের কোন নারীই দাবী করতে পারবে না।

তারাদেবী শুধু চর নয়, সেই সঙ্গে বিশিষ্ট কুশলী শিল্পীও প্রেরণ করেছেন। তারা বহু রাজ্যের প্রধানা-অপ্রধানা মহিষীদের পট এঁকে এনেছে। কোশল, মগধ,

কাশী, মৎস্য, মদ্র—এমন কি গান্ধার দেশেও এইসব দক্ষ পটুয়ারা গেছে, তারা শুধু মহিষী নয়—নটী, বারাঙ্গনা, সাধারণ নাগরিকাদেরও চিত্র এঁকে এনেছে। সে মেয়েগুলিও সুন্দরী, কিন্তু উনি বা—এমন কি ওঁর সপত্নী বা জাতা—(কি বলবেন, তা আজও তিনি জানেন না) রুমাও কোন অংশে তাদের চেয়ে কম সুরূপা নন। বরং মনে হয় পেলবতায়, মাধুর্যে, গঠনে, চলনে, গ্রীবাভঙ্গীতে তাদের চেয়ে অনেক বেশী কাম্য, অনেক বেশী বাঞ্ছিত।

ওদের মতে যারা নিতান্ত অনার্য-কন্যা, পশুর সমান, তাদের নৃত্য দেখলে ঐ সভ্যতাগর্বী অসভ্যগুলো বুঝত নৃত্য কাকে বলে ; মনে হত, এদের দেহে অস্থি বলে কোন পদার্থ নেই, শুধু সুকোমল মাংস, নবনী দিয়া গড়া। তাও ঐ সব ঘৃত ও মাংসখাদিকাদের মতো বসাববহুল মেদ নয়, তন্বী, ভঙ্গুর, পুষ্পদণ্ডের মতো সন্নত, পুষ্পের মতোই কোমল ও সদা-নবীন।

এ সবই জানেন, বিশ্বাস করেন, তবে এ সযত্ন প্রসাধন কেন ?

কে জানে, তারা বোধ করি নিজেও জানেন না।

বোধ করি সেই অ-দৃষ্ট, বহু দূরস্থ আর্যনারীদের সঙ্গে স্পর্ধিত প্রতিযোগিতার জন্যই। তাদেরও প্রসাধন সামগ্রী আছে, তারাও এসব এবং অন্যান্য, ওঁদের কাছে দুর্লভ বস্তু দিয়ে রূপসজ্জা করে—কিন্তু তবু, তারাদেবী নিশ্চিতভাবেই বলতে পারেন, এমন অত্যাশ্চর্য সজ্জা, সে সব বিদ্যা ও রূপ-গরবিনীরা জানে না।

তারাদেবী প্রসাধন বেদিকা ত্যাগ ক'রে ইঙ্গিতে প্রধানা সহচরীকে এগুলি যথাস্থানে তুলে রাখতে বলে, তাঁর প্রাসাদাংশ সংলগ্ন মুক্ত অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন। এখান থেকে ঋষ্যমূক দুর্গচূড়া দৃষ্টিগোচর হয়, এই জন্যই এ স্থানটি এত প্রিয় তাঁর। যদিচ ঐ দুর্গ চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনই একটা তীব্র অন্তর্জ্বালা বোধ করেন, সে দাহ দৈহিক দুষ্ট ক্ষতের মতোই অসহ্য বোধ হয়—তবু এখানে না এসেও পারেন না।

ঐখানে এমন একটি মানুষ আছে, যে ওঁর এই রূপসজ্জার মর্ম বা মূল্য বুঝত, যে ওঁর রূপের চিরমুগ্ধ উপাসক। আজ এই বেশে ওঁকে দেখলে, গদ্‌গদ ভাষায় কাব্যের মতো করে স্তুতি করত। নানা উপমা-অলঙ্কারে ওঁর সৌন্দর্যের অপরূপত্ব বর্ণনা করত।

সে বোঝে, সে জানে।

গুণগ্রাহী, সৌন্দর্যবোদ্ধা।

একমাত্র সে-ই।

আর ওঁর স্বামী—স্বামী বললে শব্দটার অবমাননা হয়, প্রভু—কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালী !

তিনি কখনও, কোনদিনই তাঁর প্রধানা সঙ্গিনী, কিষ্কিন্ধ্যার প্রধানা মহিষীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন না। রূপের ব্যঞ্জনা তো দূরের কথা, আদৌ কোন দিন ভাল করে চেয়ে দেখেছেন কি তাঁর দিকে ! তাঁর কাছে নারী রমণী মাত্র।

সকলেই সমান। সম্ভোগের উপকরণ।

অপরাজেয় যোদ্ধা, অপরিমেয় বলশালী, বিশাল দেহ, তেমনি সেই অনুপাতেই তার দুর্বার অনির্বাণ কাম। প্রতিদিন তিন-চারটি স্ত্রীলোক উপভোগ না করলে তাঁর সে যৌনক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। তাও পূর্ণ নিবৃত্তি হয় কি ?

এই পরিমাণ বিচার-বিবেচনাহীন ক্ষুধা বলেই সম্ভোগপাত্রী নির্বাচনে কোন ইতরবিশেষ নেই বালীর। তারাদেবীর মনে হয়, তিনি এসব স্ত্রীলোকের কোনটিরই মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখেন নি। রূপে তার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন দেহটার। যৌবনের।

এই যে রুমা, ওঁর জাতা ও সপত্নী (কী বিচিত্র সম্পর্কই না দাঁড়িয়েছে তাঁদের!)—সেও সুন্দরী, যথার্থ সুন্দরী; অনার্য-দুহিতার দেহলালিত্য ও আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতা পূর্ণমাত্রায়ই আছে তার—সেকথা তারাদেবীও স্বীকার করতে বাধ্য। তাকে সম্ভোগ করার জন্যই—সুগ্রীবকে বিতাড়িত করলেও, রুমাকে ছাড়েন নি বালী—তবু তাঁর দিকেই কোন দিন কি চেয়ে দেখেছেন বালী, মুগ্ধ চোখে, প্রশংসার দৃষ্টিতে! ঐ প্রথম-যৌবন-সরসীতে অর্ধস্ফুট কমলকলিকাটির দিকে ?

না, কোনদিনই না। তা জোর করেই বলতে পারেন তারা। সে প্রয়োজনও নেই, সে দৃষ্টিও নেই।

যদি ওঁকে অবহেলা করে রুমাকে নিয়েই থাকতেন, অন্ততঃ তাকে প্রিয়তমা বলে গণ্য করতেন—তা হলেও তবু, মনুষ্যত্বের না হোক, মানবজনোচিত রুচি ও বিবেচনার অস্তিত্ব বোঝা যেত। তাও না, রুমা অসংখ্য শয্যাসঙ্গিনীর অন্যতমা মাত্র, প্রিয়তমা, বা শ্রেষ্ঠতমাও না।

পশুর মতোই শক্তি লোকটার, পশুর মতোই ব্যবহার। ঠিক সেইরূপই অপরিমাণ কামনা। যেমন প্রচণ্ড ঔদরিক ক্ষুধা, তেমনই ইন্দ্রিয়জ। আকৃতি ছাড়া সব দিক দিয়েই পশু।

কিন্তু তাই কি ?

তাও বোধহয় সত্য নয়।

কোথায় যেন একটা প্রতিবাদ জাগে তারার নিজের মনেই—চিন্তাটা আসার সঙ্গে সঙ্গেই।

পশুরাও এমন নয়, এতটা নয়।

এই কিষ্কিন্ধ্যায় পশুর অভাব নেই। নিরীহ মেষ মৃগ থেকে বরাহ, সিংহ, ঋক্ষ—সমস্তই আছে। আবার সত্যকার বানর—যাদের শাখামৃগ বলে সারমেয়, এ সবেরও অভাব নেই। তাদের আচরণ প্রায়শঃ, স্বামীসঙ্গ বঞ্চিতা তারা তাঁর দুঃখ-দায়ক প্রবৃত্তিজর্জরিত অবসর সময়ে, ভালভাবেই নিরীক্ষণ ও লক্ষ্য করেছেন। তার কাম উদ্রেকের বিশেষ কাল আছে, স্ত্রী পশুরা ঋতুমতী না হলে পুরুষ-পশুর কাছে আসে না, গর্ভবতী হয়েছে বুঝলেই, পুরুষ সংসর্গ পরিহার করে, পুরুষরাও তাদের বিরক্ত করে না। একই দিনে এমন বারবার বিভিন্ন স্ত্রী-পশুকে প্রয়োজন হয় না তাদের।

এ লোকটা পশুরও অধম। কে জানে সুদূর দক্ষিণে যে অসভ্য আম-মাংস-ভোজী লোকগুলি বাস করে বলে তারা শুনেছেন—যাদের রাক্ষস পিশাচ আখ্যা দেয় আর্যরা—তাদের মধ্যে এমন আচরণ দেখা যায় কিনা!

সুগ্রীব, হ্যাঁ, সুগ্রীবই তাঁর উপযুক্ত স্বামী, যথার্থ সাথী।

প্রভু বলে মানতেও রাজী আছেন তারা।

বলবীর্য তাঁর বালীর মতো নয়, সত্য কথা। তবে অপর পরিচিত সব লোকের থেকেই বেশী। বিরাট কলেবর নয়, সুগঠিত সুন্দর দেহ। বিবেচনা আছে, সদসৎ বিচারবুদ্ধি আছে, দয়া-মায়াও আছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করতে জানে। মিষ্টভাষী, মিতবাক্; অপরকে প্রাপ্য সম্মান দিতে জানে। শুধু স্ত্রীলোকেরই নয়—প্রকৃতির সৌন্দর্যও দেখতে জানে, উপভোগ করার মতো মানসিক গঠন আছে তার। ঋতু পরিবর্তনেরও সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি যে নব নব রূপ ধারণ করে, সে বিষয়ে সচেতন।

আজ সুগ্রীব কাছে থাকলে, তাঁর এই অপরূপ রূপসজ্জা সার্থক হত।

সুগ্রীব দেখতেন, মুগ্ধ হতেন। প্রসাধনের রহস্য ও কার কি প্রভাব—জানা আছে তাঁর, একবার ওঁর মুখের ওপর চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারতেন, কোথাও কোন ত্রুটি নেই, কোথাও কুরুচি প্রকাশ পায় নি।

তাঁর সেই সু-বর্ণনা ও মুগ্ধতার মুকুরে তারা নিজেও দেখতেন।

সুগ্রীবের কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন অস্থির হয়ে উঠলেন তারা।

যেন মনে হচ্ছে, তাঁকে কে তাড়না করছে কোথাও যাওয়ার জন্য। কিছু একটা উপায় করার জন্য। কঠিন কণ্টকময় বেত্রাঘাত করছে কে, তার জ্বালা তীব্র, দুঃসহ। একমাত্র অপরিমেয় মাধ্বী পান করে অচেতন না হলে এ জ্বালার অবসান হয় না।

তারা জোর করে ঋষ্যমূকের দিক থেকে দৃষ্টি ফেরালেন। কিন্তু তাতেও জ্বালা যেন বৃদ্ধি পেল। চারিদিকের বনস্থলী, হরিৎ-বৃক্ষশীর্ষ শোভিত পর্বতমালা, পুষ্প ও বিভিন্ন সুমিষ্ট ফলবৃক্ষ শোভিত উপত্যকা, সুরম্য নদীতীর দেখে তাঁর বিরহজ্বালা বৃদ্ধি পেল ব্যতীত হ্রাস পেল না। এ সৌন্দর্যের সঙ্গে যে সুগ্রীবের স্মৃতি বিজড়িত। তিনি দেখতেন, তিনি দেখাতেন। প্রতিটি পুষ্পের নাম তাঁর জানা, কোন্ ঋতুতে কোন্ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তা তাঁর কণ্ঠস্থ। তাঁর বর্ণনায় এই সৌন্দর্য আরও বেশী উপভোগ্য বোধ হত।

তবু, এই শোভা দৃষ্টিপথে পতিত হওয়া মাত্র আজও তাঁর দুই চোখে যেন কে মায়াকাজল পরিয়ে দিল।

মরি, মরি। আজ এ কী শোভা ধরিত্রীর!

বোধ করি তাঁকে অধিকতর যন্ত্রণা দেওয়ার জন্যই প্রকৃতির এই অপরূপ রূপসজ্জা।

দুই নদীতীরে কত কি লতা, প্রত্যেকটিই বিচিত্র বিভিন্ন বহু বর্ণ পুষ্পভারে

আনত ; তাদের মিশ্রিত সুগন্ধ এত দূরেও মৃদু জীবনের ন্যায় পবনবাহনে এসে পৌঁচচ্ছে, শুধু গন্ধ নয়—সেই সঙ্গে তাদের গন্ধবাহী পুষ্পরেণুও। পুষ্পদল ও পল্লব এত দূরে আসা সম্ভব নয়, সেগুলি ঐ নদীতীরের তৃণভুমিতে যেন ওঁদের জন্যই পুষ্পশয্যা রচনা করছে। গঙ্গার দক্ষিণ তটের পর্বতশিখরের হরিৎ বৃক্ষগুলিতে অন্ধকার নেমে আসায় তা ক্রমশঃ মেঘবর্ণ ধারণ করছে, কিন্তু তারই মধ্যে অসংখ্য দীপমালার মতো পুষ্পিত কর্ণিকার শাখাগুলি আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এপারে নিষ্পত্র পুষ্পাকীর্ণ কিংশুক, মালতী, মল্লিকা, করবী—নদীতটের পাশে পাশে মধুগন্ধী পদ্ম, কেতকী, সিন্ধুবার, বাস্তী, যূথী ও কুন্দ ; এদিকে নক্তমাল, মধুক, স্থলবেতস, বকুল, চম্পক ও পুন্নাগ, নীল অশোক ; দূরে শৈল-সানুতে সিংহকেশর, লোধ্র, চূত, পাটল ও কোবিদার ; মুচকুন্দ, অর্জুন, শিরীষ, শিংশপা ও ধব,* শাল্মলী, কুরুবক, চন্দন ও সান্দন, হিন্তাল ও তিলক ; এগুলি যে এমনভাবে একই সঙ্গে পুষ্পিত ও গন্ধবহ হয়ে উঠেছে, সে কি কেবল তাঁকেই যন্ত্রণা দেবার জন্য নয় ?

যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠেন তারা, কামনার আবেগে ক্রুদ্ধা সর্পীর মতো অবস্থা হয় তারাদেবীর। তবু কী যে করবেন, কি করলে এই মানসিক জ্বালা, যা অবিলম্বে দৈহিক জ্বালায় পরিণত হবে, তার অবসান বা প্রতিকার হয়, তাও ভেবে পান না। এক এক সময় মনে হয় এই প্রাসাদের পাষাণ-কুট্টিমে মাথা কুটে মরেন। আবার কখনও মনে হয়, নিশীথ রাত্রে নিঃশব্দে উঠে প্রাসাদ দুর্গে অগ্নিসংযোগ করেন—ডাকিনীর মতো ; প্রেতিনীর মতো ঘুরে ঘুরে সমস্ত প্রাসাদের কক্ষ দ্বারে দ্বারে তৈলনিষেক করে আগুন ধরিয়ে দেন—যাতে বহ্নিবেষ্টনীতে পুড়ে মরে ঐ পাপিষ্ঠ আর তার পাপসহচরীরা। হ্যাঁ, ওদের ওপরও ওঁর দারুণ ঘৃণা। পুড়ে মরুক বালী আর তার উচ্ছিষ্ট ঐ স্ত্রীলোকগুলো ! সেই সঙ্গে নিজেও মরুন। সবাই যাক, তাঁরই বা এভাবে বেঁচে থেকে লাভ কি ?

পরক্ষণেই মনে পড়ে যায়—তাঁর পুত্র, এ বংশের এখনও পর্যন্ত একমাত্র সন্তান কুমার অঙ্গদের কথা। শিউরে ওঠেন সঙ্গে সঙ্গেই। সকলে গেলে, সেও যাবে। হয়ত যাকে ধ্বংস করার জন্য এত আয়োজন, সেই বালীই বেঁচে থাকবে শেষ পর্যন্ত। লোকটা যেন অমর, অজেয়। বহুবার বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, কোন অস্ত্র যেন ওকে বিদ্ধ করতে পারে না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। এমন কি, বোধ করি পর্বতের চাপেও পিষ্ট হবে না লোকটা। অমানুষিক বল, অবিশ্বাস্য সহ্যশক্তি। তার চর্ম যে কোন ধাতু অপেক্ষা অধিক ঘাতসহ।

কোন উপায়ের কথাই মাথায় যায় না বালীকে বিনষ্ট করার। শেষ অবধি ক্ষিপ্তের মতো এসে এতক্ষণের এত যত্নের প্রসাধন ও সজ্জা নিজের হাতে নষ্ট করেন। খুলে ফেলেন সযত্নরচিত কবরী, টেনে ছিঁড়ে ফেলেন বহু বিচিত্র

---

* এখন উড়িষ্যা ও সিংভূমে ধ গাছ নামে পরিচিত। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় এর নাম দিয়েছিলেন শিব বৃক্ষ।

পুষ্পগ্রথিত গুঞ্জমালা, দূরে ফেলে দেন যাবতীয় মণি-মাণিক্য শোভিত অলঙ্কারের রাশি। তারপর ঋক্ষচর্মের সুকোমল শয্যায় আছড়ে পড়ে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন

॥ দুই ॥

একি শুধুই তারাদেবীর অসহায় অবস্থা, নির্বাপণের-উপায়হীন কামবহ্নির জন্যই এ অস্থিরতা? শুধুই কামনা আর আবেগ, প্রেমের তৃষ্ণা?

না, তার সঙ্গে আত্মগ্লানিও যে প্রচুর।

সুগ্রীবের সঙ্গে এই যে বিচ্ছেদ—এই নিদারুণ কষ্টদায়ক বিরহজ্বালা—এর জন্য কি উনি নিজেই দায়ী নন? এ যে ওঁরই স্বখাত সলিল।

ওঁরই মূর্খতা ও নিবুর্দ্ধিতা। হ্যাঁ, মূর্খতাই বলবেন নিজের সে কার্যকে।

সেদিনের কথা, সে সময়ের প্রতিটি ইতিহাস ওঁর মনে আছে। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুখে নিজেরই কালিমা লেপনের ইচ্ছা হয়।

এত কাল বাস করেছেন যার সঙ্গে, যার সন্তান গর্ভে ধারণ করেছেন—তার আসুরিক বল সম্বন্ধে সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা থাকা উচিত ছিল বৈকি।

তা নইলে মায়াবী দানব তাকে বধ করতে পারবে—এমন অসম্ভব অনুমানই বা করতে যাবেন কেন?

আম-মাংসভোজী, কদাচারী, পশুচর্মবাস, গুহাবাসী দানবরাই নাকি এখানের আদিমতম অধিবাসী। বিরাটকায় শষ্পভোজী জন্তুদের পরে এরাই বুঝি প্রথম মানব। এই আদিবাসীদেরই দানব, রাক্ষস প্রভৃতি নামে অভিহিত করে আর্যরা। তাদের কাছে এরা সবাই সমান, পশুর সমগোত্রীয়। যদিচ রাক্ষসরা দানবদের থেকে বেশী অগ্রসর, তারা ধাতুর ব্যবহার জানে। কিন্তু আর্যদের কাছে ওঁরাও তো ঐ একই শ্রেণীতে পড়েন? অজ্ঞানতা আর কাকে বলে?

অনার্যরা এদেশ অধিকার করার বহু পূর্ব থেকেই এইসব আদিবাসীরা আছে এখানে, কে জানে সে কতকালের কথা! এরা বিশেষ এই দানবরা এখনও কৃষিকর্ম শেখে নি। শুধু এত দিনে ওঁদের কাছ থেকে অগ্নি প্রজ্বলনের কৌশলটা আয়ত্ত করেছে মাত্র, যদিচ অগ্নিপক্ব কোন আহার্য এখনও গ্রহণ করে না। পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করে, বৃহৎ শিলাখণ্ডে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড ঘর্ষণ করে সূচীতীক্ষ্ন অস্ত্র প্রস্তুত হয়। তবে সে অস্ত্র পশু শিকারের জন্যই ব্যবহৃত হয়—যুদ্ধের সময় বিরাট বিরাট শিলাখণ্ড ও সদ্য-উৎপাটিত বৃক্ষই অস্ত্রের কাজ করে। একক সমরে বাহুবল ও দেহভারই সম্বল।

বালী যখন কিষ্কিন্ধ্যায় রাজ্য বিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ব্রতী হলেন, তার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পিতৃ-পিতামহ এখানে আধিপত্য করলেও এই দানবদের ভয় করে চলতেন, ঠিক কর বা উৎকোচ না দিলেও—অবাধ শিকারের ও ফল আহরণের অধিকার স্বীকার করে নিয়ে, এক রকম সখ্য বজায় রেখে চলতেন।

এদের মধ্যে বীর্যে ও বুদ্ধিতে দুন্দুভি দানবই ছিল প্রধান। তার ধারণা ছিল, তাকে তুষ্ট না রেখে কেউ কিষ্কিন্ধ্যায় রাজত্ব করতে পারবে না।

বালী রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করে প্রথমেই এদের দমনে প্রবৃত্ত হলেন। এই বর্বর, অর্ধনর লোকগুলো যদি শাসকের উপরে শাসক হয়ে বসে থাকে তো রাজত্বে ধিক—এই হল তাঁর বক্তব্য। বিবাদ করতে গেলে একটা উপলক্ষ সৃষ্টি প্রয়োজন, সে উপলক্ষ এক একজনের কাছে এক একটা বেশী সুবিধাজনক বোধ হয়। কামকীট বালী একই অস্ত্রে দুই পশু বধ করলেন, দুন্দুভিপুত্র মায়াবী তখন দানবদের মধ্যে প্রধান—তার দুটি তিনটি অপেক্ষাকৃত সুশ্রী সঙ্গিনীকে হরণ করে এনে নিজের অন্তঃপুরভুক্ত করলেন।

মায়াবী অবশ্যই যথাসাধ্য বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বালীর বাহুবল তার অপেক্ষা বহুগুণ বেশী, কিছুক্ষণের মধ্যেই পরাজিত ও সাংঘাতিক আহত হয়ে কোনমতে পলায়ন করে বাঁচল। এর পর আর কোন দানব বালীর বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস করে নি।

কিন্তু মায়াবী তার অপমান ও এই পরাজয়ের গ্লানি ভোলে নি। সে সাংঘাতিক প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

ওরা গুহাবাসী, এখন কেউ কেউ প্রস্তরখণ্ডের উপর প্রস্তরখণ্ড চাপিয়ে স্বতন্ত্র গৃহনির্মাণ করলেও, অধিকাংশই গুহাতে বাস নিরাপদ ও আরামদায়ক মনে করে। এই সব গুহার যেটা প্রধান প্রবেশপথ—তার অনেক শাখাপথ ও তার ধারে ধারে গুপ্ত গুহা থাকে। যারা বহুদিন ধরে বা বংশপরম্পরায় বাস করে, তারাই এর রহস্য সম্যক্ আয়ত্ত করতে পারে, অন্য কোন নবাগত ব্যক্তি কৌতূহলী হয়ে সে সঙ্কীর্ণ শাখাপথে প্রবেশ করলে আর ফিরে আসতে পারে না বা অন্যদিকে নির্গমনের মুক্তিদ্বার খুঁজে পায় না। অন্ধকার পথে ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে হয়ত বা একই পথে বারবার ঘুরে অনাহারে প্রাণ দেয়।

মায়াবী তার রণভূমি হিসেবে এমনিই একটি বহু শাখা বা গুপ্তপথবিশিষ্ট বিশাল গুহা নির্বাচন করেছিল। তার মধ্যে বেশ কিছুকাল ধরে বিস্তর প্রস্তরখণ্ড ও প্রস্তরনির্মিত অস্ত্র স্তূপীকৃত করেছে, সেই সঙ্গে নিজের জন্য কিছু আহার্যও। এই ধরনের গুহার মধ্যেই ঝরনা থাকে, সুতরাং পানীয় জলের জন্য কোন চিন্তা ছিল না।

আয়োজন শেষ করে, একদা গভীর রাত্রে এই প্রাসাদের দ্বারে এসে বিকট গর্জন ও আস্ফালন করতে লাগল। সে কোন বীরের হুঙ্কার নয়—উন্মত্ত পশুর মতো এক ধরনের কদর্য চিৎকার।

চন্দ্রকরোজ্জ্বল রাত্রি। বিস্মিত, ক্রুদ্ধ ও অকাল-নিদ্রাভঙ্গে বিরক্ত বালু প্রাসাদ-প্রাকারে এসেই ওকে দেখে চিনতে পারলেন। মাত্র বৎসর-খানেক পূর্বে প্রহার করে যার অস্থি পর্যন্ত চূর্ণ করে দেহটাকে প্রায় পিণ্ডাকার করে দিয়েছিলেন—সে নির্লজ্জ আবার কোন্ সাহসে তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে এসেছে? তবে কি

সে আরও বহু স্বজাতীয়কে সঙ্গে করে এনেছে ? তিনি দুর্গ থেকে বহির্গত হলেই তারা অতর্কিতে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করবে ? অবশ্য দানবমহলেও তাঁর কিছু কিছু গুপ্তচর আছে—তারাও দানব, নানা প্রকার লোভে তারা বালীর বশীভূত, তেমন কোন ষড়যন্ত্র দেখলে নিশ্চয়ই সংবাদ দিত। নাকি ওরাই বিশ্বাস-ঘাতকতা করল ?

নানা কুটিল সন্দেহ কয়েক লহমার মধ্যেই মনে দেখা দিল।

তবে সে যাই হোক, অপর কারও, বিশেষ বর্বর দানবের তর্জন গর্জন সহ্য করে, রাত্রি প্রভাত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন কি সৈন্যসজ্জার আদেশ দেবেন, বালীর অত ধৈর্য নেই। তাঁরও ক্রোধ কতকটা জান্তব, ওদের সমানই। তিনি তখনই কুৎসিত ভাষায় ওকে যথেচ্ছ গালি দিয়ে চর্মাবৃত হয়ে তখনই দুর্গ থেকে বহির্গমনের উদ্যোগ করলেন।

বালী অদূরদর্শী ও হঠকারী হলেও তাঁকে সুমন্ত্রণা দেবার লোকের অভাব ছিল না। মন্ত্রী জাম্বুমান, মহাবীর হনুমান, নল, নীল প্রভৃতি বিচক্ষণ পার্ষদগণ সকলেই তাঁকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন।

সেদিন যে ব্যক্তি সাংঘাতিকভাবে প্রহৃত, লাঞ্ছিত হয়ে কোনমতে পলায়ন করে প্রাণ বাঁচিয়েছে, সে আজ কোন্ ভরসায় এসে এমন পাশবিক চিৎকার শুরু করে ! এই দুঃসাহস ও আপাত-নির্বুদ্ধিতার পিছনে নিশ্চয়ই কোন সুচিন্তিত কু-অভিসন্ধি আছে, গভীর কোন ষড়যন্ত্র ! না হলে এত রাত্রেই বা আসবে কেন ? প্রভাতের জন্যও তো অপেক্ষা করতে পারত ? দুন্দুভি দানব ইন্দ্রজালে সুদক্ষ ছিল, মায়াবী তারই পুত্র, নিশ্চয়ই বহু মায়াকৌশল তার জানা আছে।

তা হলেও এ দুর্গ সে ভেদ করতে পারবে না। অন্য কোনভাবে এলে আর দ্বন্দ্বযুদ্ধের কোন প্রশ্ন থাকবে না, তাঁরা সকলে মিলে ওকে বধ করতে পারবেন। রাত্রি প্রভাত পর্যন্ত সে এমনি উচ্চ গর্জনে নিজের কণ্ঠস্বরই ভঙ্গ করুক—প্রভাতে সদলবলে দুর্গ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

নিষেধ করেছিলেন সুগ্রীবও। কড়জোড়ে অনুরোধ করেছিলেন এমন হঠকারিতা না করতে। বালীর অসংখ্য পত্নী বা সঙ্গিনীরা সক্রন্দনে পথরোধ করার চেষ্টা করেছিল।

নিষেধ করেছিলেন তাঁরাও।

হ্যাঁ, তিনিও করেছিলেন, কণ্ঠস্বরে যথোপযুক্ত আকুলতাও এনেছিলেন, নইলে দৃষ্টিকটু হয়।

তবে এমন ভাষা ব্যবহার করেছিলেন সে উদ্বেগ প্রকাশে, যাতে বালীর শৌর্যের প্রতি কটাক্ষ থাকে একটু। বয়স হয়েছে, সুখে ও সম্ভোগে অভ্যস্ত হয়ে পূর্বের যুদ্ধাভ্যাসের তীক্ষ্নতা নিশ্চয়ই কিছু নষ্ট হয়েছে—বিশেষ বিস্তর প্রমদাসংসর্গে নিত্য শক্তিক্ষয় হচ্ছে, এখন এমন দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। অপর দিকে ঐ মায়াবীটা একা বিজন অরণ্যে আত্মগোপন করে থেকে নিশ্চয়ই প্রভূত দেহবলের অধিকারী হয়েছে, ইত্যাদি।

তাতেই আরও অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়েছিল। একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন বালী।

তিনিও একটা হিংস্র পাশবিক চিৎকার করে উঠে ওঁদের সরিয়ে, কণ্ঠলগ্ন তরুণী মেয়েটিকে শিলা কুট্টিমে আছড়ে ফেলে, দুর্গ সম্মুখস্থ বিস্তৃত মুক্ত প্রান্তরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

সঙ্গে আর কাউকে নিতে সম্মত হন নি।

সেটা বোধহয় তাঁর এতদিনের বীর্যখ্যাতির অহঙ্কারে বেধেছিল।

শুধু সুগ্রীব কোন কথাই শোনেন নি, তিনিই সঙ্গে গিয়েছিলেন।

তারা জানেন না, এটা শুধু ভ্রাতৃপ্রেম, না তাঁর কোন গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তবে সুগ্রীবের এই সহগমনটা তাঁর ভাল লাগে নি, কারণ ঠিক এই আকস্মিক ঘটনার পূর্বে তিনি সুগ্রীবের সান্নিধ্যেই ছিলেন।

সেদিন অপরাহ্নে তারাকে প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো রূপ ও রূপসজ্জায় দীপ্ত পেতে দেখে সুগ্রীব আর নিজেকে স্থির রাখতে পারেন নি! তবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল, বালীর অভিরুচি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রহরের প্রারম্ভে বালীর শয়নকক্ষে চারিটি সুনির্বাচিত তরুণীকে প্রবেশ করতে দেখে নিশ্চিত বুঝেছিলেন, সে রাত্রে তারাকে বালীর প্রয়োজন হবে না। সে সুযোগ নিতেও আর বিলম্ব করেন নি, যথাসম্ভব আত্মগোপন করে তিনি তারার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছিলেন এবং নিজের অতুলনীয় কাব্যসম্পদপূর্ণ ভাষায় তারার স্তুতিগান করছিলেন। তারা এই আগমন প্রত্যাশাই করেছিলেন, সে আভাস পেয়েছিলেন তিনি সুগ্রীবের প্রায়-উন্মত্ত চেতনাহীন দৃষ্টিতে। তিনি তাঁর রক্ত-কমলের মতো সুকোমল চরণযুগল সুগ্রীবের অঙ্কে তুলে দিয়ে মুগ্ধ মনে সেই রূপ বর্ণনার মধু পান করছিলেন। সে সময় যে এমন দানবীয় ব্যাঘাত ঘটবে, রূঢ় আঘাতে, কর্কশ ধ্বনিতে সে স্বপ্নভঙ্গ হবে—তা দুজনের একজনও আশঙ্কা করতে পারেন নি।

সেই জন্যই সুগ্রীবের এই সম্ভাব্য অজ্ঞাত বিপদের মধ্যে যাওয়াটা তাঁর আদৌ ভাল লাগে নি।

তবু তখনও, এইভাবে দীর্ঘকাল সংশয়, আশঙ্কা ও আকুলতার মধ্যে থাকতে হবে, তাও কল্পনা করতে পারেন নি।

নিশাবসানের পূর্বেই না হোক, বড়জোর প্রভাতের দুই দণ্ডকালের মধ্যে ওঁরা দুই ভাই শত্রু বধ করে ফিরে আসবেন—এমনই আশা করেছিলেন।

কিন্তু প্রভাত মধ্যাহ্নে, মধ্যাহ্ন এক সময় সন্ধ্যায় পর্যবসিত হল, আবার রাত্রি, সে রাত্রিরও অবসান ঘটল—তবু কেউই প্রত্যাগমন করলেন না। তখন উৎকণ্ঠিত মন্ত্রিগণ ও সভাসদগণ সংবাদের জন্য ব্যস্ত হলেন, চর ও কিছু কিছু সৈনিক তো প্রেরিত হলই, নিজেরাও চারিদিকের পর্বত উপত্যকা নদীতীরে অনুসন্ধান করতে

লাগলেন। সুপরিকল্পিতভাবে কে কোন্ দিকে যাবেন এবং কতদূর পর্যন্ত—তা পূর্বেই স্থির করে নিলেন, যাতে একই স্থানে বহু লোক গিয়ে অন্য স্থান একেবারেই অননুসন্ধিত না থাকে।

তবু সংবাদ পেতে আরও দু'দিন সময় লাগল এবং সে সংবাদও চিন্তা সম্পূর্ণ দূর করার মতো নয়।

আসলে প্রবীণদের অনুমানই সত্য। দুর্বৃত্ত এবার বল অপেক্ষা কৌশলের উপরই নির্ভর করেছে বেশী।

বালী দুর্গের বাহিরে আসা মাত্র সে পশ্চাদপসরণ করতে আরম্ভ করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত দ্রুতবেগে পলায়নের ভান করেছে। ক্রুদ্ধ বালী তার স্পর্ধা চিরদিনের মতো শেষ করার অভিপ্রায়ে—এটা সত্যই ভয় না ভয়ের অভিনয়, সে কথা চিন্তা না করেই অন্ধভাবে তার পশ্চাদ্ধাবন করেছেন। অকালে বিশ্রামে ব্যাঘাত করায় অপরিসীম ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, এখন এই কাপুরুষতা দেখে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

বর্বরটা দুষ্ট ক্ষতের মতো বারবার অশান্তির কারণ হচ্ছে, তাকে শল্যচিকিৎসার মতো একেবারে নির্মূল করাই শ্রেয়ঃ—এই বিবেচনাতেই তিনি অগ্রপশ্চাৎ কিছু চিন্তা না করে কোন্ দিকে যাচ্ছেন, সে বিষয়ে সচেতন না হয়ে শুধুই ধূর্ত মায়াবীর পিছনে ছুটছিলেন।

কিন্তু মায়াবীর দেহ বালী অপেক্ষা অনেক লঘু, তদুপরি তপস্যার মতো করে এইসব সম্ভাব্য ঘটনার জন্য প্রস্তুত হয়েছে এতদিন, বালী যতই নিজের বেগ দ্রুততর করুন—মায়াবী অনায়াসে ততই এগিয়ে যেতে থাকে, দু'জনের ব্যবধান কিছুতেই হ্রাস পায় না।

এইভাবে ছুটতে ছুটতে দুজনেই পর্বতে উঠেছেন এবং এক সময় এক অন্ধকার অন্তহীন গুহামুখে পেঁছেছেন। মায়াবীর এইরূপই অভিসন্ধি ছিল, সে এক সময় যেন পলকপাত-মাত্র গুহার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বালীর তখনই তার দুরভিপ্রায় অনুমান করা উচিত ছিল। রাজকার্য যে পরিচালনা করে, তার এ বিষয়ে কিছু জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা না থাকার কথা নয়, রাজনীতিতে সর্বদাই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা এবং হিসাববোধ প্রয়োজন। কিন্তু বালী তখন এই দুষ্টটার নষ্টামিতে এতই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন যে এসব কোন চিন্তাই তাঁর মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নি। ক্রোধকে এই কারণেই মানবের প্রধান শত্রু বলা হয়, ক্রুদ্ধ হলেই সর্বাগ্রে বুদ্ধিবিভ্রম ঘটে।

শুধু দৈবক্রমেই যেন, একেবারে শেষ মুহূর্তে কিছু চৈতন্য ফিরেছে। সুগ্রীবকে বলেছেন, 'তুমি এখানেই থাক, গুহামুখ পাহারা দাও, দানবটা হয়ত পাশেই কোথাও আত্মগোপন করে আছে, আমি ভিতরে গেলেই পলায়নের চেষ্টা করতে পারে। আমি ওকে বধ করে ফিরে না আসা পর্যন্ত কোথাও যেও না। কোন ওর পাপ-সহচর না পিছন থেকে আমাকে আক্রমণ করতে পারে, সে বিষয়েও সতর্ক থাকা প্রয়োজন।'

সেই অনুজ্ঞামতোই সুগ্রীব সেখানে অপেক্ষা করছেন। রাজপুরীতে এসে এ'দের সংবাদ দিতে পারেন নি।

॥ তিন ॥

তবু তখনও মায়াধর মায়াবীর চক্রান্তটা সম্পূর্ণ বোঝা যায় নি।

সুগ্রীবের প্রতীক্ষা যে এত দীর্ঘস্থায়ী হবে, তাও কেউ ভাবতে পারেন নি।

এক দিন, দুই দিন, সপ্তাহ, মাস। ঋতুও পার হয়ে গেল।

মন্ত্রীরা অন্য প্রহরী নিযুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কয়েকজন করে পর্যায়ক্রমে পাহারা দিক, বিশ্বস্ত রণকৌশলী প্রহরীই দেবেন তাঁরা—কিন্তু সুগ্রীব সম্মত হন নি বা হতে সাহস করেন নি।

বালীর যে কোন নির্দেশ অমান্য করাটা তাঁর কাছে অমার্জনীয় অপরাধ, তা সে যে কোন কারণই ঘটুক না কেন। দ্বিতীয়তঃ, যদি সত্যই তাঁর কোন বিপদ ঘটে? যদি সত্যই সুগ্রীবকে প্রয়োজন হয়? দুর্ধর্ষ ও মায়াকৌশলী মায়াবীর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাকে বধ করতে পারে একমাত্র বালী, এবং তাঁর পরই সুগ্রীব। আর কারও সাধ্য নেই।

অগত্যা প্রবীণ ব্যক্তিরা মন্ত্রণা করে বর্ষা, হিম ও রৌদ্রতাপ থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য সেখানেই বৃক্ষশাখা ও পত্রপল্লব দিয়ে একটি আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে প্রচুর ফল ও পানীয় জলের সংস্থান রেখে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। বালী ও সুগ্রীব দুজনেই অনুপস্থিত জানলে সামগ্রিকভাবে দানবদের অভ্যুত্থান অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে রাজপ্রধানদের থাকা প্রয়োজন।

শুধু স্থির রইল, একটি করে পরিচারক বা প্রহরী প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় সুগ্রীবের সংবাদ নিয়ে, কোন প্রয়োজন থাকলে, তা সরবরাহ করে যাবে।

তবু তখনও কেউ ভাবেন নি যে সুগ্রীবকে বৎসরকাল এইভাবে একা থাকতে হবে। অতন্দ্র, সদাসতর্ক প্রহরায়।

এক মাসের পর আর এক মাস, তার সঙ্গে আরও এক মাস যুক্ত হল।

ঘনাস্ত হেমন্ত শিশির। মাসের সঙ্গে মাস, ঋতুর সঙ্গে ঋতু ক্রমান্বয়ে যোগ হয়। শিশিরের পর বসন্ত, নিদাঘ, বর্ষা।

যেখানে একদিন অতিবাহিত করাই দুঃসহ, সেখানে এই দীর্ঘ অদর্শন ক্রমে তারাকে আকুল, প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে।

এধারে প্রকৃতির ঘন ঘন রূপান্তর—রূপ থেকে রূপে যেন জন্মান্তর—তাঁর বিরহব্যথাকে দ্বিগুণতর বর্ধিত করে। মনে হয়, প্রকৃতির এই সজ্জা-পরিবর্তন—এ তাঁর ভাগ্যের, বিধাতারই ষড়যন্ত্র—তাঁকে এই নিদারুণ যন্ত্রণা দেবার জন্যই। প্রকৃতি ভাগ্যেরই যন্ত্রমাত্র।

জীবনই দুর্বিষহ বিষবৎ মনে হয়। আর কিছু নয়, যদি শুধু দিনান্তে একবার সুগ্রীবের দর্শনও পেতেন!

তাঁর মুগ্ধ চোখের দর্পণে নিজের রূপলাবণ্য যৌবনের প্রতিবিম্ব দেখে আশ্বস্ত হতে পারতেন।

কিন্তু যেখানে রুমা গৃহপ্রান্তে শান্ত হয়ে অপেক্ষা করছে, সেখানে তাঁর সুগ্রীবকে দেখতে যাওয়া যে বড়ই দৃষ্টিকটু হয়।

যত এসব চিন্তা করেন, ততই একটা দৈহিক জ্বালা অনুভূত হয়। রুমা কেন এত নির্বিকার, এ প্রশ্নও মনে জাগে বৈকি। হয়ত এতদিনে সে বালীর প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। সে বালীর জন্যই উৎকণ্ঠিত বেশী। অথবা সুগ্রীবের মন কোথায় আবদ্ধ তা বুঝে তাঁর সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়েছে।

ঐ মেয়েটাকেও যদি বালীর সঙ্গে ঐ অন্ধ, মৃত্যু বিভীষিকাময় গুহায় পাঠানো যেত তো বেশ হত। সুগ্রীব ফিরে এলে তাঁদের মিলন চক্ষুলজ্জার বাধাশূন্য হত।

ঘরেও থাকতে পারেন না, বাহিরের মুক্ত অলিন্দে বা ছাদে এসে দাঁড়ালেও যেন বিশ্বসুদ্ধ তাঁর শত্রু, এই কথাটাই বেশী করে মনে পড়ে।

আশ্চর্য, এত কাল এই অলিন্দ, দুর্গ-প্রাকার, দুর্গের সর্বোচ্চ স্থান থেকে চারিদিকের বহুদূরব্যাপী বন, পর্বত, নদীর শোভা নিরীক্ষণ করেছেন, তা সুন্দর বোধ করেছেন, কিন্তু তা যে এত কামোদ্দীপক, এমন তো কখনও মনে হয় নি।

বিশেষ এই বর্ষায়—সমস্ত পৃথিবী যেন প্রিয়-মিলন-প্রত্যাশায় অধীর উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

ঐ দূরে প্রস্রবণগিরি, সহজেই এখান থেকে মেঘবর্ণ মনে হয়, এখন নীল নীরদ ঘনীভূত হয়ে সে বর্ণ আরও নিবিড়, আরও নীলাভ হয়ে উঠেছে। আর তারই ছায়ান্ধকারে গিরিশৃঙ্গের গহন অরণ্যও মেঘলোকের মতো প্রতীয়মান হচ্ছে—ছায়াতে-মেঘেতে, নীলে-সবুজে একাকার হয়ে গেছে। ঐ ঋষ্যমূক, অপেক্ষাকৃত নিকটে কিন্তু তৎসত্ত্বেও কম স্বপ্নময়, কম মেঘমেদুর ছায়ানিবিড় নয়।

এমন কি পর্বত অরণ্যে সিংহ, ভল্লুক, শার্দূল প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পশুদের গর্জনও যেন মধুর মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে এও প্রিয়মিলন আবাহনই। দূর বনান্ত থেকে ভেসে আসা গম্ভীর কেকাধ্বনি, মৃদু মৃদু মেঘগর্জন সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গত বলে বোধ হচ্ছে—মধুময়, কামনা-উদ্দীপক!

দূরদৃষ্ট পর্বতগুলিতে বিক্ষিপ্ত বা অঙ্গীভূত ধাতুময় শিলাগুলি বিভিন্ন ধাতুর বর্ণে শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। মনে হয়, যেন শ্যামবর্ণ দয়িতের কণ্ঠে বিবিধ মহামূল্য রত্নহার।

কিন্তু শুধুই কি মণিহার? প্রকৃতি সেই সঙ্গে পুষ্পমাল্যেরও কি আয়োজন করেন নি? মালতী, কুন্দ, সিন্ধুবার*, শিরীষ, কদম্ব, শর্জ বা শাল, কেতকী; হীরকোজ্জ্বল উপলাহত নির্ঝরিণীসমূহের দুই কূলে চন্দন, তিলক, অতিমুক্ত, সরল, অশোক, বকুল, হিন্তাল, তিনিস, বেতস, কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষগুলিও যেন

* শ্বেত নিশিন্দা।

পুষ্প প্রসবের আশায় মদনরঙ্গে মেতে উঠেছে। নদীগুলি চলেছে সাগরের অভিসারে, নদীতীরও যেন চক্রবাক, ক্রৌঞ্চমিথুনদের মৈথুনশ্রান্তি অপনোদনের জন্য পদ্ম ও কুমুদ-কলিকার মধুপাত্র সাজিয়ে বসে আছে।

সর্বত্রই প্রকৃতির এই এক ইঙ্গিত।

মেঘগুলিও মেঘ নয়, তারা যেন সূর্যরশ্মির মিলনে সমুদ্রবীর্য গ্রহণ করে এতকাল গর্ভভার বহন করছিল, এখন শস্যক্ষেত্রে জল প্রসব করছে। আবার মনে হয়, ঐ নদীসকল মেঘরূপ সোপান বেয়ে উঠে পর্বতশীর্ষ থেকে কুটজ কুসুম-মাল্যে সূর্যকে বরণ করছে। সন্ধ্যামেঘের পাণ্ডু-পীতবর্ণ কি স্নিগ্ধ চন্দনপঙ্ক? সূর্যের কামজ্বালা নিবারণ করছে অথবা তাঁকে রাত্রির অভিসারের জন্য সজ্জিত করছে?

আকাশকেও আজ বিরহী বোধ হচ্ছে, মৃদুল বায়ু তার দীর্ঘশ্বাস, জলকণাগুলি বেদনাবাষ্প।

তারার মনে হয়, এই বিরহব্যথাই বুঝি কাব্যের জনক, নইলে প্রকৃতির এ রূপ তো এমনভাবে তাঁর দৃষ্টিতে পড়ে নি ইতিপূর্বে! কে জানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার অতৃপ্ত তৃষ্ণাতেই সুগ্রীবের মুখ থেকে অত সুন্দর কাব্যধর্মী ভাষা নিঃসৃত হত কিনা!

বালীর আশা সকলেই ত্যাগ করেছেন, কেবল তাঁর অনুজ সুগ্রীব ছাড়া।

তিনি জ্যেষ্ঠের নির্দেশ পিতার আদেশের মতোই শিরোধার্য করে এখনও সেই গুহামুখে প্রহরায় নিযুক্ত আছেন।

মন্ত্রী ও সুহৃদরা চিন্তিত। চিন্তিত দেশ ও রাজ্যের কথা চিন্তা করে।

তাঁরা বোঝান, এত কাল কোন প্রাণী বিনা খাদ্যে জীবিত থাকতে পারে না। বালী দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ী হলে তো এই পথেই বেরিয়ে আসতেন। হয়তো অন্ধকার অজ্ঞাত জটিল পথচক্রে ক্রমাগত আবর্তিত হতে হতে শ্রান্তিতে হতাশায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন—দানবদের পৈশুন্য তো সর্বজনবিদিত, এত দিন ধরে এই জন্যই প্রস্তুত হয়েছে, বালীর সঙ্গে সরল যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না জেনেই এই কৌশল অবলম্বন করেছে।

সে পরাজিত হলে বালী নিশ্চয়ই বৃথা গুহামধ্যে কালক্ষেপ করতেন না। ঐ পাপিষ্ঠটা এখানে সুগ্রীব ও অন্যান্য বীরগণ আছে জেনেই অন্য কোন পথে পলায়ন করেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বালী বিগত হয়েছেন জেনেই ওঁদের তদনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। রাজ্য অধিককাল শাসকশূন্য থাকলে বহু-বিধ বিপদের সম্ভাবনা। বিজিত আদিম অধিবাসীরা প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টায় চঞ্চল হয়ে উঠবে, ওঁদের নিজেদের মধ্যেও শক্তি গ্রহণের জন্য লোলুপতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেবে, তা থেকে অন্তর্দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী।

সুতরাং অবিলম্বে সর্ববাদীসম্মত, বিধিমতো একজন শাসক বরণ কর্তব্য। কুমার অঙ্গদ বালক মাত্র, তার বুদ্ধি পরিপক্ব হয় নি, অভিজ্ঞতার অবসর পায় নি।

পিতার প্রশয়ে লালিত—রাজনীতির জটিলতা ও কুটিলতা—কিছুই অবগত নয় সে। এক্ষেত্রে, সকল দিক বিবেচনা করে পূর্বতা অনুযায়ী সুগ্রীবেরই অবিলম্বে শাসনভার গ্রহণ করা কর্তব্য। তাঁর যদি এ বিষয়ে কোন বিবেকের বাধা থাকে, তাহলে তিনি স্বীয় শাসনভার গ্রহণ অনুষ্ঠানের সঙ্গেই অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন, পরবর্তীকালের জন্য তার অধিকার সর্বসমক্ষে স্বীকার করে নিন।

কথাগুলি যুক্তিযুক্ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তত্রাচ সুগ্রীব ক্রমাগত কালহরণ করছিলেন, দীর্ঘকাল সময় নিয়েছিলেন প্রধানদের এই সকল যুক্তি ও প্রস্তাব বিবেচনা করতে।

তার কারণ এরা ঠিক বুঝবে না, তিনি যতটা বুঝছেন।

বালীর বলবীর্য এবং ক্রোধ দুটোরই পরিমাণ সুগ্রীব বিলক্ষণ অবগত আছেন।

বালী এত সহজে নিহত হবেন, তা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না ওঁর।

মায়াবী হয়ত কোন কৌশলে ওঁকে আবদ্ধ রেখেছে, অথবা অপর কোন বহিঃপথ দিয়ে পলায়নের চেষ্টা করেছে, বালীও তার পশ্চাদ্ধাবন করেছেন। এইভাবে ছলনার সাহায্যে গহন অরণ্য বা পর্বত-জটিলতার মধ্যে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। একদিন না একদিন মায়াবীকে বধ করে বালী ফিরে আসবেন, আর সেদিন কোন যুক্তি বা কারণ বুঝতে চাইবেন না। সুগ্রীব তাঁর আদেশ পালন করে নি, এইটেই সর্ববৃহৎ অপরাধ গণ্য হবে এবং ওঁর লাঞ্ছনার অবধি থাকবে না। আজ যাঁরা তাঁকে এইসব উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁদের কাউকেই সে সর্বধ্বংসী রোষবহ্নির সম্মুখে পড়তে হবে না।

এইসব প্রশ্নই এ সমস্যা সমাধানের বিপুল বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

বালীকে এঁরা কেউ এত চেনেন না, সুগ্রীব যতটা চিনেছেন।

এই সময়েই তারা একটা বিরাট ভুল করে বসলেন। বোধ করি তা স্বাভাবিকও।

মানুষের কাম বা কামনা যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে, তখন সে অন্ধ হয়ে যায়—নিজের শুভাশুভ চিন্তা করার শক্তি বা ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে।

তারারও সেই অবস্থা তখন। বৃদ্ধ মন্ত্রীদের বুদ্ধি যা করতে সক্ষম হয় নি, হয়ত তাঁর রূপলাবণ্য সে উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে—এই আশা ও বিশ্বাসেই তিনি এক দুরূহ ও দুঃসাহসিক কর্মে ব্রতী হলেন।

একদা সূর্যাস্তের পর প্রহরীদের অজ্ঞাতে দুর্গপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে তিনি বনপথ অবলম্বন করলেন এবং জব অর্থাৎ দ্রুতবেগ অবলম্বনে হরিণীর মতো লঘুপদে মধ্যরাত্রের পূর্বেই সেই গুহামুখে পৌঁছে গেলেন।

এর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন গত কয়েকদিন থেকেই। তাঁর কয়েকটি বিশ্বস্ত বেতনভুক পুরুষ চর ছিল (স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নেই, কোন কথা গোপন রাখতে জানে না), তাদের পাঠিয়ে শুষ্ক মৃত্তিকার পটে ঐ গুহা অবধি যাওয়ার পথের একটা রেখাচিত্র খোদিত করিয়ে নিয়েছিলেন, সেই পট নিয়ে একান্তে উপরের প্রাসাদচূড়া থেকে যতদূর দৃষ্টি যায় সেই চিত্রের সঙ্গে পথ—দুদিকের বনস্পতি-

গুলিকেই চিহ্ন রাখা হয়েছিল, চেনার অসুবিধা না হয় সেই জন্য,—মিলিয়ে নিয়েছিলেন। অতঃপর প্রহরীদের আসবের সঙ্গে দুই তিন বিন্দু ধুতুরার রস মিশিয়ে তাদের অচৈতন্য রাখার ব্যবস্থাতেও ত্রুটি হয় নি। ওরা চার প্রহর অতিক্রান্ত হবার পূর্বে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে না।

আয়োজনে কোন ত্রুটি হয় নি, সবই হিসাবমতো চলেছিল।

ত্রুটি ছিল বিচারবুদ্ধিতে। উনিও পরিণামের কথা চিন্তা করেন নি, সুগ্রীবকেও করতে দেন নি।

অথচ ওঁরা উভয়েই বালীকে সম্যক চিনতেন।

তারার অনুমানও অভ্রান্ত।

অবগুণ্ঠনবতী সামান্য দাসীর বহির্বাসে বল্কলের একটা আচ্ছাদনমাত্রে সজ্জিতা তারা, সুগ্রীবের সম্মুখে অত রাত্রে অন্ধকার নিশীথে প্রেতিনীর মতো গিয়ে উপস্থিত হতে সুগ্রীব অবশ্যই চমকিত হয়েছিলেন, কিন্তু সে বহির্বাস উন্মোচন করে স্বমূর্তিতে প্রকাশিত হতে একেবারে হতচকিত বিহ্বল হয়ে গেলেন। হিংস্র জন্তুর আশঙ্কায় প্রতি রাত্রেই সুগ্রীবের পর্ণ কুটিরের সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, অপরাহ্নে যে প্রহরী আসে খাদ্য পানীয় নিয়ে, সে-ই সে অগ্নি জেলে রেখে যায়, পাশে বিস্তর শুষ্ক কাষ্ঠ থাকে, সময়ে সময়ে স্তিমিতপ্রায় বহ্নিতে ইন্ধন দিয়ে পুনঃপ্রদীপ্ত করে নিতে হয়। সেইরূপ নব প্রজ্বলন্ত আলোকেই যে মূর্তি চোখে পড়ল, তা অন্ততঃ এখানে দ্বিপ্রহর রাত্রে এই ভয়াবহ পরিবেশে দেখার কথা কল্পনাও করেন নি।

এ যেন এক স্বপ্নদৃষ্টা দেবকন্যা, এই অপরূপ নারীমূর্তি। এ যেন পুষ্পদল দিয়ে গড়া, পীতাভ পদ্মদল দিয়ে কিংবা মধুখে নির্মিত দেবশিল্পীর ক্ষোদিত মূর্তি, মূর্তিও নয়, শিল্পীর মহত্তম কল্পনা মেঘ থেকে মূর্তি গ্রহণ করেছে। এ যেন কোন নারীর আগমন নয়—যেন দেবীরই আবির্ভাব। অগ্নির আলোক পর্যাপ্ত নয়, তাও কম্পমান—যেন এই বরনারীর আবির্ভাবেই কাষ্ঠের অগ্নিই উজ্জ্বলতর দীপ্ততর হয়ে উঠল, আর তাতেই যা দেখলেন, তাতে দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ রইল। চোখও ফেরাতে পারলেন না, কণ্ঠ ভেদ করে কোন স্বরও প্রকাশ পেল না।

এর পর আর সুগ্রীবের কি করার থাকতে পারে এই দেবীর আদেশ পালন করা ছাড়া! আদেশই—তারার অনুরোধ তাঁর কাছে অলঙ্ঘ্য আদেশ।

অবশ্য সেইদিন অপরাহ্নে আরও একটি ঘটনা ঘটে গেছে।

বিস্ময়কর, ভীতিপ্রদ।

সুগ্রীবের মনে হল, এই দেবকন্যার আবির্ভাব ও উক্ত ঘটনা দৈব-নির্দেশ, ভাগ্যের অঙ্গুলিসঙ্কেত।

সৌভাগ্য কখনও কখনও অযাচিতভাবে সম্মুখে আসে—প্রার্থিত বা আকাঙ্ক্ষিত দুর্লভ বর নিয়ে, তখন তাকে প্রত্যাখ্যান করলে ভাগ্যদেবতা বিমুখ হন। সুযোগ বারবার আসে না জীবনে।

সে সময় অবিরাম প্রহরারত ক্লান্ত বিরক্ত উদ্বিগ্ন সুগ্রীব তাঁর অভ্যস্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর বসে বোধ করি ঈষৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

অকস্মাৎ একটা পাশবিক, না পৈশাচিক চিৎকারে সে তন্দ্রার আলস্য বিদূরিত হল, নিমেষে গদাহস্তে উঠে দাঁড়ালেন।

উল্লাস নয়—বরং কতকটা আর্তনাদের মতো। বিশাল কোন প্রাণীর মরণ আর্তনাদ?

সেই বিভীষিকাময় ধ্বনি, অমানুষিক একটা প্রচণ্ড শব্দ—মনে হল যেন চতুর্দিকের স্থির বায়ুমণ্ডল, শূন্যতা ও পর্বতশিখরসমূহে প্রতিহত, প্রতিধ্বনিত হয়ে তাকে অধিকতর ভয়াবহ করে তুলল। শুধু অজানা কোন ভয় নয়—অশুভ কোন ঘটনার আভাস বলেই বোধ হল সেই অবর্ণনীয় কদর্য শব্দটা। কল্পনাতীত অভূতপূর্ব কোন অমঙ্গলের বার্তা বহন করে আনল—প্রলয়কালে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুভয়ার্ত বহু জীবের মিলিত আর্তনাদের মতো।

এমনিতেই সর্বাঙ্গ প্রস্তরবৎ অনড় ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাওয়ার কথা। সুগ্রীবও প্রস্তরীভূতই হয়ে গিয়েছিলেন কতকটা। কিছু করার শক্তি নেই, করণীয় কিছু আছে কিনা, তা চিন্তা করারও না।

শুধুই বিহ্বলভাবে শূন্য দৃষ্টিতে গুহামুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, কারণ মনে হয়েছিল, শব্দটা ওর ভিতর থেকেই এসেছে। সেই জন্যই, গুহার বিশাল শূন্য গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হওয়ার ফলেই তা এত তীব্র তীক্ষ্ণ ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে চোখ ফেরাতেও সাহস হচ্ছিল না তাই। যদি কোন বিশাল প্রাণী এখনই ঐ স্থান থেকে এসে অতর্কিতে তাঁকে আক্রমণ করে!

অবশ্য তেমন কিছু ঘটে নি, তবে যা ঘটেছিল, তাও কম বিস্ময়-উদ্দীপক, কম ভীতি-সঞ্চারক নয়।

সেই বিকট আর্তনাদের প্রতিধ্বনি ভাল করে না মেলাতেই দেখা গেল, সেই বিবরের মুখ থেকে প্রচুর রুধির নিঃসৃত হচ্ছে, প্রায় সদ্য জন্মলব্ধ নির্ঝরিণীর মতোই স্রোতধারা রচনা করে—এত প্রচুর রক্ত।

আবারও পাষাণে পরিণত হলেন সুগ্রীব।

এ কার রক্ত?

মানুষের, না কোন জন্তুর?

একই প্রাণী, না একাধিক?

কোন মানুষের হলে কার—বালীর না মায়াবীর?

কোন মানুষের দেহে এই পরিমাণ রক্ত থাকা সম্ভব?

এমনি নানা প্রশ্ন একই সঙ্গে মাথা তুলল মনের মধ্যে।

অবশ্য, পরক্ষণেই মনে হল, বালী বা মায়াবী কেউই সাধারণ মানুষ নয়। যেমন বিরাট তাঁদের শক্তি, তেমনই বিপুল দেহ। সে দেহে শোণিতের পরিমাণ কম থাকার কথা নয়।

আবার সন্দেহ দেখা দিল—প্রথম ভয়ার্ত বিস্ময়ের জড়তা কেটে গেছে ততক্ষণে

—এ যা দেখছেন রক্তই তো, না অন্য কোন প্রকার রক্তবর্ণ তরল পদার্থ ? রঙ্গীন জল ? মায়াবীটা ইন্দ্রজালে পটু, ওঁকে প্রতারিত করারই কোন আয়োজন নয় তো এটা ?

কথঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে গিয়েছেন সুগ্রীব। স্পর্শও করেছেন।

তখনও উষ্ণ, শোণিত যে তাতেও সন্দেহ নেই।

তখন থেকেই এমনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে আছেন।

কী করবেন কী করা উচিত ? আরও বহু লোক ডেকে এনে, সকলে মিলে ভিতরে প্রবেশ করবেন ? না, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করবেন ?

এমনি নানা পরস্পর-বিরোধী চিন্তা তাঁর বুদ্ধিকে যেন আচ্ছন্ন করে দিয়েছে, কিছু ভাল করে ভাবতেও পারছেন না।

রাত্রি প্রভাতে কোন প্রহরী বা দাস আসবে খাদ্য, বস্ত্র, পানীয় নিয়ে। অন্য কোন প্রয়োজন বা আদেশ থাকলে—তাও জানতে। তাকে দিয়ে অবশ্যই রাজ্য-প্রধানদের ডেকে পাঠাবেন। তারাও তখনই আসবে।

কিন্তু তার পর ?

ঐ বিপুল রহস্যময় অন্ধকার—হয়ত বা নানা প্রাণঘাতী বিপদের জাল বিস্তার করা—হয়ত ওর মধ্যে অসংখ্য অন্তহীন শাখাপথে মৃত্যুর নানাবিধ উপায় সজ্জিত রেখেছে দানবটা।

গুহামুখ সংকীর্ণ, ভিতরেও যতদূর দৃষ্টি চলে, অনুচ্চ অপ্রশস্ত পথ, একসঙ্গে বহু ব্যক্তি দূরের কথা, দুই ব্যক্তির পাশাপাশি চলাও অসম্ভব। একে একে প্রবেশ করলে, কিছুদূর যাওয়ার পর যদি একে একেই হত্যা করতে থাকে ? কে জানে, মায়াবী তার কিছু অনুচর বা সহচর রেখেছে কিনা, কিংবা কিছু হিংস্র পশুদের অভুক্ত রেখে ক্রুদ্ধ ও হিংস্রতর করে রেখেছে—এঁদের কিছু লোক ভিতরে প্রবেশ করলে, সেই প্রায়-উন্মত্ত শ্বাপদদের বন্ধনমুক্ত করবে, তারাও ক্ষুধার তাড়নায় নিমেষে এদের নিঃশেষ করবে।

এইসবই চিন্তা করছেন, অবিরাম নিজের প্রস্তাব নিজেই বিরুদ্ধ যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করছেন—এমন সময়, যেন এই ছায়া থেকে কায়া গ্রহণ করা অপরূপা ছায়ারূপিণী, যেন চারিদিকের খণ্ড মেঘাচ্ছন্ন জ্যোৎস্না থেকে মূর্তি পরিগ্রহ করে এক দেবীমূর্তির আবির্ভাব ঘটল।

অতঃপর সুগ্রীবের যদি মনে হয়, তাঁর এই জীবনমরণসমস্যার সমাধান করতে, তাঁর বর্তমান-ভবিষ্যতের সংখ্যাহীন গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে স্বয়ং বিধাতা পরিচিত নারীমূর্তিরূপে জনৈকা দেবদূতীকেই পাঠিয়েছেন —খুব দোষ দেওয়া যায় না।

এবং সত্যই সেই দেবদূতী বা দেবীর মতোই তারা এইসব সমস্যা-জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করে দিলেনও তো !

তারা জানতেন—তিনি বৃথাই এতকাল রাজকার্যের মধ্যে বাস করেন নি, রাজার প্রধানা ঘরণীরূপে—মানুষ যখন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে

ব্যাকুলভাবে তার সমাধানের উপায় খোঁজে, তখন সম্ভাব্য সব উপায় তার মস্তিষ্কেই দেখা দেয়, নিজেই আবার সে পথের অন্ধকার দিক, বিপজ্জনক দিকের কথা চিন্তা করে হতাশ হয়ে পড়ে, অন্য উপায় অবলম্বনে চেষ্টা করে। ঘটনার যে পরিণাম তার পক্ষে লাভজনক, সেই দিকেই মন ঝোঁকে, কিন্তু সে পথে যেতে সাহসে কুলোয় না, চক্ষুলজ্জা বা বিবেকও বাধা দেয়। এইভাবে নিজেই বৃহত্তর জটিলতার সৃষ্টি করে।

সেই সময় অপর কেউ যদি কণ্ঠস্বরে অতিরিক্ত দৃঢ়তা এনে কোন একটি বিশেষ উপায়ের ওপর জোর দেয়, সমস্যার্ত মানুষটির সুবিধাজনক হলে তো কথাই নেই, তখন বিহ্বল বিমূঢ় ব্যক্তিটি সেই পথই গ্রহণ করে, নিশ্চিন্ত হয়। ভাবে, এর দায়িত্বটা ঐ বক্তার উপরই ন্যস্ত করল সে। এমন কথা ভাবে না বা ভাবতে চায় না যে আসল দায়িত্বটা তারই থেকে গেল।

তারা এসব মানব-মনোধর্ম অবগত ছিলেন, সুগ্রীবের মনোভাবও।

আরও নিকটে এসে নিজের অঞ্চলে ওঁর ললাটের ঘর্ম মুছে নিয়ে, ওঁর স্কন্ধে সমস্ত ভার ন্যস্ত করে যেন এলিয়ে পড়ে মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'এ বালীরই রক্ত, তুমি যা দেখেছ। যদি মায়াবীর হত, এতক্ষণে দুই প্রহর প্রায় অতীত হয়ে গেল, বিজয়ী বালী কি গুহা থেকে বেরিয়ে আসতেন না? শব্দের উৎপত্তি-স্থান নিকটবর্তী না হলে এত উচ্চ ও বিকট শোনাত না। যারই মরণ আর্তনাদ হোক—সে মৃত্যু নিকটেই কোথাও ঘটেছে। মহাবল বালীই নিহত হয়েছেন। পাপিষ্ঠ মায়াবী তোমার কাছে লাঞ্ছিত হবার আশঙ্কায় আত্মপ্রকাশ করতে সাহস করছে না। অথবা, অপেক্ষা করছে, তোমরা বালীর দেহ উদ্ধারের জন্য একে একে ভিতরে প্রবেশ করলে, সেও একে একে তোমাদের বধ করবে। ও চেষ্টাতে প্রয়োজন নেই, বরং রাত্রি প্রভাতে কিছু শ্রমিক বা সৈনিক ডেকে গুহামুখ ভাল করে বন্ধ করে দাও 'পাপিষ্ঠটা অনাহারে মরুক।'

তারপর সুগ্রীবের ঊর্ধ্বোত্থিত গ্রীবা ধরে তাঁর দৃষ্টিতে নিজের স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যেন ধীরে ধীরে, শুধু শ্রুতিগম্য নয়—বিশেষ অর্থবহ বক্তব্যকে বুদ্ধিগম্য করে বললেন, 'দেখে, বিবেচনার দ্বারা নির্বাচন করে, বিশাল ও গুরুভার প্রস্তরখণ্ড এনে গুহামুখের সম্মুখে এক কৃত্রিম ক্ষুদ্র পর্বত রচনা করাই শ্রেয়ঃ— যাতে মায়াবীটা, কোনোমতেই না তা সরিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। সেও কম বলশালী নয়, সেই বুঝে গুহামুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করো।'

বিশেষ ব্যক্তির মোহময় দৃষ্টির বিশেষ চাহনি ও কণ্ঠস্বরের বিশেষ বক্রতার সম্যক অর্থ অবশ্যই যথাস্থানে পৌঁছেছিল, নচেৎ আবারও প্রায় এক লহমার মধ্যে সুগ্রীবের ললাট স্বেদার্দ্র হয়ে উঠবে কেন, তাঁর দৃষ্টিই বা অমন করুণ অসহায় দেখাবে কেন?

এটা সাধারণ চিত্তদৌর্বল্য বা বিবেকের পীড়া—তা বুঝতে তীক্ষ্ম বুদ্ধিমতী তারার বিলম্ব হল না। তেমনি সুগ্রীবের বৃহত্তর দুর্বলতা কোথায় তাও জানা ছিল তিনি এক মদির কটাক্ষ নিক্ষেপ করে, আবারও অঞ্চলপ্রান্ত দিয়ে সদ্য-প্রকাশিত

স্বেদ মোচন করে, খুব লঘুভাবে সেই তখনও-আর্দ্র ললাটে একটি চুম্বন করে—প্রায় চোখের পলকেই আবার দাসীর বহির্বাস তুলে নিয়ে ত্বরিত গতিতে অদৃশ্য হলেন।

বনস্থলীর অস্পষ্ট আলোক ও নিবিড় ছায়া থেকে পরিগৃহীত মূর্তি পুনশ্চ যেন ছায়াতেই মিলিয়ে গেল।

।। চার ।।

প্রথমটা অস্বস্তি বোধ করলেও সুগ্রীব শেষ অবধি তারার প্রতি কৃতজ্ঞতাই অনুভব করেছিলেন। তাঁর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হতেও কোন বাধা হয় নি। মায়াবীর পুনরাগমনের সম্ভাবনা উল্লেখ করা মাত্র শঙ্কিত অমাত্যের দল প্রস্তর-স্তূপ রচনার প্রস্তাবেই পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং বহু শ্রমিক নিয়োগে দূর দূরান্ত থেকে বিশাল বিশাল প্রস্তর খণ্ড আনয়নেও ত্রুটি ঘটে নি।

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহও তারার অনুমান-অনুযায়ীই চলছিল। ঠিক অভিষিক্ত না হলেও সুগ্রীবই শাসকের পদ গ্রহণ করেছিলেন এবং তৎকালীন রীতি অনুযায়ী পদাধিকার-বলে পূর্ব শাসকের রমণীগুলিও। আর তার মধ্যে তারাই যে অগ্রগণ্যা হয়ে উঠবেন, সে বিষয়েই বা সন্দেহ কি! বালীর প্রতি সম্মান ও তারার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্যই তো তাঁকে অগ্রাধিকার দেওয়া কর্তব্য।

এতদিনের কামনা কল্পনা পূর্ণ হয়েছে, সকল দিকেই শান্তি। সুগ্রীব মুখে কিছু না বললেও তাঁর আচরণ ও দৃষ্টিতে প্রেম ও কৃতজ্ঞতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা নিজের বুদ্ধির প্রশংসা করছেন মনে মনে—এমন সময় যেন এক মহাপ্রলয় ঘটে গেল তাঁদের জীবনের উপর দিয়ে।

অকস্মাৎ জীবিত ও সুস্থ বালী সেই পর্বত-সদৃশ প্রস্তর বাধা অপসারিত করে নিজের রাজ্য ও রাজধানীতে এসে উপস্থিত হলেন।

অতঃপর সিংহাসন ও তাঁর রমণীগুলিকে সুগ্রীবের কুক্ষিগত দেখে স্বভাব-কোপন বালীর মুখভাব যে খুব প্রসন্ন বা উদার দেখাবে না—তা সহজেই অনুমেয়।

তাঁর সেই ভয়ঙ্কর মুখ-চোখের ভাব দেখে রাজ্য-প্রধানদেরও বক্ষে শঙ্কা জাগল। এবং সে শঙ্কার সঙ্গত কারণও ছিল।

এটাকে যদি বালী বিশ্বাসঘাতকতা ও তাঁকে অপসারণের ষড়যন্ত্র বলে মনে করেন তো তাঁকে খুব দোষ দেওয়াও যায় না।

কিন্তু রাজ্যপ্রধান বা মন্ত্রীগণ কেবলমাত্র আশঙ্কায় নয়—অপরিমাণ বিস্ময়েও বিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

এবং প্রত্যক্ষ প্রাণভয়ও তাঁদের সে বিহ্বলতা অপনোদন ক'রে আশু কোন প্রতিকারে প্রণোদিত করতে পারল না।

বিস্ময়। বিস্ময়। বিস্ময় আর অবিশ্বাস।

নিজেদের দৃষ্টিকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

দানবরাই ইন্দ্রজালে পটু ও পারদর্শী এই তাঁরা জানতেন। বালী কি তাদের অপেক্ষাও মায়াধর ?

না কি এ বালীর প্রেতাত্মা !

অথচ বালী-মায়াবী সংঘর্ষের ও বালীর পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস খুব সরল ও সংক্ষিপ্ত।

মায়াবী গুহার ভিতরকার জায়গা ও গুপ্ত পথের জটিলতার উপর নির্ভর করেই নিশ্চিন্ত হয় নি, কিছু কিছু বিশ্বস্ত ও বলশালী দানবও পূর্ব হতে প্রস্তুত রেখেছিল। তারা সাগ্রহেই এসেছে—কারণ বালী জীবিত থাকতে তাদের শ্রেয়ঃ নেই তা তারা জানত।

প্রথম যুদ্ধে তাদের কয়েকজনকে সাংঘাতিক প্রহারে প্রায় মুমূর্ষু করে ফেলাতে তারা ওঁর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধের আশা পরিত্যাগ করে গুহার মধ্যে বালীকে পথভ্রষ্ট করিয়ে অনাহারে মারবে—এই আশার উপর ভরসা করেছিল। বলের থেকে কৌশল বেশী কার্যকর হবে—এই রকমই ভেবেছিল।

কিন্তু বালী দৈবক্রমে প্রথম দিকেই ওদের খাদ্যভাণ্ডারে গিয়ে পড়েছিলেন। হয়ত এ ব্যবস্থা অন্য অন্য স্থানেও কিছু কিছু ছিল। নতুবা দানবরাই বা এতকাল, এক বর্ষেরও অধিক, এখন যা শুনছেন জীবিত থাকবে কি ভাবে ? কিন্তু সঞ্চয়ের বিপুলতা দেখে বুঝেছিলেন ঐ ভাণ্ডারটিই প্রধান। তিনি নিজে ওদের অনুসন্ধানের চেষ্টা না করে সেই ভাণ্ডারের প্রবেশ-পথেই অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সেখানে সূচীভেদ্য অন্ধকার। দিনও নেই, রাত্রিও নেই, আছে অন্তহীন প্রতীক্ষা। সময়ের হিসাব রাখা সম্ভব নয়, কতকাল কেটেছে তাও বুঝতে পারেন নি। এমন কি কোন্ দিক থেকে এসেছেন, সেদিকে যেতে গেলে কোন্ দিকে মুখ করে যেতে হবে, ক্রমে তাও ধারণার অতীত হয়ে গেল।

আহার্যের ঘ্রাণে দিক নির্ণয় করে ভাণ্ডারের মধ্যে এসে পড়েছিলেন হাত দিয়ে দিয়ে অনুভব করে সেগুলির অস্তিত্ব, বিপুলতা ও স্থিতিস্থান বুঝেছিলেন। কিছু-দূরে ক্ষীণ জলধারা পতনের শব্দে নির্ঝারিণীর অস্তিত্ব জেনে সেখানে গিয়ে জল পান করতেন, কখনও কখনও স্নানের চেষ্টাও করেছেন। ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে দৃষ্টি অভ্যস্ত হতে ভাণ্ডারের মুখ পর্যন্ত যেতে পারতেন, সেখান থেকে প্রধান পথের একটা দিক নির্ণয়ও হত।

মায়াবী তাঁকে সে স্থান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাবার বহু চেষ্টা করেছে, নানাবিধ ছলনার আশ্রয় নিয়েছে। এমন কি সুগ্রীবের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে করুণ আর্তনাদ করেছে—কিন্তু বালী এই ধরনের ছলনার জন্য প্রস্তুতই ছিলেন বলে প্রতারিত হন নি।

অবশেষে, সম্ভবতঃ উপবাসের জ্বালা সহ্য করতে না পেরেই মায়াবী সদলবলে সেই ভাণ্ডার দ্বারে হানা দেয়। সুগ্রীব যে বিকট শব্দ শুনেছেন তা মায়াবীরই

মরণ-আর্তনাদ। মায়াবীর দেহ বিশাল, তার কণ্ঠস্বরও তেমনি কর্কশ ও উচ্চ-গ্রামের, তাতেই এই ধরনের শব্দ হয়েছে। রুধিরও সেই দানবটারই।

কিন্তু তাকে বধ করেই অব্যাহতি পান নি বালী। অবশিষ্ট যে কয়েকজন পাপ-সহচর ছিল দুর্বৃত্তটার তারা একাধারে ক্রুদ্ধ ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে, ওঁকে ঘিরে ধরেছে। অন্ধকার সঙ্কীর্ণ গুহাপথে এতগুলি লোকের সঙ্গে মাত্র বাহুবলে যুদ্ধ করা শুধু অসম নয়, অসুবিধাজনকও, তারা মায়াকৌশল বা ছলনায় সিদ্ধহস্ত, সেভাবে বালীকে বিপন্ন করার অনেক চেষ্টা করেছে—সেই জন্যই আরও কয়েকদিন বিলম্ব হয়েছে তাঁর—সম্ভবতঃ তাদের সব কজনকেই বধ করতে। আর কেউ আছে কিনা তিনি জানেন না, থাকলেও সে প্রাণ-ভয়ে কোথাও আত্মগোপন করে আছে।

অবশেষে—অনেকখানি নিরাপদ হবার পর গুহামুখের আলোক দেখে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার চেষ্টা করবেন, সে আলোকের কোন চিহ্ন কোথাও দেখতে পান নি। এতদিন অন্ধকারে থেকে দিনের সমস্ত স্মৃতি মন থেকে মুছে গিয়েছে। তাঁকে ঐ গলিত শব-দেহের মধ্যেই পড়ে একদা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হত—যদি না শেষ অবধি দৈব কৃপা করতেন। ওঁর হস্তে নিগৃহীত দানবদের মধ্যে একজনের তখনও প্রাণ ছিল, সে কোন মতে বুকে ভর দিয়েই নিঃশব্দে গুহামুখের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, তবু সেই বদ্ধস্থানে অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে শূন্যে কোন বস্তু আন্দোলনেরও শব্দ ওঠে একপ্রকার। বালী ওর গতির শব্দ পাবেন বৈকি! বালীর মনে হল তার তখনও দিক সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা আছে। ওকে অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ।

এও দৈবকৃপা। বালীর মনে ও মস্তিষ্কে ক্রোধেরই প্রাধান্য সমধিক। উন্মত্ত ক্রোধ। কিন্তু কে জানে কেন, বোধ করি শোচনীয় মৃত্যু অদৃষ্টে নেই বলেই সেই চরম আপৎকালে, শোচনীয় মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে তিনি সহজাত ক্রোধ, জিঘাংসাবৃত্তি বা প্রতিশোধ-স্পৃহাকে জয় করতে পেরেছিলেন। ক্রোধের উপর বিবেচনার জয় হয়েছিল। তিনি এটুকু ঠিকই বুঝেছিলেন, এই অর্ধজীবিত লোকটির গতি লক্ষ্য করাই তাঁর নিজের প্রাণরক্ষা করার তখন একমাত্র উপায়।

সেও কঠিন, কারণ লোকটা সরীসৃপের মতোই অগ্রসর হচ্ছে, যতটা সম্ভব নিঃশব্দে, তারই সামান্য যেটুকু ধ্বনি উঠছে, বিশেষ নিঃশ্বাসের—তারই উপর নির্ভর, বরং বলা উচিত অনুমানের উপর নির্ভর, তবু সে মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে সেইটুকুই প্রাণরক্ষার একমাত্র অবলম্বন—এবং তার সাহায্যেই শেষ পর্যন্ত গুহামুখে এসে পেঁছেছিলেন।

অর্থাৎ সে লোকটি থেমে ছিল। কিন্তু এই কি গুহার দ্বার, তাহলে বিন্দুমাত্র আলোক নেই কেন? লোকটাই কি তার পথ ভুল করল?

প্রথমে সেই সংশয় আর তজ্জনিত হতাশাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরে ঐ দানবটা তার প্রচুর রক্তক্ষরণজনিত দুর্বলতার মধ্যেই প্রাণপণে প্রস্তর অপসা-রণের চেষ্টা করছে দেখে শেষ অবধি সত্যটা তাঁর মনে প্রতিভাত হয়েছিল।

নিশ্চয় তাঁকে মৃত মনে করে ওরা গুহার মুখ বন্ধ করে চলে গেছে, তাতেই এমন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

সে দানব পারে নি ঐ জগদ্দল প্রস্তুরস্তূপ ঠেলে বেরিয়ে আসতে—কিন্তু বালী পেরেছিলেন। বালীর অপরিসীম দৈহিক শক্তির পরিচয় বহু দূরদেশের বহু ব্যক্তিই পেয়েছে। সে পরিচয়ের কিছু কিছু কাহিনী জনশ্রুতি বা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। এ কথাও কেউ কেউ বলেন, স্বয়ং সূর্যের সঙ্গে স্পর্ধা প্রকাশ করতে গিয়েছিলেন বালী।

তাও, বালীও—বহুক্ষণের, সম্ভবতঃ কয়েক প্রহরের বা কয়েক দিনের চেষ্টাতে ঠিক জানেন না, সময়ের কোন হিসাবই ছিল না, শেষ পর্যন্ত ঐ বিশাল পাষাণ প্রাচীর সরাতে পেরেছেন। অর্থাৎ বালীর পক্ষেও খুব সহজ হয় নি কাজটা।

প্রায়-নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে দৈবক্রমে ফিরে এসে সে বিপদের যারা কারণ তাদের সম্বন্ধে মনোভাব মধুর থাকবে—তা সম্ভব নয়।

বালীকে অগ্নিশর্মা মূর্তিতে উপস্থিত হতে দেখেই সুগ্রীব ও অমাত্যগণ, রাজ্য-প্রধানরা আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন।

এটা যে কেউ ইচ্ছা করে করে নি, বালী মৃত বুঝেই এ কাজ করেছে—করতে হয়েছে—এ কথা বালীকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না। তিনি পূর্বেই যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এখন রাজধানীতে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে দেখলেন যে তাঁর সিংহাসন এবং রমণীগুলি পর্যন্ত গ্রহণ করে সুগ্রীব সুখে ও নিশ্চিন্তে রাজত্ব করছেন—সঙ্গে সঙ্গে সে ক্রোধাগ্নি প্রায় দাবানলে পরিণত হল। তিনি পুনঃ পুনঃ গর্জন বা সিংহনাদ সহকারে সব কয়জনকে শোচনীয়ভাবে বধ করার সঙ্কল্প প্রকাশ করতে লাগলেন।

সুগ্রীব পাংশু বিবর্ণ মুখে কম্পিত দেহে এসে তাঁর রাজমুকুট উন্মোচিত করে বালীর পদতলে রক্ষা করে করুণ কণ্ঠে বললেন, 'আমি ভুল বুঝেই এ কাজ করেছি। নচেৎ পূর্বেও যেমন আপনার দাসানুদাস ছিলাম, এখনও তাই আছি। আপনার স্থান আপনি অধিকার করুন। আমাকে আদেশ করুন, কোন্ কার্য সাধন করলে আপনার প্রসন্নতা ও ক্ষমা লাভ করতে পারি?'

তিনি আরও বললেন, 'আমার একার বুদ্ধিতে এ কার্য করি নি, উপস্থিত অমাত্যগণ ও প্রধান ব্যক্তিরা সকলেই এই পরামর্শ দিয়েছেন। আমার তখন একান্ত বিহ্বল অবস্থা, নিজে বিচার করে দেখে মনস্থির করব—সে অবস্থা ছিল না।'

বালী সে কথায় কর্ণপাত মাত্র করলেন বলে মনে হ'ল না। বরং সবল পদাঘাতে সুগ্রীবকে বহু দূরে নিক্ষেপ ক'রে—মহামাত্য জাম্ববান, মৈন্দ, দ্বিবিধ, গয়, গবাক্ষ, শরভ, বিদ্যুন্মালী, সম্পাতি, হনুমান, সূর্যাক্ষ, সুবাহু, নল, কুমুদ, সুষেণ, তার, দধিবক্র, নীল, সুনেত্র প্রভৃতি রাজ্য-প্রধানদের সম্বোধন ক'রে বললেন,

'তোমাদের হীন ষড়যন্ত্রে ও স্বার্থবুদ্ধিতেই এ কার্য হয়েছে, তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছি। আমাকে ঐ অন্ধ গুহার মধ্যে আবদ্ধ রেখে আমার জীবন নষ্ট করার সুবিধা হবে বলেই এই ষড়যন্ত্র। তবে আমিও বালী, ক্ষমা আমি কাকেও করি না, করবও না। এখন সর্বাগ্রে আমার বিশ্রাম প্রয়োজন। তারপর চিন্তা করব—কোন্ প্রকার শাস্তি দিলে তোমাদের পাপের উপযুক্ত দণ্ডদান করা হয়। যাও দূর হয়ে যাও আমার সম্মুখ থেকে। তবে মনে ক'রো না যে পলায়ন ক'রে বেশী দূর যেতে পারবে। যেখানেই যাও—আমার আয়ত্তের বাইরে যেতে পারবে না, আমার রোষবহ্নি থেকে নিস্তার পাবে না। উত্তরে কৈলাস, দক্ষিণে মলয় পর্বত—যেখানেই থাকো—আমার এই দুই হস্ত তোমাদের পেষণ ক'রে পিণ্ডে পরিণত করবে।'

তারপর পদানত প্রাণভয়-বিবর্ণ সুগ্রীবের দিকে সঘৃণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'তুইও অব্যাহতি পাবি না। তোকে প্রাণে মারব না—কারণ, যদিচ আমরা এক পিতার সন্তান নই, তবু এক মাতার গর্ভে তো জন্মগ্রহণ করেছি, সহোদর—তবে তোর হস্তপদ নষ্ট ক'রে চিরদিনের মতো বিকলাঙ্গ ক'রে দেব, যাতে আর কোনদিন সিংহাসনে বসার আশা না থাকে—সে অভিলাষ চিরদিনের মতো দূর করতে যাতে বাধ্য হোস!'

এই পর্যন্ত বলে আর একটা হুঙ্কার দিয়ে বালী বেপথুমানা, ত্রস্তা, ক্রন্দনরতা ভ্রাতৃজায়া রুমাকে বাহুবন্ধনে বদ্ধ ক'রে নিজের বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করলেন—বোধ করি ভ্রাতাকে অধিকতর মনোকষ্ট দেবার জন্যই। অথবা রুমার সম্বন্ধে লালসা ছিলই, এতকাল চক্ষুলজ্জাতেই তাকে গ্রহণ করতে পারেন নি। এখন আর সে বাধা রইল না।

এই তাৎকালিক সঙ্গিনী নির্বাচন সম্ভবতঃ সুগ্রীবের প্রতি বিধাতারই করুণা।

কারণ বুদ্ধিরূপিনী, মনোবল-প্রদায়িনী, মিষ্ট অথচ তীক্ষ্ণ-ভাষিণী তারা-দেবীকে বালীর সেবায় বিব্রত থাকতে হ'ল না। তিনি স্বচ্ছন্দে এঁদের ভাগ্যরশ্মি নিজ হস্তে ধারণ করতে পারলেন।

ভয়ার্ত বানর রাজপুরুষ ও অমাত্যগণ অনেকেই পলায়নে তৎপর হয়েছেন ততক্ষণে। জাম্ববান নল প্রভৃতি প্রাজ্ঞ ও সুবুদ্ধি প্রধানরা তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে মহাবল বালীর যে শক্তি ও প্রকৃতি, তাতে কোথাও গিয়ে নিস্তার পাওয়া যাবে না। আর, দুই তিন প্রহর—ওঁর ক্লান্তি অপনোদনের পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট—সময়ের মধ্যে তাঁরা কত দূরেই বা যেতে পারবেন? তার চেয়ে একবার সকলে মিলিতভাবে ওঁকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে কি হয়? সকলে এক যোগে আক্রমণ করলে, যত বড় বীরই হোন বালী, কতক্ষণ সহ্য করতে পারবেন?

হয়ত এ যুক্তিতে এঁরা কিছুটা আশ্বস্ত হতে পারতেন কিন্তু বিজ্ঞ হনুমান স্মরণ করিয়ে দিলেন, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের রীতি অনুসারে এমনভাবে আক্রমণকে কাপুরুষোচিত কর্ম বলে বিবেচনা করা হয়। এ নিষাদের কার্য। এভাবে জয়লাভ করলে তাঁরা ভদ্র অনার্য সমাজে নিন্দিত হবেন, তাঁদের সকলে বর্বর বলবে। এমন

কি এ কার্য দানব বা রাক্ষসরাও বোধ করি করে না।

আবার এক মূঢ় বিহ্বলতায় সকলে পাষাণবৎ নিশ্চল হয়ে গেলেন।

আর ঠিক এই সঙ্কটক্ষণে এগিয়ে এলেন তারাদেবী।

হাত ধরে সুগ্রীবকে ভূমিশয্যা থেকে তুলে নিজের অঞ্চলে তাঁর কালভয়জনিত ঘর্মবারি ও ধূলো মোচন ক'রে নিয়ে বললেন, 'আপনারা এখনই—যতদূর সম্ভব দ্রুত ঋষ্যমূক পর্বতে চলে যান। নারী ও শিশুদের নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না, কারও সঙ্গে আলোচনা ক'রেও বৃথা কালক্ষেপ বা অধিকতর জটিলতার সৃষ্টি করবেন না। গৃহসামগ্রী নিয়ে যেতে গেলেও যে ঈষৎ আলোড়ন উঠবে—একেবারে নিঃশব্দে এ কার্য হয় না—তা মহাবল বালীর কর্ণে পৌঁছতে পারে। তাহলে আসন্ন সর্বনাশ প্রত্যক্ষ হয়ে পড়বে। যেমন আছেন, যে যেভাবে আছেন, এখনই দ্রুত ঐ পর্বত অভিমুখে যাত্রা করুন। প্রাণভয়ে অবশ্যই পদক্ষেপ ত্বরান্বিত হবে, আপনারা দুই প্রহরকালের মধ্যেই ঋষ্যমূকের সানুদেশে পৌঁছে যাবেন। অতঃপর আর কোন ভয় থাকবে না।'

সুগ্রীব নির্বোধের মতো শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ এই আশ্চর্য নারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'তার অর্থ?'

শিশুদের নির্বুদ্ধিতা দেখলে অভিভাবকরা যেমন প্রশ্রয়ের হাস্য করেন—তারাদেবী সেইভাবেই হাসলেন। বললেন, 'তোমাদের স্মৃতিশক্তি দেখছি বড়ই দুর্বল।'

সুগ্রীবকে যেন উপেক্ষা ক'রেই হনুমানের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার নিশ্চয় স্মরণ আছে?'

হনুমান তারাকে অভিবাদন ক'রে বললেন, 'আছে বৈকি দেবী। ওখানেই পূর্বে মতঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল। কিছুদিন পূর্বে অকস্মাৎ পুরাকালের পর্বত-সদৃশ অতিকায় এক মহিষ কোন অজ্ঞাত কারণে প্রাচীন দুষ্প্রবেশ্য অরণ্যভূমি থেকে লোকালয়ে এসে পড়ে। যেন সাক্ষাৎ-কৃতান্তরূপী এই অসুর চতুর্দিকে নিজের যুদ্ধ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার মতো কোন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কেউই তাকে নিবারণ বা দমন করতে সাহস করল না। অবশেষে বোধ করি সেই ভীষণাকার জন্তুটার মৃত্যুই আসন্ন হয়ে থাকবে—একদা কিষ্কিন্ধ্যা-ধীশ্বর বালীর এই প্রাসাদসম্মুখে এসে তর্জন-গর্জন ও নানা উৎপাত শুরু ক'রে দিল। শক্তি-অভিমানী বালী অবশ্যই এ স্পর্ধা সহ্য করবেন না—তিনি মহা ক্রুদ্ধ হয়ে তার দর্প চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তখনই প্রাসাদ থেকে বহির্গত হলেন।

'এর পর যে ঘোর যুদ্ধ হ'ল, তা বর্ণনা করাও কঠিন। মনে হ'ল, প্রলয় আসন্ন। বালীর মতো মহাবল পুরুষকেও বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়েছিল তাকে নির্বীর্য করতে। তথাপি সে শেষ পর্যন্ত এক সময়ে অবসন্ন হয়ে পড়ল। তখন তাকে যথেচ্ছ প্রহারে বধ ক'রে বালী—যেন নিজের অপরিমেয় শক্তি পরীক্ষা করতেই—সেই পর্বত-সদৃশ পাষাণভার পশুটাকে দুই শৃঙ্গে ধরে বহুদূরে নিক্ষেপ করলেন। বালীর অবিশ্বাস্য শক্তির প্রমাণস্বরূপ সে শব ঐ মতঙ্গ মুনির আশ্রমের

কিছু দূরে গিয়ে পতিত হ'ল।

'কিন্তু গগনপথে থাকতেই ক্ষতবিক্ষত দেহটা থেকে কয়েক বিন্দু শোণিত ঐ আশ্রমে পড়ে—এবং মুনির দেহেও। তাতেই ক্রুদ্ধ মুনি অভিসম্পাত দেন—যে ব্যক্তি এভাবে তাঁর আশ্রম অপবিত্র করল, সে কখনও এই আশ্রমের চতুঃসীমার মধ্যে আসতে পারবে না। এলেই অনিবার্যভাবে তার মৃত্যু ঘটবে।

'সে সংবাদ অবশ্যই বালীর কর্ণে পৌঁছবে, এ তো অবধারিত সত্য। বালী দূর থেকে তাঁর ক্রোধ সংবরণ ও অভিশাপ প্রত্যাহারের জন্য যথেষ্ট অনুনয় বিনয় করেছিলেন, এ কার্য যে ইচ্ছাকৃত নয়, এর ভূরি ভূরি প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টাও—কিন্তু মতঙ্গকে প্রসন্ন করতে পারেন নি। তখন থেকেই এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর মধ্যে ঐ ঋষ্যমূক পর্বত ও তার সংলগ্ন বনস্থলীটুকু মহাবলদর্পী বালীর কাছেও অগম্য হয়ে আছে।'

এই বলে, নিমেষ-কয়েক কাল নীরব থেকে মহাবীর হনুমান সপ্রশংস দৃষ্টি তারাদেবীর প্রতি নিবদ্ধ ক'রে বললেন, 'দেবীর স্মৃতিশক্তিই শুধু বিস্ময়কর নয়, প্রত্যক্ষ এবং ভয়াবহ মৃত্যুর সম্মুখেও যে সে শক্তি কার্যকরী থাকে, এমন দ্রুত সেই ভয়ানক বিপদ থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় বলে দিতে পারেন—সেই অবিশ্বাস্য স্থিরবুদ্ধিই সর্বাপেক্ষা প্রশংসার্হ এবং অধিকতর বিস্ময়কর।'

মহাবীর ব্যতীত অবশিষ্ট রাজ্যপ্রধানগণ অবশ্যই তারাদেবীর সদাজাগ্রত উপস্থিত বুদ্ধি আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করার জন্য সময়ক্ষেপ করেন নি, তাঁরা ততক্ষণে, সেই অবস্থাতেই, পুত্র-কলত্র অথবা সঙ্গিনীগণের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা না ক'রে, যতটা সম্ভব পদক্ষেপণ-শব্দকে সংযত রেখে—ঋষ্যমূক অভিমুখে দ্রুত পদ-চালনা আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। যতটা অল্প সময়ে বালীর থেকে যত অধিক দূরত্ব সৃষ্টি করা যায়—সেইটাই তাঁদের অগ্রগণ্য চিন্তা।

হনুমানের জন্য চিন্তা নেই, তাঁর শশকসম দ্রুতগতি এবং শাখামৃগদের ন্যায় উল্লম্ফন-ক্ষমতা সর্বজনবিদিত।

তিনি অনেক পরে যাত্রা করলেও ওঁদের পূর্বে ঋষ্যমূকে পৌঁছে যাবেন।···

আর সুগ্রীব যে তখনও দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় সেখানেই আছেন—সে জন্যও তাঁদের বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। সুগ্রীবই কি তাঁদের এই ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ নন?

ও'রাই যে সুগ্রীবকে এই কর্মে উৎসাহিত এবং বস্তুতঃ প্রণোদিতই করেছিলেন সেদিন—সে কথা স্মরণ রাখা সম্ভব নয়, এ অবস্থায় কেউ রাখেও না।

সুগ্রীবের ইতস্ততঃ করার কারণ আর যাই হোক—ভ্রাতৃপ্রেম নয়।

তিনি তারার মুখের দিকে সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'তুমিও চলো।'

'না', তারা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আমি দস্যু-তস্করের মতো পলায়ন করব না। তোমরা আসন্ন মৃত্যু বা তদপেক্ষা গুরুতর লাঞ্ছনার আশংকায় যাচ্ছ—তোমাদের কার্য নিন্দনীয় নয়। কিন্তু আমার সে কারণ নেই। তুমি যেদিন জয়ী

হয়ে বালীকে পরাজিত ক'রে ফিরে আসবে, সেদিন আমি বিজয়মাল্য দিয়ে তোমাকে বরণ করব। তার পূর্বে আর আমাদের মিলনের সম্ভাবনা নেই। আরও দেখ, অপর কোন সজ্জন নারী কি পুত্রকন্যা নিয়ে গেলেন না, তোমার স-সঙ্গিনী যাওয়া শোভন হবে না।'

বলতে বলতেই দু' হাত দিয়ে প্রায়-অনড় সুগ্রীবকে বহির্গমন পথের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'যাও যাও, আর নিমেষকাল সময়ও নষ্ট করো না। নিজের কথা না ভাব, আমার কথা স্মরণ ক'রেও অন্ততঃ নিজেকে রক্ষা করো।'

এরপর আর বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ করলেন না সুগ্রীব।

এ নারীর আদেশ যত কঠোরই হোক—পালনে তাঁর সুখ।

॥ পাঁচ ॥

তার পর থেকেই—এই দীর্ঘকাল—বন্দিনী-দশা চলছে মনস্বীনী বহ্নিরূপিণী তারাদেবীর।

সাধারণ বন্দীদশার দুঃখও বোধ করি সহনীয়। এ যেন সুবর্ণশৃঙ্খলে বাঁধা তিনি। অনেকখানি স্বাধীনতা—কেউ তাতে কোন হস্তক্ষেপ করে না—কিন্তু সে-ই কি সমধিক দুঃখের কারণ নয়?

রূপবতী, বুদ্ধিমতী। রাজ্যশাসনের সমস্ত শক্তি তাতে বিদ্যমান। এর থেকে অধিকতর ব্যাপকতর কর্মক্ষেত্রেও উপযুক্ত কর্ত্রীরূপে পরিচালনা করতে পারেন।

তাঁর পক্ষে পুরুষের উপেক্ষা বা ঔদাসীন্যই যে সর্বাপেক্ষা দুঃসহ।

অবমাননা—হ্যাঁ, তাঁর কাছে এটা অবমাননাই—দৈহিক লাঞ্ছনার অপেক্ষা অনেক বেশী অসহনীয়, অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক।

যে মহাবলী পুরুষের তিনি প্রধানা সঙ্গিনী, সে ব্যক্তি কোনদিন তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র করেন না। এই যে অনিন্দ্য রূপসজ্জা, যাকে বিধাতার সৃষ্টিকার্যের সংশোধন বলা চলে, যা ঈশ্বরদত্ত রূপকে কেবলমাত্র উজ্জলতর নয়, প্রায় পরিবর্তিত ক'রে দেয়, শ্রেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠতর করে—সে সম্বন্ধে ঐ কামকীটটা সচেতন-মাত্র নয়। তারার অপেক্ষা রূপ বা রতিপাণ্ডিত্যে অনেক অপকৃষ্ট—শিক্ষাদীক্ষা-হীনা, যারা সুবিধা পেলেই, তাঁর আলিঙ্গনমুক্ত হওয়া মাত্র, ঐ গৃহদ্বারেই প্রহরারত তরুণ কিঙ্করদের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়—তাদের নিয়েই দিনরাত কাটে বালীর, এমন কি অপরূপা অতুলনীয়া রুমাতেও তাঁর অরুচি এসে গেছে। কাছে রাখেন এই মাত্র, দৈহিক সঙ্গ দেন কদাচিৎ।

ঋতুর পর ঋতুর আগমন ঘটে, তারা নবাগত ঋতুর উপযুক্ত প্রসাধনে সুসজ্জিতা হন। এমন কি কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ ভেদে প্রসাধনের যে পরিবর্তন আবশ্যক—সে সম্বন্ধেও তাঁর অভ্রান্ত ধারণা। কিন্তু কে তা দেখে মুগ্ধ হবে! অবশ্যই এ প্রাসাদে লালসাতুর রূপবান পুরুষের অভাব নেই, কিন্তু যা দেবভোগ্য বস্তু, রাজভোগ্য—তা পথের সারমেয়কে বিতরণ করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। ধিক্!

এইভাবেই চলছে অন্তহীন, উপায়ান্তরহীন প্রতীক্ষা।

সুগ্রীবের কোনদিন সাহস হবে কি বালীর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে?

করলেই কি তিনি সক্ষম হবেন বিজয়ী হতে?

গোপনে চর বা দূত পাঠিয়ে কিছু বলিষ্ঠ তরুণ যোদ্ধা সংগ্রহ ক'রে সেই বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলে হয়ত বালীকে পরাজিত করা যায়—কিন্তু সে বুদ্ধি বা উদ্যম সুগ্রীবের নেই, তা তারা বিলক্ষণ জানেন।

স্বভাব-অলস, কবি-প্রকৃতির মানুষ। তারা যে ও'র প্রতি আকৃষ্ট, সে তো, পৌরুষের জন্য নয়—পুরুষ হিসাবে বালী অপেক্ষা যোগ্যতর আর কে আছে? চক্ষুষ্মান, শিল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, চারুকর্মের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে সক্ষম—এমন মুগ্ধ ভক্ত হিসাবেই তিনি ও'র প্রতি প্রসন্ন, করুণার্দ্র।

কাব্যের যেমন রসিক পাঠক না থাকলে কবির সৃষ্টি ব্যর্থ হয়, শিল্পকর্মেরও তেমনি, মুগ্ধ শুধু নয়, রসবেত্তা দর্শক ব্যতিরেকে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। রূপ বিধাতার সৃষ্টি, তিনিও অসামান্য শিল্পী সন্দেহ নেই—কিন্তু ত্রুটিহীন রূপসজ্জা যা সেই রূপকে শতগুণে লোভনীয়, আকর্ষক ক'রে তোলে—তা বোধ করি শ্রেষ্ঠ-তর শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম। তার বোদ্ধা দর্শক না থাকলে সমস্তই তো নষ্ট।

অথচ তাই তো হচ্ছে। প্রতিদিনই তা এইভাবে বিনষ্ট, ব্যর্থ হয়ে চলেছে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর।

এমনিই অতুলনীয় নিত্যনূতন সজ্জা—আবার সে সজ্জার ব্যর্থতায় এমনিই পাষাণ-কুট্টিমে অবলুণ্ঠিতা হয়ে হতাশায়, ক্ষোভে, রোষে এই ক্রন্দন।

অগ্রে পশ্চাতে ঊর্ধ্বে অধে—যতদূর দৃষ্টি এমন কি কল্পনা বা আশা পৌঁছয়—সীমাহীন অন্ধকার, অন্তহীন নৈরাশ্য।

কোথাও বিন্দুমাত্র আলোকরেখা চোখে পড়ে না।

আলোকের স্বপ্ন দেখারও কোন উপাদান নেই মনে বা মস্তিষ্কে।

উনি যে এমন ব্যাকুল হয়ে প্রাসাদের মুক্ত অলিন্দ থেকে ঋষ্যমূকের দিকে চেয়ে থাকেন প্রতিদিন—সে সম্বন্ধেও কি সুগ্রীব অবহিত?

মনে তো হয় না।

ঐ দূর থেকেও যদি সে চেয়ে দেখত একবার! পদ্মের মৃণালমধ্যস্থ শূন্যতা দিয়ে নিরীক্ষণ করলে বহুদূরের বস্তুও দৃষ্টিগোচর হয়। তাও যদি দেখত—ঐ ধরণের কোন অন্তঃসারশূন্য পুষ্পদণ্ডের মধ্য দিয়ে—হয়ত এ সজ্জার কিছুটা চোখে পড়ত। তাতে আশা না হোক—লালসায় উজ্জীবিত হতে পারত লোকটা।

কিন্তু আজ সেই বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন হতাশার পুনরাবৃত্তি, শেষ অবধি অপরিমিত সুরাপানে অচেতন হওয়ার নিত্য একই প্রকারের ঘটনার মধ্যে অকস্মাৎই যেন ছেদ পড়ল একটা।

কোথাও কোন আশা নেই, তত্রাচ যেন কতকটা অভ্যাসবশতঃই মহাদেবী তাঁর

গুপ্তচরী-নিয়োগ-প্রথা বজায় রেখেছিলেন। ওরা ঋষ্যমূক থেকেও প্রায়শ সুগ্রীব ও তাঁর অনুচরদের স্বাস্থ্য এবং নৈষ্কর্মের সংবাদ সংগ্রহ ক'রে আনত।

সংগ্রহ করত কিন্তু অপ্রয়োজনবোধেই ইদানীং আর তা প্রত্যহ ওঁকে নিবেদন করতে আসত না। কারণ প্রতিদিন একই অরুচিকর সংবাদ শুনতে শুনতে রুষ্ট হয়ে উঠতেন কর্ত্রী, প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ বা কণ্টকিত বেত্রদণ্ড তাড়নে তাদের ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিতেন। সেই আশঙ্কাতেই আরও ওরা নিত্য দুঃসংবাদ শোনাতে সাহস করত না।

সন্ধ্যায় এসে গৃহদ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করত, কিছুটা শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হওয়ার—প্রতিদিনকার এই উন্মত্ত রোদন ও নিঃশব্দ বিলাপের সাক্ষী ওরা—এই আবেগ সংবরণ ও মদিরাপান আরম্ভের মধ্যেকার দণ্ড-দুই সময়ই কিছুটা সহজ হতেন, কোন কোন দিন এই সময়টায় উনি নিজেই ওদের আহ্বান করতেন, তখন সাহস সঞ্চয় ক'রে নিকটে যেত।

আজ তার অন্যথা ঘটল। প্রবল ব্যতিক্রম।

এর জন্য কোন প্রত্যাশা ছিল না। যেমন গতানুগতিক ভাবে জীবন কাটে, তেমনিই কাটবে, এই জানতেন।

কিন্তু সে ধারণাকে ছিন্ন ক'রে প্রধানা গুপ্তসংবাদবাহিকা নেত্রবতী যেন উত্তর-পূর্বাগত ঝটিকার মতো গৃহে প্রবেশ করল। বেশ কিছুটা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই বিজয়িনীর মতো দৃপ্ত কণ্ঠস্বরে আহ্বান করল, 'মহাদেবী, আজ কিছু নূতন সংবাদ আছে!'

'নূতন সংবাদ!'

অশ্রুবিধৌত অক্ষিপ্রান্তের কজ্জলরেখা অঞ্চলপ্রান্ত দিয়ে ঘষে মুছতে মুছতে—বিকৃত প্রসাধন অপেক্ষা তাঁর স্বভাববর্ণ ও আকৃতি অনেক ভাল, সে সম্বন্ধে তখনও সচেতনতার অভাব ছিল না—উঠে বসলেন।

'কী সংবাদ রে নেত্রবতী? মহামতি সুগ্রীব কি রণসজ্জার আয়োজন করছেন? তিনি কি শেষ অবধি তাঁর জড়তা ও আলস্য দূরীভূত করতে পারলেন?'

এবার যেন নেত্রবতীর বিজয়গর্বের ভাব কিছুটা মন্দীভূত হয়।

কন্ঠস্বর অত সহজে আর উচ্চ-গ্রামে ওঠে না। কিছুটা দ্বিধা সংশয়ের সঙ্গেই যেন বলে, 'রণসজ্জা করছেন—কিন্তু সে—'

বলতে বলতে থেমে যায়। সকণ্টক বেত্রদণ্ড বা কোন প্রস্তরখণ্ড হস্ত-প্রসারণের সীমায় আছে কিনা দেখে নেবার চেষ্টা করে।

'কিন্তু কি বল? থামলি কেন?' অধীর হয়ে ওঠেন তারা।

'রণসজ্জা কিষ্কিন্ধ্যা জয়ের জন্য নয় মহাদেবী, (মহাদেবী সম্বোধন তারাই অভ্যাস করিয়েছেন অনুচরী, সহচরী ও কিঙ্করীদের), এ রণসজ্জা আত্মরক্ষার জন্য। কোন সৈন্য সংগ্রহ বা অস্ত্র, কি যুদ্ধকালীন খাদ্য সঞ্চয়ের আয়োজন নেই। ওঁরাই কয়েকজন প্রস্তুত হচ্ছেন মাত্র, সর্জবৃক্ষ ও বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ ক'রে।'

'তার অর্থ'!' ওষ্ঠে অবজ্ঞার একটা প্রকট ভঙ্গী ক'রে বলেন তারা, 'কে আবার ওঁদের ঐ আশ্রয়টুকু নষ্ট করতে চাইছে? এমন বাতুল কে এল? না কি বালীই অপর কাউকে পাঠাবার সঙ্কল্প করেছেন?'

'না, না। সে সব কিছু নয়। যতদূর শুনে ও দেখে এলাম—দুটি মাত্র প্রাণী, সম্ভবতঃ উত্তর-দেশাগত দুটি আর্যসন্তান, যদিচ তাঁদের পরিধানে আমাদের মতোই বল্কল, মৃগচর্মের বর্ম—কিন্তু তাঁদের উজ্জ্বল বর্ণ, দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, অপরূপ কান্তি এবং সঙ্গে খড়্গ ও ধনুর্বাণ দেখে মনে হচ্ছে, ওঁরা আর্যবংশোদ্ভব কোন রাজা বা রাজপুত্র হবেন।'

'দু'জন মাত্র! তার জন্য এঁদের রণসজ্জা! এঁরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন! হায় হায়! বুদ্ধিও বটে! ওঁরা এই ঐশ্বর্যশালিনী কিষ্কিন্ধ্যা পরিহার ক'রে নগণ্য ঋষ্যমূক আক্রমণ করবেন কেন? আর তাতে এত ভয়েরই বা কি আছে?'

তাচ্ছিল্য বিদ্রূপে তারাদেবীর কণ্ঠস্বর শাণিত হয়ে ওঠে।

বেত্রদণ্ডটা আপাততঃ পার্শ্বে নেই—লক্ষ্য ক'রে নেত্রবতী আশ্বস্ত হয়েছে। সে বলল, 'ওঁদের অভিপ্রায়টাই যে জানা যাচ্ছে না। তাইতেই তো এত আশঙ্কা এঁদের। অনিশ্চয়তাই যে নানা সংশয় ডেকে আনে। তদুপরি ওঁদের আকৃতি দেখেই মনে হয়, বীর্যবান শুধু নয়, ওঁরা যথেষ্ট রণদক্ষ। সঙ্গের অস্ত্রগুলি যেন সাক্ষাৎ কৃতান্ত-নির্মিত—যেমন মারাত্মক, তেমনি বহু ব্যবহৃত। দুটি তরুণেরই সুগৌর সুগঠিত সুন্দর দক্ষিণ বাহু যেন অবিরাম ঘর্ষণজনিত কঠিন ব্রণাঙ্কিত। শুনেছি, ধনুর জ্যা রোপণে নিত্য অভ্যাস থাকলেই কোমল লোহিতাভ শুভ্র চর্ম এমন কুশ্রী ব্রণাঙ্কিত হয়। অর্থাৎ ওঁরা যে যোদ্ধা এবং বীর, তাতে সংশয় মাত্র নেই।'

কুটিল সন্দেহ, আশঙ্কা ও প্রবল কৌতূহল; তার মধ্যেই তারাদেবী অভ্যস্ত কৌতুকের লোভ সংবরণ করতে পারেন না। চক্ষুর একপ্রকার বিশেষ ভঙ্গী ক'রে বলেন, 'তুই যে দেখছি মোহিত হয়ে গেছিস ওদের দেখে?'

'তা হয়েছি মহাদেবী, অকপটেই স্বীকার করছি। ঐ রূপবান দুটি তরুণ যুবা যদি এক রাত্রের জন্যও ওদের সেবা করার অনুমতি দিত—আমার জন্ম সার্থক মনে করতাম, পরক্ষণেই ঘটলেও তাতে দুঃখ বোধ হত না!'

'এত সুন্দর! এত সুপুরুষ!' এবার তারা উঠে দাঁড়ান, গবাক্ষ দিয়ে ঋষ্যমূকের সানুদেশের দিকে তাকান, কিন্তু বনস্থলীর ছায়ান্ধকারে কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না।

'তা তাদের পরিচয় কিছু পেলি? বলছিস বীর, বলছিস রাজপুত্র—তা দিগ্বিজয়ে এসেছেন মহাবীররা, সঙ্গে কোন সেনা নেই, যুদ্ধের আয়োজন নেই—এই বা কেমন কথা!'

তারপর কিছুকাল ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে নীরবে যেন কি ভেবে নিয়ে বলেন, 'কে জানে ওরা হয়ত উত্তরাখণ্ডের কোন রাজার প্রেরিত চর, এদেশের শক্তি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করতে এসেছে। এদের প্রধান শক্তি কি, কোন্ কোন্ অস্ত্র ব্যবহার

করে—কোন্ পথে কিভাবে আক্রমণ করলে, কাদের হস্তগত করলে সুবিধা হবে—এই সব তথ্য জানতে চায়। তা তাদের পরিচয় কিছু পেলি ?'

'না দেবী, সে ওঁরাও পান নি। মহাবীর হনুমান সে ভার নিয়েছেন। কিন্তু তিনিও আর দুই একদিন ওঁদের ভাবভঙ্গি দেখে তবে ওদের সম্মুখীন হবেন—এই তাঁর অভিপ্রায়। মহাবীর বলেন, বৃথা বা অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয় পরিহার, সর্ববিধ সতর্কতা অবলম্বন এবং সর্বাগ্রে প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য আহরণ, তাদের বুদ্ধি এবং মানসিক গতি লক্ষ্য করাই প্রকৃত রণকৌশল।'

'কিন্তু সে উনি যাই বলুন, উনি আবার বড় বেশী সাবধানী। তা আমি খবর পাবো কিভাবে ?'

বেশ একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন তারাদেবী।

নেত্রবতীর যেন সেই অনুপাতেই পুনশ্চ বিজয়িনীর ভাব প্রকাশ পায়।

'সে ব্যবস্থা আমি করেই এসেছি মহাদেবী। আপনার অপর গুপ্তচরী বিদিশাকে রেখে এসেছি। সে অল্পবয়স্কা বালিকা মাত্র, বৃক্ষারোহণে বিশেষ পটু। তার গতিবিধিও সরীসৃপের মতোই নিঃশব্দ। যে বৃক্ষতলে ঐ দুটি রাজপুত্র—রাজপুত্রই হবেন, আমার এ দৃঢ় বিশ্বাস—বিশ্রাম করছেন, ওঁদের অলক্ষ্যে তারই এক শাখায় আরোহণ ক'রে বসে আছে সে, ওঁদের কথপোকথন শুনছে।'

'কিন্তু সে ওদের ভাষা বুঝবে কি ক'রে ?

'তাতে কিছু অসুবিধা হবে না। আপনি বিস্মৃত হয়েছেন, বিদিশাকে একদা কিছু কিছু আর্যভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা আপনিই ক'রে দিয়েছিলেন, এই কার্যে প্রয়োজনে লাগতে পারে বলে। তা ব্যতীত, ওঁরা দুটি বনচারী নিষাদকে বিনয় বাক্যে বশ ক'রে তাদের নিকট আনতে পেরেছেন, ওঁদেরও তো সংবাদ সংগ্রহ প্রয়োজন। তাদের সঙ্গে ওঁরা কতকটা আমাদের ভাষাতেই কথা বলছেন। মনে হয় ওঁরা দীর্ঘকাল এই পবিত্র দক্ষিণাবর্তে বাস করছেন। সব শব্দের নির্ভুল প্রয়োগ করতে না পারলেও বাক্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে ওঁদের ব্যবহৃত ভাষাই যথেষ্ট। আমি যতদূর জানি—মহাবীর হনুমানও ঐ নিষাদ দুটির জন্যই অপেক্ষা করছেন। ওরা কিছু দূরে এলেই তিনি ওদের ধরবেন।'

সংবাদ নিবেদন পর্ব সমাপ্ত ক'রে নেত্রবতী দ্রুত মহাদেবীর দৃষ্টির অন্তরালে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। তার ললাট, কপোল ও পৃষ্ঠের চর্ম অদ্যকার মতো অক্ষত রইল। এখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে তাম্বুলের দ্বারা ক্লান্তি অপনোদন করতে পারে।

পরন্তু এ সংবাদে তারাদেবীর ললাটের মেঘ বরং অধিকতর ঘনীভূত হল।

ওঁর শান্তি ও স্বস্তি কিছুই রইল না।

কে এরা ? কি জন্য এসেছে ?

কি এদের অভিপ্রায় ?

সত্যই কি সুগ্রীবকে আক্রমণ করবে নাকি ?

তবে তাতে ওদের লাভই বা কি হবে ? কী আছে সুগ্রীবের, বস্তুতঃ সে তো দীন ভিক্ষুকের জীবন যাপন করছে। এত নির্বোধ কি কেউ আছে, যে ওর ঐ গিরিচূড়ার সামান্য দুর্গ আর সামান্য কিছু জমির জন্য যুদ্ধ করবে ?

আসলে ওদের অভিসন্ধি, গূঢ় অভিপ্রায়টাই যে জানা যাচ্ছে না।

ওদের মনের গোপন গতিবিধির সঙ্কীর্ণ বক্র বর্ত্ম।

যদি আক্রমণই করে সত্যসত্যই ? সে ক্ষেত্রে কি সুগ্রীব জয়ী হতে পারবেন ?

সে সম্ভাবনা অল্প। অথবা আদৌ নেই।

ওরা যে শ্রেণীর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত —এইমাত্র যা শুনলেন—অবশ্য স্ত্রীলোক চরে বিশ্বাস নেই ঠিক, মহামালীকে পাঠালে সে মৃত্তিকাপটে অঙ্কিত করে আনতে পারত—তাতে বৃক্ষ ও প্রস্তর সম্বল ক'রে কতক্ষণই বা যুদ্ধ করবেন ?

পলায়ন করারও সাহস নেই। কারণ বালীর হস্ত সুদূরপ্রসারী, ক্রোধও অনির্বাণ। সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা ছাড়া গতি থাকবে না। বরণ বলাও অতিশয়োক্তি। অনন্যোপায় মৃত্যুকে মৃত্যুবরণ বলা চলে না। নিহত হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না বলাই উচিত।

আর, তার পর ?

এতদিন যে ক্ষীণতম আশা সম্বল করে তারাদেবী দিন যাপন করছিলেন, তাও সমূলে বিনষ্ট হবে।

অস্থিরভাবে ছাদ, অলিন্দ এবং গৃহ বার বার পদচারণা বা যাতায়াত করতে করতে যখন প্রায় ধৈর্যের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছেন, তখন কিশোরী বিদিশার আগমনবার্তা পাওয়া গেল।

বিদিশা মহামান্য নলের পৌত্রী। এখন অসহায় ও নিঃসম্বল হয়ে পড়ায় ওঁর সংবাদ-সংগ্রহের কার্য গ্রহণ করেছে। অতিশয় চতুর ও বুদ্ধিমতী এই বালিকাটির বোধ করি অসাধ্য কিছুই নেই। ওঁর যতগুলি গুপ্তচর, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, তার মধ্যে এই মেয়েটিই যে সর্বগুণসম্পন্না, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

স্থিরবুদ্ধি, দূরদৃষ্টি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং বাক্‌সংযম—রাজনীতি সম্পর্কিত কার্যের পক্ষে যে চারটি মহৎ গুণ একান্ত আবশ্যক তার সবগুলিই এই কিশোরীটির —প্রায় বালিকার—আছে।

তারাদেবী ওর শক্তি, সাহস এবং ঔৎসুক্য লক্ষ্য ক'রে সেই কারণেই বিস্তর অর্থব্যয় ও অনুসন্ধান ক'রে আর্যভাষাবিদ্ এক ব্যক্তিকে আনিয়েছেন পারিশ্রমিকের অঙ্গীকারে—নিজের সম্মুখে রেখে বিদিশাকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করেছেন। নিজের সম্মুখে রাখার অর্থ, উনিও যাতে কিছুটা আয়ত্ত করতে পারেন এবং অপর কেউ ওঁর অজ্ঞাতে না করতে পারে।

শত্রুর বা প্রবল কোন দেশের ভাষা আয়ত্ত করা একটা প্রবল অস্ত্রসংগ্রহেরই তুল্য।

আর্যরা যেভাবে শনৈঃ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে ওদের সঙ্গে মিত্রতা

তথা বশ্যতাস্বীকার অথবা সংঘর্ষ অনিবার্য।

সে উভয় অবস্থাতেই—ওদের ভাষা সম্বন্ধে অন্ততঃ প্রাথমিক জ্ঞান আছে এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধিও রাখে—এমন গুপ্তচর অবশ্যই প্রয়োজন হবে। ও'র পুরুষ গুপ্তচরের সংখ্যাই সমধিক, তবে তাদের সাধ্য সীমিত, সেই জন্যই কয়েকটি স্ত্রী-সংবাদ-সংগ্রাহিকাও নিয়োগ করতে হয়েছে। যারা বাক্যের উপর বুদ্ধিকে স্থান দেয় অর্থাৎ রসনার রশ্মি যাদের হস্তগত এবং বাহবাস্ফোট বা আত্মপ্রচারের স্বাভাবিক লোভ দমন করতে পারে, এমন দেখেই অবশ্য এই কয়টি নারী সংগ্রহ করেছেন তিনি।

দেখে, বাজিয়ে—অর্থাৎ পরীক্ষা ক'রে।

তাদের মধ্যে বিদিশাই শ্রেষ্ঠ।

পুরুষ ও স্ত্রী উভয় কর্মীর মধ্যেই।

বিদিশার বুদ্ধি-উজ্জ্বল দৃষ্টি ও মুখের লালিত্য দেখে চিরদিনই তারাদেবী প্রসন্ন হয়ে ওঠেন, আজও তার ব্যতিক্রম ঘটল না।

যেন মন্ত্রবলে ওঁর ললাটের নিবিড় ভ্রূকুটি এবং দৃষ্টির অন্তঃপ্রসারজনিত শূন্যতা অন্তর্হিত হ'ল। তিনি একবারে হাতে ধরে এনে নিজের আসনে নিজের পাশে বসালেন।

বিধাতা যদি দিন দেন, কুমার অঙ্গদ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলে মহামতি নলের নিকট এই বালিকাটিকে উনি প্রার্থনা করবেন। রাজ্য কেন, এই বালিকাটি কালে সাম্রাজ্য শাসনের দক্ষতাও অর্জন করবে—এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত।

কিন্তু বিদিশা যে সংবাদ দিল, তাতে ওঁর মুখের প্রসন্নতা শারদ-শুভ্র মেঘের মতোই যেন দূর দিগন্তে বিলীন হ'ল।

চিন্তার পুঞ্জীভূত মেঘ এসে জমল মসৃণ ও কিছু পূর্বের উজ্জ্বল ললাটে। দুই ভ্রূকুটিবদ্ধ চক্ষুর আবারও যেন মনের কোন গভীরে এই সংবাদের পূর্ণ তাৎপর্য এবং তার মধ্য থেকে নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির সূত্র খুঁজে বেড়াতে লাগল।

সংবাদের প্রথম অংশ উৎফুল্ল হবার মতোই, কিন্তু দ্বিতীয়াংশ নয়।

বিদিশা অবশ্য এনেছে প্রচুর সংবাদ। ওদের কথোপকথন থেকে এতগুলি তথ্য সংগ্রহ করা বিস্ময়কর তো বটেই, প্রায় অবিশ্বাস্য।

ঐ দুটি যুবা পুরুষের মধ্যে যেটি বয়োজ্যেষ্ঠ, তার নাম রাম বা রামচন্দ্র। কনিষ্ঠটি লক্ষ্মণ।

উত্তরাখণ্ডের কোথায় নাকি এক কোশল দেশ আছে, তার অধিপতি মহাবীর্য-শালী দশরথের পুত্র এ'রা। আরও দুই পুত্র আছে তাঁর, তাঁরা দেশেই থাকেন। এঁদের সকলের জ্যেষ্ঠ হলেন রামচন্দ্র।

দশরথ বিগত হয়েছেন, কিন্তু রামচন্দ্র সিংহাসনে অধিরোহণ করতে পারেন নি। ওঁর এক বিমাতা যুদ্ধকালে আহত স্বামীকে যথেষ্ট সেবা ক'রে দুটি বরের

প্রতিশ্রুতি লাভ করেন। সেই বর—রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা হচ্ছে সংবাদ পেয়ে—দাবী করেন, দশরথকে তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দেন। সত্যবদ্ধ রাজার—ওঁরাও সুসভ্য অনার্য জাতিদের মতো সত্যপালনকে ধর্ম বলে মনে করেন—সে প্রতিশ্রুতি পালন ছাড়া পথ ছিল না।

তাঁর এক বরে সেই বিমাতার পুত্রকে সিংহাসন দিতে হয়েছে। অন্য বরে রামচন্দ্রকে বনবাসে আসতে হয়েছে। রামচন্দ্র নাকি মহাবীর এবং খুব জনপ্রিয়। তিনি নিকটে থাকলে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঁর ভ্রাতা ভরতকে অপসারিত ক'রে রামচন্দ্রকেই হয়ত বসিয়ে দেবে—সম্ভবতঃ এই আশঙ্কাতেই ওঁর বনবাসের ব্যবস্থা।

রামচন্দ্রের অবশ্যই তেমন কোন অভিপ্রায় ছিল না।

পিতার আদেশ পালন, পিতার অঙ্গীকারকে সত্য করা তাঁর কর্তব্য, তিনি সেইভাবেই কাজ করেছেন।

এমন কি, অসুস্থ মর্মাহত পিতার সুস্থ হওয়ার জন্যও অপেক্ষা করেন নি। তখনই, সেইদিনই তিনি চীর-বল্কল ধারণ ক'রে বনে চলে এসেছেন। মা অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, কিন্তু তিনি জানতেন, যতক্ষণ প্রিয়পুত্র সম্মুখে থাকবে, দশরথ লজ্জায় ও অনুশোচনায় দগ্ধ হবেন।

তবে তিনি একা বনে আসতে পারেন নি। ওঁর তরুণী স্ত্রী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা সঙ্গে এসেছেন—এক প্রকার ওঁর অনিচ্ছাতেই।

রামচন্দ্র নিজেদের রাজ্যসীমায় তো নয়ই, নিকটেও থাকেন নি।

গঙ্গা পার হয়ে ক্রমাগত দক্ষিণে এসে হিংস্র শ্বাপদ এবং তাদের অপেক্ষাও হিংস্র—রাক্ষস পিশাচ প্রভৃতি বন্য-বর্বর-মনুষ্য-অধ্যুষিত দণ্ডক-অরণ্যে নিজের বাসস্থান স্থির ক'রে নেন।

ক্রমে সে অরণ্যের প্রান্তসীমায় পঞ্চবটী নামে এক রমণীয়, নদী-পর্বত-ফলবান-বৃক্ষশোভিত অরণ্য নিজের বাসস্থান হিসাবে নির্বাচিত করেন এবং দীর্ঘকাল সেখানেই অবস্থান করেন।

সুখেই ছিলেন। পঞ্চবটী হিংস্র জন্তু ও হিংস্র মানব অধ্যুষিত হ'লেও অতি মনোরম ও নয়নানন্দদায়ক স্থান। সীতাদেবী ও রামচন্দ্র উভয়েরই খুব প্রীতিপ্রদ বোধ হয়েছিল। মনে হয়েছিল এর কাছে রাজ্যসুখও তুচ্ছ।

লক্ষ্মণ সর্বগুণোপেত একটি স্থান মনোনীত ক'রে সুন্দর এক কুটির নির্মাণ করেছিলেন। অদূরেই একটি রমণীয় সরোবর, সেখানে বালার্কবর্ণ রক্তোৎপল প্রস্ফুটিত। কিছু দূরে পুণ্যস্রোতা গোদাবরী নদী, একেবারে অগম্যও নয়। তার তীরে তীরে কুসুমিত বৃক্ষশ্রেণী, জলে হংস, সারস, চক্রবাক। নদীর ওপারে সু-উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ—সেখানে ময়ূররা অবাধে নিঃশঙ্কচিত্তে পুচ্ছ বিস্তার ক'রে নৃত্য করছে।

বন্য জন্তুদের আশঙ্কাতেই লক্ষ্মণ দৃঢ়ভিত্তিক, স্তম্ভশোভিত, সুরম্য এক পর্ণশালা প্রস্তুত করেছিলেন। প্রধানতঃ মৃত্তিকা নির্মিত হ'লেও সুপক্ব সুবৃহৎ

বংশে তাকে ঘাতসহ করা হয়েছিল। তদুপরি শমীপত্র, কুশ ও কাশের আচ্ছাদন। কোমল শুষ্কপত্র ও মৃগচর্মের শয্যা, ভক্ষ্য হিসাবে ফলমূল ও কোমল মাংসের প্রাচুর্য। এর থেকে অধিক কি সুখে রাজারা কাল কাটান!

বনবাসের নির্ধারিত কাল শেষ হয়েও এসেছে, এমন সময়ে এক অঘটন ঘটল।

কিছুদিন পূর্বে ওঁদের অনুপস্থিতিতে এক রাক্ষস এসে রামের স্ত্রী সীতা-দেবীকে হরণ করে নিয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তাঁকে উদ্ধার করা যায় নি।

তাতেই রাম শোকাকুল হয়ে সীতার অন্বেষণে দেশে দেশে ঘুরছেন।

কে নাকি এক রাক্ষসই ওঁদের উপদেশ দিয়েছে এ দেশে আসতে।

কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি সুগ্রীব অতি সজ্জন ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলে তিনি চারিদিকে সংবাদ-সংগ্রাহক চর প্রেরণ ক'রে কোন্ রাক্ষস হরণ করেছে, কোথায় রেখেছে— সীতা জীবিতা কি মৃতা—সব সংবাদ এনে দেবেন।

প্রয়োজনমতো, যদি যুদ্ধ করতে হয়—বাহিনী নির্মাণেও সহায়তা করবেন। একক কোন দেশ বা রাজ্য আক্রমণ করা যায় না—তা আক্রমণকারী যত বীরই হোন।

দীর্ঘ কাহিনী বিবৃত ক'রে বিদিশা বোধ করি নিরতিশয় ক্লান্ত হয়েই নীরব হ'ল।

কিন্তু তারাদেবী তাকে বিশ্রামের এমন কি নিঃশ্বাস গ্রহণেরও অবসর দিলেন না, তাঁর কৌতূহল আশা-আকাঙ্ক্ষা আর ধৈর্য মানছে না। তিনি ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তার পর? তা এদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?'

পরক্ষণেই হতাশা মিশ্রিত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'আর যোগাযোগ হয়েই বা লাভ কি? বোঝা গেল যে সংবাদ দিয়েছে, কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি সুগ্রীব, সে তার পরের ঘটনা অবগত নয়। সুগ্রীব নিজেই তো প্রায় এক বর্গ ক্রোশ স্থানের মধ্যে বন্দী। তিনি কি সাহায্য করবেন!'

বিদিশা একটু ক্লান্ত হাসির সঙ্গে বলে, 'না, মহাদেবী। সংবাদের এখানেই সমাপ্তি ঘটে নি। নিতান্ত শক্তির অভাবেই একটু নীরব হয়েছিলাম।'

'বল, বল। থামিস নি।' তারা ওর দুটো হাত চেপে ধরেন।

বিদিশা ধীরে ধীরে বলে, 'আমাদের জীবনে এক মহাবিপদ আসতে পারে এদের দ্বারা। মহা সর্বনাশ আসন্ন। সম্ভবত নেত্রবতী আপনাকে জানিয়েছেন যে, বনমধ্যে দুটি নিষাদকে দেখে তাদের আহ্বান ক'রে নিকটে বসিয়ে এ দেশের সংবাদ ও তথ্যাদি সংগ্রহ করছেন ঐ দুই ভ্রাতা। বস্তুতঃ তাদের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গেই আমার পক্ষে ওঁদের পরিচয় ও এখানে আগমনের হেতু জানা সম্ভব হয়েছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাতে কি হয়েছে? নিষাদরা কী এমন শত্রুতা করতে পারে?'

সংশয়ে, আশঙ্কায় অস্থির হয়ে ওঠেন তারাদেবী।

'পারে বই কি। একই তথ্য নানা ভাবে পরিবেশন করা যায় না কি? ঐ নিষাদ দুটি ওঁদের বক্তব্য ও উদ্দেশ্য শুনে বলেছে যে, মহামনা সুগ্রীব তো এক

প্রকার ও'র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হাতে বন্দী। এই ঋষ্যমূক পর্বত ত্যাগ ক'রে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই তাঁর। সুগ্রীবের সঙ্গে অনুচর ও সেবক হিসাবেও অল্পসংখ্যক লোক আছে। দুর্দশাগ্রস্ত, বিপন্ন, নির্বাসিত সুগ্রীবের কাছে কেউ আসেও না। তাঁর চর নিয়োগেরও কোন সাধ্য নেই। যে কয়জন সাথী ও'র সঙ্গে আছে, তারাও বালীর ক্রোধাগ্নির ভয়ে এই পর্বতসীমার বাইরে যেতে সাহস করে না। সুতরাং পরাজিত হতশ্রী বিপন্ন ব্যক্তির সঙ্গে মিত্রতা ক'রে কোন মঙ্গল নেই। তাঁর থেকে ওঁদের কর্তব্য, বালীর সঙ্গেই সখ্য স্থাপন করা। ও'রা যদি বালীর প্রিয়-কার্য-সাধন হিসাবে সুগ্রীবকে বন্দী ক'রে বালীর হস্তে প্রদান করেন, তবে বালী অবশ্যই প্রত্যুপকার হিসাবে ও'দের সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। বালী মহাশক্তিশালী, বিশ্বত্রাস বললেও অল্প বলা হয়। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। তিনি সহায় হলে ও'দের আর কোন অসুবিধাই থাকবে না।'

'তার পর? ও'রা কি বললেন?'

তারা এতক্ষণ প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বিদিশার সংগৃহীত সাংঘাতিক সংবাদ শুনছিলেন।

পাংশু বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল তাঁর মুখ। ললাটে চারুকবরীর প্রান্তে অসংখ্য স্বেদবিন্দু ফুটে উঠেছে এই অল্পকালের মধ্যেই। কথা বলার সময়ও স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর প্রকাশ পেল না—মনে হ'ল প্রায়-বদ্ধ দন্তপংক্তির মধ্য থেকে ক্রুদ্ধ সর্পীর মতো চাপা গর্জন উঠল একটা।

তারার উগ্র মূর্তি দেখে ও এই সর্পীবৎ কণ্ঠস্বরে বিদিশা যেন ভয় পেয়েই গেল, ধীরে ধীরে বলল, 'ও'রা তখনই কিছু বলেন নি। নিজেদের মধ্যে নিম্নকণ্ঠে কি আলোচনা করছিলেন। সে এতই নিম্নকণ্ঠ যে, অত উচ্চশাখা থেকে তা শ্রবণ সম্ভব নয়। আর, আপনি এই সংবাদের জন্য অধীর হয়ে থাকবেন, তা জানি বলেই দ্রুতবেগে এখানে চলে এসেছি। মুহূর্তকালও কোথাও বিশ্রাম করি নি।'

তারপর বোধ করি একটু নিশ্বাস নিয়ে এবং সেই সঙ্গে ঈষৎ সাহস সঞ্চয় ক'রেও, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তারার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর, ভাবলাম, এ ক্ষেত্রে যদি আপনার কিছু করণীয় থাকে, এই সর্বনাশ রোধ করার কোন প্রবল প্রয়াস, সে জন্যও অবিলম্বে আপনাকে এ সংবাদ শোনানো প্রয়োজন। কারণ এসব সময়ে কালক্ষেপ করার অর্থই সর্বনাশের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া। তাই না? ও'রা মনস্থির ক'রে কোন অকর্ম করে বসলে তা সংশোধনের তো আর কোন উপায় থাকবে না।'

তারা এই আসন্ন বিপদের কথা বিস্মৃত হয়ে কিছুক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

বিদিশা কি সত্যই বালিকা?

মধ্যে মধ্যে, বিশেষ ক'রে এইসব সময়ে কেমন যেন বিভ্রান্তি জাগে ও'র মনে।

এই বয়সে এত গভীর বুদ্ধি, দূরপ্রসারী দৃষ্টি এবং কার্যের গুরুত্ব বিচার ক'রে কর্তব্য নির্ধারণ করা, আর কারো দেখেন নি। কারো এমন কার্যের অগ্রাধিকার

সম্বন্ধে জ্ঞান আছে বলে শোনেনও নি।

মনে হয় বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বুঝি বালিকার বেশ ধরে ও'কে রক্ষা করতে এসেছেন।

কিন্তু এসব চিন্তার এখন সময় নেই।

আদৌ কোন সময় নেই। যা করতে হবে, এখনই, এই মুহূর্তে।

কি করতে হবে, তাও ভেবে নিয়েছেন। সংবাদটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই, চিন্তার যন্ত্রটা কার্য আরম্ভ ক'রে দিয়েছিল এবং একটা সঙ্কল্পে পে'ছিতেও বিলম্ব ঘটে নি।

তারাদেবী নিজের কণ্ঠ থেকে শ্বেতরক্ত-মিশ্রিত প্রবালের কণ্ঠহার খুলে বিদিশার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে বলেন, 'এটা তোর সামান্য পুরুস্কার। যদি দিন আসে, রত্নহার পরিয়ে দেব তোর গলায়। কিন্তু সে কথা এখন নয়। তুই খুবই ক্লান্ত বুঝতে পারছি—খুবই ক্লান্ত—সে তোর ঘর্মাক্ত কলেবর আর চক্ষুর অপরিসীম শ্রান্ত দৃষ্টি দেখেই বুঝছি। তবু তোকে বিশ্রামের অবসর দিতে পারব না বিদিশা। আমি, তুমি, তোমার বংশের অপরাপর সকলেই এক মহা সর্বনাশের সম্মুখীন হয়েছি। এ বিপদ যেমন অকস্মাৎ এসেছে, তেমনই ত্বরিতগতিতে—বিন্দুমাত্র কালহরণ না ক'রে সর্বপ্রযত্নে তার সম্মুখীন হতে হবে। সময় আর আদৌ নেই।'

বিহ্বল বিদিশা বলে, 'কিন্তু আপনার কি আদেশ, তাই তো এখনও জানলাম না।'

'আদেশ নয় বিদিশা। তোমার যা কার্য, তা তুমি সুন্দরভাবেই শেষ করেছ। এবার যা করার আমাদেরই করতে হবে। তুমি শুধু আমার সঙ্গে যাবে।'

'যেতে হবে? আপনার সঙ্গে? কিন্তু আপনি এখন কোথায় যাবেন?'

'ঐ যেখানে সেই দুটি রাজকুমার অবস্থান করছেন দেখে এসেছ, যে বৃক্ষতলে বসে নির্বোধ নিষাদগুলোর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন ও'রা—হয়ত এতক্ষণে সে আলোচনা শেষ হয়ে গেছে—সেইখানে যাব। ও'দের সঙ্গেই দেখা করব। আমি একাই যেতে পারতাম, তোকে কষ্ট দিতাম না; এখনই এতটা দুর্গম দীর্ঘ পথ ছুটে এলি—কিন্তু আমি তো সে স্থান জানি না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। অন্ধকার রাত্রি, আমি কোথায় তাদের অন্বেষণ করব? হয়ত সারা রাত্রিই ঘুরে বেড়াতে হবে। ততক্ষণে অনিষ্ট যা হবার হয়ে যাবে। তুই একটু কষ্ট ক'রে চল মা।'

'না না। আমার কষ্টের প্রশ্নই ওঠে না।' বিদিশা ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'আমি এখনও সে পথ তিন-চার বার যাতায়াত করতে পারব। কিন্তু দেবী, আপনার যে বড় কষ্ট হবে। অন্ধকারে বন্য পার্বত্য পথ অতিক্রম—সে তো আদৌ কোন পথই নয়—রাজধানীর সীমা যেখানে শেষ, সেখান থেকেই গভীর অরণ্য আরম্ভ। শিলাকীর্ণ, কণ্টক-গুল্মে পূর্ণ, সরীসৃপ শ্বাপদের রাজ্য সে। আপনি কেমন ক'রে যাবেন? প্রদীপ জেলেও যাওয়া যাবে না, প্রথমতঃ বাতাসে প্রদীপ থাকবে না।

দ্বিতীয়তঃ এই গাঢ় অন্ধকারে প্রদীপের আলো বহুদূরে থেকে দেখা যায়। কার চোখে পড়বে, সে যদি আলোক অনুসরণ ক'রে এসে অন্তরাল থেকে দেখে, এ সংবাদ প্রাসাদে প্রচার করে? প্রত্যূষকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না? ক্ষতি কি?'

উৎসুক মুখে ও'র দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে বিদিশা।

'যদি ওরা ইতিমধ্যেই মনস্থির ক'রে থাকে? যদি রাত্রেই এসে এখানে উপস্থিত হয়? অথবা ঊষার আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে? ওরা যেমন কাতর আর অস্থির তুই বলছিস, সামান্যমাত্র কালক্ষেপও ওদের কাছে অসহ্য বোধ হতে পারে। না বিদিশা, আমার মন বলছে আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করা ঠিক নয়। তুই একটু সঙ্গে চল শুধু, আর কোন দায়িত্ব নেই তোর। নয় তো নেত্রবতীকে ডাকতে হয়। তবে তাকে আমি নিতে চাই না, তার ওপর ঠিক কতটা আস্থা স্থাপন করা যায়—তার এখনও কোন পরীক্ষা হয় নি। এ বিপদে হিসাবের সামান্যতম প্রমাদও অধিকতর সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।'

'না, না। আমিই যাবো। আপনি যদি যেতে পারেন—আমার কোন কষ্ট হবে না। আপনি প্রস্তুত হোন।'

'প্রস্তুত! এখনই এই অবস্থায় যাবো। দাসীর একটা বহির্চ্ছদ রাখাই আছে, আচ্ছাদনী—সেইটেতেই আত্মগোপন ক'রে বেরিয়ে যাবো দুর্গ থেকে।'

॥ ছয় ॥

আরও একটি ব্যক্তি তারাদেবীর পূর্বেই রামচন্দ্রের অরণ্য-আবাসের নিকটে পেঁছে গিয়েছিলেন।

তিনি মহাবীর হনুমান।

সুগ্রীবের সর্বাপেক্ষা কর্মঠ, বুদ্ধিমান ও বিশ্বস্ত সেবক।

সুগ্রীবের সঙ্গে যাঁরা এই ঋষ্যমূকে এসেছেন—তাঁদের সকলেই বুদ্ধিমান, বলবীর্যেও তাঁরা ন্যূন নন—কিন্তু তাঁদের মধ্যেও হনুমান বিশেষ একজন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, সর্বাপেক্ষা বলশালী।

মনে হয় একটা পর্বত-শৃঙ্গ বহন করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে না—তেমন প্রয়োজন হলে। বস্তুত তাঁর অপেক্ষা অধিক দৈহিক শক্তি বালী ব্যতীত এ রাজ্যে কারও ছিল না। সেই জন্যই তাঁর অপর নাম মহাবীর।

এবং—তিনি বুদ্ধিমানই শুধু নন, রাজনীতিতে সুপণ্ডিত, কলাকৌশলে দক্ষ। এই আরণ্যরাজ্যে বাস ক'রে যতটা জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব তা তিনি করেছেন।

সবচেয়ে যা তাঁর প্রশংসার্হ, তা হ'ল তাঁর অসামান্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

আরও একটি ক্ষেত্রে তিনি একক—এ পর্যন্ত তাঁকে কেউ রমণীলোলুপ হ'তে দেখে নি।

এ হেন হনুমানই সংবাদ-সংগ্রহের ভার নিয়েছেন এই দুটি তরুণ যুবাপুরুষ সম্বন্ধে। সেই সঙ্গে যদি অবস্থা অনুকূল হয়, এঁদের অভিপ্রায় ও মনের গতি বুঝে—সখ্যস্থাপনও।

সেজন্য কিছু ছদ্মবেশও ধারণ করেছেন উনি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে এসেছেন। বাহুমূলে বদ্ধ একটি গ্রন্থোপম বস্তুও বস্ত্রাবৃত ক'রে আনতে ভুল হয় নি।

আয়োজন সবই প্রস্তুত। সাহসেরও অভাব নেই—তথাপি হনুমান তখনই ওঁদের সম্মুখে আসতে ইতস্ততঃ করছেন।

বড় বেশী শাণিত ও সাংঘাতিক অস্ত্র ওঁদের সঙ্গে। দৃষ্টি ক্রুদ্ধ, উদ্বিগ্ন—যেন সঙ্কল্পে দৃঢ় হওয়ারই পথ অন্বেষণ করছেন।

কি করতে এসেছেন ওঁরা, সে সংবাদ জেনেছেন।

দুটি নিষাদ ওঁদের সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে কি সব আলোচনা করছে, তা উনি দূর থেকেই লক্ষ্য করেছেন।

কী আলোচনা সেটা জেনেছেন—তারা যখন বনপথে নিজেদের আবাসের দিকে যাচ্ছিল তখন।

কিছুদূর যাবার পরই—ঐ দুটি আর্যদেশাগত তরুণের দৃষ্টি ও শ্রুতিসীমার বাহিরে যাওয়া মাত্র—দুটি বিরাট পুরুষ ও বলিষ্ঠ হস্ত দুজনের গলদেশে দিয়ে দু'জনকেই শূন্যে তুলে আছাড় দিয়েছেন।

তারপর ঐ ভয়ঙ্কর ব্যক্তির কাছে কোন কথা গোপন করবে—সে দুঃসাহস সামান্য পশুচর্ম-ব্যবসায়ীর থাকা সম্ভব নয়।

আর প্রয়োজনই বা কি?

ওরা তো কোন গোপনতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসে নি।

সবই বলেছে ওরা। সব কথা, ওরা কি পরামর্শ দিয়েছে তাও।

ফলে হনুমানের দুশ্চিন্তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সতর্কতার প্রয়োজনও বুঝেছেন।

ওঁরা কি স্থির করেছেন—সেটার একটু আভাস পেলেও অগ্রসর হতে পারেন। নতুবা, সুগ্রীব-বধেই ওঁরা যদি স্থিরনিশ্চয় হয়ে থাকেন, তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ওঁকে বধ করাও আশ্চর্য না।

সেই আভাসটা কিভাবে পাবেন, তাও বুঝতে পারছেন না।

জ্যেষ্ঠটি বসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন আর অর্ধস্ফুট স্বরে কী সব বলছেন। কনিষ্ঠও তার উত্তর দিচ্ছেন—তবে সর্বক্ষেত্রে নয়। হয়ত জ্যেষ্ঠ যা বলছেন তা প্রশ্ন নয়, স্বগতোক্তি।

আরও কিছুক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা ক'রে নিয়ে ওঁদের দিকে অগ্রসর হতে যাবেন, সহসা মহাবীরের সদাসতর্ক কর্ণে দূরাগত মৃদু পদশব্দ শোনা গেল।

খুবই দূরাগত খুবই মৃদু। শব্দ না করারই চেষ্টা করছে কেউ প্রাণপণে, কিন্তু শুষ্ক পত্রপল্লব আর উপলখণ্ডের উপর পদক্ষেপ—সহস্র সতর্কতাতেও একেবারে শব্দ রোধ করা যাবে না।

এবং সে সামান্য শব্দ এঁদের কর্ণে না পেঁছিলেও মহাবীরের কর্ণে প্রবেশ করবে।

এইজন্যই তিনি বিখ্যাত। জনশ্রুতি—তিনি যোজন-দূরের পদশব্দও শুনতে পান এবং সে শব্দ মানুষ কি পশুর, শ্বাপদ সরিসৃপ, কার পদক্ষেপের শব্দ, কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে যাচ্ছে বলে দিতে পারেন।

আজও শব্দ পাবার সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক এবং উৎকর্ণ হলেন। স্থির হয়ে যেন নিশীথ অন্ধকারের দিকে কান পেতে রইলেন।

না, পশু নয়। যে আসছে সে মানুষই।

আর—সেও নয়, যারা। দুটি প্রাণী আসছে।

একজন অল্প বয়স্ক, অপরজন কিছু বড় তার চেয়ে। একজনের পদশব্দ অতি লঘু আর একজনের দেহ কিছু ভারী, অর্থাৎ বয়স বেশী।

এখানে মানুষ!

এত রাত্রে, এত এই গহন অরণ্যে?

কে আসছে? কী উদ্দেশ্যে?

মহাবীর হনুমান তাঁর হস্তের যষ্টি, যেটাকে বৃদ্ধ ভিক্ষাজীবীর পথচলার অবলম্বন হিসাবে ধরে ছিলেন, সেটাকেই বজ্রমুষ্টিতে উদ্যত ক'রে রাখলেন। প্রয়োজনের সময় তিলার্ধ না বিলম্ব ঘটে।

যারা আসছে তাদের গতি খুবই দ্রুত, তাতে সন্দেহ নেই।

যদি এমন হয় যে, এই দুই যুবাকে কেউ আক্রমণ করতেই আসছে, অতর্কিতে, তাহলে অন্ততঃ ওদের প্রস্তুত হবার সময় তো দিতে পারবেনই। আর, যদি এদেশীয় কেউ হয়, তাহলে, একমাত্র বালী ছাড়া, তাঁর এই যষ্টি এবং দুটি হাতই যথেষ্ট।

একবার এমনও মনে হ'ল, বালীই আসছেন না তো? অকস্মাৎ এসে পড়ে এঁদের স্বদলে আনতে, এঁদের সঙ্গে সন্ধি ক'রে সুগ্রীবকে বন্দী বা নিহত করতে?

আবার তার পরই তার অসম্ভাব্যতা নিজের মনেই বুঝলেন।

ঐ নিষাদ দুটি এখনও বেশীদূর যায় নি। বিশেষ এই রাত্রে দুর্গের মধ্যে গিয়ে বালীকে সংবাদ দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, বালীরও এখন সে সংবাদ শোনার মতো অবস্থা নয়।

তবে এ সব চিন্তাই চোখের নিমেষে মনে খেলে গেল মহাবীরের। আর বেশী অবসরও ছিল না। কারণ গোপনচারীরা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ওঁর এবং ঐ দুটি যুবা পুরুষেরও দৃষ্টিসীমার মধ্যে এসে গেল।

কিন্তু, যারা এল—আর যত কথা বা যাদের কথাই কল্পনা করুন না কেন—তাদের কথা তাঁর মনের সুদূর দিগন্তেও দেখা দেয় নি।

দুটি স্ত্রীলোক।

কোশল রাজকুমারদের সম্মুখে যে অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল, তাতে অন্যমনস্ক

গভীর দুশ্চিন্তারত কুমাররা এ পর্যন্ত কোন নূতন কাষ্ঠ নিক্ষেপ করেন নি। ফলে, তার দীপ্তি অতিশয় স্তিমিত হয়ে এসেছে—তাতে দুটি স্ত্রীলোক দেখা গেলেও মুখ ভাল ক'রে দেখা বা চেনা গেল না।

একেবারে ওঁদের সম্মুখে এসে দাঁড়াতেও না।

কারণ যেটিকে বয়োজ্যেষ্ঠা বলে মনে হ'ল সে অবগুণ্ঠনবতী, কনিষ্ঠটি—আকৃতি দেখে মনে হয় বালিকাই—সে ওর পিছনে, ছায়ান্ধকারে।

তবে বেশীক্ষণ সংশয়ে থাকতে হ'ল না।

বিস্ময়, অপরিমাণ বিস্ময় এসে এবার সংশয়ের স্থান অধিকার করল।

রমণীটি সামান্যা দাসীর বহিচ্ছদ মোচন করা মাত্র মহাবীর যেন একটা সজোর দৈহিক আঘাতে দুই পা পিছিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের জন্য মনে হ'ল, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল তাঁর।

এঁরা সকলেই নিজেদের বিস্ময়ে অভিভূত ছিলেন বলে সে বিলম্বিত প্রশ্বাসের শব্দ কেউ পেল না।

তারাদেবী ?

বালীর প্রধানা সঙ্গিনী, কিষ্কিন্ধ্যার কর্ত্রী !

এত রাত্রে ? এই ভাবে ! একা ! সামান্যা দাসীর উত্তরীয়ে মুখ আবৃত ক'রে !

হ্যাঁ। একাই বলতে হবে। সঙ্গের বালিকাটিকে আর চিনতে অসুবিধা হয় নি মহাবীরের—মলের পৌত্রী, বিদিশা।

ও তো বালিকা মাত্র। ওর ভরসায় বন্যপথে আসাও যা, একা আসাও তাই।

বিদিশার কথাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই—কেন ওকে সঙ্গে এনেছেন তারা—তার কারণটা নির্ণয়েও বিলম্ব হ'ল না।

বিদিশা নিশ্চয় ওঁর গুপ্তচরের বৃত্তি গ্রহণ করেছে।

বিদিশাই এঁদের বার্তা নিয়ে পৌঁছেছে মহাদেবী তারার কাছে সেইজন্যই পথ-প্রদর্শিকা রূপেও তাকেই সঙ্গে আনতে হয়েছে।

কিন্তু তারার উদ্দেশ্য কী ?

উনি কি বালীর সঙ্গে সখ্য স্থাপনের অনুরোধ নিয়ে এসেছেন ?

তবে, তাই বা কেমন ক'রে হবে ?

মহাবীর আপনমহৈ মাথা নাড়েন। যতদূর উনি অবগত আছেন—তারাদেবী সুগ্রীবেরই কল্যাণপ্রার্থিনী।

তা হলে ?

অবশ্য এসব চিন্তা দুই-চার লহমার বেশী সময় নেয় নি মহাবীরের মনে খেলে যেতে—আর সেই অত্যল্পকালের মধ্যেই উত্তরও পেয়ে গেলেন।

কোশল রাজকুমাররা সেই সময়টায় সত্যই ইতিকর্তব্য নির্ধারণে নিবিষ্ট ছিলেন। বোধ হয় নিমজ্জিত ছিলেন বলাই উচিত।

কবন্ধ নামে মাংসপিণ্ডাকার একটা রাক্ষস মৃত্যুর পূর্বে ওঁদের সুগ্রীবের কথাই বলে গেছে, তাঁরই শরণ নিতে বলেছে। সুগ্রীব ধার্মিক, ভদ্র। সে ওঁর দুঃখও বুঝবে। অথচ এখানে এসে যা শুনেছেন, সুগ্রীবকে দিয়ে কতটুকু উপকার ওঁদের হবে? তাঁর কতটুকু সাধ্য? তিনি নিজেই তো বন্দী। রাজক্ষমতা যার হাতে আছে, সে-ই পারে ওঁদের অভীষ্ট সাধন করতে।

এই দুর্ভাবনায় মগ্ন ছিলেন বলেই এ পদশব্দ একেবারে নিকটে আসার পূর্বে পান নি।

সে শব্দ কানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দুটি মূর্তিও দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

আর পলকপাত মাত্রেই দুজনে উন্মুক্ত খড়্গহস্তে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

রাক্ষস পিশাচ বা এই শ্রেণীর নর-বিদ্বেষী কোন ব্যক্তি—ভাবাই স্বাভাবিক।

তবে, যাঁরা এসেছেন তাঁরাও—ওঁদের অনুমান বা আশঙ্কা কোন পথে যাবে তা জানতেন, পূর্বেই সে কথা চিন্তা করেছেন।

তাই সম্মুখবর্তিনীটি প্রায় নিমেষের মধ্যেই অবগুণ্ঠন মোচন ক'রে দুই হাত জোড় ক'রে আর্যদের মতোই নমস্কারের ভঙ্গী করলেন।

নারী! এবং সুচারুসজ্জিতা সভ্য নারী।

উদ্যত-খড়্গ দুজনের হস্তই অবনমিত হ'ল।

লক্ষ্মণ রামকে পুরোবর্তী রেখে নিজে পিছিয়ে এসে নির্বাপিতপ্রায় অগ্নিতে কিছু কাষ্ঠ ও শুষ্ক পত্রপল্লবাদি নিক্ষেপ করলেন।

প্রায় তৎক্ষণাৎ অগ্নি দ্বিগুণ তেজে বর্ধিত হ'ল। শুষ্ক পত্রের জন্য সে অগ্নি শিখাকারে উত্থিত হয়ে বেশ কিছু আলোকও বিকীরণ করল চতুর্দিকে।

সে আলোকে, রামচন্দ্রের এতক্ষণের অন্ধকারে অভ্যস্ত চক্ষু, এঁদের ভাল ক'রেই দেখল।

দেখলেন, এই নিশীথচারিণী অনার্যদুহিতা হলেও পরম রূপবতী এবং নিঃসংশয়ে সম্ভ্রান্তবংশীয়া।

তিনিও ঈষৎ আনত হয়ে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'মনস্বিনী, আপনি কে জানি না। কী উদ্দেশ্যে এসেছেন তাও বুঝতে পারছি না। যদি কোন কারণে বিপন্ন হয়ে থাকেন তো বলুন, আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি? আমি কোশল-নৃপতি বিশ্বত্রাস দশরথের পুত্র রাম, ইনি আমার অনুজ লক্ষ্মণ। আমাদের হস্তে অস্ত্র এবং দেহে একবিন্দু রক্ত বহমান থাকতে আপনার কোন আশঙ্কা নেই।'

মধুরভাষিণী তারাদেবী বললেন, 'ভদ্র, আপনাদের পরিচয় আমি পূর্বাহ্নেই সংগ্রহ করেছি। আপনাদের বিপদের কথাও শুনেছি। আমি এই দেশের অধিপতি মহাবল বালীর প্রধানা রমণী। এ অধীনার নাম তারা।'

রামচন্দ্রের অনিন্দ্যসুন্দর মুখকান্তি সংশয়-মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললেন, 'আপনি চরের মুখে আমাদের সকল সংবাদ সংগ্রহ করেছেন! আশ্চর্য! আপনার, না এদেশের শাসনব্যবস্থারই এমন নিপুণ সংবাদ-

সংগ্রহ ব্যবস্থা ?'

'এদেশের শাসক নিজের দৈহিক বলদর্পে নিশ্চিন্ত হয়ে নক্ষত্র-পরিবৃত চন্দ্রের মতো রমণী ও সুরায়, আনন্দকৌতুকে দিনযাপন করছেন। যাঁরা প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনা করতেন, তাঁরা নিজেদের ভাগ্যদোষে, বিনা অপরাধে সুগ্রীবের সঙ্গে নির্বাসিত, এই ঋষ্যমূক পর্বতের চতুঃসীমায় বন্দী।'

'তবে ?' প্রশ্নটা শেষ করতে পারেন না রামচন্দ্র, ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রেই চেয়ে থাকেন।

'আমি নিজেই কিছু বার্তা-সংগ্রাহক পালন করি। আপনাদের আগমন ও পরিচয় আমি পেয়েছি অপর এক গুপ্তচরীর মুখে। দুই নিষাদের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে আপনাদের বিপদ ও অপরিমেয় দুঃখ-বেদনার কাহিনী শ্রবণ করেছে আমার সঙ্গের এই বালিকাটি। এই বৃক্ষেরই এক শাখায় বসে সব শুনেছে সে। এর দেহ এতই লঘু, শাখামৃগীর মতোই এর গতিবিধি—সেজন্য আপনারা বিন্দুমাত্র কোন শব্দ পান নি। এমন কি যখন নেমে চলে গেছে, তখনও না।'

তারাদেবী এই পর্যন্ত নিজেদের পরিচয় এবং এখানে আগমনের এইটুকু যোগাযোগ জানিয়ে নীরবে ঈষৎ উৎসুক মুখে রামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তিনিও যেন এই আর্য যুবকটিকে বোঝার চেষ্টা করছেন। এ কতটা বিশ্বাসযোগ্য বা নির্ভরযোগ্য, এর বুদ্ধির গভীরতা কতখানি।

রামচন্দ্রও তাঁর আয়ত নেত্রের স্থির দৃষ্টি তারার আননের উপরই নিবদ্ধ রেখেছেন।

এভাবে পরনারীর মুখের দিকে চেয়ে থাকা হয়ত অভব্যতা, কিন্তু এ নারী এই গভীর রাত্রে নিজেই এসে দাঁড়িয়েছেন, নিজের মুখাবরণ উন্মোচন করেছেন—কোন বিশেষ বার্তা এনেছেন নিশ্চয়ই—কোন বিশেষ প্রস্তাব—এঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দোষ নেই।

তাঁরও এঁকে বোঝা প্রয়োজন—তুলাদণ্ডের মাপে এঁর মনের গতি তৌল করা।

অল্পক্ষণ পরে রামচন্দ্র বললেন, 'আপনি যখন সবই অবগত হয়েছেন, তখন অধিক ভূমিকার প্রয়োজন নেই। আপনি কি ঐ নিষাদদের অভিমতই সমর্থন করেন ? আমাদের কি তাহলে বালীর সহায়তা লাভের চেষ্টা করাই কর্তব্য ?'

'কদাচ না !' তারাদেবীর কণ্ঠস্বর এখনও যেন সর্পিণীর মতোই গর্জন করে উঠল, 'সেইজন্যই তো নিষাদদের পরামর্শ শ্রুতিগোচর হওয়ামাত্র আমি লজ্জা ও ভয় বিসর্জন দিয়ে এই অন্ধকার রাত্রে বিপজ্জনক পথে ছুটে এলাম। বালীর আশ্রয় গ্রহণ করতে গেলে অধিকতর বিপদে পড়বেন। সর্বনাশের যা সামান্য অবশিষ্ট আছে তাও থাকবে না। বালীই আপনাদের বন্ধন ক'রে সেই রাক্ষসের হাতে সমর্পণ করবেন। শুনলাম আপনারা সে অপহরণকারীর নাম কোন বৃদ্ধের মুখে শুনেছেন—রাবণ, কিন্তু তার পরিচয় বা গতিবিধি জানেন না। আমি জানি। রাবণ লঙ্কার রাজা, রাক্ষস জাতির মধ্যে সর্বাধিক পরাক্রান্ত। সে লঙ্কার

অধীশ্বর বটে, তবে এই বিশাল জম্বুদ্বীপের সর্বত্র তার গতিবিধি। সে কুবেরের বৈমাত্র ভ্রাতা—কিন্তু কুবেরের ঐশ্বর্য, এমন কি তাঁর পুষ্পক রথ পর্যন্ত বাহুবলে করায়ত্ত করেছে। আকাশপথে তার গতিবিধি, কখনও কৈলাসে, কখনও মলয় পর্বতে—ইচ্ছামতো বিহার করে। সে প্রবলপ্রতাপ, বোধ করি দেবতারাও তাকে ভয় করেন। কেবল একবার রাবণ বালীর সঙ্গে স্পর্ধা প্রকাশ করতে গিয়েছিল, তাঁকে জয় করতে পারে নি। দীনতা স্বীকার ক'রে মুক্তি পেয়েছিল। সেই হ'তে দু'জনার নিবিড় সখ্য। রাবণ সব দেশ থেকে বলপূর্বক রাজপ্রাপ্য আদায় করে, কেবল কিষ্কিন্ধ্যায় কদাচ আসে না।'

বিস্মিত রামচন্দ্র বললেন, 'কিন্তু আপনি বালীর প্রধানা মহিষী, তার ভার্যা, আপনি এইসব সংবাদ দিতে এসেছেন, এত রাতে এই শ্বাপদ ও তাদের থেকেও ভয়ঙ্কর হিংস্রপ্রাণী-সমাকীর্ণ বনপথে! এর অর্থ আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

'প্রধানা মহিষী ঠিকই।' অবজ্ঞায় ও ব্যঙ্গে তারার মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে, 'এখনও আমি পদবীতে ওঁর সঙ্গিনীদের মধ্যে অগ্রগণ্যা। যুবরাজ অঙ্গদ আমারই গর্ভজাত। তবে ভার্যা বা স্ত্রী বলতে আপনারা যা বোঝেন—ক্ষমা করবেন, বহু দূর দেশে চর প্রেরণ ক'রে আমি আপনাদের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠানের যে বিবরণ সংগ্রহ করেছি—আমাদের এখানে তেমন কোন অনুষ্ঠান বা প্রথা নেই, এক একজনের এক একটি রমণী চিহ্নিত থাকে এই পর্যন্ত। সে-ই তার স্ত্রীর কার্য করে। মানে আপনারা যাকে স্ত্রী বলেন তেমনি। আপনারা বহুবিবাহের দ্বারা একাধিক রমণী সম্ভোগের ব্যবস্থা রেখেছেন, আমাদের এখানে পুরুষরা একাধিক রমণী এমনিই গ্রহণ করে ইচ্ছা হ'লে। মেয়েদেরও তেমনি সে স্বাধীনতা আছে।'

এই পর্যন্ত বলে তারা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন।

ধীরে ধীরে ঈষৎ বেদনা-আবেগ-কম্পিত স্বরে বলতে লাগলেন—'আমার নিজের ব্যথা দিয়ে—স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা অবহেলিতা হওয়ার অবমাননা, একা একা দিনরাত্রি কাটানোর যন্ত্রণা দিয়ে বুঝি আপনার স্ত্রী কত সৌভাগ্যবতী। আপনি তাঁকে এত ভালবাসেন, তাঁর বিরহে প্রায় উন্মাদ হয়ে তাঁর সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অন্য নারী দ্বারা কাম চরিতার্থ করার চেষ্টা করেন নি—তিনিই আপনার ধ্যানজ্ঞান—আমার কাছে এর থেকে কোনো সৌভাগ্য অকল্পনীয়। সেই জন্যই আপনার জন্য আমার এত সহানুভূতি, আপনার প্রতি আমার এত শ্রদ্ধা। সেই কারণেই আমার এ দুঃসাহসও। প্রায় অভিসারিকার মতোই ঘন অরণ্য ভেদ ক'রে ছুটে এসেছি পথের বিপদ কি কষ্টের কথা চিন্তা না ক'রে। আপনি যাতে আপনার প্রিয়তমা স্ত্রীকে উদ্ধার, করতে পারেন, আপনার মর্মান্তিক দুঃখ দূর হয়, আপনি যাতে সুখী হতে পারেন, আর আপনার সঙ্গে মিলিত হতে পারে আপনার ভাগ্যবতী স্ত্রীও—সেই আমার এখন যেন একমাত্র চিন্তা।'

তারপর একটু সময় নিয়ে যেন নিজের আবেগ দমন ক'রে অধিকতর গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বললেন, 'বালীর কাছে গিয়ে পড়লে স্ত্রীকেও উদ্ধার করতে পারবেন না।

উপরন্তু নিজেরাই তার হস্তে বন্দী হবেন। ছলনার দ্বারা বন্ধন ক'রে রাবণের হাতে অর্পণ করবেন। তদুপরি আপনার স্ত্রী যদি সত্যই খুব রূপবতী হন, বালী তাঁকে হরণ ক'রে এনে নিজ অন্তঃপুরভুক্ত করবেন। রাবণও সাহস করবেন না ওঁকে বাধা দিতে।'

'শুচিস্মিতে,' রাম অভয় হাস্যে বলেন, 'আপনার এই উৎকণ্ঠা, আমার স্ত্রী সম্বন্ধে সস্নেহ উক্তিতে আমি কৃতার্থ বোধ করছি। তবে আপনিও নিশ্চিন্ত থাকুন, বালী যত বড় শক্তিমানই হোন, দাশরথির হস্তে ধনুর্বাণ বা অসি থাকতে তাঁর সাধ্য নেই আমাদের বন্দী করেন।'

'কিন্তু তিনি যদি কপটাচারের সাহায্য নেন? সখ্যের ছল ক'রে সমাদরে গৃহে নিয়ে নিদ্রিত অবস্থায় বন্দী করেন? তদ্ব্যতীত আপনি কি তাঁর সঙ্গে একক দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ী হতে সক্ষম হবেন? তিনি নিরস্ত্র দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করলে আপনার পক্ষে অস্ত্র দ্বারা বধ করা তো সম্ভব নয়।'

'কেন নয়?' পিছন থেকে লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ কন্ঠ এবার শোনা যায়, 'হিংস্র জন্তুদের কি আপনারা অস্ত্র, প্রস্তর অথবা অগ্নির সাহায্যে বধ করেন না? হস্তপদাদির সাহায্যে তাকে বশীভূত করার চেষ্টা করেন? কখনও কখনও কৃত্রিম গুহার সৃষ্টি ক'রে উপরে সামান্য পত্রপল্লব দিয়ে আহার্যের লোভ দেখিয়ে শ্বাপদদের এনে বন্দী করেন এবং তারপর সেই অসহায় আকস্মিক-বন্দীদশাপ্রাপ্ত পশুদের কি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করেন, না তৎক্ষণাৎ বধ ক'রে নিশ্চিন্ত হন? বালীর যেরূপ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি, কেবলমাত্র পশুবলই যার সম্বল, তাতে সে যে ব্যাঘ্র ঋক্ষ সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রাণী এমত তো বোধ হচ্ছে না তাকে।'

রামচন্দ্র অনুজকে বাধা দিয়ে শান্ত কন্ঠে তারাদেবীকে প্রশ্ন করলেন, 'ওসব কথা এখন থাক সৌমিত্রি। চারুশীলে, আপনি আমাদের এখন কি করতে বলেন?'

'আপনি সুগ্রীবের সঙ্গেই মিত্রতা স্থাপন করুন। তাঁকে বন্ধুরূপে সাহায্য ক'রে তাঁকে বালীর প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষা থেকে ত্রাণ করলে কিষ্কিন্ধ্যার সমস্ত নরনারী আনন্দের সঙ্গেই সুগ্রীবকে তাদের অধিপতি বলে স্বীকার করবে। তখন তাঁর পক্ষে রাবণের আবাস অন্বেষণ করা, কি সীতার অবস্থা ও অবস্থানের সংবাদ সংগ্রহ করা সুসাধ্য হবে। তিনিই এ রাজ্যের যুদ্ধপটু বানরবাহিনীসহ আপনার সঙ্গী হতে পারবেন। সুগ্রীব সদাচারী, সত্যবাদী, সুসভ্য। তদুপরি, কিষ্কিন্ধ্যার যাঁরা কর্মদক্ষ, বুদ্ধিমান, সৎ রাজকর্মচারী, তাঁরা প্রায় সকলেই সুগ্রীবের সহচররূপে নির্বাসিতের জীবন-যাপন করছেন। তাঁরা মুক্তিলাভ করলে আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে ও সৎ পরামর্শ দিতে পারবেন। আপনি যত বড় বীর ধনুর্ধরই হোন, একা কী সেই রাক্ষসপুরী ধ্বংস করতে বা তাদের দমন করতে পারবেন?'

'দেবী, আপনি সুখী ও সৌভাগ্যবতী হোন। ঈশ্বর আপনার কল্যাণ করুন।

আপনার উপদেশ শুনে মনে হচ্ছে, আমার এই দুঃখ দেখে অবশেষে স্বয়ং দেবতারা এক দেবদূতী প্রেরণ করেছেন। আপনার সহানুভূতিসম্পন্ন মিষ্ট বাক্য ও পরামর্শে আমি যথেষ্ট আশ্বাস ও সান্ত্বনা লাভ করলাম। মনে আশারও আলোক দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ভদ্রে, বালীর অনিষ্ট হ'লে আপনার ক্ষতি হবে না? আপনার দুঃখের কারণ ঘটবে না?'

শুষ্ক পত্রাদির প্রজ্বলন্ত বহ্নির আলোক ম্লান হয়ে এসেছে। এখন শুধু বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডগুলির অগ্নি ও অঙ্গারের যা আভা—তবু তাতেও রাম এবং অন্তরালবর্তী মহাবীর দেখতে পেলেন, তারার দুটি মাদকতাময় চক্ষুতে মুহূর্তের মধ্যে কি বিদ্যুৎ ঝলকিত হ'ল।

তিনি স্পষ্ট ও কঠিন স্বরে বললেন, 'সে সম্ভাবনা না থাকলে আপনাদের এই সুপরামর্শ দিতে ছুটে আসব কেন? বালীর সঙ্গে দীর্ঘদিনই আমার কোন প্রণয়ের সম্পর্ক নেই। বোধ করি তিনি আমাকে ভুলেই গেছেন। না, বালী না থাকলে এখন যেভাবে দিন কাটাচ্ছি, তার থেকে দুঃখে কাটবে না।'

রাম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বেশ! তবে সুগ্রীবের সঙ্গে কোথায় যোগাযোগ হবে, কী ভাবে তাঁর দেখা পাব?'

'আমার মনে হয়, তিনিও নিশ্চয় আপনাদের আগমনের সংবাদ পেয়েছেন, লক্ষ্যও রাখছেন। আপনাদের অভিপ্রায় অনুকূল বুঝলে তিনিই সম্ভবতঃ যোগাযোগের ব্যবস্থা করবেন। না হয় আমিই প্রত্যুষে তাঁকে সংবাদ প্রেরণ করব। এই বালিকাই কোন কোন দিন সূর্য উদয়ের পূর্বে ওর পিতামহর নিকটে যায়, সে-ই আপনার এ মনোভাব ও সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেবে।'

তারা আর বিলম্ব করলেন না। আনত হয়ে করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে নিমেষমাত্রে সেই মলিন বহিচ্ছদটি তুলে নিয়ে ঘনীভূত অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

॥ সাত ॥

মহাবীর হনুমান অন্তরাল থেকে তারার এই অপূর্ব কথনভঙ্গী, কণ্ঠস্বরের বিষয়োপযোগী আশ্চর্য পরিবর্তন, যুক্তি ও বুদ্ধির বিস্ময়কর মিলন দেখে মুগ্ধ, অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন।

মনে মনে অজস্র সাধুবাদ দিচ্ছিলেন তিনি মহাদেবী তারাকে। এবং সেই অনুপাতেই এই অমূল্য রত্ন অবহেলায় হারাবার জন্য বালীকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন। বালী যদি এই রাজ্যের সম্পূর্ণ শাসনভার তাঁর এই প্রধানা সঙ্গিনীর উপর ন্যস্ত করতেন, তাহলে এ রাজ্যের অনেক উন্নতি ঘটত। অনেক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হ'ত এ দেশ।

সময় অনুকূল, ভূমি তো তারাদেবীই প্রস্তুত ক'রে দিয়ে গেলেন।

তবে সেইজন্যই আরও—তখনই ওঁদের সম্মুখে যাওয়া যায় না।

মহাবীর আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন।

তবে অধিককাল বিলম্ব করতেও হ'ল না। বন্যকুক্কুট প্রভৃতি সদ্যনিদ্রোত্থিত পক্ষীরা অল্প কিছু পরেই কলবর ক'রে উঠে নিশা অবসান ঘোষণা করল।

আরও কিছু পরে নিবিড় বনান্ধকার ভেদ ক'রে ঊষার আবির্ভাব বার্তা ফুটে উঠল বহ্নি-সমুদ্ভূত আলোকের পাণ্ডুর হয়ে যাওয়ায়।

এ-ই যথা সময়।

মহাবীর বৃদ্ধজনোচিত কণ্ঠশ্লেষ্মা অপসারণের শব্দ এবং হস্তাস্থিত যষ্টির শব্দ করতে করতে এবার ওঁদের সম্মুখে এলেন।

যেন পথে যেতে যেতে অগ্নি দেখে নিতান্ত কৌতূহল-ভরেই দুই পা এদিকে চলে এসেছেন।

অতঃপর কিছুক্ষণ দুই চক্ষুর উপর হাত দিয়ে—বার্ধক্যের অভিনয় সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন—ওঁদের নিরীক্ষণ করার চেষ্টা ক'রে ব্রাহ্মণোচিত আশীর্বাদের অভয় মুদ্রার ভঙ্গী করলেন। বললেন, 'বীরগণ, তোমরা কে? কোথা থেকে আসছ? তোমাদের বর্ণ উজ্জ্বল, কান্তি সুকুমার। তোমাদের তো দেখছি ব্রতপরায়ণ তাপস বা ব্রহ্মচারীর বেশ। অথচ আকৃতি রাজসদৃশ। বরং দেবতুল্যও বলা যায়। তোমরা এই গহন অরণ্যে কিসের বা কার অন্বেষণে এসেছ? তোমাদের প্রকৃত বৃত্তি কি? তোমরা চিরধারী সন্ন্যাসী, তথাপি তোমাদের দেহপ্রভায় এই বনস্থলী, ঐ নদীতীর যেন উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। তোমাদের দেখছি বন্য হিংস্র জন্তু সম্বন্ধে আশঙ্কামাত্র নেই। মনে হয়, তাদের পূর্বেই বশীভূত করেছ অথবা তেমন সকলকে বধ করেছ। তোমাদের স্কন্ধ-বিলম্বিত শরাসন দেখলে ইন্দ্রেরও আশঙ্কা জন্মাবে। তোমরা সিংহবৎ স্থির নেত্রে চারিদিক অবলোকন করছ। তত্রাচ তোমাদের দেখে এবং ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে অবসাদগ্রস্ত ও বিষণ্ণ বোধ হচ্ছে। তোমরা সভ্য লোকালয়ে অবস্থান বা বিহারেরই যোগ্য, এই বনের মধ্যে কী কারণে এসেছ? তোমরা কি দেবলোক থেকে এখানে এসেছ? তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে, যেন সূর্য ও চন্দ্রই এই বনান্ধকারে আত্মগোপনের চেষ্টা করেছেন। তোমাদের কোদণ্ড স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত সুবর্ণ-খচিত বজ্রের মতো মনোহারী ভয়ঙ্কর বোধ হচ্ছে। পৃষ্ঠের তূণীরগুলি প্রাণান্তকর অগ্নিময় সর্পসদৃশ সুশাণিত অস্ত্রে পূর্ণ। তোমাদের দীর্ঘ খড়্গ করীশৃঙ্গবৎ ভুজদণ্ডেরই উপযুক্ত। তোমরা দুই মহাবীর কি সাগর-বন-পর্বতপূর্ণ দুই মেরুমধ্যবর্তী পৃথিবীকে জয় করতে বেরিয়েছ?'

অকস্মাৎ প্রাক্-প্রভাত কালে এই অদ্ভুতদর্শন বৃদ্ধকে দেখে ও তাঁর মুখে কাব্যানুরূপ বাক্যবিন্যাস শুনে দুই রাজকুমার এতই বিস্মিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তখনই কোন উত্তর দিতে পারলেন না। বিমূঢ়বৎ নিঃশব্দে চেয়েই রইলেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে থেকে মহাবীর পুনশ্চ বললেন, 'কী, তোমরা আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? তোমাদের কি পরিচয় দানে কোন বাধা আছে? বেশ, আমিই নিজের পরিচয় দিচ্ছি। এই ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীব নামে এক বীর বাস করেন। তিনিই এই রাজ্যের প্রজাসাধারণ নির্বাচিত প্রকৃত অধিকারী, ধর্মপরায়ণ,

সৎস্বভাব ব্যক্তি। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত, নির্বাসিত করেছেন এবং তাঁর রমণীকেও হরণ করেছেন। এজন্য একান্ত দুঃখিত মনে তিনি এখানে কালযাপন করছেন। আমি তাঁরই এক মন্ত্রী। তাঁর আজ্ঞামতোই এখানে এসেছি। আমার নাম হনুমান। সুগ্রীব তোমাদের মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করতে আগ্রহী। সেই কারণেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশে আমার এখানে আগমন। এবার তোমাদের কথাও কিছু অবগত হতে চাই।'

রাম সরাসরি মহাবীরকে উত্তর না দিয়ে লক্ষ্মণকে সম্বোধন করে বললেন, 'বৎস, আমরা সুগ্রীবেরই অন্বেষণ করছিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁরই এক মন্ত্রী আমাদের কাছে এসেছেন। এ দৈবেরই যোগাযোগ। এই মন্ত্রীবর বীর, বুদ্ধিমান ও সুবক্তা। তুমি এর সঙ্গে আলাপ করো। ইনি যেভাবে কথা বলছেন, তাতে মনে হচ্ছে তিনি এদেশবাসী হলেও ওঁর তিন বেদে সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং আর্য ভাষার সমগ্র ব্যকরণ ইনি অবগত হয়েছেন। ইনি বিস্তর কথা বললেন, কিন্তু একটিও অপশব্দ ব্যবহার করেন নি। এঁর বাক্যগুণে ইনি আসন্ন বধোদ্যত নিষ্ঠুর আততায়ীর মনও প্রসন্ন করতে পারেন। তুমি এঁর কাছে আমাদের পরিচয় দাও এবং এখানে আসার কারণ বলো।'

লক্ষ্মণ অগ্রবর্তী হয়ে নমস্কার জ্ঞাপনান্তে সংক্ষেপে এখানে আসার হেতু বিবৃত করলেন।

নিঃসন্তান রাজা দশরথের বৃদ্ধবয়সে চারিটি পুত্র হয়। তার মধ্যে এই রাম জ্যেষ্ঠ, ভরত মধ্যম, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন তৃতীয় ও চতুর্থ। রাম প্রধানা মহিষী কৌশল্যার গর্ভজাত, ভরত কেকয়রাজনন্দিনী কৈকেয়ীর পুত্র। ওঁরা দুজন সুমিত্রা নাম্নী তৃতীয়া মহিষীর।

রাম বয়োপ্রাপ্ত হলে দশরথ তাঁর উপর রাজ্যের শাসনভার অর্পণ ক'রে অবসর নিতে চেয়েছিলেন। সকলেই তাতে আনন্দিত। কারণ রাম সকলেরই প্রিয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিমাতা কৈকেয়ী দশরথের নিকট বহুদিনের প্রতিশ্রুত দুটি বর প্রার্থনা করলেন—এক বরে রামচন্দ্র চীরবল্কলধারী হয়ে চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনে যাবেন, দ্বিতীয় বরে ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন।

রাজা দশরথ মর্মাহত হলেও এর অন্যথা করতে পারলেন না। তিনি বহু দিনের সত্যবদ্ধ। অগত্যা সেই মতোই আদেশ দিতে বাধ্য হলেন। ভরত তখন মাতুলালয়ে ছিলেন। তাঁর কাছে দূত প্রেরিত হ'ল। তবে রাম আর সেজন্য অপেক্ষা করলেন না। কারণ তিনি জানতেন, ভরত কখনই এতে সম্মত হবেন না। তাছাড়া তিনি যতদিন থাকবেন, দশরথের আত্মগ্লানির সঙ্গে লজ্জাও যোগ হবে। তিনি সেইদিনই বল্কল ধারণ ক'রে বনে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তবে উনি একা আসতে পারেন নি, স্ত্রী সীতা বা জানকী এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণ স্বেচ্ছায় প্রায় রামচন্দ্রের অমতেই সঙ্গে এসেছিলেন।

সেই শোকে দুঃখে দশরথ অল্প ক'দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। ভরত এসে প্রথমে রাজ্যভার নিতে চান নি। রামকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন।

কিন্তু রাম অনেক বুঝিয়ে ও'কে নিরস্ত করেন। এই চতুর্দশ বৎসর গত হবার পূর্বেই তিনি যদি ফিরে গিয়ে সিংহাসনে বসেন, দশরথ মিথ্যাবাদী হয়ে যাবেন নাকি? ভরত এই চৌদ্দ বৎসর ও'র প্রতিনিধি হয়েই রাজ্য শাসন করুন।

ভরত তখনকার মতো বিষণ্ণ চিত্তে ফিরে গেলেন। পাছে আবার এইরূপ চেষ্টা হয়, এই আশঙ্কায় ও'রা আরও দক্ষিণে সুদূর দণ্ডকারণ্যে চলে এলেন এবং শেষ পর্যন্ত ঐ বনের প্রান্তভাগে পঞ্চবটী নামে একটি রমণীয় স্থানে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। সেখানে স্বচ্ছতোয়া কলস্বিনী নদী, নানাবিধ পুষ্পপ্রসূ বৃক্ষ, বনজ ফলমূল ও কুক্কুটমৃগমাংস প্রভৃতির প্রাচুর্য থাকায় স্থানটি ও'দের খুবই মনোরম বোধ হয়েছিল।

সুখেই ছিলেন ও'রা। বস্তুত রাজসুখভোগের সঙ্গে নানারূপ অশান্তি থাকে —এখানে অনাবিল শান্তি। বিপদ ও এই দারুণ অশান্তি দেখা দিল একেবারে শেষের দিকে, মাত্র কিছুদিন পূর্বে। আর সে বিপদ ও বিসম্বাদ ঘটল লক্ষ্মণকে উপলক্ষ ক'রেই।

ও'রা যে কদর্য জীবনযাপনকারী আমমাংসভোজী নিম্নশ্রেণীর অনার্যদের রাক্ষস নামে অভিহিত করেন, সেই জাতীয়া একটি নারী, বীভৎসদর্শনা— সূর্পনখা নাম—একদা বনমধ্যে লক্ষ্মণকে দেখে কামার্ত হয়ে বিবাহের প্রস্তাব করল। স্বভাবতঃই লক্ষ্মণ সম্মত হলেন না। তাঁর স্ত্রী আছে, তাও জানালেন। কিন্তু সে স্ত্রীলোকটি তখন এমনই অধীর হয়ে উঠেছে যে, বলপূর্বক ওঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে গেল। লক্ষ্মণ অল্পবয়স্ক, তাঁর ক্রোধ ও ঘৃণা দুই-ই অধিক। তিনি ঐ স্ত্রীলোকটার নাসাকর্ণ ছেদন ক'রে তাকে আরও বীভৎসাকৃতি ক'রে দিলেন।

সূর্পনখা কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে নিকটে তার যে সব আত্মীয়রা ছিল, তাদের সংবাদ দিল। তারা ক্রুদ্ধ হয়ে সদলবলে এল রাম-লক্ষ্মণকে বিনাশ করতে, ও'দের কোমল মাংস শল্যপক্ব ক'রে আহার করবে বলে। কিন্তু তারা সংখ্যায় অধিক হলেও তাদের অস্ত্র বলতে কিছু ছিল না। প্রধানতঃ বাহুবল ও ছলনাই ভরসা। অধিকন্তু বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ও বৃক্ষ। এ'দের সঙ্গে নানাবিধ প্রাণঘাতী শাণিত অস্ত্র, বিশেষ ভয়ঙ্কর আগ্নেয়াস্ত্র—তার সামনে ওরা দাঁড়াতে পারবে কেন? বেশির ভাগই নিহত হ'ল। কিছু কোনমতে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করল। সূর্পনখা এ'দের এতখানি শক্তির কথা কল্পনাও করতে পারে নি। সে এবার ভয় পেয়ে কোথায় তার ভাই রাক্ষসরাজ রাবণ আর পর্বতাকার কুম্ভকর্ণ আছে—তাদের সংবাদ দিল। এটা এ'দের অনুমান, সঠিক জানেন না। জটায়ু নামে এক বৃদ্ধ রাজা দশরথের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনিই, রাবণ একটি বধূকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে দেখতে পান, সীতা ক্রন্দনের মধ্যেই নিজের পরিচয় দিচ্ছিলেন, যদি কেউ শুনতে পায় তো কোনদিন রাম সংবাদ পাবেন এই আশায়। জটায়ু বাধা দেবারও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাবণ তাকে নিদারুণ প্রহার ক'রে প্রায় হতচেতন ক'রে

অনায়াসেই সীতাকে নিয়ে চলে যায়।

রাম-লক্ষ্মণ যখন ইতস্তত: সীতাকে অন্বেষণ করতে করতে ওঁর কাছে আসেন, তখন জটায়ুর শেষ অবস্থা। সে বৃদ্ধ মৃত্যুর পূর্বে শুধু এই কথাটি বলতে পেরেছিলেন—রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ ক'রে নিয়ে গেছে।

এখন মনে হয়, রাবণ জাদুবিদ্যা জানত। তাঁরই মায়াজালে সীতা দেখেন একটি সুন্দর স্বর্ণমৃগ তাঁদের কুটিরের কাছে বিচরণ করছে। তিনি রামকে অনুরোধ করেন হরিণটি ধরে দিতে। রামকে দেখে হরিণ ছুটতে থাকে, রামও তার অনুসরণ ক'রে বহুদূরে গিয়ে পড়েন। এদিকে দীর্ঘকাল অদর্শনে তাঁর বিপদ আশঙ্কা ক'রে লক্ষ্মণও তাঁর সন্ধানে যান। মনে হয়, নিকটেই কোথাও সে দুর্বৃত্তটা আত্মগোপন ক'রে ছিল। ওঁদের কুটির-সীমা থেকে নির্গত হতে দেখেই এসে ধরে নিয়ে গেছে সীতাকে।

দীর্ঘ ইতিহাস শেষ হ'ল যখন—সূর্য বেশ খানিকটা উঠে গেছেন। নিবিড় বনানীর ঘন পত্রপল্লব ভেদ ক'রেও দিন দেখা দিয়েছে স্পষ্ট হয়ে।

এঁদের দুঃখের কাহিনীতে আর্দ্রচিত্ত মহাবীর গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বললেন, 'আমার মনে হয়, আজকের এই প্রভাতসূর্য একই সঙ্গে তোমাদের ও সুগ্রীবের সৌভাগ্য-সূর্য রূপে উদিত হয়েছেন। সুগ্রীবের দুর্ভাগ্যের অবসান আসন্ন বলেই তোমরা এই ঘোর দুঃখে নিপতিত হয়েছ। আর তোমাদের সে দুঃখ রজনী প্রভাত হওয়া আসন্ন বলেই তোমরা এখানে এসে পড়েছ। চলো, আর কালাবিলম্বে প্রয়োজন নেই। আমরা এখনই সুগ্রীবের নিকটে যাই।'

॥ আট ॥

সুগ্রীব আদ্যোপান্ত সমস্ত ইতিহাস শ্রবণ ক'রে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করলেন, তার পর বললেন, 'এখন আমার বোধ হচ্ছে সেদিন আকাশপথে যাঁর আর্তনাদ ও বিলাপ শুনেছি, তিনিই আপনার স্ত্রী জানকী। তখনই বুঝেছিলাম, কোন দুর্বৃত্ত এক ভদ্র গৃহস্থবধূকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার তো কিছু করার ছিল না। ওরূপ উড্ডীয়মান যান পূর্বে কখনো দেখিও নি। এমন যে হয় তাও জানি না। তদ্ব্যতীত— আমি তো প্রকৃতপক্ষে এখানে বন্দী।'

তারপর কিছুক্ষণ যেন কী স্মরণ করার চেষ্টা করে বললেন, 'তবে তিনি বোধ করি আপনাদেরই উদ্দেশে— মানে রাক্ষসটা কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছে, উনি কোন্ পথে যাচ্ছেন জানাতেই—কিছু কিছু অলঙ্কার ফেলে গিয়েছিলেন। সেগুলি আমি যত্ন ক'রে তুলে রেখেছি। একটু অপেক্ষা করুন, আপনাদের তা দেখাচ্ছি। নিশ্চয় আপনারা চিনতে পারবেন।

বলতে বলতে তিনি উঠে গিয়ে গুহাকক্ষের অভ্যন্তর থেকে কেয়ূর, কঙ্কণ ও নূপুর এনে দেখালেন।

সেগুলি দেখামাত্র প্রায় টেনে নিয়ে সবলে বুকে চেপে ধরে রামচন্দ্র হাহাকার

ক'রে কেঁদে উঠতে আর চিহ্নিত করার কোন প্রশ্নই রইল না।

লক্ষ্মণের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না।

তিনিও প্রথমটা অধিকতর দুঃখে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন।

ওঁদের সচেতন করলেন মহাবীরই।

বেশ একটু কঠিন স্বরেই বললেন, 'পুরুষ এবং বীর—বিশেষ আপনারা ক্ষত্রিয় সন্তান—এঁরা কখনও রোদন করেন না। এঁদের চোখে জল থাকে না, থাকে অগ্নি। অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ পুরুষের কাছে ধর্মাচরণ। এখন আর বৃথা কালক্ষেপে প্রয়োজন কি? যত শীঘ্র সম্ভব সে পাপাচারীর অনুসন্ধান ও মাতা জানকীর উদ্ধারকার্য আরম্ভ করা যায় ততই মঙ্গল।'

এই এক কথাতেই রাম ও লক্ষ্মণ দু'জনেই শোক পরিহার ক'রে প্রকৃতিস্থ হলেন।

রাম সুগ্রীবকে প্রশ্ন করলেন, 'এক্ষণে আপনিই বলুন, আপনার কোন্ প্রিয় কার্য সম্পাদন করলে আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন?'

সুগ্রীব বললেন, 'দেখুন, এক্ষেত্রে বৃথা বাক্যজাল বিস্তার বাঞ্ছনীয় নয়। আমি যা বলছি, তাতে ঠিক কোন শর্ত আরোপ করছি না। প্রয়োজন বলেই বলছি। বালী নিহত না হলে আমি রাজ্য ফিরে পাব না, স্বাধীনভাবে কোন কার্য করাও সম্ভব হবে না। রাজ্য ফিরে না পেলে চর প্রেরণ বা বাহিনী গঠন কিভাবে করব বলুন? আপনি যদি আমার রাজ্যপ্রাপ্তি ও শত্রুনাশের পথ প্রশস্ত ক'রে দেন, বালীরূপ জীবন-কণ্টক দূর করেন, তা হলেই আমি আপনার দাস হয়ে সেবা করব। প্রাণপাত ক'রেও আপনার কার্য উদ্ধার করব।'

রাম কিছুক্ষণ অবনত মস্তকে চিন্তা ক'রে বললেন, 'কিন্তু বালী তো আমার কাছে কোন কারণে অপরাধী নয়, তাকে বধ করা আমার পক্ষে অধর্ম হবে না?'

এর উত্তর দিলেন মহাবীর। বললেন, 'বালী মৃত জেনে—এক বৎসরেরও অধিক কাল তিনি অদৃশ্য, অজ্ঞাত ও অনুপস্থিত ছিলেন—রাজ্যের প্রধানগণ সর্বসম্মতিক্রমে সুগ্রীবকে শাসকপদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং ন্যায়তঃ ধর্মতঃ এ রাজ্য সুগ্রীবেরই। বালী ফিরে এসে সে ঘটনার সত্যাসত্য নির্ধারণের চেষ্টামাত্র করেন নি, সুগ্রীবকে নির্যাতন ও আমাদের বধ করার সঙ্কল্প ঘোষণা ক'রে বলপূর্বক সুগ্রীবের রমণীকে নিয়ে শয়নকক্ষে চলে যান। সেই থেকেই আমরা এখানে নির্বাসিত। ঋষিশাপে এই স্থান বালীর পক্ষে মৃত্যুজনক, অগম্য, তা না হলে সে আমাদের এতদিন কবে বধ করত। এক্ষেত্রে সুগ্রীবের রাজ্য পুনরুদ্ধার করা কিছুমাত্র অধর্ম নয়, আর আপনি যদি মহামনা সুগ্রীবের সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা মিত্রতাবন্ধ হন, তাহলে সুগ্রীবের সহায়তা করা আপনার অধর্মাচরণ হবে কেন? আমি যত দূর আপনাদের যুদ্ধের রীতিনীতি অবগত আছি, কোন দুই পক্ষে যুদ্ধের কারণ ঘটলে উভয়পক্ষই তাঁদের মিত্ররাজগণকে সাহায্যার্থ আমন্ত্রণ জানান এবং নৃপতিগণও সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করা ধর্ম বলে বোধ করেন—তাই নয় কি?'

রামচন্দ্র বলেন, 'কিন্তু আমি তো কেবল দৈহিক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারব না ওর সঙ্গে, আমাকে অস্ত্র দ্বারাই ওকে বধ করতে হবে।'

মহাবীর হাস্য করলেন। বললেন, 'আপনাদের আর্যাবর্তে কোন রাজা যখন এক রাজার সঙ্গী বা বন্ধুরূপে যুদ্ধে যোগ দেন, তখন পূর্বাহ্নে প্রতিপক্ষ কোন্ কোন্ অস্ত্র ব্যবহার করবেন, তা জেনে কেবলমাত্র সেই অস্ত্রগুলিই নেন, না অধিকতর শক্তিশালী ভয়ঙ্করতর অস্ত্র নেবার চেষ্টা করেন? আপনি এক দেশের নৃপতি আর এক দেশের ভাগ্যহত নৃপতির সাহায্যার্থে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছেন—এ কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন?'

রাম কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, 'এ যুক্তি মেনে নেওয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই। সুতরাং সেই আয়োজনই করুন।'

সুগ্রীব তখনই শুষ্ক পত্র এবং কিছু শুষ্ক বৃক্ষশাখা সংগ্রহ ক'রে, তাতে অগ্নি সংযোগ করলেন। রামচন্দ্র এবং সুগ্রীব দুজনেই সেই অগ্নিকে প্রদক্ষিণ ক'রে এবং স্পর্শ ক'রে মিত্রতাপাশে বদ্ধ হলেন। সেদিন থেকেই দুজনেই দুজনের বন্ধু হলেন—আমরণ। বিপদে সম্পদে, উৎসবে শ্মশানে সর্বত্র সর্বদা বন্ধু।

অতঃপর বালী বধের আয়োজন। তবে সে আয়োজনে তখনও একজনের যেন উৎসাহের অভাব।

এত বাক্য বিনিময়ের পরও সুগ্রীব সংশয়পূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'বন্ধু রামচন্দ্র, এখনও সম্যকভাবে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করো। বালীর বাহুবল অপরিসীম, অসাধারণ। কারও সঙ্গেই তুলনীয় নয়, কারও ধারণায় সে শক্তির সামগ্রিক রূপ পাওয়া সম্ভব নয়। বোধ করি একটা সুবৃহৎ গিরিশৃঙ্গ উৎপাটিত করে সে গেণ্ডুয়ার মতো ক্রীড়া-বস্তু হিসাবে ক্রীড়া করতে পারে। বহু বলবীর্যশালী ব্যক্তি ও'কে সাক্ষাৎ শমন বোধে শঙ্কিত থাকেন, দূরে পরিহার করেন।'

রাম সুমধুর হাস্যে ও'কে অভয় দিয়ে বললেন, 'বন্ধু, দেহের বল যতই অপরিমাণ হোক, অস্ত্রের সঙ্গে তা তুলনীয় নয়। দৈহিক বলের পরীক্ষা হয় সাক্ষাৎ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে, সে ক্ষেত্রে তিনি আমাকে সহজেই পরাজিত করতে পারবেন। কিন্তু আমার সঙ্গে যা আছে, এ সবই দূরনিক্ষেপী সাংঘাতিক অস্ত্র; বিশেষ আগ্নেয় অস্ত্রগুলি সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাই নেই, পলকপাত মাত্রে তা অনায়াসে অর্ধ যোজন অতিক্রম করে এবং বধ্য ব্যক্তি—সে দূরাগত, সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপী অস্ত্র সম্বন্ধে সচেতন হওয়ারও পূর্বে, বিপদ আশঙ্কা করার পূর্বেই—নিহত হন। বালীবধ আমাদের কাছে তাই ক্রীড়ার মতোই সহজসাধ্য কাজ।

তবু সুগ্রীবের সংশয় ও অগ্রজ সম্বন্ধে আতঙ্ক কাটে না।

তিনি বলেন, 'বালী একসঙ্গে সাতটি তাল বৃক্ষ উৎপাটনের শক্তি রাখেন!'

রাম উত্তর দেন, 'তেমন শ্রেণীবদ্ধ তালকুঞ্জ নিকটে কোথাও আছে?'

মহামান্য নল নীরবে অঙ্গুলি সঙ্কেতে এক সারিতে দণ্ডায়মান সাতটি সুবৃহৎ তাল বৃক্ষ দেখিয়ে দিলেন।

রামও কোন বাক্যব্যয় করলেন না, ধনুঃশর তুলে কিছুদূরে পশ্চাদপসরণ ক'রে সেই তালগাছগুলির মধ্যভাগ লক্ষ্য ক'রে একটি তীর নিক্ষেপ করলেন।

শর ধনুচ্যুত হ'ল কিনা, ঘটনাটা কি ঘটছে, সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার অবসর পেলেন না বানর-দলপতি সুগ্রীব। তার পূর্বেই সেই শাণিত শরটি একে একে সাতটি তাল বৃক্ষই ভেদ ক'রে বহুদূরের একটি প্রস্তরখণ্ডে গিয়ে প্রোথিত হ'ল?

সুগ্রীব কিছুটা আশ্বস্ত হ'লেও সম্পূর্ণরূপে বুঝি ভীতিমুক্ত হতে পারেন না।

একটু অপ্রতিভভাবে একটা বিশাল শিলাখণ্ড—বোধ করি শতাধিক স্থূলতনু মনুষ্যের তুল্য ওজন হবে—দেখিয়ে বললেন, 'বালী ঐ শিলাখণ্ড তুলে বেশ কয়েক যোজন দূরে নিক্ষেপ করতে পারেন।'

রামচন্দ্র এবারও কোন উত্তর দিলেন না, পরন্তু যেন নিতান্ত অবহেলাভরেই একটি মাত্র শর নিক্ষেপে সে পর্বতাকার প্রস্তর শত খণ্ডে চূর্ণ ক'রে দিলেন।

এবার, রামচন্দ্রের এই প্রায়-অলৌকিক অবিশ্বাস্য শক্তির পরিচয় পেয়ে, বিস্ময়বিহ্বল সুগ্রীব ভূমিলুণ্ঠিত হয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালেন।

গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন, 'তোমাকে বন্ধু বলতে আর সাহস হচ্ছে না। তোমার বীর্য ও শস্ত্রদক্ষতা দেখে আমার বোধ হচ্ছে, স্বয়ং ইন্দ্রও তোমার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হবেন। তুমি মনে হয় স্বয়ং ঈশ্বর, আমার দুঃখ দেখে আমাকে ত্রাণ করতে দেহ ধারণ করেছ।'

রামচন্দ্র মধুর হাস্যে ওঁকে বলপূর্বক উঠিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে বললেন, 'কিন্তু তুমি আরও শক্তিমান নয় কি? তোমার ঈশ্বর আজ তোমার শরণাগত?'

সকলের মিলিত মন্ত্রণায় স্থির হয়েছিল, সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যা রাজপ্রাসাদের বহির্দেশে উপস্থিত হয়ে হুঙ্কার ও আস্ফালন প্রকাশ ক'রে বালীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবেন। অহঙ্কারী উদ্ধত বালী অবশ্যই সে আস্ফালন সহ্য করবেন না, তিনি দুর্গের বাহিরে আসবেন ও সুগ্রীবকে সমুচিত শিক্ষা দিতে চাইবেন। এই শ্রেণীর দুই বিপুলকায় ব্যক্তির বাহুযুদ্ধের জন্য প্রশস্ত উন্মুক্ত ও বৃক্ষপাদপ-শূন্য মল্লভূমিও নির্বাচন প্রয়োজন হবে। রামচন্দ্র সেই নির্বাচিত যুদ্ধস্থানের পার্শ্ববর্তী কোন সুবৃহৎ প্রাচীন বৃক্ষচ্ছায়ায় আত্মগোপন ক'রে থাকবেন, সুগ্রীব দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে পরাস্ত হচ্ছেন দেখামাত্র উনি শাণিত শরনিক্ষেপে বালীকে বধ করবেন।*

এ সবই রামচন্দ্র ও মহাবীরের যৌথ পরামর্শে স্থিরীকৃত হয়েছিল।

বহু বিবেচনায় ও আলোচনার পর এ পরিকল্পনা গৃহীত হলেও, এ প্রশ্নের একটা দিক উভয়ের কেহই চিন্তা করেন নি।

রামচন্দ্র বালীকে দেখেন নি, মহাবীর দেখেছিলেন। তাঁরই এ সমস্যাটা চিন্তা

* "ঐ সময় রাম ধনুধারণপূর্বক বৃক্ষের ব্যবধানে প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিলেন।"
—বাল্মীকি রামায়ণ।

করা উচিত ছিল।

তিনি সকল সম্ভাবনাই হিসাবে ধরেছিলেন, কেবল একটি তথ্য ছাড়া।

বালী ও সুগ্রীব বলবীর্যে বা প্রকৃতিতে সমতুল্য না হলেও উভয়ের আকৃতি ছিল একই রকম প্রায়। দু'জনে পাশাপাশি থাকলে নিকট আত্মীয় বা নিতান্ত অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ব্যতীত অপরের পক্ষে কে কোন্‌টি তা অনুমান করা কঠিন হ'ত।

আরও বিপদ হ'ল ওঁদের বেশের সাদৃশ্য।

সুগ্রীব যখন মল্লকচ্ছ পরিহিত অবস্থায় কিষ্কিন্ধ্যা রাজভবনের বহির্দেশে গিয়ে মেঘগর্জনবৎ হুঙ্কার ও আস্ফালন আরম্ভ করলেন, তখন প্রথমটায় বালী বুঝতেই পারেন নি, কার এত সাহস এবং দুর্মতি হ'ল। কারণ সুগ্রীবের এত দুঃসাহস হবে, তা ওঁর স্বপ্নেরও অগোচর। পরে, ওঁর অন্তঃপুরবাসিনীরা এসে সুগ্রীবের আগমন সংবাদ দিলে, ক্রোধে আত্মহারা হয়ে যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই—অর্থাৎ পরিধানে যে বস্ত্র ছিল, তাকেই মল্লকচ্ছে রূপান্তরিত করতে করতে দুর্গ থেকে বহিষ্ক্রান্ত হলেন এবং সম্মুখে প্রজা সমাবেশের জন্য প্রস্তুত উন্মুক্ত মসৃণ সমতল ভূমিতেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

এখানেও সমস্যার কিছুমাত্র সমাধান হ'ল না। কারণ পরিধেয় বস্ত্র দুজনকারই এক বর্ণের, এক ধরনের। একই ভাবে পরা।

রামচন্দ্র তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো পার্শ্বস্থ বনভূমিতে এক সুবিশাল সর্জবৃক্ষের অন্তরালে ধনুর্বাণ হস্তে প্রস্তুত হয়েই অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু কে বালী, কে বা সুগ্রীব, তিনি নির্ধারণ করবেন কিভাবে?

সুগ্রীব যে দণ্ডাধিক কাল বালীর বিক্রম সহ্য করতে পারবেন না—মহাবীর তা জানতেন।

এও জানতেন যে অল্পক্ষণ পরেই সুগ্রীবের কটিদেশ ধরে মৃত্তিকা হতে ঊর্ধ্বে উত্থিত করে বহু দূরের কোন শিলাপট্টে কি শৈলগাত্রে নিক্ষেপ করবেন বালী।

তিনি ত্রাসকম্পিত কণ্ঠে রামচন্দ্রকে প্ররোচিত করতে লাগলেন, 'আর কিছুমাত্র বিলম্ব করবেন না, এখনই আপনার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র নিক্ষিপ্ত করুন।'

রামচন্দ্র নিজেই যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত, নিদারুণ লজ্জা বোধ করছিলেন নিজের নিরুপায় নিষ্ক্রিয়তায়।

অথচ কর্তব্য কি, তাও স্থির করতে পারছিলেন না।

তিনি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মহাবীরকেই প্রশ্ন করলেন, 'অস্ত্র তো নিক্ষেপ করব—কিন্তু কার উপর? যদি বালীর পরিবর্তে মিত্র সুগ্রীবকেই বধ করে বসি? তুমি আমাকে কোনো চিহ্ন বলতে পারো—যাতে আমি সুগ্রীব বা বালী কোন্‌টি কে বুঝতে পারি?'

মহাবীরও এবার বিপন্ন বোধ করেন।

তিনি অবশ্য দু'জনকেই চিনতে পারছেন কিন্তু চিহ্ন কি বলবেন? কিভাবে রামচন্দ্রকে বৈসাদৃশ্যটা বোঝাবেন?

ইতিমধ্যে সুগ্রীব নিস্তেজ ও প্রহারে জর্জরিত হয়ে উঠেছেন। আরও

নিগৃহীত বা মৃতকল্প হওয়ার পূর্বেই কোনমতে তিনি অগ্রজের বাহুমুক্ত হয়ে পলায়ন করলেন—একেবারে গভীর বনপথ ধরে ঋষ্যমূকের উদ্দেশে।

বাধাপ্রাপ্ত প্রমোদবিলাস বা প্রমদাসম্ভোগের আকর্ষণ জিঘাংসা কি প্রতিশোধ-স্পৃহা অপেক্ষা অধিক প্রবল ব'লে বালী আর তখনই পরাজিতের পশ্চাদ্ধাবন করলেন না, তাই রক্ষা। নচেৎ ঐ গুরুতর প্রহৃত অবস্থায় সুগ্রীব দ্রুত ঋষ্যমূকে পেঁছিতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও মহাবীর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওঁর পশ্চাদনুসরণ করছিলেন।

তখন প্রহারে ক্ষত-বিক্ষত, অপমানে মৃতকল্প সুগ্রীব এক বৃক্ষকাণ্ডের উপর হেঁটমুণ্ডে বসে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন। তাঁর দুই চক্ষু নিরুদ্ধ ক্রন্দনে লোহিতাভ। সর্বাঙ্গে বালীর অবিশ্বাস্য দৈহিক বলের চিহ্ন।

রামচন্দ্রকে দেখেই তিনি ক্ষোভে ও রোষে যেন ফেটে পড়লেন। বললেন, 'সখা, এ তোমার কি ব্যবহার? আমি যে বালীর সম-যোদ্ধা নই, তা জেনেই তো এই দীর্ঘকাল নির্বাসিত জীবনযাপন করছি। তাতে দুঃখ ছিল, কষ্টও ছিল, কিন্তু অপমান বা লজ্জার কারণ ছিল না। এ তুমি কি করলে? আমার প্রজাবর্গের নিকট, কি অনুচরদের সম্মুখে মাথা তুলে দাঁড়াবার পর্যন্ত উপায় রাখলে না। তুমি কোন সাহায্যই করতে পারবে না জেনেও বৃথা আমাকে উত্তেজিত ও মিথ্যা আশান্বিত করলে কেন?'

তখন রাম ও মহাবীর উভয়েই বিনয় বচনে তাঁকে প্রবোধ দান ক'রে সঙ্কটজনক পরিস্থিতিটা তাঁকে বুঝিয়ে বললেন।

এ ক্ষেত্রে যে ভ্রমের সম্ভাবনা ছিল, তা সুগ্রীবের পক্ষে প্রাণান্তক হতে পারত এবং সে ক্ষেত্রে রামচন্দ্রের পক্ষেও সকল আশার বিনষ্টি ঘটত।

এক্ষণে উপায়? সুগ্রীব কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করলেন।

উপায় রামচন্দ্রই বলে দিলেন।

কিছুদূরে বনতল আলোকিত ক'রে একটি পুষ্পভারশোভিতা নাগপুষ্পীলতা যেন বর্ণসমারোহ সৃষ্টি ক'রে রেখেছে।

রাম লক্ষ্মণকে বললেন, 'বৎস, তুমি ঐ লতা এনে একটি মাল্য রচনা করো এবং তা সুগ্রীবের কণ্ঠে বিলম্বিত ক'রে দাও। মাল্যধারী সুগ্রীবকে চিহ্নিত করতে আর অসুবিধা হবে না।'

লক্ষ্মণের আহরিত পুষ্পিত লতার মাল্য পরিধান ক'রে সুগ্রীব আশ্বস্ত ও আশান্বিত হলেন।

অতঃপর তাঁরা গোপনে পুনশ্চ কিষ্কিন্ধ্যার দুর্গের নিকটে এসে বনান্তরালে এক প্রস্রবণ-তীরে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

স্থির রইল যে, পরদিন প্রভাতে পুনশ্চ দুর্গের সিংহদ্বারে গিয়ে সুগ্রীব সিংহনাদপূর্বক বালীকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করবেন।

।। নয় ।।

এ সমস্ত মন্ত্রণা ও জল্পনা, যুদ্ধের বিবরণ অর্থাৎ সুগ্রীবের শোচনীয় পরাজয় এবং উভয়কে বিচ্ছিন্নভাবে চিহ্নিত করার কৌশল অবলম্বন—কিছুই তারার অবিদিত ছিল না।

তাঁর গুপ্তচররা, বিশেষ বালিকা বিদিশা প্রভাতকাল থেকেই ক্ষণে ক্ষণে সকল সংবাদ তাঁকে পেঁাছে দিচ্ছিল।

পরাজয়ের সংবাদে তারা অতটা বিচলিত হননি, কারণ তিনি জানতেন—অনুমান করেছিলেন, কোথাও একটা কিছু ভুল হয়ে গেছে। সে ভুল অচিরে সংশোধিত হবে। এখন এই নাগপুষ্পলীতার মাল্য রচনার কথা শুনে তাঁর অনিন্দ্য ললাটে দুশ্চিন্তা ও অসন্তোষের ভ্রূকুটি ঘনীভূত হ'ল।

ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ তাচ্ছিল্য এবং অনুকম্পা মিশ্রিত বিদ্রূপের হাসিও দেখা দিল।

এই বুদ্ধি নিয়ে এরা যুদ্ধ করে! রাজ্য রক্ষা ও রাজ্য অধিকার কামনা করে!

প্রাত্যাহিক জীবনের সামান্য তুচ্ছ তথ্যও লক্ষ্য করে না।

অহরহ চতুর্দিকে যা ঘটছে, সে সম্বন্ধেও এরা উদাসীন।

আশ্চর্য!

পুরুষের দৈহিক বল ছাড়া আর কোন যোগ্যতা নেই। বুদ্ধিতে, মানবচরিত্র-পঠনে ও নিয়ন্ত্রণে স্ত্রীলোকের অনেক বেশী যোগ্যতা।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বিদিশাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের কক্ষে গেলেন। কতকগুলি বিচিত্র বর্ণের পরিধেয় বস্ত্র শয্যার উপর রেখে, তীক্ষ্নধার প্রস্তরাস্ত্রে তা খণ্ড-বিখণ্ড করলেন। তারপর সেগুলি প্রস্তর-পাত্রে রক্ষিত এক প্রকার বৃক্ষরসের সাহায্যে—যা ওঁর প্রসাধনে প্রয়োজন হয়, কোন রূপসজ্জা দেহের বা বস্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত রাখার জন্য—সেই বল্কলসঞ্জাত বস্ত্র দিয়ে পুষ্প রচনা করলেন এবং সেগুলি একসঙ্গে গ্রথিত ক'রে মাল্যে পরিণত করলেন।

না, নাগপুষ্পীর মতো নয়—আরও উজ্জ্বল বর্ণের।

দুরূহ কার্য সময়সাপেক্ষ।

নিপুণতার অভাব নেই, তবে তা আছে বলেই—সূক্ষ্ম শিল্প রচনায় পারদর্শিনী বলেই—তারা জানেন, এসব কার্যে দ্রুত হস্তচালনা অনভিপ্রেত।

সন্ধ্যা ঘনীভূত হ'ল। ক্রমে রাত্রিও এল। সে রাত্রিও গভীরতর হ'ল। এক সময় প্রথম প্রহরের যামঘোষ রবও উঠল চতুর্দিকের বনস্থলী থেকে। প্রাসাদের বিবিধ জীবনচাঞ্চল্যও নীরব হয়ে এল। শুধুই মধ্যে মধ্যে বন্য জন্তুর গর্জন ব্যতীত সমস্ত জগৎসংসারের যেন এক অখণ্ড নীরবতা নেমে এল।

মাল্য রচনা অবশেষে একসময় সমাপ্ত হ'ল। ক্লান্ত বিদিশাকে নিজের অঙ্কে তুলে নিয়ে স্নেহচুম্বনে তাকে আদর ক'রে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললেন, 'মা, তুই

অনেক কষ্ট করেছিস সারাদিন, খুবই পরিশ্রান্ত বুঝতে পারছি। তবু তোকে মিনতি করছি, আর একটু কষ্ট কর। যা হোক অল্প কিছু আহার ক'রে নে, সুপক্ব বহু ফল এখানেই আছে, তারপর গোপন পথে, সম্ভব হলে অভ্যস্ত পথ ছেড়ে, বৃক্ষে উঠে শাখা থেকে শাখান্তরে যাবার চেষ্টা করে তুই একবার সুগ্রীবের কাছে যা। আমার নাম ক'রে বলবি, ঐ পুষ্পমাল্য ত্যাগ ক'রে এই বস্ত্র-প্রস্তুত মাল্য পরিধান ক'রে যেন কাল বালীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। নাগপুষ্পীলতা যতই ঘাতসহ হোক, দুই মহাবলীর দেহঘর্ষণে, বিশেষ হস্তচালনায়, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। যদি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া মাত্র রামচন্দ্র বালীকে বধ করতে না পারেন তাহলে পুনরায় সেই একই সমস্যা দেখা দেবে। আর সুগ্রীবের প্রাণসংশয় হওয়াও আশ্চর্য নয়। কারণ মাল্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন স্খলিত হলেই কে কোন্ জন তা বোঝা কঠিন হবে।'

বিদিশা যখন এই বার্তাসহ বস্ত্রমাল্য সুগ্রীবের হস্তে অর্পণ করল, তখন কৃতজ্ঞতা, প্রেম, দ্বিগুণিত কামনা প্রভৃতি বিভিন্ন মনোভাবের সমন্বয়ে সুগ্রীবের দুই চক্ষু সেই ঘোর নিশীথের তিমিরান্ধকারেও শ্বাপদের চক্ষুর মতোই জ্বলে উঠল।

কামনাই সমধিক। এ নারীকে তার নিজস্ব ক'রে পেতেই হবে। তার জন্য সুদ্ধমাত্র অগ্রজ কেন, সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলেও তিনি করবেন।

বিদিশাকে পাঠালেন তারা বালীবধ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই। তার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে অন্ধকার বহিরলিন্দে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু বিদিশা ফিরে এসে সুগ্রীবের কৃতজ্ঞতা ও আজ্ঞানুবর্তিতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ক'রে বিশ্রাম করতে যাওয়ার পরও বহুক্ষণ পর্যন্ত তাঁর শ্রান্ত দুই চোখে নিদ্রার আভাস মাত্র দেখা দিল না।

কিন্তু, এতকাল—দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, এঁদের সংবাদের জন্য আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা প্রভৃতির যে কারণ ছিল—নিশ্চিন্ত না হতে পারার ; যে কারণে এতকাল বিশ্রাম বা নিদ্রায় সুখ কি শান্তি ছিল না, বরং নিরন্তর অনবসরেই দিন কেটেছে—অদ্যকার এ অস্থিরতার কারণ তা নয়!

বরং বিপরীত।

বালীর মৃত্যুকে প্রায় নিশ্চিত করার পর থেকেই কোথায় একটা বিবেকের দংশন অনুভব করছেন মনে মনে।

ও'দের কাছে অপরিচিত ও অবিশ্বাস্যরূপ বিস্ময়কর—রামচন্দ্রের অস্ত্রগুলির যে বিবরণ উনি শুনেছেন—শূন্যগর্ভ বংশনলের সাহায্যে দূরে থেকে নিজের চোখেও দেখেছেন কিছু কিছু—তাতে বালীর মৃত্যু যে অবধারিত, সে সম্বন্ধে আর সংশয়ের অবকাশ নেই।

এখন—কোন এক বিচিত্র কারণে ভিন্নমুখী এই প্রশ্ন জাগছে মনে—তিনি কেন

সেই মৃত্যুকে নিশ্চিততর ক'রে তুলতে গেলেন, ওঁদের বৈরহুতাশনে এই সহজদাহ্য সমিধ নিক্ষেপ করলেন ?

হ্যাঁ, বালী ওঁকে উপেক্ষা করেছেন। সম্ভবতঃ ওঁর অস্তিত্বই ভুলে গেছেন এতদিনে এটা সত্য ; তবে সে আচরণকে উনি বিশ্বাসঘাতকতা বলতে পারেন না কোনমতেই।

ওঁদের সমাজে আর্যদের মতো বিবাহপ্রথা নেই। অগ্নি সাক্ষী ক'রে শপথও করতে হয় না। তত্রাচ, সে সমাজেও বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। নৃপতিরা, ধনী ব্যক্তিরা বহু নারী সম্ভোগ করেন এবং নবীনা বধূ আসার পরও পুরাতন সম্বন্ধে পূর্ববৎ আগ্রহ বা আসক্তি থাকে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তা থাকা সম্ভবও নয়।

বালী ও'র সন্তানের পিতা। বালীর অবর্তমানে ও'র পুত্রেরই এ রাজ্য শাসন করার কথা। বালী ও'কে অবহেলা করা ছাড়া বা ও'র সম্বন্ধে নিস্পৃহ হওয়া ছাড়া আর কোন অপরাধ করেন নি। তাও কোন কোন দিন, কদাচিৎ কখনও যে তারাকে স্মরণ করেন না, তাও তো নয়।

তবে কেন এ কাজ তিনি করতে গেলেন ?

সুগ্রীব তাঁকে যেভাবে পূজার মতো ক'রে ভালবাসে, বালী হয়ত সেভাবে বাসেন না, কিন্তু সে তো ব্যক্তিগত রুচি ও মানসিক গঠনের কথা। দানবের মতো যার দৈহিক শক্তি, তার ক্ষুধাও সেইমতো হবে। সেখানে রুচির প্রশ্নই ওঠে না। আর ও'র প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও সুগ্রীবেরও তো বহু নারী সম্ভোগে আসক্তি কম নেই। অথবা, রুমা প্রধানা ও প্রথমা সঙ্গিনী হলেও তাতেই মন স্থির নেই।

এ-ই পুরুষ। সব পুরুষই এই। তবে তিনি এমন ও এত কাণ্ড করতে গেলেন কেন ? নিরঙ্কুশ রাজ্যলাভের পরও সুগ্রীবের এই পূজা ও স্তুতি যে অব্যাহত থাকবে, তারই বা নিশ্চয়তা কি ?···

এক্ষণে আর হস্তচ্যুত অক্ষ কি সম্বরণের কোন উপায় নেই ?

কি করবেন, আর একটি মাল্য রচনা ক'রে বালীর কণ্ঠে লম্বিত করবেন ?

কিন্তু বালী কি তা ধারণ করবেন ?

আর সুগ্রীব এ আচরণকে নিশ্চিত প্রবঞ্চনা বলে মনে করবেন !

এবং এবার যদি ঐ আর্য যুবকটি বালীকে যথাসময়ে বধ করতে না পারে— বালীর হস্তে সুগ্রীবের মৃত্যু সুনিশ্চিত।

সে ক্ষেত্রে তারাই কি সুগ্রীবের হত্যাকারিণী হবেন না ?

নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় অনুতপ্ত তারা সুবর্ণ পালঙ্কের সুখশয্যায় শয়ন ক'রেও ত্রিযামা রজনী যে বিনিদ্র অতিবাহিত করেন তাই নয়, নিজেই বার বার নিজের ললাটে করাঘাত ক'রে স্ত্রী-বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে থাকেন।

তখনও পর্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ থেকে ঊষার প্রথম আলোকাভাস বনস্থলীর

বৃক্ষাগ্রভাগকে স্পষ্ট ক'রে তোলে নি—তখনও পক্ষীকুল নিশিশেষ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নয়, সেই কারণে তাদের অধিকাংশেরই কলকণ্ঠ নীরব—কিষ্কিন্ধ্যার প্রাসাদ-দ্বারে প্রচণ্ড গর্জন উঠল।

সুগ্রীবের বিকট হুঙ্কার ও আস্ফালন।

আবার সুগ্রীব!

নিজের শ্রুতিশক্তিকেও বিশ্বাস করতে বিলম্ব হ'ল বালীর।

এ স্বপ্ন অথবা বাস্তব—নিরূপণ করতে, শেষ রাত্রির গাঢ় নিদ্রার বিহ্বলতা কাটতেও কিছু সময় লাগল।

সময় লাগল শয্যাসঙ্গিনীর প্রগাঢ় আলিঙ্গন শিথিল ক'রে উঠে বসে অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করতে।

তবে বেশীক্ষণ সন্দেহ থাকার অবসর রইল না।

কারণ সুগ্রীবের তর্জনগর্জন ক্রমেই উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে পৌঁচচ্ছে। এ কণ্ঠস্বর ভুল হবার কোন কারণ নেই।

বিস্ময়ের সীমা রইল না বালীর।

সুগ্রীব এত নির্লজ্জ হবে, এত অকৃতজ্ঞ!

আজ এই কয়েক প্রহর পূর্বেই তাকে যেভাবে বিমর্দিত বিমথিত ক'রে কেবলমাত্র প্রাণটুকু অবশিষ্ট থাকতে তাকে অব্যাহতি দিয়েছেন—বরং বলা উচিত পলায়ন করার সুযোগ দিয়েছেন—তাকে এক রকম প্রাণদান করাই বলে।

তৎসত্ত্বেও মাত্র এই কয়েক প্রহর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই, কোন্ লজ্জায়, কোন্ ধৃষ্টতায় সে আবার এসে এই মূঢ়গর্ভ স্পর্ধা প্রকাশ করছে?

বিস্মিত হলেন কিন্তু এর কারণ অনুসন্ধানে কালক্ষেপ করলেন না।

বুদ্ধির শরণাপন্ন হয়ে, যুক্তিপ্রয়োগ ক'রে, তথ্য বা সংবাদ সংগ্রহ ক'রে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ক'রে কোন কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার মতো ধৈর্য কোনদিনই বালীর ছিল না।

ক্রোধ এবং অসহিষ্ণুতাই ও'র স্বভাবের মধ্যে প্রধান।

উগ্র, বিকট ক্রোধ। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, ক্রুদ্ধ ব্যবহার—ক্রোধতরুমূলে অবিরাম অতিরিক্ত আত্মবল-বিশ্বাসের বারি নিষেক, শক্তির অহঙ্কার-মত্ততা। এ-ই তাঁর স্বভাবধর্ম।

ঘটনাটা কি ঘটছে, সে সম্বন্ধে সচেতনতা আসা মাত্র আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব তাঁর সহ্য হ'ল না। যে নারী পুনশ্চ তাঁর কণ্ঠলগ্ন হয়েছিল, নিশিশেষের উপভুক্ত মাল্যের মতো তার বাহুবন্ধন ছিন্ন ক'রে তাকে দূরে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর শয্যাত্যাগ ক'রে পরিধেয় বস্ত্রেই কটিবন্ধন দৃঢ়সম্বদ্ধ করতে করতে অবিলম্বে বহির্গমনের উদ্যোগ করলেন।

অন্যান্য নারীরা কোলাহল ক'রে উঠলেন। কেউ কেউ সতর্ক করারও প্রয়াস পেলেন। বাহিরে সদ্যনিদ্রোত্থিত আতঙ্কগ্রস্ত কর্মচারী বা মন্ত্রীর দল শুষ্কমুখে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু সে শুভ ও কল্যাণকর

প্রচেষ্টার কি পরিণাম হবে, তা জানা থাকায় শুষ্কমুখেই ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তাঁদের কণ্ঠ ভেদ ক'রে কোন শব্দ নির্গত হ'ল না।

প্রায় সকলেই সুগ্রীবের এই দুঃসাহসের নানারূপ হেতু অনুমান ক'রে কিছু আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছেন। কিন্তু সে সংশয় ও হিতবাক্য তো বালীকে বলা সম্ভব নয়।

ঠিক সেই সময়ে দীর্ঘকাল পরে কক্ষদ্বার-পথে পথরোধ ক'রে এসে দাঁড়ালেন তারাদেবী।

এবার অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ক্রুদ্ধ সিংহের উপযুক্ত দুঃসাহসিকা সিংহিনী—কেউ পারে তো ইনিই পারবেন বালীর শূন্য মস্তিষ্কে শুভবুদ্ধি সঞ্চারিত করতে।

তারা বালীর হস্তে হস্ত রক্ষা ক'রে যেন তাঁকে নিরস্ত করার ভঙ্গীতে অশ্রু-কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'মহারাজ, অশোভন অহিতকর বিচারশূন্য ক্রোধ সম্বরণ করুন। বারেক স্থির হয়ে বিবেচনা করুন, একটু যুক্তি প্রয়োগ করে চিন্তা করুন—কল্যকার শোচনীয় লজ্জাজনক পরাজয়ের অনতিকালমধ্যে সে পুনর্বার স্পর্ধা প্রকাশ করার দুঃসাহস কোথা থেকে লাভ করে? নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত সাহায্যের ভরসা রাখে। কুমার অঙ্গদের অনুচরেরা সংবাদ সংগ্রহ করেছে—উত্তরাখণ্ডস্থ কোশল দেশের দুই রাজকুমার সম্ভবতঃ রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে এইদিকে এসেছেন এবং সম্প্রতি এই অঞ্চলেই প্রবেশ করেছেন। আরও সংবাদ পাওয়া গেছে, গত দুই তিন দিবস তাঁরা ঋষ্যমূক সংলগ্ন বনস্থলীতে বাস করছেন। তাঁদের সঙ্গে বহু প্রকার সাং-ঘাতিক অস্ত্র আছে, যা এ দেশের কোন ব্যক্তি অদ্যাপি দেখে নি। তার ব্যবহারও জানে না। তবে তাঁদের আশ্চর্য শক্তি একজন প্রত্যক্ষ করেছে। দূর থেকেও শর নামক এক শাণিত অস্ত্র নিক্ষেপ করে ওঁদের এক রাজকুমার সাতটি তালবৃক্ষ ভেদ করেছেন। আমার মনে হয়, সুগ্রীব সেই ব্যক্তিদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছেন। তাঁদেরই আশ্বাসে সাহস সঞ্চয় ক'রে এইরূপ নির্লজ্জতা প্রকাশে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সম্ভবতঃ আপনি একক এই দুর্গ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্র সেই দুই নৃপতিতনয় তাঁদের অস্ত্রে আপনাকে অতর্কিতে বধ করবেন। ওঁরা বর্বর, দ্বৈরথ যুদ্ধের সুপ্রাচীন রীতি পালন করবে এমন আশা কম। অতএব আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনি অন্ততঃ এক দণ্ডকাল ধৈর্য অবলম্বন করুন। প্রভাত স্পষ্টতর হয়ে উঠুক, দুর্গচূড়া থেকে বাহিরের অবস্থা ও শত্রুর অবস্থান দেখে আপনি একেবারে সসৈন্যে নিষ্ক্রান্ত হোন। দুজন মাত্র ব্যক্তি—তাঁদের যত অস্ত্রই থাক—এতগুলি বানর সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রে সুগ্রীবকে রক্ষা করতে পারবেন না।'

অসহিষ্ণু, দুর্বার ক্রোধী বালী এই সৎ পরামর্শে কর্ণপাত করলেন না, পরন্তু কিছু অশ্রাব্য কটূক্তি করে তারাকে সরিয়ে বলপূর্বক কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার চেষ্টা করতে গেলেন।

তবে তারাও নিতান্ত স্বল্প বলশালিনী নন। তিনি সে বেগ সংবরণ ক'রেও

অনড় রইলেন। এবার যেন আরও করুণ বচনে বললেন, 'প্রভু, আমি আপনার ক্রোধ বর্ধিত করতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে, তা না শুনে আপনি এ গৃহ ত্যাগ করতে পারবেন না। আমার পরামর্শ, আপনি অবিলম্বে দূত প্রেরণপূর্বক সুগ্রীবের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করুন, এবং তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। আপনি রাজকার্য কিছুই দেখেন না, তিনি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আপনার সন্তানতুল্য ও প্রতিপাল্য। তিনিই আপনার নিকটতম স্বজন, সুখে দুঃখে নিত্যসঙ্গী, সহজ বন্ধু। আপনি অকারণ বৈরিতা দূর ক'রে তাঁকে আপন ক'রে নিন, তাতে অগৌরবের কারণ নেই। বরং এ উদারতায় আপনার গৌরব বৃদ্ধি পাবে, সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হবে। ভ্রাতৃসৌহার্দ্যের তুল্য বল নেই, তিনি যোগ্য অমাত্যগণসহ আপনার সেবা করলে কোন শত্রুই কিষ্কিন্ধ্যা আক্রমণ করতে সাহস করবে না। আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী, আমার অনুরোধ রাখুন, অবিলম্বে সুগ্রীবের প্রতি এই শত্রুভাব দূর করুন। নচেৎ ঐ দুই রাজকুমার সুগ্রীবের সাহায্যকারীরূপে এই বিরোধে অংশগ্রহণ করলে আপনি কিছুতেই নিরাপদ থাকতে পারবেন না। আপনি প্রসন্ন হোন, আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন।'

মৃত্যুরূপিণী নিয়তি যার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, সে যথার্থ হিতোপদেশে কর্ণপাত করবে কেন!

ক্রুদ্ধতর বালী এবার সবলে তারাকে দ্বারপ্রান্ত থেকে অপসারিত ক'রে, লোহিত লোচনে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ভর্ৎসনা করলেন, 'তুমি এতাবৎকাল আমার সঙ্গলাভ করলেও আমার প্রকৃতি অবগত হও নি। স্ত্রীলোক হতই বুদ্ধিমতী হোক, তাদের বুদ্ধি পৌরুষের সম্মানের কথা চিন্তা করতে পারে না। তোমরা সভাবতঃ ভীরু, সেই জন্যই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, স্ত্রীমতি ও স্ত্রীবুদ্ধি সর্বদা বক্রপথে চলে। শত্রু দ্বারপ্রান্তে গর্জন ক'রে স্পর্ধা প্রকাশ করছে, এ সময় আমি নিজের নিরাপত্তা চিন্তা ক'রে আত্মগোপন ক'রে থাকব! ধিক! তার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আর ঐ দুই মনুষ্য যদি সত্যই রাজবংশীয় কি রাজপুত্র হন তাঁরাই বা আমায় বিনা দোষে, বিনা বিচারে বধ করবেন কেন? তুমি এই বৃথা ভয় পরিহার করো, আজ আর আমি কোন প্রকার দয়া মায়া রাখব না মনে, জ্ঞাতি-কণ্টকতরু সমূলে বিনষ্ট ক'রে অচিরে প্রত্যাবর্তন করব। তুমি কয়েক দণ্ড মাত্র ধৈর্য ধারণ করো।'

অতঃপর বালী কর্কশতর ও প্রচণ্ডতর হুঙ্কার ত্যাগ ক'রে অবিলম্বে দুর্গ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

॥ দশ ॥

তারাদেবী বালীর মৃত্যু চেয়েছিলেন, ন্য চান নি? ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি কি চিন্তা করছিলেন? তা বোধ করি তিনিও জানেন না।

বিবেকের কাছে অপরাধ স্খালন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন তিনি। করেছেন যেন কতকটা অপর কারও চালনায়—যন্ত্রচালিতের মতো।

মনের মধ্যে ঐ কথাটা বোধ করি অকস্মাৎই মনে এল, সুগ্রীব যদি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে এ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন, এ প্রাসাদের পূর্বনির্দিষ্ট অংশে অথবা সন্নিকটে কোথাও নূতন বাসভবন নির্মাণ করেন, তাহলে বালীর মৃত্যুতে তাঁর প্রয়োজন কি ?

যদি এই কথাটা কিছুদিন পূর্বে তাঁর মনে আসত, সেইভাবে কর্মপন্থা বিস্তার করলে, পরিকল্পনা স্থির ক'রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলে, এ কার্য বোধ করি একেবারে অসাধ্যও হ'ত না।

বালী ক্রোধী। ক্রোধী বলেই নির্বোধ।

ক্রোধে শুভবুদ্ধি লোপ পায়—এ কথা সর্বজনবিদিত।

হিতাহিত-জ্ঞান বা বিবেচনাও যেমন থাকে না, তেমনি অপরের যুক্তি খণ্ডন করার মতো শক্তিও না।

সতর্কভাবে অগ্রসর হলে তাঁকে নিজের মতে আনয়ন করা একেবারে অসাধ্য হ'ত না।

কিন্তু তিনি মন্দভাগিনী। সে উপায়ের কথা পূর্বে চিন্তা করেন নি।

ক্রোধ শুধু নয়—অহঙ্কার ও মোহও বিমূঢ়তার কারণ হয়।

তারার বুদ্ধির অহঙ্কার বুঝি চিরদিন তাঁকে মন্দ পথেই চালনা করল। বালীই এক প্রকার ওঁদের জাতির রীতি অনুযায়ী ওঁর ভর্তা, পতি। শেষে উনি কি পতি-ঘাতিনী বলে পরিচিত হবেন ?

হ্যাঁ, কিছু প্রায়শ্চিত্ত করলেন বটে, শেষ মুহূর্তে সৎ-পরামর্শ দিতে গিয়ে, চিরদিনের নির্বোধের মনে শুভবুদ্ধি সঞ্চারিত করার প্রয়াস পেয়ে—কিন্তু তাই কি যথেষ্ট ?

বিহ্বলের মতো তারাদেবী প্রাসাদ-প্রাচীর-সংলগ্ন মুক্ত অলিন্দে গিয়ে দাঁড়ালেন, অশ্রুমুখী, ভীত, সন্ত্রস্ত পুরবাসিনীদের সঙ্গে। ওঁদের থেকে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে বহু প্রহরী, সেবক ও সৈনিকও ছিল। তাদের সকলেরই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। বালীর বিনা অনুমতিতে দুর্গের বাহিরে যেতে সাহস হচ্ছে না, অথচ একটা বিবেকদংশনও অনুভব করছে—কর্তব্যের বুঝি একটা মার্জনাতীত ত্রুটি বা অবহেলা ঘটে গেল। বালী অপেক্ষা সুগ্রীবই তাদের অধিকাংশের সমধিক প্রিয়, তবু কর্তব্যানুরোধে তাদের বালীর সঙ্গী হওয়ার ইচ্ছা।

কিন্তু বালী নিজের স্বভাব-দোষেই সে সাহায্যটুকু থেকেও বঞ্চিত হলেন। অনায়াসে যেখানে বিপন্মুক্ত না হোক কিছুটা নিরাপদ হতে পারতেন—সেখানে অকারণে একা বিপদের সম্মুখীন হয়ে মৃত্যুকে যেন আমন্ত্রণ জানালেন।

যুদ্ধের পরিণতি তারা যা আশঙ্কা বা অনুমান করেছিলেন—তাই হ'ল।

পূর্ব দিনের পর্যাপ্ত প্রহার-জর্জরিত সুগ্রীব আজ এক দণ্ডকালও বালীর প্রচণ্ড-উষ্মাপ্রণোদিত আক্রমণ সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর নাসিকা ও দেহের অন্যান্য স্থান থেকে প্রচুর রক্তপাত হতে লাগল; মুষ্ট্যাঘাতে তাঁর দেহের অস্থি

পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল ; শেষ অবধি যখন বালী তাঁকে শূন্যে উত্থিত ক'রে সবেগে শিলাপট্টে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলেন—তখন প্রায়-মুমূর্ষু সুগ্রীব সকাতরে রামের গুপ্ত অবস্থানের দিকে ইঙ্গিতে সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

বোধ করি তার প্রয়োজনও ছিল না। অভিজ্ঞ রামচন্দ্র তাঁর অবস্থা অনুমান ক'রে, পূর্বেই নিজ কার্মুকে শর যোজনা করেছেন—এক্ষণে নক্ষত্রবেগে সেই সুতীক্ষ্ন সুশাণিত শর এসে বালীর বক্ষে বিদ্ধ হ'ল।

রামচন্দ্র বৃক্ষান্তরালে থেকে এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষা করছিলেন। সুগ্রীবকে অসহায় বা মৃত্যুর সম্মুখীন না দেখলে, তিনি বালীর প্রতি অস্ত্রত্যাগ করতে পারেন না। এ তাঁর বীরের ধর্মে বাধে।

বিরাট পর্বতশৃঙ্গের মতো বালীর বিশাল দেহ ভূমিতে পতিত হতে, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে কিষ্কিন্ধ্যাবাসীরা হাহাকার ক'রে উঠলেন। বালী তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়, সহায়। বালীর ঔদ্ধত্য যতই অসহ্য বোধ হোক—এটা সকলেই জানেন, বালী জীবিত থাকতে কোন বহিঃশত্রু তাঁদের দেশ আক্রমণ করতে সাহস করবে না।

বালী জীবনেও যেমন, মৃত্যুতেও তেমনি—তাঁর দেহই সন্ত্রাস-ও সম্ভ্রম-উদ্দীপক। দেহ বিশাল, বক্ষ প্রশস্ত, বাহু আজানুলম্বিত। হরিদ্রা-ধূসর বর্ণ। তাঁর দৈহিক গঠনের জন্যই তিনি সকলের ভীতির পাত্র ছিলেন।

তৎসত্ত্বেও বালী সুদর্শন ছিলেন, পৌরুষশ্রীমণ্ডিত তাঁর মুখ এ দেশের হিসাবে সুন্দরই বলা চলত। এখন সেই আশ্চর্য সুন্দর দেহ যেন নূতন রূপে সকলের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হ'ল। রত্নখচিত কণ্ঠী ও সুবর্ণখচিত রামের অস্ত্রসহ তাঁর রক্তাক্ত দেহ সুবর্ণবেদীমণ্ডিত পুষ্পিত অশোকের সৌন্দর্য ধারণ করল।

বালীর পতনের পর, ঈষৎ অপ্রতিভ রামচন্দ্র তাঁর নিকটে এসে দাঁড়ালেন। বালী প্রচুর রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন ইতিমধ্যেই, তত্রাচ তিক্ত কঠোর কণ্ঠে রামকে তিরস্কার করলেন—

'রাম, আমি অপরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলাম, তোমার কোন অনিষ্ট করি নি, তথাপি বৃক্ষান্তরাল থেকে গুপ্তঘাতকের মতো আমাকে হত্যা ক'রে তোমার কি লাভ হ'ল ? শুনেছি, তুমি সদ্বংশীয়। তোমার পূর্বপুরুষরা ধার্মিক ও প্রজা-পুঞ্জের পালনকারী বলে বিখ্যাত, তুমিও কোন সৎ-কারণে ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়ে অরণ্যবাসী হয়েছ—এই কি তোমাদের ধর্মবুদ্ধি ও ব্রত পালন ? তারা আমাকে তোমার সম্বন্ধে সতর্ক করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তাতে কর্ণপাত করি নি, তোমার শূরধর্মের উপরই আস্থা স্থাপন করেছিলাম। ভেবেছিলাম আমার সঙ্গে যখন তোমার কোন প্রকার বিরোধ নেই—তুমি কেন আমাকে বধ করবে ?

'রাম, এখন বুঝছি, তুমি অতি দুরাত্মা, ধর্মধ্বজী অধার্মিক ! তুমি তৃণাবৃত কূপ ও ভস্মাবৃত বহ্নির মতোই। তুমি ধর্মের আচরণে অধর্মাচরণ করো। তুমি দুরাত্মা, পাপিষ্ঠ। ধর্মকপটী সাধুর বেশ ধারণ করেছ, অধর্মাচরণের সুযোগ পাবে বলে।

দ্যাখ, ভূমি, স্বর্ণ প্রভৃতি লোভনীয় বস্তুর জন্যই লোকে নরহত্যা করে, আমাকে বধ ক'রে তোমার কি ইষ্টসিদ্ধি হ'ল ? আমার চর্ম লোম মাংস অস্থি তোমার কোন কাজেই লাগবে না। মৃগ ব্যতীত শশ, গোধা প্রভৃতি পঞ্চ প্রকার মাংস আর্যরা ভক্ষণ করে থাকেন বলে শুনেছি, আমাদের মাংস খাদ্য নয়। তবে ? যে সকল পাপী মৃত্যুর পর নরকস্থ হয়—রাজহন্তা তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। আমি অরণ্যচর হলেও, এক সম্প্রদায়ের রাজা—তুমি কুটিল সর্পের মতো অন্যের অগোচরে এসে আমাকে বধ করলে—এ পাপ তোমার সহজে স্খালন হবে না।'

এই পর্যন্ত বলে রক্তক্ষরণজনিত শ্রান্তি ও সহ্যাতীত উত্তেজনায় কিয়ৎকাল নীরব থেকে পুনশ্চ বললেন—

'আমি চরমুখে সংবাদ পেয়েছি, তোমার ভার্যা অপহৃত হয়েছেন, সেই কারণেই তুমি উন্মাদবৎ আচরণ করছ। উন্মাদরাও পাপাচরণ করলে অব্যাহতি পায় না। তদুপরি, স্ত্রীর সন্ধানের জন্য তুমি সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য স্থাপন ক'রে আমাকে এভাবে গুপ্তঘাতকের মতো বধ ক'রে অন্যায় শুধু নয়, একান্ত অজ্ঞান নির্বোধের মতো আচরণ করেছ। তুমি আমার সাহায্য প্রার্থনা করলে, আমি অচিরে তোমার নারীকে এনে দিতাম। তার অপহরণকারী যে-ই হোক বা যেখানেই থাক, তাকে বন্ধন ক'রে তোমার কাছে এনে দিতাম, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল বা সমুদ্রগর্ভে আত্মগোপন করলেও, আমার হস্তে অব্যাহতি পেত না, তোমার স্ত্রীকেও বন্দিনী রাখতে পারত না। তার জন্য তোমাকে কোন যুদ্ধ, কি কোন কষ্ট স্বীকার করতে হ'ত না। এ তুমি কি করলে ? মৃত্যু জীব মাত্রেরই চরম পরিণাম, মৃত্যুর জন্য কোন দুঃখ নেই, বীরের ধর্ম পালন করতে করতে মরেছি, প্রতিদ্বন্দ্বী নিজে পরাজিত হয়ে, অপরের দ্বারা অতর্কিতে বধ করিয়েছে, এ তো গৌরবের মৃত্যু। কিন্তু বীরসন্তান শস্ত্রধারী কেউ গোপনে নরহত্যা করবেন কেন ? আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করলেও আমি অবশ্যই তোমার হস্তে নিহত হতাম। কারণ, তোমার যে সব ভয়াবহ, কৃতান্তসদৃশ অস্ত্র আছে—আমাদের তা একেবারেই অপরিজ্ঞাত। আমাদের সম্বল শুধুমাত্র দেহবল, অস্ত্র বলতে বৃক্ষ ও প্রস্তর। আমাকে যদি বধই করবে—মিথ্যা সুগ্রীবকেই বা এ পাপপথে আনলে কেন, ধর্মযুদ্ধেই নিহত করতে পারতে, এমন তস্কর-বৃত্তির তো কোন প্রয়োজন ছিল না ?'

এই কঠোর ও মর্মঘাতী তিরস্কারে রামচন্দ্রও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন বৈকি।

তিনিও কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'তোমাকে প্রচ্ছন্ন থেকে বধ করায় আমি কোন লজ্জার কারণ দেখি না। যারা কেবলমাত্র হস্ত পদ দিয়ে যুদ্ধ করে, তারা পশুরই সমান। নিরীহ মৃগকে বধ করার জন্য লোকে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য থেকে শর, বাগুরা বা পাশ প্রভৃতির সহযোগে যে কোন কূট উপায় অবলম্বন করে থাকে। সে জন্য কোন ব্যক্তিই লজ্জা বোধ করে না। মৃগ বিশ্বাস করে শিকারীর নিকটে আসুক বা ভয়ে পলায়নপর হোক ; নিজেদের মধ্যে বিবাদপর হোক বা অসতর্ক থাক, মাংসাশী মানুষ তাকে বধ ক'রে অনুমাত্র দোষী বলে গণ্য হয় না। আরও স্মরণ করো, তুমি আমাকে উচ্চবংশীয় রাজপুত্র, ধর্মের রক্ষক বলে স্বীকার

করেছ। আমিও নিজেকে ধর্মের সেবক বলে মনে করি। কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুত্রতুল্য, তার নারীকে বলপূর্বক হরণ ক'রে সম্ভোগ করছ। সে তোমার পুত্রবধূতুল্যা নারী। এই কি যথেষ্ট পাপাচার নয়? সে ঘৃণ্য পাপীর সঙ্গে যুদ্ধ করব কেন? পরন্তু সেই অন্যায়ের প্রতিকারপ্রার্থীর হয়ে তাকে বধ করব—এ-ই ন্যায়সঙ্গত ও সমীচীন।'

বালী ততক্ষণে নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন। তিনি আর বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হলেন না, করুণ কন্ঠে বললেন, 'আমার একটি মাত্র পুত্র আছে—অঙ্গদ। সে আমার বড়ই স্নেহের পাত্র, সে এখনও নিতান্ত অবোধ। আমি চলে গেলে কে তাকে দেখবে, কেই বা তাকে রক্ষণাবেক্ষণ ভরণপোষণ করবে! তার গর্ভধারিণী তারা বড় তেজস্বিনী ও অভিমানিণী, আমার উপর জাতক্রোধ সুগ্রীব ওদের পীড়ন ক'রে হয়ত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চাইবে! ওদের জন্যই এই অন্তিম মুহূর্তে বড় চিন্তা হচ্ছে।'

রাম এবার কিছু কোমল কণ্ঠে বললেন, 'মহাবলী, আমি তোমাকে অনায়াসে এ আশ্বাস দিতে পারি যে, সুগ্রীব তোমার পালক পুত্রকে স্বীয় পুত্রবৎ লালনপালন করবেন এবং মনস্বিনী তারাকেও তাঁর প্রাপ্য সম্মানের সঙ্গেই রক্ষা করবেন। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বর চিন্তা করতে করতে স্বর্গে গমন করো।'

বালীর পতনের পরই তারাদেবীর এতক্ষণের স্তম্ভিত বিহ্বল ভাব নিমেষে দূর হয়ে গেল। তিনি শোকে আকুল হয়ে তখনই, বিস্রস্ত বসনে মুক্তবেণী অবস্থায় দুর্গ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে চেষ্টিত হলেন।

কিন্তু ওখানকার রক্ষী সৈন্যের দল, পুরবাসী এবং পুরবাসিনীর দল সকলে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াল।

ওরা ইতিপূর্বে এমন ভয়াবহ সর্বনাশা অস্ত্র দেখে নি। যে অস্ত্র অনায়াসে বালীর মাতঙ্গবৎ-সুবিপুল-দেহ বীরকেও অনায়াসে এমন পলকপাত কালে নিহত করতে পারে—তা ওদের কাছে সাক্ষাৎ কৃতান্ত বলেই বোধ হ'ল। ওরা যুদ্ধ ও অস্ত্র বলতে বাহু ও পদদ্বয়ের প্রহার, প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ বা বিশাল তরু উৎপাটিত ক'রে সমূহ শত্রুবিনাশ বোঝে। কিন্তু এ কি অস্ত্র! এই কি তাহলে ইন্দ্রের অশনি!

ওরা প্রাণভয়ে স্বেদার্দ্র ও বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, বসন্ত পবনে হিল্লোলিত বেতস পত্রের মতোই কম্পমান। ওদের মধ্যে কিছু কিছু আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে ইতি-মধ্যেই প্রাসাদের প্রত্যন্ত কোণের কোন অন্ধকার স্থানে আত্মগোপনের জন্য পলায়ন-পর হয়েছে।

যূথপতি নিহত হলে মৃগরা যেমন যূথভ্রষ্ট হয়ে প্রাণাশঙ্কায় ইতস্ততঃ লম্ফ দিতে ও কোন দিকে লক্ষ্য না ক'রেই পলায়নের চেষ্টা করে—কোন্ দিক কোন্ পথ নিরাপদ আর কোন্টা নয়—তা বুঝতে পারে না—এদেরও সেই দশা। ওদের তখন মনে হচ্ছে, রামের শর বিদ্যুৎগতিতে ওদের পিছনে পিছনে আসছে, আর রক্ষা নাই।

রোরূদ্যমানা তারা ভগ্ন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে অনুযোগ করলেন, 'বানর সৈন্যগণ, তোমরা চিরদিনই সর্বদা মহারাজ বালীর অনুগমন করো, তাঁর আদেশ পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে থাকো, আজ তাঁর চরম দুর্দিনে তাঁর থেকে দূরে পলায়ন বা আত্মগোপনের চেষ্টা করছ কেন ? ক্রুর সুগ্রীব বালীকে অপসারিত করার জন্য রামের সঙ্গে পাপ-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন, রাম তাঁর কর্তব্য সমাপন করেছেন। তোমাদের সঙ্গে তাঁর তো কোন বৈরিতা নেই, তিনি তোমাদের আক্রমণেরও চেষ্টা করেন নি, তবে তোমরা ঈদৃশ বিহ্বল হচ্ছ কেন ? এক্ষণে সে রাজদেহ শিবা, শ্বান বা বায়সের ভক্ষ্য না হয়, তা দেখা কি তোমাদের প্রধান কর্তব্য নয় ?'

প্রাণভয়ে উন্মত্তবৎ বানররা করুণ কণ্ঠে বললেন, 'জীবিতপুত্রে, তুমি এখন কদাচ দুর্গ থেকে নির্গত হওয়ার চেষ্টা ক'রো না। কৃতান্ত স্বয়ং রামের মূর্তি ধারণ ক'রে বালীকে নিয়ে যাচ্ছেন ; রামের শর ইন্দ্রের বজ্র অপেক্ষাও শক্তিশালী। ওদের সম্মুখীন হলে, আমাদের আর রক্ষা নাই। তোমার উচিত এখানেই এবং এক্ষণেই অঙ্গদকে রাজপদে অভিষিক্ত ক'রে সর্ব-প্রযত্নে তাঁর সিংহাসন রক্ষা করা। আমরা দ্বার অর্গলমুক্ত করলেই হনুমান নল নীল প্রভৃতি বীরগণ এখানে প্রবেশ করবেন। তাঁদের স্ত্রী পুত্র এখানে—তাঁরা ওদের রক্ষা অপেক্ষা এতদিনের নির্বাসন দুঃখের প্রতিশোধ গ্রহণেই তৎপর হবেন। তখন তোমাকে বন্দিনী ক'রে, অঙ্গদকে বধ করার চেষ্টাও অসম্ভব নয়।'

তারা এবার যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বললেন, 'ইন্দ্রসদৃশ বালীর প্রতাপে সকলেই আমাকে সম্মান করত, ভয় করতে। এক্ষণে আমি—সেই পুরুষ-সিংহের সিংহিনী—প্রাণভয়ে বৃক্ষকোটরে কি ভূমিগর্ভে আত্মগোপন করব ! যদি বিশ্বত্রাস বালীই না থাকেন, আমার পুত্রেই বা কি প্রয়োজন ? নিজের জীবন রক্ষা করার জন্যই বা ব্যস্ত হবো কেন ? যিনি বালীকে বধ করেছেন, এক্ষণে তিনি যদি আমাকেও বধ করেন তো আমি তাঁর মঙ্গল কামনা করতে করতেই মরব। আমাকে ছেড়ে দাও, তোমাদের প্রাণের মায়া অধিক হয়ে থাকে—তোমরা তা রক্ষা করো, আমার স্থান আমার জীবিতেশ্বরের পদপ্রান্তে।'

তাঁর এইরূপে একাধারে ক্রুদ্ধ ও শোকার্ত মূর্তি দেখে আর কোন ব্যক্তিই তাঁকে বাধা দিতে বা নূতন কোন বিরুদ্ধ যুক্তি প্রয়োগ করতে সাহস করল না।

অবনত মস্তিষ্কে মৃত্যুভয়কম্পিত কলেবরে বৃহৎ দুর্গদ্বার অর্গলমুক্ত করে দিল। এবং তারা প্রায় উন্মাদিনীর মতো বালীর মৃতদেহের পার্শ্বে ছুটে যাচ্ছেন দেখে রক্ষীদের কিছু অংশ তাঁর অনুগমনও করল।

॥ একাদশ ॥

আত্মজিজ্ঞাসা বা আত্মবিশ্লেষণ তারাদেবীর চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

তিনি নিজেও এর জন্য কম বিস্মিত নন ! এমন আর তিনি কারও দেখেন নি, তাঁর পূর্বেও আর কারও চরিত্রে এই গুণ বা দোষ আছে বলে তিনি জানেন

না। সকলেই, নিজের আচরণ গর্হিত হলেও, বিবিধ যুক্তি প্রয়োগে নিজের বিবেকের কাছে তা সমর্থনের চেষ্টা করেন।

তারা সে মল্লভূমি-ক্ষেত্রে গিয়ে বালীর সাংঘাতিক আহত অচেতন দেহের উপর পড়ে হাহাকার শব্দে রোদন ক'রে উঠলেন। কিন্তু তার মধ্যেই তাঁর যেন এক পৃথক সত্তা তাঁকে সবিদ্রূপে কণ্ঠে প্রশ্ন করতে লাগল—'তোমার আচরণের কোন্‌টা সত্য—সুগ্রীবের নৈকট্য লাভের আশায় বালীকে অপসারিত করার ষড়যন্ত্র—না এখনকার এই শোক?'

এ প্রশ্ন অবশ্য চকিতের জন্যই মনে দেখা দিল, কারণ এ নিয়ে বিচার কি আলোচনা করার অবসর তখন নেই, পরন্তু প্রশ্নটা অবচেতনে দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বিবেক যেন সেটা দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে দিল। তবু এক সময় এক লহমার মতো আর একটা অনুভূতিও যেন অনুভব করলেন—আত্মগ্লানি অনুতাপে জর্জরিত সুগ্রীব ঐ যে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছেন—ওঁর জন্যও একটা গভীর মমতা বোধ করছেন তিনি।

না। এটা ঠিক উনি চান নি—এই পরিস্থিতি। সুগ্রীবের সান্নিধ্য ও সাহচর্য পেলেই তিনি সুখী হতেন। বালীকে বধ ক'রে—? না না, ঠিক তা নয়। তেমন কোন কর্মে তিনি যদি সহায়তা ক'রে থাকেন, সে নিতান্তই আবেগের বশে, ভবিষ্যৎ চিন্তা না ক'রেই।

এখন যদি সুগ্রীব রাজা হন, রুমাই রাজ-অন্তঃপুরের প্রধানা হবেন। তারাকে হয়ত তাঁর সহচরীদের অন্যতমা বলে গণ্য করা হবে। কে জানে এখন এই প্রত্যক্ষ ভবিষ্যতের সম্মুখে দাঁড়িয়েই শোকটা এত প্রবল ও অসহনীয় বোধ হচ্ছে কিনা!...

তারা মৃতপ্রায় বালীকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন ক'রে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিলাপ করতে করতে বললেন, 'বীরশ্রেষ্ঠ, তুমি কেন আমার সঙ্গে আজ কথা কইছ না? তুমি পুরুষসিংহ, তোমাকে সামান্য শৃগাল-প্রবৃত্তি-অনুসরণকারী ব্যাঘ্র নিহত করল। তুমি কেন উঠে তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিচ্ছ না? আমার আলিঙ্গন অপেক্ষা আজ কি তোমার নিকট মৃত্তিকার স্পর্শ সুখদ বোধ হ'ল? ওঠো, মিনতি করছি এ ভূমিশয্যা ত্যাগ ক'রে উৎকৃষ্ট পর্যঙ্কে সুকোমল শয্যায় গিয়ে শয়ন করো। হায়, কেন তুমি আমার আহ্বানে কর্ণপাত করছ না? তোমার বীর্যে মুগ্ধ দেবতাগণ কি তোমার জন্য কিষ্কিন্ধ্যা অপেক্ষা শতগুণে রমণীয় ও লোভনীয় কোন স্বতন্ত্র পুরী নির্মাণ করেছেন স্বর্গে? তাই কিষ্কিন্ধ্যায় আর তোমার রুচি নেই?'

আবার বললেন, 'তুমি আমার সাহচর্যে হয়ত বীতস্পৃহ হয়েছ, কিন্তু আমার দোষে পুত্র অঙ্গদকে ছেড়ে যাচ্ছ কেন? হায়, বুঝি নির্মম কালের দ্বারাই চালিত হয়ে সুগ্রীব তোমার মৃত্যুর কারণ হ'ল! নচেৎ সুগ্রীবের বা ঐ কপট রামের কি সাধ্য তোমাকে বধ করে! তুমি কেন একমাত্র শরাঘাতে নিহত হবে!'

শোকের প্রাবল্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী তারার বিলাপের ভাষণ প্রলাপের মতোই অসংবদ্ধ হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে প্রাসাদস্থ পুরনারীরাও তারাকে দুর্গ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রামের সম্মুখীন হওয়ার পরও বহুক্ষণ জীবিত দেখে, সাহস সঞ্চয় ক'রে ভূতলশায়ী বালীর সন্নিকটে এসেছেন। ওরাও প্রভুর দেহ বেষ্টন ক'রে তারস্বরে বিলাপ ও ক্রন্দন আরম্ভ করলেন। তাঁদের অধিকতর উচ্চ স্বরে ও বক্ষে করাঘাত ক'রে বিলাপের ভঙ্গী দেখে লক্ষ্মণের মনে হ'ল, এঁরা বুঝি তারাদেবীর সঙ্গে শোক প্রকাশের প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

এবং, বোধ করি তাঁদের সঙ্গে নিজের শোক প্রকাশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে গিয়েই তারা অধিকতর উচ্চকণ্ঠে অশ্রু-বিকৃত স্বরে বলে উঠলেন, 'নাথ, তুমি আমাকে ত্যাগ করলেও আমি তোমাকে ত্যাগ করব না। আমি এইখানে প্রায়োপ-বেশনে প্রাণত্যাগ ক'রে তোমার সহগমন করব।'

সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিলা-কুট্টিমে বার বার ললাটাঘাত করতে লাগলেন।

সুগ্রীব পূর্বেই যৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছিলেন। এক্ষণে তারার এই দুর্দশা দেখে, নিজেকে অপরাধী বোধ ক'রে মস্তক অধিকতর নত করলেন। রামচন্দ্রও এই দৃশ্যের মধ্যে কিছুটা বিব্রত ও দুঃখিত বোধ করছিলেন। কেবল লক্ষ্মণই অস্ফুট স্বরে বললেন, 'নারীজাতির মনের গতিবিধি বোধ করি বিধাতার কাছেও দুর্জ্ঞেয়। এই যে তারা—গগন-স্খলিত তারকার মতোই ভুলুণ্ঠিতা, এঁকে দেখে নিজের প্রত্যক্ষদৃষ্ট অভিজ্ঞতাও অবিশ্বাস্য বোধ হচ্ছে। কে বলবে ইনিই দুই রাত্রি পূর্বে বালীকে ত্যাগ ক'রে সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে আমাদের উপদেশ দিয়েছিলেন?'

ঘটনাটা বড়ই বিসদৃশ, বেদনাদায়ক ও অযথা বিলম্বিত হচ্ছে দেখে এবার জ্ঞানী হনুমান তারার সমীপবর্তী হয়ে করজোড়ে নিবেদন করলেন, 'দেবী, আপনি অতিশয় বুদ্ধিমতী, সংসারের গতি সম্বন্ধেও আপনার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। আপনি অবশ্যই জানেন, ইহজগতে মানুষ নিজের কর্মফলেই সুখদুঃখ ভোগ করে। বালীও সেই কর্মফলেই নিহত হলেন। বিচারশূন্য, বিবেচনাহীন ক্রোধ ও স্নেহ দয়া মায়া ক্ষমা প্রভৃতি কোমল বৃত্তির অভাবই সুগ্রীবকে তাঁর শত্রু করেছিল। এ সংসারে সকলেই একদা মৃত্যুমুখে পতিত হবে, সুতরাং সে ক্ষেত্রে একজন মৃত ব্যক্তির জন্য প্রাণত্যাগ ক'রে লাভ কি? জীবিতপুত্রে, আপনি মৃত পতির চিন্তা পরিহার ক'রে জীবিত পুত্রের কথা চিন্তা করুন। অঙ্গদ যাতে তার পিতৃ-রাজ্যের শাসনভার অধিকার করতে পারে এবং সে কার্যের অমর্যাদা না করে—সর্বপ্রথমে আপনার সে দিকেই মনোযোগ দেওয়া উচিত।'

কিন্তু তারা কোন উত্তর দেওয়ার পূর্বেই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন বালী স্বয়ং।

তিনি এতক্ষণ মৃতের মতোই মুদিত নেত্রে নিস্পন্দ অবস্থায় ছিলেন। এইবার তাঁর অক্ষিপল্লব কম্পিত হতে হতে এক সময় তিনি নেত্র উন্মীলনও করলেন। ক্ষীণকণ্ঠে আহ্বান করলেন, 'সুগ্রীব!'

সুগ্রীব ত্রস্তেব্যস্তে নিকটে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরও তখন দুই চক্ষু সজল, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ। কিন্তু বালীরও আর সময় নেই, মৃত্যু নিকটবর্তী, সে ওঁর রক্তধারায় প্রবেশ করেছে এ যেন উনি বেশ অনুভব করছেন। তিনি ঈষৎ কোমল কণ্ঠে পুনশ্চ সম্বোধন করলেন, 'সুগ্রীব, আমি ভাগ্যদোষে চিরদিন পাপপথে চালিত হয়েছি। অহংকারই আমার সকল পাপের মূল—নিজের দৈহিক শক্তি সম্বন্ধে অতিরিক্ত অহঙ্কার—তার অবশ্যম্ভাবী ফল বুদ্ধিবিভ্রম। এই বুদ্ধিবিভ্রমেই মানুষ বিনষ্ট হয়। এই বুদ্ধিবিভ্রমের জন্যই আমি অকারণ তোমার প্রতি অবিচার করেছি, তুমি আমার অপরাধ নিও না। অদৃষ্ট আমাদের দু'জনের যুগপৎ সৌহার্দ্য ও রাজ্যসুখ নির্দিষ্ট করেন নি, নাহ'লে এমন বৈপরীত্য ঘটবে কেন? সে যা হোক এখন তুমি এই অরণ্যচারী সরল লোকগুলির শাসনভার গ্রহণ করো, এবং আমি যা করি নি, যথার্থ ধর্মবুদ্ধি ও কল্যাণ চিন্তার সঙ্গে রাজত্ব করো। আমার অন্তিমকাল আসন্ন। এই জীবন, রাজ্য, মহতী শ্রী, প্রতিষ্ঠা, সুন্দরী সঙ্গিনী সকলই ত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছি। এমতাবস্থায় এই শেষ মুহূর্তে তোমার কাছে একটি অনুরোধ জানাচ্ছি, আশা করি দুষ্কর হলেও তুমি তা রক্ষা করবে। এই যে আমার বালক পুত্র অঙ্গদ ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে অবিরাম রোদন করছে—এই পুত্রই ইহজীবনে আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এ অল্পবয়স্ক, সুখে প্রতিপালিত, সুখেরই উপযুক্ত। তুমি সর্ব অবস্থায় একে নিজ পুত্রবৎ রক্ষা করবে, এবং যখন যা প্রার্থনা করে তাই পূরণ করবে। আজ থেকে তুমিই এর রক্ষক, পিতা ও দাতা। কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হ'লে, তুমি একে অভয়দান করবে। এ শ্রীমান তোমার তুল্য মহাবীর, রাক্ষসদের সঙ্গে বিবাদে এ বালক তোমার অগ্রে থাকবে। কালে আমার তুল্যই কীর্তিমান হবে।'

এই পর্যন্ত বলে—কিয়ৎকালমাত্র নীরব থেকে সেই মৃত্যুপথযাত্রী যেন কিছুটা শক্তি সঞ্চয় ক'রে নিয়ে বললেন, 'আরও একটি অনুরোধ, সুষেণতনয়া তারা বাক্য ও ঘটনা-প্রবাহের সূক্ষ্মার্থ নির্ণয় করতে এবং বিপদের সময় সৎ-পরামর্শ দিতে অদ্বিতীয়া। ইনি যা শ্রেয়ঃ বলবেন, নিঃসংশয়ে তাই ক'রো। এক্ষণে এই ইন্দ্রদত্ত স্বর্ণ-হার তুমিই কণ্ঠে ধারণ করো, এ হার তোমাকে জয়শ্রীমণ্ডিত করুক।'

সুগ্রীব সজল নেত্রে সে হার গ্রহণ করলেন। তাঁর অনুচররাও এবার পূর্বৈর বিস্মৃত হয়ে প্রকাশ্যেই রোদন করতে লাগলেন।

অতঃপর বালী ইঙ্গিতে অঙ্গদকে একেবারে বক্ষের নিকট আহ্বান ক'রে ক্ষীণতর কণ্ঠে বললেন, 'বৎস, এখন থেকে দেশ কাল বুঝে চলবে। ধৈর্যের সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে সুখ-দুঃখ সমান ভাবে সহ্য ক'রে, ইষ্ট অনিষ্ট উপেক্ষা ক'রে সুগ্রীবের অনুবর্তী ও বশম্বদ থাকবে, তাঁকে পিতৃজ্ঞানে সেবা করবে। লালিত হওয়ার কাল তোমার বিগত, এখন সেবার সময়। লোভ কাম প্রভৃতি প্রবৃত্তি দমন করবে, সুগ্রীবের সঙ্গে অতি প্রণয় বা অপ্রণয় করো না, উভয় দোষের মধ্যপথ ধরে চলবে।'

বলতে বলতেই বালীর চক্ষু ঊর্ধ্বে প্রবিষ্ট হ'ল, মুখগহ্বর ব্যাদত্ত হয়ে স্থির হয়ে গেল—তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

আবারম্ভ একপ্রস্থ হাহাকার, উচ্চরব ক্রন্দন এবং বিলাপ।

বৃষ বিনষ্ট হলে সিংহসঙ্কুল অরণ্যে গো-সকলের যে অবস্থা হয়, বালীর সেবিকাদেরও সেই অবস্থা হ'ল।

ইতিমধ্যে নল বালীর গাত্র-সংলগ্ন অন্তঃপ্রবিষ্ট তীক্ষ্ন তীর উদ্ধার করলেন, তার ফলে পুনশ্চ প্রবল বেগে জলধারার মতো রক্ত নির্গত হতে লাগল। সে রুধির তারার দেহ ও বস্ত্র রঞ্জিত ক'রে অস্তসূর্যের আভায় তাঁকে যেন নবীন মহিমা দান করল।

এদিকে সুগ্রীব রামের নিকট গিয়ে সমধিক অনুতাপে ও দুঃখে যেন ভেঙে পড়লেন। এতকালের দুঃখ অপেক্ষা বালীর সস্নেহ মিনতিপূর্ণ বাক্যই তাঁর অধিকতর দুঃসহ বোধ হ'ল। কবিহৃদয় কোমল-প্রাণ রামও বিষম দুঃখিত হলেন, এদের কীভাবে সান্ত্বনা দেবেন, ব্যাকুলভাবে সেই চিন্তাই করতে লাগলেন।

চারদিকে এই বিশৃঙ্খলা ও বিমূঢ়তা দেখে বাস্তববুদ্ধি লক্ষ্মণ এবার নিজ হস্তে ঘটনার চালনরশ্মি ধারণ করলেন।

সুগ্রীবের স্কন্ধে হস্তার্পণ করে বললেন, 'সখা সুগ্রীব, তুমি পুরুষ এবং বর্তমানে রাজ্যপ্রধান, স্ত্রীলোকের ন্যায় শোকে বিহ্বল হওয়া ও কেবলই পরিকল্পিত কৃত-কর্মের জন্য অনুশোচনা করা তোমাতে শোভা পায় না। তুমি তারাদেবী ও অঙ্গদকে নিয়ে বালীর অগ্নি-সংস্কার করো। প্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ লাগবে—কিছু চন্দন কাষ্ঠও—এখনই সেগুলি সংগ্রহ ও আনয়নের আজ্ঞা দাও। অঙ্গদ পিতৃশোকে সাতিশয় কাতর হয়েছেন, তুমি স্নেহের সঙ্গে ওঁকে আশ্বস্ত করো ও এখনই প্রতিশ্রুতি দাও যে উনি অচিরে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন। এ রাজ্য ও পুরী এক্ষণে তোমার, তুমি আর কাষ্ঠবৎ জড় হয়ে থেকো না। শ্রীমান অঙ্গদ পিতৃবিয়োগব্যথা পরিহার ক'রে মাল্য বস্ত্র ঘৃত তৈল গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি আনয়নের ব্যবস্থা করুন, বাহকগণকে আদেশ দাও, তারা মহার্ঘ্য ও সুসজ্জিত শিবিকায় বালীর শবদেহ উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে বহন ক'রে নদীতীরে নিয়ে যাক।'

এতক্ষণ কে কী করবেন, কী করা উচিত, মৃতদেহ সৎকারের প্রসঙ্গ প্রথম কে উত্থাপন করবেন স্থির করতে না পেরে উপস্থিত সকলেই শোকের আবরণে নিষ্ক্রিয় উদাসীন ছিলেন। অথচ সৎকার না হলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আরম্ভ হবে না, সে বিষয়েও সচেতনতার অভাব ছিল না—এখন লক্ষ্মণের স্বভাব-কর্তৃত্বের ভঙ্গীতে ও দৃঢ় কণ্ঠস্বরে সক্রিয় হয়ে উঠতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই উত্তম সুগন্ধী দ্রব্য, শয্যা ও পুষ্পমাল্য প্রভৃতির দ্বারা সুশোভিত শিবিকা এল। ওদিকে আর একদল কর্মী বালীর বিশাল দেহের উপযুক্ত সুবিস্তৃত চিতাশয্যা রচনা করতে লাগলেন। অন্ততঃ সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যাতে সে চিতায় অগ্নিসংযোগ করা যায়, সেই জন্যই সকলে প্রাণপণে পরিশ্রম করতে লাগলেন।

তারা তখনও বালীর দেহকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে শবদেহের বক্ষে মস্তক রক্ষা ক'রে যাচ্ছেন। সে আলিঙ্গন শিথিলিত না হলে দেহকে শিবিকায় তোলা যাবে না।

পুরনারীদের সাহায্যে নল প্রায় বলপূর্বক তারার বাহুশৃঙ্খল মোচন ক'রে বালীর দেহ শিবিকায় তুললেন। এবং লক্ষ্মণের দৃষ্টির ইঙ্গিত অনুসরণ ক'রে অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণ অপর বাহকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে শিবিকা-স্কন্ধে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নদীতীরের দিকে ধাবিত হলেন। সুগ্রীবও আর কালবিলম্ব না ক'রে তাদের অনুসরণ করলেন। বস্তুতঃ স্বল্পকালের মধ্যেই এতক্ষণের জনাকীর্ণ মল্লভূমি প্রায় জনহীন হয়ে গেল।

তারাও বিস্রস্ত বসনে, স্খলিত কেশে শিবিকারই অনুসরণ করছিলেন, দৈবাৎ রামচন্দ্রের প্রস্তর-স্থির মূর্তির দিকে তাঁর দৃষ্টি নিপাতিত হ'ল।

অকস্মাৎ যেন তাঁর সুচারু নয়নের সুগভীর আবেগপূর্ণ দৃষ্টিতে দিকদাহী অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। তিনি রামের নিকটে গিয়ে ক্রোধ-তীব্র স্বরে বললেন, 'কপট রাজকুমার, আমার প্রভুকে ভর্তাকে বধ ক'রেই ক্ষান্তি দিলে কেন? আমাকেও বধ করো, আমি বক্ষ অনাবৃত করে দিচ্ছি'—বলতে বলতেই তারা দেবী কঠোর-তপস্বীরও-সাধনাভঙ্গকারী অপ্সরানিন্দিত বক্ষ অনাবৃত করলেন, 'আর সেই সঙ্গে কুমার অঙ্গদকেও। তোমার বন্ধু সুগ্রীবের রাজসিংহাসন নিষ্কণ্টক হোক। অন্যায়ভাবে আমার প্রভুকে বধ করেছ—সে বিচার বিধাতা করবেন! আমি তার জন্য তোমাকে অভিশাপ দেব না। শুধু মিনতি করছি, ঐ রক্তাক্ত শরই তোমার হিংস্র ধনুতে সংযোজিত ক'রে আমাকেও বধ করো। এটা দয়া হিসাবেই ভিক্ষা করছি, আমাকে বালীরই আত্মা বোধ ক'রে শর নিক্ষেপ করো। স্ত্রীবধের পাতক তোমাকে স্পর্শ করবে না।'

এবার রামচন্দ্রের অনিন্দ্য আননে এক বিচিত্র সকৌতুক হাস্য ফুটে উঠল। তিনি প্রসন্ন কোমল কণ্ঠে বললেন, 'চন্দ্রাননে, তুমি অভিশাপ দিলেও তা আমার কোন ক্ষতি করত না। তার কারণ তোমার অন্তরকেই জিজ্ঞাসা করো। তোমার এতাদৃশ শোকেরও কোন যুক্তি নেই। আমি জানি, তুমি বালীর রাজত্বকালেও যেমন কিষ্কিন্ধ্যার কর্ত্রী ছিলে, সুগ্রীবের কালেও তেমনই থাকবে। বরং সুগ্রীবই তোমার কর্তৃত্বাধীন থাকবেন। তিনি তোমাতে অনুরক্ত, তুমিও সুগ্রীব সম্বন্ধে বীতস্পৃহ নও। আমি সুগ্রীবকে অনুরোধ করব—তাঁর অভিষেকের সময়ই তিনি অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন।

'চারুহাসিনী, তোমার এ শোক সত্য হলেও সাময়িক, বালীর বিরহবেদনা তুমি অচিরেই বিস্মৃত হবে। পরন্তু আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি সুখী হবে, তৃপ্ত হবে। বালীর মৃত্যুতে তোমার যেটুকু প্রেরণা ছিল, লোকে তা স্মরণে রাখবে না। কালক্রমে ভারতের ইতিহাসে তুমি মহীয়সী নারী রূপেই পরিচিত হবে।'

॥ উপসংহার ॥

সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক উৎসব সমাপ্ত হতে হতেই আকাশে মেঘসজ্জা দেখা দিল। অর্থাৎ বর্ষাকাল সমাগতপ্রায়।

এই নবনীরদ শোভায় নিদাঘদগ্ধ সকল প্রাণীই পুলকিত ও তৃপ্ত হলেন। প্রখর তপন জলদে আবৃত হয়ে দিবাভাগেই সন্ধ্যারাগের শোভা ধারণ করল। তার প্রান্তভাগ পাণ্ডুর। যেন মেঘরূপ ছিন্নবস্ত্র দিয়ে সূর্যের প্রখর দীপ্তি আচ্ছাদনের চেষ্টা চলছে। পৃথিবী এতদিন উত্তপ্ত ছিলেন, এক্ষণে মেঘদর্শনে আশ্বস্ত ও স্নিগ্ধ হয়ে এতদিনের উষ্মা ত্যাগ করলেন। বায়ু মৃদু ও মন্দ, কেতকী-গন্ধী ও কপূর-সংস্পর্শী শীতল, সে বায়ু যেন অঞ্জলি ভরে পান করা যাচ্ছে।

তবে এর সৌন্দর্য ও উপভোগ্যতা যেমন, কাব্যে যার বর্ণনা মধুর বোধ হয়, বিপদের বাস্তব দিকটাও তেমনি স্বল্প নয়।

এ ভূভাগের চতুর্দিকে বহুদূর পর্যন্ত অরণ্য ও পর্বতবহুল। গ্রীষ্ম বা শীতেও এখানকার পথ বিপজ্জনক ও দুর্গম—বর্ষায় তা অগম্য হয়ে ওঠে, বিপদের ভয়ও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

সে কারণেই সকলে পরামর্শ ক'রে স্থির করলেন, বর্ষার কাল বিগত হয়ে শরতের সমাগম হ'লেই সুগ্রীব চতুর্দিকে চর প্রেরণ করবেন সীতার সংবাদের জন্য। জ্ঞাত অজ্ঞাত সকল দেশেই বহুসংখ্যক চর প্রেরিত হবে। এবং প্রতি দলের সঙ্গেই একজন বিচক্ষণ নেতা থাকবেন। যতক্ষণ না তাঁর বার্তা পাওয়া যায়, ততক্ষণই এ অনুসন্ধান কার্য চলবে।

এই দুই তিন মাস রামকে প্রাসাদে বাস করার জন্য সুগ্রীব বিস্তর অনুনয় করলেন, কিন্তু রামচন্দ্র সম্মত হলেন না। এখনও চতুর্দশ বর্ষ অতিক্রান্ত হয় নি, তাঁর ব্রহ্মচর্য ব্রত ত্যাগ করা সম্ভব নয়। এ সময় গৃহীদের সঙ্গে প্রাসাদে বাস করলে সত্য ভঙ্গ হবে।

সুতরাং স্থির হ'ল, নিকটেই রমণীয় প্রস্রবণ পর্বত, তারই এক স্বাভাবিক গুহায় ওঁরা এই বর্ষাকাল অতিবাহিত করবেন। এবং পূর্ববৎ ফলমূল ও সুপাচ্য মাংস গ্রহণ ক'রে জীবনযাপন করবেন।

প্রস্রবণ পর্বত এমনিতেই খুব রমণীয়—বর্ষায় তার শোভা শতগুণ বৃদ্ধি পেল।

গহন তরুলতাগুল্মে আবৃত থাকায় এই সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গটিকে সর্বদাই মেঘ-নীলবর্ণ বোধ হয়। এখন স্বাভাবিক নীল মেঘের সমাবেশে ও ক্ষণে ক্ষণে নব নব নীরদ সঞ্চারে সে পর্বতের নীলাভতা যেন গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করল।

যে গুহাটি ওঁরা বসবাসের জন্য নির্বাচন করেছিলেন সে গুহার প্রবেশ দ্বার অভ্যন্তর ভাগের প্রসারতার অনুপাতে ঈষৎ অপ্রশস্ত ; গুহাটি সমতল নয়, ঈশান দিকে যেন স্তরে স্তরে দ্বিতল ত্রিতল এই ভাবে উন্নত হয়েছে, অথচ গুহার উচ্চতা

হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নি। সে কারণে সুখস্পর্শ শীতল বায়ুর অভাব হয় না, কিন্তু বর্ষার পূর্বাগত বায়ু কি জলকণা এদের সিক্ত কি বিব্রত করতে পারবে না। চতুর্দিকে যে অগণিত শিরীষ, কদম্ব, অর্জুন ও শালবৃক্ষ—তাদের সুগন্ধী শুষ্ক পত্র আহরণ ক'রে উচ্চতর অন্তর্গুহায় উত্তম শয্যা রচনা করা যাবে।

বস্তুত এ যেন এক উদ্যানবাটিকায় ওঁদের মানসিক শ্রান্তি অপনোদনের জন্য স্বয়ং বিধাতা নির্মিত উদ্যানাবাসের ব্যবস্থা। নতুবা গুহাদ্বারে সম্মুখে এমন প্রশস্ত মসৃণ সমতল শিলাখণ্ড রেখে দেবেন কেন? শিলাটি এই পর্বতগাত্রের থেকে ভিন্ন, দলিত অঞ্জনস্তূপের মতো কৃষ্ণবর্ণ। শিলাখণ্ড না বলে শিলাসন বলাই উচিত তাকে।

মধ্যে মধ্যে বর্ষণক্ষান্ত আকাশ যখন প্রখর সূর্যকিরণ কি উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে উৎভাসিত হয়, চতুর্দিকের শোভা অধিকতর রমণীয় ক'রে তোলে, তখন সেখানেই উপবিষ্ট হয়ে রামচন্দ্র কাব্যমুখর হয়ে ওঠেন, আবার সে কাব্যের সৌকুমার্য এক এক সময় তাঁর বিরহ-যন্ত্রণাকেই দ্বিগুণিত করে তোলে।

এই শিলাস্থলে বসে দূর উত্তর দিকে তাকালে একটি সুন্দর গিরিশৃঙ্গ নয়ন-গোচর হয়—তা অপরাপর শৃঙ্গ থেকে ভিন্ন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নীল কজ্জলের শৃঙ্গ বোধ হয় এখান থেকে, মনে হয় সমগ্র শৃঙ্গটি মেঘ-নির্মিত—যেমন সমতল ক্ষেত্রেও দূর চক্রদিগন্তে মেঘসজ্জা দেখে পর্বত বলে ভ্রম হয়। আবার ঠিক দক্ষিণের শৃঙ্গটি এর বিপরীত—তুষার শুভ্র—না, এতই মসৃণ যে রজতনির্মিত বলে ভ্রম হয়। এটি যেন কৈলাস শিখরের নব-দেহান্তর। আর এই যে গুহার সম্মুখে নিম্নে স্বচ্ছতোয়া নদীটি—ওটিকে এই কারণেই স্বর্গ-স্রোতস্বিনী মন্দাকিনী বলে প্রতীতি জন্মায়।

নদীটি যেন শুধু সুন্দরীই নয়—ওর উভয় তীরে চন্দন, অশোক, পদ্মক, বকুল, কেতক, বেতস প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর বৃক্ষগুলো সজ্জিত হয়ে সুবেশা নর্তকীর মতো নৃত্যরতা।

কী অপরূপ বর্ণোৎসব চারিদিকে! পর্বতগাত্রগুলি যেমন বিভিন্ন ধাতুতে বিচিত্রবর্ণ, অরণ্য যেমন বিবিধ পুষ্পবৃক্ষে বর্ণোন্মত্ত, নদীনীরে ও নদীতীরে তেমান নীলোৎপল রক্তোৎপল, শ্বেতপদ্ম, কুমুদ কহ্লার—ময়ূর, ক্রৌঞ্চের শোভা।

গুহার অদূরেই একটি স্বচ্ছতোয়া সরোজ-শোভিতা সরোবর আছে, গুহার মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী অজস্র। সুতরাং সুস্বাদু পানীয় জলের অভাব নেই।

এ পর্বতে যেমন সিংহ শার্দুল ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র পশু আছে, তেমনি সুন্দর সুকণ্ঠ পক্ষী ও মৃগ শশক প্রভৃতি নিরীহ প্রাণীরও প্রাচুর্য। চন্দন, সর্জ, অর্জুন প্রমুখ বৃক্ষের জন্য এখানে বাতাস সদা-সুগন্ধী। পর্বতটি বহু ধাতুর আধার, সেজন্য পর্বতগাত্র ও স্খলিত প্রস্তরখণ্ডগুলি বিভিন্ন বর্ণের, তাতে নীলকজ্জল মেঘের সমাবেশ হওয়ায় শৃঙ্গগুলি অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে।

বাস করার পক্ষে অপূর্ব স্থান সন্দেহ নেই। মনে অশান্তি না থাকলে রামচন্দ্র বোধ করি এ স্থানেই চিরদিন বাস করতেন। রাজ্য বা ঐশ্বর্যের ভোগবিলাসও তাঁকে প্রলোভিত করতে পারত না।

কিন্তু জানকীর অদর্শনে, তাঁর কুশল সংবাদের অভাবে নিসর্গের এই অপরূপ বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য তাঁর কাছে দ্বিগুণ বেদনাদায়ক হয়ে পড়ছে। যাঁর সঙ্গে একত্রে এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারলে সুখের সীমা থাকত না, তাঁর বিরহে, কামযন্ত্রণায় এসকল বিষবৎ বোধ হচ্ছে।

তাই কখনও বা একমাত্র সঙ্গী লক্ষ্মণের কাছে চতুর্দিকের সৌন্দর্য বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছেন, কখনও বা বিলাপে ভেঙে পড়ছেন।

তথাপি, সব দুঃখেরই একদা অবসান ঘটে।

বর্ষাও এক সময় শেষ হ'ল। নব শরতের বনভূমি হরিতে হিরণে অপরূপা হয়ে উঠল।

রাম আশা করছিলেন, এবার সুগ্রীব সক্রিয় হয়ে উঠবেন। তাই সারাদিন উৎকণ্ঠ হয়ে দূর কিষ্কিন্ধ্যার দিকে চেয়ে থাকেন, কোন কর্মচাঞ্চল্য জনসমাবেশ বা দূর-যাত্রার আয়োজন দেখা যায় কিনা।

কিন্তু সে উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা প্রতিদিনই ব্যর্থ হয়। কিছুই দেখা যায় না। সমস্ত পুরী যেন সুখসুষুপ্ত।

এইভাবেই সুদীর্ঘ ও অসহ প্রতীক্ষায় দিন কাটে। একটি রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতের সঙ্গে একটি সুখদ রজনী যুক্ত হয়। আবার রাত্রিশেষে আশা ও আনন্দের আভাস নিয়ে জ্যোতির্ময় রবির আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু রামচন্দ্রের জীবনে প্রভাত বা দিন বলতে কিছু নেই, সমস্তই আশাহীন অন্ধকার। ক্রমেই তিনি বিষণ্ণ ও ক্ষণে ক্ষণে চিন্তা বা সমাধিমগ্ন হয়ে পড়েন।

কিন্তু রামচন্দ্রের মতো অখণ্ড ধৈর্য লক্ষ্মণের নেই। তিনি রামচন্দ্রের মতো ক্ষমাপরায়ণও নন। ক্রমশঃ তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। একদা অতিশয় বিরক্ত হয়ে উঠে বলেন, 'সুগ্রীব ঘোর অকৃতজ্ঞ। তার সঙ্গে মধুর সম্পর্ক রাখা আর সম্ভব নয়। যে যেমন, তার প্রতি তেমন ব্যবহারই সঙ্গত। আপনি অপেক্ষা করুন, আমি কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে তাকে সমুচিত শিক্ষা দিচ্ছি।'

এই বলে তিনি ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে রোষলোহিত বর্ণ ধারণ ও শরাসন গ্রহণপূর্বক কিষ্কিন্ধ্যা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

কিষ্কিন্ধ্যা সত্যই সুখসুষুপ্ত ছিল।

বালী শুধু প্রচণ্ড ক্রোধী বা অমিতবলশালীই ছিলেন না, দক্ষ প্রশাসকও ছিলেন। তিনি বিলক্ষণ জানতেন—রাজকর্মচারীদের কর্মশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে বা দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর ক'রে তুলতে হ'লে তাদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রাকেও কিছু নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

সেজন্য তাঁর কতকগুলি নীতি ও নিয়ম নির্দিষ্ট ছিল, এবং এমনই তাঁর সম্বন্ধে সকলের আতঙ্ক যে, তিনি নিজে ভোগবিলাসে নিমজ্জিত থাকলেও কোন রাজপুরুষ

বা রাজ্যপ্রধানই সে নীতিকে বিন্দুমাত্র অবহেলা কি শৈথিল্য প্রদর্শন করতে সাহস করতেন না।

সেজন্য ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করলেও তাঁরা সম্পদের সে সুখ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করতে সাহস করতেন না, কতকটা সংযত জীবনযাত্রাই যাপন করতে হ'ত।

কিন্তু সুগ্রীব অন্য প্রকৃতির মানুষ। রাজকার্য বা জীবন সম্বন্ধেও তাঁর চিন্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

স্বল্পায়ু মানুষ, আনন্দের উপকরণ বিস্তর।

সুখ সম্ভোগের সুযোগ থাকতে তা গ্রহণ না ক'রে জীবন কেবল কঠোরতা দুশ্চিন্তা এবং সংঘর্ষ কি যুদ্ধবিগ্রহে অতিবাহিত করবে কেন মানুষ?

আনন্দ বা সুখের উপলক্ষ কি কারণ এবং ধারণা সকলের এক প্রকার না হতে পারে। তা যার যেমন স্বপ্ন-কল্পনা আশা সেই ভাবেই সে আনন্দ লাভ করুক না! ক্ষতি কি?

তিনি চান সুরা, সঙ্গীত ও সুন্দরী। তার অভাব নেই। তিনি আর অধিক কিছু চান না। অপরে কি ভাবে জীবনকাল অতিবাহিত বা এই জীবন উপভোগ করতে চায়, সে সম্বন্ধেও বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য নেই তাঁর। তাঁর এই ভোগসুখে কেউ অন্তরায় না হ'লেই তিনি সুখী।

তিনি আরও নিশ্চিন্ত এইজন্য—দুঃখের দিনগুলি তাদের সাহায্যে ও সাহচর্যে অতিবাহিত ক'রে দেখেছেন, সুখের দিনেও নানাভাবে তাদের মনের পরিচয় লাভ করেছেন—তাঁর রাজ্যপ্রধান বা অমাত্যরা সৎ, তাঁকে সত্যই স্নেহ করেন। সুতরাং অযথা তাদের পীড়ন বা তাদের উপর কঠিন নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করবেনই বা কেন?

তারাও সুখে শান্তিতে কালযাপন করুক, তাঁকেও করতে দিক।

অমাত্যরা তাই-ই করছিলেন। নিজ নিজ হর্ম্য নবভাবে বিপুল সম্পদশ্রীতে সজ্জিত ক'রে—কোন কোন ক্ষেত্রে পুনর্গঠিত ক'রে—ফুল ফল প্রভৃতি বৃক্ষসম্ভারে তা সুরম্য ক'রে সুস্বাদু আহার্য ও সুপেয় মদ্য ভাণ্ডার পূর্ণ রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আরামে আলস্যে কাল অতিবাহিত করেছিলেন।

আর সত্যই, ব্যস্ত হওয়ার কি উৎকণ্ঠা বোধ করার আশু কোন কারণও তো লক্ষিত হচ্ছে না। গুপ্তচররা যা সংবাদ আনছে তাও অনুকূল। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সুগ্রীব-মিত্ররূপে এই আকস্মিক আবির্ভাবে এবং রাজধানীর সন্নিকটে আবাস-স্থাপনে—বানর-রাজ্যের যারা চিরশত্রু দানব পিশাচ ও রাক্ষসজাতি রীতিমতো ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। বালীকে যারা অনায়াসে বধ করতে পারে তাদের অসাধ্য কি আছে?

সুতরাং অমাত্যগণের কোন দুর্ভাবনার কারণ কোথাও নেই, তাঁরা তো সুখসুপ্তবৎ থাকবেনই!

তবে প্রধানরা অধিকাংশ নিজ কর্তব্য বিস্মৃত হলেও একজন হন নি।

তিনি মহাবীর হনুমান।

শরতের আভাস মাত্রেই জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ হনুমান যে সুগ্রীবকে সচেতন করার প্রয়াস পান নি তা নয়। কিন্তু প্রতিবারই সুগ্রীব মধুর স্তোকবাক্যে নানা অছিলায় কর্মারম্ভের দিনটিকে অনাগত অনির্দিষ্ট কালের দিকে ঠেলে দিয়েছেন।

আদিকবি বাল্মীকির ভাষায়, 'তাঁহার মনোরথ পূর্ণ। তিনি রুমা, তারা প্রভৃতি রমণীগণকে লইয়া দিনযামিনী সুখে অতিবাহিত করিতেছেন, যেন সুররাজ ইন্দ্র অপ্সরাগণ-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। স্বয়ং নিশ্চিন্ত, রাজ্যশাসনভার মন্ত্রীগণের হস্তে অর্পিত, তিনি উহাদের কার্য পরীক্ষায় উদাসীন, বিশ্বাসে নিরশংসয় আছেন। ধর্ম বা অর্থ সংগ্রহে তাঁহার মতি নাই। তিনি ভোগপথ আশ্রয় করিয়া নিরন্তর নির্জনে লালসা চরিতার্থ করিতেই অভিলাষী।'

কিষ্কিন্ধ্যা তথা সুগ্রীবের সে সুপ্তিভঙ্গ হ'ল লক্ষ্মণের আকস্মিক আগমনে।

এ আগমনকে বুঝি আক্রমণ বলাই যথার্থ।

কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর সাধারণ বানর অধিবাসীরা প্রথমটা তাঁকে বাধা দেবারই মনস্থ করেছিল। কিন্তু সাক্ষাৎ কালদর্শন যুগান্তভীষণ লক্ষ্মণকে ও তাঁর হস্তধৃত বিশাল ভয়ঙ্কর ধনু দেখে আর্তনাদ করতে করতে পলায়ন করল।

দু'একজন তাদের মধ্যে সুগ্রীবের ভবনে গিয়ে জাগ্রত ক'রে এই আকস্মিক বিভীষিকাময় উপস্থিতি সংবাদ দেবারও চেষ্টা করল। কিন্তু সুগ্রীব তখন অতিরিক্ত সুরাপান ও রমণী সম্পর্কিত অমিতাচারের ক্লান্তি অপনোদনের সুগভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, পরিজনদের করুণ ভয়ার্ত কণ্ঠের স্বরে সে নিদ্রাভঙ্গ হবে কেন?

সংবাদ পেয়ে কুমার অঙ্গদ ভীতিকম্পিত দেহে এসে করজোড়ে লক্ষ্মণকে স্বাগত জানাবার একটা চেষ্টা করলেন। কিন্তু লক্ষ্মণের তখন প্রতি-সৌজন্য প্রকাশের মতো মনোভাব নয়। তিনি জলদগর্জনে বললেন, 'তোমার পিতৃব্য রামচন্দ্রের সঙ্গে মিথ্যাচরণ করেছেন। রামচন্দ্র অপবাদের আশঙ্কা না ক'রে ওঁর ভ্রাতা বালীকে বধ ক'রে ওঁর সিংহাসনপ্রাপ্তি ঘটিয়েছেন। কিন্তু সুগ্রীব সে ঋণশোধের জন্য আদৌ চেষ্টিত নন। এর ফল ওঁর পক্ষে শুভ হবে না। তুমি গিয়ে তোমার পিতৃব্যকে আমার এ বক্তব্য জানাও।'

অঙ্গদও যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু সুরাচ্ছন্ন কামমোহিত সুগ্রীব অতি কষ্টে নেত্র উন্মীলিত করলেও অঙ্গদের বাক্য তাঁর শ্রুতিগোচর বা মস্তিষ্কগোচর হ'ল না। তিনি তৎক্ষণাৎ পুনশ্চ নিদ্রাভিভূত হলেন।...

অঙ্গদের মুখে অবস্থার বিবরণ শুনে লক্ষ্মণ আর দ্বিধা করলেন না। তিনি প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

এই প্রাসাদদুর্গের মধ্যে বিবিধ ভবন, কিছুটা স্বাভাবিক গুহাকে হর্ম্যে রূপান্তরিত করা, কিছুটা প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। এই সব আবাসের উৎকৃষ্টগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা রাজপুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট। অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, বিদ্যুন্মালী, সম্পাতি, হনুমান, বীরবাহু, সুবাহু, নল, সুষেণ (তারাদেবীর পিতা), তার, জাম্ববান, নীল, দধিচক্র প্রভৃতি প্রধানতর।

গৃহগুলি মনোরম, বিশাল ও সুদৃশ্য। ধনধান্যে সমৃদ্ধ, সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে সজ্জিত, উত্তম উত্তম ফলবান বৃক্ষবহুল, সর্বাঙ্গসুন্দরী সুবেশা রমণীগণে পূর্ণ।

লক্ষ্মণ এইসব আবাসগুলি অতিক্রম ক'রে সুগ্রীবের নিজ প্রাসাদে উপনীত হলেন।

বহিঃপ্রাসাদের মূল্যবান আসন ও নানাবিধ সুসজ্জায় শোভিত পর পর সাতটি মহল অতিক্রম ক'রে লক্ষ্মণ এক সময় অন্তঃপুরের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলেন।

দেখলেন সম্মুখের বিস্তীর্ণ গৃহ মহার্ঘ্য সজ্জা, সুদৃশ্য আস্তরণ ও বিস্তৃত সুকোমল শয্যায় শোভিত। সে গৃহে অগণিত সদ্বংশোদ্ভূতা, যৌবন-গর্বিতা, সুরুচিসম্মতবেশা, সালঙ্কারা রমণী, কেহ বা পুষ্পমাল্য রচনায় ব্যাপৃত, কেহ বা তান-লয় সমন্বিত মৃদঙ্গ বাদ্যের সঙ্গে বীণাবাদন করছেন। কেহ বা শুধুই অলসভাবে দর্পণে নিজের রূপযৌবন নিরীক্ষণ করছেন। স্থানে স্থানে পুরুষ অনুচরগণকে দেখা গেল, তাদের পরিচ্ছদ অপরিচ্ছন্ন, মুখভাব ক্লান্ত, গৃহকর্মে তাদের কোন উৎসাহ বা প্রবৃত্তি নেই। অর্থাৎ তাদেরও বিগত রজনীর বিলাস-ব্যসন-সম্ভোগ উন্মাদনার ক্লান্তি অপগত হয় নি।

এ দেখে লক্ষ্মণ স্বভাবতই লজ্জিত বোধ করলেন। এদের সঙ্গে সম্ভাষণে তাঁর রুচি হ'ল না। নিজের আগমন বার্তা ঘোষণার অন্য উপায় না দেখে তাঁর সেই প্রলয়ান্তকারী কার্মুকে টঙ্কার দিলেন। সে টঙ্কারের ধ্বনি এ প্রাসাদ, সমগ্র পুরী কম্পিত ক'রে যেন সুদূর শৈলশিখরে আঘাত ক'রে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করল।

এইবার সুগ্রীবের সুরা-বিহ্বলতা এবং রতিরণক্লান্তি দূর হ'ল। তিনি ত্রস্ত ও চমকিত হয়ে শয্যায় উঠে বসলেন ও চিরদিনের নির্ভররূপা তারাদেবীর দিকে অসহায় ভাবে চাইলেন।

তারাদেবী তাঁর সন্ত্রস্ত অবস্থা দেখে ঈষৎ হাস্য করলেন।

প্রশ্রয় ও অভয়ের হাসি।

তার পর শয়নকক্ষ ত্যাগ ক'রে অন্তঃপুরের প্রবেশপথের দিকে অগ্রসর হলেন।

তার পূর্বেই নূপুরধ্বনি ও কাঞ্চীরব তুলে কিছু কৌতূহলী বিলাসসঙ্গিনী সেখানে সমবেত হয়েছিল, তারাদেবীকে দেখে তারা সভয়ে পথ ছেড়ে দিল। তিনি লক্ষ্মণের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

লক্ষ্মণ ইতিপূর্বেও সুন্দরীশ্রেষ্ঠা সুরনারীনিন্দিতা তারাকে দেখেছেন—সুসজ্জিতা সুচরিত্রা অবস্থায়—কিন্তু এ আজ কাকে দেখছেন?

সুরারক্ত চক্ষু দুটি তখনও অর্ধনিমীলিত, পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চল ভূলুণ্ঠিত, বেণী আলম্বিত, বক্ষ অর্ধ-অনাবৃত, সুপুষ্ট স্তনভার সন্নত। গতি স্খলিত ও কণ্ঠস্বর জড়িত।

ওঁকে এ অবস্থায় দেখে লক্ষ্মণ চক্ষু নত করলেন। কিন্তু তারা নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন নন। তিনি কতকটা প্রণয় নিবেদনের ভঙ্গীতে বললেন, 'প্রিয় রাজকুমার, এ তোমার আজ কী মূর্তি! আমি ভাবলাম, এতদিন পরে বুঝি

তোমার সম্মতি হয়েছে, তুমি আমাদের আতিথ্য নিতে এসেছ। উৎকৃষ্ট খাদ্য, অপর্যাপ্ত মদ এবং অগণিত রমণী তোমার এই আগমনেরই অপেক্ষা করছে গত কয়েক মাস। কিন্তু তুমি ক্রুদ্ধ কেন? এবং কার্মুক ধারণেরই বা প্রয়োজন কী? শমন কার নিকটবর্তী হ'ল? এমন হতভাগ্য কে—তোমার ক্রোধের উদ্রেক করল?'

লক্ষ্মণ এতক্ষণে লজ্জা জয় করেছেন, তিনি নিঃসঙ্কোচে তারার দিকে চেয়ে বললেন, 'তারা, তোমার স্বামী কামের বশীভূত, মদ্যপ, ধর্মদৃষ্টি-বিবর্জিত। তিনি নিকৃষ্ট সঙ্গীদের নিয়ে ইন্দ্রিয়সুখে নিমগ্ন। আমাদের অবস্থা একবারও চিন্তা করছেন না। নিরন্তর কামচরিতার্থ প্রয়াস ও মদ্যপান আদৌ হৃদ্য নয়, এর প্রভাবে ধর্ম ও অর্থ দুই-ই বিনষ্ট হয়। অকৃতজ্ঞতায় ধর্ম লোপ পায় এবং শক্তিমান মিত্রের সঙ্গে অসদ্ভাবে অর্থ বা ঐহিক প্রতিষ্ঠানাশ অবশ্যম্ভাবী। আমরা ওঁর এই ব্যবহার সহ্য করব না। তুমি সুগ্রীবকে গিয়ে একথা জানাও।'

তারা লক্ষ্মণের এই কঠোর বাক্যে ও কঠিন কণ্ঠস্বরে অচিরে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন! তিনি বেশবাস সংযত করে নিয়ে বিনতভাবে বললেন, 'প্রিয়বর, সুগ্রীব সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ, সবই সত্য। কিন্তু নিকৃষ্টের প্রতি উৎকৃষ্টের ক্রোধ শোভা পায় না। সে তোমাদের ক্রোধের অযোগ্য। তবে, এ দুঃখ বা হতাশা তোমাদের প্রাপ্য। তোমরা সুগ্রীবের ওপরই নির্ভর করেছিলে, তোমাদের এই দাসীকে অবহেলা ও অপমান ক'রে। সেইজন্যই আমি দেখছিলাম, কত দিনে তোমাদের শিক্ষা হয়, যথার্থ শক্তির উৎস সম্বন্ধে তোমাদের চেতনা আসে।'

তারপর একটু নীরব থেকে বলেন, 'যাও তোমার অগ্রজ রামচন্দ্রকে বলো গিয়ে, যাকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন, উপেক্ষা করেছেন; মিথ্যাচারিণী ভেবেছেন, সেই তারাই সুগ্রীবের ঋণশোধ করবে। এখন থেকে ষোড়শ প্রহরের মধ্যে চতুর্দিকে বিচক্ষণ অভিজ্ঞ সন্ধানী দল প্রেরিত হবে। সে সব ব্যক্তি নির্বাচন এবং যথাযথ ভার অর্পণ, কে কোন্ দিকে ও কোন্ কোন্ দেশে গিয়ে অনুসন্ধান করবে—সে আমি স্বয়ং ও প্রাজ্ঞ হনুমান স্থির করব। সুগ্রীব আরও দীর্ঘকাল নিদ্রিত থাকলেও এর অন্যথা হবে না।'

এই বলে লক্ষ্মণকে শান্ত ও প্রসন্ন ক'রে আরও নিকটে এসে মধুর হাস্যে বললেন, 'কিন্তু প্রিয় রাজকুমার, তুমি তো তোমার অগ্রজের মতো ব্রহ্মচর্যে প্রতিশ্রুত নও। তুমি অন্ততঃ এক প্রহর এখানে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম এবং চিত্তবিনোদন ক'রে যাও না! দ্যাখো, সুগায়িকা, উত্তম নর্তকী, তরুণী সুন্দরী নারীর অভাব নেই। সুখাদ্য, সুকোমল শয্যা যেন তোমার জন্যই অপেক্ষা করছে। সামান্যকাল যদি তুমি এখানে থেকে কিছুটা শান্তি ও তৃপ্তিলাভ করো, সেটা কিছু তোমার অগ্রজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য হবে না। দ্যাখো, অসংখ্য সুন্দরী নারী এখানে আছেন। তুমি যাকে নির্বাচন করবে সে-ই কৃতার্থ হবে। তোমার মনোমত হলে আমি বা রুমাও তোমার সেবা করতে পারি। তাও যদি রুচি না হয়, নৃত্য-গীত সম্ভোগে ক্ষতি কি?'

এই প্রস্তাবে লক্ষ্মণের সুচারু সুগৌর ললাটে লজ্জার রক্তাভা যে অপরূপ

বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি করল, তারাদেবী মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকেই চেয়েছিলেন। লক্ষ্মণ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নীরস কণ্ঠে বললেন, 'আপনার আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি আর্য রামচন্দ্রকে অচিরে নিবেদন করাই আমার যথার্থ বিশ্রাম দেবী। অন্য কোন চিত্তবিশ্রামে আমার রুচি নেই।'

তারাদেবী অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

॥ ২ ॥

অতঃপর তারাদেবী স্বয়ং, অথবা তাঁর তীব্র তাড়নায় বা প্রেরণায় সুগ্রীবের সুরা ও নারীসঙ্গর মোহবিহ্বলতা বিনষ্ট ক'রে তাঁকে দিয়েই দ্রুত ব্যবস্থা নিলেন কি নেওয়ালেন লক্ষ্মণ তা জানতে পারলেন না। তবে তারার প্রতিশ্রুতি-মতো ষোড়শ প্রহর বা দুই দিবারাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই যে দলে দলে বানরসৈন্য সংবাদ-সংগ্রাহকদের নেতৃত্বে দিকে দিকে প্রেরিত হ'ল, তা প্রস্রবণ পর্বতশিখর থেকে লক্ষ্মণ স্বচক্ষেই দেখলেন।

কেবলমাত্র তা-ই নয়, অগণিত দূত প্রেরিত হ'ল চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশগুলিতে, যাতে সে সব দেশের শাসকবৃন্দ সদলে সসৈন্যে এসে সুগ্রীবের পতাকাতলে সমবেত হন।

রামচন্দ্র এত সত্বর এই আশাতিরিক্ত বিপুল কর্মব্যস্ততা দেখে প্রসন্নচিত্তে ক্ষমাপ্রার্থী সুগ্রীবকে প্রশ্ন করলেন, 'মিত্রবর, এত অধিকসংখ্যক সৈন্য সমাবেশের কারণ কি? শত্রু কই? তার কি শক্তি, এখনও তো কিছুই জানা গেল না।'

উত্তর দিলেন সুগ্রীবের সঙ্গিনী তারাদেবীই, 'শুনেছি, আপনার কে মুমূর্ষু মিত্র জানিয়েছেন যে, রাক্ষসরাজ রাবণই সীতাকে হরণ করেছেন। আপনাকে পূর্বেই বলেছি, রাবণ বালীর খুব অনুগত বন্ধু ছিলেন। বালীই বলেছেন, রাবণ ও তাঁর ভ্রাতারা দুর্ধর্ষ বীর, দক্ষিণ সাগরের এক অতুল ঐশ্বর্যশালী দ্বীপে তাঁদের বাস। বহুসংখ্যক সৈন্য ব্যতিরেকে সে দ্বীপ জয় করা সম্ভব হবে না।'

রাম সবিস্ময়ে বললেন, 'রাবণের আবাসভূমি যদি তোমাদের জ্ঞাতই থাকে, তাহলে চতুর্দিকে এত চর প্রেরিত হচ্ছে কেন?'

তারা বললেন, 'রাবণ শুধু বড় যোদ্ধাই নন, মায়াধর এবং ধূর্ত। প্রচুর প্রভাবশালীও। সুদূর দেশসমূহের, এমন কি আর্যাবর্তের নৃপতিরাও রাবণকে তুষ্ট করার জন্য আগ্রহী। কোশল রাজ-বধূকে হরণ করার বিপদ অবশ্যই রাবণের অপরিজ্ঞাত নয়। তিনি যে সীতাকে লঙ্কাতেই নিয়ে রেখেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে। যে কোন দেশেই গোপন ক'রে রাখতে পারেন, বা সেখানে নিজেও বাস করতে পারেন।'

পুনশ্চ বললেন তারা, 'লঙ্কাদ্বীপের যথার্থ অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের কিছু ধারণা থাকলেও সবিশেষ কোন তথ্য জানা নেই। বিশাল তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র

নৌকায় পার হওয়া দুঃসাধ্য। কোথা দিয়ে সেখানে যাওয়া সম্ভব, কী উপায়ে, সে বিষয়ে সকল প্রকার সংবাদ সংগ্রহের জন্যই প্রাজ্ঞতম ও বীরোত্তম হনুমানকেই দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, অচিরকালমধ্যে লঙ্কা আক্রমণের উপায় ও সীতার সকল সংবাদ পাবেন।'

রামচন্দ্র কৃতজ্ঞ নয়নে হস্তে বরদানের মুদ্রা ক'রে বললেন, 'দেবী, আমি আরও একবার আপনার নিকট ঋণপাশে আবদ্ধ হলাম।'

অকস্মাৎ তারার দৃষ্টি জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো প্রখর ও তীক্ষ্ন তীব্র হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'রামচন্দ্র, আপনি আমার পূর্ব ব্যবহারের সঙ্গে বালীর মৃত্যুর পর শোকপ্রবলতার সামঞ্জস্য বুঝতে না পেরে বিদ্রূপ করেছিলেন। তা আর কেউ না বুঝুক, আমি বুঝেছি। আপনার নিকট আমার কৃতজ্ঞ থাকার কোন কারণ নেই। আপনার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য এই বিপুল সমরায়োজন করছি না।'

বিস্মিত রামচন্দ্র এর কোন প্রত্যুত্তর দেবার পূর্বেই অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে তারাদেবী বললেন, 'আপনার পত্নীপ্রেম, একনিষ্ঠতা, অপর নারী সম্বন্ধে আপনার আশ্চর্য ঔদাসীন্য দেখে বুঝেছি, সীতাদেবী কি অসামান্য সৌভাগ্যবতী। তাঁরও আপনার প্রতি ভালবাসা অবশ্যই একাগ্র, নচেৎ আপনিও তাঁর প্রেমে ও বিরহে এতাদৃশ উন্মত্ত হয়ে উঠতেন না। সেই সতী ও সৌভাগ্যবতী নারীকে বিপন্মুক্ত ও সুখী করার জন্যই আমার এই প্রয়াস। যে একনিষ্ঠ প্রেম আমরা পেলাম না, আমাদের এ সমাজে বোধ হয় কেউ পায় না—সেই অপূর্ব প্রেমের অধিকারী আপনারা সুখী হোন। আমি অভাগিনী, আমার দ্বারা যদি তাঁর কিছুমাত্র শান্তির উপায় হয়, তাতেই আমি কৃতার্থ হবো।'

রামচন্দ্র এবার দক্ষিণ হস্ত উত্থিত ক'রে গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন, 'ধন্য দেবী, আপনি ধন্য। তবে আমি আপনাকে আশীর্বাদ করছি, জগতের এক অদ্বিতীয়া সতী নারীর জন্য আপনার এই আকুলতা ও তাঁকে সুখী করার প্রয়াস বৃথা যাবে না। আপনিও সুখী হবেন, তৃপ্ত হবেন। ইতিহাসে স্মরণীয়া হয়ে থাকবেন।'

আকাশের সীমা নাই

উৎসর্গ

শ্রীমতী রিক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমান সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ এক ॥

চিনতে পারার কথা নয়—ঐ বিশেষ ভঙ্গীটাতেই মনে পড়ে গেল।

টাকা দেওয়ার সময় ঐ যে একটা তাচ্ছিল্যসূচক ঔদাসীন্য প্রকাশ পেল, কী দিচ্ছে কত দিচ্ছে তা যেন না দেখে-শুনেই দিয়ে দিলে—টাকা জিনিসটা সম্বন্ধেই অপরিসীম অবজ্ঞা—

এ ধরণটা আমার অত্যন্ত পরিচিত।

এ জিনিস সচরাচর দেখা যায় না, বহু মানুষের সাধারণ আচরণের ভিড়ে মিশে যাওয়ার কথা নয়।

এ মেজাজ, জীবনের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু সম্বন্ধে এমন একটা অবহেলা—জীবনে এই একজনের মধ্যেই দেখেছি—এখনও পর্যন্ত।

সুতরাং, বিস্মিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্মৃতির দরজা খুলে গেল, মনে পড়ে গেল মানুষটাকে।

দেবুদা!

দীর্ঘ বারো-তেরো বছর পরে দেখা—চেহারা ভুলে গেছি তার কারণ সেটা এই ক'বছরের মধ্যে বিস্তর বদলেছে। তখনও ঠিক রোগা যাকে বলে তা ছিল না—কিন্তু এমন স্বাস্থ্য-ঝলমলে চেহারা তখন ছিল কল্পনাতীত।

এ যেন ভেঙেচুরে গড়েছে একেবারে।

এ-ই বুকের ছাতি ; ভারি, মজবুত পা—অর্ধ-অনাবৃত লোমশ হাত দুটো বলিষ্ঠ পৌরুষের সাক্ষ্য দিচ্ছে—এক কথায় দশাসই জোয়ান। এর মধ্যে কলেজ-জীবনের সে দেবুদাকে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।

অনেকক্ষণ ধরে দেখলেও—চেহারা দেখে চেনা যেত না।

পরিচয়ের সূত্র অন্য।

মানুষ বদলেছে, কিন্তু মুদ্রাদোষ বদলায় নি।

সমান আছে ওটা।

অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ঠিকই, বাবা বোধ হয় ডিস্ট্রিক্ট্ জজ না ঐ রকম কী একটা ছিলেন, কিন্তু খুব প্রচণ্ড ধনী ছিলেন না তাঁরা—মানে নামকরা বড়লোক, তাহলে তো এক ডাকে চিনতুম সবাই।

তবু, টাকাকড়ি সম্বন্ধে ঐ ভাবটা দেখেছি বরাবর।

ওটার সঙ্গে বোধ হয় টাকা থাকা বা না-থাকার সম্পর্ক নেই।

এ মেজাজ নিয়ে জন্মায় লোক।

টাকা থাকলে টাকার ওপর মায়াই হয় বরং—

তখন বুঝি নি, জীবন সম্বন্ধেও ঐ মনোভাব ওর।

মনুষ্য-জীবনের যা স্বীকৃত ধন, যা কিছু সঞ্চয়ের যোগ্য—তার কোনটা সম্বন্ধেই ওর বিন্দুমাত্র মায়া ছিল না।

বেশী দিনের পরিচয় নয়, মাত্র এক বছর দেখেছি।

তাও পুরো এক বছর হবে না—আমার থেকে এক বছরের সিনিয়র ছিল দেবুদা ; আমি যখন থার্ড ইয়ারে এসে ভর্তি হলুম, ও তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ছে।

ঐ ক-টা মাসই যা জানাশুনো।

কিন্তু তখনই, সেই প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই, ওর ঐ ভঙ্গীটা চোখে পড়েছে। মনে লেগেছে।

টাকাকড়ির ব্যাপারে অদ্ভুত একটা ঔদাসীন্য, তাচ্ছিল্য।

এমন ভাব দেখাত যেন রকফেলার কি রথস্‌চাইল্ডের কেউ হবে।

তাও তারাও ঠিক এতটা বেপরোয়া হতে পারত কিনা সন্দেহ।

কতকটা সেই দুমার উপন্যাসে পড়া 'কাউণ্ট অফ্ মণ্টেক্রীস্টো'র মতোই মনে হ'ত ওকে—যিনি ধনী লোকের শ্রেণী বিভাগ ক'রে বলেছিলেন, 'যাকে টাকা খরচ করতে হয় জমার হিসেব মনে ক'রে রেখে, কত টাকা ব্যাঙ্কে আছে মনে ক'রে রাখতে হয়—সে ধনীই নয়। এরা হ'ল তৃতীয় শ্রেণীর বড়লোক।'

মনে রাখবেন—টাকা খরচের অঙ্কের কথা বলছি না, বলছি ঐ মেজাজটার কথা। 'দিমাগ' যাকে বলে।

টাকা হয়ত বিশ-ত্রিশ টাকার বেশি থাকত না পকেটে, কিন্তু নবাবী দেখানোর পক্ষে তাই যথেষ্ট। কলেজ-ক্যাণ্টিনে গিয়ে খেয়ে ও খাইয়ে হয়ত ষোল টাকা দশ আনা বিল হ'ল, দেবুদা অপরের সঙ্গে গল্প করতে করতে অন্যমনস্ক ভাবেই হাত ঢুকিয়ে দুখানা দশ টাকার নোট বার ক'রে 'বয়'টার দিকে ফেলে দিয়ে চলে এল—হাত দিয়ে শুধু ঐটুকুই 'ফীল' ক'রে নিত যে দুখানা নোটই উঠেছে এবং সেগুলো দশ টাকার নোটই।

এটুকু করত—কম না পড়ে, পাওনার থেকে কম দেওয়ার লজ্জায় না পড়তে হয়—সেই ভয়ে।

কিন্তু চেঞ্জ নেওয়া ? তার জন্যে দাঁড়ানো ?

দেবুদার পক্ষে কথাটা কল্পনারও বাইরে।

এটা বড়মানুষী দেখানো নয়, কারণ এইরকম ক্ষেত্রে যদি কেউ—রেস্তোরাঁ কফি-হাউস কি ক্যান্‌টিনের কোন বয়—ছুটে এসে চেঞ্জটা দিয়ে যেত, তাহ'লে তেমনি গল্প করতে করতেই সেটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে তা থেকে খুচরোটা কিংবা একটা টাকা—যা হাতে উঠল তা সেই বয়কে দিয়ে বাকীটা সমান ঔদাসীন্যের সঙ্গেই পকেটে পুরত।

কী পেল তাও গুনত না, কী দিল তাও না।

এই বাদশাহী মেজাজের জন্যেই দেবুদাকে সবাই বড়দা বলে ডাকত। যারা ওর চেয়ে বয়সে বড়—তারাও।

এমন কি কোন কোন অধ্যাপকও, ওর কথাই যে বলছেন বোঝাবার জন্যে 'বড়দা' বলে উল্লেখ করতেন, কেউ কেউ বড় জোর বলতেন 'তোমাদের বড়দা'—

যাতে আমরা এক কথায় ধরে নিতে পারি কার কথা বলা হচ্ছে।

অবশ্য তার একটু কারণও ছিল, দেবব্রত দুজন ছিল ফোর্থ ইয়ার আর্টস্‌এ, সায়ান্সেও নাকি একজন ছিল—বিহারী সে, দেবব্রত ওঝা।

সুতরাং বড়দা বললে আর কোন বর্ণনা বা বিশেষণের প্রয়োজন হ'ত না।

আমরা এক ক্লাসে না পড়লেও, দেবুদার সঙ্গে সৌহার্দ্য হ'তে কোন অসুবিধা হয় নি।

শুধু আমি কেন, বলতে গেলে কলেজ সুদ্ধই তার বন্ধু ছিল।

অমন দরাজ হাত আর দিলদরিয়া মেজাজ—খুব সহজলভ্য নয়।

তাই ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ার পর্যন্ত, সব ক্লাসের সব সেকশানের ছেলেই তার সঙ্গে পরিচিত হবার, অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ খুঁজত।

বড়লোকের ছেলে আরও অনেক ছিল—অনেকগুলো কয়লাখনির মালিক, বড় কাগজ-কলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার, বড় কন্‌ট্রাক্‌টর ফার্মের মালিক, বড় বড় মারোয়াড়ী মহাজন—নামকরা দিকপাল বড়লোক সবাই।

এদের প্রিয় এবং দুলাল ছেলেরা, ঐশ্বর্যের অনেক সত্য-কল্পনায় মেশা কাহিনীর নায়ক, ছিল বৈকি!

লাহাদের বাড়ির একটি ছেলে ছিল, সে কথায় কথায় শোনাত যে তার বাবা তাকে রোজ পঞ্চাশ টাকা হাতখরচ দেন, তেমনি এও শোনা যেত যে তিনি ওর নামে একটা ব্যাঙ্কের পাস-বই ক'রে দিয়েছেন।

তিনি আশা করেন যে ছেলে এখন থেকেই কিছু কিছু জমাতে শিখবে।

ছেলেও যে তাঁর বিশ্বাসের অমর্যাদা করে নি, তাঁর আশা-ভরসা ব্যর্থ হতে দেয় নি—সে কথাও কোন দুর্বল মুহূর্তে বেরিয়ে আসত তার মুখ দিয়েই।

এরা সবাই দামী গাড়িতে চড়ে আসত, নিত্য নূতন পোশাকের বাহার ছিল, দামী সিগারেট যেত, সিনেমায় মোটা দামের টিকিট কিনে দোতলায় বসে ছবি দেখত—কিন্তু এদের কাউকেই এমন হিসেব না ক'রে টাকা খরচ করতে দেখি নি কখনও।

অনেককে আদৌ দেখি নি অপর কারও জন্যে কিছু খরচ করতে।

দেবুদার অত টাকা ছিল না সেটা জানতাম—তবু 'দেবুদা খাওয়াও' কি 'দেবুদা আইসক্রীম খাওয়াবে একটা?' কিংবা 'খুব ভাল ছবি একটা এসেছে মেট্রোতে—দেখাবে দেবুদা?' বলে, কেউ কখনও বিমুখ হয়েছে বলে শুনি নি।

ক্যান্টিনের ম্যানেজার ওকে চিনে নিয়েছিল। অনেক সময় বেশী টাকা হাতে থাকত না, একসঙ্গে হয়ত কুড়িজন ছেলে এসে খেতে বসল বড়দাকে মুরুব্বি ধরে—খাওয়ার শেষে বয় বিল এনে ধরলে ওদের দিকে চোখ রেখেই, শুধু হাতের ভঙ্গী ক'রে একটা পেনসিল চাইত, বয় ছুটে গিয়ে পেনসিল এনে দিলে—হাতে ধরিয়ে দিতে হ'ত—তেমনি অন্যমনস্ক ভাবে কথা কইতে কইতেই সই ক'রে চলে আসত।

কত টাকার বিল, ঠিক ঠিক দাম ধরেছে না অকারণ বেশী চার্জ করেছে অথবা

যোগে ভুল হয়েছে কিনা—একবারও সেটা চেয়ে দেখত না ভাল ক'রে।…

পরের দিন অমনি ভাবেই বন্ধুদের সংগে উ'চুদরের রাজনীতি বা সাহিত্য নিয়ে উচ্চস্বরে তর্ক করতে করতে এসে অপরিসীম তাচ্ছিল্যের সংগে পকেট থেকে তিন-চারখানা নোট বার ক'রে ম্যানেজারের টেবিলে ফেলে দিয়ে চলে যেত, কত পাওনা ছিল, আর এখন কত দিল—তা মিলিয়েও দেখত না।

এটা ওর যত্নে আয়ত্ত করা পোজ মাত্র নয়—এ ওর স্বভাব। দৈহিক গঠনের মতোই অস্তিত্বের সঙ্গে জড়ানো।

ফোর্থ ইয়ার সায়ান্সের শতঞ্জীব বরাবরই একটু কুচুটে ধরনের—কারও প্রশংসা সইতে পারত না।

সে বলত, 'ওটা একটা পোজ। হিসেব ঠিকই রাখে, নইলে একদিনও ক্যান্টিনের বেশী পাওনা হয় না—এরকম হয় কি ক'রে? কই তারাপদবাবুকে তো কোনদিন বলতে শুনেলুম না যে, বড়দা আপনাকে আরও দু টাকা দশ আনা দিতে হবে! বরং দু'তিন দিন উনি জোর ক'রে এক্সেস পাঁচ টাকার নোট কি তিন-চারটে টাকা ওর পকেটে গুঁজে দিয়ে গেছেন সেটা দেখেছি।'

সে কথা দেবুদার কানে উঠলে ও যেন ইচ্ছে করেই অন্তর্নিহিত গূঢ়ার্থটা এড়িয়ে যেত, বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত ক'রে বলত, 'বা রে, তারাপদবাবুর এক্সেস পাওনা না হলে তিনি চাইবেন কেন? তারাপদবাবু কি জোচ্চোর?'

বন্ধুরা কেউ ধার চাইলে, সে কত চাইছে আর ও কত দিচ্ছে এসব তুচ্ছ তথ্য দেবুদার মাথায় ঢুকত না—বা তা নিয়ে সময় নষ্ট করতে চাইত না।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে যা হাতে উঠত মুঠো ক'রে তুলে প্রার্থীর হাতে গুঁজে দিত, সে অনুচ্চ কণ্ঠে 'অমুক দিন দেব' কথাটা আর একবার উচ্চারণ করতে গেলে তার মুষ্টিবদ্ধ হাতটায় একটু চাপ দিয়ে বলত, 'ডোন্ট বদার! য়্যাট্ লীস্ট্ আই ডু নট।'

আবার তেমনি, টাকা না থাকলে—অর্থাৎ দিনের শেষের দিকে কেউ এসে চাইলে প্রসন্ন সহজ ভাবেই বলত, 'নেই ভাই, এই দ্যাখ্—' পকেট বার ক'রে উলটে দেখিয়ে বলত, 'জাস্ট ক' আনা পয়সা পড়ে আছে—বাস ভাড়ার মতো।'

প্রথম প্রথম, অপেক্ষাকৃত নতুন যারা—ক্ষুণ্ণ হ'ত।

ভাবত অপরকে দেয়, তাকে দিল না।

পরে সবাই চিনে নিয়েছিল, জেনেছিল—হাতে থাকলে বড়দা দিতই, সত্যিই নেই, তাই দিতে পারল না। আর তারা ক্ষুণ্ণও হ'ত না, অভিমানও করত না।

এই দেবুদা!

॥ দুই ॥

কলেজের পড়া সাঙ্গ ক'রে আমি এলুম ইউনিভার্সিটিতে, দেবুদা সসম্মানে অর্থাৎ অনার্স নিয়ে পাস করা সত্ত্বেও পড়ার পাট চুকিয়ে দিলে।

বিজ্ঞের মতো একটা ভঙ্গী ক'রে বললে, 'এসব এডুকেশনের কোন মানে হয় না, শুধু শুধু সময় নষ্ট। জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে নিজের শক্তির ওপরই নির্ভর করতে হবে। ইয়োর মাস্টার্স ডিগ্রি ওন্ট্ ডেলিভার এনি গুড্স্।'

সেই যে ছাড়াছাড়ি হ'ল, তারপর এই দীর্ঘকালেও আর দেখা হয় নি।

ওর জগৎ আর আমার জগৎ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

দেখা হওয়ার কোন 'কমন' ক্ষেত্রও রইল না।

ক্রমশঃ ভুলেও গিয়েছি ওর কথাটা, চেহারাটাও আর মনে ছিল না।

আজ ওর আচরণেই প্রথম যেন মস্তিষ্কের কোন বিস্মৃত কোষে ঘা লাগল।

টাকার প্রতি ঐ রকম অপরিসীম তাচ্ছিল্য এবং ঔদাসীন্য, অন্যমনস্ক হয়ে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে এক মুঠো ছোট-বড় নোট বার ক'রে দিয়ে সেদিকে না চেয়েই কথা কইতে কইতে এগিয়ে ভেতরে আসা—চোখের সামনে দেখার পরেই—সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির সূত্রটা যেন খুঁজে পেলুম বিস্মৃতির সীমাহীন অন্ধকারে।

সেই খেই ধরে তারপর ঐ একটা বছর সাহচর্যের অনেকগুলো ছবি।

বাল্য, কৈশোর বা প্রথম যৌবনের ছবিগুলো মনের মধ্যে এমন ভাবেই গাঢ়-সম্বদ্ধ থাকে যে, একটাতে টান পড়লেই সবগুলো দ্রুত সরে সরে যেতে থাকে মনের পর্দার ওপর দিয়ে—বায়স্কোপের ছবির মতো।

সেই সূত্রে শেষ পর্যন্ত নামটাও মনে পড়ে গেল। পুরোপুরি চিনতে পারলুম।

আর চিনতে পারলুম বলেই এখন অবয়ব ও মুখশ্রীর বৈশিষ্ট্যগুলো মিলিয়ে নিতে পারলুম, সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না।

দুজন গুজরাটী ভদ্রলোকের সঙ্গে কী কথা কইতে কইতে আসছে, আর কেউ হ'লে তখনই ডাকতে বা পরিচয় ঝালাতে সঙ্কোচ বোধ হ'ত, কিন্তু লোকটিকে দেবুদা চিনতে পারার পর আর তেমন কোন দুর্বলতা রইল না।

এ মানুষ বিরক্ত হবে না বা বেয়াদব ভাববে না।

তাই নির্দ্বিধায় কাছে এগিয়ে গিয়ে বললুম, 'আরে, দেবুদা না? তুমি এখানে কী করছ? কোথায় আছ? এই হোটেলে উঠেছ না কি?'

চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে গেল দেবুদা।

হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ।

স্মৃতির অ্যালবামে আমার ছবিটা খুঁজতে লাগল মনে মনে।

তার সেই বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিটা মনে মনে বেশ একটু উপভোগ করলুম বৈকি।

তাকে চিনতে পারার যথেষ্ট কারণ আছে আমার, কিন্তু আমাকে সে চিনবে কী দিয়ে?

অবাক—কিছুটা বা অপ্রস্তুত হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে মুচকি হেসে বললুম, কী, চিনতে পারলে না?...তুমি যে আমাদের সবাইকার বড়দা ছিলে, ছোট ভাইদের একেবারে ভুলে বসে আছ? কলেজ—কলেজ-লাইফটা মনে করার চেষ্টা

করো না একটু—'

'ও হো হো—মাই গুডনেস !' যেন লাফিয়ে উঠল দেবুদা, 'সন্তোষ ! সন্তোষ তালুকদার ! মনে নেই আবার ? বিশবডেঁপো ছেলে, সবাইকে জ্ঞান দিয়ে বেড়াতিস !'

বলতে বলতেই আমার হাতটা ধরে বোধ হয় বারো-চৌদ্দবার ঝাঁকানি দিয়ে নিল।

'ওঃ ! সত্যি ! কতকাল পরে দেখা বল্ তো ! তুই তো খুব মনে রেখেছিস ! সো জেনারাস অফ ইউ !···আমি কিন্তু সত্যিই চিনতে পারি নি। এত দিন পরে —বছর দশেক তো বটেই।···এর মধ্যে কত লোক এল জীবনে, কত লোক গেল। কত লোকের সঙ্গে নতুন পরিচয় হ'ল—চিনে রাখা শক্ত বৈকি !···তবু যে চিনতে পেরেছি এইজন্যেই বাহবা দে আমাকে !···তার পর ? তুইও কি এই হোটেলে উঠেছিস ? তাহলে বেশ টু পাইস করেছিস বল্—এই পশ হোটেলের খরচা যোগাচ্ছিস !···বাই দ্য বাই—একটু অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে এধারে—লেট মি ইন-ট্রোডিউস ইউ—মাই ওল্ড্ ফ্রেন্ড সন্তোষ তালুকদার—মিঃ ঘনশ্যাম পারেখ য়্যাণ্ড মিঃ কেবলচাঁদ ঝাভেরী ! মাই ভেরি ভেরি ক্লোজ ফ্রেণ্ড্স্ !'

এক নিঃশ্বাসে গলগল করে শুধু একঝুড়ি কথাই বলে গেল না—মুখ চলছে বলে পা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই—সে আমাদের তিনজনকেই একরকম টানতে টানতে লাউঞ্জের একটা কোণে নিয়ে এসে সেটিতে বসিয়ে দিল এবং ছোট একটা তুড়ি দিয়ে বয়কে ডেকে সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা পানীয়ের ব্যবস্থা করল।···

এরপর উভয় পক্ষের ইতিহাস আদান-প্রদানে বিলম্ব ঘটবার কথা নয়—ঘটলও না।

আমি এখানে—এই দেবুর ভাষায় 'পশ' হোটেলে আছি নিজের পয়সায় নয়।

আফিসের কাজে এসেছি, আফিসের পয়সায় আছি।

অন্য কোন কমদামী হোটেলে উঠে, এই টাকাটা বিল ক'রে নিতে পারলে খুশী হতুম—কিন্তু আমার ওপরওলারা অরিজিন্যাল ভাউচার দেখতে চাইবেন, তা ছাড়া যাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্যে এখানে আসা—কর্তারা তাঁদের সবাইকেই টেলিগ্রাফ ক'রে এখানের ঠিকানা জানিয়ে দিয়েছেন—সুতরাং আমাকে নবাবী করতে হচ্ছে অনিচ্ছাতেই।

কিন্তু দেবুদা এখানে আছে স্বাধিকারে—অর্থাৎ নিজের পয়সা দিয়েই। এই হোটেলটা ও পছন্দ করে। বার বার এসে থাকার ফলে নিজের ঘরবাড়ির মতোই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

অহঙ্কার হিসেবে নয়, সহজ ভাবেই জানিয়ে দিল কথাটা।

তবে, ও যতটা সহজে জানাল, কথাটা তত সহজ নয়।

অন্তত আমার কাছে নয়।

এখানে এসে বার বার—বা বছরের অধিকাংশ সময় থাকে—তার মানে বিস্তর

টাকা খরচ হয়।

এ টাকাটা কি ও রোজগার করে—না পৈতৃক টাকা ওড়াচ্ছে ব্যবসার নাম ক'রে?—এই প্রশ্নটাই মনে ওঠে সকলের আগে।

কী ব্যবসা তা না বুঝলেও ব্যবসা যে কিছু একটা ধরেছে, সেটা ঐ দুটি ভদ্রলোকের সঙ্গে নিরন্তর কথাবার্তা থেকেই বুঝেছি।

তবে ব্যবসা একটা শুরু করলেই যে তা থেকে আয় শুরু হয়ে যাবে বা আদৌ আয় হবে—এমন কোন কথা নেই।

অন্তত অল্পদিনের ব্যবসায় এভাবে ওড়াবার মতো এত টাকা আয় হবে না।

হয়তো এখনও তোড়জোড়ই করছে, শুরুও হয় নি—সেই অজুহাতে মনের সাধে টাকা ওড়াচ্ছে। 'বাপুতি' টাকা!

এতদিন পরে দেখা, একই হোটেলে বাস—পুরনো পরিচয় আবার জমে উঠতে বাধ্য।

তা ছাড়া কলেজে ছিলুম অনেক পরিচিত সহপাঠীর একজন, এখানে একমাত্র—সুতরাং আমাকে নিয়ে যে দেবুদা একটু মেতেই উঠবে সেটা স্বাভাবিক।

অন্তত ওর পক্ষে।

সে দু'তিন দিনের মধ্যেই বোম্বে শহরে ও আশেপাশে, যা যা দেখার ছিল সব দেখিয়ে নিয়ে এল। নিজের গাড়ি নয়—ট্যাক্সিতেই কিন্তু শুনেলুম এখানে এলে প্রায়ই একটা ট্যাক্সি দিন-হিসেবে ভাড়া ক'রে রাখে; পঞ্চাশ টাকা দৈনিক ভাড়া, তা ছাড়া তেল মবিল আলাদা। নিজের গাড়ির মতোই—বরং তার থেকে বেশী, কারণ মাইনের ড্রাইভার এতক্ষণ ডিউটি দেয় না আজকাল—ভোর ছটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত ওর হুকুমের অপেক্ষায় হাজির থাকে।

থাকে তার কারণ—ড্রাইভারকে খোরাকী দেবার কথা নয়, সেটা মালিকই ধরে দেয়, কিন্তু দেবুদাও প্রায় নিত্যই দেয়—দিনে তিন-চার বার ক'রে—এবং সে টাকার পরিমাণও সামান্য নয়, কখনও চার, কখনও সাত আবার কখনও বা তিন—যখন যা হাতে ওঠে কি খুচরো থাকে পকেটে। এ ছাড়া বকশিশ তো আছেই।

সুতরাং সারারাত হাজির থাকতেও তার আপত্তি হবার কথা নয়।

অনেক জায়গা ঘোরালো আমাকে, অনেক খরচ করল।

বেড়ানো, সে-সঙ্গে এটা ওটা কেনা, প্রথম শ্রেণীর হোটেলে খাওয়া। মায় পুণা পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনল একদিন।

টাকাকড়ি সম্বন্ধে বেপরোয়া বরাবরই ছিল, এখন মনে হ'ল মরীয়া।

যখনই পকেট থেকে কিছু বার করে—দেখি এক গোছা ক'রে একশো টাকার নোট বেরোয়—সর্বদাই দু-আড়াই হাজার টাকা পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

দু-তিন দিন পরে চক্ষুলজ্জা ত্যাগ ক'রে একদিন সোজাসুজিই জিজ্ঞাসা করলুম, 'তুমি এখন কি করছ দেবুদা? মানে কাজকর্ম কি করো? এত ঘন ঘন বোম্বে আসতে হয় কেন?'

দেবু খুব ভারিক্কী চালে উত্তর দিলে—ইংরাজীতে যাকে বলে 'গ্র্যান্ড-ইলোকোয়েন্টলী'—'একটু বিজনেস-টিজনেসের চেষ্টা দেখছি।'

'চেষ্টা দেখছ! এখনও শুরু করো নি? কিসের বিজনেস?'

'বোম্বেতে আবার কিসের বিজনেস করে বাঙালীরা—ফিল্ম ছাড়া? দেখছিস না সেই বোম্বে টকীজের আমল থেকে শুরু হয়েছে—বাঙালীর জয়যাত্রা!'

'ওহো! বুঝলাম, ছবি করছ। তা সে তো শুনেছি খুব এক্‌জ্যাক্‌টিং টাস্‌ক্‌। দিনরাত ঐ নিয়েই থাকতে হয়। তুমি—মানে তোমার তো সেরকম কিছু দেখছি না?'

দেবু যেন একটু বিরক্ত হ'ল—'আরে সে তুই এসেছিস বলে তাই—একটু রিল্যাক্স করছি। অ্যাদ্দিন পরে দেখা! নইলে কি আমি কেবলই এখানে এত টাকা খরচ ক'রে ভ্যাগাবন্‌ডাইজিং ক'রে বেড়াই বলে তোর ধারণা?'

আমি আর তখন কথা বাড়ালুম না।

দেবুদাই এক এক ক'রে সব খুলে বলল—মাথা একটু ঠাণ্ডা হলে।

এই অর্থপ্রাচুর্যের উৎসটাও জানতে পারলুম।

ওর বাবা মারা গেছেন, মা আগেই গিছলেন—এখন শুধু তিন ভাই ওরা।

পৈতৃক যে সম্পত্তি ছিল, বিপুল না হ'লেও উল্লেখযোগ্য—কলকাতায় দুখানা বাড়ি, মধুপুরে একটা; রাসবিহারী অ্যাভেন্যুতে ছ'কাঠা জমি, কিছু মূল্যবান শেয়ার—সব ভাগ ক'রে নিয়ে নিজের অংশটা বেচে ও ভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে।

'তাহ'লে তুমি মূলধন বেচে খাচ্ছ বলো! এ অ্যাফ্লুয়েন্সের তো কোন মানেই হয় না।' হঠাৎই কথাটা বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

'অ্যাফ্লুয়েন্স আবার কোথায় দেখলি?' বিরস কণ্ঠে উত্তর দিল দেবু, 'এ তো বেয়ার নেশেসিটি। মূলধন ছাড়া তো ব্যবসা হয় না, আর যতদিন না জিনিসটা কংক্রিট শেপ নিচ্ছে ততদিন আমাকে তো জীবন ধারণ করতে হবে। এটুকু খরচ না করলে চলবে কেন?…যে ভিক্ষের যা ভেখ্‌। এ ব্যবসাতে টাকা টানতে গেলে টাকা ছড়াতে হয়। মহাজনদের বোঝা চাই তুমি বড়লোক, তোমার আরও অনেক আছে। আমি যদি মাহিমের কোন জেলে-বস্তিতে একটা ঝোপ্‌ড়া নিয়ে থাকি তাতে দিন চলে যাবে ঠিকই—কিন্তু এ ব্যবসা তাহ'লে কোনদিনই করতে পারব না, কেউ কথাই কইবে না আমার সঙ্গে।'

এর পর আর জবাব দেওয়া চলে না।

অপ্রীতির ধার পর্যন্ত পেঁৗছে গেছে প্রসঙ্গটা।

বলা চলত, আমার দুর্নাম ছিল জ্ঞান দেওয়া—এখন সে চাকরিটা তুমিই নিয়েছ!

কিন্তু সেসব বলে লাভ নেই। আমার মা বলেন, 'মিছিমিছি কাউকে আক্কেল দেবার চেষ্টা ক'রো না বাবা, শুধু নিজের মুখ নষ্ট করা। কেউ নিজেকে তোমার চেয়ে কম বুদ্ধিমান ভাবে না।'

যত দেখছি দুনিয়াটা, ততই কথাটার সত্যতা বুঝছি।

বিশেষ এক্ষেত্রে মুখ বুজে থাকাই ভাল।

যে লোকটা কদিনে আমার পিছনেই হাজার-দুই টাকা খরচ করলে, মিছিমিছি তাকে আঘাত দিয়ে আমার লাভ কি! দুদিনের দেখা, আবার কতকাল পরে দেখা হবে কে জানে—কদিনের হৃদ্য অন্তরঙ্গতার মধুস্মৃতিটুকুই থাক্ না।

অকারণ তিক্ততার সৃষ্টি করে লাভ কি?

তা ছাড়া—চলেই তো যাচ্ছি। দেবুদা ছাড়তে চায় না, কিন্তু আমার আর এখানে থাকার উপায় নেই।

আপিসের কাজ তিন-চারদিন আগেই মিটে গেছে—তখনই ফিরে যাওয়া উচিত ছিল, এই দৈনিক সওয়া শো টাকার মতো খরচ ক'রে একদিনও থাকা উচিত হয় নি।

এই বাড়তি থাকার জন্যেই জবাবদিহি করতে হবে অনেক। ওজর দিতে হবে। এর পর আর থাকা চলবে না একদিনও। দেবুদা অবশ্য তার নিজস্ব ভঙ্গীতেই পীড়াপীড়ি করেছিল, বলেছিল, 'দুটো দিন তো তোর ট্রেনেই কাটবে বলতে গেলে, সে দুদিন এখানেই থেকে যা, আমি তোকে পরশু ভোরের প্লেনে টিকিট ক'রে দিচ্ছি। পেঁছে অনায়াসে আপিস করতে পারবি।...দ্যাখ—খরচ আমার।'

আমি তাতে রাজী হই নি।

এমনিতেই ঢের খরচ করিয়েছি, তাতেই মনে মনে অস্বস্তির সীমা নেই।

পুঁজিভাঙা টাকা বেচারীর, একথা জেনেও আর খরচ করাতে চাই না।

দেবুদা স্টেশন পর্যন্ত এসে ট্রেনে তুলে দিয়ে বার বার বলে গেল, 'গিয়েই চিঠি দিস একখানা।...আর মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখবি—বুঝলি? আমি তো এই হুইলউইন্ডে ঘুরে বেড়াই—হয়ত ঠিক সময়মতো উত্তর দিতে পারব না, কিন্তু তোর চিঠি আশা করব, পেলে খুশী হবো খুব। এই হোটেলের ঠিকানাতেই দিস, যেখানেই থাকি না কেন—এরা রিডাইরেক্ট করবে।'

॥ তিন ॥

আমার দিক থেকে এ বন্দোবস্তে কোন ত্রুটি ঘটে নি।

আমার মন তখন কৃতজ্ঞতার সাগরে ভাসছে, টলমল করছে হৃদয়াবেগের বাতাসে।

মনের পাত্র উপচে পড়ছে উচ্ছ্বাস।

আমি এসে তাকে পর পর তিন-চারখানা চিঠি দিয়েছিলুম, কিন্তু বলা বাহুল্য তার একখানারও উত্তর আসে নি।

দেবু বলছিল, 'হয়ত ঠিক সময়মতো উত্তর দিতে পারব না,' কিন্তু একেবারে দেবে না এমন কথা তাতে বোঝায় না।

তবু আমি যে 'বলা বাহুল্য' বললুম—তার অর্থ, দেবুদার যে স্বভাবের

পরিচয় এতাবৎ পাওয়া গেছে তার সঙ্গে এই আচরণটাই মানায়।

পর পর কখানা চিঠি দেবার পরও—মাস দুই-তিন অন্তর অন্তর দু-তিনখানা চিঠি দিয়েছি—তার পর আর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি নি।

শুধু ওকে নয়, বোম্বাইয়ের দু-চারজন পরিচিত লোককেও চিঠি দিয়েছিলুম ওর খবরের জন্যে, কিন্তু কেউই কোন খোঁজ কি পাত্তা দিতে পারে নি। শেষে সেই হোটেলের ম্যানেজার যখন লিখলেন যে, তাঁরাও কোন ঠিকানা জানেন না—সেজন্যে চিঠি রিডাইরেক্ট করতে পারছেন না, তখন অনাবশ্যক কালি-কলম এবং ডাক-খরচা আর করি নি। ও পালা শেষ ক'রে দিয়েছিলুম।

অর্থাৎ জীবন থেকে আবারও মুছে গেল লোকটা।

হঠাৎ দমকা বাতাসের মতো এসে পড়েছিল পাঁচ-ছটা দিন—হৃদয়াবেগে খানিকটা তুফান তুলে আবার মিলিয়ে গেছে।

সে ঝড়ের পিছনে ছুটতে চেষ্টা করাই মূর্খতা।…

আমারও ইতিমধ্যে জীবনে পরিবর্তন ঘটেছে। বেসরকারী চাকরি ছেড়ে সরকারী চাকরি নিয়ে দিল্লী এসেছি।

বড় একটা সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলুম বলে এই বেশী বয়সেও সরকারী চাকরি পেতে আটকায় নি, পররাষ্ট্র ব্যাপারের বার্তা-বিভাগেই চাকরি পেয়েছি।

আয় যে খুব বেড়েছে তা নয়—খাটুনি ছুটোছুটি অনেক কম।

কাজ বলতে কোনমতে দিনগত পাপক্ষয় ক'রে যাওয়া, চাকরি সম্বন্ধে কিছুমাত্র মাথা ঘামাতে হয় না। জানি বয়স বাড়লে মাইনে বাড়বে।…

এর মধ্যে দেবুদার সঙ্গে সেই স্বল্প কদিন অবস্থানের স্মৃতি জীবনের এই বহু পরিবর্তনের ঘূর্ণাবর্তে কোথায় তলিয়ে গিয়েছিল।

কলকাতার বাসা উঠিয়ে দিয়ে চলে এসেছি, সেখানে কেউ খবর নিতে গেলেও খোঁজ পাবে না।

অবশ্য কে আর খবর নিতে যাচ্ছেই বা, অন্তত দেবুদা যে যাবে না সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

কিন্তু আরও একদিন হঠাৎই দেখা হয়ে গেল।

আবারও আকস্মিক ভাবে জীবনে এসে পড়ল লোকটা।

কনট প্লেসের রিগ্যাল বিল্ডিং-এর নিচের গাড়িবারান্দায় শুকনো মুখে আস্তে আস্তে হাঁটছে নিরুদ্দেশ্য ভাবে।

এবারও বহুদিন—প্রায় দশ-বারো বছর পরে দেখা, তবু চিনতে কোন অসুবিধে হয় নি। মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে, সামনের একটা দাঁত নেই, ললাটের সে প্রশান্তি-মসৃণতা ঘুচে গিয়ে বেশ কয়েকটি রেখা ফুটে উঠেছে—তাহলেও মোটামুটি চেহারার কাঠামো কি মুখের ছাঁচে কোন পরিবর্তন হয় নি—দেখামাত্রেই চেনা যায়।

কিন্তু এ কোন্ দেবুদা?

পরনে এখনও একটা দামী প্যাণ্ট্, কিন্তু তাতে মহার্ঘ্যতার দীপ্তি আর নেই—বেশ দৃশ্যগোচর ভাবেই জরাগ্রস্ত হয়েছে সেটা ; হাওয়াই শার্টটারও কলার ছেঁড়া, জুতোর গোড়ালি দুটোই ক্ষয়ে একপাশগুলো বোধ হয় সুখতলা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

এক নজরেই চোখে পড়েছে এগুলো। দারিদ্র্য ও ব্যর্থতার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

দেবুদা দেখতে পায় নি। আমিই কাছে গিয়ে কাঁধে হাত দিলুম।

'কী দেবুদা, চিনতে পারো ? নাকি আবারও ভুলে গেছ বেমালুম ?'

হঠাৎ যেন তার সেই মন্থর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন গতি চঞ্চল হয়ে উঠল। ব্যস্ত-ভাবে বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বিলক্ষণ। সন্তোষ ! বেশ, বেশ, বড় খুশী হলুম। এখানেই থাকো বুঝি আজকাল ? অ। তা কোথায় থাকো ?'

বললুম ঠিকানাটা। শাস্ত্রী ভবনে আপিস, বিনয়-নগরে থাকি। নম্বরটাও বললুম, যদিচ জানি সে ওর মনে থাকবে না।

'চলো না দেখেই আসবে। আমার স্ত্রী, তোমার বৌমা রয়েছেন, ছেলেমেয়ে—। একটু চা খেয়ে আসবে।'

'যাব বৈকি, অবশ্য যাব। আজ নয়—আর একদিন। নিজেই যাব।…আজ বড় ব্যস্ত। আচ্ছা চলি।'

বলতে বলতেই সে হনহন করে এগিয়ে সামনের ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের জনারণ্যে মিশে গিল।

চলে যাবার পর মনে পড়ল যে ওর ঠিকানা বা এখানে কি করে—জিজ্ঞাসা করা হ'ল না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল—জিজ্ঞাসা করলেই কি বলত ?…লোকটা তো এক রকম পালিয়েই গেল আমার কাছ থেকে !

তবে আশা ছাড়ি নি।

জানতুম যে দিল্লী যতই জনবহুল হয়ে উঠুক আজকাল—সে কলকাতা নয়, এখানে থাকলে একদিন-না-একদিন দেখা হবেই।

অবশ্য যদি থাকে !

কী করে কে জানে ?

কৃতকর্মের অর্থাৎ বোহিসেবী অপব্যয়ের ফল যে ভোগ করছে, তা তো দেখতেই পেলুম।

পথেঘাটে চলতে তাই উৎসুক হয়ে চেয়ে দেখি পথিক মানুষদের মুখগুলো।

বাস, ভটভটিয়াগুলোও লক্ষ্য করি।

হ্যাঁ, স্বীকার করছি মানুষটার প্রতি প্রীতির আকর্ষণ নয়—কৌতূহলটাই প্রবল হয়ে উঠেছে, সেই জন্যেই তার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার জন্য এত ঔৎসুক্য।

দেখা হ'লও একদিন।

আগের দেখা হওয়ার প্রায় মাস পাঁচেক পরে।

শালা এসেছিল ক'দিনের জন্যে, তার হাত দিয়ে মার জন্যে একটা 'ফুলকারী'

চাদর কিনে দেব বলে চাঁদনীচকে গিয়েছিলুম, একটু সকাল সকাল আপিস থেকে বেরিয়ে, সেখানেই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

তেমনি নিরুৎসাহ মন্থরগতি, আপাত লক্ষ্যহীন ; চোখের দৃষ্টি তেমনি স্তিমিত, সেই আগের দিন যেমন দেখেছি। পরিচ্ছদটাই শুধু অত জরাজীর্ণ নয়, অপেক্ষাকৃত নতুন—কিন্তু অনেক কমদামী। এখানের সাধারণ কেরানীরাও এর থেকে দামী পোশাক পরে।

সেদিনও দেবুদা আমাকে আগে দেখতে পায় নি, আমিই দেখেছি। সঙ্গে একটি মহিলা—স্ত্রীই হবেন সম্ভবত—কারণ যেভাবে পাশাপাশি কথা কইতে কইতে হাঁটছেন তাতে অনাত্মীয়ের দূরত্ব নেই, আবার প্রণয়ী-সুলভ ঘনিষ্ঠতারও অভাব, এ অনাসক্ত অন্তরঙ্গতা দাম্পত্য সম্পর্কই সূচিত করে।

দেখতে তত ভাল নন ভদ্রমহিলা, সাধারণ চেহারা, একটু বেঁটে ধরনের।

তবে একটু লক্ষ্য ক'রে দেখলুম, স্ত্রীর চোখে স্বামী সম্বন্ধে এখনও একটা সম্ভ্রমবোধ—ইংরেজীতে যাকে awe বলে—একটা মুগ্ধ বিস্ময়ের ভাব আছে—সেটা এখনকার দিনে নিতান্ত দুর্লভ।

আজ আর পালাবার অবকাশ দিলুম না। দ্রুত বেরিয়ে এসে একেবারে ওদের পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে বললুম, 'এই যে, দেবুদা ! খুব এলে যাহোক আমার ওখানে ! আমাকে ঠিকানাটাও দিলে না যে আমিই একদিন যাবো। ইনি—ইনিই কি আমাদের বৌদি ?'

বেশ একটু থতমত খেয়ে গেল দেবুদা। বিব্রতভাবে—খানিকটা ইতস্ততঃ ক'রে বলল, 'হ্যাঁ—ইয়ে—এই আমার স্ত্রী হীরা, হীরাবাঈ টু বি এক্‌জ্যাক্‌ট্—আর ইনি আমার বন্ধু সন্তোষ তালুকদার।'

পরিচয়ের পর্বটা রীতিমাফিকই সারা হ'ল বটে, তবে তাতে যে ওর বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা উৎসাহ নেই—তার চোখের চাহনিতে এবং নিরুৎসুক কণ্ঠেই তা বেশ বোঝা গেল।

ওর স্ত্রী অবাঙালী সেটা আগেই সন্দেহ করছিলুম, কাছে এসে আরও ভাল ক'রে বুঝলুম।

নামেও সে প্রমাণ। হীরাবাঈ নাম যখন—মারাঠী মেয়ে নিশ্চয়। রাজপুতানীও হ'তে পারত, কিন্তু তাদের—কবির ভাষায় "দেহে কোথাও নাইকো কোমলতা"—অন্ততঃ আরও দীর্ঘাকৃতি হবার কথা।

বাঙালী মেয়েদের মতোই শাড়ি পরেছে বটে (আসলে এটা গুজরাটী ধরনই), সে পরার মধ্যে এখনও বেশ আড়ষ্টতা আছে, অসুবিধা বোধ করছে।

বাংলা উচ্চারণেও একটু বাঁকা ভাব রয়েছে।

হীরাবাঈ দু হাত তুলে নমস্কার ক'রে কেতাবী ভাষায় বলল, 'নমস্কার। আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'তে পেরে বড় খুশী হলুম।…ভালই হ'ল, এখানে ওঁর বন্ধু তো বেশী নাই, উনি একা বোধ করেন।'

আমি তখনও অভদ্র ভাবে তাকিয়েই আছি হীরার মুখের দিকে।

দেবুর মতো প্রভঞ্জণকে বেঁধেছে যে মেয়ে সে কেমন তাই দেখছি।

রূপসী যাকে বলে তা আদৌ নয়। বরং একটু বেঁটে বলে খারাপই লাগছে।

তবু আকর্ষণ একটা আছে।

চোখ দুটিতে তো বটেই—এমন শান্ত করুণ-কোমল চোখ আমি আর কারও দেখি নি আজও পর্যন্ত, বাংলার নিভৃত পল্লীর বাঁশঝাড় আর কদম গাছে ঘেরা নিস্তরঙ্গ পুষ্করিণী স্মরণ করিয়ে দেয় সে চোখ—তা ছাড়াও সেই অতি সাধারণ মুখখানাতেও কী একটা আছে যা দেখলে মায়া হয়—ভালবাসা নয়, স্নেহ ও প্রশ্রয় দিয়ে রক্ষা করতে ইচ্ছা করে, বিপদ-সংঘাত থেকে।

চাঁদনীচকের বিপণীবহুল ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কথা বলা শক্ত।

দুদিক থেকে নিরন্তর ধাক্কা আসছে, তার ফলে তাঁতের মাকুর মতো অবস্থা হচ্ছে অনেকটা।

বললুম, 'চলো দেবুদা, আমাকে ট্যাক্সি তো করতেই হবে, চলো, আজই আমার গরিবখানা দেখে আসবে। বরং আবার পেঁছে দেব'খন তোমার বাসা পর্যন্ত।···চলুন ভাবীজী—' হীরার দিকে চেয়ে বলি।

আজও যেন সঙ্গে সঙ্গে বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠল দেবু, 'না ভাই, আজ হবে না। এই এখুনি ছ'টার সময় এক জায়গায় যেতে হবে, বিশেষ এনগেজমেণ্ট আছে একটা। বিষয়কর্মের ব্যাপার—বোঝই তো—! আমিই একদিন যাবো, এবার ঠিক যাবো, দেখে নিও। সবাই যাবো আমরা—'

আমি বললুম, 'ও ভাঁওতায় এবার আর ভুলছি না। তার চেয়ে তোমার ঠিকানাটা বলো, আমিই গিয়ে একদিন দেখা করব।'

'ঠিকানা?' হঠাৎ যেন মুখ শুকিয়ে উঠল দেবুর, 'হ্যাঁ—না মানে, ঠিকানা কি জানো—শীগগিরই দু-একদিনের মধ্যে এ বাসা ছাড়তে হবে। মিছিমিছি গিয়ে কোথায় খুঁজবে—হয়রানি। নতুন বাসা এখনও পাকা হয় নি যে সে ঠিকানা দোব।···তবে সে তুমি ভেবো না, আমিই যাবো কথা দিচ্ছি।'

'তাহলে ঠিকানাটা লিখে নাও—'

'ঠিকানা মনে আছে ভাই। ডিজি এইট নাইন থ্রি তো? ভুলি নি।'

সত্যিই অবাক হয়ে গেলুম।

পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে একবারই বলেছিলুম, আর তখন তো ও পালাবার জন্যে ব্যস্ত। তবু ঠিক মনে আছে তো!

কিন্তু সে বিস্ময় প্রকাশের আগেই—তেমনি, সেই সেদিনের মতোই—ব্যস্তসমস্ত ভাবে চলে গেল ওরা ফতেপুরীর দিকে। তবে তার মধ্যেই হীরার চোখের বিস্ময়বিহ্বলতা আমার চোখ এড়ায় নি।

এই জরুরী এনগেজমেণ্ট যে সর্বৈব মিথ্যা, বাড়ি বদলের ব্যাপারটাও সম্পূর্ণ কাল্পনিক—এই মুহূর্তের প্রয়োজনে রচিত, তা আগেই অনুমান করেছিলুম, এখন হীরার চোখের দিকে চেয়ে নিঃসন্দেহ হলুম।

কিন্তু সত্যিই দেবুদা শেষ পর্যন্ত এল একদিন আমার বাসায়। স্ত্রী ও তিনটি ছেলেমেয়ে সুদ্ধই।

রবিবার নয়—এমনিই কী একটা ছুটির দিন সেটা, দিবানিদ্রা দিয়ে উঠে চা খেতে খেতে কোন সিনেমাতে যাবো না কোন বন্ধুর বাড়ি যাবো ভাবছি—হঠাৎ এসে পড়ল ওরা।

বিস্মিত হলুম নিঃসন্দেহে, খুশীও হলুম।

আশা করি নি একেবারেই।

ওর যা ভাব দেখেছিলুম, তাতে ও আমাদের এড়িয়ে যেতে চায় সেই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হয়েছিল।

দেবুদার আজ দেখলুম অনেকটা স্বচ্ছন্দ ভাব। হাসি ঠাট্টা গল্পে রমাকে বেশ জমিয়ে নিল দু'চার মিনিটের মধ্যেই। দাদা ও বোন—সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

প্রথমটা—আমার মুখে শুনে রমার মনের মধ্যে যে সংশয় এবং একটা অকারণ ঈষৎ-বিদ্বেষের ভাব ছিল—সেটা কাটিয়ে দিল দেবুদা অনায়াসেই।

বৌটিও দেখলুম বেশ লোক, তবে বড্ড শান্ত আর নিরীহ। যাকে নিপাট ভাল-মানুষ বলে তাই। স্বামী সম্বন্ধে এখনও একটা সসম্ভ্রম বিস্ময়ের ভাব বজায় আছে—এতদিনেও সে মুগ্ধতা-বোধ নষ্ট হয় নি।

কোন কোন সদ্য-বিবাহিতার চোখে মুখে এ ভাব যে না দেখেছি তা নয়—কিন্তু এতকাল পরেও সেটা বজায় রইল দেবুদার কোন্ গুণে—সেটাই বুঝতে পারলুম না।

ছেলেমেয়েরাও ভাল, ভদ্র কথাবার্তা; দুরন্ত কি আবদেরে নয়।

প্রায় নটা পর্যন্ত থেকে রাত্রের খাবার খেয়ে ওরা বাড়ি ফিরল। খুব হৈ চৈ হ'ল সবাই মিলে—বে ভাল লাগল সকলকারই। এবার ঠিকানাও পাওয়া গেল ওদের। পুরনো দিল্লীতেই বাসা, সব্জি মণ্ডী বরফ কলের কাছে—কিন্তু লক্ষ্য করলুম আমাদের একবারও যেতে বলল না।

বোধহয় ভুল হয়ে গেছে। তত খেয়াল ক'রে হুঁশ রেখে দেবুদা কাজ করবে এটা আশা করাই তো মূর্খতা।

॥ চার ॥

এর পর আরও কয়েকবার এসেছে দেবুদা।

কোন কোন দিন শুধু সে আর হীরা, কোনদিন বা ছেলেমেয়ে সুদ্ধই।

বেছে বেছে ছুটির বারেই আসত।

ওর যে কোন ছুটির প্রয়োজন আছে, মানে কোন বাঁধা কাজ করে তা মনে হ'ত না—আমার সুবিধার জন্যেই ছুটির হিসেব রাখত।

সেই সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়ার সম্ভাব্য সময়ের হিসেবটাও।

দুটো-তিনটে নাগাদ এসে চা খেয়ে জাঁকিয়ে বসত, একেবারে রাতের খাওয়া সেরে ফিরত।

যেদিন ছেলেমেয়েরা আসত না, সেদিন তাদের খাবারও—জোর ক'রেই অবশ্য, ওরা, বিশেষ হীরা খুবই আপত্তি করত, ভাত রাঁধা আছে বলত ; আমাদের জবরদস্তিতেই নিতে হ'ত—গৃহিণী জোর ক'রে বেঁধে সঙ্গে দিতেন।

'এত রাত্রে গিয়ে আর উনুন জ্বালতে হবে না, আমার তো হচ্ছেই—হয়েই আছে, মিছিমিছি নষ্ট করে লাভ কি ?' এই ছিল রমার যুক্তি।

আমার স্ত্রী রমার সঙ্গে ওর খুবই জমে গিয়েছিল ; রমা বলত বড়দা, দেবু ওকে বলত 'বোনটি'—কোনদিন বলত 'বোন-সোনা'।

খবর দিয়ে আসে না বলে রমার অনুযোগের অন্ত ছিল না—ভাল ক'রে কিছু খাওয়াতে পারে না বলে।

দেখুদা ওকে আরও রাগিয়ে দিত ; বলত, 'সেই জন্যেই তো আসি না। খবর দিয়ে এলে একগাদা বাজার করাবি, রান্না করবি—সন্তোষের দুঃখের পয়সা কতকগুলো শুধু অপব্যয়—আমাদেরও মরা পেটে গুচ্ছেব গিলে পেট-খারাপ !'

শেষে একদিন রমা খুব রাগারাগি করতে দেবুদা কথা দিল, 'এবার যেদিন আসব সকাল নটার মধ্যেই এসে পড়ব। তাহলেই হবে তো ?'

রমা বললে, 'খুব। আপনার বোনাই ছুটির বারে কোনদিনই সাড়ে নটা দশটার আগে বাজার যায় না, কাজেই যদি ঠিক নটায় আসতে পারেন—কোন অসুবিধে হবে না। তবে ছেলেমেয়ে নিয়ে আসবেন কিন্তু।'

তাই এল। সত্যিই পরের রবিবার নটার মধ্যে এসে হাজির হ'ল—কিন্তু খালি হাতে নয়।

এমনিতেও কিছু বাঙালী মিষ্টি কিম্বা দেশীয় লাড্ডু মিঠাই ছাড়া আসত না কোনদিন—সেটা বলতেই হবে।

আর আনতও, সামান্য পরিমাণে নয়। সেরখানেকের কম থাকত না কোনদিনই।

এদিনও এল একরাশ মাছ নিয়ে। 'রুহু' বা রুই, পাবদা, চেতলের পেটি—সব জড়িয়ে অন্তত তিন-চার সের মাছ।

রমা রেগে আগুন হয়ে উঠল, 'এসব কি বড়দা ! এতই যদি বাজার করবেন—আমাদের খেতে বললেই তো পারতেন, শুধু বাড়তির মধ্যে দুটি চালের খরচ তো, আমরা গিয়ে ওখানেই খেয়ে আসতুম, একদিন খাটুনিটা বাঁচত।'

শুধু চালের খরচ ! কয়লা, কাঠ, তেল, মসলা, ঘি—গেলে চায়ের আয়োজন জলখাবার—তোদের যা নিয়ম দেখি তো। এ তো চাট্টিটি মাছ এনে খালাস, বরং তোদেরই একগাদা খরচায় ফেললুম।'

তারপর হেসে বললে, 'মূলেই যে তোর ভুল হচ্ছে ভাই, আমার ইনি না পারেন মাছ কুটতে আর না পারেন রাঁধতে ! আমার বাড়ি মাছ নিয়ে যাওয়াও যা গরুকে

তামাক খেতে দেওয়াও তাই। আমি নিজেও রান্নার ব্যাপারটা তেমন বুঝি না, তাই এক-আধদিন যদি বা মাছ কাটিয়ে বাছিয়ে নিয়ে যাই—সেটা ওর হাতে পড়ে কিম্ভূতকিমাকার একটা বস্তু দাঁড়ায়। মাছের ঝাল খাচ্ছি না মুলোর আচার খাচ্ছি বোঝা যায় না।'

হীরা এ অভিযোগে রাগ করল না, বরং হেসেই বলল, 'তা ভাই সত্যি, আমাদের কোন পুরুষে কেউ কখনও মাছ খায় নি, রাঁধতে শিখব কি ক'রে? প্রথম দিন তো গন্ধেই বমি এসে গিয়েছিল! অথচ ওঁর এতদিনের অভ্যাস—আজন্ম, বেশীদিন মাছ খেতে না পেলে ওঁর খুব কষ্ট হয় তা বুঝতে পারি।'

রমা একটু নরম হয়ে এলেও—বলে, 'তা বেশ তো, সেটা বললে, আর বলতেই বা হবে কেন—বাঙালীর ঘরে বাঙালীকে খেতে বলেছি—মাছ তো আনানো হ'তই। তোমাদের হাতে ক'রে আনবার কি ছিল? এ গরিব বোন কি দাদাকে দু'টুকরো মাছ খাওয়াতে পারত না একদিন?'

দেবুদাও সদাপে উত্তর দেয়, 'বোন যদি গরিবই হয় তো অত চ্যাটাং চ্যাটাং কথা কিসের? গরিব গরিবের মতো থাকলেই হয়, ঘাড় হেঁট ক'রে।' তারপর চোখ মটকে বলে, 'ওরে বোকা মেয়ে, এটা বেনোজল ঢোকানো—বুঝলি না? বেনোজল ঢুকিয়েই ঘরো জল বার করতে হয়। এই এক দিনই আনলুম, তাই বলে কি রোজ আনব? এরপর আসব আর গাদা গাদা খেয়ে যাবো। এটা হল' তার জমি করা।'

'আর তাছাড়া,' একটু থেমে আবার বলে, 'মাছ বেশী করে আনা মানে তোদের বেশী তেল খরচ হওয়া—খরচাটা তো তার কম হচ্ছে না। বরং বেশীই—রাগ করছিস কেন?'

এরপর থেকে যেদিনই আসত, বেশির ভাগই ঐ সকাল বেলায়।

কোনদিন এমনিই আসত শুধু হাতে, কোনদিন আবার গুচ্ছের মাছ কিনে এনে হাজির করত।

এ নিয়ে আগে আগে রমা বকাবকি করত, কিন্তু ইদানীং মানুষটাকে চিনে নিয়েছিল—এসব বকুনি তার ঔদাসীন্যের বর্মে লাগে শুধু—তা ভেদ ক'রে মনের চর্মে পৌঁছয় না।

ওকে সাধারণ মানুষের পর্যারে ফেললে নিজেদেরই ঠকতে হবে।

কোন কিছুতেই ওর কিছু আসে-যায় না, কোন কিছুই ওকে বিচলিত করতে পারে না—এমন মানুষের সঙ্গে বকাবকি করতে যাওয়াই তো মূর্খতা।

এর মধ্যে আমাদের কিন্তু একদিনও দেবুরা ওদের বাড়ি যেতে, কি ওখানে খেতে বলে নি।

এমন কি, তথাকথিত চায়ের নেমন্তন্নও করে নি।

আমরা অবশ্য তা নিয়ে মাথাও ঘামাই নি।

বৌটি যে ভাল রাঁধতে জানে না—তা সে নিজেই স্বীকার করে বার বার, এমন কি ওদের নিজস্ব রান্নাও তেমন কিছু শেখে নি।

কোনমতে জীবনধারণ করে মাত্র, ওর ছেলেমেয়েরা—এই কথাই বলে আক্ষেপ করে।

তাছাড়া, ওদের অবস্থাও যে তত সুবিধের নয়—সেটা ওরা মুখে কিছু না বললেও ওদের কথাবার্তা থেকেই বুঝে নিয়েছি—পোশাক-আশাকে তো বটেই।

তবে চিরদিনই, নিরবচ্ছিন্ন অভাব-অনটনে যায় না—সেটুকুও বুঝতে পারি দেবুর ধরনধারণে।

কখনও বেশ হাসিখুশী, ঠাট্টা-তামাশায়-উৎসাহে ঝলমল করে, সে সব দিনে মাছ কি মিষ্টি নিয়ে আসে রাশি রাশি—আবার অন্য দিন কেমন যেন মিইয়ে থাকে, মুখ খোদা ক'রে।

কোথাও থেকে, হয়ত কোন উপার্জনের পথেই, হঠাৎ কিছু টাকা এসে পড়ে মধ্যে মধ্যে।

তবে, মধ্যে মধ্যে প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেও মোট অবস্থা খারাপের দিকে—সেটা সুপ্রত্যক্ষ। কী যে করে—কিছু করে কিনা, মানে রুজি-রোজগারের চেষ্টা—কিসে চলে, এটা এক ধরনের চক্ষুলজ্জাতেই জিজ্ঞাসা করতে পারি না, দেবুদাও কোনদিন সে প্রসঙ্গ তোলে না।

রকম-সকম দেখে তো মনে হয় কিছুই করে না, অন্ততঃ নিয়মিত কোন কাজ—নইলে এত অফুরন্ত অবসর পায় কোথা থেকে।

আয় থাকলে সর্বাগ্রে যেটা করা উচিত—যেটা ভদ্রলোক মাত্রেই করে—ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা, সেটাও যে ওরা এখনও ক'রে উঠতে পারে নি ভাল-রকম কিছু—তা হীরা বলে ফেলেছে কয়েকবারই।

স্বামীর সম্বন্ধে অনুযোগ হিসেবে নয়, স্বামীর দোষ ও কোন কালেই দেখে না—ভাগ্যের বঞ্চনা হিসেবেই কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

সেইটেই সব চেয়ে দুঃখের কথা।

তবে আমরা—বাংলায় যাকে 'মাইন্ড' করা বলে—তা না করলেও জিনিসটা যে খারাপ দেখাচ্ছে তা ওরা অনুভব করছিল নিশ্চয়ই।

সেটুকু শিক্ষা-দীক্ষা ওদের আছে।

একতরফা আতিথেয়তায় আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা যতই থাক্—যারা সেটা গ্রহণ করে, তাদের ভদ্রতা বজায় থাকে না।

অন্তত আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারের।

এ ধরনের ঔদাসীন্য নির্বিকারভাবে প্রকাশ করতে পারে প্রচণ্ড ধনী অথবা ভিক্ষুকেই।

ইদানীং দেখতুম বাড়ি রওনা দেবার আগে—কী যেন বলি-বলি ক'রেও বলতে পারছে না, স্ত্রী স্বামীর মুখের দিকে আর স্বামী স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাচ্ছে—অকারণেই মাথা চুলকোচ্ছে দেবু।

শেষ পর্যন্ত বোধহয় আর থাকতে পারল না। একটা কী ছুটির বারে বেড়াতে এসে—দিন দশেক পরের এক ছুটির দিনে ওদের বাড়ি দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানাল।

'আমাদের বাসায় যেয়ো একদিন' কি 'কবে আমাদের ওখানে যাচ্ছ তাহলে' —এসব লৌকিকতার ধার দিয়েও গেল না, সোজাই বলল, 'সামনের বুধবারের পরের বুধবার তো ছুটি—ঐদিন আমাদের ওখানে যেতে হবে তোমাদের। যেতে হবে মানে—সকালে যাবে, দুপুরে খাবে—বিকেলে চা খেয়ে ফিরবে একেবারে।'

হীরার যেন আনন্দ চোখেমুখে উপ্‌চে পড়ছে—এই নিমন্ত্রণ জানাতে পেরে, বোধহয় না বলতে পারলে লজ্জাটা খুবই পীড়া দিচ্ছিল এতদিন—সে খুশিতে ঝলমল করতে করতে বলল, 'তোমাদের কিন্তু খুব কষ্ট হবে রমাদি, তা আগে-ভাগেই বলে দিচ্ছি। আমাদের ছোট্ট জায়গা, বলতে গেলে একখানাই ঘর—তার মধ্যে সারাদিন কাটানো— ।···তাছাড়া, আমার যা রান্না, হয়ত কিছু মুখেও তুলতে পারবে না। তবু একদিন না হয় কষ্ট করলেই!'

রমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'মুখে তুলতে তো যাচ্ছি না, রীতিমতো খেতেই যাচ্ছি। সেই বুঝে ভাল ক'রে রাঁধবে—মন দিয়ে। তোমাদের দিশী রান্না দু-একটা খাবো কিন্তু। শ্রীখণ্ড না কি বলে—ঐ যে দইয়ের জল ঝরিয়ে তৈরী করো—ওটা চাই।'

এমনি ক'রেই দুই বান্ধবীর হাসি-ঠাট্টা কপট অনুযোগে দিনটা শেষ হ'ল।

এই প্রথম দেখলুম—হীরা বৌদি যাওয়ার সময় কোন দ্বিধা কি কুণ্ঠার ভাব নিয়ে গেল না—সহজভাবে মাথা উঁচু করেই বিদায় নিল।

রমা বলেই দিয়েছিল, 'খুব সকালে যেতে পারব না ভাই হীরে বৌদি, ছেলে-মেয়েদের ঝামেলা, তার ওপর ছুটির দিনে অনেক বাড়তি কাজ থাকে তো—তোমার ঠাকুরপোর একরাশ সাবান কাচা আছে—সাড়ে দশটার আগে বেরোতে পারব না। তোমার ওখানে পেঁছিতে যার নাম ধরো সাড়ে এগারোটার কম নয়।'

তাতে ওদেরও আপত্তির কারণ ছিল না।

দেরি তো হবেই। ওদেরও সময় কম লাগবে না আয়োজনে। বিশেষ হীরা বৌদির তো আরও বেশী।

সেই মতোই তৈরী হচ্ছিলুম আমরা।

সময়ের ঐ হিসেব ধরেই।

আসলে রমার মতলব ছিল—কিছু রসগোল্লা আর খানকতক মালপো তৈরী ক'রে নিয়ে যাবে দেবুদার ছেলেমেয়েদের জন্যে।

সেই জন্যই আরও—হাতে সময় রেখেছিল।

খাবার হয়ে গেছে, সাবান কাচা প্রভৃতিও; রাত থাকতে উঠে সে সব কাজ শুরু ক'রে দিয়েছে রমা; এমন কি বাচ্চাদের স্নান-টানও হয়ে গেছে, এখন শুধু আমরা দু'জন তৈরী হয়ে নিলেই হয়—হঠাৎ দেবুদা এসে হাজির।

কিন্তু এ কী অবস্থা!

এ কে এসে দাঁড়াল!

এতদিনেও দেবুদার এ চেহারা আমরা দেখি নি কখনও। চক্ষু রক্তবর্ণ, উদ্‌-ভ্রান্তের মতো দৃষ্টি, চুল উশকোখুশকো—জামা-কাপড়গুলো যেন কোনমতে

আলনায় রাখার মতো ক'রে গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে—সমস্ত ভঙ্গীটা দিশাহারার মতো ; এত ম্লান মুখ—মনে হচ্ছে এখনই চোখে জল এসে যাবে—আমরা কেউ একটা কথা কইলে।

আমরা দুজনেই একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠলুম প্রায়, 'এ কী! ব্যাপার কি দেবুদা ? কী হয়েছে ? এমনভাবে পাগলের মতো—? কোন বিপদ-আপদ—মানে —ছেলেমেয়েরা সব ভালো তো ?'

ঠিকমতো প্রশ্ন করতেও তখন যেন সাহস হচ্ছে না। কি শুনব তা কে জানে! কত কি সম্ভাব্য আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা মনে আসছে কেবল।

দেবুদা এসেই ধপ্ ক'রে একটা সেটিতে বসে পড়েছিল। মনে হচ্ছে, এই দীর্ঘ পথ বুঝি বা ছুটতে ছুটতেই এসেছে হেঁটে।

অন্ততঃ সেই রকমই পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল তাকে।···খানিকটা চুপ ক'রে ব'সে থেকে বললে, 'ছেলেমেয়েরা ভালই আছে—সে-সব কিছু না—ওরই—। কী যে হবে!'

এক রকমের হতাশ ভাবে খাপছাড়া খাপছাড়া কথাগুলো বলে আবার ও চুপ করল।

ফলে আরও ব্যস্ত হয়ে পড়লুম আমরা।

'হাঁরে বৌদির ? কী হয়েছে কি ? ব্যাপারটা খুলে বলোই না ছাই!'

'খুব ভোরে উঠেছিলেন—মানে ভোরেই ওঠেন অন্য দিনও, আজ আর একটু আগে—রাত চারটে নাগাদ উঠে পড়েছিলেন—তোমরা যাবে বলেই আরও, খুব চটপটে তো নয়, সেই ডিফিসিয়েন্সীটা ঢাকতেই—অন্ধকার তো তখন—বাথরুমে যেতে কী একটা বেঁজি বা ইঁদুর কিছু ছিল বোধহয়—গায়ে পা লেগে চমকে ভয় পেয়ে যেমন ছুটে বেরোতে যাবেন—পড়ে গেছেন সামনেটায়। চৌকাঠে কোমরটা লেগে আর উঠতে পারছেন না। তাই আমি খবরটা দিতে এলুম। মানে—আরও আগে আসাই উচিত ছিল, তবে ওধারটা না দেখে তো—'

ব্যস্ত হয়ে বলতে যাচ্ছিলুম যে—'চলুন যাই, দেখি গে—' তার আগেই দেবুদা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'অথচ তোমাদেরও তো তাহলে কিছু যোগাড় চাই, অনর্থক দেরি হয়ে গেল। আমি যাই ভাই, আমার এক বন্ধু আছেন ডাক্তার—তাঁর একটা নার্সিং-হোম মতোও আছে—তিনি এসে পড়েছেন দেখে আমি বেরিয়েছি—তিনি বলছিলেন তো তাঁর ওখানে নিয়ে যাবেন। তা যদি নিয়ে গিয়ে থাকেন তো সেখানে আবার ছুটতে হবে—ছেলেমেয়েগুলোকে গুরবচনরা নিয়ে যাবে বোধ হয়, বলছিল তো—আচ্ছা, আসি ভাই—'

বলতে বলতেই শেষের কথাগুলো সিঁড়ির মুখ থেকে প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত নেমে গেল।

বাধা দেওয়া সম্ভব নয়—এসব কথা শোনার পর।

বসতে বলা কি কিছু খাওয়ানোর তো প্রশ্নই ওঠে না।

হয়ত সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে গেলে হ'ত—সেটাও তখন অত মনে পড়ল না।

মুশকিল এই—দেবুদা অনেক কথাই বলল, কিন্তু দরকারী তথ্য একটাও জানা গেল না।

নার্সিং হোমে গেলেন কিনা হীরা বৌদি, সে নার্সিং হোমই বা কোথায়, কে ডাক্তার—আর গুরুবচন কে, নিশ্চয়ই পরিচিত কোন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক, গুরুবচন লাল কি গুরুবচন সিং—কিছুই জানা গেল না।

তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেলেন কিনা—সে প্রশ্নও নিরুত্তরিত থেকে গেল।

ফলে উদ্বেগ দুশ্চিন্তা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও—কিছুই করা গেল না—এমন কি হীরা বৌদির একটা খবরও নেওয়া সম্ভব হ'ল না।

সারাদিন ছট্‌ফট ক'রে ক'রে শেষ পর্যন্ত বিকেলের দিকে বেরিয়েই পড়লুম।

ওর বাসাতেই যাওয়া যাক তো, সেখানে আর যারা আছে—সে বাড়ির অন্য লোক, তারা কি আর কোথায় আছে কেমন আছে একটু খবর দিতে পারবে না?

কোথায় যাচ্ছি সেটা আর রমাকে বললুম না।

বললেই সঙ্গে যেতে চাইবে, ছেলেমেয়েরা হয়ত সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ো ধরবে—'আশিট'র কাছে যাবো। (হীরা বৌদিকে ওরা বলে আশিট—এ দেশের পাঞ্জাবীদের পাশ্চাত্ত্য ফ্যাশন মতো ওরাও আশিট বলতে শিখেছে।)

সে অনেক হাঙ্গামা ও অর্থব্যয়।

ফেরার পথে যদি বাসে উঠতে না পারি—না পারার সম্ভাবনাই বেশী, এত-গুলো লোক নিয়ে—তাহ'লে ট্যাক্সি করতে হবে—বরফকল থেকে বিনয় নগর—যার নাম বারোটি টাকা খরচ।

তাছাড়া, দুর্ঘটনার বাড়ি, বাড়িতে আদৌ কেউ আছে কিনা তার ঠিক নেই—যদি এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে হয় খোঁজখবরের জন্যে—ওদের কোথায় বসাবো, কোথায় রেখে যাবো?

সবসুদ্ধ ঘোরা তো সম্ভব নয়।...একা পুরুষমানুষের কথা আলাদা।

বাস থেকে নেমে খোঁজ করতে করতে শেষ পর্যন্ত বাড়িটার হদিস মিলল।

অনেককে অনেক প্রশ্ন করার পর।

এ দেশের এই এক বৈশিষ্ট্য—পাশের বাড়ির লোকের খবরও এরা রাখে না, অথবা বলে না।

ব্যাঙ্কের দারোয়ান রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, তাকে সেই ব্যাঙ্কেরই ঠিকানা জিজ্ঞেস করেছি—প্রশ্ন শেষ হবার আগেই বলেছে, 'মালুম নেহি!'

অসংখ্য লরীর ভিড়ের মধ্য দিয়ে, কতকগুলো ছোটখাটো মোটর গাড়ি মেরা-মতের কারখানার পাশ দিয়ে একটা সঙ্কীর্ণ গলি—তার ভেতরে একটা ব্যারাক-মতো বাড়ির নিচের তলার একটা ফ্ল্যাটে থাকে দেবুদারা।

বলতে ভাল শোনায় বলেই ফ্ল্যাট বলা (এখন আবার অনেকে বলে অ্যাপার্টমেন্ট) —নইলে মোট একখানাই ঘর, ভেতরের বারান্দায় একখানা টিনের চালা, তার মাঝখানে কলতলা—তাতে দরজা নেই, ছেঁড়া পর্দা দিয়ে আবরু রক্ষা হয়েছে—সেই কলতলার একপাশে একটু রান্নার জায়গা আর একপাশে খাটা পায়খানা।

এদেশের পুরনো আমলের খাটা পায়খানা কী বস্তু তা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন—যাঁদের অভিজ্ঞতা নেই, তাঁদের আর যন্ত্রণা বাড়াতে চাই না।

তাও—পরে শুনেছিলাম এ ফ্ল্যাট এক সর্দারজী মাসিক আট টাকায় ভাড়া নিয়ে এগারো টাকায় এদের বসিয়ে গেছেন।

অনুমান করা খুব অন্যায় হবে না যে, বাড়িওয়ালা তাঁর ভাড়া বা সর্দারজী নিজের মুনাফা—কিছুই পাচ্ছেন না।

কিন্তু তখনও এই অনুসন্ধানের পরিণতিটা অনুমান করতে পারি নি।

কল্পনা এ বাস্তবের ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারে না।

খুঁজে খুঁজে বাইরে দিনের আলো যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও প্রায় অন্ধকার গলির সেই ফ্ল্যাট বা ঘরের সামনে এসে যখন পৌঁছলুম, দেখি স্বয়ং হীরা বৌদিই নিরতিশয় ম্লান ও শুষ্ক মুখে দরজার সামনে রাস্তায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এক হাতে দরজার চৌকাঠটা ধরে।

শুষ্ক—উদ্বেগেও ততটা নয়—যতটা উপবাসে। অন্ততঃ দেখা মাত্র তাই মনে হ'ল আমার, যদিচ উদ্বেগের পরিমাণও কম হবে না।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্র চমকে উঠে মাথা নত করলেন হীরা বৌদি।

দেখতে দেখতে দু'চোখ দিয়ে তাঁর টপটপ ক'রে জল ঝরে পড়তে লাগল।

তাঁর মানসিক অবস্থা বুঝে কোন অস্বস্তিজনক প্রসঙ্গ না তুলে সহজ প্রশ্নই করলুম—যেন ওঁর মুখের বিবর্ণতা ও লজ্জা লক্ষ্য করি নি, চোখের জলও চোখে পড়ে নি—এইভাবেই—'দেবুদা কোথায় ?'

এবার মুখ তুললেন বৌদি। অনাবশ্যক মিথ্যা বলে ভবিষ্যতে অধিকতর লজ্জার কারণ সৃষ্টি করতে চাইলেন না। বোধ হয় মিথ্যা বলা তত অভ্যাসও নেই।

বললেন, 'উনি ভোরবেলাতেই বেরিয়েছিলেন কিছু টাকা যোগাড় করতে, বলে গিছলেন যদি কোথাও কিছু না পান—আপনাদের আসতে নিষেধ ক'রে দেবেন—কিন্তু কী করেছেন জানি না, এখনও পর্যন্ত বাড়ি ফেরেন নি।'

অন্যরকম চেষ্টা সত্ত্বেও কণ্ঠস্বরটা বোধহয় তিক্ত হয়ে উঠল উত্তর দেবার সময়, বললুম, 'তা টাকার যোগাড় না ক'রেই এই নেমন্তন্নের হাঙ্গামা করতে গেল কেন ?'

আবারও মাথা নত করলেন বৌদি, বললেন, 'এক জায়গা থেকে কিছু পাবার কথা ছিল—গত বৃহস্পতিবার। যার দেবার কথা সে কখনই নাকি ফেল্ করে না, আজ অবধি করে নি—সেই ভরসাতেই বলেছিল। সে লোকটি হঠাৎ বুধবার রাত্রে মারা যাওয়াতে সব ওলটপালট হয়ে গেল। সেইদিন থেকেই ঘুরছেন টাকার জন্যে পাগলের মতো। আমরা উপবাস করতে পারি, করেওছি এর আগে—বাচ্চারা সুদ্ধ—এই ইজ্জতটা বাঁচাবার জন্যেই আরও প্রাণপণে ঘুরছেন, কোন জ্ঞান নেই বলতে গেলে। কিন্তু কিছুই হ'ল না। অবস্থা বুঝে ওকে মাপ করবেন।'

তার পরই আরও আকুল হয়ে কেঁদে উঠে বললেন, 'ভাই ঠাকুরপো, আপনার—

আপনার দাদা লজ্জায় কিছু ক'রে বসেন নি তো ?'

'সম্ভবতঃ না, 'অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠেই বলি এবার, 'আমাকে কোনদিনই কিছু বলে নি, তবে ওর অবস্থাটা অনুমান করতে পারি বৈকি। এ তো আর আজ নতুন নয়। ক্রমাগত ভাগ্যের কাছে ঘা খেলে সহ্যশক্তি অনেক বেড়ে যায়। আসলে—শুধু আমরাই তো একমাত্র প্রবলেম নই, প্রধান হ'তে পারি—কিন্তু আপনাদের সংসারেরও তো প্রয়োজন আছে, সে সমস্যারও কোন সমাধান হয় নি বোধ হয়—তাই ফিরতে পারছেন না।'

একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ মুছে বৌদি বললেন, 'ভেতরে চলুন। আতিথেয়তা করতে পারব না—তবু একটু বসুন এসে।'

'এখনই আসছি একটু—' বলেই সেই কানা গলিটা থেকে বেরিয়ে এলুম আবার।

পাড়াটা বিশ্রী, শুধুই স্কুটার, ট্যাক্সি ও লরী মেরামতের আড্ডা। ঠিকাদারদের লরীর আস্তানাও। তাই পথের ধারে চা ও চাটের দোকান ঢের আছে—ঠেলাগাড়িতে ঠেলাগাড়িতে, কোন ভদ্র দোকান খুঁজে পাওয়া কঠিন।

অবস্থা দেখলে হঠাৎ মনে হবে—এ পাড়ার লোকরা ঐ 'চাট্' জাতীয় জিনিস খেয়েই জীবন ধারণ করে।

অনেক ঘুরে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে একটা দোকান মিলল। সেখান থেকে কিছু ক্ষীরের বরফি, গাঁঠিয়া অর্থাৎ মোটা ঝুরিভাজা এবং কিছু চাল ডাল ও আলু কিনে নিয়ে ফিরলুম, সেই সঙ্গে পকেটে ক'রে একটা ছোট চায়ের প্যাকেট ও এক পো চিনি।

বৌদি তখনও সেইখানে দাঁড়িয়ে আছেন—তেমনি ভাবে।

বোধ করি আমারই অপেক্ষা করছিলেন।

এবং আমার ওভাবে চলে যাওয়ার কারণটাও বুঝতে অসুবিধে হয় নি।

আমাকে দেখে একটি কথাও বললেন না, খুব সহজ ভাবেই হাত থেকে জিনিসগুলো নিয়ে 'আসুন' বলে পথ দেখিয়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন।

দেখলুম ছেলেমেয়েগুলো একটা খাটিয়ায় কেমন যেন জড়ো হয়ে বসে আছে।

অদ্ভুত ছেলেমেয়ে, সত্যি!

শিক্ষা না স্বভাব কে জানে! কান্নাকাটি নেই, মুখে কোন শব্দই নেই।

হয়ত মায়ের কাছ থেকেই পাওয়া এটা—এই সহ্যগুণ।

অথচ মুখ দেখেই বোঝা যায়, সারাদিন পেটে কিছু পড়ে নি। অনাহার উপবাস বোধ হয় নতুন নয়। তাই কান্নাকাটি ক'রে শক্তির অপচয় করে না, শান্ত হয়ে সহ্য করে।

আমাকে দেখে যত না হোক, বোধ হয় মায়ের হাতের বস্তুগুলো যে খাদ্য বুঝতে পেরেই, ওদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তৎসত্ত্বেও কেউ উঠে এল না বা 'দাও' 'দাও' করে বিরক্ত করল না। হয়ত একেবারে নেতিয়ে পড়েছে বলেই—আমাকে দেখেও কোন সম্ভাষণ জানাল না।

'চাচাজী' বলে আমাকে, বাড়িতে গেলে আমার কাছে-কাছেই থাকে গল্প শোনার লোভে—কিন্তু আজ চোখে পরিচয়ের সামান্য একটু দীপ্তি ফুটে ওঠা ভিন্ন কোন উচ্ছ্বাস কি অভ্যর্থনার একটি শব্দও ফুটল না ওদের মুখে।

খাবারগুলো ভাগ করতে করতে হীরা বৌদি অর্ধস্বগতোক্তির মতো মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'আপনি তখন হঠাৎ কেন চলে গেলেন তা বুঝেছিলাম, তবু বারণ করতে পারি নি। এমনই অবস্থা যে চক্ষু-লজ্জা করতে আর সাহস হয় না আজকাল।'

ছেলেদের দিয়ে আমার দিকেও এক প্লেট এগিয়ে দিলেন। আমার খাওয়ার সাধ্য নেই, ওঁদেরই কল্যাণে আমার খেতে বেলা তিনটে বেজেছে। সেকথা অবশ্য বলা গেল না। শুধু প্রশ্ন করলুম, 'আপনি নিলেন না ?'

হীরা বৌদির দু'চোখে আবার জল উপচে এল। বললেন, 'সে আসুক ভাই আগে।...তার হয়ত সারাদিনে এক কাপ চাও পেটে পড়ে নি। বাস ভাড়ার পয়সাও নেই, শুধুই হয়ত হাঁটছে। সেই ভোর থেকেই হাঁটছে। সে না এলে মুখে উঠবে না কিছু—'

আমি বললুম, 'আমি বেলা তিনটেয় খেয়েছি—বুঝতেই পারছেন, এখন আর কিছু খেতে পারব না। বরং একটু চা করুন।'

হীরা বৌদি আর দ্বিরুক্তি করলেন না, অকারণ পীড়াপীড়ি করলেন না, খাবার-গুলো সরিয়ে সযত্নে তুলে রাখলেন।

সত্যকে এমন সহজে মেনে নেবার শক্তি মেয়েদের মধ্যে আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এদিক দিয়ে হীরা বৌদি সত্যিই অতুলনীয়া।

আজ মনে হ'ল দেবুদাকে ভাগ্য যত রকমেই বঞ্চিত করুক, এই একদিকে করে নি।

দেবুদা কিন্তু রাত নটাতেও ফিরল না।

অগত্যা আমাকে উঠতে হ'ল। বাড়িতে কিছু বলা নেই, রমা হয়ত ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি শুরু করবে।

আসার আগে শুধু জিজ্ঞাসা ক'রে নিলুম, 'এরকম রাত করা নিশ্চয়ই ওর পক্ষে নতুন নয় ?'

হীরা ঘাড় নাড়লেন, 'না। এ রকম সারাদিন—গভীর রাত পর্যন্ত ঘোরা ওঁর অভ্যাস আছে। বিশেষ যেদিন ঘরে কিছুই থাকে না, সেদিন যতক্ষণ কিছু না হাতে আসে বাড়ি ফেরেন না।'

'তা'হলে আমি এখন আসি। বরং কাল ভোরেই খবর নেব!'

হীরা বৌদি ঘাড় নাড়লেন।

বললেন, 'না ভাই। যদি রাত্রে না আসে আমিই ভোরে গিয়ে খবর দেব। আপনি আর আসবেন না। বড় লজ্জা পাবে। এতগুলো মিথ্যে বলেছে তো!'

পরের দিন সকালে যখন হীরা বৌদি এলেন না তখন নিশ্চিন্ত হলুম।

বুঝলুম হয়ত আমার খোঁজ করতে যাওয়ার সম্ভাবনা বুঝেই কোথাও বসে ছিল,

কোন পার্কে কি কোথাও —। আমি চলে আসতে বাড়ি ফিরেছে, সময়টা অনুমান ক'রে নিয়ে।

॥ পাঁচ ॥

দেবদার সঙ্গে আর আমার দেখাই হ'ল না।

লজ্জানিবারণ ভগবানই বোধ করি তাকে সেই মর্মান্তিক মিথ্যার লজ্জা থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

চিরকালের মতো এই আশাহীন অসম জীবনযুদ্ধ থেকেও।

সেই যে উদ্‌ভ্রান্তের মতো খাপছাড়া খাপছাড়া কথা বলতে বলতে শুষ্ক শ্রান্ত-মুখে বেরিয়ে গেল—একটু চা-ও খাওয়াতে পারি নি বেচারীকে—সেই-ই শেষ দেখা তাকে।

একদা যার মুখ সর্বদাই উৎসাহ আর আশায় প্রদীপ্ত থাকত, জীবন সম্বন্ধে—বিশেষ জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে মনে হ'ত যার তাচ্ছিল্যের অবধি নেই, জীবনী-শক্তির এত প্রাচুর্য যার—মনে হ'ত যে প্রতিনিয়ত সে-জীবন সে অনায়াসে মুঠো মুঠো ক'রে ছড়িয়ে বিলিয়ে দিচ্ছে—সেই অপরাজিত অনবনমিত আশ্চর্য মানুষটির আশাপ্রোজ্জ্বল মুখের দীপ্তি আর কোনদিনই চোখে পড়ল না, সেই প্রথম ওর ভাগ্যের কাছে হার মানার দিনটি থেকে।···আর কোন দিন পড়বেও না।

কে জানত সেই-ই শেষ দেখা ; কে জানত যে দু'দিন খাড়া উপবাসী থেকে ঘুরেছে লোকটা আমাদের খাওয়াবার জন্যে ; সেদিনও, তখনও পর্যন্ত এক কাপ চা-ও পেটে পড়ে নি, সাত-আট মাইল কি হয়ত আরও অনেক বেশী, চোদ্দ-পনেরো মাইল হেঁটে এসেছে !

হয়ত তার পরও হেঁটেছে। হেঁটেই বেড়িয়েছে—সারা দিন।

বিশ্রাম করতে পারে নি। করতে সাহস হয় নি।

খবরটা দিলেন হীরা বৌদিই এসে।

সে-ই একদিন ভোরবেলাই এলেন হীরা বৌদি।

যেমন আসার কথা ছিল সেদিন—দেবুদা না ফিরলে।

কিন্তু এ আসার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না আমরা ! এমন ভাবে আসার জন্যে।

চুল এলো, জামাকাপড় আলুথালু ; দুই চোখে অবিরাম জল পড়ছে ; কপালে কুম্‌কুমের টিপ ঘামে বা অন্য কারণে কপালে লেগে গেছে ; অনেকটা পাগলীর মতো চেহারা দাঁড়িয়েছে।

ভোরের প্রথম বাস্-এই এসেছেন, বোধ হয় ভাড়ার মতো কটা পয়সাই ছিল, হাতে ক'রে বেরিয়েছিলেন—কারণ টিকিটখানা হাতেই ধরা। ব্যাগ তো নেই-ই আঁচলেও কিছু বাঁধা নেই।

সব চেয়ে বড় কথা খালি পায়েই এসেছেন।

কী হয়েছে, কী ব্যাপার—এমন ভাবে ছুটে এসেছে কেন—এসব কোন প্রশ্নই

করা গেল না, তার আগেই 'ঠাকুরপো' বলে একটা যেন বুকফাটা চিৎকার ক'রে উঠে একেবারে আছড়ে পড়লেন—ফ্ল্যাটে ঢুকে যে চলনটা—তার মেঝেতেই।

দুঃসংবাদ খানিকটা অনুমান ক'রে নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম।

স্বামী সম্বন্ধেই দুঃসংবাদ নিশ্চয়।

ছেলেমেয়েদের কারও কিছু হ'লে তাদের বাবাই আসত।

সেদিনের সেই সামান্য লজ্জার কথা মনে ক'রে রেখে বিপদের দিনে অযথা সংকোচ করবে—এমন লোকই সে নয়।

কিন্তু কী সে খবর, কতখানি খারাপ ?

অসুখ, স্ট্রোক, না অ্যাক্‌সিডেন্ট ?

না আরও খারাপ কিছু ? মর্মান্তিক কোন চরম দুঃসংবাদই ?

—যা মুখে উচ্চারণ করতে পারে না মানুষ !···

অবশেষে রমাই যেন সক্রিয় হয়ে উঠল।

পাশে বসে পড়ে মাথাটা জোর ক'রে কোলে তুলে নিয়ে বললে, 'কী হয়েছে তাই আগে বল্ না ভাই ! একটু ধৈর্য ধর্। বিপদে শান্ত হয়ে থাকতে হয় এ শিক্ষা তো তোর নতুন নয়।···এতটাই যখন এলি তখন কী হয়েছে, আমরা কী করতে পারি—কিছু করার পথ আছে কিনা সেটা আমাদের কাছে বল্। না জানলে যে কোন কাজেই আসতে পারছি না।···লক্ষ্মীটি, মুখ তোল্, শান্ত হ, বল্ কী হয়েছে।'

বোধ হয় এইটুকু আন্তরিকতা, সামান্য এই সহাভূতির স্পর্শেই হীরা বৌদি আরও ভেঙে পড়লেন, আরও আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

বহুদিনের সঞ্চিত জল পাষাণ-প্রাচীরে আটকে ছিল যেন—এখন নিদারুণ আঘাতে সে পাষাণ-বাধা ভেঙে গেছে—সহজে এ প্রবল স্রোত সম্বরণ কি সংহরণ করা সম্ভব নয় !

অনেক সময় লাগল দুঃখের সে প্রচণ্ড আবেগ সামলাতে, প্রকৃতিস্থ না হোক, কথা বলার মতো শক্তি ফিরে পেতে।

রমাই সাহায্য করল, ছোট ছোট প্রশ্নে, আন্তরিক সমবেদনায়—দুঃখ ভাগ ক'রে নেওয়ার অনুচ্চারিত প্রতিশ্রুতিতে।

বেশ খানিকক্ষণ পরে, একটু একটু ক'রে তার কান্নার ফাঁকে ফাঁকে যে সংবাদটুকু সংগ্রহ করা গেল, তা এই ঃ

গত কদিন ধরেই চরম দুরবস্থা চলছিল।

এমন নিরবচ্ছিন্ন ভাগ্যের বিরূপতা আর কখনও আসে নি তাদের জীবনে।

অবশেষে একেবারেই ঘরে কিছু নেই, ছেলেমেয়েরা দুদিন ধরে উপবাস ক'রে আছে দেখে কালও নাকি সেদিনের মতো ভোরবেলা উঠে বেরিয়ে গেছেন, ফিরেছেন একেবারে রাত নটায়।

কিন্তু সে কী চেহারায় ফিরলেন !

অস্নাত অভুক্ত, চোখমুখ বসে গিয়েছে, ঘামে গায়ের সঙ্গে জামা লেপ্‌টে গেছে—জামায় প্যাণ্টে তেলকালির মাখামাখি ; কী করে এসেছেন—কোন কারখানাতেই

খেটেছেন কি কোথাও মাল বয়েছেন—কিম্বা কোন সর্দারজীর লরী-মেরামতে সাহায্য করেছেন—সে প্রশ্ন করতে সাহস হয় নি বৌদির—ওঁর সেই একান্ত ক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে।

দেবুদাও নিজে থেকে কিছু বলেন নি, পকেট থেকে চারটে টাকা বার ক'রে দিয়ে সেই ময়লা জামাকাপড় সুদ্ধই বিছানাতে শুয়ে পড়েছেন।

সে অবস্থায় কোন একটু দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যও দেওয়া যায় নি। ক্লান্তি অপনোদনের কোন উপায়ও ছিল না।

টাকার জন্যে গত মাসে ইলেকট্রিকের লাইন কেটে দিয়েছে, তাছাড়া পাখা চরম অভাবে অনেকদিন আগেই বেচে দিতে হয়েছে—একটুখানি দাঁড়িয়ে তালপাতার পাখায় হাওয়া করেছেন বৌদি, তবে তাও বেশীক্ষণ করতে পারেন নি, দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাবে বলে।

তাহ'লে এত কষ্টের টাকাও কোন কাজে লাগবে না।

বন্ধই হয়ে গিয়েছিল, এক চেনা দোকানদারের হাতে-পায়ে ধরে বাড়ির ভেতর দিক দিয়ে চাল ডাল আলু কিনে এনেছেন বৌদি, সেই সঙ্গে তার ব্যবহারের কয়লা থেকে একটু কয়লাও, ধার হিসেবে।

রান্নাও হয়েছে—সামান্যই এক পাকের রান্না, ভাত তার সঙ্গেই ডাল আর আলু-ভাতে—তখন ডাকতে উনি উঠে জামা ছেড়ে মুখে হাতে জল দিয়ে খেতেও বসেছেন—কিন্তু কারও সঙ্গে একটাও কথা বলেন নি। তখনই লক্ষ্য করেছেন বৌদি—ঘাড় হেঁট ক'রে বসে খাচ্ছেন—টপটপ ক'রে চোখের জল ঝরে পড়ছে ভাতের ওপর।

বোধহয় খেতে বসতেনই না—তিনি না খেলে এরা খাবে না বলেই জোর ক'রে বসেছেন।

বুক ফেটে গেছে বৌদির।

জীবনে এমনভাবে পরাজয়কে মেনে নিতে বৌদি আর কোনদিন দেখেন নি ওঁকে।

সদানন্দময় বেপরোয়া ঐ মানুষটাকে।

শত কষ্টেও ওঁর চোখে জল পড়ে নি কখনও। কখনও হাল ছাড়েন নি, অভাব ও দুঃখের কাছে নতিস্বীকার করেন নি।

কিন্তু আর বাস্তবকে বুঝি অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

উনি যে আর পারছেন না, পারলেন না—হারই মেনেছেন ভাগ্যের কাছে—কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ওঁর সেই স্তব্ধ মার-খাওয়া দীন ভঙ্গীতে।

সেইজন্যেই আর একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেন নি বৌদি—পাছে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়, আরও বেশী দুঃখ পান—দুঃখের কথা বলতে গিয়ে।

ঐ উপার্জনের ইতিহাসটাও তাই জানা হয় নি আর।

খেয়ে উঠেই শুয়ে পড়েছেন দেবুদা, কারও সঙ্গে একটি কথাও না বলে।

এমন কি ছেলেদের পর্যন্ত কোন প্রিয় সম্ভাষণ করেন নি। প্রতিদিন শোবার

আগে ওদের খানিকটা আদর করা চিরদিনের অভ্যাস ওঁর—কিন্তু এই অবসন্ন অবস্থা ও বিষাদগম্ভীর ভাব দেখে তারাও কাছে আসতে সাহস করে নি।

হীরা বৌদিও, ওঁকে বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন বুঝে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে আলো নিভিয়ে নিজের বিছানায় এসে শুয়েছেন।

রাত দুটো নাগাদ একটা চাপা গোঙানির মতো আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙেছে বৌদির।

শব্দটা কোন দিক থেকে আসছে তাও বুঝতে দেরি হয় নি।

দুশ্চিন্তা একটা ছিলই, বোধ হয় সর্বনাশের পদধ্বনি নিজের বুকের মধ্যেই শুনতে পেয়ে থাকবেন, তাই ভাল ক'রে ঘুম হয় নি—আধ-তন্দ্রার মধ্যে কান পাতা ছিল এদিকে।

কিন্তু ঘুম ভাঙলেও—উঠে ঘুমের ঘোরে দেশলাই খুঁজে আলো জ্বালাতে তিন চার মিনিট কেটেছে।

তারপর কাছে এসে আলো ধরে দেখেছেন চোখমুখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে দেবুদার। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছেন, ঘামে সর্বাঙ্গ ভেসে যাচ্ছে। তার মধ্যেই অস্ফুট কণ্ঠে একবার বলেছেন, 'বড় কষ্ট হীরু, বড় কষ্ট!'

বৌদি তখনই পাশের ঘরের ভদ্রলোককে ডাকতে যাচ্ছিলেন, দেবুদা হাতের ওপর বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা হাত রেখে নিষেধ করেছেন, তেমনি ভাবেই বলেছেন, 'যেয়ো না! আমার বোধ হয় শেষ হয়ে আসছে, একটু কাছে থাকো।'

চিৎকার করে কেঁদে ওঠারই কথা। তবু প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত ক'রে হীরা বৌদি বলেছেন, 'না না, ওসব কিছু না। যাঃ! এক সেকেণ্ড একা থাকো লক্ষ্মীটি। সোহন সিংকে একটা ডাক্তার ডাকতে বলে আসি।'

কিন্তু সেই সময়টাতেই আরও কষ্ট বেড়েছে দেবুদার, গোঙাতে গোঙাতেই বলেছেন, 'পাইখানা—নিয়ে চলো—নাবিয়ে দাও—'

বৌদি বলছেন, 'তুমি এখানেই করো, আমি ফেলে দেব।' বলতে বলতেই নিজের একখানা ছেঁড়া শাড়ি পেতে দিয়েছেন—কিন্তু তার আর কোন দরকার হয় নি। বার দুই যেন 'হীরু', 'হীরু' আর 'ছেলেমেয়েরা' শব্দ দুটো উচ্চারণ করেছেন, তারপর একটু ঘড়ঘড় আওয়াজ হয়েছে গলায়, তারপরই স্থির শান্ত হয়ে গেছেন।

তখনও এই স্থির হয়ে যাওয়ার মানেটা ঠিক বুঝতে পারেন নি বৌদি।

বোঝার কথাও নয়।

সত্যিই যে সব শেষ হয়ে গেল, এমন ভাবে, অকস্মাৎ—এতটুকু প্রস্তুতির অবসর না দিয়ে—তা বিশ্বাস করাও তো শক্ত।

যে বিপুল প্রাণশক্তি ছিল মানুষটার—সে যে এমন ভাবে এত সহজে, এমন নিঃশব্দে নিঃশেষ হয়ে যাবে—তা তো ভাবাও যায় না!

কখনও একটু আভাস পর্যন্ত পান নি যে!

কখনও অসুস্থও হ'তে দেখেন নি।

মৃত্যুর এতটুকু সতর্ক-বাণী শোনেন নি কখনও।

তাই বৌদি এটাকে রোগের প্রশমন বা যন্ত্রণার ক্ষণিক বিরতি বলে মনে করেছেন, ছুটে পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে সোহন সিংয়ের দোরে ঘা দিয়েছেন।

স্বভাবতই তাদের উঠতে দেরি হয়েছে একটু।

ঘুম ভেঙে যখন সোহন সিং, তার মা স্ত্রী সবাই এসেছে তখন বৌদি স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে যন্ত্রণার লক্ষণ আবার দেখা দেবে কিনা লক্ষ্য করছেন।

সোহনের মা প্রথম বুঝেছেন—ললাটে করাঘাত ক'রে জড়িয়ে ধরেছেন ওঁকে। সোহনের স্ত্রীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে, সোহন সিং বলে উঠেছে, 'হে ভগবান।'

তবু বুঝতে পারেন নি হীরা বৌদি, তবু বিশ্বাস হয় নি।

বিহ্বল হয়ে চেয়ে থেকেছেন ওদের মুখের দিকে।

কাঁদছে কেন এরা, হাহাকার করছে কেন—ভেবে পান নি।

দেরিই বা করছে কেন?

শেষ অবধি, মুহূর্ত কয়েক দেখে অসহিষ্ণু হয়ে উঠে অনুরোধ করেছেন শীগ্‌গির কোন ডাক্তার ডাকতে।

এবার সোহনের মা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছেন, সোহনের স্ত্রীও।

সোহন বলেছে ধীরে ধীরে, ভাবীজী, ডাগ্‌দার ডাকলে যদি কোন কাজ হ'ত আর ভাইসাহেবের জান ফিরে আসত—আগেই ছুটে যেতুম। ভগবানজী যে আর কোন কিছু বাকী রাখেন নি, তাঁর খাদেমকে কাছে টেনে নিয়েছেন!'

তবুও বুঝতে সময় লেগেছে।

আরও কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছেন।

তারপর একটু একটু ক'রে বুঝেছেন, ক্রমে ক্রমে বিশ্বাসও করতে হয়েছে।

অবিশ্বাস করার বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে ওদের প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়েছেন, কিন্তু কোথাও সে আশা পূরণের কোন সম্ভাবনা দেখেন নি।

সর্বনাশের পরিমাণ সবটা হয়ত উপলব্ধি করতে পারেন নি, তখনও, তবু যে তাঁর ভবিষ্যৎ আর বর্তমান একটা ভয়াবহ চেহারা নিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সেটার আবছা আদল একটা অনুভব করেছেন।

আর তাতেই, যখন বিশ্বাস হয়েছে এই রকম সর্বনাশের ঘটনাটা, করতে বাধ্য হয়েছেন—তখন কাউকে কিছু না বলে ছুটে চলে এসেছেন আমাদের কাছে।

ঐভাবে ছুটে আসতে দেখে সোহন সিং খানিকটা সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। শেষ-রাত্রে এভাবে একা মেয়েছেলে যাওয়া ঠিক হবে না বুঝেই এসেছে সে, প্রয়োজন হয় তো শেষ পর্যন্ত আসবে বলেই।

কিন্তু খানিকটা এসেই বাস দেখতে পেয়েছে একটা—প্রথম বাস এই রুটের।

তাতেই উঠিয়ে দিয়েছে সোহন সিং, বৌদি উঠে গেলে সম্ভবত তার খেয়াল হয়েছে, বৌদি এক কাপড়ে ব্যাগ না নিয়েই বেরিয়ে এসেছেন—তাড়াতাড়ি পকেট থেকে কটা পয়সা বার করে চলন্ত অবস্থাতেই কণ্ডাক্টরের হাতে গুঁজে দিয়েছে।

অর্থাৎ এখনই রওনা হওয়া দরকার।

এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে।

এতগুলো সংবাদ হীরা বৌদির বুকফাটা কান্নার মধ্য থেকে কিছু কিছু ক'রে উদ্ধার করতে অনেকখানি সময় কেটেছে।

সেখানে সেই বাচ্চাগুলো আর সেই শবদেহটা পড়ে আছে—সম্ভবতঃ পরের ভরসায়।

'সম্ভবতঃ' এইজন্যে যে, তারাও কেউ দেখছে কিনা কে জানে!

না জানি কি করছে ওরা—এই ভয়াবহ রকমের অসহায় অবস্থায়।

আমরাও পর, তবু এই দীর্ঘকালে একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে—নইলে হীরা বৌদি আগেই আমাদের কাছে ছুটে আসতেন না।

মুখে-চোখে একটু জল দিয়েই বেরিয়ে পড়লুম।

আমাদের চা খাওয়ার চেষ্টা করাও সম্ভব নয়।

খাওয়ানোও যাবে না।

প্রথমতঃ বৌদি খেতে চাইবেন না, দ্বিতীয়তঃ অনেকখানি সময় নষ্ট হবে।

তবে ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন আছে, সে ভারটা পাশের ফ্ল্যাটের মুলচান্দানীদের ডেকে অবস্থাটা বুঝিয়ে দিয়ে, তাদের ওপরে ছেড়ে দিলুম।

তখন মনে হচ্ছে একটা মুহূর্তও নষ্ট করা অন্যায় হবে। বাস্‌এ যাওয়ার আর অবসর নেই। মুলচান্দানীরাই ফোন ক'রে ট্যাক্সি আনিয়ে আমাদের তুলে দিল।

দেবুদাদের বাড়িতে পেঁছে যে দৃশ্য চোখে পড়ল তার দুঃস্মৃতি বোধ হয় বাকী জীবনই বহন করতে হবে।

শুধু সেই করুণ ও অবর্ণনীয় অবস্থাটা দেখেই যেন কেমন মাথা ঝিমঝিম ক'রে উঠল।

কল্পনায় দেখা একরকম, বাস্তব আরও ঢের বেশী মর্মন্তুদ।

কোন কল্পনাই এই বাস্তবের কাছাকাছি পেঁছতে পারে না।

ভার নেওয়ার জন্যেই ছুটে এসেছি—কিন্তু এ ভার কি বইতে পারব? এতখানি?

দেবুদার শব ঠিক সেইভাবেই পড়ে আছে, তেমনি বেঁকেচুরে।

চোখের পাতা বুজিয়ে দেওয়ার কথা কারও মনে পড়ে নি, একটা চাদরও ঢাকা দেয় নি কেউ।

ছেলেমেয়ে তিনটে উঠেছে, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পারলেও তাদের বোধ হয় আপনা থেকেই একটা ভয় হয়েছে—তারা ঘরের একটা কোণে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে—শুষ্ক বিবর্ণ মুখে এদিকে চেয়ে।

ঘরে আর কেউ নেই। সোহন সিংরা খেটে-খাওয়া লোক, তারা আসা-যাওয়া করছে নিশ্চয়ই—কিন্তু অনির্দিষ্টকাল মড়া আগলে বসে থাকলে তাদের চলবে কেন?

শুধু এই মর্মান্তিক দৃশ্যই নয়—সম্পূর্ণ অবস্থাটা বুঝে মাথা আরও ঘুরে উঠল।

যে দায়িত্ব ঘাড় পেতে নিতে এসেছি, তার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে।

বাড়িতে গোটা একটা টাকাও আছে কিনা সন্দেহ। কোথাও কিছু জমা আছে, চেষ্টা করলেও পাওয়া যাবে—এমন কল্পনা করারও কোন কারণ নেই।

ডাক্তার একজনকে ডাকতেই হবে, 'ডেথ সার্টিফিকেট' চাই কিন্তু তাঁর ফী দেবে কে— সম্ভবতঃ এই চিন্তাতেই সোহনরা সে-চেষ্টা করে নি।

কারণ সোহন সিংয়ের কাছে ডাক্তার শব্দটা উচ্চারণ করতেই সে চটে উঠল।

'ডাগ্‌দার ? ডাগ্‌দার কেয়া হোগা ? হামলোক বুদ্ধু হ্যায় কেয়া ? হাম ক্যা নেহি সমঝতে হ্যায়—দাদা জিন্দা হ্যায় ক্যা নেহি ? ডাগ্‌দার ক্যা উসকো জিন্দা কর দেগা আ-কে ?'

তাকে আইনটা বোঝাতেই আমার বিস্তর সময় লাগল যে, ডাক্তারের সার্টি-ফিকেট ছাড়া মড়া পোড়াতে দেবে না।

কিন্তু তবু এসব তো তুচ্ছ !

সমস্যা একটা নয়। এক রকমও নয়।

মড়া নিয়ে যাওয়ার সমস্যা আছে। যদি লরী ক'রে নিয়ে যেতে হয়—সেও অনেক খরচা। দাহ করার কত খরচ লাগে এখানে তাও জানি না। যদি কাঁধেই নিয়ে যেতে হয়—অনেকগুলো লোক চাই। খরচ সেদিকেও বড় কম হবে না।

তাছাড়া বাড়ির খরচা আছে।

কিছুই তো নেই। ছেলেমেয়েগুলোকে কি খেতে দেব ! সে তো এখনই কিছু করা দরকার।

তবু, আমরা গিয়ে দাঁড়াতেই সোহন সিং চা ক'রে নিয়ে এল। চা আর কেক, কলা, ডালমুট।

ওদের যা প্রচলিত আতিথেয়তা।

সোহনের মা বললেন, ছেলেমেয়েদেরও ওঁরা কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ওরা কোন কথাও বলছে না, খাচ্ছেও না। যেন পাথর হয়ে গেছে।

চা-টার তখন খুব প্রয়োজন ছিল।

মাথা ঘুরছে, গলা শুকিয়ে গেছে। বুকের মধ্যে একটা হিম-হিম ভাব বোধ করছি, পায়েও যেন কোন জোর নেই।

সুতরাং আর কে খেল না খেল—অত বিবেচনার সময় ছিল না।

চা খেয়ে এখানের ভার রমার উপর ছেড়ে দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লুম—টাকা ও লোকের চেষ্টায়।

নিজের পকেটে বেশী টাকা ছিল না।

এখানে আসতেই দশ টাকার মতো ট্যাক্সি ভাড়া গেছে, এখন ঘুরতেও হবে ট্যাক্সি বা স্কুটারে—বাস্-এর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই। সুতরাং সে খরচাটা রাখা দরকার অন্ততঃ।

যা ছিল কাছে তাই থেকেই গোটা কুড়ি টাকা সোহন সিংয়ের হাতে দিয়ে বলে এলুম, এদের খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করতে এবং যে কোন একজন ডাক্তারকে ডেকে ডেথ সার্টিফিকেটখানা লিখিয়ে রাখতে।

ঘুরতে হ'ল বিস্তর।

যে সহানুভূতি ও আনুকূল্য খুব সহজেই পাব ভেবেছিলুম—কার্যক্ষেত্রে নেমে সেটার অন্য চেহারা দেখলুম। আগেকার দিনে দিল্লীতে এরকম ঘটনা ঘটলে অযাচিত যে সাহায্য পাওয়া যেত বলে শুনেছি—তার কিছুই দেখতে পেলুম না।

অনেকেই দেবুদাকে চেনে দেখলুম। আর তারা কেউই ওর ওপর প্রসন্ন নয়।

কেউ কেউ বললে, লোফার একটা, জোচ্চোর—ব্যবসার নাম ক'রে অনেকের পয়সা মেরেছে।

কেউ বা জানালে তাদের কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে ফেরত দেয় নি, সেই টাকা-টাই আমি যেন দান বলে ধরে নিই।

কেউ বললে, শেডী ক্যারেক্টার। ওর জীবনে অনেক বিশ্রী ইতিহাস আছে। তোমরা জানো না।

একজন আবার নতুন একটা কথা বললেন। সেণ্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটের পদস্থ কর্মচারী বঙ্কিম জানা বললেন, 'স্কাউণ্ড্রেল একটা। ওর ফ্যামিলির জন্যে সাহায্য করব ? অ্যাম দ্য লাস্ট্ পার্সন টু ডু ইট ! জানো কি করেছে ? একটা ভদ্রলোকের মেয়েকে বিয়ে করে গর্ভবতী অবস্থায় তাকে ফেলে সরে পড়েছিল। শিক্ষিতা, সুন্দরী, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। তার জায়গায় ঐ একটা ইতর শ্রেণীর মেয়ে—একটা ফিল্ম অ্যাকট্রেসকে স্ত্রী বানিয়ে ঘর করছে, তাও সে যদি সত্যিকারের আর্টিস্ট হ'ত তো কথা ছিল। সম্পূর্ণ ফেলিওর একটা। ছোঃ !...তোমার লজ্জাও করে না—ঐ মাগীটার ছেলে-মেয়েদের জন্যে চাঁদা তুলছ !'

আসলে যা দেখলুম সকলেরই একটা বিদ্বেষ বা প্রতিকূল মনোভাব দেবুদা সম্বন্ধে।

দেবুদা একমাত্র আমারই পরিচিত ঠিক এ মনোভাব না থাকলেও—তাকে এত লোক জানে, তার ইতিহাস এত লোকের কণ্ঠস্থ—একথা তো ভাবি নি কখনও !

কই এতকাল তো ওর নামও কখনও শুনি নি কারও মুখে !

এ কঠিন মনোভাবের কারণ ঐ হীরা বৌদিই।

অবাঙালী মেয়ের সঙ্গে বসবাস করছে বাঙালী ব্রাহ্মণের ছেলে—সে মেয়েরও পূর্ব ইতিহাস নাকি তত ভাল নয়, হয়ত বা রীতিমাফিক কোন বিয়েই হয় নি—এইটেই তাদের বিরাগের প্রধান কারণ।

ফলে, তিন-চারশ টাকা চাঁদা তুলতে বেলা চারটে বেজে গেল।

লোক কিছু যোগাড় হয়েছিল, তরুণ কলেজের ছেলেদের অত বাছবিচার নেই, কিন্তু টাকা নিয়েই হ'ল মুশকিল।

অথচ ওর কমেও হয় না।

এতগুলি ছেলেকে ট্যাক্সি-ভাড়া দিয়ে পাঠানো—কষ্ট ক'রে বাস্-এর জন্যে দেড় ঘণ্টা কিউ দেবে, তাদের কী এত গরজ?—আবার তাদের ফেরত আসার ব্যবস্থা, লরী ভাড়া, দাহর খরচা, জলখাবার খাওয়ানো, নতুন কাপড়জামার ব্যবস্থা—হাজারো খরচা।

টাকার যোগাড় ক'রে ফিরতে চারটে বেজে গেল।

ততক্ষণে কিছু ছেলে অপেক্ষা ক'রে থেকে থেকে চলে গেছে।

বাকী যারা আছে, তারাও এই অকারণ (তাদের কাছে) বিলম্বে বিরক্ত। তাড়াতাড়ি তাদের একটা চা-জলখাবারের ব্যবস্থা ক'রে মৃতদেহ লরীতে তুলে রওনা দিলুম।

রমার আর থাকা সম্ভব নয়, ছেলেমেয়ে সম্পূর্ণ পরের ভরসায় রেখে এসেছে। তারা কতটা নজর রেখেছে কে জানে!

সে এবার অশ্রুসজল চোখে বিদায় নিল।

হীরা বৌদি আর ছোট দুটো বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল—বড় ছেলেকে আমাদের সঙ্গে নিতে হবে, শেষকৃত্যের জন্যে—সে বেচারাদের তখনও সেই স্তম্ভিত অবস্থা, কী ঘটল কী হ'ল কিছুই বুঝছে না, কেমন একটা অজানা আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে গেছে—কিন্তু বৌদি যেতে রাজী হলেন না, সেক্ষেত্রে ওদেরও নিয়ে যাওয়া যায় না।

বৌদি ততক্ষণে অনেক শান্ত হয়ে গেছেন।

চিরদিন এমনি শান্তভাবে অদৃষ্টকে মেনে নিয়ে এসেছেন, সেই অভ্যাসটাই মজ্জাগত হয়ে গেছে।

সেটাই কাজে লাগল এখন।

রমার প্রস্তাবে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'ওঁরা ফিরে এলে কী সব কৃত্য আছে—সেগুলো না সেরে যাওয়া তো উচিত হবে না···আমি সব জানিও না। সেই সময় বরং যদি কেউ আসতেন—।'

রমা প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে বললে, 'সে আমি পারব না ভাই। কিছুতেই পারব না।···শুনছি এই পাড়াতেই ঐ সিনেমার কাছে এক ঘর বাঙালী থাকেন, তাদের গিন্নীও বিধবা, অনেক বয়সও—সোহন সিংরাও চেনে—তাঁকেই ডেকে আনতে বলি না হয়।'

সেই ব্যবস্থাই হ'ল।

মড়া পুড়িয়ে আমরা ফিরলুম রাত দুটোয়।

তখন আর কিছু করা সম্ভব নয়।

তবে দেখলুম সেই রাধু দিদিমা এসেছেন এবং মোটামুটি এখনকার মতো ভার নিয়েছেন।

সোহন সিং আর তাঁর হাতেই কিছু টাকা দিয়ে তখনকার মতো চলে এলুম।

আমি তখন আর দাঁড়াতে পারছি না।

আমার ওপর দিয়েও তো কম ধকল যাচ্ছে না সারাদিন।

ঘোরাঘুরি বা অনাহার বলে শুধু নয়, দুশ্চিন্তার জন্যেই আরও—শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে। অন্তত একটুখানি বিশ্রাম না নিলে আর চলছে না।

॥ ছয় ॥

সেদিন তখনকার বিপদ ও সমস্যাটাই সব চেয়ে বড় মনে হয়েছিল, কিন্তু দুদিন যেতে দেখা গেল প্রবলতর ও বৃহত্তর সমস্যা—সমস্যা না বলে প্রশ্ন বলাই উচিত—আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

এখন এদের কি হবে ?

যা করতে হয়েছে তাতেই যথেষ্ট বিব্রত।

দাহর ব্যাপারটা শেষ ক'রে যা টাকা বেঁচেছিল, তাই দিয়ে কোন রকমে নিয়মরক্ষামতো শ্রাদ্ধটা সারা হয়েছে।

কালীবাড়ির ভটচায্যি মশাইকে ধরেছিলুম, অবস্থা শুনে তিনিই নামমাত্র মূল্যে নিয়ে কাপড় গামছা দানের বাসন শয্যা ইত্যাদি ঘর থেকে দিয়ে শ্রাদ্ধ করিয়েছেন।

অবশ্য সেদিনের উদ্বৃত্ত টাকায় সব কুলোয় নি—নতুন কাপড়-জামা বাবদ আমাদের কাছ থেকেও মোটা একটা টাকা বার করতে হয়েছে।

তবু তো ব্রাহ্মণ খাওয়ানোর হাঙ্গামা করা হয় নি, ঠাকুর মশাইকেই কটা টাকা ধরে দিয়ে সে-পাট চুকনো হয়েছে।

তিনিই রান্না করিয়ে ঐখানে 'ভোজন' করবেন।

যদি কখনও ওদের সুদিন আসে, ছেলেরা মানুষ হয়—তখন পিতৃকৃত্য করবে ভাল ক'রে। এখন শুধু শুদ্ধ হওয়া দরকার, সেজন্যে যেটুকু করতে হয় করিয়ে দিলুম।

কিন্তু তার পর ?

সেই অনিবার্য প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে যে।

বিপদ হয়েছে আরও, হীরা বৌদি পুরোপুরি আমাদের ওপরই নির্ভর ক'রে বসে আছেন।

যেন আঁকড়ে ধরেছেন আমাদের।

অথচ আমাদের কতটুকু ক্ষমতা! কী-ই বা করতে পারি? চারটে প্রাণীর খরচ টানার মতো কেন—তার সিকি সামর্থ্যও নেই।

যে দিনকাল, নিজেদেরই ভদ্রভাবে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

আমাদের এত করারও কথা কি ?

দেবুদার সঙ্গে পরিচয় কতটুকু!

তাঁর তো কিছুই জানি না বলতে গেলে।

তাঁর কি ছিল, কি আছে—কোন খবরই তো জানা নেই।

কে আছে—তা তো নয়ই।

কি করতেন দেবুদা—এই সহজ ও স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠেছে বৈকি।

আমিই করেছি বৌদিকে।

কিন্তু কোন সদুত্তরই পাই নি।

পাই নি তার কারণ উত্তরটা হীরা বৌদির জানা নেই।

দেবুদার সঙ্গে যখন পরিচয় হয়েছে ওঁর, দেবুদা তখন রীতিমতো সম্পন্ন ব্যক্তি।

অন্তত তাঁর চালচলনে ব্যবহারে তাই মনে হয়েছিল বৌদির।

অনেক টাকা না থাকলে—বাজ-খরচের মতো অনেক টাকা—মানুষ ওরকম চালে চলতে পারে না।

পরে শুনেছিলেন—ঠিক সেই সময়টাতেই পৈতৃক সম্পত্তির অংশ যা-কিছু প্রাপ্য, সব বিক্রী ক'রে দিয়ে লাখখানেক টাকা নিয়ে বোম্বেতে এসেছিলেন।

ইচ্ছা—ফিল্ম তুলবেন, ফিল্ম-এর ব্যবসা করবেন।

বহু নির্বোধেরই এ বাসনা থাকে।

দু-একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ ব্যবসায়ে লাভ করেছে, লোকসান দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে অনেক বেশী।

কিন্তু সেই সার্থকদের দৃষ্টান্তটাই চোখের সামনে ধাঁধার সৃষ্টি করে—পতঙ্গের মতো বহু লোক ছুটে যায় সর্বনাশা দীপ্তির দিকে, মরীচিকা দেখে স্নিগ্ধ সরোবর ভাবে।

এদেশে অন্তত, ফিল্ম-এর ব্যবসা আলেয়ার আলো—পথ ভুলিয়ে মৃত্যুর দিকে টানে।

সেই টানেই—উদার এবং অনভিজ্ঞ (নির্বোধ বলছি না স্নেহবশতঃই) দেবুদাও সেই মিথ্যে আলোর দিকে দৌড়েছিলেন।

আর, নির্বোধ লোকের হাতে অনেক টাকা—এ গন্ধ পেতে ওখানকার মানুষ-হাঙরদের দেরি হয় নি।

দেবুদা ছিলেন—বৌদির যা ধারণা—সরল এবং উদারচরিত্রের স্নেহময় মানুষ, টাকার ওপর কোন মায়াও ছিল না, ও বস্তুটার মূল্যও বুঝতেন না তত।

সকলকেই বিশ্বাস করতেন, বিশেষ যারা নিজেদের 'বিজনেসম্যান' বলে পরিচয় দিত—তাদের দেবতা-জ্ঞান করতেন।

তাঁর ধারণা ছিল এরা কেউ ঠকাতে পারে না। ব্যবসা করতে বসেছে—ঠগ্-জোচ্চোর তো নয়।

জুচ্চুরিতে কখনও ব্যবসা চলে?

ফলে এক লাখ টাকা উড়ে যেতে দেরি হয় নি।

শেষ পর্যন্ত যখন কপর্দকশূন্য হয়েছেন তখন ওঁর ছবি দু'হাজার ফুটও ওঠে নি।

টাকা যেতে ছবির ব্যবসাটাকে তার স্ব-রূপে চিনতে শিখেছেন দেবুদা। বোম্বের ছবির বাজার সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা হয়েছে কিছু।

অনেক কষ্ট করে অনেককে ধরে-পাকড়ে শেষ পর্যন্ত একটা ছবি তুলে ছিলেন —একেবারে যে সে ছবি অচল হয়েছিল তাও না, কিন্তু নাতোয়ানের শর্ত বলেই

—উনি এক পয়সাও পান নি। মহাজন, ডিস্ট্রিবিউটার আর 'হাউস'-এই সব খেয়ে নিয়েছে।

ও রাজ্যের নাকি এই আইন!

ওখান থেকে অর্থলাভ করতে পারেন নি, অন্য লাভ হয়েছে।

এতকাল কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না, সেইটেই ঘাড়ে চেপেছে। পায়ে বেড়ি পরিয়ে বোম্বের ফিল্ম জগৎ বিদায় দিয়েছে তাঁকে।

সংসার-রূপ সুকঠিন শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছে তাঁর গলায়।

হীরা বৌদির সঙ্গে আলাপ এই ফিল্ম জগতেই।

হীরা বৌদিও অভিনেত্রী হ'তে এসেছিলেন।

মা বাবা ছিল না, মামা অভিভাবক। তাঁর চাপ ছিল—যেটুকু লেখাপড়া শিখেছে তাইতেই যা হয় একটা চাকরি যোগাড় ক'রে নিক।

নিজের খরচ নিজে চালাক। সম্ভব হ'লে তাঁদেরও।

হীরার এই স্কুল-ফাইন্যাল-পাসের স্বল্প পুঁজিতে সামান্য কোন চাকরির কথা ভাল লাগে নি। অন্য কথা ভেবেছিল সে।

আলেয়ার সর্বনাশা ফাঁদ পাতা সর্বত্রই।

হীরাও মরীচিকা দেখে ছুটবে এ এমন কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয়।

তার এক সহপাঠিনী ইতিমধ্যে ফিল্ম্ জগতে এসে গিয়েছিল, একটু নামও হয়েছিল তার।

হীরা তাকেই এসে ধরলে—ওর একটা গতি ক'রে দেওয়ার জন্যে।

নামকরা নায়িকা হবার মতো রূপ তার নেই তা সে জানত। তবু অন্য রকম ভূমিকাও তো আছে!

সে মেয়েটি, মৌসুম তার নাম—সে হীরাকে ভালবাসত। চেষ্টাও করেছে প্রাণপণে।

হীরাকে নিলে তবে সে নায়িকার 'পার্ট' করবে এই শর্তে দেবুদার প্রথম ছবির চুক্তিতেই সই করেছে।

সে ছবি তখন ওঠে নি, তবে অন্য লোকের মালিকানায় এক সময় শেষ হয়েছে, দেখানোও হয়েছে। ছবি বিশেষ চলে নি—তবু তাতেই মৌসুমের খ্যাতি হয়েছে খুব—কিন্তু হীরা কোন সুবিধা করতে পারে নি।

তৎসত্ত্বেও, মৌসুমের অনুরোধেই আরও একটা ছবিতে নামানো হয়েছে। এবারেও সেই একই ফল।

পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে গেছে যে ঝি, কি বাসনওয়ালী, কিম্বা পথের ধারের ফেরিওয়ালী—এমনি সামান্য ভূমিকা, যাতে অভিনয়ের কিছু নেই—এই ধরনের পার্ট ছাড়া আর কিছু পারবে না হীরা। অর্থাৎ যাতে না প্রয়োজন হবে চেহারার, না প্রয়োজন হবে অভিনয়-দক্ষতার।

কিন্তু এসব পার্ট একটা ছবিতে দুটো-একটার বেশি থাকে না।

একদিনের কাজ, বড় জোর বিশ-পঁচিশ টাকা পাওনা হবে সে দিনের শেষে।

তামাক খেতে দেওয়াও তাই। আমি নিজেও রান্নার ব্যাপারটা তেমন বুঝি না, তাই এক-আধদিন যদি বা মাছ কাটিয়ে বাছিয়ে নিয়ে যাই—সেটা ওর হাতে পড়ে কিম্ভুতকিমাকার একটা বস্তু দাঁড়ায়। মাছের ঝাল খাচ্ছি না মুলোর আচার খাচ্ছি বোঝা যায় না।'

হীরা এ অভিযোগে রাগ করল না, বরং হেসেই বলল, 'তা ভাই সত্যি, আমাদের কোন পুরুষে কেউ কখনও মাছ খায় নি, রাঁধতে শিখব কি ক'রে? প্রথম দিন তো গন্ধেই বমি এসে গিয়েছিল! অথচ ওঁর এতদিনের অভ্যাস—আজন্ম, বেশীদিন মাছ খেতে না পেলে ওঁর খুব কষ্ট হয় তা বুঝতে পারি।'

রমা একটু নরম হয়ে এলেও—বলে, 'তা বেশ তো, সেটা বললে, আর বলতেই বা হবে কেন—বাঙালীর ঘরে বাঙালীকে খেতে বলেছি—মাছ তো আনানো হ'তই। তোমাদের হাতে ক'রে আনবার কি ছিল? এ গরিব বোন কি দাদাকে দুটুকরো মাছ খাওয়াতে পারত না একদিন?'

দেবুদাও সদাপে উত্তর দেয়, 'বোন যদি গরিবই হয় তো অত চ্যাটাং চ্যাটাং কথা কিসের? গরিব গরিবের মতো থাকলেই হয়, ঘাড় হেঁট ক'রে।' তারপর চোখ মটকে বলে, 'ওরে বোকা মেয়ে, এটা বেনোজল ঢোকানো—বুঝলি না? বেনোজল ঢুকিয়েই ঘরো জল বার করতে হয়। এই এক দিনই আনলুম, তাই বলে কি রোজ আনব? এরপর আসব আর গাদা গাদা খেয়ে যাবো। এটা হল' তার জমি করা।'

'আর তাছাড়া,' একটু থেমে আবার বলে, 'মাছ বেশী করে আনা মানে তোদের বেশী তেল খরচ হওয়া—খরচাটা তো তার কম হচ্ছে না। বরং বেশীই—রাগ করছিস কেন?'

এরপর থেকে যেদিনই আসত, বেশির ভাগই ঐ সকাল বেলায়।

কোনদিন এমনিই আসত শুধু হাতে, কোনদিন আবার গুচ্ছের মাছ কিনে এনে হাজির করত।

এ নিয়ে আগে আগে রমা বকাবকি করত, কিন্তু ইদানীং মানুষটাকে চিনে নিয়েছিল—এসব বকুনি তার ঔদাসীন্যের বর্মে লাগে শুধু—তা ভেদ ক'রে মনের চর্মে পেঁছিয় না।

ওকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে ফেললে নিজেদেরই ঠকতে হবে।

কোন কিছুতেই ওর কিছু আসে-যায় না, কোন কিছুই ওকে বিচলিত করতে পারে না—এমন মানুষের সঙ্গে বকাবকি করতে যাওয়াই তো মূর্খতা।

এর মধ্যে আমাদের কিন্তু একদিনও দেবুরা ওদের বাড়ি যেতে, কি ওখানে খেতে বলে নি।

এমন কি, তথাকথিত চায়ের নেমন্তন্নও করে নি।

আমরা অবশ্য তা নিয়ে মাথাও ঘামাই নি।

বৌটি যে ভাল রাঁধতে জানে না—তা সে নিজেই স্বীকার করে বার বার, এমন কি ওদের নিজস্ব রান্নাও তেমন কিছু শেখে নি।

কোনমতে জীবনধারণ করে মাত্র, ওর ছেলেমেয়েরা—এই কথাই বলে আক্ষেপ করে।

তাছাড়া, ওদের অবস্থাও যে তত সুবিধের নয়—সেটা ওরা মুখে কিছু না বললেও ওদের কথাবার্তা থেকেই বুঝে নিয়েছি—পোশাক-আশাকে তো বটেই।

তবে চিরদিনই, নিরবচ্ছিন্ন অভাব-অনটনে যায় না—সেটুকুও বুঝতে পারি দেবুর ধরনধারণে।

কখনও বেশ হাসিখুশী, ঠাট্টা-তামাশায়-উৎসাহে ঝলমল করে, সে সব দিনে মাছ কি মিষ্টি নিয়ে আসে রাশি রাশি—আবার অন্য দিন কেমন যেন মিইয়ে থাকে, মুখ খোদা ক'রে।

কোথাও থেকে, হয়ত কোন উপার্জনের পথেই, হঠাৎ কিছু টাকা এসে পড়ে মধ্যে মধ্যে।

তবে, মধ্যে মধ্যে প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেও মোট অবস্থা খারাপের দিকে—সেটা সুপ্রত্যক্ষ। কী যে করে—কিছু করে কিনা, মানে রুজি-রোজগারের চেষ্টা—কিসে চলে, এটা এক ধরনের চক্ষুলজ্জাতেই জিজ্ঞাসা করতে পারি না, দেবুদাও কোনদিন সে প্রসঙ্গ তোলে না।

রকম-সকম দেখে তো মনে হয় কিছুই করে না, অন্ততঃ নিয়মিত কোন কাজ—নইলে এত অফুরন্ত অবসর পায় কোথা থেকে।

আয় থাকলে সর্বাগ্রে যেটা করা উচিত—যেটা ভদ্রলোক মাত্রেই করে—ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা, সেটাও যে ওরা এখনও ক'রে উঠতে পারে নি ভাল-রকম কিছু—তা হীরা বলে ফেলেছে কয়েকবারই।

স্বামীর সম্বন্ধে অনুযোগ হিসেবে নয়, স্বামীর দোষ ও কোন কালেই দেখে না—ভাগ্যের বঞ্চনা হিসেবেই কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

সেইটেই সব চেয়ে দুঃখের কথা।

তবে আমরা—বাংলায় যাকে 'মাইণ্ড' করা বলে—তা না করলেও জিনিসটা যে খারাপ দেখাচ্ছে তা ওরা অনুভব করছিল নিশ্চয়ই।

সেটুকু শিক্ষা-দীক্ষা ওদের আছে।

একতরফা আতিথেয়তায় আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা যতই থাক্—যারা সেটা গ্রহণ করে, তাদের ভদ্রতা বজায় থাকে না।

অন্তত আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারের।

এ ধরনের ঔদাসীন্য নির্বিকারভাবে প্রকাশ করতে পারে প্রচণ্ড ধনী অথবা ভিক্ষুকেই।

ইদানীং দেখতুম বাড়ি রওনা দেবার আগে—কী যেন বলি-বলি ক'রেও বলতে পারছে না, স্ত্রী স্বামীর মুখের দিকে আর স্বামী স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাচ্ছে—অকারণেই মাথা চুলকোচ্ছে দেবু।

শেষ পর্যন্ত বোধহয় আর থাকতে পারল না। একটা কী ছুটির বারে বেড়াতে এসে—দিন দশেক পরের এক ছুটির দিনে ওদের বাড়ি দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানাল।

'আমাদের বাসায় যেয়ো একদিন' কি 'কবে আমাদের ওখানে যাচ্ছ তাহলে' —এসব লৌকিকতার ধার দিয়েও গেল না, সোজাই বলল, 'সামনের বুধবারের পরের বুধবার তো ছুটি—ঐদিন আমাদের ওখানে যেতে হবে তোমাদের। যেতে হবে মানে—সকালে যাবে, দুপুরে খাবে—বিকেলে চা খেয়ে ফিরবে একেবারে।'

হীরার যেন আনন্দ চোখেমুখে উপ্‌চে পড়ছে—এই নিমন্ত্রণ জানাতে পেরে, বোধহয় না বলতে পারলে লজ্জাটা খুবই পীড়া দিচ্ছিল এতদিন—সে খুশিতে ঝলমল করতে করতে বলল, 'তোমাদের কিন্তু খুব কষ্ট হবে রমাদি, তা আগে-ভাগেই বলে দিচ্ছি। আমাদের ছোট্ট জায়গা, বলতে গেলে একখানাই ঘর—তার মধ্যে সারাদিন কাটানো— ।···তাছাড়া, আমার যা রান্না, হয়ত কিছু মুখেও তুলতে পারবে না। তবু একদিন না হয় কষ্ট করলেই!'

রমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'মুখে তুলতে তো যাচ্ছি না, রীতিমতো খেতেই যাচ্ছি। সেই বুঝে ভাল ক'রে রাঁধবে—মন দিয়ে। তোমাদের দিশী রান্না দু-একটা খাবো কিন্তু। শ্রীখণ্ড না কি বলে—ঐ যে দইয়ের জল ঝরিয়ে তৈরী করো—ওটা চাই।'

এমনি ক'রেই দুই বান্ধবীর হাসি-ঠাট্টা কপট অনুযোগে দিনটা শেষ হ'ল।

এই প্রথম দেখলুম—হীরা বৌদি যাওয়ার সময় কোন দ্বিধা কি কুণ্ঠার ভাব নিয়ে গেল না—সহজভাবে মাথা উঁচু করেই বিদায় নিল।

রমা বলেই দিয়েছিল, 'খুব সকালে যেতে পারব না ভাই হীরে বৌদি, ছেলে-মেয়েদের ঝামেলা, তার ওপর ছুটির দিনে অনেক বাড়তি কাজ থাকে তো—তোমার ঠাকুরপোর একরাশ সাবান কাচা আছে—সাড়ে দশটার আগে বেরোতে পারব না। তোমার ওখানে পৌঁছতে যার নাম ধরো সাড়ে এগারোটার কম নয়।'

তাতে ওদেরও আপত্তির কারণ ছিল না।

দেরি তো হবেই। ওদেরও সময় কম লাগবে না আয়োজনে। বিশেষ হীরা বৌদির তো আরও বেশী।

সেই মতোই তৈরী হচ্ছিলুম আমরা।

সময়ের ঐ হিসেব ধরেই।

আসলে রমার মতলব ছিল—কিছু রসগোল্লা আর খানকতক মালপো তৈরী ক'রে নিয়ে যাবে দেবুদার ছেলেমেয়েদের জন্যে।

সেই জন্যই আরও—হাতে সময় রেখেছিল।

খাবার হয়ে গেছে, সাবান কাচা প্রভৃতিও; রাত থাকতে উঠে সে সব কাজ শুরু ক'রে দিয়েছে রমা; এমন কি বাচ্চাদের স্নান-টানও হয়ে গেছে, এখন শুধু আমরা দু'জন তৈরী হয়ে নিলেই হয়—হঠাৎ দেবুদা এসে হাজির।

কিন্তু এ কী অবস্থা!

এ কে এসে দাঁড়াল!

এতদিনেও দেবুদার এ চেহারা আমরা দেখি নি কখনও। চক্ষু রক্তবর্ণ, উদ্‌-ভ্রান্তের মতো দৃষ্টি, চুল উশকোখুশকো—জামা-কাপড়গুলো যেন কোনমতে

আলনায় রাখার মতো ক'রে গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে—সমস্ত ভঙ্গীটা দিশাহারার মতো ; এত ম্লান মুখ—মনে হচ্ছে এখনই চোখে জল এসে যাবে—আমরা কেউ একটা কথা কইলে।

আমরা দুজনেই একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠলুম প্রায়, 'এ কী! ব্যাপার কি দেবুদা ? কী হয়েছে ? এমনভাবে পাগলের মতো—? কোন বিপদ-আপদ—মানে—ছেলেমেয়েরা সব ভালো তো ?'

ঠিকমতো প্রশ্ন করতেও তখন যেন সাহস হচ্ছে না। কি শুনব তা কে জানে! কত কি সম্ভাব্য আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা মনে আসছে কেবল।

দেবুদা এসেই ধপ্ ক'রে একটা সেটিতে বসে পড়েছিল। মনে হচ্ছে, এই দীর্ঘ পথ বুঝি বা ছুটতে ছুটতেই এসেছে হেঁটে।

অন্ততঃ সেই রকমই পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল তাকে।...খানিকটা চুপ ক'রে ব'সে থেকে বললে, 'ছেলেমেয়েরা ভালই আছে—সে-সব কিছু না—ওরই—। কী যে হবে!'

এক রকমের হতাশ ভাবে খাপছাড়া খাপছাড়া কথাগুলো বলে আবার ও চুপ করল।

ফলে আরও ব্যস্ত হয়ে পড়লুম আমরা।

'হ্যাঁরে বৌদির ? কী হয়েছে কি ? ব্যাপারটা খুলে বলোই না ছাই!'

'খুব ভোরে উঠেছিলেন—মানে ভোরেই ওঠেন অন্য দিনও, আজ আর একটু আগে—রাত চারটে নাগাদ উঠে পড়েছিলেন—তোমরা যাবে বলেই আরও, খুব চটপটে তো নয়, সেই ডিফিসিয়েন্সীটা ঢাকতেই—অন্ধকার তো তখন—বাথরুমে যেতে কী একটা বেঁজি বা ইঁদুর কিছু ছিল বোধহয়—গায়ে পা লেগে চমকে ভয় পেয়ে যেমন ছুটে বেরোতে যাবেন—পড়ে গেছেন সামনেটায়। চৌকাঠে কোমরটা লেগে আর উঠতে পারছেন না। তাই আমি খবরটা দিতে এলুম। মানে—আরও আগে আসাই উচিত ছিল, তবে ওধারটা না দেখে তো—'

ব্যস্ত হয়ে বলতে যাচ্ছিলুম যে—'চলুন যাই, দেখি গে—' তার আগেই দেবুদা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'অথচ তোমাদেরও তো তাহলে কিছু যোগাড় চাই, অনর্থক দেরি হয়ে গেল। আমি যাই ভাই, আমার এক বন্ধু আছেন ডাক্তার—তাঁর একটা নার্সিং-হোম মতোও আছে—তিনি এসে পড়েছেন দেখে আমি বেরিয়েছি—তিনি বলছিলেন তো তাঁর ওখানে নিয়ে যাবেন। তা যদি নিয়ে গিয়ে থাকেন তো সেখানে আবার ছুটতে হবে—ছেলেমেয়েগুলোকে গুরবচনরা নিয়ে যাবে বোধ হয়, বলছিল তো—আচ্ছা, আসি ভাই—'

বলতে বলতেই শেষের কথাগুলো সিঁড়ির মুখ থেকে প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত নেমে গেল।

বাধা দেওয়া সম্ভব নয়—এসব কথা শোনার পর।

বসতে বলা কি কিছু খাওয়ানোর তো প্রশ্নই ওঠে না।

হয়ত সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে গেলে হ'ত—সেটাও তখন অত মনে পড়ল না।

মুশকিল এই—দেবুদা অনেক কথাই বলল, কিন্তু দরকারী তথ্য একটাও জানা গেল না।

নার্সিং হোমে গেলেন কিনা হীরা বৌদি, সে নার্সিং হোমই বা কোথায়, কে ডাক্তার—আর গুরুবচন কে, নিশ্চয়ই পরিচিত কোন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক, গুরুবচন লাল কি গুরুবচন সিং—কিছুই জানা গেল না।

তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেলেন কিনা—সে প্রশ্নও নিরুত্তরিত থেকে গেল।

ফলে উদ্বেগ দুশ্চিন্তা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও—কিছুই করা গেল না—এমন কি হীরা বৌদির একটা খবরও নেওয়া সম্ভব হ'ল না।

সারাদিন ছট্‌ফট ক'রে ক'রে শেষ পর্যন্ত বিকেলের দিকে বেরিয়েই পড়লুম।

ওর বাসাতেই যাওয়া যাক তো, সেখানে আর যারা আছে—সে বাড়ির অন্য লোক, তারা কি আর কোথায় আছে কেমন আছে একটু খবর দিতে পারবে না?

কোথায় যাচ্ছি সেটা আর রমাকে বললুম না।

বললেই সঙ্গে যেতে চাইবে. ছেলেমেয়েরা হয়ত সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ো ধরবে—'আন্টি'র কাছে যাবো। (হীরা বৌদিকে ওরা বলে আন্টি—এ দেশের পাঞ্জাবীদের পাশ্চাত্ত্য ফ্যাশন মতো ওরাও আন্টি বলতে শিখেছে।)

সে অনেক হাঙ্গামা ও অর্থব্যয়।

ফেরার পথে যদি বাসে উঠতে না পারি—না পারার সম্ভাবনাই বেশী, এতগুলো লোক নিয়ে—তাহ'লে ট্যাক্সি করতে হবে—বরফকল থেকে বিনয় নগর—যার নাম বারোটি টাকা খরচ।

তাছাড়া, দুর্ঘটনার বাড়ি, বাড়িতে আদৌ কেউ আছে কিনা তার ঠিক নেই—যদি এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে হয় খোঁজখবরের জন্যে—ওদের কোথায় বসাবো, কোথায় রেখে যাবো?

সবসুদ্ধ ঘোরা তো সম্ভব নয়।...একা পুরুষমানুষের কথা আলাদা।

বাস থেকে নেমে খোঁজ করতে করতে শেষ পর্যন্ত বাড়িটার হদিস মিলল।

অনেককে অনেক প্রশ্ন করার পর।

এ দেশের এই এক বৈশিষ্ট্য—পাশের বাড়ির লোকের খবরও এরা রাখে না, অথবা বলে না।

ব্যাঙ্কের দারোয়ান রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, তাকে সেই ব্যাঙ্কেরই ঠিকানা জিজ্ঞেস করেছি—প্রশ্ন শেষ হবার আগেই বলেছে, 'মালুম নেহি!'

অসংখ্য লরীর ভিড়ের মধ্য দিয়ে, কতকগুলো ছোটখাটো মোটর গাড়ি মেরামতের কারখানার পাশ দিয়ে একটা সঙ্কীর্ণ গলি—তার ভেতরে একটা ব্যারাক-মতো বাড়ির নিচের তলার একটা ফ্ল্যাটে থাকে দেবুদারা।

বলতে ভাল শোনায় বলেই ফ্ল্যাট বলা (এখন আবার অনেকে বলে অ্যাপার্টমেন্ট) —নইলে মোট একখানাই ঘর, ভেতরের বারান্দায় একখানা টিনের চালা, তার মাঝখানে কলতলা—তাতে দরজা নেই, ছেঁড়া পর্দা দিয়ে আবরু রক্ষা হয়েছে—সেই কলতলার একপাশে একটু রান্নার জায়গা আর একপাশে খাটা পায়খানা।

এদেশের পুরনো আমলের খাটা পায়খানা কী বস্তু তা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন—যাঁদের অভিজ্ঞতা নেই, তাঁদের আর যন্ত্রণা বাড়াতে চাই না।

তাও—পরে শুনেছিলাম এ ফ্ল্যাট এক সর্দারজী মাসিক আট টাকায় ভাড়া নিয়ে এগারো টাকায় এদের বসিয়ে গেছেন।

অনুমান করা খুব অন্যায় হবে না যে, বাড়িওয়ালা তাঁর ভাড়া বা সর্দারজী নিজের মুনাফা—কিছুই পাচ্ছেন না।

কিন্তু তখনও এই অনুসন্ধানের পরিণতিটা অনুমান করতে পারি নি।

কল্পনা এ বাস্তবের ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারে না।

খুঁজে খুঁজে বাইরে দিনের আলো যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও প্রায় অন্ধকার গলির সেই ফ্ল্যাট বা ঘরের সামনে এসে যখন পৌঁছলুম, দেখি স্বয়ং হীরা বৌদিই নিরতিশয় ম্লান ও শুষ্ক মুখে দরজার সামনের রাস্তায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এক হাতে দরজার চৌকাঠটা ধরে।

শুষ্ক—উদ্বেগেও ততটা নয়—যতটা উপবাসে। অন্ততঃ দেখা মাত্র তাই মনে হ'ল আমার, যদিচ উদ্বেগের পরিমাণও কম হবে না।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্র চমকে উঠে মাথা নত করলেন হীরা বৌদি।

দেখতে দেখতে দু'চোখ দিয়ে তাঁর টপটপ ক'রে জল ঝরে পড়তে লাগল।

তাঁর মানসিক অবস্থা বুঝে কোন অস্বস্তিজনক প্রসঙ্গ না তুলে সহজ প্রশ্নই করলুম—যেন ওঁর মুখের বিবর্ণতা ও লজ্জা লক্ষ্য করি নি, চোখের জলও চোখে পড়ে নি—এইভাবেই—'দেবুদা কোথায় ?'

এবার মুখ তুললেন বৌদি। অনাবশ্যক মিথ্যা বলে ভবিষ্যতে অধিকতর লজ্জার কারণ সৃষ্টি করতে চাইলেন না। বোধ হয় মিথ্যা বলা তত অভ্যাসও নেই।

বললেন, 'উনি ভোরবেলাতেই বেরিয়েছিলেন কিছু টাকা যোগাড় করতে, বলে গিছলেন যদি কোথাও কিছু না পান—আপনাদের আসতে নিষেধ ক'রে দেবেন—কিন্তু কী করেছেন জানি না, এখনও পর্যন্ত বাড়ি ফেরেন নি।'

অন্যরকম চেষ্টা সত্ত্বেও কণ্ঠস্বরটা বোধহয় তিক্ত হয়ে উঠল উত্তর দেবার সময়, বললুম, 'তা টাকার যোগাড় না ক'রেই এই নেমন্তন্নের হাঙ্গামা করতে গেল কেন ?'

আবারও মাথা নত করলেন বৌদি, বললেন, 'এক জায়গা থেকে কিছু পাবার কথা ছিল—গত বৃহস্পতিবার। যার দেবার কথা সে কখনই নাকি ফেল্ করে না, আজ অবধি করে নি—সেই ভরসাতেই বলেছিল। সে লোকটি হঠাৎ বুধবার রাত্রে মারা যাওয়াতে সব ওলটপালট হয়ে গেল। সেইদিন থেকেই ঘুরছেন টাকার জন্যে পাগলের মতো। আমরা উপবাস করতে পারি, করেওছি এর আগে—বাচ্চারা সুদ্ধ—এই ইজ্জতটা বাঁচাবার জন্যেই আরও প্রাণপণে ঘুরছেন, কোন জ্ঞান নেই বলতে গেলে। কিন্তু কিছুই হ'ল না। অবস্থা বুঝে ওকে মাপ করবেন।'

তার পরই আরও আকুল হয়ে কেঁদে উঠে বললেন, 'ভাই ঠাকুরপো, আপনার—

আপনার দাদা লজ্জায় কিছু ক'রে বসেন নি তো ?'

'সম্ভবতঃ না, 'অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠেই বলি এবার, 'আমাকে কোনদিনই কিছু বলে নি, তবে ওর অবস্থাটা অনুমান করতে পারি বৈকি। এ তো আর আজ নতুন নয়। ক্রমাগত ভাগ্যের কাছে ঘা খেলে সহ্যশক্তি অনেক বেড়ে যায়। আসলে —শুধু আমরাই তো একমাত্র প্রবলেম নই, প্রধান হ'তে পারি—কিন্তু আপনাদের সংসারেরও তো প্রয়োজন আছে, সে সমস্যারও কোন সমাধান হয় নি বোধ হয়— তাই ফিরতে পারছেন না।'

একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ মুছে বৌদি বললেন, 'ভেতরে চলুন। আতিথেয়তা করতে পারব না—তবু একটু বসুন এসে।'

'এখনই আসছি একটু—' বলেই সেই কানা গলিটা থেকে বেরিয়ে এলুম আবার।

পাড়াটা বিশ্রী, শুধুই স্কুটার, ট্যাক্সি ও লরী মেরামতের আড্ডা। ঠিকাদারদের লরীর আস্তানাও। তাই পথের ধারে চা ও চাটের দোকান ঢের আছে—ঠেলা-গাড়িতে ঠেলাগাড়িতে, কোন ভদ্র দোকান খুঁজে পাওয়া কঠিন।

অবস্থা দেখলে হঠাৎ মনে হবে—এ পাড়ার লোকরা ঐ 'চাট্' জাতীয় জিনিস খেয়েই জীবন ধারণ করে।

অনেক ঘুরে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে একটা দোকান মিলল। সেখান থেকে কিছু ক্ষীরের বরফি, গাঁঠিয়া অর্থাৎ মোটা ঝুরিভাজা এবং কিছু চাল ডাল ও আলু কিনে নিয়ে ফিরলুম, সেই সঙ্গে পকেটে ক'রে একটা ছোট চায়ের প্যাকেট ও এক পো চিনি।

বৌদি তখনও সেইখানে দাঁড়িয়ে আছেন—তেমনি ভাবে।

বোধ করি আমারই অপেক্ষা করছিলেন।

এবং আমার ওভাবে চলে যাওয়ার কারণটাও বুঝতে অসুবিধে হয় নি।

আমাকে দেখে একটি কথাও বললেন না, খুব সহজ ভাবেই হাত থেকে জিনিসগুলো নিয়ে 'আসুন' বলে পথ দেখিয়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন।

দেখলুম ছেলেমেয়েগুলো একটা খাটিয়ায় কেমন যেন জড়ো হয়ে বসে আছে।

অদ্ভুত ছেলেমেয়ে, সত্যি !

শিক্ষা না স্বভাব কে জানে ! কান্নাকাটি নেই, মুখে কোন শব্দই নেই।

হয়ত মায়ের কাছ থেকেই পাওয়া এটা—এই সহ্যগুণ।

অথচ মুখ দেখেই বোঝা যায়, সারাদিন পেটে কিছু পড়ে নি। অনাহার উপবাস বোধ হয় নতুন নয়। তাই কান্নাকাটি ক'রে শক্তির অপচয় করে না, শান্ত হয়ে সহ্য করে।

আমাকে দেখে যত না হোক, বোধ হয় মায়ের হাতের বস্তুগুলো যে খাদ্য বুঝতে পেরেই, ওদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তৎসত্ত্বেও কেউ উঠে এল না বা 'দাও' 'দাও' করে বিরক্ত করল না। হয়ত একেবারে নেতিয়ে পড়েছে বলেই—আমাকে দেখেও কোন সম্ভাষণ জানাল না।

'চাচাজী' বলে আমাকে, বাড়িতে গেলে আমার কাছে-কাছেই থাকে গল্প শোনার লোভে—কিন্তু আজ চোখে পরিচয়ের সামান্য একটু দীপ্তি ফুটে ওঠা ভিন্ন কোন উচ্ছ্বাস কি অভ্যর্থনার একটি শব্দও ফুটল না ওদের মুখে।

খাবারগুলো ভাগ করতে করতে হীরা বৌদি অর্ধস্বগতোক্তির মতো মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'আপনি তখন হঠাৎ কেন চলে গেলেন তা বুঝেছিলাম, তবু বারণ করতে পারি নি। এমনই অবস্থা যে চক্ষু-লজ্জা করতে আর সাহস হয় না আজকাল।'

ছেলেদের দিয়ে আমার দিকেও এক প্লেট এগিয়ে দিলেন। আমার খাওয়ার সাধ্য নেই, ওঁদেরই কল্যাণে আমার খেতে বেলা তিনটে বেজেছে। সেকথা অবশ্য বলা গেল না। শুধু প্রশ্ন করলুম, 'আপনি নিলেন না?'

হীরা বৌদির দু'চোখে আবার জল উপচে এল। বললেন, 'সে আসুক ভাই আগে।...তার হয়ত সারাদিনে এক কাপ চাও পেটে পড়ে নি। বাস ভাড়ার পয়সাও নেই, শুধুই হয়ত হাঁটছে। সেই ভোর থেকেই হাঁটছে। সে না এলে মুখে উঠবে না কিছু—'

আমি বললুম, 'আমি বেলা তিনটেয় খেয়েছি—বুঝতেই পারছেন, এখন আর কিছু খেতে পারব না। বরং একটু চা করুন।'

হীরা বৌদি আর দ্বিরুক্তি করলেন না, অকারণ পীড়াপীড়ি করলেন না, খাবার-গুলো সরিয়ে সযত্নে তুলে রাখলেন।

সত্যকে এমন সহজে মেনে নেবার শক্তি মেয়েদের মধ্যে আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এদিক দিয়ে হীরা বৌদি সত্যিই অতুলনীয়া।

আজ মনে হ'ল দেবুদাকে ভাগ্য যত রকমেই বঞ্চিত করুক, এই একদিকে করে নি।

দেবুদা কিন্তু রাত নটাতেও ফিরল না।

অগত্যা আমাকে উঠতে হ'ল। বাড়িতে কিছু বলা নেই, রমা হয়ত ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি শুরু করবে।

আসার আগে শুধু জিজ্ঞাসা ক'রে নিলুম, 'এরকম রাত করা নিশ্চয়ই ওর পক্ষে নতুন নয়?'

হীরা ঘাড় নাড়লেন, 'না। এ রকম সারাদিন—গভীর রাত পর্যন্ত ঘোরা ওঁর অভ্যাস আছে। বিশেষ যেদিন ঘরে কিছুই থাকে না, সেদিন যতক্ষণ কিছু না হাতে আসে বাড়ি ফেরেন না।'

'তা'হলে আমি এখন আসি। বরং কাল ভোরেই খবর নেব।'

হীরা বৌদি ঘাড় নাড়লেন।

বললেন, 'না ভাই। যদি রাত্রে না আসে আমিই ভোরে গিয়ে খবর দেব। আপনি আর আসবেন না। বড় লজ্জা পাবে। এতগুলো মিথ্যে বলেছে তো!'

পরের দিন সকালে যখন হীরা বৌদি এলেন না তখন নিশ্চিন্ত হলুম।

বুঝলুম হয়ত আমার খোঁজ করতে যাওয়ার সম্ভাবনা বুঝেই কোথাও বসে ছিল,

কোন পার্কে কি কোথাও —। আমি চলে আসতে বাড়ি ফিরেছে, সময়টা অনুমান ক'রে নিয়ে।

॥ পাঁচ ॥

দেবদার সঙ্গে আর আমার দেখাই হ'ল না।

লজ্জানিবারণ ভগবানই বোধ করি তাকে সেই মর্মান্তিক মিথ্যার লজ্জা থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

চিরকালের মতো এই আশাহীন অসম জীবনযুদ্ধ থেকেও।

সেই যে উদ্‌ভ্রান্তের মতো খাপছাড়া খাপছাড়া কথা বলতে বলতে শুষ্ক শ্রান্ত-মুখে বেরিয়ে গেল—একটু চা-ও খাওয়াতে পারি নি বেচারীকে—সেই-ই শেষ দেখা তাকে।

একদা যার মুখ সর্বদাই উৎসাহ আর আশায় প্রদীপ্ত থাকত, জীবন সম্বন্ধে—বিশেষ জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে মনে হ'ত যার তাচ্ছিল্যের অবধি নেই, জীবনী-শক্তির এত প্রাচুর্য যার—মনে হ'ত যে প্রতিনিয়ত সে-জীবন সে অনায়াসে মুঠো মুঠো ক'রে ছড়িয়ে বিলিয়ে দিচ্ছে—সেই অপরাজিত অনবনমিত আশ্চর্য মানুষটির আশাপ্রোজ্জ্বল মুখের দীপ্তি আর কোনদিনই চোখে পড়ল না, সেই প্রথম ওর ভাগ্যের কাছে হার মানার দিনটি থেকে।…আর কোন দিন পড়বেও না।

কে জানত সেই-ই শেষ দেখা ; কে জানত যে দু'দিন খাড়া উপবাসী থেকে ঘুরেছে লোকটা আমাদের খাওয়াবার জন্যে ; সেদিনও, তখনও পর্যন্ত এক কাপ চা-ও পেটে পড়ে নি, সাত-আট মাইল কি হয়ত আরও অনেক বেশী, চোদ্দ-পনেরো মাইল হেঁটে এসেছে !

হয়ত তার পরও হেঁটেছে। হেঁটেই বেড়িয়েছে—সারা দিন।

বিশ্রাম করতে পারে নি। করতে সাহস হয় নি।

খবরটা দিলেন হীরা বৌদিই এসে।

সে-ই একদিন ভোরবেলাই এলেন হীরা বৌদি।

যেমন আসার কথা ছিল সেদিন—দেবুদা না ফিরলে।

কিন্তু এ আসার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না আমরা ! এমন ভাবে আসার জন্যে।

চুল এলো, জামাকাপড় আলুথালু ; দুই চোখে অবিরাম জল পড়ছে ; কপালে কুম্‌কুমের টিপ ঘামে বা অন্য কারণে কপালে লেগে গেছে ; অনেকটা পাগলীর মতো চেহারা দাঁড়িয়েছে।

ভোরের প্রথম বাস্‌-এই এসেছেন, বোধ হয় ভাড়ার মতো কটা পয়সাই ছিল, হাতে ক'রে বেরিয়েছিলেন—কারণ টিকিটখানা হাতেই ধরা। ব্যাগ তো নেই-ই আঁচলেও কিছু বাঁধা নেই।

সব চেয়ে বড় কথা খালি পায়েই এসেছেন।

কী হয়েছে, কী ব্যাপার—এমন ভাবে ছুটে এসেছে কেন—এসব কোন প্রশ্নই

করা গেল না, তার আগেই 'ঠাকুরপো' বলে একটা যেন বুকফাটা চিৎকার ক'রে উঠে একেবারে আছড়ে পড়লেন—ফ্ল্যাটে ঢুকে যে চলনটা—তার মেঝেতেই।

দুঃসংবাদ খানিকটা অনুমান ক'রে নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম।

স্বামী সম্বন্ধেই দুঃসংবাদ নিশ্চয়।

ছেলেমেয়েদের কারও কিছু হ'লে তাদের বাবাই আসত।

সেদিনের সেই সামান্য লজ্জার কথা মনে ক'রে রেখে বিপদের দিনে অযথা সংকোচ করবে—এমন লোকই সে নয়।

কিন্তু কী সে খবর, কতখানি খারাপ ?

অসুখ, স্ট্রোক, না অ্যাক্সিডেন্ট ?

না আরও খারাপ কিছু ? মর্মান্তিক কোন চরম দুঃসংবাদই ?

—যা মুখে উচ্চারণ করতে পারে না মানুষ !···

অবশেষে রমাই যেন সক্রিয় হয়ে উঠল।

পাশে বসে পড়ে মাথাটা জোর ক'রে কোলে তুলে নিয়ে বললে, 'কী হয়েছে তাই আগে বল্ না ভাই ! একটু ধৈর্য ধর্। বিপদে শান্ত হয়ে থাকতে হয় এ শিক্ষা তো তোর নতুন নয়।···এতটাই যখন এলি তখন কী হয়েছে, আমরা কী করতে পারি—কিছু করার পথ আছে কিনা সেটা আমাদের কাছে বল্। না জানলে যে কোন কাজেই আসতে পারছি না।···লক্ষ্মীটি, মুখ তোল্, শান্ত হ, বল্ কী হয়েছে।'

বোধ হয় এইটুকু আন্তরিকতা, সামান্য এই সহানুভূতির স্পর্শেই হীরা বৌদি আরও ভেঙে পড়লেন, আরও আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

বহুদিনের সঞ্চিত জল পাষাণ-প্রাচীরে আটকে ছিল যেন—এখন নিদারুণ আঘাতে সে পাষাণ-বাধা ভেঙে গেছে—সহজে এ প্রবল স্রোত সম্বরণ কি সংহরণ করা সম্ভব নয় !

অনেক সময় লাগল দুঃখের সে প্রচণ্ড আবেগ সামলাতে, প্রকৃতিস্থ না হোক, কথা বলার মতো শক্তি ফিরে পেতে।

রমাই সাহায্য করল, ছোট ছোট প্রশ্নে, আন্তরিক সমবেদনায়—দুঃখ ভাগ ক'রে নেওয়ার অনুচ্চারিত প্রতিশ্রুতিতে।

বেশ খানিকক্ষণ পরে, একটু একটু ক'রে তার কান্নার ফাঁকে ফাঁকে যে সংবাদটুকু সংগ্রহ করা গেল, তা এই :

গত কদিন ধরেই চরম দুরবস্থা চলছিল।

এমন নিরবচ্ছিন্ন ভাগ্যের বিরূপতা আর কখনও আসে নি তাদের জীবনে।

অবশেষে একেবারেই ঘরে কিছু নেই, ছেলেমেয়েরা দুদিন ধরে উপবাস ক'রে আছে দেখে কালও নাকি সেদিনের মতো ভোরবেলা উঠে বেরিয়ে গেছেন, ফিরেছেন একেবারে রাত নটায়।

কিন্তু সে কী চেহারায় ফিরলেন !

অস্নাত অভুক্ত, চোখমুখ বসে গিয়েছে, ঘামে গায়ের সঙ্গে জামা লেপ্টে গেছে—জামায় প্যান্টে তেলকালির মাখামাখি ; কী করে এসেছেন—কোন কারখানাতেই

খেটেছেন কি কোথাও মাল বয়েছেন—কিম্বা কোন সর্দারজীর লরী-মেরামতে সাহায্য করেছেন—সে প্রশ্ন করতে সাহস হয় নি বৌদির—ওঁর সেই একান্ত ক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে।

দেবুদাও নিজে থেকে কিছু বলেন নি, পকেট থেকে চারটে টাকা বার ক'রে দিয়ে সেই ময়লা জামাকাপড় সুদ্ধই বিছানাতে শুয়ে পড়েছেন।

সে অবস্থায় কোন একটু দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যও দেওয়া যায় নি। ক্লান্তি অপনোদনের কোন উপায়ও ছিল না।

টাকার জন্যে গত মাসে ইলেকট্রিকের লাইন কেটে দিয়েছে, তাছাড়া পাখা চরম অভাবে অনেকদিন আগেই বেচে দিতে হয়েছে—একটুখানি দাঁড়িয়ে তালপাতার পাখায় হাওয়া করেছেন বৌদি, তবে তাও বেশীক্ষণ করতে পারেন নি, দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাবে বলে।

তাহ'লে এত কষ্টের টাকাও কোন কাজে লাগবে না।

বন্ধই হয়ে গিয়েছিল, এক চেনা দোকানদারের হাতে-পায়ে ধরে বাড়ির ভেতর দিক দিয়ে চাল ডাল আলু কিনে এনেছেন বৌদি, সেই সঙ্গে তার ব্যবহারের কয়লা থেকে একটু কয়লাও, ধার হিসেবে।

রান্নাও হয়েছে—সামান্যই এক পাকের রান্না, ভাত তার সঙ্গেই ডাল আর আলু-ভাতে—তখন ডাকতে উনি উঠে জামা ছেড়ে মুখে হাতে জল দিয়ে খেতেও বসেছেন—কিন্তু কারও সঙ্গে একটাও কথা বলেন নি। তখনই লক্ষ্য করেছেন বৌদি—ঘাড় হেঁট ক'রে বসে খাচ্ছেন—টপটপ ক'রে চোখের জল ঝরে পড়ছে ভাতের ওপর।

বোধহয় খেতে বসতেনই না—তিনি না খেলে এরা খাবে না বলেই জোর ক'রে বসেছেন।

বুক ফেটে গেছে বৌদির।

জীবনে এমনভাবে পরাজয়কে মেনে নিতে বৌদি আর কোনদিন দেখেন নি ওঁকে।

সদানন্দময় বেপরোয়া ঐ মানুষটাকে।

শত কষ্টেও ওঁর চোখে জল পড়ে নি কখনও। কখনও হাল ছাড়েন নি, অভাব ও দুঃখের কাছে নতিস্বীকার করেন নি।

কিন্তু আর বাস্তবকে বুঝি অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

উনি যে আর পারছেন না, পারলেন না—হারই মেনেছেন ভাগ্যের কাছে—কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ওঁর সেই স্তব্ধ মার-খাওয়া দীন ভঙ্গীতে।

সেইজন্যেই আর একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেন নি বৌদি—পাছে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়, আরও বেশী দুঃখ পান—দুঃখের কথা বলতে গিয়ে।

ঐ উপার্জনের ইতিহাসটাও তাই জানা হয় নি আর।

খেয়ে উঠেই শুয়ে পড়েছেন দেবুদা, কারও সঙ্গে একটি কথাও না বলে।

এমন কি ছেলেদের পর্যন্ত কোন প্রিয় সম্ভাষণ করেন নি। প্রতিদিন শোবার

আগে ওদের খানিকটা আদর করা চিরদিনের অভ্যাস ওঁর—কিন্তু এই অবসন্ন অবস্থা ও বিষাদগম্ভীর ভাব দেখে তারাও কাছে আসতে সাহস করে নি।

হীরা বৌদিও, ওঁকে বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন বুঝে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে আলো নিভিয়ে নিজের বিছানায় এসে শুয়েছেন।

রাত দুটো নাগাদ একটা চাপা গোঙানির মতো আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙেছে বৌদির।

শব্দটা কোন দিক থেকে আসছে তাও বুঝতে দেরি হয় নি।

দুশ্চিন্তা একটা ছিলই, বোধ হয় সর্বনাশের পদধ্বনি নিজের বুকের মধ্যেই শুনতে পেয়ে থাকবেন, তাই ভাল ক'রে ঘুম হয় নি—আধ-তন্দ্রার মধ্যে কান পাতা ছিল এদিকে।

কিন্তু ঘুম ভাঙলেও—উঠে ঘুমের ঘোরে দেশলাই খুঁজে আলো জ্বালাতে তিন চার মিনিট কেটেছে।

তারপর কাছে এসে আলো ধরে দেখেছেন চোখমুখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে দেবুদার। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছেন, ঘামে সর্বাঙ্গ ভেসে যাচ্ছে। তার মধ্যেই অস্ফুট কণ্ঠে একবার বলেছেন, 'বড় কষ্ট হীরু, বড় কষ্ট!'

বৌদি তখনই পাশের ঘরের ভদ্রলোককে ডাকতে যাচ্ছিলেন, দেবুদা হাতের ওপর বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা হাত রেখে নিষেধ করেছেন, তেমনি ভাবেই বলেছেন, 'যেয়ো না! আমার বোধ হয় শেষ হয়ে আসছে, একটু কাছে থাকো।'

চিৎকার করে কেঁদে ওঠারই কথা। তবু প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত ক'রে হীরা বৌদি বলেছেন, 'না না, ওসব কিছু না। যাঃ! এক সেকেণ্ড একা থাকো লক্ষ্মীটি। সোহন সিংকে একটা ডাক্তার ডাকতে বলে আসি।'

কিন্তু সেই সময়টাতেই আরও কষ্ট বেড়েছে দেবুদার, গোঙাতে গোঙাতেই বলেছেন, 'পাইখানা—নিয়ে চলো—নাবিয়ে দাও—'

বৌদি বলছেন, 'তুমি এখানেই করো, আমি ফেলে দেব।' বলতে বলতেই নিজের একখানা ছেঁড়া শাড়ি পেতে দিয়েছেন—কিন্তু তার আর কোন দরকার হয় নি। বার দুই যেন 'হীরু', 'হীরু' আর 'ছেলেমেয়েরা' শব্দ দুটো উচ্চারণ করেছেন, তারপর একটু ঘড়ঘড় আওয়াজ হয়েছে গলায়, তারপরই স্থির শান্ত হয়ে গেছেন।

তখনও এই স্থির হয়ে যাওয়ার মানেটা ঠিক বুঝতে পারেন নি বৌদি।

বোঝার কথাও নয়।

সত্যিই যে সব শেষ হয়ে গেল, এমন ভাবে, অকস্মাৎ—এতটুকু প্রস্তুতির অবসর না দিয়ে—তা বিশ্বাস করাও তো শক্ত।

যে বিপুল প্রাণশক্তি ছিল মানুষটার—সে যে এমন ভাবে এত সহজে, এমন নিঃশব্দে নিঃশেষ হয়ে যাবে—তা তো ভাবাও যায় না!

কখনও একটু আভাস পর্যন্ত পান নি যে!

কখনও অসুস্থও হ'তে দেখেন নি।

মৃত্যুর এতটুকু সতর্ক-বাণী শোনেন নি কখনও।

তাই বৌদি এটাকে রোগের প্রশমন বা যন্ত্রণার ক্ষণিক বিরতি বলে মনে করেছেন, ছুটে পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে সোহন সিংয়ের দোরে ঘা দিয়েছেন।

স্বভাবতই তাদের উঠতে দেরি হয়েছে একটু।

ঘুম ভেঙে যখন সোহন সিং, তার মা স্ত্রী সবাই এসেছে তখন বৌদি স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে যন্ত্রণার লক্ষণ আবার দেখা দেবে কিনা লক্ষ্য করছেন।

সোহনের মা প্রথম বুঝেছেন—ললাটে করাঘাত ক'রে জড়িয়ে ধরেছেন ওঁকে। সোহনের স্ত্রীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে, সোহন সিং বলে উঠেছে, 'হে ভগবান।'

তবু বুঝতে পারেন নি হীরা বৌদি, তবু বিশ্বাস হয় নি।

বিহ্বল হয়ে চেয়ে থেকেছেন ওদের মুখের দিকে।

কাঁদছে কেন এরা, হাহাকার করছে কেন—ভেবে পান নি।

দেরিই বা করছে কেন?

শেষ অবধি, মুহূর্ত কয়েক দেখে অসহিষ্ণু হয়ে উঠে অনুরোধ করেছেন শীগ্‌গির কোন ডাক্তার ডাকতে।

এবার সোহনের মা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছেন, সোহনের স্ত্রীও।

সোহন বলেছে ধীরে ধীরে, ভাবীজী, ডাগ্‌দার ডাকলে যদি কোন কাজ হ'ত আর ভাইসাহেবের জান ফিরে আসত—আগেই ছুটে যেতুম। ভগবানজী যে আর কোন কিছু বাকী রাখেন নি, তাঁর খাদেমকে কাছে টেনে নিয়েছেন!'

তবুও বুঝতে সময় লেগেছে।

আরও কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছেন।

তারপর একটু একটু ক'রে বুঝেছেন, ক্রমে ক্রমে বিশ্বাসও করতে হয়েছে।

অবিশ্বাস করার বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে ওদের প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়েছেন, কিন্তু কোথাও সে আশা পূরণের কোন সম্ভাবনা দেখেন নি।

সর্বনাশের পরিমাণ সবটা হয়ত উপলব্ধি করতে পারেন নি, তখনও, তবু যে তাঁর ভবিষ্যৎ আর বর্তমান একটা ভয়াবহ চেহারা নিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সেটার আবছা আদল একটা অনুভব করেছেন।

আর তাতেই, যখন বিশ্বাস হয়েছে এই রকম সর্বনাশের ঘটনাটা, করতে বাধ্য হয়েছেন—তখন কাউকে কিছু না বলে ছুটে চলে এসেছেন আমাদের কাছে।

ঐভাবে ছুটে আসতে দেখে সোহন সিং খানিকটা সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। শেষ-রাত্রে এভাবে একা মেয়েছেলে যাওয়া ঠিক হবে না বুঝেই এসেছে সে, প্রয়োজন হয় তো শেষ পর্যন্ত আসবে বলেই।

কিন্তু খানিকটা এসেই বাস দেখতে পেয়েছে একটা—প্রথম বাস এই রুটের।

তাতেই উঠিয়ে দিয়েছে সোহন সিং, বৌদি উঠে গেলে সম্ভবত তার খেয়াল হয়েছে, বৌদি এক কাপড়ে ব্যাগ না নিয়েই বেরিয়ে এসেছেন—তাড়াতাড়ি পকেট থেকে কটা পয়সা বার করে চলন্ত অবস্থাতেই কণ্ডাক্টরের হাতে গুঁজে দিয়েছে।

অর্থাৎ এখনই রওনা হওয়া দরকার।

এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে।

এতগুলো সংবাদ হীরা বৌদির বুকফাটা কান্নার মধ্য থেকে কিছু কিছু ক'রে উদ্ধার করতে অনেকখানি সময় কেটেছে।

সেখানে সেই বাচ্চাগুলো আর সেই শবদেহটা পড়ে আছে—সম্ভবতঃ পরের ভরসায়।

'সম্ভবতঃ' এইজন্যে যে, তারাও কেউ দেখছে কিনা কে জানে!

না জানি কি করছে ওরা—এই ভয়াবহ রকমের অসহায় অবস্থায়।

আমরাও পর, তবু এই দীর্ঘকালে একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে—নইলে হীরা বৌদি আগেই আমাদের কাছে ছুটে আসতেন না।

মুখে-চোখে একটু জল দিয়েই বেরিয়ে পড়লুম।

আমাদের চা খাওয়ার চেষ্টা করাও সম্ভব নয়।

খাওয়ানোও যাবে না।

প্রথমতঃ বৌদি খেতে চাইবেন না, দ্বিতীয়তঃ অনেকখানি সময় নষ্ট হবে।

তবে ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন আছে, সে ভারটা পাশের ফ্ল্যাটের মুলচান্দানীদের ডেকে অবস্থাটা বুঝিয়ে দিয়ে, তাদের ওপরে ছেড়ে দিলুম।

তখন মনে হচ্ছে একটা মুহূর্তও নষ্ট করা অন্যায় হবে। বাস্‌এ যাওয়ার আর অবসর নেই। মুলচান্দানীরাই ফোন ক'রে ট্যাক্সি আনিয়ে আমাদের তুলে দিল।

দেবুদাদের বাড়িতে পৌঁছে যে দৃশ্য চোখে পড়ল তার দুঃস্মৃতি বোধ হয় বাকী জীবনই বহন করতে হবে।

শুধু সেই করুণ ও অবর্ণনীয় অবস্থাটা দেখেই যেন কেমন মাথা ঝিমঝিম ক'রে উঠল।

কল্পনায় দেখা একরকম, বাস্তব আরও ঢের বেশী মর্মন্তুদ।

কোন কল্পনাই এই বাস্তবের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে না।

ভার নেওয়ার জন্যেই ছুটে এসেছি—কিন্তু এ ভার কি বইতে পারব? এতখানি?

দেবুদার শব ঠিক সেইভাবেই পড়ে আছে, তেমনি বেঁকেচুরে।

চোখের পাতা বুজিয়ে দেওয়ার কথা কারও মনে পড়ে নি, একটা চাদরও ঢাকা দেয় নি কেউ।

ছেলেমেয়ে তিনটে উঠেছে, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পারলেও তাদের বোধ হয় আপনা থেকেই একটা ভয় হয়েছে—তারা ঘরের একটা কোণে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে—শুষ্ক বিবর্ণ মুখে এদিকে চেয়ে।

ঘরে আর কেউ নেই। সোহন সিংরা খেটে-খাওয়া লোক, তারা আসা-যাওয়া করছে নিশ্চয়ই—কিন্তু অনির্দিষ্টকাল মড়া আগলে বসে থাকলে তাদের চলবে কেন?

শুধু এই মর্মান্তিক দৃশ্যই নয়—সম্পূর্ণ অবস্থাটা বুঝে মাথা আরও ঘুরে উঠল।

যে দায়িত্ব ঘাড় পেতে নিতে এসেছি, তার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে।

বাড়িতে গোটা একটা টাকাও আছে কিনা সন্দেহ। কোথাও কিছু জমা আছে, চেষ্টা করলেও পাওয়া যাবে—এমন কল্পনা করারও কোন কারণ নেই।

ডাক্তার একজনকে ডাকতেই হবে, 'ডেথ সার্টিফিকেট' চাই কিন্তু তাঁর ফী দেবে কে— সম্ভবতঃ এই চিন্তাতেই সোহনরা সে-চেষ্টা করে নি।

কারণ সোহন সিংয়ের কাছে ডাক্তার শব্দটা উচ্চারণ করতেই সে চটে উঠল।

'ডাগ্‌দার ? ডাগ্‌দার কেয়া হোগা ? হামলোক বুদ্ধু হ্যায় কেয়া ? হাম ক্যা নেহি সমঝতে হ্যায়—দাদা জিন্দা হ্যায় ক্যা নেহি ? ডাগ্‌দার ক্যা উসকো জিন্দা কর দেগা আ-কে ?'

তাকে আইনটা বোঝাতেই আমার বিস্তর সময় লাগল যে, ডাক্তারের সার্টিফিকেট ছাড়া মড়া পোড়াতে দেবে না।

কিন্তু তবু এসব তো তুচ্ছ !

সমস্যা একটা নয়। এক রকমও নয়।

মড়া নিয়ে যাওয়ার সমস্যা আছে। যদি লরী ক'রে নিয়ে যেতে হয়—সেও অনেক খরচা। দাহ করার কত খরচ লাগে এখানে তাও জানি না। যদি কাঁধেই নিয়ে যেতে হয়—অনেকগুলো লোক চাই। খরচ সেদিকেও বড় কম হবে না।

তাছাড়া বাড়ির খরচা আছে।

কিছুই তো নেই। ছেলেমেয়েগুলোকে কি খেতে দেব ! সে তো এখনই কিছু করা দরকার।

তবু, আমরা গিয়ে দাঁড়াতেই সোহন সিং চা ক'রে নিয়ে এল। চা আর কেক, কলা, ডালমুট।

ওদের যা প্রচলিত আতিথেয়তা।

সোহনের মা বললেন, ছেলেমেয়েদেরও ওঁরা কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ওরা কোন কথাও বলছে না, খাচ্ছেও না। যেন পাথর হয়ে গেছে।

চা-টার তখন খুব প্রয়োজন ছিল।

মাথা ঘুরছে, গলা শুকিয়ে গেছে। বুকের মধ্যে একটা হিম-হিম ভাব বোধ করছি, পায়েও যেন কোন জোর নেই।

সুতরাং আর কে খেল না খেল—অত বিবেচনার সময় ছিল না।

চা খেয়ে এখানের ভার রমার উপর ছেড়ে দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লুম—টাকা ও লোকের চেষ্টায়।

নিজের পকেটে বেশী টাকা ছিল না।

এখানে আসতেই দশ টাকার মতো ট্যাক্সি ভাড়া গেছে, এখন ঘুরতেও হবে ট্যাক্সি বা স্কুটারে—বাস্-এর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই। সুতরাং সে খরচাটা রাখা দরকার অন্ততঃ।

যা ছিল কাছে তাই থেকেই গোটা কুড়ি টাকা সোহন সিংয়ের হাতে দিয়ে বলে এলুম, এদের খাওয়া-দাওয়ার যোগাড করতে এবং যে কোন একজন ডাক্তারকে ডেকে ডেথ সার্টিফিকেটখানা লিখিয়ে রাখতে।

ঘুরতে হ'ল বিস্তর।

যে সহানুভূতি ও আনুকূল্য খুব সহজেই পাব ভেবেছিলুম—কার্যক্ষেত্রে নেমে সেটার অন্য চেহারা দেখলুম। আগেকার দিনে দিল্লীতে এরকম ঘটনা ঘটলে অযাচিত যে সাহায্য পাওয়া যেত বলে শুনেছি—তার কিছুই দেখতে পেলুম না।

অনেকেই দেবুদাকে চেনে দেখলুম। আর তারা কেউই ওর ওপর প্রসন্ন নয়।

কেউ কেউ বললে, লোফার একটা, জোচ্চোর—ব্যবসার নাম ক'রে অনেকের পয়সা মেরেছে।

কেউ বা জানালে তাদের কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে ফেরত দেয় নি, সেই টাকা-টাই আমি যেন দান বলে ধরে নিই।

কেউ বললে, শেডী ক্যারেক্টার। ওর জীবনে অনেক বিশ্রী ইতিহাস আছে। তোমরা জানো না।

একজন আবার নতুন একটা কথা বললেন। সেণ্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটের পদস্থ কর্মচারী বঙ্কিম জানা বললেন, 'স্কাউণ্ড্রেল একটা। ওর ফ্যামিলির জন্যে সাহায্য করব? অ্যাম দ্য লাস্ট্ পার্সন টু ডু ইট! জানো কি করেছে? একটা ভদ্রলোকের মেয়েকে বিয়ে করে গর্ভবতী অবস্থায় তাকে ফেলে সরে পড়েছিল। শিক্ষিতা, সুন্দরী, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। তার জায়গায় ঐ একটা ইতর শ্রেণীর মেয়ে—একটা ফিল্ম অ্যাকট্রেসকে স্ত্রী বানিয়ে ঘর করছে, তাও সে যদি সত্যিকারের আর্টিস্ট হ'ত তো কথা ছিল। সম্পূর্ণ ফেলিওর একটা। ছোঃ!···তোমার লজ্জাও করে না—ঐ মাগীটার ছেলে-মেয়েদের জন্যে চাঁদা তুলছ!'

আসলে যা দেখলুম সকলেরই একটা বিদ্বেষ বা প্রতিকূল মনোভাব দেবুদা সম্বন্ধে।

দেবুদা একমাত্র আমারই পরিচিত ঠিক এ মনোভাব না থাকলেও—তাকে এত লোক জানে, তার ইতিহাস এত লোকের কণ্ঠস্থ—একথা তো ভাবি নি কখনও!

কই এতকাল তো ওর নামও কখনও শুনি নি কারও মুখে!

এ কঠিন মনোভাবের কারণ ঐ হীরা বৌদিই।

অবাঙালী মেয়ের সঙ্গে বসবাস করছে বাঙালী ব্রাহ্মণের ছেলে—সে মেয়েরও পূর্ব ইতিহাস নাকি তত ভাল নয়, হয়ত বা রীতিমাফিক কোন বিয়েই হয় নি—এইটেই তাদের বিরাগের প্রধান কারণ।

ফলে, তিন-চারশ টাকা চাঁদা তুলতে বেলা চারটে বেজে গেল।

লোক কিছু যোগাড় হয়েছিল, তরুণ কলেজের ছেলেদের অত বাছবিচার নেই, কিন্তু টাকা নিয়েই হ'ল মুশকিল।

অথচ ওর কমেও হয় না।

এতগুলি ছেলেকে ট্যাক্সি-ভাড়া দিয়ে পাঠানো—কষ্ট ক'রে বাস্-এর জন্যে দেড় ঘণ্টা কিউ দেবে, তাদের কী এত গরজ ?—আবার তাদের ফেরত আসার ব্যবস্থা, লরী ভাড়া, দাহর খরচা, জলখাবার খাওয়ানো, নতুন কাপড়জামার ব্যবস্থা—হাজারো খরচা।

টাকার যোগাড় ক'রে ফিরতে চারটে বেজে গেল।

ততক্ষণে কিছু ছেলে অপেক্ষা ক'রে থেকে থেকে চলে গেছে।

বাকী যারা আছে, তারাও এই অকারণ (তাদের কাছে) বিলম্বে বিরক্ত। তাড়াতাড়ি তাদের একটা চা-জলখাবারের ব্যবস্থা ক'রে মৃতদেহ লরীতে তুলে রওনা দিলুম।

রমার আর থাকা সম্ভব নয়, ছেলেমেয়ে সম্পূর্ণ পরের ভরসায় রেখে এসেছে। তারা কতটা নজর রেখেছে কে জানে!

সে এবার অশ্রুসজল চোখে বিদায় নিল।

হীরা বৌদি আর ছোট দুটো বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল—বড় ছেলেকে আমাদের সঙ্গে নিতে হবে, শেষকৃত্যের জন্যে—সে বেচারাদের তখনও সেই স্তম্ভিত অবস্থা, কী ঘটল কী হ'ল কিছুই বুঝছে না, কেমন একটা অজানা আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে গেছে—কিন্তু বৌদি যেতে রাজী হলেন না, সেক্ষেত্রে ওদেরও নিয়ে যাওয়া যায় না।

বৌদি ততক্ষণে অনেক শান্ত হয়ে গেছেন।

চিরদিন এমনি শান্তভাবে অদৃষ্টকে মেনে নিয়ে এসেছেন, সেই অভ্যাসটাই মজ্জাগত হয়ে গেছে।

সেটাই কাজে লাগল এখন।

রমার প্রস্তাবে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'ওঁরা ফিরে এলে কী সব কৃত্য আছে—সেগুলো না সেরে যাওয়া তো উচিত হবে না···আমি সব জানিও না। সেই সময় বরং যদি কেউ আসতেন—।'

রমা প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে বললে, 'সে আমি পারব না ভাই। কিছুতেই পারব না।···শুনেছি এই পাড়াতেই ঐ সিনেমার কাছে এক ঘর বাঙালী থাকেন, তাদের গিন্নীও বিধবা, অনেক বয়সও—সোহন সিংরাও চেনে—তাঁকেই ডেকে আনতে বলি না হয়।'

সেই ব্যবস্থাই হ'ল।

মড়া পুড়িয়ে আমরা ফিরলুম রাত দুটোয়।

তখন আর কিছু করা সম্ভব নয়।

তবে দেখলুম সেই রাধু দিদিমা এসেছেন এবং মোটামুটি এখনকার মতো ভার নিয়েছেন।

সোহন সিং আর তাঁর হাতেই কিছু টাকা দিয়ে তখনকার মতো চলে এলুম।

আমি তখন আর দাঁড়াতে পারছি না।

আমার ওপর দিয়েও তো কম ধকল যাচ্ছে না সারাদিন।

ঘোরাঘুরি বা অনাহার বলে শুধু নয়, দুশ্চিন্তার জন্যেই আরও—শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে। অন্তত একটুখানি বিশ্রাম না নিলে আর চলছে না।

॥ ছয় ॥

সেদিন তখনকার বিপদ ও সমস্যাটাই সব চেয়ে বড় মনে হয়েছিল, কিন্তু দুদিন যেতে দেখা গেল প্রবলতর ও বৃহত্তর সমস্যা—সমস্যা না বলে প্রশ্ন বলাই উচিত—আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

এখন এদের কি হবে ?

যা করতে হয়েছে তাতেই যথেষ্ট বিব্রত।

দাহর ব্যাপারটা শেষ ক'রে যা টাকা বেঁচেছিল, তাই দিয়ে কোন রকমে নিয়ম-রক্ষামতো শ্রাদ্ধটা সারা হয়েছে।

কালীবাড়ির ভটচায্যি মশাইকে ধরেছিলুম, অবস্থা শুনে তিনিই নামমাত্র মূল্যে নিয়ে কাপড় গামছা দানের বাসন শয্যা ইত্যাদি ঘর থেকে দিয়ে শ্রাদ্ধ করিয়েছেন।

অবশ্য সেদিনের উদ্বৃত্ত টাকায় সব কুলোয় নি—নতুন কাপড়-জামা বাবদ আমাদের কাছ থেকেও মোটা একটা টাকা বার করতে হয়েছে।

তবু তো ব্রাহ্মণ খাওয়ানোর হাঙ্গামা করা হয় নি, ঠাকুর মশাইকেই কটা টাকা ধরে দিয়ে সে-পাট চুকনো হয়েছে।

তিনিই রান্না করিয়ে ঐখানে 'ভোজন' করবেন।

যদি কখনও ওদের সুদিন আসে, ছেলেরা মানুষ হয়—তখন পিতৃকৃত্য করবে ভাল ক'রে। এখন শুধু শুদ্ধ হওয়া দরকার, সেজন্যে যেটুকু করতে হয় করিয়ে দিলুম।

কিন্তু তার পর ?

সেই অনিবার্য প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে যে।

বিপদ হয়েছে আরও, হীরা বৌদি পুরোপুরি আমাদের ওপরই নির্ভর ক'রে বসে আছেন।

যেন আঁকড়ে ধরেছেন আমাদের।

অথচ আমাদের কতটুকু ক্ষমতা! কী-ই বা করতে পারি? চারটে প্রাণীর খরচ টানার মতো কেন—তার সিকি সামর্থ্যও নেই।

যে দিনকাল, নিজেদেরই ভদ্রভাবে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

আমাদের এত করারও কথা কি ?

দেবুদার সঙ্গে পরিচয় কতটুকু!

তাঁর তো কিছুই জানি না বলতে গেলে।

তাঁর কি ছিল, কি আছে—কোন খবরই তো জানা নেই।

কে আছে—তা তো নয়ই।

কি করতেন দেবুদা—এই সহজ ও স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠেছে বৈকি।

আমিই করেছি বৌদিকে।

কিন্তু কোন সদুত্তরই পাই নি।

পাই নি তার কারণ উত্তরটা হাঁরা বৌদির জানা নেই।

দেবুদার সঙ্গে যখন পরিচয় হয়েছে ওঁর, দেবুদা তখন রীতিমতো সম্পন্ন ব্যক্তি।

অন্তত তাঁর চালচলনে ব্যবহারে তাই মনে হয়েছিল বৌদির।

অনেক টাকা না থাকলে—বাজ-খরচের মতো অনেক টাকা—মানুষ ওরকম চালে চলতে পারে না।

পরে শুনেছিলেন—ঠিক সেই সময়টাতেই পৈতৃক সম্পত্তির অংশ যা-কিছু প্রাপ্য, সব বিক্রী ক'রে দিয়ে লাখখানেক টাকা নিয়ে বোম্বেতে এসেছিলেন।

ইচ্ছা—ফিল্ম তুলবেন, ফিল্ম-এর ব্যবসা করবেন।

বহু নির্বোধেরই এ বাসনা থাকে।

দু-একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ ব্যবসায়ে লাভ করেছে, লোকসান দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে অনেক বেশী।

কিন্তু সেই সার্থকদের দৃষ্টান্তটাই চোখের সামনে ধাঁধার সৃষ্টি করে—পতঙ্গের মতো বহু লোক ছুটে যায় সর্বনাশা দীপ্তির দিকে, মরীচিকা দেখে স্নিগ্ধ সরোবর ভাবে।

এদেশে অন্তত, ফিল্ম-এর ব্যবসা আলেয়ার আলো—পথ ভুলিয়ে মৃত্যুর দিকে টানে।

সেই টানেই—উদার এবং অনভিজ্ঞ (নির্বোধ বলছি না স্নেহবশতঃই) দেবুদাও সেই মিথ্যে আলোর দিকে দৌড়েছিলেন।

আর, নির্বোধ লোকের হাতে অনেক টাকা—এ গন্ধ পেতে ওখানকার মানুষ-হাঙরদের দেরি হয় নি।

দেবুদা ছিলেন—বৌদির যা ধারণা—সরল এবং উদারচরিত্রের স্নেহময় মানুষ, টাকার ওপর কোন মায়াও ছিল না, ও বস্তুটার মূল্যও বুঝতেন না তত।

সকলকেই বিশ্বাস করতেন, বিশেষ যারা নিজেদের 'বিজনেসম্যান' বলে পরিচয় দিত—তাদের দেবতা-জ্ঞান করতেন।

তাঁর ধারণা ছিল এরা কেউ ঠকাতে পারে না। ব্যবসা করতে বসেছে—ঠগ্-জোচ্চোর তো নয়।

জুচ্চুরিতে কখনও ব্যবসা চলে?

ফলে এক লাখ টাকা উড়ে যেতে দেরি হয় নি।

শেষ পর্যন্ত যখন কপর্দকশূন্য হয়েছেন তখন ওঁর ছবি দু'হাজার ফুটও ওঠে নি।

টাকা যেতে ছবির ব্যবসাটাকে তার স্ব-রূপে চিনতে শিখেছেন দেবুদা। বোম্বের ছবির বাজার সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা হয়েছে কিছু।

অনেক কষ্ট করে অনেককে ধরে-পাকড়ে শেষ পর্যন্ত একটা ছবি তুলে ছিলেন—একেবারে যে সে ছবি অচল হয়েছিল তাও না, কিন্তু নাতোয়ানের শর্ত বলেই

—উনি এক পয়সাও পান নি। মহাজন, ডিস্ট্রিবিউটার আর 'হাউস'-এই সব খেয়ে নিয়েছে।

ও রাজ্যের নাকি এই আইন!

ওখান থেকে অর্থলাভ করতে পারেন নি, অন্য লাভ হয়েছে।

এতকাল কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না, সেইটেই ঘাড়ে চেপেছে। পায়ে বেড়ি পরিয়ে বোম্বের ফিল্ম জগৎ বিদায় দিয়েছে তাঁকে।

সংসার-রূপ সুকঠিন শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছে তাঁর গলায়।

হীরা বৌদির সঙ্গে আলাপ এই ফিল্ম জগতেই।

হীরা বৌদিও অভিনেত্রী হ'তে এসেছিলেন।

মা বাবা ছিল না, মামা অভিভাবক। তাঁর চাপ ছিল—যেটুকু লেখাপড়া শিখেছে তাইতেই যা হয় একটা চাকরি যোগাড় ক'রে নিক।

নিজের খরচ নিজে চালাক। সম্ভব হ'লে তাঁদেরও।

হীরার এই স্কুল-ফাইন্যাল-পাসের স্বল্প পুঁজিতে সামান্য কোন চাকরির কথা ভাল লাগে নি। অন্য কথা ভেবেছিল সে।

আলেয়ার সর্বনাশা ফাঁদ পাতা সর্বত্রই।

হীরাও মরীচিকা দেখে ছুটবে এ এমন কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয়।

তার এক সহপাঠিনী ইতিমধ্যে ফিল্‌ম্‌ জগতে এসে গিয়েছিল, একটু নামও হয়েছিল তার।

হীরা তাকেই এসে ধরলে—ওর একটা গতি ক'রে দেওয়ার জন্যে।

নামকরা নায়িকা হবার মতো রূপ তার নেই তা সে জানত। তবু অন্য রকম ভূমিকাও তো আছে!

সে মেয়েটি, মৌসুমি তার নাম—সে হীরাকে ভালবাসত। চেষ্টাও করেছে প্রাণপণে।

হীরাকে নিলে তবে সে নায়িকার 'পার্ট' করবে এই শর্তে দেবুদার প্রথম ছবির চুক্তিতেই সই করেছে।

সে ছবি তখন ওঠে নি, তবে অন্য লোকের মালিকানায় এক সময় শেষ হয়েছে, দেখানোও হয়েছে। ছবি বিশেষ চলে নি—তবু তাতেই মৌসুমের খ্যাতি হয়েছে খুব—কিন্তু হীরা কোন সুবিধা করতে পারে নি।

তৎসত্ত্বেও, মৌসুমের অনুরোধেই আরও একটা ছবিতে নামানো হয়েছে। এবারেও সেই একই ফল।

পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে গেছে যে ঝি, কি বাসনওয়ালী, কিম্বা পথের ধারের ফেরিওয়ালী—এমনি সামান্য ভূমিকা, যাতে অভিনয়ের কিছু নেই—এই ধরনের পার্ট ছাড়া আর কিছু পারবে না হীরা। অর্থাৎ যাতে না প্রয়োজন হবে চেহারার, না প্রয়োজন হবে অভিনয়-দক্ষতার।

কিন্তু এসব পার্ট একটা ছবিতে দুটো-একটার বেশি থাকে না।

একদিনের কাজ, বড় জোর বিশ-পঁচিশ টাকা পাওনা হবে সে দিনের শেষে।

তাতে একটা লোকেরও চলে না। তাছাড়া সব ছবিতে যে সে পার্ট পাবেই, তারও তো কোন নিশ্চয়তা নেই।

এতখানি ব্যর্থতা আশঙ্কা করেন নি হীরা বৌদি।

তিনি একেবারেই চোখে অন্ধকার দেখলেন।

ওধারের আশ্রয় ও পথ ঘুচিয়ে দিয়েই এসেছেন এদিকে।

মামা-মামীর সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে। তাঁরা সাধারণ গৃহস্থ, যে গিয়ে অভিনেত্রীর খাতায় নাম লেখায় তাকে তাঁরা বেশ্যার পর্যায়ে ফেলতেই অভ্যস্ত।

সেকালের সেই ধারণা এখনও তাঁদের মন থেকে যায় নি। তাঁরা আর ওকে আশ্রয় দেবেন না এটা ঠিক।

এখন তাঁর সামনে খোলা আছে একটিই মাত্র পথ—জীবনের রঙ্গমঞ্চে ঝি কি ফেরিওয়ালী কি বাসনওয়ালীর ভূমিকায় নামা।

মেয়েদের আর একটা যে পথ খোলা থাকে—অল্পবয়সী মেয়েদের সে-পথে যাওয়ার পাথেয়ও তাঁর নেই। তিনি রূপসী নন।

তাও ফেরিওয়ালী বাসনওয়ালীর কাজ করার যোগ্যতা আছে কিনা সন্দেহ। ঝিয়ের কাজ ছাড়া হয়ত আর কিছুই পাবেন না, পারবেন না।···

এই সময়েই কী ক'রে ওঁর অবস্থাটা দেবুদার কানে ওঠে। ব্যর্থতার এই শোচনীয় ইতিহাস।

একদিন বুঝি একটা স্টুডিওর বাগানে একটা নির্জন কোণে বসে নীরবে চোখের জল ফেলছিলেন—সে দৃশ্যও চোখে পড়েছে দেবুদার।

আরও শুনেছেন দেবুদা, এখানের একটি বিখ্যাত অভিনেত্রীর কাছে সত্যি সত্যিই দাসীর কাজ চেয়েছিলেন হীরাবাঈ—কিন্তু সে মেয়েটি স্বাভাবিক সঙ্কোচেই রাজী হয় নি।

যে অভিনেত্রী হতে এসেছিল, কোন কোন ছবিতে কাজও করেছে—তাকে দাসী রাখার প্রস্তাবে মন সায় দেয় নি। অন্য নানা রকম সৎ-পরামর্শ দিয়ে ফেরত দিয়েছে সে।

বাড়িতে পেয়িং গেস্ট রাখার কথা বলেছে।

বলেছে ছোটখাটো হোটেল চালানোর কথা—লাইসেন্সহীন প্রাইভেট হোটেল।

তাতে আরও দু'চারটি মেয়ে রাখতে বলেছে।

অর্থাৎ এক কথায়—অপ্রকাশ্য 'ব্রোথেল' খুলতে পরামর্শ দিয়েছে।

হীরা বৌদির মানসিক গঠন অন্য রকম। এ ধরনের কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়।

সুতরাং যেটা সম্ভব সেই কথাই ভাবছিলাম—আত্মহত্যার কথাই।

কিন্তু জীবনের মায়া কিছুতেই বুঝি যেতে চায় না—এ অসহায় কান্না সেই কারণেই।

এই কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আরও—মনস্থির করে ফেলেছেন দেবুদা।

ভালবেসে নয়, অন্য কোন মতলবে নয়—স্রেফ করুণা বা সহানুভূতিতেই স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছেন, রীতিমতো রেজেস্ট্রী ক'রে বিয়ে করেছেন হীরাবাঈকে।

তবে বলে দিয়েছেন সেই সময়ই যে, 'সাহেবদের বিয়েতে পাদ্রীরা মন্ত্র পড়াবার সময় বলে দেয়, ফর বেটার অর ফর ওয়ার্স'—তোমরা আজ থেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'লে। তার মানে সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী হ'তে হবে, সুখের সঙ্গে দুঃখ পাওয়ার জন্যেও প্রস্তুত থেকো—জীবনের অংশীদার—আনন্দ-বেদনার অংশ সমান ভাবে ভাগ ক'রে নিতে হবে।···আমি আজ নিঃস্ব, সুখ বিলাস এমন কি স্বাচ্ছন্দ্যও আশা ক'রো না এ বিয়েতে। কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে। কঠিন জীবনযুদ্ধের জন্যে যদি প্রস্তুত থাকো তবে আমার কাছে এসো। তোমাকে আমি মাথায় ক'রে নিয়ে যাবো।'

সানন্দেই রাজী হয়েছেন হীরা বৌদি। যে ঝিয়ের কাজই খুঁজছে সে স্বামীর ঘরে সম্মানের মধ্যে পরিশ্রম করতে, কষ্ট করতে পিছুপাও হবে কেন?

এই ঝুঁকি নেওয়ার জন্যে জীবনে কোনদিন দুঃখিত হন নি—আজ দাম্পত্য-জীবন শেষ ক'রে, সেই কথাটাই যেন উচ্চৈঃস্বরে জানিয়ে দিতে চাইলেন হীরা বৌদি।

'সুখ-দুঃখ ভাগ্যের কথা ভাই। রাজার ঘরে পড়লেও লোকে সুখী হয় না। সীতা-দ্রৌপদীর কথাটাই মনে করুন না। জীবনভোর দুঃখই পেয়ে গেছেন—মানে পার্থিব ভোগ-বিলাস সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিক দিয়ে বলছি। আমিও অনেক দেখেছি, বিপুল সম্পত্তি দেখে বাবা বিয়ে দিলেন, শেষে সেই মেয়েকে স্বামী থাকতেই পরের কাছে সাহায্য চাইতে হয়েছে, যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিয়েছে স্বামী।'

একটু থেমে আবার বলেছেন, 'আমি সাংসারিক দুঃখ কষ্ট যা-ই পেয়ে থাকি, স্বামী-সুখ পেয়েছি যথেষ্ট। সেদিন অপাত্রে বিশ্বাস করি নি—মানুষকেই বিয়ে করে-ছিলুম। বিপদে পড়েছি, একেবারে সহায়সম্বল নেই, সামনে উপবাস বা আত্মহত্যা ছাড়া কোন পথ খোলা ছিল না—সেই সময় উনি এই প্রস্তাব দিতে বর্তে গেছি, হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেয়েছি; রাজী হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না কিছু—ওর থেকে অনেক খারাপ কোন লোক, চরিত্রহীন চোর জোচ্চোরও কেউ এ প্রস্তাব দিলে রাজী হ'তে হ'ত—কিন্তু এখানে রাজী হয়ে ঠকি নি বিন্দুমাত্রও। ঐ রকম যদি স্বামী পাই, জন্ম জন্ম এ দুঃখ এ কষ্ট ভোগ করতে প্রস্তুত আছি। অমন মন দেবতাদেরও হয় কিনা সন্দেহ। এমন উদার স্নেহশীল মানুষ—আমি তো জীবনে দেখি নি। কাউকে কখনও দোষ দেন নি, কারও নিন্দা করেন নি, কাউকে কোন দিন অবিশ্বাস করার কথা ভাবতেও পারতেন না, বার বার ঠকেও।···আর অমন ভালবাসতেও কেউ পারবে না। আমাকে, ছেলেদের বিলাসে ভোগে রাখতে পারেন নি, সব দিন খেতেও দিতে পারেন নি কিন্তু ভালবাসায় সব অভাব সব ফাঁক পুরিয়ে দিয়েছেন। এই বয়সেই ছেলেমেয়েরা ওঁর বন্ধু হয়ে উঠেছিল।'

না, কী করতেন—মানে বিবাহ পরবর্তীকালে, ছবির বাজার থেকে বিতাড়িত হবার পর—তা বৌদি জানেন না।

জানবার চেষ্টাও করেন নি কখনও।

প্রশ্ন করার কথা মনেও পড়ে নি।

অকূল পাথারে ভাসতে ভাসতে এমন পরমাশ্চর্য কূল পেয়েছিলেন, তার ফলে সেই যে প্রথম প্রেম আর নবীন অভিজ্ঞতায় বিস্ময়ের ঘোর লেগেছিল চোখে, সেই যে মুগ্ধতা ও বিহ্বলতা বোধ করেছিলেন—সে বিস্ময়, সে মোহ, সে অননুভূত-পূর্ব আনন্দ-রসাস্বাদনের নেশা এতকালের মধ্যেও কাটে নি!

ঐ স্বামীকে পেয়ে উনি সংসার, পৃথিবী, অন্য সমস্ত চিন্তা—সব যেন ভুলে গিয়েছিলেন। স্বামী কি করেন এ তুচ্ছ তথ্য নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর পান নি।

স্বামী তো তাদের কথা ভাবছেনই, তাদের সুখে রাখার জন্যে প্রাণপাত করছেন—কোনমতে সম্ভব হলেই তাদের অধিকতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবেন—এ যখন জানেন, স্থির বিশ্বাস আছে—তখন সেটা কীভাবে করবেন, আদৌ সে ব্যবস্থা করার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা—মিছিমিছি এ স্থূল বাস্তব চিন্তা নিয়ে নিজেকে অকারণে ব্যস্ত উৎপীড়িত করবেন কেন?

তাছাড়া বোধ হয় এই ভাবে স্বামীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে একটা আনন্দও বোধ করতেন বৌদি।

তবে এখন মনে হয়—সে-সময়ও ঐ রকমই একটা ধারণা ছিল যে, উনি কোন-না-কোন ব্যবসাতেই লেগে থাকতেন, লেগে থাকার চেষ্টা করতেন।

কারণ ব্যবসার কথাটাই বেশী শোনা যেত তাঁর মুখে—ঐ সংক্রান্ত নানা কথা।

পুঁজি ছিল না, সেজন্যে অনেক ঘুরতে হ'ত, মেহনত করতে হ'ত—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিষ্ফল হ'ত সে পরিশ্রম—তবু ঐ পথেই গেছেন চিরদিন, চাকরি করার কোন চেষ্টা করেন নি।

বলতেন, 'ও বাঁধা-সময় বাঁধা-কাজ আমার ভাল লাগে না। ও আমি পারব না।...আর এই বয়সে সাধারণ গ্র্যাজুয়েট কী চাকরিই বা পাব? তাতে কি সংসার চলবে এ বাজারে? শুধু শুধু জাতও যাবে পেটও ভরবে না।'

তবে যা-ই করুন, ব্যবসা বা দালালী বা অন্য কিছু—নিরবচ্ছিন্ন অভাবে কি দুঃখকষ্টে কাটে নি ওঁদের জীবন।

মাঝে মাঝে কোথা থেকে দমকা টাকা এসে পড়ত।

কোথা থেকে আসত তা বৌদি কখনও প্রশ্ন করেন নি।

যেমন—'কেন, আসছে না' এ প্রশ্নও করেন নি কোনদিন।

নিজে থেকেই বলতেন মাঝে মাঝে, খুব ভারিক্কি চালে—'বিজনেসে আপ্‌স্ অ্যান্ড ডাউন্‌স্ আছেই। তা নিয়ে যারা চিন্তা করে তারা ইডিয়ট। এ লাইনে কখনও রাজা কখনও ফকির হ'তে হয়—সে তো সবাই জানে।'

তবে টাকা যখন হাতে আসত—তখন আর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতেন না, বিগত দুঃখদিনের কথা স্মরণ ক'রে সতর্কও হতেন না।

জীবনে কখনই হিসেব ক'রে চলেন নি, টাকা গুনে খরচা করেন নি।

শত দুঃখ-অভাবেও এ বিষয়ে সচেতনতা আসে নি তাঁর।

টাকা হাতে এলেই চলে গেছেন, টাকার অঙ্ক দেখে কতটা সাধ্য হিসেব ক'রে —কাশ্মীর, উটি, দার্জিলিং, শিলং।

ফার্স্ট ক্লাসেই গেছেন, কখনও কখনও এয়ার কণ্ডিশ্যান্‌ড্‌ গাড়িতেও।

সেখানে পেঁছেও—'পশ' হোটলে যাকে বলে, মহার্ঘ বড়লোকের হোটেলে উঠেছেন।

রাশি রাশি টাকা খরচ করেছেন, বাঁধা ট্যাক্সিতে ঘুরেছেন, মোটা মোটা টাকা বকশিশ দিয়েছেন হোটেলের বয় ট্যাক্সিওয়ালা দারোয়ান ইত্যাদিকে—

দেবেন বলে হিসেব ক'রে বা বড়মানুষী দেখাতে দেন নি, ঐ রকমই স্বভাব ছিল তাঁর, ওটা জীবন-অভ্যাসের অঙ্গ হয়ে গিছল।...

কলকাতাতেও নিয়ে গিছলেন একবার।

সোজাসুজি গ্র্যাণ্ড হোটেলে উঠেছিলেন।

ঢাউস গাড়ি দিনরাতের হিসেবে ভাড়া ক'রে—কলকাতাই নয় শুধু—আশ-পাশের সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়েছেন।

গেছেন অনেক জায়গাতেই। ডায়মণ্ডহারবার থেকে জয়রামবাটি। ওদিকে বোলপুর। নিজের জন্মস্থান, পৈতৃক বাড়িটাও দূর থেকে দেখিয়েছেন।

সেখানে এখন কে এক মারোয়াড়ী থাকেন, ভেতরে ঢোকা সম্ভব হয় নি।

এভাবে খরচ করলে কুবেরের ঐশ্বর্যও চিরস্থায়ী হয় না।

দীর্ঘস্থায়ীও না।

ফলে, এই রকম হঠাৎ-নবাবীর পর, আবার হয়ত দীর্ঘদিন টানা অভাব ও দারিদ্র্য গেছে।

কিন্তু সেটা না দেবুদা না হীরা বৌদি কেউই আমলে আনেন নি।

সে কষ্ট গায়ে মাখেন নি।

শুধু কেন যে শেষ পর্যন্ত দিল্লীতে এলেন, কিসের আশায়—সেইটেই বুঝতে পারেন না বৌদি।

বোম্বের পর এইখানেই স্থায়ীভাবে বাস করতে এলেন কেন—কে কি মতলব দিয়েছিল—তা আজও জানেন না।

অবশ্য কোনদিন জিজ্ঞাসাও করেন নি।

চিরদিন নির্বিচারে মেনে নিয়েছেন দেবুদার সমস্ত খেয়াল—হয়ত বা নির্বুদ্ধিতাই।

মানতে অভ্যস্ত। অভ্যাস ক্রমশঃ স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়।

দিল্লী কিন্তু দেবুদাকে হতাশ করেছে। এখানে এসে পর্যন্তই এই একটানা দারিদ্র্য গেছে। কোথাও কিছু সুবিধা করতে পারেন নি।

মধ্যে যে দু'একশ টাকা আনতেন—তখন বুঝতে পারেন নি হীরা বৌদি, এখন মনে হয়—তার বেশির ভাগই ধার।

একটা লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের এজেন্সী ছিল, কিন্তু এখানে ওঁর চেনা লোক

খুবই কম, কাজেই সেটাও বিশেষ কাজে লাগাতে পারেন নি।

এদিক দিয়ে খুব একটু মুখ-চোরাও ছিলেন, বোধ হয়।

খুব একটা ভাল 'বিজনেস' কখনই দিতে পারেন নি।

কখনও-সখনও, দৈবাৎ, হয়ত ত্রিশ-চাল্লিশ টাকার এক-আধখানা চেক এসেছে ডাকে।

শেষের দিকে তাও আর আসত না।

ইদানীং সর্বত্র বিফল হয়ে, শুধুই ঘুরতে ঘুরতে—এখানে আসার বছর দুই পর—মনটা একটু যেন ভেঙে এসেছিল, হতাশ হয়ে পড়েছিলেন একটু একটু ক'রে। আর কিছু হ'ল না, জীবনে কিছু করতে পারলেন না—এই ভাবটা বড় বেশী ফুটে উঠেছিল ওঁর পরিশ্রান্ত হতোদ্যম চেহারায়।

মনে হয় তাতেই—দেহটাও ভেঙে আসছিল।

ভেঙে এসেছিল ভেতরে ভেতরে।

সেটা হীরা বৌদিও বুঝতে পারতেন, লক্ষ্য করেছিলেন।

তবে তাই বলে যে, এইভাবে একেবারে শেষ হয়ে এসেছিল সমস্ত প্রাণশক্তি, সে আশঙ্কা একবারও করেন নি।

কে আছে দেবুদার? আত্মীয়স্বজন?

এ প্রশ্নের উত্তরেও সেই অপ্রতিভের মতো চেয়ে থেকেছেন হীরা বৌদি। ম্লান-মুখে ঘাড় নেড়েছেন।

তিনি কিছুই জানেন না, কাউকে চেনেন না।

আর কাউকে চেনার প্রয়োজন আছে তাও ভাবেন নি।

শুনেছেন ওঁর অনেক আত্মীয় আছেন।

নিকট-আত্মীয়ই তাঁরা। ভাই, মামা, বোন, ভগ্নীপতি।

তারা বেশির ভাগই ধনী। প্রতিষ্ঠিত।

বড় বড় চাকুরে অনেকে। কেউ কেউ খুবই বড় কাজ করেন। বড় ভগ্নীপতি নাকি বড় উকীল ছিলেন, এখন কোথাকার জজ হয়েছেন। এক মামাতো ভাই যেন কোথায় ডেপুটি হাই কমিশনার হয়ে গিছলেন। এক ভাই সরকারের আইন-পরামর্শদাতা।

কিন্তু বৌদি তাঁদের কাউকেই দেখেন নি কোন দিন।

কোন সম্পর্কই রাখেন নি দেবুদা তাঁদের সঙ্গে।

সম্পর্ক রাখেন নি কোন পক্ষই।

কোনদিন তাঁরাও কেউ খবর নেন নি এক কলম চিঠি দিয়ে, দেবুদাকেও কোন দিন চিঠি দিতে দেখা যায় নি।

বাইরের দিক থেকে তো বটেই—মনের মধ্যেও দুস্তর দূরত্ব রচিত হয়ে গিয়েছিল।

অনেকটা সরে গিছলেন পরস্পর থেকে।

শুধু বিষয়-সম্পত্তি বিক্রী ক'রে দিয়ে চলে এসেছেন বলেই নয়—আরও কিছু

হয়েছিল—কোন বিশেষ তিক্ততার কারণ ঘটেছিল নিশ্চয়।

যতই অনভিজ্ঞ আর উদাসীন হোন—এটুকু বুঝতে পারেন বৈকি হীরা বৌদি।

তবে সে তিক্ততা কি, কেন তা দেখা দিল—কোনদিনই সে-প্রশ্ন করেন নি।

হীরা বৌদির আশ্চর্য বিশ্বাস ছিল স্বামীর ওপর, আজও আছে যে, যাকে সত্যকার অন্যায় বলে বা পাপ—তা দেবুদা কোনদিন করতে পারেন না।

টাকা ধারের কথাটা এ পর্যায়ে পড়ে না।

দু' একশো টাকা ধার নিয়ে না দিতে পারা এমন কোন ঘৃণ্য অপরাধ নয়—যারা দিয়েছে তারা সকলেই অবস্থাপন্ন, ঐ ক'টা টাকা না পেলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

শোধও যে একেবারে করেন নি তা নয়। করেছেন বলেই আবার ধার পেয়েছেন।

'কিন্তু ঐ যে ভদ্রলোক বললেন,' 'সোজাসুজি প্রশ্ন করি এবার, 'এক স্ত্রী ফেলে পালিয়ে আসা? বিনা দোষে? গর্ভবতী স্ত্রী?…সেই জন্যেই নাকি আত্মীয়-স্বজনরা মুখ দেখত না?'

কথাটা অনেকদিন ধরেই মনের মধ্যে ঠেলাঠেলি করছিল, প্রশ্ন না ক'রে থাকতে পারলুম না।

প্রশ্ন শুনে অরুণবর্ণ হয়ে উঠেছিল হীরা বৌদির মুখ—তবে কোন প্রবল প্রতিবাদ করেন নি, কি কঠিন কথা বলেন নি।

কঠিন কথা বোধহয় কোন দিনই বলতে পারেন না, নিরন্তর ভাগ্যের কাছে মার খেয়ে খেয়ে স্বভাবটা ভীতু আর শান্ত হয়ে গেছে।

শুধু আস্তে আস্তে বলেছিলেন, 'কী জানি। কখনও তো শুনি নি ওঁর মুখে। অবশ্য ওঁর দিকের কোন আত্মীয়ের সঙ্গে তো কখনও পরিচয়ও হয় নি।…বললে এক উনিই বলতে পারতেন। এমনি ছেলেবেলার গল্প অনেক করেছেন—প্রায়ই করতেন। ভাইবোনদের কথাও বহু বারই বলেছেন। কিন্তু কেন যে বোম্বাইতে আসার পর তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না, তা কোনদিন বলেন নি। আমিও জিজ্ঞাসা করি নি কখনও, আমার মনে হ'ত যে আমাকে বিয়ে করেছিলেন বলেই তারা সবাই বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন।…তাই তো হয়।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন বৌদি যে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার অনেক আগেই উনি কলকাতার পাট চুকিয়ে দিয়ে বিষয়সম্পত্তি বেচে চলে এসেছিলেন। তখনই তাদের সঙ্গে, মানে ভাইবোন-ভগ্নীপতিদের সঙ্গে কাটানছিড়েন হয়ে গিছল।'

'কি জানি ভাই। বিষয়সম্পত্তি বেচে আসা এক জিনিস, আর সম্পর্ক তুলে দেওয়া অন্য। কেবলই নিজেকে অপরাধী মনে হ'ত, মনে হ'ত আমার বরাতে ওঁর এই দুর্গতি, পাথরের মতো চেপে বসেছি ওঁর উন্নতির মুখে—তাই কোন দিনই ভরসা ক'রে ওকথা তুলি নি। উনিও বলেন নি।'

এই বলে—একটুখানি চুপ ক'রে বসে থেকে, যেন অতীত জীবনের মধ্যে কী খানিকটা হাতড়ে বেড়িয়েছেন, তার পর মুখ তুলে বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই বলেছেন, 'তবে এও জানি—এ ধরনের কোন গর্হিত কাজ যদি তিনি ক'রে থাকতেন—আমার কাছে গোপন করতেন না। সে স্বভাবই ছিল না তাঁর। আমি তো ভাই এ দুর্নাম বিশ্বাস করতে পারছি না।'

তা করুন বা না-ই করুন, মূল প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

এখন এদের উপায় ?

এবার সেই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি না দাঁড়ালে উপায় নেই।

বর্তমানে ভয়াবহ সমস্যার ফয়সালা না করতে পারলে !

বললুম, 'আচ্ছা—আপনি দেবুদার কোন ভাই কি কাকা কি ভগ্নীপতি—কারও নাম জানেন ? কি ঠিকানা ?'

'না।' বৌদি ঘাড় নাড়লেন, 'বলেছেন দু-একবার কিন্তু মনে নেই।'

'ঘরে কোন কাগজপত্র নেই—পুরনো চিঠিপত্র ? যা থেকে কারও নাম-ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে ?'

'মনে তো হয় নেই। কেউই তো কখনো কোন চিঠি দেয় নি কোনদিন, মানে আত্মীয়স্বজন কেউ। এমনি বন্ধু-বান্ধব, ব্যবসার সম্পর্কে পরিচিত অনেকে দিয়েছে। তা বিশেষ রাখতেন না। দু'চারখানা জমতে একদিন চোখ বুলিয়ে কোনোটা বেশী দরকার কিনা দেখে তেমন বুঝলে সেটা রেখে বাকীগুলো ছিঁড়ে ফেলতেন।···তাও এখানে এসে তো সে রকম চিঠিও আসা বন্ধ হয়েছিল।··· পারিবারিক চিঠি আমি তো কোন দিনই দেখি নি। যদি আগে কিছু এসেও থাকে—সে হয়ত ওঁর বড় ট্রাঙ্কটায় ছিল। দিল্লী আসার আগে সেটার কাগজপত্র সব বার ক'রে ফেলে দিয়ে তাতেই বাসন কোসন টুকিটাকি সংসারের জিনিস পুরে এনেছিলেন। সে চিঠিপত্রে আর কিছুই নেই।'

আবার একটু থেমে—ঈষৎ যেন অভিমানের সুরেই বলেছেন, 'আর নাম-ঠিকানা পেলেও—যারা কোনদিন একবারের জন্যেও খোঁজ নিলে না—তাদের কাছে দুঃখ-দায় জানিয়ে হাত পাতা কি উচিত হবে ?'

এবার একটু রূঢ় কথা বলতে বাধ্য হলুম হীরা বৌদিকে।

এত অবোধ হলে পৃথিবীতে বাস করা যায় না।

বাস্তব অবস্থাটা সম্বন্ধে সচেতন করতেই কঠিন আঘাত দিতে হ'ল একটু।

বললুম, 'বৌদি, অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন, কিছুই নেই ঘরে, একখানা কাঁসার বাসন পর্যন্ত নেই যে বেচে দুটো টাকা পাবেন ; আপনার যা লেখাপড়া তাতে এই বয়সে চাকরি পাবার আশা একেবারেই দুরাশা বলে ধরে রাখা ভাল ; এখনকার যা দিনকাল—আমাদের অবস্থা কারুরই তেমন ভাল নয়—শোচনীয় বলাই উচিত, ডাইনে টানতে বাঁয়ে কুলোয় না—কে আপনার ভার বইবে বলুন ? একাও নন আপনি, একটা গোটা সংসার চলবে কিসে ? সামনে তো ভিক্ষা ছাড়া

কোন পথই নেই। বড়জোর সেটাকে সাহায্য নাম দিতে পারেন। সে চেষ্টাও যে করি নি তা নয়, এখানে যে সব দাতব্য ফাণ্ড্ আছে তারও দু'চারটে ট্যাপ্ করে দেখেছি—কিন্তু এখনও একটা থেকেও কিছু বার করতে পারি নি। যদি দেয়ও—হয়ত একবারই কিছু দেবে, অনেক ঘুরিয়ে অনেক টালবাহানা ক'রে। পরে আর তাদেব কাছ থেকে কিছু বার করা যাবে না। তখন সোজাসুজি তো ভিক্ষেতেই বেরুতে হবে বৌদি।···মাপ করবেন এত রূঢ় কথা বলছি বলে, কিন্তু সত্যটা সহজ-ভাবে মেনে নেওয়াই ভাল। আর, ভিক্ষেই যদি করতে হয়—আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে, ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া—ইংরেজীতে বলে, এ বেগার কান্‌ট্ বি এ চুজার, ভিখারীর দানের জিনিস বেছে নেওয়া সম্ভব নয়—সে ক্ষেত্রে কে দিচ্ছে, কার কাছে হাত পাতছি, অত বাছবিচার করা যায় না। ···যতই হোক, তাদের বংশের ছেলে, এরা যদি পথে বসে ভিক্ষে করে তাদেরই মাথা হেঁট।'

বৌদি মাথা নিচু ক'রে স্থির হয়ে বসে রইলেন।

একটা কথাও আর বললেন না।

বলতে পারলেন না।

জলও বুঝি আর পড়ে না চোখ দিয়ে। সব শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে। সমস্ত অনুভূতিই।

আমারই বরং কথাগুলো বলে ফেলার পর অনুশোচনার অন্ত রইল না। কিন্তু তখন আর ফেরার পথ নেই।

হাতের পাশা আর মুখের কথা—একবার পড়ে গেলে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

তাঁকে আঘাত দিতে গিয়ে আমিই আহত হয়ে ফিরে এলাম।

॥ সাত ॥

তিন-চার দিন পরে একটা সকালে—বৌদিই ছুটে এলেন বলতে গেলে।

সেই সকাল বেলা!

—এবং এইভাবে আসা!

বুকের মধ্যেটায় ছাঁৎ করে ওঠে যেন।

সারা পথটাই এই রোদ্দুরে হেঁটে হেঁটে এসেছেন, বেশ জোরেই এসেছেন হয়ত—নইলে আমার দেখা পাবেন না এই আশঙ্কায়। অবিরাম ঘামে যেন পাঙাশ বর্ণ ধারণ করেছেন ভদ্রমহিলা।

'কী ব্যাপার—এমনভাবে? আবার—' রমাই প্রথম প্রশ্ন করে, কিন্তু অলুক্ষুণে কথা বলেই শেষ করতে পারে না।

'আবার কি হ'ল?' বোধহয় এই প্রশ্নই করতে যাচ্ছিল।

বৌদি একটু চুপ করে থেকে খানিক দম নিয়ে উত্তর দিলেন—আমার দিকে চেয়েই—'ওঁর সেই ভগ্নীপতি, আমার কে হবেন যেন—নন্দাই বলেন না আপনারা?

—অবশ্য সে আত্মীয়তা দাবি করার সাহস আমার নেই—এমনিই বলছি—হঠাৎ তাঁর নামটা আমার মনে পড়ে গেছে।...তাঁর নাম আর ওঁর পরের যে ভাই, আমার দেওর—তার নামও। এমনিতে কথা প্রসঙ্গে তো অনেকবারই বলেছেন, তবে সে ডাক নামগুলোই ব্যবহার করতেন, গেনু আর পেবা বলতেন। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম আসল নামগুলো কি—উনি হাসতে হাসতে বলেও ছিলেন। একদিন, ঐ একবারই। মনে ছিল না। হঠাৎ কাল শুয়ে শুয়ে মনে পড়ল—ক'দিনই ভাবছি তো—দেওর হ'ল জ্ঞানপ্রিয় আর নন্দাই প্রবীর রায়চৌধুরী। তবে ঠিকানা কখনও বলেন নি, জানিও না। পৈতৃক বাড়িটা দেখিয়েছেন বটে, সেও কোথায় এখন আর বলতে পারব না। তাছাড়া সে বাড়ি তো ওঁরা এ মারোয়াড়ীকে বেচে দিয়েছেন।'

খবরটা দিয়েও একটু অপ্রতিভ ভাবে চেয়ে থাকেন।

এর কোন মূল্য আছে কিনা, এ সংবাদ কোন কাজে লাগবে কিনা—সে সম্বন্ধে ওঁরই সন্দেহ হয়।

এটাকে একটা খবর মনে করায় না ধৃষ্টতা প্রকাশ পেয়ে থাকে—এ আশঙ্কাও।

'দেখি। সর্বনাশ সমুৎপন্ন হ'লে পণ্ডিতরা অর্ধেকেই খুশী থাকেন।' আশ্বাস দিয়ে বলি ও'কে, 'তবু তো একটা সূত্র পেলুম। এতেই কোন খোঁজ পাই কিনা দেখি একটু চেষ্টা ক'রে।'

জ্ঞানপ্রিয়র কোন খোঁজ পাওয়া সম্ভব নয়।

তবে প্রবীর রায়চৌধুরী শুনেছি জজ—হাইকোর্টের কি সিটি-সিভিল-কোর্টের—কিম্বা ডিস্ট্রিক্ট জজ তা না জানলেও—খুঁজে বার করা একেবারে অসম্ভব হবে না। সরকারী আপিসে যখন কাজ করি, বিশেষ পররাষ্ট্র দপ্তরে, তখন সরকারী পথগুলোর সাহায্য পাবো বৈকি।

অন্য দপ্তরের লোকেরা না পাক, আমরা চিঠি লিখে উত্তর আদায় করতে পারব।

দ্বিতীয় চিঠিখানা কড়া ক'রে দিলেই জবাব বেরিয়ে আসবে। আমাদের দপ্তরের কিছুটা অগ্রাধিকার তো আছেই।

পেলামও খবর। আশ্চর্য রকম তাড়াতাড়ি, সরকারী আপিসের হিসেবে—মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই খবর পেয়ে গেলুম।

কোথায় কাজ করেন, কোথায় থাকেন—ঠিকানা, টেলিফোন-নম্বরসহ।

টেলিফোন টেলিগ্রাম ক'রে লাভ নেই, সে সময় পেরিয়ে গেছে। চিঠিই দিলুম একখানা। বিস্তারিত খবর দিয়ে—বিস্তৃত চিঠি।

মোটামুটি সংক্ষেপে দেবুদার ইতিহাস, তাঁর বিবাহের কাহিনী, ব্যবসায়িক ব্যর্থতা, ইদানীংকার দুর্গতি ও মৃত্যুর বিবরণ—বর্তমানে কী অবস্থায় ও কোথায় দেবুদার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা আছে—জানিয়ে দিলুম।

একেবারেই ভিক্ষার ওপর আছেন বলতে গেলে। কিন্তু বেশী দিন যে তাও মিলবে না—বাসের ধারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতে হবে—সে কথাটাও রূঢ় স্পষ্টতার সঙ্গে লিখে দিলুম।

খবর এল দিন-তিনেকের মধ্যেই।

এত দ্রুত আসবে তা আমরা কল্পনাও করি নি।

এবং এমন অনুকূল খবর।

টেলেক্সে একটি বার্তা এসে পৌঁছল। অতি সংক্ষিপ্ত—সংক্ষিপ্ততমও বলা চলে, এই ক্ষেত্রে।

"You need not worry. We shall do the needful"

তবে এই 'নীডফুলে'র ব্যবস্থাটা এত দ্রুত হয় নি।

হবে তা আশাও করি নি।

খোঁজ-খবরে সময় লাগবে তা জানতুম।

অবশ্যই আমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন নি। কেনই বা করবেন ? এখানকার পুলিসকে খোঁজখবর করতে বলেছিলেন জজ সাহেব।

তবে সেটা ত্বরান্বিত করার চেষ্টাতেও কোন ত্রুটি রাখেন নি।

যাতে দ্রুত খবর নেওয়া ও সে খবর তাঁর কাছে পাঠানো হয় সেজন্যে তিনি নগর কোটাল বা পুলিসের বড় কর্তাকে ব্যক্তিগত চিঠি দিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরে।

বড় কর্তা ভার দিয়েছিলেন এস-পি হরদীপ বাহেলকে—আমার দীর্ঘকালের বন্ধু, তার কাছ থেকেই পেলাম ভিতরের সংবাদটা।

বলা বাহুল্য হরদীপ আমারই শরণাপন্ন হয়েছিল। আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে বৌদির সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট, অন্য কাগজপত্র—দেবুদার বি এ. ডিগ্রীটা তখনও ছিল—সব দেখিয়ে, এ যে আসল লোক, উক্ত দেবপ্রিয়রই স্ত্রী—বিশ্বাস করিয়ে ছেড়ে দিলুম।

এর পর আর দেরি হয় নি।

এই রিপোর্ট পাওয়ার তিন-চার দিনের মধ্যেই দুশো টাকার একটা টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার এসে পৌঁছল।

সেই সঙ্গে সেই ফর্মেই দু ছত্র বার্তা, 'ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে ভর্তি করো, বাড়তি যা খরচা হবে আমাকে জানাও।'

এবং সে টাকাও—হিসেব পাওয়া মাত্র পাঠিয়েছেন তাঁরা।

সেও টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডারই।

এর পর থেকে প্রায় ঘড়ির কাঁটা ধরেই টাকাটা আসতে লাগল—প্রতি মাসের দু'তিন তারিখের মধ্যে।

কদাচিৎ পাঠাতে দেরি হয়ে গেলে টেলিগ্রাফেই আসত—ঐ সময়টা লঙ্ঘিত হ'ত না কোনমতেই।

হীরা বৌদিও বাসা বদল করলেন না, কারণ ঐ টাকাতে বেশী ভাড়া টানা চলতও না—ছেলেমেয়েদের কাছাকাছি যা ভাল ইস্কুল সেইখানেই ভর্তি ক'রে দিলেন।

আমাদের দু'একজনের চেষ্টায় তিনজনেই ফ্রী হয়ে গেল।

ভর্তি হওয়ার খরচা ও বইখাতা বাবদ যা প্রয়োজন, তা ছাড়া আরও শ দেড়েক টাকা দরকার হয়েছিল, পোশাক শয্যা ইত্যাদি বাবদ—কার ও সব কিছুই ছিল না —সে পাঠিয়েছিলেন প্রবীরবাবু, চিঠি পাওয়া মাত্র। যদিচ এর মধ্যে এক ছত্রও হাতে লেখা চিঠি পান নি হীরা বৌদি এদের কাছ থেকে।

কিন্তু তখন নিরন্ধ্র অন্ধকার ভবিষ্যৎ থেকে ত্রাণ পাওরার স্বস্তিতে ও ছেলে-মেয়েদের মানুষ করার সম্ভাবনার কৃতজ্ঞতাতে এই সামান্য তথ্য হীরা বৌদি বোধ করি লক্ষ্যও করেন নি।

লক্ষ্য করার প্রয়োজনও হয় নি। উনিও বিশেষ দরকার না বুঝলে লিখতেন না, তাঁরাও সেই লেখার উত্তর হিসাবেই তৎক্ষণাৎ টাকাটা পাঠিয়ে দিতেন। সেই তো যথেষ্ট।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি কখনই আর।

বোধ হয় ওঁরা বুঝে নিয়েছিলেন যে বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষা চাইবার মানুষ হীরা বৌদি নন।

পরে শুনেছিলাম, সেও আমাদের এক পরিচিত ভদ্রলোকের মারফৎ হঠাৎ আবিষ্কৃত হ'ল, তিনি জ্ঞানপ্রিয়র খুব অন্তরঙ্গ—যে, এই টাকাটা এঁরা নিজেদের পরিবারের মধ্যে থেকে 'পুল' ক'রে পাঠান।

দুই ভাই মিলে দেয় একশ,' ভগ্নীপতি বাকী একশ' দিয়ে দু'শ টাকা পুরিয়ে দেন। বাড়তি টাকাও ঐ ভাবেই আসে।

বাড়তি টাকা অবশ্য আরও আসত মধ্যে মধ্যে। অযাচিত টাকা।

পুজোয় একশ' টাকা পাঠাতেন দেবুদার বোন বিষ্ণুপ্রিয়া—তার নামেই আসত অন্ততঃ—নববর্ষে একশ' টাকা দিতেন দেবুদার এক কাকা। ঐ কাকাই তখনও জীবিত ছিলেন--হরিপ্রিয় নাম। এই কাকা নাকি দেবুদাকে ছেলেবেলায় খুব ভালবাসতেন, হীরা বৌদি সে কথা অনেকবার শুনেছেন দেবুদার মুখে।

এছাড়া প্রথম বছর শীতেও বিষ্ণুপ্রিয়ার নামে শ'খানেক টাকার মনিঅর্ডার এসেছিল—তার সঙ্গে অবশ্যই কোন চিঠি আসে নি—ঐ ফর্মের কুপনেই নৈর্ব্যক্তিক ভাবে বিনা সম্বোধনে বিনা স্বাক্ষরে দু'ছত্র লেখা—'ছেলেমেয়ের শীত-বস্ত্রের জন্য'।

আরও আসত, জুলাই মাসে নতুন সেশনস্-এর মুখে নতুন বইখাতা বাবদ আরও একশ' সওয়াশ' টাকা আসত—যেমন প্রয়োজন হ'ত যে বারে—সেটা প্রবীরবাবুর নামেই পাঠানো হ'ত, সবাই ভাগ ক'রে দিতেন কিনা জানি না।

টাকাটা আসাই বড় কথা, কে দিল জেনে লাভ কি ?

সমগ্র ভাবে পরিবারের কাছেই কৃতজ্ঞ থাকতেন বৌদি।

আর হয়ত প্রতীক্ষা করতেন, কবে ছেলেরা মানুষ হবে। যখন এ দান আর নেওয়ার প্রয়োজন থাকবে না।

অবশ্য ছেলেমেয়েগুলোও সত্যিই ভাল, বাড়িতে প্রাইভেট টিউটরের দরকার

হ'ত না, নিজেরাই পড়ে ভাল ভাবেই পাস ক'রে যেত ফি বছর।

ঐ বয়সেই কেমন ক'রে যেন একটা আত্মসম্মান-বোধও গড়ে উঠেছিল ওদের।

এ টাকাটা নেওয়ার মধ্যে যে অগৌরব, সে সম্বন্ধে সচেতন থাকত সর্বদা।

বইখাতার ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকত ওরা, যতটা পারত কম খরচে চালিয়ে নিত, পুরনো বই ইত্যাদি যোগাড় ক'রে নিয়ে।

কখনও-সখনও দরকার হলে—ছোটখাটো বইগুলো—বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে খাতায় লিখে নিত, দীর্ঘ রাত জেগেও।

কিন্তু বছর দুই পরে অকারণ একটা আঘাত খেলেন হীরা বৌদি, নিজে থেকে গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া যাকে বলে।

উনি এ কাজ করতে যাচ্ছেন জানলে আমি নিষেধ করতুম।

আসলে ছেলেমেয়েদের আগ্রহেই লিখতে হয়েছিল ওঁকে।

উনি অত বুঝতেও পারেন নি যে এতে কোন ধৃষ্টতা প্রকাশ পাচ্ছে।

মানুষ চেনার মতো এত বুদ্ধি বা শিক্ষা ওঁর ছিল না।

ছেলেমেয়েদের তো থাকবেই না। চোখের দৃষ্টিতে বক্রতা আসার বয়স তখনও হয় নি।

কৃতজ্ঞতা থেকেই ঐ উচ্ছ্বাসটা প্রকাশ পেয়েছিল আরও।

সে-বছর তাদের পরীক্ষার ফল খুবই ভাল হয়েছিল। ওদের সেই প্রোগ্রেস রিপোর্ট পাঠিয়ে—তাঁরাই যখন খরচা দিচ্ছেন তখন পাঠানোই উচিত, অর্থটা অপব্যয় হচ্ছে না সেটা জানানো দরকার—হীরা বৌদি প্রবীরবাবুকে লিখেছিলেন যে, ছেলেমেয়েরা ওদের কাকা দুজন এবং পিসেমশাইকে কখনও দেখে নি, খুব দেখার ইচ্ছা একবার। সামান্য কিছু টাকা পাঠালে—থার্ড ক্লাসেই যাবেন—ওঁরা একবার গিয়ে দেখা ক'রে আসতে পারেন। অথবা, তাঁদের যদি এর ভেতর দিল্লীতে আসার সম্ভাবনা থাকে তাহ'লে তো কথাই নেই, এখানেই দেখা হ'তে পারে।

মাত্র একবার একটু দেখার ইচ্ছা, অন্য কোন রকমেই বিরক্ত করবেন না ওঁরা—সে সম্বন্ধে যেন কোন দুশ্চিন্তা না করেন প্রবীরবাবুরা।

সে কথাটাও ঐ সঙ্গে বেশ স্পষ্টভাবেই জানানো ছিল।

এ চিঠির উত্তর এল প্রবীরবাবুর সেক্রেটারীর জবানীতে।

সংক্ষিপ্ত রূঢ় চিঠি। মর্মান্তিক অপমানকর।

চিঠির যা বক্তব্য তা সংক্ষেপে এই ঃ

দেবুর ছেলেমেয়েরা পথে বসে ভিক্ষা করবে, হয়ত বা ওঁদের পরিচয় দিয়েই করবে—এই আশঙ্কাতেই ওঁরা তাদের খরচ বহন করছেন।

নতুবা ওঁরা তাদের আত্মীয় বলে স্বীকার করেন না। এই বিবাহও মানেন না।

সুতরাং ভবিষ্যতে এ ধরনের কোন আত্মীয়তা দাবি বা অন্তরঙ্গতার চেষ্টা না

করলেই ও'রা খুশী হবেন। চিঠিপত্রও অতঃপর প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয়।···

গাল বাড়িয়ে চড় খেলেও কিন্তু একটা উপকার হয়েছিল এতে।

এই মর্মান্তিক অপমানে।

বোধ হয় ভগবান এবার মুখ তুলে চাইবেন বলেই ঐ দুর্বুদ্ধি দিয়েছিলেন বৌদিকে।

এর আগে থেকেই হীরা বৌদি কিছু উপার্জনের জন্য চেষ্টা করছিলেন, কোন্ উপায়ে তা করা সম্ভব সেই পথ খুঁজছিলেন। অনেককেই বলেছেন সে-কথা, একটা কোন উপায় ক'রে দেবার জন্যে।

একেবারে নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্ট হয়ে ছিলেন না কোনদিনই।

এভাবে দয়ার দানে দীর্ঘকাল কাটানোর চিন্তাতে কুণ্ঠার সীমা থাকত না তাঁর।

ছেলেরা বড় হয়ে উপার্জনক্ষম হ'তে অনেক সময় লাগবে এখনও। এতদিন এই ভিক্ষা নেওয়া?

এখন তো আরও—এটা যে বিদ্বেষ ও অবজ্ঞার দান, এর প্রতিটি মুদ্রায় অপমান মাখানো—জেনে অসহ্য হয়ে উঠল।

এবার প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন স্বাবলম্বী হবার।

উঠে পড়ে লাগলেন।

বোধ হয় এই ইন্ধনটারই প্রয়োজন ছিল এতটা সক্রিয় হ'তে।

উনি অবশ্য ইতিমধ্যেই দিল্লীপ্রবাসী এক মারাঠী ভদ্রলোকের ছোট ছোট দুটি ছেলেমেয়েকে পড়াতে শুরু করেছিলেন। মারাঠীর সঙ্গে বাংলাও শেখাতে পারবেন এবং কাজ-চলা-গোছের ইংরাজীও—সেই জন্যেই তাঁরা রেখেছিলেন, পঞ্চাশ টাকা ক'রে দিতেন।

কিন্তু এভাবে উপার্জন করলে উদয়াস্ত পরিশ্রমেও সব খরচ টানতে পারবেন না, সেটাও বুঝেছিলেন বৌদি।

অন্য কিছু কাজ শিখে স্থায়ী নিজস্ব আয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কলেজে ভর্তি হয়ে বি. এ. পাস করার কথা বলেছিলুম আমি, উনি সাহস করলেন না। লেখাপড়ায় মাথা খুব একটা নাকি কোন কালেই নেই, এখন এতদিন পরে কি আবার করতে পারবেন? এত খরচ ক'রে যদি ফেল করেন?

তাছাড়া সাধারণ ভাবে বি. এ. পাস করলেই বা এত বয়সে কে ও'কে চাকরি দেবে?

সরকারী চাকরির বয়স নেই আর।

বি. টি. পাস না করলে একটা মাস্টারিও হয়ত যোগাড় করতে পারবেন না।

বি. টি. পাস করতেও অনেক দেরি হবে।

অন্য কোন কাজ শিখলে উপার্জনের পথ সহজতর হয়।···

জনে জনে, পায়ে-পড়ার মতো ক'রে অনুরোধ করতে লাগলেন সবাইকে।

শেষে ঐ মারাঠী ভদ্রলোকটিকে দিয়েই উপায় হ'ল একটা।

হীরা বৌদির আচরণে সশ্রদ্ধ স্নেহের ভাব একটা দেখা দিয়েছিল ভদ্রলোকের।

তিনি নিজে ডাক্তার, স্বাস্থ্য-বিভাগে কাজ করেন। বড়কর্তাদের কারও কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও ছিল একটু।

তিনিই অনেক তদ্বির, অনেক সুপারিশ ক'রে—পিছনের দরজা দিয়ে যাকে বলে—হীরা বৌদির নার্সের ট্রেনিং নেবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

হীরা বৌদিও এতে খুশী হলেন। দেখা গেল এদিকেই ও'র স্বাভাবিক প্রবণতা।

শুধু যে শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন তাই নয়, মাত্র বছর দুই ট্রেনিং নেবার পরই ওঁকে একটা ছাড়পত্র পাইয়ে দিলেন—পাস-করা নার্স হিসাবে কাজ করার। সেবা-বৃত্তির দরজা খুলে গেল ওঁর সামনে।

এবার আমরাও কিছু কিছু কাজে আসতে পারলুম।

এক দূর সম্পর্কের মামাকে ধরে শহরের এক বিখ্যাত আধা-হাসপাতাল আধা-নার্সিং হোমে চাকরি পাইয়ে দিল রমা।

এখনই মাইনে এবং ভাতা মিলিয়ে দুশো চল্লিশের মতো পাবে, তাছাড়া ডিউটি হিসেবে—যে দিন যেমন পড়ে—লাঞ্চ অথবা ডিনার পাবে। নাইট-ডিউটি পড়লে রাতে অতিরিক্ত চা এবং 'স্ন্যাক্‌স্'।

অসুবিধা যেটা হ'তে পারত—ছেলেমেয়েদের কে দেখবে—সেটা শিক্ষানবিশ অবস্থাতেই দেখা দিয়েছিল—সে ব্যবস্থাও রমাই ক'রে দিল একটা।

আমাদের জানাশুনো একটি বৃদ্ধা মহিলা একেবারে সহায়সম্বলহীনা হয়ে পড়েছিলেন।

ভদ্রঘরের ব্রাহ্মণের মেয়ে—ঝিয়ের কাজ করতে পারতেন না।

তাঁকেই আমরা ওঁর বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা ক'রে দিলুম।

মাইনে দিতে পারবেন না বৌদি, তবে স্বাভাবিক যা খরচ সবদেবেন।

বাড়ির লোকের মতো, গিন্নীর মতো হয়ে থাকবেন।

এক কালে নিজেকেও যে এমনি চাকরিই খুঁজতে হয়েছিল সেটা ভেবেই বোধ হয়, হীরা বৌদিও তাঁকে সসম্মানেই গ্রহণ করলেন।

খরচ একটু বেড়ে গেল বটে—হীরা বৌদির আয়ের তুলনায় অনেক বেশী—উনি প্রথমটা সেজন্যে খুবই ইতস্ততঃ করেছিলেন—কিন্তু আর তো কোন উপায়ও দেখা গেল না।

অন্য দিকের খরচ যতদূর সম্ভব টেনেটুনে কমিয়ে এই অবস্থা বহাল করারই পরামর্শ দিলেন সবাই। নইলে, শুধু খাওয়াদাওয়ার সমস্যাই নয়, একা একা থাকলে ছেলেমেয়েগুলো নষ্টও হয়ে যাবে একেবারে।

অসুখ-বিসুখ তো আছেই।

সেজন্যেও একজন গৃহিণী-স্থানীয়া কারও থাকা প্রয়োজন।

প্রথম মাসের মাইনে হাতে পাওয়ার পরেই হীরা বৌদি প্রবীরবাবুকে একটা

চিঠি দিলেন।

স্বাবলম্বী হবার জন্যে তিনি কি কি করেছেন, তার একটা বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে হীরা বৌদি জানালেন যে এখন থেকে আর মাসে মাসে অত টাকা পাঠানোর দরকার নেই।

একেবারে কিছু পাঠানোর দরকার হ'ত না, নেহাৎ ইতিমধ্যে খরচপত্র অনেক বেড়ে গেছে বলেই একটু অসুবিধা।

এখন যদি আর বছরখানেক ওঁরা মাত্র পঞ্চাশটি টাকা ক'রে পাঠান তাহ'লেই এঁদের যথেষ্ট উপকার করা হবে। যদি ঈশ্বর মুখ তুলে চান—মনে তো হয় আসছে বছর নাগাদ তাঁর খানিকটা মাইনে বাড়বে—তাহ'লে তৎক্ষণাৎ তিনি লিখে জানাবেন প্রবীরবাবুদের, সেক্ষেত্রে আর কিছুই পাঠাতে হবে না তাঁদের।

এমনিতেই ওঁরা যা করলেন—চারটি অনাথা প্রাণীকে নিশ্চিত ভয়াবহ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালেন—এ ঋণ ভোলার নয়।

যতদিন বাঁচবেন বৌদি এ দয়া স্মরণ রাখবেন।

তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি দিনও বা একটি টাকা নিয়েও ওঁদের বিরক্ত করার ইচ্ছা নেই হীরা বৌদির।

ঈশ্বর ওঁদের মঙ্গল করুন—নিত্য এই প্রার্থনাই করেন তিনি ; ইত্যাদি—

বেশ বিনত এবং আন্তরিক ভাবেই চিঠি শেষ করেন বৌদি।

এবার যেন প্রবীরবাবুরা একটু সচেতন হয়ে উঠলেন হীরা বৌদি সম্বন্ধে।

এই—প্রথম বোধ হয় মনে হ'ল তাঁদের যে, এই স্ত্রীলোকটিকে তাঁরা যত ঘৃণ্য জীব—সাধারণ দেহোপজীবিনীর মতোই কেউ—ভেবে ছিলেন, ঠিক সে রকম নয়।

এই ধরনের কোন আত্মমর্যাদাজ্ঞান তাঁরা আশা করেন নি ওঁর কাছ থেকে।

টাকা আপনা থেকেই যেখানে নিয়মিত আসছে, বিনা জবাবদিহিতে, বিনা খোঁজ-খবর এমন কি বিনা অনুরোধে—সেখানে সে টাকা কেউ যেচে বন্ধ করতে চায়—বিশেষ এঁদের মতো নিঃস্ব নিম্নবিত্ত পরিবার—এ অভিজ্ঞতা বোধ হয় আর কখনও বা আর কোন ক্ষেত্রে হয় নি ওঁদের।

ওঁদের উচ্চবিত্ত আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে—তথাকথিত সম্ভ্রান্ত পরিবারেও ঠিক এমনটি দেখেছেন বলে সহজে মনে পড়ে না।

একে যদি ভদ্র না বলা যায়—তাহ'লে ও শব্দটারই সংজ্ঞা বদলাতে হয়।

এবার হীরা বৌদির চিঠির যে জবাব এল—তার ভাষা ও ভঙ্গী অনেক বেশী কোমল, অনেক বেশী মানবিক।

এই স্বাবলম্বন স্পৃহার জন্যে ওঁকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রবীরবাবু লিখেছেন, তাই বলে এখনই এত কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। ওঁকে আপাততঃ পুরো এক'শ টাকা ক'রেই পাঠাবেন তাঁরা। তাছাড়াও যখন যা দরকার হবে, হীরা বৌদি যেন নিঃসঙ্কোচে জানান।

এইতেই যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছিলেন বৌদি, এই ভদ্র চিঠিতেই, কিন্তু দেখা

গেল 'এহ বাহ্য'।

হীরা বৌদির শ্বশুরকুলের এই মানসিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এইখানেই থামল না। আরও যে প্রচণ্ড বিস্ময় অপেক্ষা ক'রে ছিল ওঁদের জন্যে—যে অভাবনীয় সৌভাগ্য—সেটা ওঁদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল এতদিন।

মাস কতক পরে—দৈবক্রমে রমা সেদিন বৌদিদের বাসায় উপস্থিত ছিল—বিরাট একখানা মার্কিন গাড়ি ওঁদের গলিতে যথেষ্ট শোরগোল তুলে, দুদিকের অধিবাসীদের বিপুল অসুবিধা সৃষ্টি ক'রে, বিস্ময় ও কৌতূহলের চাঞ্চল্য জাগিয়ে একেবারে ওঁদের দরজার সামনেই থামল।

এই সংকীর্ণ পথে, ট্রাক ও লরীর অরণ্য এবং চাট বা মোমফালির ঠেলাগাড়ি ভেদ ক'রে এখানে সাধারণ কোন গাড়ি আসাটাই দুঃসাধ্য ; তাছাড়া আসেও না বড় একটা।

এমন গাড়ি-চড়া আত্মীয় যাদের আছে—তারা এ পাড়ায় থাকবেই বা কেন !

গাড়ি থেকে নামলেন যিনি—বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশের বাঙালী ভদ্রলোক, নিখুঁত দামী পোশাক ও অখণ্ড গাম্ভীর্যে—তিনি যে পদস্থ সরকারী কর্মচারী অথবা প্রচণ্ড ধনী মান্যগণ্য কেউ হবেন তা ভাবেভঙ্গীতে প্রচার ক'রে—এখানে এসে বা এই প্রশ্ন ক'রেই তিনি এদের কৃতার্থ করেছেন এই ধারণার সৃষ্টি ক'রে—সামনের একটি লোককে ডেকে হীরা বৌদির খবর নিলেন।

সে লোকটিকে কিছু বলতে হ'ল না, তিন-চারটি কৌতূহলী ছেলে প্রায় একসঙ্গে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বাড়িটা দেখিয়ে দিল।

ডেকেও দিল হীরা বৌদিকে।

এই ধরনের মানুষের কাজে লাগতে পেরে সাধারণ লোকে অনেকটা কৃতার্থ বোধ করে।

ছেলেগুলিও তার ব্যতিক্রম হবে কেন ?

ভদ্রলোক তাঁর ভাবভঙ্গীর সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'এটাই কি মিসেস মল্লিকের বাড়ি ? হীরাবাঈ মল্লিক ?'

'হ্যাঁ—যৎপরোনাস্তি বিস্মিত এবং বোধ করি একটু ভীত কণ্ঠেই—কোথায় কি ঘটল না-জানি, ইনি হয়ত সরকারী লোক, কী তদন্তে এসেছেন এই ভয়—বললেন বৌদি, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আপনি—মানে আপনাকে তো ঠিক—'

তেমনি অটল গাম্ভীর্যের সঙ্গেই জবাব দিলেন তিনি, 'আমি জ্ঞানপ্রিয় মল্লিক, অশোকদের কাকা হই।'

কথাটা বুঝতেই হীরা বৌদির অনেক দেরি হ'ল। তিনি যেন এই অবিশ্বাস্য বিস্ময়ের আঘাতে হতভম্ব বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন।

তাই ঠিক কি বলা উচিত, এখনই যে স্বাগত জানানো উচিত, উচিত সস্মিত-মুখে কুশল প্রশ্ন করা—এ সব কোন কথাই তাঁর মনে পড়ল না।

তাঁর সংকীর্ণ সামাজিক জীবনে এই স্তরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা নেই, আদবকায়দা রীতিনীতিও জানেন না কিছু।

এমন অভিজ্ঞতা তো নেই-ই।

তাঁকে জড়বৎ দেখে রমাই তাড়াতাড়ি ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা ক'রে ভেতরে নিয়ে গেল।

তবু রমাও একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন বৈকি।

অবশ্য অকারণেই।

যে ধনী নয়, এমন কি মধ্যবিত্তও নয়—তার একমাত্র ঘর ধনীর ড্রইংরুমের মতো সাজানো থাকবে এ আশা করাই বাতুলতা।

ঘরে আসবাব বলতে কিছুই ছিল না—খাটিয়া ও বিছানা বাদে। একটিমাত্র চেয়ার ছিল, তাও ভাঙা। যে আসত সে খাটিয়াতেই বসত।

তবে ইদানীং একটু উন্নতি হয়েছিল ; এই চাকরি হওয়ার পর দু'খানা হাল্কা বেতের চেয়ার কিনেছিলেন বৌদি ; তারই একটা মিঃ মল্লিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বসতে বলল রমা।

হীরা বৌদির স্বাভাবিক সহজ হ'তে আরও বিলম্ব হ'ল।

ঘরে এসে একটা নমস্কার করা ছাড়া কোন সম্ভাষণ করতে পারেন নি।

শুধুই বিস্ময়। বিস্ময় আর সেই সঙ্গে একটা কারণহীন লজ্জা।

ভাগ্যে বিছানাগুলো সেদিনই পাল্টানো হয়েছে এবং রমা নিজে এসে টান করে সাজিয়ে দিয়েছে একটু আগে—নইলে কী লজ্জাতেই না পড়তে হ'ত। বার বার সেই কথাটাই মনে মনে বলতে লাগলেন হীরা বৌদি।

তবে যিনি এসেছিলেন তাঁর এ পরিস্থিতি, তাঁর আকস্মিক আগমনের ফলে যে বিস্ময়-বিহ্বলতার সৃষ্টি হয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় নি।

জীবন সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা বৌদির থেকে অনেক বেশী!

তিনিই কিছু হাঁকডাক কথাবার্তায় পরিস্থিতিটা সহজ ক'রে নিলেন।

মিঃ মল্লিক শুধু-হাতে আসেন নি। চাপরাসীকে ইঙ্গিত ক'রে জিনিসপত্রগুলো ভিতরে আনিয়ে নিলেন। কলকাতা থেকে সন্দেশ এনেছেন, এখান থেকে ফল কিনেছেন, এক ঝুড়ি। এ ছাড়া ওদের প্যাণ্ট-জামার কাপড়, বৌদির জন্যে সরুপাড় শাড়ি, বাংলা গল্পের বই—প্রভৃতি বিস্তর জিনিস এনেছেন।

বাইরের সজ্জা, গাড়ি ও গাম্ভীর্যে যতটা ভয়ঙ্কর রাশভারি মনে হচ্ছিল, এখন দেখা গেল ততটা নয়। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন না, কিন্তু বেশ হেঁট হয়েই নমস্কার করলেন বৌদিকে, ছেলেমেয়েদের ডেকে, তারা কাছে এসে প্রণাম করতে—মাথায় গায়ে হাত দিয়ে সস্নেহে সম্ভাষণ জানালেন।

বৌদিকে জানালেন, তাঁর যদি আপত্তি না থাকে, ইস্কুলের পাট চুকলে অশোককে কলকাতায় নিয়ে যাবেন, ওঁর কাছে থেকে কলেজে পড়বে। কালকাতার ভাল কলেজে।

দাদা বেঁচে থাকলে, তিনিও এইটেই চাইতেন নিশ্চয়।

ওঁর নিজের ছেলেও এই বয়সী হবে, বোধহয় একসঙ্গেই পাস করবে—তাহ'লে একসঙ্গে এক ক্লাসেই পড়তে পারবে। দু'জনে বন্ধুর মতো থাকবে।

'ভাইয়ের সম্পর্কের থেকে বন্ধুর সম্পর্ক অনেক বেশী নিবিড়, অনেক বেশী অন্তরঙ্গ।'...একটু হেসে শেষের মন্তব্যটি ক'রে বক্তব্য শেষ করলেন মিঃ মল্লিক।

হীরা বৌদি নীরবে সম্মতি জানালেন শুধু। কোন কথা কইলেন না।

কথা কইতেই পারছেন না আসলে।

বিস্ময়ের প্রাথমিক জড়তা কেটেছে—কিন্তু অন্য মানসিক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

বহুদিনের নিরুদ্ধ অভিমান, অতীত দিনগুলির দুঃসহ দুঃখের বেদনা, স্বামীর স্মৃতি—বিশেষ ক'রে তাঁর দুর্দশার স্মৃতি, সেই সঙ্গে শ্বশুরকুলের কাছ থেকে এই স্বীকৃতি পাওয়ার অননুভূতপূর্ব একটা আনন্দও—সব জড়িয়ে ওঁর অন্তরে আবেগের তুফান তুলেছে,—সেই বিভিন্ন আবেগের সংঘাতেই ওঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে—কিছুতেই কোন শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে না।

কথা কইতে গেলে চোখে জলই এসে যাচ্ছে বার বার। চোখের বাঁধ ভেঙে এতদিনের দুঃখ অশ্রুর আকারে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

কিছুতেই কোনমতেই তাকে বাধা দিতে পারছেন না।

এই অস্বস্তিকর সেণ্টিমেণ্টাল পরিস্থিতি সামলাতে রমাই সক্রিয় হয়ে উঠল।

অকারণে খানিক ঘরবার করল, সাড়ম্বরে চা তৈরী করল, সোহন সিংয়ের ছেলেদের দিয়ে খানিকটা ক্ষীরের মিষ্টি আনাল—এক কথায় গৃহিণীপনার দায়িত্ব ষোল আনাই তুলে নিল নিজের হাতে।

মিঃ মল্লিক অবশ্য সে-সব কিছুই খেলেন না, শুধু দু'-তিন চুমুক চা খেয়ে, আরও অনেক ভদ্র শোভন কথা বলে, ছেলেমেয়েদের মাথায় পিঠে আর এক দফা হাত বুলিয়ে, সেদিনের মতো বিদায় নিলেন।

এর পরও জ্ঞানপ্রিয় মল্লিক এসেছিলেন কয়েকবার।

তাঁকে সরকারী কাজেই দিল্লী আসতে হয়।

তিনি আসেন প্রতিবারেই অনেক জিনিস-পত্র নিয়ে।

ছেলেমেয়েদের প্রিয় সব জিনিস।

গল্পের বই আনেন—যা এখানে দুষ্প্রাপ্য, অন্তত এদের কাছে।

অন্য ভাইও একবার এসে দেখা করে গেলেন।

চিঠিপত্রের আদানপ্রদানও শুরু হ'ল। প্রদান তো ছিলই—উত্তর আসাটাই সুদুর্লভ সৌভাগ্য মনে হ'ল ওদের। বিশেষ জ্ঞানপ্রিয়র স্ত্রী উত্তরা এবং বোন বিষ্ণুপ্রিয়া যখন চিঠি দিলেন তখন স্বামীকে স্মরণ ক'রে হীরা বৌদি আবারও ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন।

ইতিমধ্যে হীরা বৌদির আর্থিক অবস্থারও কিছু উন্নতি হয়েছে।

মাইনেটা একলাফেই অনেকখানি বেড়েছে।

কে জানে তার মধ্যেও জ্ঞানপ্রিয়র কিছু হাত আছে কিনা। এই নার্সিংহোমের মালিকদের সঙ্গে নাকি ওঁর অনেকখানি আলাপ, তাঁরা ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ, কথায়

কথায় একদিন বলেছিলেন জ্ঞানপ্রিয়।

তবে সেটা আর অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন নি হীরা বৌদি। লাভ কি? এ অনুমান সত্য হলে পরোক্ষ সাহায্যের মতোই লাগবে—এই বর্ধিত আয়টাকে।

সচ্ছলতার মধুর স্বাদে স্যাকারিনের মতো মিষ্টতার সঙ্গে ঈষৎ তিক্ততার অনুভূতি আনবে।

হীরা বৌদি এই বেতন-বৃদ্ধির পর প্রবীরবাবুকে আর একদফা কৃতজ্ঞতা ও অপরিশোধ্য ঋণের কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন—মাসিক টাকা আর পাঠাবার দরকার নেই বলে।

কিন্তু ও'রা শোনেন নি।

জ্ঞানপ্রিয়ই সে চিঠির জবাবে লিখেছিলেন, 'আমাদের বংশের ছেলেমেয়ে ওরা, আমাদের সন্তানের মতো। ওদের জন্যে কিছু না করতে পারলে নিজেদের অপরাধী বোধ করব।'

সুতরাং সেই একশ' টাকা মাসোহারা এখনও নিয়মিত আসছে।

হীরা বৌদিও আর খুব বেশী প্রতিবাদ করতে পারেন নি এ ব্যবস্থায়।

জীবনযাত্রার ব্যয় যেভাবে বাড়ছে দিন দিন—আয় আর ব্যয়ে কোনমতেই সমতা রাখা যাচ্ছে না।

আট

কিন্তু এতেই অভাবনীয়ত্বের বা বিস্ময়ের শেষ হয় নি হীরা বৌদির, আরও কিছু বাকি ছিল।

সেটা এল আর বছরখানেক বাদে।

সেই সঙ্গে বহুদিনের একটা রহস্যেরও আবরণ উন্মোচিত হ'ল।

হঠাৎ একদিন হীরা বৌদি তাঁর নার্সিং হোমে টেলিফোন পেলেন একটা। আপিস থেকে খবর এল কে এক মহিলা চাইছেন তাঁকে।

'মহিলা? বাঙালী?'

হীরা বৌদি অনেকক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থেকেও কে তাঁকে ডাকতে পারে তা ভেবে পেলেন না।

অনেক রোগিণীর সঙ্গে সখ্যতার সম্পর্ক হয়ে যায় এটা ঠিকই—কিন্তু সে সখীত্ব এখান থেকে বেরিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে গেলে বেশীদিন টেকে না।

কাজকর্মে নিমন্ত্রণ হয় দু চার মাস পর্যন্ত, পথে দেখা হ'লে মিষ্ট বাক্য বিনিময়ের আয়ুষ্কাল বছরখানেক—তার পরেই হৃদ্যতা উবে যায়।

বিশেষত, টেলিফোনে ডাকবার মতো বন্ধুত্ব তাঁর তেমন কোথাও কারও সঙ্গে আছে বলে তো মনে পড়ে না।

সে যাই হোক—অত ভাবার সময় নেই।

আর টেলিফোন ধরলেই তো জানা যাবে।

তিনি উঠেই পড়লেন।

'হ্যালো' বলতেই মধুর কণ্ঠে শোনা গেল, 'আপনি কি মিসেস মল্লিক বলছেন ? আমি তাঁকেই চাইছি।'

'আপনি কে বলছেন ?' এ পাল্টা প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না, আমার নাম অরুণা—পরিচয় দিলে চিনবেন, কিন্তু তাতে দেরি লাগবে।...আমি কলকাতা থেকে এসেছি, আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে একটা কথা জানিয়ে যাবো বলে। তবে কোথাও একটু আলাদা বসা দরকার—নিরিবিলি। কোথায় গেলে সেটা সুবিধে হবে যদি বলেন, সেইখানে গিয়েই দেখা করব।...আপনার নার্সিং হোম আমি চিনি, বাড়ির ঠিকানাও নিয়ে এসেছি, খুঁজে যেতে পারব।'

প্রচ্ছন্ন একটু অনুনয়ের সুরেই যেন শেষের কথাগুলো বললেন তিনি।

এমনই অচিন্তিত প্রস্তাব, সম্পূর্ণ অপরিচিতা একটি মহিলার কাছ থেকে—বিমূঢ় হয়ে যাওয়ারই কথা। হীরা বৌদিরও উত্তর দিতে অনেকটা দেরি লাগল বৈকি।

কথাটা বুঝতেই বেশ কিছুটা সময় লাগল!

তারপর অনেকক্ষণ ধরে—স্মৃতির দূরতম প্রান্ত খুঁজে এই নামটির সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরার চেষ্টা করলেন।

কিছুতেই মনে পড়ল না।

বাংলা নামের সঙ্গে পরিচয় বেশির ভাগই স্বামী মারফৎ। তাঁর মুখে কোনদিন এ নাম শুনেছেন বলে মনে হয় না।

তাছাড়া এরকম আকস্মিক প্রস্তাবে বোধ হয় কোন কথাই চট ক'রে মনে পড়তে চায় না।

এই চিন্তা, স্মৃতির দুয়ারে এই মাথা খোঁড়ার মধ্যেই আর একটা মানসিক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিছল। সেটা ভয়ের।

একটা অজ্ঞাত অপরিচিত আশঙ্কা।

কে এ, কী মতলবে দেখা করতে চাইছে ? কোন বিপদে ফেলবে না তো ?

তাঁর মতো সামান্য প্রাণীকে ওর কি এত দরকার থাকতে পারে ?

এমন কি গোপন কথা ?

তারের ও-প্রান্তে বোধ করি মনোভাবের এই তরঙ্গ পেঁাছিয়ে থাকবে—অব্যক্ত এই প্রশ্ন,—মহিলা আবারও মিনতি ক'রে বললেন, 'কোন ভয় নেই। আমি একা এসেছি, একাই দেখা করব। নার্সিংহোমে তো ধরুন বহু লোক—তার মধ্যে গিয়ে আমি কিন্তু আপনাকে খুমজখম ক'রে আসতে পারব না ; আর আপনি যেখানে থাকেন সেখানেও তো শুনেছি বহু ভাড়াটে। কথা বলার সময়, আমি যখন যাবো—তাদের কাউকে ডেকে ঘরে বসাতেও তো পারেন—পাঞ্জাবী যদি কেউ থাকে। বাংলা কথাবার্তা না বুঝতে পারলেই হ'ল।'

এর পর আর 'না' বলা যায় না।

সংশয় ও দ্বিধা মন থেকে একেবারে না গেলেও বলতে হ'ল, 'বেশ, তাহলে এখানেই আসুন। আমার দিনের ডিউটি—তিনটে-চারটের সময় চা দেওয়া হয়, তখন খানিখটা অবসর থাকে, ভিজিটার্স রুমেও সে-সময় বড় একটা কেউ থাকে না। থাকলেও বাংলা-জানা-লোক কেউ থাকার চান্স নেই।

'ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ।' ঈষৎ কাঁপা-কাঁপা গলাতে এই শব্দ দুটি উচ্চারণ ক'রে ও-পক্ষ ফোন রেখে দিলেন।

উত্তেজনায় ও আবেগে যেমন গলা কাঁপে—তেমনই।

মহিলা কাঁটায় কাঁটায় ঠিক তিনটেতে এলেন।

স্লিপ নিয়ে এল একটি আয়া, তাতে নাম লেখা—অরুণা মল্লিক।

মল্লিক ?

তাহলে কি ওঁর শ্বশুরবাড়ির কেউ ?

কিন্তু তাহলে তো এতদিনে নামটা শোনার কথা।

আবার অনেক ভাবলেন বৌদি, বিস্তর মাথা ঘামালেন—অবশ্য কয়েক মুহূর্ত সময়ে যেটুকু হয়—তারপর আয়াকে নির্দেশ দিলেন ভিজিটার্স রুমে বসাতে।

দু' পেয়ালা চা ওখানেই পাঠাতে বলে একটু পরেই হীরা বৌদি সে ঘরে এসে ঢুকলেন। দেখলেন একটিই মাত্র মহিলা বসে আছেন, ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

যিনি বসে আছেন তিনি ওঁরই বয়সী হবেন। কি সামান্য বেশী।

কিন্তু সে বয়সও তার সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি মহিলার দেহে—দেহের লাবণ্যে।

অসামান্যা সুন্দরী না হ'লেও চেহারায় যে একটা চটক ছিল—চোখ ধাঁধানো নয়, চোখ-জুড়ানো—ইংরাজীতে যাকে লাভ্‌লিনেস্ বলে—তার পরিচয় এখনও সুস্পষ্ট।

সুগৌর বর্ণ ; চেহারার বাঁধুনি দেখে স্থিরযৌবনা শব্দটা মনে পড়ে যায় বার বার।

কিন্তু সে সুন্দর মুখ এখনই শুধু ম্লান নয়—হীরা বৌদির নিজের মতোই অনেক দুঃখ অনেক বেদনার ইতিহাস একটা স্থায়ী বিষণ্ণতার ছাপ রেখে গেছে তাতে।

হীরা বৌদিকে দেখে একটু ম্লান হেসে উঠে দাঁড়ালেন মহিলা, কাছে এসে ওঁর দুটি হাত ধরে বললেন, 'আপনাকে ছোঁয়ার অধিকার আমার আছে কিনা জানি না, তবু লোভ সামলাতে পারলুম না।...আপনার স্বামী ছিলেন দেবতা ; আপনি তাঁর স্ত্রী, আপনাকে তিনি ভালবাসতেন—অসামান্য না হলে, পবিত্র স্বভাবের মানুষ না হ'লে—তাঁকে আপনি বাঁধতে পারতেন না এমনভাবে, তাঁর স্নেহ-ভালবাসা পেতেন না। আপনাকে প্রণাম করাই উচিত—কিন্তু আমি হয়ত

আপনার চেয়ে বয়সে বড়ই হবো, তাই করলুম না। ওতে নাকি আয়ু কমে যায় যাঁকে প্রণাম করা হয় তাঁর।'

বিব্রত হীরা বৌদি 'বসুন বসুন' বলে হাত ধরেই একটা চেয়ারে আবার বসিয়ে নিজে সামনে বসলেন।

তারপর, অকারণেই একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে বললেন, 'কিন্তু আপনাকে তো কই—মল্লিক পদবী দেখছি—আপনি কি ওঁদের কেউ, মানে আমার স্বামীর ফ্যামিলির কেউ হবেন?'

এবার খুব মলিন, বরং বলা যায় করুণ একটু হাসি হাসলেন মহিলা।

বললেন, 'পদবীতে পরিচয় দেবার অধিকার আর আমার নেই, কিন্তু আমি ইচ্ছে ক'রেই ওটা ছাড়ি নি।···মনে হয়, তবু ওঁর সামান্য একটু স্পর্শ লেগে থাকে আমার সত্তায়—তাতেই যদি আমার মহাপাপ কিছুটা কমে।'

আরও অস্পষ্টতা, আরও কুরাশা।

অধিকতর বিমূঢ় হয়ে যান বৌদি।

মহিলাই আবার বলেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, 'পরিচয় পাবার পর হয়ত ঘেন্নায় আপনি আর আমার মুখ দেখবেন না, হয়ত যে কথা ক'টা বলবার জন্যে এসেছি সেটাও শোনাতে পারব না—আপনি উঠে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবেন। এই ভয়েই ইতস্ততঃ করছি এখনও।···যদি শেষপর্যন্ত একটু ধৈর্য ধরে শোনেন দয়া ক'রে—এই অনুরোধটাই করতে চাই।'

হাতজোড় করলেন ভদ্রমহিলা বলতে বলতেই।

খুবই করুণ শোনাল তাঁর কণ্ঠ, অনুনয় বললে ঠিক বলা হয় না—এ যেন কান্নাই।

হীরা বৌদি এবার বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'না না, ছি ছি! কী বলছেন! ঘেন্না করব কেন ভাই! আমি এমন কী যে ঘেন্না করব! আমিই কি দুধে-ধোওয়া একেবারে? আমারও কি আর পাপ অপরাধ জমা নেই! ঢের আছে। আপনি শুনেছেন কিনা জানি না, এঁর আশ্রয় পাবার আগে আমি ফিল্‌মে অভিনেত্রী হবার জন্যে খুব চেষ্টা করেছিলুম, সেজন্যে—সেই আশায়—অনেক নিচে নামতে প্রস্তুত ছিলুম, একেবারে যে কিছু নামি নি তাও নয়। আমি অপরের দোষ ধরব কোন্ অধিকারে?'

'আপনার দেহে কি মনে যদি কোন ময়লা লেগেও থাকে কোন অন্যায় বা পাপ—দেবুদার সংস্পর্শে থেকে, তাঁর ভালবাসায় সে-সব অনেকদিনই ধুয়ে গেছে। এ কথার কথা নয়, আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। তিনি ছিলেন গঙ্গার ধারা, গঙ্গাজল—তাতে অবগাহন করলে আর কোন পাপ থাকতে পারে না যে ভাই।'

তারপর নিজেই, সেই রকম একটু সকরুণ বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, 'বড্ড জটিল হয়ে পড়ছে কথাগুলো, না? পরিচয়টাই দিই আগে বরং। আপনি নিশ্চয় শুনেছেন, দেবুদা—দেবুদাই বলি, যে নামে ডাকতুম তাঁকে সে নামে না-ডাকার কোন কারণ ঘটে নি—আগে আর একবার বিয়ে করেছিলেন, আর ছেলে হবার

সম্ভাবনা ঘটেছে দেখেও সে স্ত্রীকে ফেলে চলে গিয়েছিলেন বোম্বেতে, তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন নি। আসলে সেই জন্যেই ওঁর আত্মীয়স্বজনরা ওঁর মুখ দেখেন নি আর—সেই অপরাধে। এটাকে ওঁরা খুব ঘৃণ্য, অন্যায় ব্যবহার মনে করেছিলেন। করার কথাও হয়ত। তাঁরা তাদের মতোই বিচার করেছেন। আমিই ওঁর সেই স্ত্রী।'

বাংলা শেখার পর হীরা বৌদি অনেক সেকালের নাটক নভেল পড়েছিলেন (এ কথাটা উনিই বলেছিলেন আমাদের কাছে পরে, এ উপমাও উনিই দিয়েছিলেন), সে-সব বইতে একটা কথা অনেকবারই পেয়েছেন, 'সম্মুখে বজ্রাঘাত হইলেও বোধ করি সে এত বিস্মিত হইত না।' এখন এই মুহূর্তে হীরা বৌদিরও ঠিক সেই অনুভূতি হ'ল।

কথাটা বুঝতে পারলেন না অনেকক্ষণ।

যেটাকে তিনি অন্তত মিথ্যা বলে ভেবে এসেছিলেন—সেই একটা কলঙ্কিত অপবাদ এ আবার কি এক আপাতস্তুতির আকার নিয়ে এসে দাঁড়াল!

বিস্মৃত অতীত কোন্ চেহারায় দেখা দিল আবার!

কী বলবেন, কী উত্তর দেবেন—সান্ত্বনা দেবেন কি রাগ করবেন, বিশ্বাস করবেন কি প্রতিবাদ করবেন—কিছুই ভেবে না পেয়ে বৌদি বিহ্বল হয়ে চেয়েই রইলেন শুধু।

এতক্ষণে কথা বলার মধ্যে সমস্ত সময় অরুণা মল্লিকও একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন ওঁর মুখের দিকে, কী দেখছিলেন কে জানে। এখন শেষ কথাটা—সর্বশেষ বিস্ময়ের আঘাতটা ছাড়ার পর তিনি মুখ নামিয়েছেন।

অনেকক্ষণ বাদে, যেন বাইরে কোথাও থেকে কণ্ঠস্বর কুড়িয়ে এনে হীরা বৌদি বললেন, 'কিন্তু আমি বহুদিন পর্যন্ত শুনি নি কথাটা। উনি কখনও বলেন নি আমাকে। ওঁর মৃত্যুর পর এখানকার একটি ভদ্রলোক ওঁর এক বন্ধুর কাছে কথাটা বলছিলেন। সে কথা আমি বিশ্বাস করি নি।'

তারপর—কথাটা ভাবতে ভাবতেই, স্বামীর প্রতি প্রেমে ও বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে, কণ্ঠস্বরে বেশ একটু দৃঢ়তা এনে বললেন, 'আমি এখনও বিশ্বাস করছি না। আপনি যে সত্যি কথাই বলছেন তা আমি কেমন ক'রে জানব? আমার স্বামী এত ছোট হবেন, হ'তে পারেন তা আমার কিছুতেই মনে হয় না।'

অকস্মাৎ যেন আকুল হয়ে ওঠে অরুণা। বলে, 'না না, ছোট কি বলছেন! তিনি মহৎ লোক, তিনি দেবতা। আমাকে—নিতান্তই দু'চার দিনের পরিচিত একটা বাজে মেয়েকে কলঙ্ক থেকে বাঁচাতে যিনি অনায়াসে নিজের মাথায় এই বিপুল মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা নিয়ে চলে এলেন—চিরদিনের মতো দেশভুঁই আত্মীয়স্বজন ছেড়ে—তিনি কি সামান্য লোক! এ কি সাধারণ লোকের সাধ্য? এ দেবতা না হলে কেউ পারে না। দেবতার চেয়েও যে বড় ছিলেন তিনি ভাই।'

বলতে বলতে অরুণার চোখের দু'কূল প্লাবিত ক'রে অশ্রুর ঝর্ণা নামে।

এবার যেন মাথাটা কেমন ঘুরতে থাকে হীরা বৌদির।

তিনি কিছু বুঝতেও পারেন না, ভাবতেও পারেন না।

এভাবের কথা শোনার বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই ওঁর।

ভাষার ওপরও এতখানি দখল নেই—বাংলা ওঁর মাতৃভাষা নয়—যে, এই ধরনের পরস্পর-বিরোধী কথার মধ্য থেকে কোন গূঢ়ার্থের নাগাল পাবেন।

বিহ্বল ব্যাকুল হয়ে বিস্ফারিত চোখে তাই শুধু চেয়েই থাকেন অরুণার মুখের দিকে। সেখানেই যেন অর্থটা খোঁজার চেষ্টা করেন।

পুরো পাঁচ মিনিট সময় লাগে তাঁর কণ্ঠস্বর ফিরে পেতে। তারও পরে অসহায় শুখলিত কণ্ঠে বলেন, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না ভাই। আপনি যদি একটু খুলে বলেন তো ভাল হয়।'

খুলেই বলল অরুণা।

অনেক সময় নিয়ে, থেমে থেমে—প্রায়ই রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল গলা, চোখের জলে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এল বার বার—তবু একসময় শেষ করল—তার নেই অপরিমাণ লজ্জা ও কলঙ্কের কাহিনী।

যা বলল, তা প্রায় অবিশ্বাস্য।

নিজ-মুখে না বললে বিশ্বাস হ'তও না কিছুতে।

পরিচয়টাও জানা গেল এবার।

অরুণা হ'ল হীরা বৌদির নন্দাই, দেবুর বড় ভগ্নীপতি প্রবীরবাবুর আপন খুড়তুতো বোন।

একই বাড়িতে ওরা থাকত তখন, যখন বিষ্ণুপ্রিয়ার বিয়ে হয়—একান্নবর্তী পরিবারে।

বিয়ের পর এদের দুই পরিবারে স্বাভাবিক অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। খাওয়া-দাওয়া—যাওয়া-আসা চলতে থাকে। কলকাতাতেই—একই অঞ্চলে— ভবানীপুরেই থাকতেন ওঁরা, দেবুরা আর প্রবীরবাবুরা—সুতরাং ছোটখাটো আসা-যাওয়া লেগেই থাকত।

এব-বাড়ির মেয়েরা সিনেমার টিকিট কেটে ও-বাড়ির মেয়েদের তুলে নিয়ে যেত—আবার ও-বাড়ির মেয়েরা কোথাও সিনেমা কি থিয়েটারের টিকিট কাটলে এদের টেলিফোনে জানিয়ে দিত। এ ঘটনা ছিল প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক।

খাওয়া-দাওয়াও এই ভাবেই চলত। যে যেদিন রাত্রে অপর বাড়িতে গিয়ে পড়ত, সে সেদিন সেখানেই খেয়ে আসত। তাতে অকারণ সঙ্কোচ কি দ্বিধা বোধ করত না।...

অরুণারা খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইবোন মিলিয়ে অনেকগুলি।

এক পরিবারভুক্ত বলে সকলের সঙ্গেই ওদের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল।

সকলেই আসত দেবুদাদের বাড়িতে।

তার মধ্যে অরুণাই ছিল এ বাড়ির একটু বেশী প্রিয়।

দেখতে অতীব সুশ্রী, ফূর্তিবাজ, মিশুকে—প্রাণবন্ত মেয়ে। লেখাপড়াতেও ভাল, উপরন্তু গান জানে।

সব চেয়ে আকর্ষণ—ওর প্রাণপ্রাচুর্য ও উৎসাহ-চঞ্চলতা।

সকলেরই কেমন একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল—কোন পক্ষে কোন স্পষ্ট কথা কিছু উচ্চারিত না হয়েও—যে, অরুণার সঙ্গেই একদা দেবপ্রিয়র বিয়ে হবে।

শুধু দেবু একটু রোজগারপাতি কাজ-কর্ম শুরু করার—জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার—অপেক্ষা।

অবশ্য এ ব্যাপারে অরুণার মনের কথা জানার কেউ চেষ্টাও করে নি। অনাবশ্যক বোধেই। ওর ব্যবহারে, এ বাড়ির সঙ্গে মেলামেশার ধরনে—ওর যে এই বিবাহে কোন আপত্তি থাকতে পারে—সে কথা কেউ কল্পনাও করে নি।

বিশেষ যেভাবে সে সর্বদা দেবুর কাছে নানাবিধ আবদার ধরত, বায়না করত—যে ভাবে অবিরত ঠাট্টা-তামাশায়-বিদ্রূপে ব্যতিব্যস্ত করত—তাতে তার মনোভাব যে এ ব্যবস্থার অনুকূলই হবে—এই কথাই মনে করত সবাই।

হ'তও হয়ত—যদি না ইতিমধ্যে এই অঘটনটা ঘটে যেত!

শুধু নিমেষের ভুল, সামান্য একটু মতিভ্রম।

অদৃষ্টদেবতার এই খেলা—অকরুণ, সর্বনাশা।

প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই, পরিণাম চিন্তা তো দূরের কথা—কী ঘটছে তা বোঝার আগেই ঘটে গেল ব্যাপারটা।

চেয়ারে বসে বসে বা বাস্এ যেতে যেতে, সামান্য একটু—কয়েক মিনিটের তন্দ্রাতেও যেমন মুহূর্ত-কয়েকের স্বপ্ন দেখে মানুষ—তেমনিই।

তার বেশী কিছু নয়।···

অরুণা নিজের বাড়িতেও, ভাইবোনদের মধ্যে সব চেয়ে প্রিয় ছিল সকলকার। সকলেই খুশী হয়ে উঠত ওকে দেখলেই।

প্রবীরেরও প্রিয় ছিল—সেই একই কারণে।

প্রবীর তখন উদীয়মান যশস্বী অ্যাডভোকেট। অল্প কয়েক বছরেই ওর যথেষ্ট খ্যাতি হয়েছে ওকালতিতে।

তরুণ, সুদর্শন, বলিষ্ঠ। বুদ্ধিমান। কৌতুকপ্রিয়। সেই সঙ্গে স্নেহপরায়ণ, সদাশয়।

ছোট ছোট ভাইবোন সকলকারই সম্ভ্রম-প্রীতির পাত্র ছিলেন তিনি। বিশেষ ক'রে বোনদের।

তাদের কাছে প্রবীর ছিলেন পুরুষদের মধ্যে—আকাঙ্ক্ষিত সুপাত্রের আদর্শ।

অরুণার বেলাও তার অন্যথা ঘটে নি।

গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা তারও ছিল বহুজনের-ঈর্ষার-পাত্র এই জ্যাঠতুতো দাদাটি সম্বন্ধে।

এই প্রীতি, অনুরাগ কবে কখন আসক্তিতে পরিণত হয়েছে—শ্রদ্ধার সম্ভ্রমের পরিণতিতে এসেছে নির্দ্বিধ একান্ত আত্মসমর্পণ—তা কেউ বুঝতেও পারে নি।

একদা নির্জন কর্মহীন মধ্যাহ্নে, চৈত্রের উষ্ণ বাতাস যখন মদির হয়ে উঠেছে শহরের এক দ্বিতল কক্ষেও, সবল পুরুষের গায়ের গন্ধ এনেছে মাদকতা, সুন্দরী তরুণীর অনেকখানি অনাবৃত কাঁধে ও পিঠে ঘামের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে কয়েক-গাছি সূক্ষ্ম ঈষৎ সোনালী চুল, তার দৃষ্টিতে ফুটেছে আমন্ত্রণ, আত্মনিবেদনের আকুতি—তখন দু'জনের সম্পর্কের কথাটা কেউ মনে রাখতে পারে নি।···

একদিন পথ খুলে দিয়েছে আর এক দিনের, অনাস্বাদিত-পূর্ব এক অভিজ্ঞতা নেশা এনেছে ওদের মনে। ভালমন্দ, পরিণাম বিচারের অবসর পায় নি আর।

সে ইচ্ছাও জাগে নি মনে।

সর্বনাশের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে দুজনেই।

যখন প্রথম সচেতন হয়ে উঠল তখন সেই মুহূর্তের ভুল, অনবধানতা, যৌবন-মত্ত অচেতন অন্যমনস্কতা-অসতর্কতার মূল বহু দূর পর্যন্ত গাঢ়-প্রবিষ্ট হয়েছে।

অনুরাগের বসন্ত বাতাসে দেহবল্লরী মুকুলিত হয়েছে অরুণার। সে মুকুলের সঙ্গে জেগেছে ফলের আভাস।

এক কথায় সে তখন গর্ভবতী হয়েছে।

কিছুই তখন আর করার নেই। ভুল ঢেকে নেবার কোন পথ নেই—সংশোধ-নের তো নেই-ই।

প্রবীর বিবাহিত। তার স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার সবে একটি বাচ্চা হয়েছে।

আসলে সেই অবসরে ও প্রয়োজনেই ভুলটা ঘটতে পেরেছে হয়ত।

তখনও বহু বিবাহ হয়ত একেবারে অপ্রচলিত হয় নি।

কিন্তু হিন্দু-বিাহ ওদের সম্বন্ধে আটকায়। রেজিস্ট্রি ক'রে বিয়ে করারও কোন উপায় নেই।

আর তাতেও কলঙ্কের পশরা কম চাপবে না মাথায়।

ঢিঢিক্কার পড়ে যাবে চারিদিকে। আত্মীয় পরিচিত সমাজে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

প্রবীর আশ্বাস দিয়েছিলেন গোপনে গর্ভপাতের ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

অরুণা তাতে রাজী হয় নি। ঠিক সেই সময়েই খবরের কাগজে দুটি ঘটনার বিবরণ বেরিয়েছে—গর্ভপাত করাতে গিয়ে তথাকথিত ডাক্তারের চেম্বারে অপমৃত্যু ঘটেছে গর্ভিণী মেয়ে দুটির।

তা নিয়ে হৈচৈ, নিন্দা, ধিক্কার ; পুলিস কেস। কেলেঙ্কারির অন্ত থাকে নি।

জাতও গেছে পেটও ভরে নি।

'তাহলে উপায় ?'

বিপন্ন প্রবীর অসহায়ভাবে ওকেই প্রশ্ন করেছিল।

উপায় যে কি—তা অরুণাও খুঁজে পায় নি, দেখতে পায় নি কোন পথ—এক মৃত্যু ছাড়া।

সোজাসুজি আত্মহত্যা।

সে অনেক সহজ, অনেক বাঞ্ছনীয়—তার জন্যে অত ধিক্কার লাঞ্ছনা সইতে

হবে না।

অন্তত নিজের জীবিতকালে নয়।

মরার পর কে কি বলল তাতে ওর কিছু এসে-যাবে না।

তাছাড়া যেমন ভাবেই হোক, প্রথম সন্তান এসেছে তার গর্ভে, মা হয়ে জেনে-শুনে তাকে হত্যা করতে পারবে না—নিজের পাপ নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্যে।

নিজের কামনার খেসারত যোগাতে একটি নির্দোষ জীবনমুকুল উন্মূলিত করতে পারবে না।

তার পর বেঁচে থেকে এ জীবন ভোগ করতে পারবে না অন্তত।

দু'জনে একসঙ্গেই যায় তাতে কোন দুঃখ নেই।······

অনেক ভেবে অনেক কেঁদে এইটেই একমাত্র পথ দেখেছিল।

মৃত্যুর জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছিল। ভাগ্য অন্যরকম তাই একদিন হঠাৎ দেবুর চোখে পড়ে গেল।

ঐ আশ্চর্য মানুষটির।

মানুষও নয় সে—অন্তত অরুণার তাই বিশ্বাস।

একাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল চুপি চুপি, গঙ্গায় যাওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে। হাওড়া পুলে অনেক লোক, সন্ধ্যার ঝোঁকে বাবুঘাটে কি অন্য স্নানের ঘাটে গিয়ে স্নান করতে যাওয়ার মতো আস্তে আস্তে নেমে গেলে কেউ অত লক্ষ্য করবে না। সে সাঁতার জানে না, ঘটি-বাটির মতোই ডুবে যাবে।···

পরিকল্পনা পুরোই তৈরী ছিল, কিন্তু সেটা তখন-তখনই কাজে লাগাতে পারে নি।

কিসের জন্যে অপেক্ষা করছিল, কিসের আশা তখনও—সে নিজেও জানে না।

আসলে অল্প বয়সে—প্রাণের মায়া তত না হোক, জীবন সম্বন্ধে নানা আশা নানা স্বপ্ন থাকে।

অতৃপ্ত কামনা নিয়ে শুধু শুধু কে মরতে চায়?

তাই শুষ্ক বিবর্ণ মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এক রকম পথে পথেই, তার মধ্যে কখন অভ্যস্ত পা পরিচিত পথ ধরেছে তা টেরও পায় নি।

হঠাৎ দেবুর কণ্ঠস্বরেই প্রথম সচকিত সচেতন হয়ে উঠে আবিষ্কার করেছে—কখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে ঢুকে পড়েছে সে।

'আরে রুণু যে! এখানে হঠাৎ? আর একাই বা কেন?'

এমনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল অরুণার, মনের উপর অপরিসীম বোঝা চেপে থাকা সত্ত্বেও, 'বলা মুখ' তার কাজ ক'রে গেল, 'আর কে থাকবে বলো? আর, কেউ যে থাকতেই হবে তার কি মানে?'

সে হাসবারও একটা চেষ্টা করল, এই ধরনের হাল্‌কা কথার উপযোগী হাসি, কিন্তু সে চেষ্টায় মুখটা কেমন বিকৃত হয়ে উঠল ওর, হাসি ফুটল না।

সাধারণতঃ দেবুর কোন সূক্ষ্ম তথ্য চোখে পড়ে না। দৈব অপ্রসন্ন তাই আজ পড়ল।

অথবা প্রসন্ন, অন্তত অরুণার প্রতি।

ভাল ক'রে চেয়ে দেখল পরিচিত ঐ সুন্দর, ওদের সকলের প্রিয় মুখখানিতে সেই সদা প্রফুল্ল উৎসাহ-প্রোজ্জ্বল হাসি আর নেই—নেই সেই আকর্ষক দীপ্তি।

এই অপরাহ্নের উজ্জ্বল রাঙা আলোয়—পশ্চিম আকাশে একখানা সাদা মেঘ সূর্যকিরণ-প্রতিফলিত হয়ে উজ্জ্বল এক বর্ণাভার সৃষ্টি করেছে—'কনে দেখা মেঘ' যাকে বলে—অরুণার মুখের অপরিসীম বিবর্ণতা, চোখের কোণে সুগভীর কালি, অবিরাম রোদনে আরক্ত চক্ষু, চুলের কোলে-কোলে ঘাড়ে গলায় ক্লান্তির স্বেদবিন্দু—সর্বোপরি একটা বিপুল অবসাদ লক্ষ্য করল আজ।

ঐকান্তিক একটা ক্লান্তি—বোধ হয় দেহে ও মনে দুই-ই। এখন সমগ্রভাবে ওর দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল পা ভেঙে আসছে, হয়ত এখনই পড়ে যাবে—এই মাটিতেই।

একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে, কারণটা নির্ণয় করার চেষ্টা করতে করতেই কতকটা অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল দেবু, 'থাকে বৈকি, থাকাই যে নিয়ম। তোমার মতো সুন্দরী তরুণী এই বর্ণোজ্জ্বল অপরাহ্নে, এমন আতপ্ত মদির বাতাসে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠে বেড়াতে এসেছ—সঙ্গে এককটি বিশেষ সঙ্গী—আমার প্রাকৃত ভাষায় যাকে মনের মানুষ বলি, কবির ভাষায় আত্মার-আত্মীয়—না থাকলে চলবে কেন ?···তাছাড়া সঙ্গী, এবার একটু খবরের কাগজের ভাষাও ব্যবহার করি—নিরাপত্তার খাতিরেও অন্ততঃ একজনকে নিয়ে আসা উচিত ছিল। স্থান ও কাল কোনটাই অনুকূল নয়—তোমার মতো মেয়ের পক্ষে।'

বলতে বলতেই অকস্মাৎ, কণ্ঠের সে পরিহাস-তারল্য ত্যাগ ক'রে জিজ্ঞাসা করল, এই, কী হয়েছে রে ? মুখ-চোখ এমন কেন ? কেঁদেছিস তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ব্যাপার কি ? বাড়ি থেকে ঝগড়া ক'রে আসিস নি তো ? ঠিক ক'রে বল্ দিকি।'

'হ্যাঁ ! কী আবার হবে। তোমার এক কথা।'

হাল্কা ভাবেই বলার চেষ্টা করে, চেষ্টা করে উড়িয়ে দেবার—কিন্তু গলায় যথোপযুক্ত জোর ফোটে না।

দেবু বলে, 'উঁহু। এদিকে আয় দিকি, বোস্ এখানে।···হ্যাঁ, এবার বল্ কি হয়েছে—।'

'কি হবে, কিছুই না।···এমনিই বেড়াতে বেড়াতে চলে এসেছি।'

তেমনই ম্লান করুণ হাসির সঙ্গে বলে।

কিছুই যে হয় নি সেইটেই বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করে।

কিন্তু এবারও বিশ্বাসযোগ্য হয় না সে হাসিটা।

'দ্যাখ আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করিস নি। এমনিই বেড়াতে বেড়াতে চলে এলে হঠাৎ আমার ডাকে অমনভাবে চমকে উঠে চারদিকে বোকার মতো চেয়ে

দেখতিস না। কী হয়েছে বল্ ঠিক ক'রে, নয়তো তোকে ট্যাক্সি ডেকে বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে এখুনি।'

আর পারে না অরুণা, এইবার কেঁদে ফেলে সে ঝরঝর ক'রে। অবাধ্য চোখের জল প্রবল ধারায় ঝরে পড়তে থাকে।

মনে হয় এ চোখের জল না ফেললে তার বুকটাই ফেটে যেত।

এবার আরও চেপে ধরে দেবু।

তার একটা অনুমান অরুণার চোখের জলে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

গোলমাল একটা কিছু হয়েছে কোথাও, বড় রকমের কোন অশান্তির কারণ।

এবার অসংখ্য অনুমান তার কল্পনার উর্বর ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হ'তে থাকবে—এ আর আশ্চর্য কি ?

হাজারো রকম পারিবারিক অশান্তি, বিপদে বা সংকটের কথা মনে পড়ে তার, সেইভাবেই সে প্রশ্ন ক'রে যায়।

ফলে দুঃখের বন্যায় সংযমের বাঁধ ভাঙে। অশ্রুর বেগ প্রবলতর হয়।

চারিপাশে লোক, কোথাও কেউ দেখছে কিনা, কে কী ভাবছে—এসব কিছুই মনে পড়ল না অরুণার। আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল শুধু, মুখে রুমালটা গুঁজে দিয়ে।

এটা ঠিক যে—কাউকেই বলতে চায় সে। কাউকে সব কথা খুলে বলতে পারলে, কারুর পরামর্শ নিতে পারলেই বেঁচে যাবে সে, মনে হয়। কিন্তু তবুও কেন কিছুতেই বলতে পারে না, শেষ মুহূর্তেও যেন কে গলা চেপে ধরে !

একথা কি কাউকে বলা যায় ? বিশেষ, কোন পুরুষকে !

তবু বলতে হয় একসময়। বলেও।

দেবুর সস্নেহ ব্যবহারে, আন্তরিক সহানুভূতিতে ও সত্যকার উদ্বেগে—আস্তে আস্তে সব সঙ্কোচ ও দ্বিধা কেটে যায়।

মনে হয় এই মানুষটি আমার একান্ত আপন, একে সব কথা খুলে বলা চলে, এর কাছে লজ্জা করার কোন কারণ নেই।

এ এমন মানুষ, কোন অপরাধই যে অমার্জনীয় বোধ করবে না, কোন দুষ্কৃতিই ঘৃণ্য বলে ভাববে না।

এর উদার স্নেহে কোন মালিন্য দাঁড়াবেও না।

সব শুনে দেবু পাথর হয়ে যায়।

আর যাই হোক, এ রকম জটিলতা সে আশঙ্কা করে নি, এই কিছুক্ষণ আগেও—এই ধরনের কোন সমস্যা।

অনেক —অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকে।

চিন্তা অনেক। শুধু এই মেয়েটাই নয়, এর ভুলের মাশুল এ দিক গে—'পাপের মজুরী মৃত্যু' বাইবেলের সে কথা সর্বদেশে সর্বকালেই সত্য—কিন্তু ওর নিজের বোন ? মোটে এই দুটি বছর বিয়ে হয়েছে বেচারীর। কতই বা বয়স ! কথাটা

জানাজানি হ'লে আত্মীয়-বন্ধু-সমাজে যে কোন দিনই আর মুখ দেখাতে পাবে না সে। আর তা না হলেও—এর পর, জানতে পারলে স্বামীর সম্বন্ধে কী ধারণা হবে তার, সমস্ত দাম্পত্য জীবনটাই যে বিষিয়ে যাবে!

তাছাড়া, বোন তো আছেই, সত্যিসত্যিই কিন্তু এর কথাটাও বাদ দেওয়া যায় না মন থেকে।

এরও কিছু দাবী, কিছু অধিকার যে আছে তা অস্বীকার করে কি ক'রে?

হয়ত ওর নিজেরও দুর্বলতা আছে এই মেয়েটি সম্বন্ধে, ওকে ভাল না বেসে থাকলেও, ভালবাসতে চেয়েছিল এটা ঠিক।

আকর্ষণ বোধ করেছে। সাহচর্যে আনন্দ লাভ করেছে।

ভবিষ্যতের জীবনসঙ্গিনী রূপে কল্পনা ক'রে পুলকিত হয়েছে।

যতই বলুক ওর ভুলের বোঝা ওরই বহন করা উচিত—এ মেয়েটার চিন্তাও ঠেলে সরিয়ে দিতে পারবে না।

মুহূর্তের এ ভুল, এ পদস্খলন সকলের জীবনেই আসতে পারে। এ তো আরও ছেলেমানুষ—সংসারের কোন জ্ঞান কি অভিজ্ঞতাই ওর হয় নি। এই অজ্ঞানকৃত মুহূর্তের অবিবেচনার কঠোর বিচার করলে কি সেটা অবিচারই হয়ে উঠবে না?

এই যে আকুল আগ্রহে একান্ত নির্ভরে মেয়েটা চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে, যেন শ্বাসরোধ ক'রে—ওকেই বা কি ক'রে বলবে 'আমি কিছু জানি না, যা ইচ্ছা করো গে!'

এক কথায় মৃত্যুর দিকে, অথবা নিন্দিত ধিক্কৃত সবার ঘৃণিত জীবনের দিকে—অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেবে? এতখানি ভরসাকে নিরাশ করবে!

মন স্থির করতে দেবুর কোনদিনই খুব দেরি লাগে না।

মাত্র আধ ঘণ্টাটাক চিন্তা করার মধ্যেই মন স্থির করে ফেলল সে, বলল, 'একটা কাজ করতে পারি, তোকে বিয়ে করতে পারি!'

স্বভাবতঃই অরুণা চমকে উঠবে। উঠলও। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপমাত্র না ক'রে বলে চলল সে, 'কাউকে কিছু বলার দরকার নেই, কথাবার্তা বলে বাড়িতে বসে আয়োজন ক'রে বিয়ে হ'তে হ'তে আরও দুটি মাস কাটবে কমসে কম, ততদিনে তোর অবস্থা কারও জানতে বাকী থাকবে না, স্পষ্ট হয়ে উঠবে সবটাই। তাছাড়া সেক্ষেত্রে ফুলশয্যার দিন থেকে দিন গুনবে সবাই, সাত মাসে স্বাভাবিক ওজনের বাচ্চা হ'লে বিস্তর জবাবদিহি করতে হবে।...তার চেয়ে চল্ কালই ব্যবস্থা ক'রে রেজেস্ট্রি ক'রে আসি—এক ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার আছেন আমার জানাশুনো—ব্যাক ডেট দিয়ে নোটিশ লিখিয়ে কালই কাজ সারা যেতে পারবে। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে খবরটা ভাঙলেই হবে। তাতে বিয়ের কদিন পরে ছেলে হয়েছে তা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামাবে না। লাভ-ম্যারেজ যখন তখন ধরেই নেবে এর পেছনে বেশ কিছুদিনের পূর্বরাগ ছিল। এরকম বিয়ের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো ক'রে বিয়ে করার মানেই ধরে নেয় তাই। আর হয়ও—অনেকের বেলাই—খাতায়-পত্রে বিয়ে

হবার আগেই বিয়ের চেয়ে যা বড় তা হয়ে যায়—কনসেপশ্যন হয়ে পড়ে বলেই হঠাৎ বিয়ে করতে আসে।…আমাদেরও তো এই ধারণার সুযোগ নেওয়া ছাড়া পথ দেখছি না।'

সেই প্রথম দারুণ রকমের চমকে ওঠার পর থেকে অরুণা স্তম্ভিত হয়ে বসে ছিল।

বিশ্বাসই হয় না কথাটা। বুঝতে পারে না সে ঠিক শুনছে কিনা।

এত সহজে কেউ এতখানি আত্মত্যাগ করতে পারে তা সে শোনে নি কখনও, জানে না। এ তো কল্পনারও বাইরে, মানুষের সহজ স্বভাবের বিরোধী।

এ কি সত্যিই বলছে ও?

ওর মাথা খারাপ, না তার?

এত সহজে পরিত্রাণ পাবে সে, প্রতিষ্ঠিত হবে সম্মানিত জীবনে, কলঙ্কের ফসল সন্তান—সুনির্দিষ্ট পিতৃপরিচয়, সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান বলে পরিচয় দিতে পারবে?

এও কি সম্ভব?…

ব্যাকুল ভাবে বার বার নিজেকেই সে প্রশ্ন করতে থাকে শুধু।

সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থাতেই এক সময় শোনে, দেবু আবার বলছে, 'তবে এর বেশী আর কিছু আশা ক'রো না ভাই, এ দায় এ দায়িত্ব চির দিনের জন্যে বইতে পারব না। আমার সম্পত্তির শেয়ার বেচে দেব ঠিকই করেছি, কিছু ভাইরাই নেবে, কিছু হয়ত বাইরে দিতে হবে। ভেবে রেখেছি এ টাকাটা নিয়ে বোম্বাই গিয়ে ছবির ব্যবসায় নামব। সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারব না। কাজেই তোমার সঙ্গে দু-চার দিনের বেশী কোন সম্পর্কও থাকবে না, মানে লোক-দেখানো যেটুকু সেটুকুও নয়।…তবে এও কথা দিচ্ছি, আমার জীবন থাকতে এর ভেতরের কথা কেউ জানতে পারবে না।…তোমাকে এইভাবে ফেলে চলে গেলে চারদিক থেকে ধিক্কারের ঝড় উঠবে, নিন্দায় আকাশ-বাতাস ছেয়ে যাবে—আত্মীয়স্বজন সবাই একটা পশু ভাববে, কেউ মুখ দেখবে না—সব জেনেই এ কাজে নামছি, কাজেই কোন চাপে কাউকে বলে ফেলব এ সম্ভাবনা নেই। যত দুঃখই পাই, যত লাঞ্ছনাই সইতে হোক—আমি কথা দিচ্ছি, ওআর্ড অফ অনার—কেউ কোনদিন অন্ততঃ আমার দিক থেকে জানতে পারবে না তোমার লজ্জা ও অসম্মানের কথা।'

জানতে পারেও নি। কোনদিনই নয়।

সত্যি, কী লাঞ্ছনাই না সইতে হয়েছে তাঁকে।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় নাইটদের মতো, পুরাকালের বীরের মতোই সামান্য এক নারীর সম্মান রাখার জন্য নিজের জীবনভর বিপুল অসম্মান বহন করেছেন, অনায়াসে, অবহেলায়।

যা কোন মানুষে পারে না তাই করেছেন।

বলতে বলতে আজও, এতকাল পরেও অরুণা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

সবাই ভেবেছে লম্পট, হৃদয়হীন, অমানুষ।

সেকথা বলেওছে সবাই।

কেউ ঘৃণায় তাঁর নামও উচ্চারণ করত না—আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে।

তার ভাইয়েরাই চেষ্টা ক'রে ডিভোর্সটা করিয়ে দিয়েছে। অরুণার ছেলেকে মানুষ করার ভারও তারাই নিয়েছে—দাদার ক্ষমার অযোগ্য এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে।

আর একবার বিয়ের কথাও তুলেছিল, বিশেষ প্রবীর—খুবই চেষ্টা করেছিল, খুব পীড়াপীড়ি—কিন্তু অরুণা রাজী হয় নি।

'রাজী হই নি তার কারণ'—অরুণা হাত জোড় ক'রে বলেছিল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন এত বড় দুঃসাহসের কথাটা বলছি বলে—তত দিনে আমি যে তাঁকে সত্যিই ভালবেসে ফেলেছি। আগে যদি চোখ খুলত—তাহ'লে দুজনেরই জীবনের গতি হয়তঃ যেত ঘুরে। কিন্তু সে হবার নয়। এ অভাগীর অত সৌভাগ্যই যদি থাকবে, তাহলে আর—।…তবু ভালবাসা তো এত হিসেবনিকেশ বিচার-বিবেচনার ধার ধারে না ভাই। এমন মানুষ, মানুষ কেন বলছি—দেবতা, এমন দেবতাকে এভাবে দেখার জানার পর ভাল না বেসে থাকা যায়? আপনিই বলুন!…ওঃ, কী সহ্যই না করেছেন, অপরের পাপের বোঝা বয়ে কী লাঞ্ছনাই না সইতে হ'ল সারাজীবন! একবার যদি ভাইদের ঘুণাক্ষরেও জানাতেন, তারা মাথায় ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে যেত—তাদের এত বড় মহৎ উদার দাদাকে অন্তত দুটো অন্নর জন্যে কষ্ট পেতে হ'ত না।…প্রবীরদাকে তো অনায়াসেই তিনি জানাতে পারতেন—কিন্তু পাছে উনি সেটা ব্ল্যাকমেলের চেষ্টা মনে করেন—পাছে আমার গায়ে অসম্মানের এতটুকু আঁচ লাগে, প্রবীরদা অত বড় অমানুষকে সাহায্য করেছেন জানলেই লোকের সন্দেহ হবে—আমি জানি, সেই ভয়েই তিনি কোনদিন একটা চিঠি পর্যন্ত দেন নি। দাঁতে দাঁত চেপে সয়েছেন সব, জীবন দিয়েছেন কিন্তু নিজের জবান ফিরিয়ে নেন নি—নেহাত এক অপরাধিনীকে করুণা ক'রে ভিক্ষা দেওয়া জবানও!'

বলতে বলতেই যেন হাহাকার ক'রে কেঁদে ওঠে অরুণা।

সেই কান্নার মধ্যেই বলতে থাকে বার বার, 'ওঃ, আমি কী করেছি, কী করেছি। কেন সেদিন আমি মরতে পারলুম না!'

বাইরে বুঝি একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। কারা যেন নামছে কথা কইতে কইতে।

ভিজিটিং আওয়ার এটা, সম্ভবতঃ রোগী দেখতেই এসেছে, কিন্তু কোন কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করতে আসাও বিচিত্র নয়। তাছাড়া কেউ কেউ রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে আসেন হয়ত কিন্তু ভেতরে যান না—হাসপাতালের আবহাওয়া সহ্য হয় না—এখানেই অপেক্ষা করেন।

তার মানে যে কোন মুহূর্তে এবার যে-কেউ এ ঘরে এসে পড়তে পারে।

এখনই কিছু করা দরকার।

হীরা বৌদি উঠে দাঁড়ান। একটু, এক পলককাল বোধ হয় ইতস্ততঃ করেন,

তারপর ঘরে এসে কাছে দাঁড়িয়ে অরুণার পিঠে একটা হাত রাখেন। বলেন, 'ছিঃ ভাই, শান্ত হও। এখুনি কে এসে পড়বে, তখন বিষম লজ্জায় পড়তে হবে। কী না কি ভাববে সবাই। শান্ত হও, শান্ত হও।'

তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করেন, 'তুমি কি একথা ওঁদের বলেছ? আমার দেওরদের? মানে—জ্ঞানপ্রিয়বাবুদের?'

চোখ মুছতে মুছতে—আবেগে ও কান্নায়-বুজে-আসা গলায় অরুণা বলে, 'না, না। এখনও কাউকে বলি নি। বলতে গিয়েও বলতে পারি নি। তবে আর না, আর দেরি হবে না। এবার বলব।'

'না।' স্বভাববিরুদ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে বলেন হীরা বৌদি, ,না, বলো না। কাউকে কোন দিনই আর বলার দরকার নেই। তিনি যা ভাল বুঝেছিলেন—তাঁর কাজের বিচারের ভার, তাঁর ভুল—যদি ভুলই ক'রে থাকেন—তা সংশোধনের অধিকার আমাদের ওপর নেই ভাই। খোদার ওপর খোদাকারী করার আমরা কে? তিনি নিজের জীবন দিয়ে যে জবানের দাম দিলেন—সে জবান মিথ্যে করবই বা কেন? এত দুঃখ এত কষ্ট সহ্য করেছেন, এত অপমান এত হেনস্তা—লজ্জায় মুখ দেখাতে পারেন নি, পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন বন্ধুদের কাছ থেকে—দুঃসহ দুঃখ, দুনিয়ার লোকের ঘেন্না মাথা পেতে নিয়ে তোমার যে সম্মান প্রতিষ্ঠা গড়ে দিয়ে গেছেন—আমরা তাকে আজ যদি আন-ডু করি, ভেঙে দিই—তাহ'লে তাঁকেই চরম আঘাত দেওয়া হবে, তাঁর স্মৃতিকে সব চেয়ে বেশী অপমান করা হবে।'

তারপর একটু থেমে গাঢ় গলায় আবার তেমনি দ্রুতই বলে গেলেন, 'তুমি তাঁকে ভালবেসেছ, তাঁকে চিনেছ—তাঁকে শ্রদ্ধা করো—এতেই তুমি আমার আপন হয়ে উঠেছ; পরমাত্মীয় তুমি। আজ তোমার অসম্মান, এতদিন চুপ ক'রে সত্য গোপন ক'রে থেকে, সেই নিরপরাধ লোকটাকে ঘৃণ্য প্রতিপন্ন করার জন্যে যে নিন্দা-ধিক্কারের ঝড় উঠবে তোমার নামে—তা আর আমি সইতে পারব না।···আর তাতে তো সে ফিরবে না ভাই। সে দিনও আর ফিরবে না। মিছিমিছি—কী লাভই বা?···তাছাড়া—এ কথা জানাজানি হ'লে—প্রবীরবাবুর জন্যে তত মাথাব্যথা নেই—তিনিই এর মধ্যে ঘোরতর পাপী, আর কিছু না পারুন এগিয়ে এসে অন্ততঃ এঁর দিকে একটা বন্ধুর হাত বাড়িয়ে দিতে পারতেন—সে যাক গে, কিন্তু তোমার ছেলের কি অবস্থা হবে তা ভেবেছ? তোমাদের ভুল বলো ভুল, অন্যায় বলো অন্যায়—সে শাস্তি তার মাথায় চাপাবার কী অধিকার আছে তোমার? এই বয়স তার, সারা জীবনই পড়ে আছে সামনে, তার জীবনটা এমন ভাবে পণ্ড ক'বে দিও না।···এ কথার, এ ইতিহাসের এইখানেই শেষ হোক, চাপা পড়ে যাক চিরদিনের মতো।'

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে অরুণা ওঁর মুখের দিকে—অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে যাওয়া চোখ মেলে। বিহ্বল কণ্ঠে বলে, 'কিন্তু সে চিরদিন ওঁর—দেবুদার ছেলে বলেই পরিচিত হ'তে থাকবে? এঁদের চোখে বংশের বড় ছেলের মর্যাদা পাবে?···এ তুমি সইতে পারবে?'

'কেন পারব না বোন ! তুমি আজ তাঁকে সত্যকার স্ত্রীর মতোই ভালবেসেছ —তোমার সন্তানকে তাঁর সন্তান বলে মনে করতে অসুবিধে হবে কেন ? সে সুখী হোক, শিক্ষিত হোক, জীবনে প্রতিষ্ঠা সম্মান পাক—তাতে তাঁরই গৌরব বাড়বে। …না, আমার কোন দুঃখ হবে না তাতে—আমি অন্তর থেকে বলছি। সে ভাল ছেলে হোক, এই প্রার্থনা শুধু।'

তারপর পাশে বসে পড়ে অরুণাকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে বলেন হীরা বৌদি, 'তুমি এখন যাও ভাই। আর এসো না। চিঠিও দিও না। আর আমাদের দেখাশুনো না হওয়াই ভাল, কোন সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। এ সত্যের বিন্দুবাষ্প আভাসও আর কেউ না টের পায়। ওঠ ভাই, যাও এবার, লক্ষ্মীটি।'

আর সময়ও ছিল না !

বিপুল এক গাড়ি ক'রে কারা যেন এসে পড়েছে : তাদের মধ্যে কারা এগিয়ে আসছে এদিকে—ভিজিটার্স রুমে।

অরণাকে একরকম ঠেলেই বার ক'রে দেন হীরা বৌদি।

কনখলে গেলে আমি এক-আধবার অবশ্যই শ্মশানঘাটে যাই। স্থানটি নিরিবিলি বলেও বটে, ওখানেই আমার মাকে দাহ করা হয়েছে বলেও বটে। এখন অবশ্য ওখানে বড় বড় আশ্রম হয়েছে, একটি তো খুবই বড়, চারিদিক থেকে মুক্ত স্থান-টুকুকে নষ্ট করার চেষ্টার অবধি নেই। আগের সে নির্জন শান্তি আর নেই। তবে আকর্ষণও একটি জুটেছে, এক গঙ্গাপুত্র। যাকে আমরা কলকাতায় ডোম বলি, মড়া পোড়ানোর সহায়তা করে। ওখানে আবার চিতায় আগুন দিয়েই মৃতের আত্মীয়রা স্নান ক'রে ঘরে ফিরে যান, এই গঙ্গাপুত্রই দাহ করার প্রায় সব কাজ করে। আত্মীয়রা পরের দিন সকালে এসে নাভি গঙ্গায় দিয়ে চিতা ধুয়ে দেন। অন্তত কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই প্রথা ছিল, ঠিক এখনকার কথা বলতে পারব না।

এই গঙ্গাপুত্রটি সম্বন্ধে আকর্ষণের হেতু—হঠাৎই আবিষ্কার করেছিলুম—সে বাঙালী। না, উদ্বাস্তু নয়, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। অতদূরে থেকে এই কাজ করার জন্যে উত্তর প্রদেশের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে কেন এসেছে—এ কৌতূহল স্বাভাবিক।

জিজ্ঞাসা করেছি বৈকি। শুনে হাসে শুধু, কোন উত্তর দেয় না। শুধু মধ্যে মধ্যে আকাশের দিকটা দেখায়। আমিই বা কদিন তার কাছে যাই—থাকিই বা হরিদ্বারে কদিন—নিত্য খোঁচালে হয়ত একদিন বলে ফেলত।

তবে তেমন কৌতূহলও বোধ করি নি। লোকে ভাগ্যের স্রোতে ভাসতে ভাসতে এর থেকেও দূরে সরে পড়ে। তেমনিই হবে কিছু।

কিন্তু বছর পাঁচ-ছয় পরে একদিন, হঠাৎ পরিচয়ের মতোই হঠাৎ আবিষ্কার করলুম—সে শিক্ষিত। একটু-আধটু ইস্কুলে পড়া বিদ্যে নয়, রীতিমতোই শিক্ষিত। যে ইংরেজী শব্দ সে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করল তাতেই সে কথা প্রমাণিত হ'ল। এতদিন কথাবার্তা তার জীবিকার উপযোগী ভাবেই বলত, কিন্তু বহুদিনের অভ্যাস সহজে যায় না, একই লোকের সঙ্গে বেশীদিন কথা বলতে বলতে কোন-দিন না কোনদিন সে-অভ্যাস প্রকাশ পাবেই।

তখনই ঘাঁটালুম না। কারণ অদূরেই এক চিতা জ্বলছে, সেদিকে তার মনো-যোগ দেওয়া দরকার।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা আর একবার এলুম। সাধারণত সন্ধ্যাবেলা ওদিকে যেতুম না, বেলা ৪টা নাগাদ খুব জনবিরল থাকত জায়গাটা বলে সেই সময়েই যেতুম, তবু—আজ আবার এমন অসময়ে টর্চ হাতে এদিকে দেখেও—খুব বিস্মিত হ'ল না, বরং ঈষৎ ভ্রূ কুঁচকে এমনভাবে তাকাল যে মনে হ'ল বিকেলের বেফাঁস কথাটা সম্বন্ধে সেও সচেতন, এই আক্রমণটা প্রত্যাশাই করছিল।

তখন ওর কোন কাজ ছিল না। একটা চালাঘর ছিল ওর নিজের কিন্তু রান্না-

বান্না বড একটা করত না। কাছেব হোটেল থেকে ভাত কিনে খেত, কিংবা পয়সা কম থাকলে সদাব্রত-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে (যারা টাকায় ষোলআনা হিসেবে — এখন চারখানায় ঠেকেছে—রুটি বিক্রি করে, যাতে ক্রেতারা কিনে সাধুভোজন করাতে পারেন) রুটি কিনে খায়। তবে নাকি ঘরে চালডাল থাকে—কোনদিন কোন টাকা পয়সা আমদানি না হ'লে চিতার কাঠই টেনে এনে ভাত রাঁধে।

সে বেশ সহজ কণ্ঠেই বলল, 'আসুন বাবু। আজ ও ঘরটা খালি আছে—ওখানে বসার সুবিধে, এখানে কোথায় আর বসবেন—সাপ বিছে কত কি থাকতে পারে—বিচ্ছু তো আছেই—মাটিতে কি জলের ধারে বসা নিরাপদ নয়।'

'ও ঘরটা' অর্থে শ্মশানযাত্রীদের বসার ঘর। তবে শ্মশানযাত্রী খুব কমই বসে, দূরান্তর থেকে এলে এবং সঙ্গে মেয়েছেলে থাকলে তারাই বসে। সন্ধ্যার সময় বেশির ভাগই বসেন সাধু ব্রহ্মচারীর দল, কেউ বা নীরবে বসে থাকেন গঙ্গার দিকে চেয়ে, কেউ বা শাস্ত্র সম্বন্ধে তর্ক জুড়ে দেন বা জ্ঞানার্থীদের উপদেশ দেন তারস্বরে —তাঁদের জ্ঞান দূরের বড় রাস্তা থেকে যাতে কিছু শ্রোতা আকর্ষণ করতে পারে—এই আশায়। কখনও কখনও এঁদের জ্ঞানের প্রচণ্ডতার ঠেলায় মৌনী সাধু-মহাৎমারা বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে গঙ্গাতীরে বসেন।

বসলাম ঘরে গিয়ে। বসে ওকে বেঞ্চির পাশের জায়গাটা দেখাতে জিভ কাটল, বলল, 'তাই কি পারি। দিনরাত মড়া ঘাঁটছি, আসলে তো ডোমই।' বলে সামনের ধুলো-বালির ওপরই বসে পড়ল।

তাই বলে আর কোন ভনিতা করল না, বৃথা বাক্যব্যয়ও না। বলল, 'আপনি আসবেন আবার তখনই বুঝেছিলাম। হঠাৎই শব্দটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই।'

তারপর সামান্য কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, 'হ্যাঁ বাবু, আমি লেখাপড়া জানা লোক। জাতে ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্য বৈদিক, সোদপুরের কাছে ভোলায় বাড়ি। লেখাপড়া জানি বলতে পণ্ডিত নই, তবে কেমিস্ট্রীতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স নিয়ে বি এসসি পাস করেছি। এইটুকুই পর্যন্ত আমার লেখাপড়া। এম. এসসি পড়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু হয়ে উঠল না। শৈশবে বাবা মারা গিছলেন, মামার বাড়ি মানুষ, তিনিও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ তবু বোন ভাগ্নেকে ফেলেন নি, হয়ত দেনা করেও পড়াতেন কিন্তু বি. এসসি'র রেজাল্ট বেরোবার আগেই মারা গেলেন, মাও গেলেন তার মাসখানেক পরে।

'উপায় রইল না আর পড়ার। টিউশ্যনী ক'রে পড়া ও অন্নবস্ত্রের সংস্থান কবা—তাতে কোনমতে হয়ত পাস করা যায় তবে ভাল ফল আশা করা যায় না। বিশেষ আমার যা ইচ্ছে ছিল—রিসার্চ করার, তার জন্য বৃত্তি পাওয়ার মতো তত ভাল ফল হত না। আর ইচ্ছেও ছিল না। মনটা কেমন ভেঙে গেল। তা ছাড়াও, মামী আর মামাতো বোন রয়েছে, তাদের দেখা তো কর্তব্য।'

আবারও চুপ করল লোকটি। আমি কিছু অসহিষ্ণুভাবেই বলে উঠলুম, তারপর ?'

'বলছি বাবু। সবই খুলে বলব বলে ঠিক ক'রে রেখেছি মনে মনে। আপনি চলে যাবার পর এই দু'ঘণ্টা ধরে এই কথাই ভেবেছি।

'চাকরি নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি। সরকারী চাকরির চেষ্টা যে করি নি তা নয়, কিন্তু তার আগেই একটা স্কুল-মাস্টারী জুটে গেল। সায়েন্সের টিচার, মাইনে কম তবে টিউশ্যনীর সুযোগ আছে। পরীক্ষার খাতা দেখা, স্কুলপাঠ্য বই লেখা—এতে চলে যায়। বছর খানেকের মধ্যেই অসাধ্য সাধনের মতো ক'রে বোনটার বিয়ে দিলুম। দেশের বাড়ির একটা অংশ ছিল, সরিকদেরই সেটা বেচে বোনের বিয়ের খরচ উঠল খানিকটা। মামার কাছে ঋণ অনেক, এ তার কথঞ্চিৎ স্বীকৃতি বলতে পারেন।

'কিছুই নেই সঙ্গতি—দেশের বাড়িও গেছে। থাকি মামার বাড়ি। সে বাড়িও এতটুকু এবং বহু পুরনো, তবু বিয়ের জন্যে আক্রমণ চলছিলই, মাস্টারী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। এবার মামীও পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। সুতরাং বিয়েতে রাজী হতে হ'ল। কনেরও অভাব হল না। শুধু তাই নয়, গরীব ইস্কুল-মাস্টারের ভাগ্যে এক রূপসী মেয়েই জুটল।

'আনন্দ হবার কথা, জীবনের এ একটা বড় রকমের বিজয় লাভ ভাবার কথা —কিন্তু কোনটাই হ'ল না। কারণ প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছিলুম এ বিবাহে সে সুখী নয়। সে যে রূপসী সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন, বোধ হয় বহু পুরুষের মুগ্ধ স্তুতি এবং অপর মেয়েদের ঈর্ষাই তাকে সচেতন করেছিল, বোধ হয় ইচ্ছা ছিল ফিল্মের নায়িকা হবে—নিতান্ত সুযোগ-সুবিধে ঘটে নি, আর বাবার অবস্থা আমার থেকেও খারাপ—তাই এ বিয়ে করতে হয়েছিল। আশা ভঙ্গের অসন্তোষ তার কথাবার্তায় কি আচরণে ঢাকা থাকত না।

'তবু ঘর করতে হল। এক বছরের মধ্যে একটি ছেলেও হ'ল। হয়ত আরও হ'ত—তবে আমি আর বোঝা বাড়াতে চাই নি। অবশ্য তিনিও বিশেষ সুযোগ দিলেন না। পাড়ায় একটি টাউট ছিল, নিজে দিন কতক ফিল্ম্ ডিরেকটারী করেছিল কিন্তু পরপর কটা ছবি ফ্লপ করায় কেউ টাকা দিচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত টাউটে পরিণত হয়েছিল। বোম্বের ফিল্ম্ বাজারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে এমন নানা মিথ্যে বলে মেয়েগুলোকে নিয়ে যেত—তারপর তাদের কি গতি হত কেউ জানে না। তার সঙ্গে আমার স্ত্রীর কি ভাবে যোগাযোগ হয়েছিল জানি না, তিনি দু বছরের শিশু-পুত্রকে ফেলে তার সঙ্গে ভেগে পড়লেন। বাপের বাড়ি থেকে কিছুই আনতে পারেন নি, কিন্তু আমার মামীমা কিছু গহনা দিয়েছিলেন—সেইগুলো নিয়েই ভাগ্যস্রোতে ভাসলেন।

'ছেলেকে দিদিমার বাড়ি পাঠানোর কথা অনেকে বলেছিল। আমি রাজী হই নি। মামীমাই মানুষ করতে লাগলেন। তবে যে জন্ম-অভাগা তার সেটুকু স্নেহও অদৃষ্টে পাবার কথা নয়—অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। বছর চারেক বাদে মামীও মারা গেলেন। এক পুরনো ঝি ছিল, খুব বুড়ি, সে সংসার দেখতে লাগল। আমি ছেলেকে একটা মিশনারী স্কুলে দিলুম, তাদের বোর্ডিং ছিল।

মানে ছোট ছেলে রাখার মত বোর্ডিং। তার জন্যে আমাকে পরিশ্রম আরও বাড়াতে হ'ল। কোচিং ক্লাস, টিউশ্যানী—তারপর রাত জেগে নোট বই, কোশ্চেন য়্যানসার জাতীয় বই লেখা।

'ছেলেকে ভাল করেই মানুষ করতে চেয়েছিলুম। এমনি তার কেরিয়ার দেখে সকলেই বাহবা দিত, কুড়ি বছরে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স নিয়ে বি এ. পাস করল এবং নিজের চেষ্টায় একটা বড় বিদেশী ফার্মে সেলস্ প্রোমোটার-এর চাকরিও পেয়ে গেল। রূপবান বিদ্বান ছেলে, গর্ব হবারই কথা। কিন্তু স্ত্রীর বেলায় যা হয়েছিল ওর বেলায়ও তাই হ'ল। ছেলে শুধু যে পর হয়ে গেল তাই নয়—আমাকে একটু লুক-ডাউনও করতে লাগল। আমার মতো লোকের এত টাকা খরচ ক'রে মিশনারী ইস্কুলে পাঠানো ঠিক হয় নি। বুড়ি ঝির কাছে রাখলেই ভাল হ'ত। বছর দুই পরেই যখন চাকরিতে বড় একটা প্রোমোশন হ'ল, তখন কোম্পানী থেকে দিচ্ছে বলে, আলাদা একটা ফ্ল্যাট নিল। বলল, 'এ কাজে হামেশাই পার্টি দিতে হয়—বড় বড় আপিসারদের এনটারটেন করতে হয়—সে এ বাড়িতে হওয়া সম্ভব নয়।'

'বুঝলুম। দোষ আমারই। এখন আর স্রোত উল্টো দিকে বওয়ানো যায় না। খুবই একা পড়েছিলুম—কিন্তু সৌভাগ্য নয়, দুর্ভাগ্য ক্রমেই আমার মামাতো বোন রাণু বিধবা হয়ে একটি মেয়ে নিয়ে এসে এ বাড়ি উঠল। রাণু আমাকে নিজের ভাই হিসেবেই দেখত, কাজেই যত্ন আত্তির কোন অভাব রইল না। আমার তখন প্রয়োজনও ছিল। সে বুড়ি ঝি গেছে—দিনরাত পরিশ্রম দুশ্চিন্তা আর হোটেলে খাওয়া, এ আর চলছিল না। বয়সও তখন বাবু ধরুন পঞ্চাশের কাছাকাছি পেঁীচেছে।

'ভাগ্নী বিপাশা দেখতে খুব ভাল না হলেও একটা আলগা চটক ছিল। লেখা-পড়াতেও ভাল। রাণুর স্বামী অত্যন্ত খরচে ছিলেন। মার্চেন্ট আপিসের কেরানী, ভরসার মধ্যে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর গ্র্যাচুইটি—তেমনি দেনাও ছিল বিপুল। কাজেই বিশেষ কিছু টাকাকড়ি নিয়ে আসতে পারে নি। মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে আমাকেই দিতে হয়। সে সামর্থ্য আমার নেই। মানে এতদিনে বিয়ের বাজারে খরচার হিসেব বহুদূরে এগিয়ে এসেছে। বিপাশা বুদ্ধিমতী মেয়ে, বয়সেও আমার ছেলের কাছাকাছি—সে গিয়ে ছেলেকে ধরল, 'এই ভালোদা, আমাকে একটা চাকরি দেখে দে।'

'কোন অসুবিধে ছিল না। বিপাশা গ্র্যাজুয়েট। ছেলে চাকরি দেখে দিল, ওদের আপিসেই, স্টেনোর কাজ। শর্টহ্যাণ্ড জানত না—তবে তাতে আটকাল না, আমার ছেলের তখন আপিসে আরও প্রতিষ্ঠা বেড়েছে। চাকরি পাবার পর শর্ট-হ্যাণ্ড আর টাইপ করা শিখিয়ে নিল।

'আমার একটা—ইংরেজিতে যাকে বলে মিসগিভিং—ছিলই। সেটাই অবিলম্বে সত্য হ'ল, মাস তিনেক পরেই ওরা রেজেস্ট্রী ক'রে বিয়ে করল। বিয়ে হয়ে যাবার পর আমাদের জানাল—বরের বাবা ও মেয়ের মাকে। পার্টি দিল

গ্র্যাণ্ড হোটেলে। বলা বাহুল্য কেউই যাই নি আমরা। রাণু তো ঝিকে পর্যন্ত মুখ দেখাতে লজ্জা পেত। বিশেষ একদিন আমার ছেলে যখন 'রঙীন' অবস্থায় এসে শাশুড়িকে উপদেশ দিয়ে গেল—'তোমরাও বিয়ে করে নাও না। এভাবে জীবন কাটিয়ে লাভ কি। কাজিন তো, আইনে আটকায় না।'

'তাও সয়েছিলুম বাবু। বোনটার মুখ চেয়েই সয়েছিলুম। অবশ্য বলবেন, না সয়ে আর উপায় কি, ছেলে কি ভাগ্নী কেউই তো তোমার এক্তেজার নয়। তারা স্বাধীন, টাকা আছে—তাদের আর কি ক'রে শাসন করবে। তা আমিও জানতুম। তবু কিছু করার কথা তখন চিন্তাও করি নি।

'কিন্তু একদিন আমার মাছের রক্তও গরম হয়ে উঠল। সহ্যের সীমা ছাড়াল।

বিপাশা নিজেই এসে হাজির হ'ল। না, সুখের বিন্দুমাত্র চিহ্নও তার মুখে ছিল না। বরং মনে হ'ল কাঁদতে কাঁদতে তার মুখটাই বিকৃত হয়ে গেছে। অমন রঙ কালি হয়ে গেছে—যেন ধুঁকছে। পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠল—যাকে বলে ডুকরে কেঁদে ওঠা।

'ভাগ্যে তখন রাণু ছিল না, ষষ্ঠীতলায় পুজো দিতে গিছল।

'কী ব্যাপার রে! চুপ কর্ চুপ কর্। কি হয়েছে কি? অসুখ-বিসুখ ওর? - জিজ্ঞাসা করি। ছেলের নামটাও উচ্চারণ করতে ঘৃণা বোধ হ'ত।

'ক্রমে সবই শুনলুম। ছেলে—কী বলব আপনাকে বাবু—পূর্ণ বিকারগ্রস্ত, একরকম পাগল বলতে পারেন—হয়ত এসব বইতে পড়ে থাকবেন—আমিও পড়েছি। প্রথম তত বুঝতে পারে নি বিপাশা, ক্রমে এই রোগটা দেখা দিল। প্রতি রাত্রে ওকে বেদম মারে—তবে তার তৃপ্তি।

'গা খুলে দেখাল সে সব। সর্বাঙ্গে নিষ্ঠুর কঠিন আঘাতের চিহ্ন।

'আমার কিন্তু মায়া বা দয়ার চেয়ে রাগটাই হল বেশী, প্রচণ্ড। যা মুখে এল তাই বলে গাল দিলুম। বেশ হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে। এখন আমার কাছে এসেছ কেন। আমার ছেলে কেমন তা আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করলেই পারতে। যাও, এখন চলে যাও। মাকে অনেক আঘাত দিয়েছ—আর দিতে দেব না।'

'মাথা হেঁট করেই চলে গেল সে। কিন্তু আমার দিনের আহার রাতের ঘুম কেড়ে নিল। যতই ভাবি ততই মাথা গরম হয়ে ওঠে। বোনকে স্তোক দিই—অন্য কারণ দেখাই কিন্তু আমিও ক্রমশ পাগল হয়ে উঠলুম। ঐ ছেলেকে—আমার স্ত্রীর ঐ অবদানটিকে নিশ্চিহ্ন না করলে চলবে না—আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হবে না।

'শেষে দ্বিতীয়দিন—মামার দরুন একটা মোটা বাঁশের লাঠি ছিল, সেইটে হাতে ক'রে বেরোলুম। ছোটবেলায় সিমলে ব্যায়াম সমিতির আখড়ায় লাঠি তলোয়ার দুই-ই খেলেছি—অভ্যেস না থাকলেও কোন্ আঘাত মারাত্মক তা ভুলি নি। ওদের বাঁশদ্রোণীর বাড়ি যখন পৌঁছলুম তখন রাত দশটা বেজে গেছে। পাঁচিল ডিঙোতে হবে ভেবেছিলুম, কিন্তু দেখলুম সদর দরজা খোলা—হাঁ হাঁ করছে। বোধ হয় যে চাকর সেও কোথাও ফূর্তি করতে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই চাপা

চিৎকার কানে গেল—'আমাকে একেবারে মেরে ফ্যালো, শেষ করে দাও। আমি আর পারছি না।'

'ওপরে সামনেই ওদের বসার ঘর, তার সঙ্গে শোবার। দেখলুম মেয়েটাকে ফেলে অবিরাম লাথি মারছে আমার ছেলে, 'হ্যা, তাই মারব। মর্ না, মরিস না তো।'

'আমি লাঠি বাগিয়ে এগিয়েছি—ঠিক সেই মুহূর্তে ঐ রাক্ষসটা আর একটা সাংঘাতিক লাথি মারল। আমি আর থাকতে পারলুম না। সজোরে মোক্ষম মার মারলুম এক ঘা। সেই এক ঘায়েই একটা "কাঁক" এই ধরনের গলায় শব্দ করে পড়ল ছেলেটা। আর নড়ল না, কোন সাড়া শব্দ নেই।

'তখন মাথারও ঠিক নেই, দৃষ্টিরও স্বাভাবিক শক্তি নেই। তবু খানিকটা দেখে মনে হ'ল—মরেই গেছে। এমন এক ঘায়ে যে মরবে তা জানি না, সত্যিই বলছি বাবু।···কিন্তু বিপাশা অত আঘাতেও মরে নি। শুধু তাই নয়, তার মনও ওর মধ্যেই দ্রুত কাজ করেছে। বলে উঠল, 'তুমি চলে যাও মামা, এখনই চলে যাও। আমি বলব, আমি সইতে না পেরে এ কাজ করেছি। এখনই চাকরটা আসবে, তাকে মদ কিনতে পাঠিয়েছে. কোথায় গেছে তা জানি না। যে কোন সময়ে এসে পড়তে পারে। যাও মামা, দুটি পায়ে পড়ি তোমার—'

'বলতে বলতেই সে লাঠিটা টেনে নিয়ে হাত ধরার জায়গাটা নিজের আঁচলে মুছে—মানে আমার আঙুলের চিহ্নটা মুছে—নিজে বার বার চেপে ধরতে লাগল। তখনও তার মন এমনভাবে কাজ করছে—এ যেন ভাবাই যায় না।

'কিন্তু বাবু তাই করলুম আমি, কাপুরুষের মতো। চলেই এলুম।'

এর পর অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে নিজেই বলতে শুরু করলে আবার।

'কে পুলিস ডেকেছিল তা জানি না, কী হয়েছিল তাও না। খবর পেয়ে আমরাও গিছলাম বৈকি। আমি আর রাণু। বিচারও একটা হ'ল। বিপাশার কথাই করোনার এবং পরে জজ বিশ্বাস করলেন। ডাক্তারও পরীক্ষা ক'রে বলেছেন নির্মমভাবে মার খেয়েছে মেয়েটা। বেকসুর ছাড়া পেল বিপাশা।

'তারপর তাদের কি হল আমি আর জানি না। খবর নিই নি। সব ছেড়ে নানা জায়গায় ঘুরেছি পাগলের মতো। শেষে প্রায়শ্চিত্তের এই পথটাই বেছে নিয়েছি। যদি এতে আমার অনিচ্ছাকৃত পাপের শেষ হয়। ছেলে মেরেছি বলে পাপ বলছি না, সেটা গোপন করলুম—মেয়েটার ওপর সে দায় চাপিয়ে—এই পাপ।'

বজ্রে বাজে বাঁশী

উৎসর্গ

শ্রীকিষণচাঁদ বর্মণ

প্রীতিভাজনেষু

॥ এক ॥

সুভদ্রা সহসা যেন বড় ক্লান্তি বোধ করে।

আর যেন পারে না সে, আর যেন পারছে না।

এমনভাবে এই অভাবের সংসারে জোড়াতালি দিতে পারে না—পারে না এতগুলি লোকের মতিভ্রমের খবরদারি ক'রে সামলে রাখতে।

আশ্চর্য ! এদের কি কেউ স্বাভাবিক নয় !

সাধারণ সামান্য মানুষ—পথেঘাটে যা দেখা যায় ?

যারা চাকরি-বাকরি রোজগারপাতি করে, বাজার-হাটে যায়, ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয়, থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখে, বিদেশে বেড়াতে বেরোয় ?

এই তো আশেপাশে বিস্তর গৃহস্থ বাড়ি আছে, তারা তো এমনিভাবেই সহজ জীবন যাপন করে। সুভদ্রার অদৃষ্টেই বা এমন হ'ল কেন ?

ওরই অদৃষ্ট বলতে হবে।

নইলে এত জায়গা, এত লোক থাকতে এখানে এসে এদের ভাগ্যের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়বে কেন ?

সবচেয়ে বিপদ হয়েছে এই যে, এদের ভবিষ্যৎ সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, যা এরা কেউ দেখে না—দেখার চেষ্টা করে না।

ছেলেমেয়েগুলোর ভবিষ্যৎ।

কীভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এরা, কীভাবে সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সুভদ্রা একা, তায় মেয়েছেলে—একালের চাকরি-করা মেয়ে নয়, সংসারের ঘানিতে বাঁধা—তার পক্ষে ওদের ফেরানো সম্ভব নয়।

এতগুলোকে।

বৌদি, ওদের মা, যদি একটু বুঝতেন, একটু কম স্নেহান্ধ হতেন !

বুঝতেন যদি কানাইদাও !

সবচেয়ে রাগ হয় ওর কানাইদার ওপর।

আবার মাঝে মাঝে করুণাও হয়। একেবারেই অমানুষ—মানুষের যেটুকু বুদ্ধি-বিবেচনা থাকার কথা, যে দায়িত্ব-জ্ঞান, যা মানুষের থাকে—তার এতটুকুও নেই।

তা নইলে এতগুলো ছেলেমেয়ের বাপ এমনভাবে উদাসীন, নির্লিপ্ত থাকতে পারে কি ক'রে ?

ছেলেদের কথা বলতে গেলে যেন ওদের ওকালতি নিয়েই বলে, 'কী করবে বলো ! খেতে দিতে পারি না—ওরা তো এই রকমই হয়ে যাবে। এই সব ক'রে বেড়াবে।'

বলেই নিশ্চিন্ত হয়ে আবার ছবিতে মন দেয়।

যেন আর কারও, পাড়াপ্রতিবেশীর ছেলেদের কথা হচ্ছিল।

সেই সময়গুলোতে মনে হয় সুভদ্রার—এদের বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে একদিকে বেরিয়ে চলে যায়—যেখানে হোক, যে দিকে দু'চোখ যায়।

নিতান্ত এই ছেলেমেয়েগুলোর মায়াতে জড়িয়ে পড়েছে বলেই—আবারও সামলে নিতে হয় নিজেকে, আবারও গিয়ে হাঁড়িহেঁশেল ধরতে হয়। তাও সাধারণ সংসারের হাঁড়ি হেঁশেল ধরা নয়।

প্রতিদিন অসম্ভব সম্ভব করার সাধনা তার।

যেখানে এক পয়সাও আয় নেই, সেখানে ন-দশটি প্রাণীর আহার্যের সংস্থান করা।

কানাইদা চিরকালই এমনি।

অমানুষ, দায়িত্বজ্ঞানহীন।

আরও তাকে বোধ হয় অমানুষ ক'রে তুলল ওরাই—মেয়ের দল।

কেন—তা আজও জানে না, এ রহস্যটা ভাল পরিষ্কার হ'ল না কোনদিনই।

সুন্দর চেহারা আর শিল্পীর ভড়ং—শিল্পী নয় সে আদৌ, সেটুকু দীর্ঘদিনে বেশ বুঝতে পেরেছে সুভদ্রা—বোধ হয় এইতেই মেয়েগুলো পতঙ্গের মতো এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে চিরকাল।

যা দেখে ছুটে এসেছে তা যদি আগুন হ'ত সত্যি সত্যিই—নিদেন প্রদীপের আলোও, সুভদ্রার অত কিছু বলবার ছিল না।

এ সবটাই ফাঁকা, ফক্কিকারী।

কাচের বাতি এক রকম আছে, মোমবাতির মতো দেখতে, আসলে তা কাচের বাল্‌ব্‌, বিজলীর সুইচ টিপলে তার মধ্যে আলো জ্বলে—তার শিখাও নেই, তাপও নেই।

কানাই সেই জিনিস। তবু তাতেই এসে আছড়ে পড়ে মরেছে বহু মেয়ে।

রূপও এমন কিছু নয়, মেয়েলি চেহারা আর ফর্সা রঙ—এই তো সম্বল।

তবুও—

তবু ওতেই সুভদ্রাও তো মজেছিল।

আজ কার দোষ দেবে সে!

ভাবতে লজ্জাই করে আজ, উম্মত্তের মতোই ভালবেসেছিল সেদিন সুভদ্রা এই অকর্মণ্য অপদার্থটাকে।

নেহাৎ বয়সটা খুবই কম ছিল বলে নাটকীয় কিছু ক'রে ফেলে নি—আত্মহত্যার মতো কিছু।

আর কানাইয়ের কোন সঙ্গতি ছিল না বলে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করাও সম্ভব হয় নি—।

সেই বোধ করি কানাইয়ের প্রথম প্রেম। সে তখন আঠারো—সুভদ্রা পনেরো।

কিশোর-কিশোরীর লীলা বলাই ভাল প্রেম না বলে—ইংরাজীতে যাকে বলে বাছুরের প্রেম—কিন্তু বেদনা সেদিন কম বাজেনি কিছু।

আজও সে শূন্যতা, সে অতৃপ্তি, সে ক্ষোভের নিরসন হয় নি।

সম্পর্ক একটা আছে বৈকি!

তবে সে নিকট কিছু নয়।

কানাইয়ের দাদা বিশ্বনাথ বা বিশুদা সুভদ্রার মাসতুতো ভগ্নীপতি।

সুভদ্রার কোন কালেই কেউ ছিল না বলে—মা মৃত, বাবা নিরুদ্দেশ—মেসোমশায়ের সংসারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সেই সুবাদেই কানাইয়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, আলাপ-পরিচয়, প্রণয়।

দাদার শালী—প্রেম করার মতো সম্পর্ক ঠিকই।

কিন্তু কানাই তখনও বলতে গেলে স্কুলের ছাত্র, সবে ম্যাট্রিকুলেশ্যান পাস করেছে—আর সুভদ্রা মাসির বাড়ি এসে বেশী বয়সে লেখাপড়া শুরু করেছে; ক্লাস সিক্সএ পড়ে আর পুণ্যিপুকুর ব্রত করে।

সুভদ্রা দেখতেও অবিশ্যি ভাল ছিল না তেমন।

নিতান্তই সাধারণ চেহারা, শ্যাম বর্ণ।

তবু কৈশোরের নবীন রঙ তার দেহে আর মুখের হাসিতে, চোখের চাহনিতে সদ্য মায়া-তুলি বুলিয়েছে—ওরই মধ্যে একটু লাবণ্যের আভাস জেগেছে দেহে. তা ছাড়া কানাইয়ের হাতের কাছে প্রেম করার মতো এই প্রথম মেয়ে, এই প্রথম পূজা পেল সে একটি মেয়ের কাছ থেকে।

সে মেয়ে যেমনই হোক—একান্তভাবে সে আমাকেই কামনা করছে, আমার প্রসাদ চায়—ভাবতে ভাল লাগে।

সব তরুণ ছেলেরই লাগে।

তবে সুযোগ খুব একটা মেলে নি।

সুভদ্রা থাকত কালনায়—কানাই কলকাতায়।

তার কলেজ আছে—বি. এ পাস না করুক, কলেজটা উপভোগ করেছিল কানাই বেশ বছর কতক ধরেই—সুতরাং নানা ছুতোনাতায় কয়েকবার গেলেও বেশীদিন থাকা হ'ত না কোন বারেই এবং যাওয়াটাও ঘন ঘন হয়ে উঠত না।

এর মধ্যে সুভদ্রার বিয়েও হয়ে গেল।

ষোল বছরের মেয়ে, আধা-পাড়াগাঁয়ে মানুষ।

পরের দয়ার ওপর নির্ভর তার—বিয়ে ভেঙে দেওয়া বা বেঁকে দাঁড়ানোর সাধ্য ছিল না।

তবে বরবধূর যাত্রাকালে পাত্রী যে আকুল হাহাকার ক'রে কেঁদেছিল তার সবটাই মাসী বা মেসোর জন্যে নয়, হয়ত বা বেশীটাই অপরের জন্যে।

তবু সেদিন মাসী-মেসো তৃপ্ত হয়েছিলেন মেয়েটার কৃতজ্ঞতাবোধের পরিচয় পেয়ে। পাড়ার লোকও মেয়েটার এবং সেই সঙ্গে জানকীবাবুদেরও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন।

এমন নিজের মেয়ের মতো ক'রে ভালবেসেছেন বলেই না এতখানি ভালবাসা পেয়েছে।...

সাধারণ স্বামী, সাধারণ ঘর।

পাড়াগাঁয়ে সামান্য জমিজমার ওপর ভরসা।

একটা পাস-করা পাত্র, তবু শেষ পর্যন্ত তাতেই শান্তি খুঁজে পেয়েছিল সুভদ্রা, হয়ত সুখীই হ'ত একদিন, কিন্তু ওর অদৃষ্টে সে আশ্রয় বা আশ্বাস বেশীদিন সইল না।

বিয়ের এক বছরের মধ্যেই বিধবা হ'ল। তখনও শ্বশুর বেঁচে, শাশুড়ী গৃহিণী, তাঁরা এই অপয়া বৌটিকে একরকম তাড়িয়েই দিলেন।

এরাও মানে সুভদ্রার অভিভাবক পক্ষ তা নিয়ে কোন মামলামকদ্দমা করতে পারলেন না।

সম্পত্তি শ্বশুরের—তিনি যদি পুত্রবধূকে না দেন, কে কি করতে পারে!

সব আশা, সব সম্ভাবনা ঘুচিয়ে আবার সেই মাসীর ঘরে এসেই উঠতে হ'ল সুভদ্রাকে।

কিন্তু সে ঘরও আর বেশীদিন রইল না। বছর দুই পরেই জানকীবাবুর পক্ষাঘাত হ'ল।

তাঁর এক ছেলে উত্তর-বঙ্গের কোন্ এক স্টেশনে চাকরি করে—সামান্য চাকরি, তার পক্ষে টানা-পোড়েন ছোটাছুটি করা সম্ভব নয়।

সে এখানের জমিজমা বন্দোবস্তে দিয়ে মা বাবাকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখতে চাইল।

তবে তার ছোট্ট দু-কামরা রেলের কোয়ার্টার, সেখানে কোনমতে মা-বাবাকে নিয়ে গিয়ে রাখা যায়—বাড়তি কাউকে নয়।

সে দুর্দিনে বিশুদা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওকে আশ্রয় না দিলে সুভদ্রাকে বোধ হয় পথেই বেরোতে হ'ত সত্যিসত্যিই।

বিশুদার অবশ্য প্রয়োজনও ছিল একটু।

তার স্ত্রী—সুভদ্রার দিদি মায়ালতা তখনই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে দেখাশুনো করে কিংবা সংসার দেখে এমন লোক নেই।

সুতরাং সুভদ্রাকে পেয়ে বিশুদাও নিশ্চিন্ত হলেন—সুভদ্রাও বেঁচে গেল একটা আশ্রয় পেয়ে।···

উপন্যাস রচিত হবারই মতো অনুকূল আবহাওয়া তাতে সন্দেহ নেই।

একই বাড়িতে সে এবং কানাই।

তরুণী বিধবা এবং একটি অবিবাহিত সুশ্রী তরুণ যুবা।

বিশেষ দুজনের একটু পূর্বরাগেরও ইতিহাস আছে যেখানে।

কিন্তু ততদিনে সুভদ্রার মোহ কিছু ঘুচেছে।

প্রথমত, মানুষ চিনতে শিখেছে সে কিছু—দ্বিতীয়ত, কানাইয়ের স্বরূপ সে চেনার অপেক্ষাতেও বসে নেই, আপনিই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

বোঝা গেছে, মেয়েদের প্রতি আসক্তিটা ওর একটা ব্যাধি।

কত যে মেয়ে এরই মধ্যে এসেছে ওর জীবনে, কত মেয়ের পিছনে ও দৌড়চ্ছে তার সীমা-সংখ্যা নেই, সে হিসেব বোধ করি কানাই নিজেও রাখে না।

শুধু তাই নয়, এর মধ্যে বন্ধনেও জড়িয়ে পড়ল কানাই।

যারা সহজলভ্য, পথে-ঘাটে বেরোয়, তাদের জন্যে জাল ছড়াবার প্রয়োজন হয় না।—কিন্তু যারা দর বাড়াতে জানে তাদের জন্য নির্বোধ পতঙ্গ যেচে বন্ধনদশা বরণ করে।

প্রধানত অন্তঃপুরবদ্ধা একটি বন্ধুর বোন তার প্রতি আসক্ত হয়েছে জনশ্রুতি শুনে কানাইও প্রবল আকর্ষণ বোধ করল—ভাল করে না দেখেই।

আর বিবাহ ছাড়া তার সঙ্গে মিলিত হবার কোন উপায় ছিল না বলে বাবা এবং দাদার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিয়ে করবে কথা দিয়ে বসে রইল।

তখন কানাইয়ের মাত্র একুশ বছর বয়স।

বাবা ও দাদার আপত্তি আরও এই জন্যেই।

তা নইলে অজাত কুজাত কিছু নয়—সঘরেরই মেয়ে।

ভদ্র, জানা বংশ।

কিছু একটা উপার্জনের পথ হবার পর, অন্তত চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে বিয়ে করলে কিছুই বলবার ছিল না তাঁদের।

যাঁরা বিয়ে দিলেন, শোভার বাবা-জ্যাঠারও আপত্তি থাকা উচিত ছিল, কিন্তু সঘরের অবস্থাপন্ন সুশ্রী পাত্র দেখেই তাঁরা ঝুঁকে পড়লেন।

এত সহজে কন্যাদায় উদ্ধার হ'লে আর কে ছাড়ে।

সত্যিই তখন অবস্থাপন্ন ছিল এরা—কানাইরা।

কানাইয়ের বাবা তখনও বেঁচে।

মাঝারি গোছের পেন্সন পান—সবটাই তিনি ছোট ছেলেকে পাঠিয়ে দেন তার হাত-খরচের জন্যে।

দেশে জমি-জায়গা সামান্য যা আছে তাতেই তাঁর নিজের খরচ চলে যায়।

স্ত্রী নেই, ভদ্রলোক একাই থাকেন। সেখানে একটি চাকর ও এক বৃদ্ধা মাসীমার ভরসায়।

দাদা বিশ্বনাথের মনোহারী দোকান, খুব রৈ রৈ ক'রে না চললেও যথেষ্ট আয় হয়।

একান্নবর্তী পরিবার, দাদাই সংসার চালান।

ভাইয়ের কাছে তিনি পয়সার প্রত্যাশীও নন। তা নিয়ে মাথাও ঘামান না।

এমন কি বাবার পেন্সনের যে টাকাটা আসে সেটা নিয়ে কানাই কি করে, সে সম্বন্ধেও কখনও কোন প্রশ্ন করেন না।

বরং—তা ছাড়াও যখন কানাইয়ের কিছু টাকার দরকার হয় সে অম্লানবদনে দাদার কাছে চেয়ে নেয়—দাদাও বিনা প্রশ্নে তা দিয়ে দেন।

কানাই শিল্পী—একদিন সে নাম করবে, খ্যাতিমান হবে—একথা বোধ করি কানাইয়ের সঙ্গে তাঁরাও বিশ্বাস করতেন—বাবা আর দাদা।

কানাইও সেই সুযোগে কাগজ, রঙ, তুলি নিয়ে ছবি-আঁকা খেলা ক'রে যেত এবং নিজের সৃষ্টিতে নিজেই চমৎকৃত হয়ে আত্মপ্রসাদে স্ফীত হ'ত।

এইভাবেই চলছিল।

চলেছিল বেশ বছর কতক।

ততদিনে কানাইয়ের দুটি ছেলেমেয়েও হয়ে গেছে।

হঠাৎ একটা বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেল।

কানাইয়ের বৌদি মায়া মারা গেলেন।

বিশুদারও অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল, অল্প বয়সেই ছেলে হয়েছে, ছেলেকে বরাবরই বাইরের মিশনারী ইস্কুলে রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছেন—ছেলে অল্প বয়সেই আই. এ. এস. পাস ক'রে ভাল চাকরি পেয়ে গেল।

বিশুদা এখানকার বাসা ভেঙে সদ্য মাতৃহীন ছেলের কাছে চলে গেলেন।

তাঁর নিজের হাতেও কিছু টাকা ছিল, দু-একটা মোটা জীবনবীমা—ঠিক গলগ্রহ হবারও অবস্থা নয়।

ছেলের কাছে হাত না পা তলেও তাঁর বাকি জীবনটা অনায়াসে চলে যাবে।

অবশ্য ছেলেও তেমন নয়—সুশিক্ষাই পেয়েছে সে, চিরদিন—যতদিন বিশুদা বেঁচে ছিলেন তাঁকে মাথায় ক'রেই রেখে দিয়েছিল।

বিশুদার এখানে কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না, ছিল না কোন বন্ধনও। বাবা বছরখানেক আগেই মারা গেছেন, দেশের বিষয় তিনি পৈতৃক বাড়িটা বাদ দিয়ে সব দিয়ে গেছেন তাঁর দুঃস্থ ভাগ্নেকে।

তারা পাড়াগাঁয়েরই লোক, বিষয় নেড়েচেড়ে খেতে পারবে—এরা কস্মিনকালে যাবেও না, গেলেও দু-চারদিনের জন্যে, তাতে জমিজমার ফসল ঘরে তোলা বা তা বেচে-কিনে টাকা আনা সম্ভব হবে না—এ কানাইয়ের বাবা ভালই জানতেন।

কানাইয়ের এবার চোখে অন্ধকার দেখা উচিত ছিল, কিন্তু সে একটুও বিচলিত হ'ল না।

বিচলিত হ'ল সুভদ্রা আর কানাইয়ের স্ত্রী শোভা।

বিশুদা দোকান বেচে দেবেন স্থির করেছিলেন, দরও বেশ ভালই পাওয়া গিয়েছিল, এখন শোভার কান্নাকাটিতে তিনি লেখাপড়া ক'রে দোকানটা কানাইকেই দিয়ে গেলেন।

বললেন, 'সকাল বিকেল গিয়ে একটু বসিস। চলতি কারবার—যদি অযথা ধার-বাকি দিয়ে না উড়িয়ে দিস, এতেই তোর সংসার বেশ চলে যাবে। এতেই তো আমিও চালিয়েছি, এতগুলো লোক, অসুখ-বিসুখ সবই এই একটা আয় থেকে চলেছে। তোর বৌদির অসুখে তো ক'বছর কম খরচ হয় নি। তবে নিজেকে বসতে হবে। দুপুরে বরং বন্ধই রাখিস, বারোটা থেকে চারটে—সে সময় তোর ছবি আঁকার কাজ করতে পারবি। কিন্তু দোকান খোলার সময় সকাল সন্ধ্যে নিজে গিয়ে বসিস : আর ছবি তো ঢের আঁকলি, এ দেশে ছবি এঁকে সংসার চালানো

যায় না। বিশেষ যতদিন রাজা-মহারাজারা ছিল ততদিন একরকম ছবি—বুঝুক না বুঝুক কিনতেই হ'ত প্রেস্টিজ বজায় রাখার জন্যে। এখনকার বড়লোক হ'ল ব্যবসাদার বেনে—তাদের কাছে ও ঝুটো প্রেস্টিজের কোন দাম নেই।'

ভালই বলেছিলেন বিশুদা।

ভাইকে যে তিনি সত্যিই ভালবাসতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই, অন্তত এরপর আর থাকা উচিত নয়। তার যাতে যথার্থ হিত হয় সেই ভেবেই কথাটা বলেছিলেন।

কিন্তু কানাইয়ের ভাল লাগে নি। দাদা তার প্রতিভা বুঝতে পারেন নি—তাই এমন কথাটা অনায়াসে বলতে পারলেন।

শিল্পী, সে যাবে দোকানদারী করতে!

দাদা কথাটা ভাবতে পারলেন কি করে!

...অবশ্য পৃথিবীর কোন্ শ্রেষ্ঠ শিল্পীকেই বা তার আত্মীয়-স্বজনরা কবে চিনতে পেরেছে?

প্রতিভার এই তো অভিশাপ।

এই ভেবেই সে ক্ষমা করল দাদাকে।

দোকানটা কর্মচারীর ওপর ছেড়ে দিয়েই বসে ছিল কানাই।

শোভা বৌদি এই সময় আর একটা বোকামি ক'রে বসল।

যে দুজন পুরনো কর্মচারী ছিল বিশুদার, তাদের হাতে রাখলে হয়ত তারা একেবারে মূলে হাত দিত না।

কারণ তারা সংসারী লোক, অল্পশিক্ষিত—দোকান থাকলেই তাদের লাভ।

অকারণে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে শোভা নিজের ছোট ভাই হরিশকে এনে বসল দোকানে।

অল্প বয়স তার, কুড়ি-একুশের বেশী হবে না।

হাতে বেহিসেবী—অর্থাৎ হিসাব দিতে হবে না এমন কাঁচা পয়সা এসে পড়ল।

তার দামী সিগারেট, টেরিলিনের জামা, চোদ্দ জোড়া জুতো এবং মোসাহেবে—অতদিনের দোকানের স্তূপীকৃত মাল সব নিঃশেষে উড়ে গেল।

বছর তিনেকের মধ্যেই দোকান শেষ ক'রে ভগ্নীপতির মাথায় বিপুল দেনা চাপিয়ে একদিন সরে পড়ল হরিশ।

শোনা যায়, সেই থেকে আর বাড়িও ফেরে নি, বাইরে বাইরেই ঘুরছে। জোচ্চুরিটাই পেশা ক'রে নিয়েছে।

সেই থেকেই চলছে এই একটানা অভাব আর উঞ্ছবৃত্তি।

কানাই এখনও তার বিশ্বাসে অটল আছে—সে উঁচুদরের শিল্পী, একদিন না একদিন তার প্রতিভার স্বীকৃতি পাবে সে, চারিদিক থেকে টাকা নিয়ে ছুটে আসবে লোক, যামিনী রায়ের মতো বিলেত-আমেরিকায় তার ছবির কদর হবে।

ততদিন—সামান্য একটু কষ্ট করতে পারবে না তার বাড়ির লোকেরা?

সব সিদ্ধির মূলেই সাধনা থাকে একটা। সেটা একটু আয়াসসাধ্য তো হবেই।

এই 'একটু কষ্ট'টা যে কি—সে সম্বন্ধে ওর খুব স্বচ্ছ ধারণা নেই অবশ্যই।

কারণ দুবেলা তার নিজের খাদ্য এবং আনুষঙ্গিক চা সিগারেট কোথা থেকে আসছে তা নিয়ে তাকে কোনদিনই মাথা ঘামাতে হয় না, তেমনি ছেলেমেয়েদের খাবারও কে যোগাচ্ছে তাও ভাবার প্রয়োজন নেই।

সেটা ভাবে শোভা ও সুভদ্রা।

বহু কাণ্ড করতে হয় তাদের এজন্যে। মাঝে বাধ্য হয়ে সুভদ্রাকে পাড়ায় একটা ঠিকে রান্নার কাজও নিতে হয়েছিল গোপনে।

এক ভদ্রমহিলার রান্না ক'রে দিয়ে আসত।

তাঁর বেলায় খাওয়া—এখান থেকে সাড়ে নটায় বেরিয়ে গিয়ে তাঁর রান্না ক'রে বারোটায় ফিরে আসা চলত।

রাত্রে আরও কম, ঘণ্টাখানেকের জন্যে যেতে হত একবার।

দুর্ভাগ্যক্রমে—মানে এদের দুর্ভাগ্য—তিনি মাস ছয়েকের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠে নিজের রান্না নিজেই করতে শুরু করলেন, সুভদ্রার সাহায্যের আর দরকার রইল না।

আশ্চর্য! কোথা থেকে যে আসছে এই বিরাট সংসারের বিপুল খরচা, সে কথাটা একবারও ভাবে না কানাইদা!

প্রশ্ন তো করেই না।

শোভাকেই হাত পাততে হয় নানা লোকের কাছে।

কখনও 'ধার' বলে, কখনও বা সোজাসুজি সাহায্যই।

আত্মীয় মহল রীতিমতো বিরক্ত হয়ে উঠেছে, তারা এখন সযত্নে ওদের পরিহার ক'রে চলে—প্রতিবেশীদের এড়ানোর উপায় নেই বলে তারা পড়ে মার খায়।

ভাশুরপোকেও সে লিখেছিল একবার অনেকদিন আগে—লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে—সে পত্রপাঠমাত্র একশ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিছুদিন পরে আবারও লিখতে—ছেলেমেয়েদের শিক্ষার দোহাই দিয়ে লিখেছিল শোভা—সে জানতে চেয়েছিল, মোট ওদের স্কুলের মাইনে কত এবং তারপর থেকে সেই হিসেবমতো পঞ্চাশ টাকা করে পাঠায় প্রতি মাসে। এর পরও দু-একবার অন্য অজুহাতে চিঠি দিয়েছিল শোভা, নিতান্তই নির্লজ্জের মতো, তার আর উত্তর আসে নি।

শোভা এ নিয়ে অনুযোগ করে।

একটানা অভাবে বোধ হয় মানুষ এই রকমেই স্বার্থপর হয়ে যায়।

তা নইলে আশীষের সম্বন্ধে এমন ধরনের মনোভাব প্রকাশ করতে পারত না সে!

সুভদ্রা সেই কথাই বলে ওকে, তিরস্কার করে, 'তোমার লজ্জা করে না বৌদি—তার কাছে তোমরা চিরঋণী। তার প্রাপ্য সম্পত্তি বিশুদা অনায়াসে তোমাদের দান ক'রে দিয়ে গেলেন—বিক্রি হলে দশ-বারো হাজার টাকা তো পেত অক্লেশে, বেশী ছাড়া কম না—সে একটি কথাও বলল না। তার ওপর, প্রতি মাসে এই

মাসোহারা টেনে যাচ্ছে—ভাইদের মুখ চেয়ে, তাদের শিক্ষার খরচা বলে, যে খুড়তুতো ভাইদের সে কখনও বোধ হয় চোখেও দেখে নি, দেখলে চিনতে পারবে না। তার ওপরও তুমি তার কাছ থেকে সাহায্য আশা করো কি ক'রে ? তার তো আর কিছুই নেই। না পেল ঠাকুর্দার সম্পত্তি, না পেল বাপের। ঐ তো কটা টাকা মাইনে ভরসা। তারও তো সংসার হয়েছে, ছেলে হয়েছে—তাকে, তাদের তুমি কি দিতে পারছ ?'

বকুনি খেয়ে চুপ ক'রে থাকে শোভা, হয়ত এ সবই বুঝতে পারত সে, বিবেচনার এমন একান্ত অভাব ঘটত না যদি দিবারাত্র এই বিপুল সংসারের বিপুল ক্ষুধার কথা না ভাবতে হ'ত তাকে।

॥ দুই ॥

এদিকেও যদি একটু হিসেব থাকত কানাইদার।

মোটামুটি শিক্ষিত সে, ইংরেজী বই কাগজ পড়তে পারে।

বর্তমান কালের চিন্তাধারণা সম্বন্ধে একেবারে কিছু অজ্ঞ নয়।

অনায়াসেই সংসারের আয়তন সাধ্যসীমার মধ্যে রাখতে পারত।

তার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলেই রেখেছে—কারও এতগুলো ছেলে-মেয়ে নেই।

শুধু কানাইদাই যেন সৃষ্টিছাড়া, গোত্রছাড়া।

অনেক সময়, প্রথম দিকে মেয়েই শুধু হতে থাকলে বাপ মা পুত্র-সন্তানের আশায় বহু সন্তানের জন্ম দিয়ে যায়, কানাইয়ের সেটুকু কৈফিয়তও নেই।

পর পর প্রথম দুটিই ছেলে তার—তার পর মেয়ে।

এখনও মোট পাঁচটি ছেলে, দুটি মেয়ে। ছেলের সংখ্যাই বেশী।

আগে নাকি বেশির ভাগ বাপ-মারা মেয়ে হ'লেই অসন্তুষ্ট বা দুঃখিত হতেন।

আশাভঙ্গের কারণ ঘটত তাঁদের।

মেয়ের থেকে ছেলেরই বেশী দাম ছিল বাঙালীর সংসারে।

এখনও সে শ্রেণীর বাপ-মা একেবারে বিরল নয়—কিন্তু সুভদ্রার মনে হয়—অন্তত চারিদিকে যা দেখছে—ছেলের থেকে এখনকার দিনে মেয়েই কাম্য।

মেয়েরা লেখাপড়া করে, উন্নতি করার চেষ্টা করে। দরকার হ'লে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট ক'রেও বাবা-মার সংসার চালায়, ভাইবোনদের মানুষ করে।

বুড়ো বয়সে তারাই বাবা-মাকে দেখে—বিয়ের পরও।

ছেলেদের ওপর আজকাল আর কোন আশাই করা যায় না।

তাদের মানুষ করাই কঠিন—সামলে রাখা, লেখাপড়া শেখানো তো কঠিন বটেই।

বাইরের বহু আকর্ষণ তাদের।

চারিদিকে অসংখ্য ফাঁদ পাতা।

তারপর, যদি-বা লেখাপড়া শিখল, চাকরি-বাকরি করল—বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এদিকের দায়িত্ব ত্যাগ ক'রে আলাদা সংসার পাতার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

তাদের কাছে আর কিছু প্রত্যাশা করাই নির্বুদ্ধিতা···

এতগুলো ছেলেমেয়ে সামলানোটাই বড় সমস্যা।

মানুষ ক'রে তোলা।

সংসারের নিত্য অভাব, দৈনন্দিন বেঁচে থাকার যুদ্ধ তো আছেই।

প্রতিদিনই দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা নিয়ে সকাল হয় সুভদ্রার জীবনে। রাশি রাশি দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা নিয়েই শুতে যায় সে।

তার ওপর এদের শিক্ষা, এদের ভবিষ্যতের চিন্তা আরও যেন তাকে অবসন্ন ক'রে দেয়।

এটা সম্পূর্ণ সামলাতে হয় তাকেই—আর কোথাও থেকে কোন সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

বরং ওদের বাবা ও মা সমস্যাটাকে আরও জটিল, আরও দুঃসহই ক'রে তোলেন।

কানাইদা এখনও—আজও—বড় ছেলে হাবুর বয়স এই ষেটের একুশে পড়ল—একটির পর একটি মেয়েকে ধরছে।

সে সম্বন্ধে তার কোন লজ্জাও নেই, ভয়ও নেই। তারা প্রকাশ্যেই আসে, বাড়িতেই, কানাইদার তথাকথিত স্টুডিওতে কাটায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আবার কানাইদাও তাদের সঙ্গে বাইরে চলে যায়।

কখনও কখনও তাদের এগিয়ে দেবার নাম ক'রে বেরিয়ে পড়ে—তারা তিন-চার ঘণ্টা থাকার পরও।

কোথায় যায় কে জানে—ফেরে রাত নটা-দশটায়, সকালে বেরোলে আসতে দুটো-তিনটে বেজে যায়।

হয়ত বা মেয়েটাকে নিয়েই ফেরে।

মনোভাব বা আচরণ সম্বন্ধে কোন দ্বিধা বা সংশয়ের অবকাশ নেই—সে সম্বন্ধে কোন আবরণের প্রয়োজন আছে তা মনে করে না কানাইদা।

আরও মুশকিল হয়েছে—শোভা বৌদি নিপাট ভালমানুষ হয়েই।

একটা কথাও সে বলতে পারে না কানাইদাকে, শুধু আড়ালে চোখের জল মোছে আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

প্রথম থেকেই তার কেমন একটা অকারণ ভয়-ভয় ভাব, কে যেন কী ক'রে তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, কানাইদার মতো রূপবান এবং শিল্পী স্বামী পাওয়া তার আশাতীত সৌভাগ্য।

সে কোন অংশেই অমন স্বামীর উপযুক্ত নয়।

তার রূপের দৈন্যের জন্যেই স্বামীকে অন্যত্র আশা মেটাতে হয়—এইটেই বিশ্বাস ক'রে নিয়েছে সে।

ওকে বিয়ে ক'রে অনেক স্বার্থত্যাগ করেছে স্বামী। এখন তার জন্যেও কিছু

স্বার্থত্যাগ করা ওর প্রয়োজন।

তাই স্বামীর মন রাখতেই আরও—কানাইদার এই সব সাময়িক প্রণয়িনীদের মিষ্ট সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করে, চা জলখাবার দেয়, ভাত খেয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে—এবং বিদায়কালে বার বার 'আবার এসো ভাই' বলে আন্তরিকতা জানায়।

অথচ শোভা বৌদি আদৌ খারাপ দেখতে নয়।

রঙটা আর একটু উজ্জ্বল হ'লে ডাকের সুন্দরী বলা চলত।

কানাইদার অন্তত স্বার্থত্যাগ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।···

শোভা যেমন স্বামীকেও শাসন করতে পারে না, তেমনি ছেলেদেরও না।

তা ছাড়া ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে তার অন্ধ অনুরক্তি।

সে ওদের কিছুই খারাপ দেখে না কখনও, চোখে দেখলেও বিশ্বাস করে না।

কৈফিয়ত টানবার চেষ্টা করে—কার দোষে কার জন্যে এমন কাজ ক'রে বসল।

এই ক'রেই হাবুকে নষ্ট করেছে সে।

স্কুল-ফাইন্যালটাও পাস করতে পারল না—তার আগেই সব রকম বকামিতে পাস ক'রে গেল।

সিগারেট বিড়ি তো তুচ্ছ—মদ, মেয়ে এবং আনুষঙ্গিক খরচ যোগানোর জন্যে চুরি-জোচ্চুরিতে সুদ্ধ পেকে উঠল বিশ বছর বয়স হবারও আগে।

তার ফলে কানাইয়ের মতো নির্বিকার লোকেরও টনক না নড়ে উপায় রইল না। দুনিয়াভর অপরিচিত পাওনাদার এসে যখন হাবুর নাম ক'রে তাগাদা শুরু করল, তখন বাধ্য হয়েই বলতে হ'ল, ছেলের জন্যে দায়ী নয় সে এবং একদিন ছেলেকেও বলতে হ'ল 'বেরিয়ে যাও'।

ছেলে অবশ্য তার আগে থাকতেই রাত্রে বাড়িতে থাকা ছেড়ে দিয়েছে।

আসাটাও অনিয়মিত হয়ে উঠেছিল।

এখন সেটা আরও কমিয়ে দিল এই পর্যন্ত। তবে যেদিন আর কোথাও কিছু জোটে না, সেদিন দুপুরে চুপি চুপি বা সন্ধ্যার পর বাবার বাড়ি না-থাকবার অবসরে এসে খেয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে যা পায়—মায়ের কাছ থেকে আদায় ক'রে নিয়ে যায়—কিঞ্চিৎ দক্ষিণাও।

কী করে এবং কোথায় থাকে এখন তা কেউ জানেও না এরা।

বাকি ছেলেগুলো অবশ্য বকে যাওয়া যাকে বলে তা যায় নি—কানাইদার বাবার পুণ্যেই সম্ভবত।

খুব ভাল নয় কেউই—তবু লেখাপড়াটা কোন রকমে বজায় রেখে যাচ্ছে—নিমাই, গোরা, সবু, বাবুন সকলেই, ফার্স্ট সেকেণ্ড না হোক, ফেলটেল কেউই করে না বিশেষ।

তবু তো কারুরই মাস্টার নেই বাড়িতে, যা পারে নিজেরাই পড়ে নেয়।

মেয়ে দুটো অবশ্য খুবই ভাল। ওদেরও পড়া বলে দেবার লোক নেই, তবু দুজনেই ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে ওঠে বরাবর।

দীপ্তা তো এবার হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করেছে স্কলারশিপ পেয়ে—কলেজে ফ্রী ক'রে নিয়েছে সেই জন্যে।

এদের নিয়ে অন্য অশান্তি।

এদের মনে মনে নিয়তই একটা অসন্তোষ—একটা যেন কী অভিযোগ ধূমায়িত।

সে অসন্তোষও স্বাভাবিক, তার জন্যে খুব একটা দোষ দিতে পারে না সুভদ্রা।

কারণ অন্য ছেলেমেয়েদের মতো সহজ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এদের নয়। নিত্য অভাব, নিত্য টানাটানি—নিত্য বেইজ্জৎ হওয়া।

সে অপমান ঢাকার জন্য অজস্র মিথ্যার জাল বয়ন করা।

অল্প বয়স ওদের—ক্ষুধাও যেমন তীব্র, তেমনি প্রবল ওদের স্বাচ্ছন্দ্যের, সম্ভোগের তৃষ্ণা।

সে ক্ষুধা, সে তৃষ্ণা কোনদিনই বোধ হয় মেটে না।

অন্য বন্ধুদের বাড়ি যা দেখে, ওদের বাড়িতে তা নেই।

পদে পদে ইচ্ছাকে সঙ্কুচিত করতে হয়।

প্রায় প্রতি মুহূর্তে অপরের জীবনযাত্রার সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য, ছোট ছোট সম্ভোগের অজস্র উদাহরণ সচেতন করে দিয়ে যায় ওদের অপরিসীম দৈন্য ও হীন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে।

অসন্তোষটা অস্বাভাবিক নয়—অস্বাভাবিক যেটা সেটা ওদের মনোভাব। এর জন্যে ওরা ওদের বাবাকে দায়ী করে না—ওর বাবা ও মায়ের মতো এটাকে ওরা বর্তমান সমাজব্যবস্থার গলদ—পৃথিবী ও তাবৎ মানবসমাজের অবিচার বলে মনে করে।

ওদের ধারণা, ওদের বাবা খুব উঁচুদরের শিল্পী—কিন্তু সে প্রতিভা স্ফুরণের সুযোগ কেউ দিচ্ছে না।

যেন একটা ষড়যন্ত্র ক'রে চিরদিন দমিয়ে রেখেছে—অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে এত বড় অসামান্য একটা প্রতিভাকে চুবিয়ে শ্বাসরোধ করে মারছে সবাই।

নিমাই, দীপ্তা ও গোরা বড় হয়েছে—স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কী হয়েছে তা জানা না গেলেও, মোটামুটি ধারণা করতে যে অসুবিধা হয় না—এ বিষয়ে সুভদ্রা নিঃসন্দেহ।

এই মেয়েগুলো ওদের বাবার কাছে কেন আসে, কী চায় এরা, এদের কাছেই বা ওদের বাবার কী কামনা—এত হাসি আড্ডা কেন, এবং আড্ডাটা কি জাতের—তা ওরা নিশ্চয়ই বোঝে।

সেই সঙ্গে এও বোঝে যে, ওদের সামান্য ক্ষুদ্র পুঁজি থেকেও ওদের বঞ্চিত ক'রে বুভুক্ষু রেখে ওদের বাবা বেশ খানিকটা টাকা এদের পেছনে খরচ করছে।

তবুও বাবাকে দায়ী করে না ওরা।

বাবা শিল্পী, তাঁর নাকি এটুকু চাই—এটুকু অবকাশ।

এটাই নাকি সংসারের শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ার, জীবনের কারাগারের সামান্য বাতায়ন। এটুকু না থাকলে শিল্পী বাঁচবে কিসে?

আর ওদের বাবা তো সামান্য কেরানী নন কি কারখানার মিস্ত্রী যে, প্রাণপণে খেটে ওদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবেন।

সমাজ তথা সরকারেরই উচিত—তাঁর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা।

যে কোন সভ্য সরকারেরই নাকি এটা দায়িত্ব।

হায় রে।

এদের কথাবার্তা শুনে দুঃখের মধ্যেও হাসি পায় সুভদ্রার।

এই ছেলেমেয়েগুলোর বুদ্ধির অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না।

দারিদ্র্যের হীনতা এরা এই অহংকারে ঢাকতে চায়।

ওরা নাকি খুব বোঝে।

অথচ ওদের বাবা ছেলেবেলা থেকে যা শুনিয়েছেন, অন্ধভাবে, নির্বোধের মতো মূঢ়ের মতো, নির্বিচারে সেইটেই বিশ্বাস ক'রে এসেছে—চোখে যা দেখছে তাও বিশ্বাস করে না, অথবা বিচার ক'রে দেখার মতো শক্তিই ওদের নেই—বাবা যা বলেছেন বলেন—তোতাপাখীর মতো কপ্‌চে যায় শুধু।

নিজেদের বুদ্ধিবিবেচনার ওপর এতটুকু ভরসা করতে পারে না।

শুধু যদি ওরা ওদের বিশ্বাস ও ধারণা নিয়েই থাকত তো কিছু বলবার ছিল না। ঘরে বসে যা কিছু ভাবুক, যত খুশি রাজার মাকে ডাইনী বলুক—কার কি আপত্তি।

কিন্তু এরা ঐখানেই আবদ্ধ নেই, এ অসন্তোষের যা অবশ্যম্ভাবী ফল—ধীরে ধীরে রাজনীতির আবর্তে গিয়ে পড়ছে।...

তাও, সুভদ্রা তার শৈশবে যে রাজনীতি দেখেছে—যে রাজনীতির গল্প শুনেছে মামা-মামীর মুখে, দাদা-কাকাদের মুখে, সে রাজনীতি হ'লেও কথা ছিল।

বর্তমান যুগের অসহিষ্ণু, নিষ্করুণ, নৃশংস রাজনীতি এ।

সর্বকালে সর্বদেশেই এই শ্রেণীর নির্বোধদের জন্যে রাজনীতির ফাঁদ পাতা থাকে বোধ হয়।

শুধু দিনে দিনে তার চেহারাটা পাল্‌টাচ্ছে।

ভয়ঙ্কর সে ফাঁদ।

ভয়াবহ এ রাজনীতি।

এর আবর্তে টিকে থাকার মতো, তার টান কাটিয়ে তীরে এসে ওঠার মতো শক্তিমান নয় এরা,—সেই জন্যেই এত ভয়, এত চিন্তা সুভদ্রার।

এরা মরবে।

রাজনীতি বুদ্ধিমানের খেলা, নির্বোধের পক্ষে মৃত্যু।

সুভদ্রা তেমন লেখাপড়া না শিখলেও খবরের কাগজ প'ড়ে প'ড়ে লোকের মুখে শুনে শুনে অনেক কথাই বুঝতে পারে।

এটুকু সে জানে যে, রাজনীতিতে মুষ্টিমেয় একদল অসামান্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি অসংখ্য নির্বোধ, অনভিজ্ঞ, ভদ্রাভদ্র-বিচারশক্তিহীন লোকের ভবিষ্যতের মূল্যে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নেয়, স্বার্থসিদ্ধি করে।

এখানে কোন মাঝারি মস্তিষ্কের স্থান নেই।

'হেথায় বুদ্ধিমান চুরি করে বোকায় পড়ে ধরা'—ছেলেবেলায় শোনা নলিনী সরকারের কমিক গানের এই লাইনটি রাজনীতির ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

নেতা যাঁরা তাঁরা বেঁচে যাবেন—অথবা সুবিধা-মতো বর্ণ-বদল করবেন—এই অজ্ঞান, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েগুলো, আবেগে আর উচ্ছ্বাসে যাদের ভবিষ্যৎদৃষ্টি আচ্ছন্ন—এরাই মরবে।

দেখছে, অনুভব করছে, কিন্তু বাধা দিতে পারছে না সুভদ্রা!

যাদের শক্তিতে ওর শক্তিমতী হবার কথা, সেই বাবা যে নির্বিকার, উদাসীন—ও কি করবে?

বসে বসে শুধু দেখছে—কেমন ক'রে ক্রমাগত কঠিনতর ফাঁস এঁটে বসেছে ওদের গলায়, কী মুক্তি-উপায়হীন বন্ধনে জড়িয়ে পড়ছে ওরা।

সাধ ক'রে সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

দিন দিনই বেপরোয়া হয়ে উঠছে, বিশেষ নিমাই সবু আর দীপ্তা।

সন্ধ্যার পরই কোথায় বেরিয়ে যায়—কোন দিন খেয়ে যায়, কোন দিন সে সময়টুকুও হয় না—ফেরে গভীর রাত্রে।

কোন ভদ্র গৃহস্থ বাড়ির শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েরই ফেরার সময় নয় সেটা।

বারোটা, একটা, কোন কোন দিন দুটো আড়াইটেও হয়ে যায়।

কোন দিন বা অন্ধকার আকাশে ঊষার ছোঁয়াচ লাগারও পর জাগরণ ও উপবাসক্লিষ্ট ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে আসে।

চোখের কোলে কালি; শীর্ণ মুখে রক্তহীন পাণ্ডুরতা—কিন্তু দৃষ্টিতে হিংস্র উত্তেজনা—উগ্র, ক্রূর দৃষ্টি।

আগের সেই ক্ষুধার্ত লুব্ধ ক্ষুণ্ণ দৃষ্টিটা পালটে এই ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

দেখে আর বুকের মধ্যে একটা হিম আশঙ্কা বোধ করে সুভদ্রা।

তারও দুই চোখ জ্বালা করে, প্রায় প্রতিদিন রাত জাগার ফলে, তবু সে যেন ভরসা ক'রে ঘুমোতে পারে না।

কেমন যেন তার মনে হয় সে ঘুমিয়ে থাকলে ওরা আরও বেশী বিপদে গিয়ে পড়বে, অজানা কোন সাংঘাতিক অমঙ্গল ঘটবে হয়ত—এই রাত-জেগে ব'সে থাকার মধ্যেই ওদের তবু কিছুটা মঙ্গল, কিছুটা আশ্রয় ও আশ্বাস থাকবে।

তাই প্রতিদিনই সে ছাদে ওঠার সিঁড়িটার বাঁকে অন্ধকার পথের দিকে চেয়ে কান পেতে বসে থাকে।

কলকাতার উপকণ্ঠে এই প্রায়-শহর অঞ্চলেও রাত দশটার পরই নিষুতি হয়ে

যায় আজকাল ; শুধু যা কখনও-সখনও পুলিসের গাড়ি যাতায়াত করে কিম্বা পদাতিক পাহারাওয়ালার বুটের শব্দ পাওয়া যায়।

আর যা শব্দ, সে আরও ভয়াবহ।

দূরে কাছে মধ্যে মধ্যেই বোমা ফাটে, সেই সঙ্গে বন্দুক বা পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়ে কারা।

কোন কোন দিন এর সঙ্গে যোগ হয় অগ্নিকাণ্ড। আগুন নেভাতে দমকল আসে। সেই সঙ্গে পুলিসের গাড়ি।

আরও বোমা ফাটে, আরও গুলি ছোটে।

তার মধ্যেই কানে যায় সুভদ্রার—কারা যেন ফিসফিস করে কথা কইছে।

খালি পায়ে দুড়দুড় ক'রে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে ক'জন—পাশের তিন ফুট জমাদার-খাটবার-গলি দিয়ে।

এই সবের মধ্যে কোনও স্বরটা চিনতে পারা যায় কিনা কিম্বা কোন পদশব্দ —প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করে সে, অন্ধকারেই বিস্ফারিত চোখ মেলে চেনবার চেষ্টা করে নিশাচর মানুষগুলোকে—

নিঃশব্দে পাথরের মতো জেগে ব'সে থাকে এমনি ক'রে রাতের পর রাত— শুধু খুব কাছে বাড়ির সামনে কি পাশের গলিতে কড়া সস্তা দামের সিগারেটের গন্ধ উঠলে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাশে একটু-আধটু খুকখুক করে।

যারা সিগারেট খায়—তারা এতদিনে জেনে গেছে এ কাশি কার।

সে জন্যে তারা লজ্জিত হয় না।

তারা জানে প্রায় সারা রাতই জেগে বসে থাকে সুভদ্রা—কেন ও কাদের জন্যে।

তার জন্যে কোন লজ্জা বা সঙ্কোচও বোধ করে না কেউ। বরং ওর জন্যে করুণাই অনুভব করে একরকমের।

বিশ্বস্ত অথচ নির্বোধ পুরাতন ভৃত্য সম্বন্ধে মনিবরা যেমন করুণা অনুভব করে—কতকটা তেমনি।

॥ তিন ॥

ছেলেগুলোকে ধরতে পারে না সুভদ্রা, তাদের কোন কিছু বলতে গেলে উত্তরই দেয় না।

দিলেও ওকে উড়িয়ে দেয় যেন তুড়ি মেরে—ভেংচে বিদ্রূপ ক'রে চ'লে যায় বেশির ভাগই। মেয়ে দুটোকে চেপে ধরে মধ্যে মধ্যে।

'কেন এমন ক'রে বেড়াস তোরা, এই মানুষ খুন, এই অরাজকতা ? গরিবের ঘরের ছেলেমেয়ে কোথায় মন দিয়ে লেখাপড়া শিখবি, যা হোক চাকরিবাকরি ক'রে সংসারের দুঃখু কষ্ট ঘোচাবি—না হৈ হৈ ক'রে বেড়িয়ে ইহকাল পরকাল মাটি করছিস !···ওরা তবু পুরুষ মানুষ, যা করে করুক। ধরু তোদের যদি পুলিসে ধরে নিয়ে যায়—তোরা আর কোন দিন সমাজে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবি ? না

তোদের বিয়ে-থাই হবে আর !'

'ওঃ সত্যি !' বিদ্রুপের হাসিতে ভেঙে পড়ে সতেরো বছরের মেয়ে দীপ্তা, 'কী সাংঘাতিক দুর্ঘটনাই ঘটবে তা হ'লে ! একটা হয়ত বা জরদ্গব পুরুষকে বিয়ে ক'রে একপাল ছেলে বিইয়ে—দিনরাত নিজেকে সংসারের ঘানি-গাছে পিষে শেষ বিন্দু রক্তটি পর্যন্ত বার ক'রে না দিলে অনর্থ ঘটে যাবে বৈকি ! জীবনের সার্থকতাই আসবে না কোন দিন !···কী বঞ্চিতই না হবো !'

তারপর একটু থেমে বলে, 'আমরা বিয়ে-থা ক'রে সংসারী হবার জন্যে ছটফটিয়ে মরে যাচ্ছি—এমন কথা কে তোমাকে বললে শুনি !'

'ওমা, বিয়ে করবি না তো কী করবি শুনি ? চাকরি-বাকরি ক'রে সারা জীবন কাটাবি ? তাতেও তো লেখাপড়ার দরকার।'

'আমরা সমাজের এই ব্যবস্থা থাকতে কিছুই করব না। সবই করতে চাই আমরা—জীবনের যা কিছু স্বাদ সব পেতে চাই, ভোগের সবগুলো স্তরই চেখে দেখতে চাই—কিন্তু সেই জন্যই কিছুদিন কষ্ট করতে হবে, কিছুদিন সংযত হয়ে থাকতে হবে। আমরা চাই আমাদের ভোগে যদি নাও আসে—এমন অবস্থা আমরা দেশে আনব, উত্তরকালের মানুষ না অন্য মানুষের দ্বারা এক্সপ্লয়টেড্ হয়। সত্যিকারের যা জীবন তা যেন তারা ভোগ করতে পারে, বুঝতে পারে।'

'তা তোদের বাপ-মা ? তারা যে এত দুঃখ কষ্ট করে তোদের মানুষ করছে—তাদের কথা একবার ভাবছিস না ?'

'ঐ সব বুর্জোয়া সেণ্টিমেণ্টের আফিং খাইয়েই এতকাল ধরে ছেলে-মেয়েগুলোকে তোমরা নষ্ট করেছ, পিসী !···বাবা মায়ের এই কষ্ট দেখছি বলেই তাদের কথা আমরা ভাবব না। এই কষ্ট না উত্তরকালের বাবা-মাদের করতে হয়, তাদের ছেলেমেয়েরা না আমাদের মতো বঞ্চিত হয় সে জন্যই তো আমাদের এত কাণ্ড করা। যেখানে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বাপ-মায়ের কথা ভাবছি সেখানে নিজের বিশেষ বাপ-মায়ের কথা ভাবতে গেলে চলবে কেন ? লেট দেম সাফার। তাদের প্রথম বয়সে যদি তারা এই কথাগুলো ভাবত তা হলে আজ আর তাদের বা আমাদের এ কষ্ট সহ্য করতে হত না। আমাদের এই লড়াই তাদেরই তো করা উচিত ছিল।'

'তা এইভাবে মানুষ মেরে—অকারণে দুধের বাচ্চাগুলোকে খুন ক'রেই তোরা রামরাজ্য আনবি ?'

একটু বিহ্বলভাবে প্রশ্ন করে সুভদ্রা।

এদের এ কালের এ সব কথার কোন অর্থই বুঝতে পারে না যেন সে।

অসহিষ্ণু দীপ্তা উত্তর দেয়, 'আঃ, পিসী—সামান্য দুচারটে মানুষের মৃত্যু নিয়ে তোমরা এত হা-হুতাশ করো কেন ? ঐ তো বললুম, যেখানে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের বেঁচে থাকার—ভাল ক'রে বেঁচে থাকার প্রশ্ন, সেখানে দুটো চারটে কি দু এক হাজার লোকের মৃত্যুতে কি এসে-যায় ? শক্তিসাধনায় পাঁঠা মোষ বলি দিতে হয় জানো না—সেই রকম বলি বলে ধরে নিতে পারছ না।'

'তা এদের মেরে লাভ কি হয় ?'

'রাজনীতির লাভ লোকসানের ব্যাপার তোমার মাথায় ঢুকবে না পিসী, ওচ তুমি আমাদের ওপর ছেড়ে দাও। রবি ঠাকুরের—ঐ বুর্জোয়া কবির নামে তোমরা তো প্রণাম করো প্রায়—গান্ধারীর আবেদন পড়ছে ? "আমি চাই ভয়, সেই মোর রাজ্যপ্রাপ্য, আমি চাহি জয়—দর্পিতের দর্প নাশি।" আমাদের রাজনীতিতে যে আমাদের দলে নয় সে আমাদের শত্রু, তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করি না আমরা। তা ছাড়া দল রাখতে গেলে শাসনটা কড়া রাখতে হয়—এই কন্ট্রোল দলের ওপর রাখতে পারে নি বলেই কংগ্রেসের আজ এই দুর্দশা।'

তারপর গলা একটু নামিয়ে বলে, 'পিসী, এতদিনের পুরানো সমাজ-ব্যবস্থা কতদূর পর্যন্ত শিকড় বিস্তার করেছে তা তুমি ভাবতেও পারবে না—সেই শিকড় যদি মূল পর্যন্ত উপড়ে ফেলতে হয়, বহুদূর অবধি গভীর ক'রে মাটি কাটতে হবে। সে মাটি কাটতে গেলে কিছু কিছু পোকা মাকড়, কেঁচো-কেন্নুই মরবে বৈ কি, কোন কোন সাপ-বিছের বাসা ভাঙবে। এ তো স্বাভাবিক নিয়ম। তাছাড়া অনেক লোককে যদি দলে টানতে হয়, সবাইকে হয়ত দলে টানা যাবে না—অন্তত তাদের চুপ করিয়ে রাখতে হবে, নিষ্ক্রিয় রাখতে হবে—সেক্ষেত্রে এই ত্রাস আর আতঙ্কের সৃষ্টি না ক'রে উপায় নেই। বিবেক-বিবেচনা, পাপপুণ্য এসব কুসংস্কার মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে—ধর্ম, ঠাকুর-দেবতার নেশা আফিং বা মদের থেকেও কড়া —সে নেশা তাড়াতে গেলে আরও কড়া কোন জিনিস চাই বৈকি ! যেমন বিষ তার তেমনি প্রতিষেধক দরকার।'

এসব কথা ভাল বুঝতে পারে না সুভদ্রা।

বোঝার কথাও নয় তার।

এমনভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত নয় তারা, করেও নি কোন দিন। সে শিক্ষা-দীক্ষাও নেই।

তবে এটুকু বোঝে যে—বোঝে নি এরাও।

দীপু বা তীপুই শুধু নয়, ঐ নিমাই গোরা, ওরা কেউই কিছু বোঝে নি, কিছুই জানে না।

কি বলছে সে সম্বন্ধেও কোন জ্ঞান নেই ওদের।

সহজ বুদ্ধিতেই এটা বুঝতে পারে সুভদ্রা।

এই বয়সের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা থেকেই।

কারণ, এর জন্যে, এইভাবে ভাবতে গেলে যতটা লেখাপড়া জানার দরকার হয় সে লেখাপড়া এদের নেই।

লেখাপড়াও না, অভিজ্ঞতাও না।

এই লক্ষ কোটি মানুষের সত্যকারের কল্যাণ কিসে আসবে তা তো দূরের কথা—সে কল্যাণটা কি এ সম্বন্ধেও ভাল ধারণা নেই।

যে স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন এরা দেখছে, যে ছবি এদের চোখের সামনে, নেশায় বুঁদ ক'রে রেখেছে যে চিন্তা (এরা কথায় কথায় নেশার দোহাই দেয় বলেই এই উদাহরণ মনে আসে সুভদ্রার—ধর্ম, ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান, বিবেক—এ সবই নাকি নেশার ব্যাপার, বুর্জোয়া কাদের বলে তা সুভদ্রা জানে না—এই নেশায় আচ্ছন্ন ক'রে রেখেই মানুষকে ক্রীতদাস করে রেখেছে নাকি তারা !)—সেটা সত্যি কিনা, সে স্বর্গ রাজ্য আদৌ কোথাও আছে কিনা, থাকা সম্ভব কিনা তাও জানে না।

শুধু পরের কপ্‌চানো বুলি আওড়ায়—ওরাও কপ্‌চে যায় তোতা পাখীর মতো।

আর না-বোঝা না-জানা এই সব গরম বক্তব্যের উত্তেজনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে দিনরাত।

শুধু এটাও যে নেশা—এইটে বিশ্বাস করে না।

এ সব বুলি এদের যে কে শেখায়, তাও সুভদ্রা জানে।

কোন নেতা নয়, কোন অধ্যাপক বা তাত্ত্বিক কেউ নয়।

শেখায় এই পাড়ার, এই গলির প্রান্তে পাইনদের বাড়ির ভারাটে ছেলে প্রদীপটা।

ও-ই এসে এদের তাতায়।

তাতাচ্ছে এখনও।

অকারণে এদের সমূহ বিপদের মধ্যে, সর্বনাশের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

দু'চক্ষে দেখতে পারে না ছেলেটাকে সুভদ্রা।

যেমন বাপ, তেমনি ব্যাটা। অকর্মণ্য, অপদার্থ।

নিজেদের পরকাল নষ্ট ক'রে যথেষ্ট হয় নি—এদের পরকাল সুদ্ধ খাচ্ছে বসে বসে।

।। চার ।।

প্রদীপের বাবা সত্যভূষণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'ক্লাস ফোর' কর্মচারী, অর্থাৎ বোধ হয় বেয়ারা।

অন্তত আগে ওদের নাকি তাই বলা হ'ত।

এই বাজারেও নাকি কুড়িয়ে-বাড়িয়ে সর্বসাকুল্যে দেড়শর বেশী পায় না মাসে।

ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ।

বংশও নাকি ভাল।

কিন্তু সেটা আজ ঠাট্টায় পরিণত হ'তে বসেছে—

'আবোল-তাবোলে' সেই যে পাত্রের কথা আছে, 'শুনেছি ওরা উচ্চঘর, কংস-রাজের বংশধর'। কতকটা সেই রকম।

লেখাপড়া একেবারেই শেখে নি, ইংরেজী অক্ষর পরিচয় আছে এই পর্যন্ত,

ভদ্রঘরের ছেলে বলেই মুখে ইংরেজী বুক্‌নি দিতে পারে।

পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি যা কিছু ছিল, প্রথম বয়সেই উড়িয়ে দিয়েছে।

অথচ বিয়ের শখ ষোল আনার ওপর আঠারো আনা।

বাপের কিছু নামডাক ছিল এবং আত্মীয়দের মধ্যে অনেকে অবস্থাপন্ন বলে পাত্রীরও অভাব হয় নি।

যথাসময়ে ছেলেমেয়েও হ'তে শুরু করেছে।

ভাগ্যে স্ত্রীই শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ করেছিলেন, নইলে এতদিন বোধ করি ডজন পুরে যেত—

এ যাত্রা চারটেতেই থেমেছে, দুই ভাই দুই বোন।

কিন্তু চারটে ছেলেমেয়েকে মানুষ করাও এই আয়ে অসম্ভব।

একখানা ঘরে ভাড়া থাকে, সামনে একটু ছাঁচতলা-মতো আছে, সেখানেই রান্নার ব্যবস্থা। গরম কালে ছেঁড়া কাপড় আড়াল দিয়ে চলে, শীতেও তাই—বর্ষায় তোলা উনুন ঘরে তুলতে হয়।

ছাতা আড়াল দিয়ে রান্না চলত—সে ছাতাই বা দেয় কে?

তবু এটুকু আশ্রয় আছে তাই!

বহুকালের ভাড়াটে, পনেরো টাকা ভাড়াতে চলছে।

বাড়িওলা কোন মতেই ওঠাতে পারছে না, অথচ এরা উঠলেই এখন ঐ ঘরে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া পায়।

তেমন সঙ্গতি আর সময় থাকলে মামলা-মকদ্দমা করত, করে না দুটোরই অভাব বলে।

সেক্ষেত্রে যা করা সম্ভব তাই করছে—যত রকমে সম্ভব এদের অসুবিধা সৃষ্টি।

আগে উঠোনে কয়লা প'ড়ে থাকত, সিঁড়ির নিচে ঘুঁটে।

এ নিয়ে যে কিছু বলার আছে তা বাড়িওলাও ভাবে নি। এখন নতুন ক'রে ভাড়া চাওয়া যায় না ঐটুকু জায়গায় জন্যে। তাই অন্য পথ ধরতে হ'ল।

পর-পর কয়েকদিন দুটি বস্তুই লোপাট হ'তে ঘুঁটে কয়লা পর্যন্ত ঐ দশ বাই বারো ঘরে তুলতে হয়েছে—তক্তপোশের নিচে।

বাসন, চাল-ডাল রান্নার সরঞ্জাম তো বটেই।

ঐখানেই খাওয়া-দাওয়া, ঐখানেই তারপর এঁটো বাসন এক পাশে সরিয়ে রেখে শোওয়ার ব্যবস্থা—বাসি রান্নার আমলাটে গন্ধের মধ্যে রাত্রি-যাপন।

কেউ বেড়াতে এলে, তারা যতক্ষণ না চলে যায় ততক্ষণ রান্না-খাওয়া করা যায় না—ছেলেদের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয়, অথবা অন্য কোন বাড়ির রকে। গ্রীষ্মে বা শীতেও অপর কারও সামনে রান্নার আয়োজন করা যায় না—উপকরণের স্বল্পতার জন্যে।

এ খাওয়া পাঁচজনকে ডেকে দেখানোর মতো নয়।

এ অবস্থায় এইভাবে যারা মানুষ বা বড় হচ্ছে—তাদের লেখাপড়া হবার কথা নয়, তবু হয়েছে।

হয়েছে, তার কারণ মায়ের আপ্রাণ চেষ্টা। ছেলেমেয়েদেরও ভাগ্য ভাল।

প্রদীপের মা চিরদিন লোকের কাছে ভিক্ষে ক'রে ওদের বই-খাতা সংগ্রহ করেছেন, মেগে-পেতে, ইস্কুলের সেক্রেটারী মেম্বারদের ধরে ফ্রী হাফ-ফ্রী করিয়ে নিয়ে পড়ার ব্যবস্থা করেছেন।

আত্মীয়দের অবস্থা খুব ভাল না হলেও অনেকেরই চলনসই।

সত্যভূষণের ব্যবহারে ও স্বভাব-চরিত্রে তাদের প্রায় সকলেই সংস্রব ত্যাগ করেছিল—প্রদীপের মার মিনতিতে এবং ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর ইচ্ছে দেখে অনেকেই আবার এখন মধ্যে মধ্যে কিছু ক'রে সাহায্য করেন।

অবশ্য সে কতই বা—দু টাকা চার টাকা। এর বেশী তাদেরও সামর্থ্য নেই।

অথচ এদেরও যেন অনন্ত ক্ষুধা—অসংখ্য অভাব।

জামা কাপড় জুতো খাতা পেন্সিল কলম কালি—কী নয়? যা আসে তা-ই যথেষ্ট ব'লে মনে হয়।

ঐটুকুই লাভ। চোরের রাত্রিবাসের মতো।

ওদের বাপের সামর্থ্য কোনমতে মুখে নিরুপলক্ষ ডাল ভাত বা ডাল রুটি যুগিয়েই অবসন্ন হয়ে পড়ে—আর বেশী এগোতে পারে না।

নিজে যৎপরোনাস্তি ছেঁড়া জামা এবং তালি-দেওয়া কেড্‌স্‌ জুতো প'রে আপিস করে—আপিস বাজার রেশন, সবই চলে ঐ অদ্বিতীয় বস্ত্রে, শোয় একটি গামছা পরে।

স্ত্রীর শাড়ি এখনও তাঁর ভাইয়েরা যোগায় তাই রক্ষা, তাঁর লজ্জা নিবারিত হয়।...

একেবারে এই সম্প্রতি কিছু সুরাহা হয়েছে।

প্রদীপ হায়ার সেকেণ্ডারী পাস ক'রে একটা চাকরিতে ঢুকেছে।

তেমন আপিস টাপিস কিছু নয়—একটা ছাপাখানায় হিসেব লেখার কাজ, মাইনে একশো টাকার মতো।

এর আগেও পরীক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সকাল বিকেল টিউশানী শুরু করেছিল, তাতেও পঞ্চাশ টাকার মতো আসত।

এতে আর কিছু নয়—ভিক্ষেটা অনেকখানি বন্ধ হয়েছিল, বাকী তিনটে ভাইবোনকে লেখাপড়া শেখাবার আশাকে আর দুরাশা ব'লে বোধ হয় নি।

চাকরিটা হবার পর অবশ্য টিউশানি দুটো ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

না, আলস্যের জন্যে নয়।

বি-কম পড়ার ইচ্ছে ওর—সেক্ষেত্রে আপিস বজায় রেখে পড়তে গেলে ইভনিং সেকশানে ভর্তি হওয়া ছাড়া উপায় নেই; কলেজ ছুটি হতে হতে রাত নটা, বাড়ি পৌঁছতে রাত দশটার কম নয়—সন্ধ্যাবেলা ছেলে পড়াবে কখন?

আর এই একই কারণে সকালে পড়ানোও সম্ভব নয়।

বি-কম পড়তে গেলে কলেজ ছাড়া বাড়িতেও কিছু পড়াশুনো দরকার।

দুপুরে আপিস আর সন্ধ্যায় কলেজ বাদ দিলে সময় বলতে থাকে এই সকাল-

টুকুই—সে সময় ছেলে পড়াতে গেলে নিজের পড়া হয় কখন ?

ওর বাবা অবশ্য এ ব্যবস্থায় খুশী হয় নি।

এবং সে বিরক্তি চেপেও রাখে নি।

প্রকাশ্যেই গজ গজ করেছে।

বি-কম পড়ে ছেলে স্বর্গে বাতি দেবে, একেবারে হাতে চাঁদ তুলে দেবে !

এখন খেয়ে প'রে বেঁচে থাকলে তবে তো ভবিষ্যতের উন্নতি। যা হয় ক'রে ভাতডালের সঙ্গে একটু আলুভাতে জুটছিল কদিন—তাও বন্ধ করতে হবে।

কেন, এই হায়ার-সেকেণ্ডারী, ম্যাট্রিক এসব পাস ক'রে কি কেউ সরকারী আপিসে কাজ পাচ্ছে না ? সবই বরাত। বরাতে থাকলে প্রদীপও পেত।··· ইত্যাদি—

কিন্তু প্রদীপের মা নমিতা স্বামীর কোন কথা শোনেন নি,—ছেলেকেই উৎসাহ দিয়েছেন।

এতকাল যদি কষ্ট ক'রে আসতে পেরে থাকেন, আর তিনটে বছরও পারবেন।

এ তো একশটা টাকা আরও বাড়ল তবু।

খোকার কলেজের মাইনে, হাতখরচ বাদ দিয়েও কোন্ না সত্তরটা টাকা হাতে আসবে !

ছেলে তো বলেই দিয়েছে, বই কিনতে হবে না। কী সব নাকি পাঠভবন হয়েছে চারদিকে, ইনস্টিটিউট অফ কালচার আছে—বই সেখানে থেকেই যোগাড় হয়ে যাবে।

একটু কষ্ট ক'রে কাদায় গুণ ফেলে কাটালে যদি আখেরের একটা সুরাহা হয়, সেইটেই তো ওদের দেখা দরকার।

একটা ছেলে মানুষ হয়ে উঠলে সে-ই বাকি তিনটিকে দেখতে পারবে, মানুষ ক'রে তুলবে।

স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে সব এক কাট্ঠা হওয়াতে সত্যভূষণ আর বাধা দিতে পারে নি, কিছুদিন গজগজ করে একসময় চুপ করতে বাধ্য হয়েছে।

এ অনেক আগের কথা।

তখনও পর্যন্ত এই রকম সুবুদ্ধিই ছিল প্রদীপের।

লেখাপড়া করবে, উন্নতি করবে, বাপ মায়ের দুঃখু ঘোচাবে, ভাইকে মানুষ করবে, বোনেদের বিয়ে দেবে।

যেমন মতিগতি থাকা উচিত, তেমনিই ছিল।

পাড়ার লোকে ওর প্রশংসা করত।

নিজেদের ছেলে-মেয়েদের ওর দৃষ্টান্ত দেখাত।

তারপর যে কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল ! কলেজ ছেড়ে দিলে প্রদীপ। টিউশানীও নিল না। কোন মতে আপিসটা সেরে এসেই পাড়ায় বেরিয়ে পড়ে—ফেরে কোন কোন দিন রাত দুটোয়, কোন দিন বা তারও পরে। আবার ভোরেই

কারা যেন ডাকতে আসে। ওর মায়ের ঘুম ভাঙার ভয়ে চেঁচিয়ে ডাকে না, কড়াও নাড়ে না—শুধুই বাড়ির সামনে ল্যাম্পপোস্টটার গায়ে লাঠি দিয়ে মৃদু আঘাত করে—সেই শব্দেই ঘুম ভেঙে আস্তে দোর খুলে বেরিয়ে আসে প্রদীপ—কোথায় যেন উঠে যায় ক'ঘণ্টার জন্যে।

ফেরারও কোন ঠিক নেই।

বেশির ভাগ দিনই অনেক দেরিতে বাড়ি আসে।

জলখাবার খাওয়ার তো অভ্যাসই নেই, ব্যবস্থাও নেই কিছু। কোন দিনই নেই। শুধু একটু চা খেত—তাও খাওয়া হয় না আর।

একেবারে নটা নাগাদ বাড়ি ফিরে কোন মতে দুটি নাকে-মুখে গুঁজে আপিসে ছোটে।

বেশির ভাগ দিনই স্নান করার পর্যন্ত সময় হয় না।

কোথায় যায় এবং কী করে ?

এই অত্যন্ত সমীচীন প্রশ্ন শুধু নমিতা বা সত্যভূষণ কেন—অনেকের মনেই দেখা দিয়েছে।

এক্ষেত্রে জোয়ান ছেলেদের ক্ষেত্রে যে সন্দেহ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক, তাও দেখা দিয়েছে।

মুখ ফুটে প্রশ্ন করেওছে অনেকে।

সে প্রশ্নের উত্তর প্রদীপের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি—পাওয়া গেছে আরও অন্য বহু লোকের কাছ থেকে।

এ ও সে—পাড়ার বহুলোকের কাছ থেকে টুকরো টুকরো বিবরণ পাওয়া যায়, সেগুলো জুড়ে নিলেই সামগ্রিক চিত্রটা মেলে।

কী না করে !

রাজনীতিতে মেতে উঠলে যা যা করবার কথা, সবই করে।

বক্তৃতা দেয়, আলকাতরা দিয়ে দেওয়ালে স্লোগান লেখে, মিছিল করে, এবং পাড়ার ছেলেমেয়েদের তাতায়।

এটুকু বোধ হয় আরও বহু রাজনৈতিক দলের কর্মীরাই করে।

এদের নাকি আর একটু বেশী করতে হয়।

এদের শলা-পরামর্শ গোপনেই বেশী, এরা সভাসমিতি ডাকে কদাচিৎ।

এদের আপিস নেই, মিলিত হবার কোন স্থান চিহ্নিত নেই—নির্দিষ্ট সময় তো নেইই।

যখন খুশি যেখানে খুশি নাকি এদের কার্যকরী সমিতির বৈঠক বসে, সেই-খানেই বড় বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সে সিদ্ধান্ত কেউ লিপিবদ্ধ করে না।

লেখাপড়া জিনিসটাই কম, কিছু লিখলেও সঙ্কেতে সংক্ষেপে লেখা হয়।

এসবে তত আপত্তি ছিল না সুভদ্রার, ওর আপত্তি ঐ ছেলেমেয়ে তাতানোতেই বেশী।

যা করছিস কর না বাপু !

গরিবের ছেলেমেয়েগুলোর মাথা না খেলে হয় না ?

ঐ যে কী একটা ছোট লাল বই হাতে ক'রে আসে, ইশারা ক'রে বাইরে ডেকে নিয়ে যায় নিমাই গোরা সবু দীপ্তা তৃপ্তা এদের—কী সব গুজগুজ ক'রে বলে বোঝায় হাত পা নেড়ে, কখনও বা সামান্য মৃদু তর্ক-বিতর্ক'ও ওঠে—তবে সে কদাচিত—ছেলেমেয়েগুলো তারপর যখন বাড়ি ফিরে আসে তাদের তখন চোখ-মুখের বিহ্বল ভাব, কথাবার্তার সুর ও ভঙ্গী পাল্টে যায় কিছুক্ষণের মতো—ঘর-সংসার নিজেদের লেখাপড়া উন্নতি সব কোথায় চিন্তার কোন্ সুদূর দিগন্তে যায় মিলিয়ে—অন্য এক ধরণের দীপ্তি জ্বলতে থাকে চোখের তারায়, দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্যুতি ফুটে ওঠে চোখে-মুখে।

মনে হয় বিশ্ববিজয়ের প্রতিজ্ঞা এদের। ভয়ানক কিছু না করতে পারলে স্থির হবে না।

তার ফলে কিছুদিন প্রদীপের এই যাতায়াত করার পরই—এদেরও লেখাপড়া সব সিকেয় উঠেছে, এইভাবে হল্ল হল্ল ক'রে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছে এরাও।

ইস্কুল কলেজে যাওয়া তো বন্ধই—এমনিও বাড়িতে বসে পড়াশুনোও করে না কেউ।

সোজাসুজিই বকাটের খাতায় নাম লিখিয়ে বসে আছে।

কী যে করে, কিসের যে এত ব্যস্ততা তাও বোঝে না সুভদ্রা।

কি চায় এরা, কী করবে, কার ওপর এত রাগ ?

সমাজে সংসারে নাকি চারদিকেই শুধু অবিচার হচ্ছে।

আরে বাপু চিরকালই তো সংসারের এই ধারা—বুদ্ধ চৈতন্য কেউ যা পারল না, তোরা এই কটা ছোঁড়া আর ছুঁড়িতে মিলে তা-ই করবি ?

কোথায় তোদের কোন দেশে নাকি কে এক নেতা আছেন—তিনিই যেন সাক্ষাৎ ভগবান ওদের কাছে।

তা হোক, নেতা সব দেশেই জন্মান, এদেশেও সুভদ্রা ছোটবেলা গান্ধীজীকে দেখেছে—কিন্তু যত বড় শক্তিশালী নেতাই হোক, রাম রাজ্য কি পেরেছে কেউ বসাতে !

তোদের ঐ নেতাই কি পেরেছেন ?

সুভদ্রা জানে, তিনি তা পারেন নি। পারা সম্ভব নয়।

আসলে মানুষগুলোই খারাপ যে, তাদের লোভ ঈর্ষা নীচ প্রবৃত্তি—এ তো নিয়েই জন্মায়—সে সব দূর করা কারও কর্ম নয়।

এরাও যে এই এত কাণ্ড করছে—এ কি দেশ আর জাতির প্রতি ভালবাসা ?

নিঃস্বার্থ মানব-প্রেম ?

দেশের প্রতি ভালবাসা ? স্বার্থ-বর্জিত ?

হ'তেই পারে না।

ক্ষমতা আমার দলের হাতে এলে আমি একটা বড় কেউ হয়ে উঠব—দেশের

সেবার নাম ক'রে শাসন করব। তাঁবে রাখব অনেককে, গাড়ি চড়ব, লোকে মশাই মশাই করবে—এই লোভ।

সুভদ্রা লেখাপড়া জানে না বটে কিন্তু মোটামুটি মানুষগুলোকে চিনে নিয়েছে সে।

আর কিছু জানার দরকার নেই।

সবাই সমান—অনেক দেখে ঠেকে এটুকু বেশ বুঝেছে।

তবু তোরা যা করছিস করছিস, নিজেরা কাঠ খেয়ে আঙরা নাদবি—এ কী অনাচার সব ঘরে ঢোকাচ্ছিস!

ওরা ভাবে পিসী কিছু বোঝে না।

গুরুজনরা সবাই বোকা—বোকা ছেলেমেয়েগুলো এইটেই ধরে নেয় আগে।

ভেবে দেখে না যে, ওদের ঐ বয়সও একদিন এঁদের ছিল, সেটা পেরিয়ে তবে এই বয়সে এসেছেন। ঐ বয়সের রহস্য বুদ্ধি-ধারণা কল্পনা কিছুই এঁদের অজানা নেই।

গোরা ওর ঐ বন্ধু সত্যেনটাকে কেন যখন তখন বাড়িতে নিয়ে আসে, কেন তীপুকে নিয়ে ওর সঙ্গে সিনেমায় যায়—তা কানাইদা বা শোভা বৌদি না বুঝুন—সুভদ্রার বুঝতে বাকী নেই।

আসলে ওদের টাকার দরকার।

বোমা তৈরী করতে টাকা লাগে, টাকা লাগে পেট্রোল কিনতেও।

এক-আধবার এক-আধটা গাড়ি থামিয়ে কিছু নেওয়া যায়, কিন্তু তাতে এত তেল মেলে না।

ঐ তো, পাড়ার সৌদামিনী বালিকা বিদ্যালয় যেদিন পুড়ল—সেদিন বোধ হয় অমন দশ বালতি পেট্রোল খরচ হয়েছে।

এ ছাড়া—এই যে এত ঘোরাঘুরি, পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো—এর তো খরচ আছে। পুলিস এলেই তিন-চারদিন কোথাও গিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকতে হয়—তাতে পয়সা লাগে না?

এই যে থানার লোক এসে আগে খবর দিয়ে যায় কবে এ পাড়ায় সার্চ হবে—তাকে পয়সা দিতে হয় না নিয়মিত?

ঘোরাঘুরিতেও বাস ভাড়া, ট্রাম ভাড়া লাগে, সময়-বিশেষে ট্যাক্সিতেও চড়তে হয়।

টাকা ছাড়া এক পাও চলা যায় না আজকাল।

এসব খরচ যোগায় কে?

অন্য দলের আপিস আছে, তাদের চাঁদা ওঠে—সেই চাঁদায় খরচ চলে।

সৌরেন সাধু খাঁ দিন-রাত তাদের দলের কাজ ক'রে বেড়ায়—তেমনি সে দলও নাকি তার ঐ অত বড় সংসারের সব খরচা টানে।

কই, এদের দলের তো তেমন কিছু আছে বলে মনে হয় না।

অন্তত চোখে তো পড়ে নি এতদিনেও।

আসলে টাকা।

টাকার দরকার সকলেরই, সব কাজেই। এদেরও দরকার কম নয়।

পয়সাওলা লোকদের মারতে গেলেও পয়সা চাই।

টাকার জন্যেই গোরা সত্যেনকে ডেকে এনেছে বাড়িতে। ডেকে আনে।

টাকার জন্যেই ছোট বোনটাকে এগিয়ে দিয়েছে তার দিকে—মাছের সামনে বঁড়শিতে গাঁথা টোপের মতো।

বেচারী তীপু।

এই সবে চোদ্দ বছর বয়স ওর। তেরো পূর্ণ হয়ে চোদ্দ চলছে।

বাড়নশা গড়ন বলে এর মধ্যেই দেহ পুরন্ত হয়ে উঠেছে, অন্তত ষোল-সতেরো মনে হয়—নইলে পাশের বাড়ির চাপা তো ওর একবয়িসী, একদিনের বড় বরং—দিব্যি ফ্রক পরে ধিতিং ধিতিং ক'রে নেচে বেড়ায়, দেখলে মনে হয় আট ন বছরের মেয়ে।

গড়ন যাই হোক—বয়সটা তো কম, সংসারের কিছুই বোঝে না।

দাদারা যা বোঝায়, প্রদীপদা যা বলে বেদবাক্য বলে ধরে নেয় একেবারে।

বোকার মতো সেই কথাগুলো আউড়ে ভাবে খুব বুদ্ধি-বুদ্ধি কথা বলছে। এমনিও মেয়েটা চিরদিনই বোকা। সুন্দর চেহারা যাদের দেন ভগবান, বোধ হয় বুদ্ধিটা তাদের কমই দেন সেই মাপে।

শোভা বৌদি বলে, 'তীপু আমার গর্ভের সেরা রত্ন।'

সুভদ্রা শুনে হাসে মনে মনে।

রূপে রত্ন হয় না, রত্ন হয় গুণে, বুদ্ধিতে বিদ্যায় বিবেচনায়।

কাঁচে আর হীরেতে প্রথম দেখলে তফাৎ বোঝা শক্ত—হীরের দ্যুতি ম্লান হয় না বলেই তার অত মূল্য।

না, তীপুর দোষ দেয় না সুভদ্রা তত।

আসল দোষ ওর বাপ-মার।

দোষ গোরা, নিমাইদের।

জেনেশুনে সত্যেনটাকে লেলিয়ে দিয়েছে তীপুর দিকে।

আগে বাড়িতেই খুব বাড়াবাড়ি করেছিল—বলার তো কেউ নেই, কানাইদা তেমনিই উদাসীন— তাঁর বোধ করি সতেরো নম্বরের প্রণয়িনী ক্ষমা সেনকে নিয়ে তেমনিই মশগুল (বড়লোকের বৌ, ছবি আঁকা শিখতে আসে নাকি, কিছু টাকাও দিয়েছে, আবার শোনা যাচ্ছে কে এক ছোকরা অভিনেতাকে টাকা দিয়ে তাকে ফিল্‌ম্‌-তৈরীর কাজে নামাচ্ছে, শর্ত ক্ষমাকে নায়িকা করবে) ; বৌদি তো অন্ধ—ছেলেদেরও দোষ যেমন দেখেন না, তেমনি তাঁর ছেলেমানুষ মেয়ে তীপুর পক্ষে খেলে বেড়ানো ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব তাও বিশ্বাস করেন না ; সুতরাং বাধা দেবার কেউই ছিল না বলতে গেলে।

শেষে সুভদ্রাই রুদ্রমূর্তি ধারণ করতে—তার সহ্যের সীমা আছে, এই

নোংরামি বন্ধ না হলে—সে এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে ভয় দেখানোতে কিছুটা কাজ হ'ল, ঘরের মধ্যে বেলেল্লাগিরিটা বন্ধ হ'ল।

তার বেশি আর কিছু করতে পারল না সুভদ্রা।

ছেলেরা যতই বেপরোয়া হোক, ওর ঐ মূর্তি দেখে একটু ভয় পেয়েছিল ঠিকই—তবে নিজেদের 'কোট' ওরা ছাড়বে না, এটা সুভদ্রাও বুঝেছিল।

তাই তীপু যে প্রত্যহ বিকেলে সেজেগুজে দাদা বা দিদির সঙ্গে কোথায় যায় তা অনুমান করলেও প্রশ্ন করতে সাহস করত না সুভদ্রাও।

শুধু শুধু অপমানিত হতে যাওয়া।

নিজের মান নিজের কাছে।

হয়ত কী একটা তাচ্ছিল্যসূচক কথা বলবে, নয় তো মিথ্যা কথা।

কোনটাতেই দরকার নেই।

তবে সুভদ্রা জানে সব, ওদের কথার ফাঁকে ফাঁকেই ধরে নেয় আসল কথাটা।

সত্যেন ঐ বড় রাস্তার মোড়টাতেই গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এরা গিয়ে তার গাড়িতে ওঠে। তারপর একটু গিয়েই সঙ্গী যেদিন যে থাকে কাজের অছিলায় নেমে পড়ে—সত্যেন তিপুকে নিয়ে চলে যায়।

কোনদিন ডায়মণ্ডহারবারের দিকে, কোনদিন গড়ের মাঠে, কোনদিন বা সোজাসুজি সিনেমায় গিয়ে ঢোকে।

গোরার এতদূর অধঃপতন হয়েছে—সুভদ্রা যেদিন কথাটা জানতে পেরেছিল সেদিন ঘুমোতে পারে নি সারারাত, খেতে পারে নি—গোরাই নাকি প্রথম একদিন সত্যেন আর তীপুকে নিয়ে সিনেমায় যায়, একটু পরেই হল অন্ধকার হতে, 'আসছি' বলে বেরিয়ে আসে—শুধু সত্যেন আর তীপু বসে সিনেমা দেখে। সেদিন ঠিক কি হয়েছিল তা সুভদ্রাও জানে না, তবে মেজদার প্রতি অচলা ভক্তি থাকা সত্ত্বেও—তীপু রাত্রে বাড়ি ফিরে খায় নি কিছু, বিছানায় শুয়ে কেঁদেছিল।

এইটেই সহ্য করতে পারে না সুভদ্রা।

এই কাঁচ বোকা মেয়েটার কথা যখন ভাবে, তখন এক একদিন চোখে যেন সব লাল দেখে—একটা ভীষণ কোন কাণ্ড, রক্তারক্তি করতে ইচ্ছে করে।

মনে হয় এই সব কটাকে খুন করে ফাঁসি হয় সেও ভাল।

বিশেষ করে আগে ঐ কানাইদাকে। আর ঐ গোরাটাকে।

যা তোমার নিজের—আখের ভবিষ্যৎ জীবন, তুমি তোমার আদর্শের জন্যে নষ্ট করতে পারো, একটা সরল নাবালিকা মেয়ের জীবনটা এভাবে বরবাদ ক'রে দেওয়ার কী অধিকার তোমার ?

যতই দল তোমার বড় হোক—তোমার নিজের স্ত্রীকে তুমি ঠেলে দিতে পারতে মানুষ-কুমীরের মুখে ?

ওরা অবশ্য বলে ওদের দলের জন্যে, ওদের আদর্শের জন্যে, শাসন প্রবর্তনের জন্যে কিছুই অকরণীয় নেই ওদের।

নিজের মা বাবাকে খুন করতেও এক মিনিট ইতস্তত করবে না ওরা।

যেখানে কোটি কোটি মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির প্রশ্ন—সেখানে দুটো লোকের প্রাণ নিয়ে কে মাথা ঘামায় ?

॥ পাঁচ ॥

চিন্তা যতই যা ক'রে থাকুক সুভদ্রা, ইচ্ছা যা-ই হোক—মনে মনে নিত্য এদের মতি পরিবর্তনের জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছে এও ঠিক—তবু ঘটনার এ পরিণতি কখনও কল্পনা করে নি সে।

প্রদীপ—এদের গুরু—এদের যথেষ্ট নাচিয়ে উত্তেজিত ক'রে—ইহকাল পরকাল নষ্ট ক'রে—নিজেই পিছিয়ে পড়ল শেষ পর্যন্ত।

কে সেই এক বৈজ্ঞানিক—দীপু গল্প করে—নকল মানুষ সৃষ্টি করতে গিয়ে সেটা যখন দানবে পরিণত হ'ল তখন তাকে আবার নষ্ট করতে গিয়েছিল, কিন্তু পারে নি। সেই দানবের হাতেই নিহত হয়েছিল।

প্রদীপেরও সেই অবস্থা হয়ে দাঁড়াল বোধ করি।

নিজেরই সৃষ্টি যে এই রকম হয়ে দাঁড়াবে তা বোধ হয় সে ধারণা করে নি আগে।

ঐ বয়সের ছেলের পক্ষে ধারণা করা সম্ভবও নয়।

তাকে বলল দীপুই।

ক'দিন ধরেই খুব মুখ শুকিয়ে বেড়াচ্ছে মেয়েটা, খুব যেন আর বাইরে যাবারও উৎসাহ নেই—কী একটা যেন ভাবছে দিনরাত—এটা সুভদ্রা লক্ষ্য করেছে।

সে এদের ভালবাসে, এরা যা-ই ভাবুক তার হাতেই মানুষ এরা, নিজের সন্তানের মতোই প্রিয়।

বরং বোধ হয় আরও বেশি, নিজের সন্তান হয় নি বলেই বুভুক্ষু অন্তর এদের আরও বেশি ক'রে আঁকড়ে ধরেছে।

সে এদের চোখের পলক পড়ারও অর্থ বুঝতে পারে, মুখে এতটুকু দুঃখের ছায়া দেখলে তার অন্তর ব্যথায় টনটন ক'রে ওঠে।

দীপুর এই ভাবান্তর সেই প্রথম দিন থেকেই নজরে পড়েছে সুভদ্রার।

চিন্তিত, বিচলিত হয়েছে।

তবু এ হয়ত ওদের দলগত কোন ঝগড়া বা মতানৈক্য, এই ভেবেই চুপ ক'রে ছিল ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারল না, একদিন বিকেলের দিকে বাড়িতে তখন কেউ নেই, শোভাও পাশের বাড়ি বেড়াতে গেছে—অন্ধকার ঘরে দীপু একা ব'সে আছে দেখে গিয়ে চেপে ধরল, 'কী হয়েছে রে তোর দীপু, কদিন ধরে অমন মন গুমরে গুমরে বেড়াচ্ছিস ?'

চমকে উঠল দীপু।

চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে যেমন চমকে ওঠে ছেলেপুলেরা। তেমনই।

তারপর অতি কষ্টে যেন কণ্ঠস্বর বাইরে কোথা থেকে কুড়িয়ে এনে বলে, 'কই ? আমার ? কিছু হয় নি তো !'

সুভদ্রা এবার পাশে বসে পড়ে ওকে জড়িয়ে ধরে একেবারে, বলে, 'লক্ষ্মী মা, আমার কাছে লুকোস নি। কিছু যে একটা হয়েছে এটা কি আমি বুঝতে পারব না তুই মনে করিস ? বৌদি তোকে পেটে ধরেছে ঠিকই—কিন্তু আমি তো তোকে মানুষ করেছি !'

আর থাকতে পারে না দীপ্তা।

পিসীর বুকে মাথা গুঁজে দিয়ে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলে।

বলতেই তো সে চাইছে, ক'দিন ধরেই কাউকে বলতে চাইছে, বলে পরামর্শ নিতে।

সেই লোকই বাড়িতে কেউ নেই যে। বাবা উদাসীন, মা এ সব ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। ভাইবোনেরা বিরুদ্ধ পক্ষ।

এই পিসীর কথাটাই মনে হয় নি।

মনে পড়ে নি।

পিসী ওদের ভালবাসে, পিসী ওদের মা বাবার থেকে দুনিয়ার বেশী খবর রাখে।

পারলে হয়ত পিসীই পারবে কোন সৎ পরামর্শ দিতে।

সুভদ্রা কোন তাড়া দিল না, ঠিক এই মুহূর্তে প্রশ্ন ক'রে ওকে বিব্রত বা বিরক্ত করে তুলল না, নীরবে বসে ওর মাথায় আর পিঠে হাত বুলোতে লাগল।

অনেক রকম আশঙ্কা জাগছে মনে, মন বহু দূরে চলে গেছে। দূরতম সম্ভাবনা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এতক্ষণে।

তীপুর যে দুর্গতির আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে আছে, সেই ধরনের কোন পরিণামে পড়ে নি তো মেয়েটা ?

এরও বয়স অল্প, চেহারাও ভাল, তীপুর মতো সুন্দরী না হলেও সুদর্শনা তাতে কোন সন্দেহ নেই।...কে জানে, ওদের সব বন্ধুগোষ্ঠী সহকর্মীদের তো চেনে না সুভদ্রা।

কে জানে আরও কে আছে। কার খপ্পরে পড়ল !...

এই দিক দিয়েই যাচ্ছিল সুভদ্রার কল্পনা, তবু সে তখনই ব্যস্ত হয়ে ওঠে নি। ওকে সামলাবার সময় দিচ্ছিল।

প্রায় মিনিট দুই-তিন কাটবার পর আস্তে আস্তে ওর মুখটা তোলবার চেষ্টা ক'রে বলল, 'এইবার বল মা, কি হয়েছে।...কেন এত ভেঙে পড়েছিস এমন ক'রে !'

ভগ্ন, অশ্রুস্খলিত কণ্ঠে উত্তর দিল দীপ্তা, 'বলে কিছু হবে না পিসী, কেউ কিছু করতে পারবে না। মরা ছাড়া আর কোন উপায় নেই আমার !'

আগের সন্দেহটাই ঘনীভূত হয়।

তবু কণ্ঠস্বরে জোর দিয়েই বলল সুভদ্রা, 'ছিঃ, মা ! তুই না ছেলেমানুষ, তোরা না দেশের ভাল করার ব্রত নিয়েছিস, মানুষের জন্যে মানুষের সঙ্গে লড়াই

করছিস ! তোদের মুখে মরবার কথা মানায় না। এ পৃথিবীতে এমন কোন বিপদ, এমন কোন দুঃখ নেই—যার প্রতিকার বা সান্ত্বনা হয় না। তুই ঠিক ক'রে বল দিকি কি হয়েছে !'

বোধ হয় ওর জোরেই মনে কিছুটা জোর পায় দীপু, একবার মুখ তুলে ঝাপসা দৃষ্টিতেই পিসীর মুখটা দেখার চেষ্টা করে, তারপর বলে, 'ওকে—ওকে এরা মেরে ফেলবে ঠিক করেছে, পিসী !'

বলতে বলতেই আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে সে।

কিন্তু সুভদ্রার ওপর এ কথার অন্য প্রতিক্রিয়া হয়।

ওর প্রতি যত সহানুভূতিই থাক, ওর দুঃখে, ওর চোখের জলে যত বেদনা বোধই করুক—এই কথাটায় মনে মনে খানিকটা স্বস্তি বোধ না ক'রেও পারে না সুভদ্রা।

আর সেই ভাবটার জন্য নিমেষে যেন অনুতপ্তও হয়ে ওঠে।

ছিঃ, ছিঃ, এ কী স্বার্থপরতা তার !

দীপুর দুঃখই তো সব নয়—সেই সঙ্গে একজনের মৃত্যুর প্রশ্নও রয়েছে যে।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বলে, 'কে রে, কারে মারবে ? কার কথা বলছিস ? কারা মারবে ?'

'চুপ চুপ !' যেন শিউরে ওঠে দীপ্তা, পিসীর মুখে হাত চাপা দেয়, 'এসব কথা তোমায় বলেছি জানলে তোমাকে আমাকে কাউকে ছাড়বে না।'

ফিস ফিস ক'রে কান্না-জড়ানো গলাতে কথা বলে সে, সুভদ্রার বুঝতে কষ্টই হয়—কতক কথা আন্দাজে আন্দাজেই বুঝতে হয়।

সেও তেমনি চাপা গলায় পুনশ্চ প্রশ্ন করে, 'কিন্তু কার কথা বলছিস কিছুই তো বুঝতে পারছি না দীপা—বিশ্বাসই যদি করলি পুরোপুরিই কর। আমার থেকে তোর কোন অনিষ্ট হবে না কোন দিন—এটা বিশ্বাস করিস।'

'ওকে—প্রদীপদাকে।'

শুধু কি কান্না, সঙ্কোচেও গলা বুজে আসে বৈ কি !

শেষ মুহূর্তেও নামটা যেন গলায় আটকে যায়।

'প্রদীপদাকে মারবে ! সেই জন্যে তুই কাঁদছিস ?'

চোখের সামনে থেকে অনেকখানি অন্ধকার সরে যায়।

পুরুষরা—দীপার ভাইরা ওকে হয়ত রাজনৈতিক গুরুর চোখেই দেখে, কিন্তু দীপার বেলায় যা স্বাভাবিক, শতকরা নব্বুইটি ক্ষেত্রেই যা ঘটে থাকে তাই ঘটেছে। প্রেম এসে কখন শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করেছে, তা ও টেরও পায় নি বোধ হয়।

প্রশ্ন বা অর্ধ-প্রশ্ন যা-ই ক'রে থাক সুভদ্রা, উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, 'তা ওকে কে মারবে রে, পুপুকে ? কারা ?'

দীপারও স্বীকারোক্তির লজ্জা সামলে নিতে দেরি হয় কিছু।

মনের নিভৃতে যে কথাটি লালন করেছে এতদিন, যে সত্য, আজ একজনকে

বলতে পেরে তার চেহারাটা চোখে পড়ে নিজে বোধহয় চমকেও উঠেছে একটু।

অনেকক্ষণ পরে বলে, 'মেজদা, ছোড়দা—ওর বন্ধুর দল, সবাই।'

'সে কি রে! ওরা কেন মারবে? এই এত ভক্তি, কী করেছে পুপু?'

গলাটা বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতসারেই একটু চড়ে গিয়ে থাকবে।

আবারও ব্যাকুল হয়ে উঠল দীপু, পিসীর মুখে হাত চাপা দিয়ে চাপা আর্তনাদের মতো গলায় বলে উঠল, 'আস্তে, পিসীমা আস্তে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি—কেউ যদি ঘুণাক্ষরেও টের পায় যে এই কথা তোমাকে বলছি, তোমার আমার কারও রক্ষে থাকবে না। এমনিতেই আমার রিভলভারটা কেড়ে নিয়েছে একটা ছুতো ক'রে।'

বিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠে না বটে—গত দুবারের সতর্কবাণীতে এটুকু শিক্ষা হয়েছে—কিন্তু শিউরে ওঠে সুভদ্রা।

'রিভালভার! তোর কাছেও রিভালভার থাকে নাকি?'

'ছিল এতদিন। সকলের কাছেই তো থাকে। সবু পর্যন্ত।'

অকস্মাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায়।

আরও খানিকটা অন্ধকার যেন সরে যায় চোখের সামনে থেকে।

এই তো কদিন আগের ঘটনা।

প্রায় নিত্যনৈমিত্তিকের মতোই সরকার-বাড়ি থেকে কটা টাকা ধার ক'রে আনছিল সুভদ্রা,—ধার না বলে ভিক্ষা বলাই উচিত, কারণ এই ধারের বেশির ভাগই তো আজকাল আর শোধ দেওয়া যায় না—মোড়ের তেরপল-ফেলা চায়ের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল দুটি ছেলে, এই গোরারই বয়িসী হবে—কি দু'-এক বছরের বড়। আজকাল যেমন হয়েছে চোস্ত প্যান্ট, পায়ে চটি, ওপরে একটা ক'রে পাঞ্জাবি ঝোলানো; হাত খানিকটা গুটিয়ে তোলা তাতে লোহার কাঁটা বসানো চামড়ার চওড়া বালার মতো, মারামারির সময় নাকি এগুলো খুব কাজে লাগে; দু'আঙুলে ধরা একটা ক'রে সস্তা সিগারেট।

এরা দুজন দাঁড়িয়ে ছিল, সুভদ্রা যখন কাছাকাছি এসেছে ওদিক থেকে আর একটি ছোকরা এল।

এদের একজন বললে, 'কী রে এত দেরি! চ, শো কটায়—দুটো না সওয়া দুটোয়?'

তৃতীয়টি ঘড়ি দেখতে দেখতেই জবাব দিল, 'দুটোয়। ইস্, পৌনে হয়ে গেল যে রে।···আরে বেরোনো কি যায়—বেরোতে যাচ্ছি কোথা থেকে দিদিরা এসে গেল, নানান বাগড়া। চ চ, জলদি—'

আগের একটি জবাব দিলে, 'তুমি শালার জন্যে দেরি হয়ে গেল, এখন চ চ করছিস খামোকা! ট্যাক্সী কর—তুই ট্যাক্সী ভাড়া দিবি!'

তৃতীয় জন বললে, 'এক পঁচাশি আছে আমার কাছে—দুটো টাকা বাগিয়েছিলুম দিদির কাছ থেকে—পনেরো পয়সা আসতে খরচা হয়েছে। হেঁটে এলে আরও কুড়ি মিনিট সময় লাগত—পাক্কা! আর কিছু নেই, সাফ কথা।'

'ওতেই হবে। দেড় টাকার বেশি ওঠে না—তবু তো তিরিশ পয়সা মার্জিন রইল।'

'কিন্তু ধোঁয়া ?'

'আমার স্টক আছে—সে ভাবতে হবে না।'

বলে—যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে যায় প্রথমটি।

তৃতীয় জনার শার্টের মধ্যে দিয়ে হাত গলিয়ে কোমরের কাছে কি দেখে নিয়ে বলে, 'কি রে, মাল কই ? নিস নি ?'

'না রে! সিনেমা দেখতে যাচ্ছি ওসব নিয়ে আবার—'

তাকে কথা শেষ করতে দেয় না প্রথম জন, বলে ওঠে, 'উঁহু উঁহু, মাল ছাড়া যাওয়া ঠিক নয়। আমরা এখন সবচিনে সবাই জানে।—ঠিক আছে ট্যাক্সী ঘুরিয়ে তুলে নিলেই হবে, না হয় গণ্ডা-আষ্টেক পয়সা বেশী পড়বে—সে আমার কাছে আছে, হয়ে যাবে'খন—চ চ, পা হাঁকা। মোড়ে না গেলে তো ট্যাক্সী নেই!'

বলতে বলতেই চলে গিছল তারা।

তখন 'মাল' জিনিসটা বোঝে নি।

অথবা ভুল বুঝেছিল।

মাল বলতে ভেবেছিল মদের শিশি কি চরস কোকেন জাতীয় কিছু।

কিন্তু তারপর যত ভেবেছে কথাটা নিয়ে, ততই মনে হয়েছে, তেমন নেশাখোরের মতো দেখতে নয় ছেলেগুলো। মদ কোকেন খাওয়ার চেহারাই আলাদা।

তবে ?

কী যে তাও ঠিক করতে পারে নি।

এখন বুঝছে—হয় রিভালভার নয় বোমা।

বোমা ঠিক হয়ত কোমরে ক'রে নিয়ে যাওয়া যায় না—রিভালভারই নিশ্চয়।

আশ্চর্য!

এইটুকু ছেলে, গলা টিপলে বোধ হয় এখনও মায়ের দুধ বেরোয়—এরা অনায়াসে এই সব মারণাস্ত্র নিয়ে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে!

এত পয়সাই বা পায় কোথায় এ সব কেনবার ?

কে যোগায় এদের ?

এই জন্যেই কি আজকাল এত ডাকাতি রাহাজানি হচ্ছে ?

লোককে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় চলছে!

আর, তার মানে তার ভাইপো ক'টির সঙ্গেও থাকে সর্বদা।

এতদিন এর কাছেও ছিল, এই মেয়েটার কাছে!···

কী আশ্চর্য!

কী সাংঘাতিক কাণ্ড!

ভাবতে ভাবতে মন বহু দূরে চলে গিয়েছিল।

এখন দীপুর কাতর প্রশ্নে চমক ভাঙল যেন, 'কী হবে পিসী ?'

তাই তো, এসব কী ভাবছিল এতক্ষণ, ছাইভস্ম!

একটু যেন লজ্জিত হয়ে ওঠে আবারও।

কিন্তু আবারও সেই আগের প্রশ্নেই ফিরে যেতে হয়, 'কিন্তু কেন, এরই মধ্যে হ'ল কি? কী করেছে কি পুপু?'

আস্তে আস্তে, থেমে থেমে, কান্নার ফাঁকে ফাঁকে সবই বলে দীপ্তা।

কোন কথাই গোপন করে না।

প্রদীপ এ পথে এগিয়ে এসেছিল মনে অনেকখানি আশা এবং আদর্শ নিয়ে।

উৎসাহ ছিল, পরিশ্রম করতে পারত, স্বার্থত্যাগেও প্রস্তুত ছিল।

কেবল কাজটা যে কি সেই সম্বন্ধেই ভাল ধারণা ছিল না।

অথবা এভাবে বোধ করি ধারণা হয়ও না।

শোনা কথায় ধারণা করা এক জিনিস, আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আর এক।

শোনা কথায় যে ধারণা হয়, তার ভিত্তি রচিত হয় আদর্শের আকাশে।

বাস্তবের সঙ্গে তার সম্পর্ক সামান্যই।

বক্তৃতা করতে, প্রচার করতে, সারারাত ধরে দেওয়ালে দেওয়ালে লিখে বেড়াতে আপত্তি ছিল না।

এই সব কাজের জন্যেই তো সে দুটো টিউশ্যানী ছেড়েছে, মাসে সত্তর টাকা আয়ের পথ বন্ধ করেছে। আছে এই চাকরিটা, তাও যদি প্রয়োজন হয় তো ছাড়তে দ্বিধা করবে না।

না, এসব কাজে এখনও যথেষ্ট উৎসাহ আছে।

এমন কি, এই যে ইস্কুলগুলো তছনছ করা, আগুন ধরানো, পরীক্ষা ভণ্ডুল, পুলিসের গাড়িতে বোমা ছোঁড়া, কারও বাড়ির ছাদ থেকে পুলিস স্কোয়াড তাগ ক'রে বোমা ফেলা, বাসে আগুন লাগানো—এতেও বিন্দুমাত্র গররাজী কি পিছপাও ছিল না সে, আজও নেই।

পৌঁছিয়ে গেছে সে নরহত্যাগুলোতেই।

অকারণ নরহত্যা যে!

'যারা কিছু জানে না, রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কমাত্র নেই—যাদের সঙ্গে আমাদের কোনো দুশমান নেই, তাদের এভাবে মারব কেন?' এই হল প্রদীপের প্রশ্ন।

পর পর অনেকগুলো খুন হয়ে গেল বটে।

সুভদ্রার মনে পড়ল কথাটা।

সত্যিই অকারণ খুন হয়ে গেল।

অন্তত ওদের তাই মনে হয়।

হয়ত কোন কারণ আছে—যা তারা জানে না, বুঝছে না। এই ভেবেই সুভদ্রা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছে নিজেকে।

সেই কথাই বলতে যায় সে।

যেন ওদের ঐ খুনে-দলের হয়ে কৈফিয়ৎ দিতে যায়।

কিন্তু তেমনি ফিস ফিস ক'রেই প্রতিবাদ ক'রে ওঠে দীপু।

না, এমন কোন কারণ ছিল না—নেত্যদাকে মারবার।

রাখালবাবুকে মারবারও না।

কোন কারণই ছিল না।

দীপু জানে ভেতরের সব কথা।

তাকে কেউ এতকাল কোন অবিশ্বাস করে নি, গোরার বরং গর্বই ছিল বোনের সম্বন্ধে, সাধারণ মেয়ের মতো নয় দীপ্তা যে, পেটে কথা থাকবে না।

এসব কাজের দায়িত্ব নেবার মতো ক'রে মানুষ করেছে সে বোনকে।

পুরুষের থেকে কোন অংশে ছোট নয়।

সেই কথাই বলে যখন-তখন।

সুতরাং দীপু এর আদ্যন্ত ইতিহাস জানে।

এই সব হত্যাকাণ্ডের।

নেত্যদা পুলিসের লোক—এই তার একমাত্র অপরাধ।

নেত্যদা ভাল লোক ছিলেন তা গোরারা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছে, এখনও করে।

অমায়িক, দিলখোলা লোক।

পরোপকারী—এ পাড়ার যে-কেউ গিয়ে ধরেছে লালবাজারে কোন কাজ পড়লে—তাকেই সাহায্য করেছে সে চিরদিন।

প্রাণ দিয়েই করেছে।

নিজেই সময় নষ্ট ক'রে, কাজের ক্ষতি ক'রে।

এ পাড়ায় দীর্ঘকাল আছে, সেই ছেলেবেলা থেকে।

নিজের বাড়ি করেছে, পালে-পার্বণে মোটা চাঁদা দিয়েছে বরাবর।

সবাইকে ভালবাসত, 'বাবা' 'ভাই' ছাড়া কথা ছিল না।

তাকে বাজার থেকে ফেরার পথে অমন ক'রে কুপিয়ে মারার কি দরকার পড়ল? কী করেছিল বেচারী?

প্রদীপের এই প্রশ্নের উত্তরে তারই মন্ত্রশিষ্য স্বপন উত্তর দিয়েছে, 'কিছুই করে নি। হাতের কাছে, ওকে সাবাড় করা সোজা বলেই করেছি। আমাদের পোগ্রাম—ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুলিস, বড় সরকারী অফিসার, জোতদার, ব্যবসাদার, সুদখোর মারতে হবে—পাবলিকের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে—এ প্রোগ্রাম তো তুমি জানোই পুপুদা! এখন আবার আকাশ থেকে পড়ছ কেন?··· সেই প্রোগ্রাম-মতো করেছি বৈ তো নয়। পুলিস অফিসার একজনকে মারতে হবে, মেরেছি। এর মধ্যে আবার পার্সনের কথা তুলছ কেন? একে না মেরে অপরকে মারলেই ভাল কাজ হ'ত? তার বিরুদ্ধেই বা আমাদের নালিশ কি বলো? তারা পেটের দায়ে চাকরি করতে এসেছে—এই তো?'

এর কোন জবাব খুঁজে পায় নি পুপু।

নিজের কথাগুলো অপরের গলায় শুনেছে সে, কী জবাব দেবে?

রাখালবাবু অবশ্য এই তালিকানুযায়ী কোন শ্রেণীতেই পড়েন না।

ইস্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত, তাতে সংসার চলে না বলেই কিছু কিছু হাত-দেখা, কোষ্ঠী করার কাজ করে থাকেন।

বয়স হয়েছে, ষাটের বেশিই হবে, কোমর ভেঙে গেছে—সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে হাঁটেন।

ঠিকুজী-কোষ্ঠী, হাত দেখার কাজ করেন বলেই বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হয় তাঁকে। এপাড়া ওপাড়া—বহু দূর-দূরান্তরেও যেতে হয়।

সময়েরও কোন বাঁধাধরা হিসেব নেই, এক-এক দিন বাড়ি ফিরতে রাত দশটা সাড়ে-দশটা বেজে যায়।

অপরাধের মধ্যে এ পাড়ায় সদ্য এসেছেন, মাত্র মাস ছ-সাত আগে।

এর মধ্যেই কে বা কারা রটিয়ে দিল, লোকটা পুলিসের স্পাই, ইন্‌ফরমার!

ব্যস আর কেউ কিছু দেখল না, কোন খোঁজখবর নিল না—স্থির হয়ে গেল ওকে 'লিকুইডেট' করতে হবে,, সেই মতোই একদিন সাবাড় হয়ে গেলেন রাখালবাবু।

কী ক'রে কী হ'ল কেউ জানে না, সম্ভবত রাত হয়ে গিছল, লাইন ধরে হেঁটে আসছিলেন, অন্ধকারে চার পাঁচ জন মিলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বোধহয়।

সকালে কে একজন আনাজ বেচতে যাচ্ছিল, সে-ই দেখতে পেল, ভদ্রলোক উপুড় হয়ে পড়ে আছেন লাইনের ধারে।

বুকে পিঠে ছোরা বসানোর দাগ তো আছেই, খাঁড়ার মতো কোন এক যন্ত্র দিয়ে গলাটাও কেটে দুখানা ক'রে দিয়েছে।

তারপর অবশ্য জানা গেছে লোকটার পেশা। তার জন্যে কেউই অনুতপ্ত হয় নি।—এই সামান্য ভুলের জন্যে।

এই ইন্‌ফরমার সন্দেহ ক'রেই ব্রজেনকে মেরেছে ওরা।

সতেরো বছরের প্রিয়দর্শন ছেলে, এই বয়সেই প্রচুর লেখাপড়া করেছে।

ওদের ভাষায় উঁচুদরের তাত্ত্বিক।

ওদের এই দলের মধ্যে বেশ ওপর দিকেই স্থান ছিল ব্রজেনের।

তবু তাকেও ছেড়ে দিল না ওরা।

ঘটনাটা হ'ল এই:

রাখালবাবুকে মারবার পর ব্রজেন একটু আপত্তি করেছিল।

লেখাপড়া জানা ছেলে সে, বুদ্ধিমান, ক্ষুরধার তার বুদ্ধি এবং অকাট্য যুক্তি।

তার প্রতিবাদ খুব মৃদু হয় নি—বলাই বাহুল্য।

সে বিস্তর পুঁথি, নেতাদের বক্তৃতার কাটিং এনে দেখিয়ে দিয়েছিল যে, এই শ্রেণীর অকারণ এবং নির্বিচার হত্যা—'হেস্টী'—তাদের স্বার্থের পরিপন্থী, তত্ত্বের বিরোধী।

এবং এ ঘটনার পর—মানে এই তর্কাতর্কির পর তিনদিন সে পাড়ায় বেরোয় নি, বোধ হয় অন্য পাড়ায় মাসীর বাড়ি গিয়ে বসে ছিল। তারপরই একদিন গভীর রাত্রে পুলিসের গাড়ি এসে বাবুলদের বাড়ি হানা দিয়ে বোমার মাল-মশলা, দেশী বন্দুক আর টোটা হাতিয়ে নিয়ে গেল, সেই সঙ্গে বাবুলকেও।

এমনিতে নাকি বাবুলের ওপর কারও কোন সন্দেহ হবার কথা নয়, তাকে কেউ কোনদিন দেওয়ালে লিখতে বা গভীর রাত্রে বোমা ফেলে বেড়াতেও দেখে নি।

সুতরাং কেউ নিশ্চয় খবর দিয়েছে পুলিসকে।

ভেতরের কেউ তো বটেই।

সে কে?

কে আর হতে পারে ব্রজেন ছাড়া?

ওর মনেই এত অসন্তোষ, এত প্রতিবাদ দেখা দিয়েছে যখন, তখন এ কাজ ও ছাড়া কে করবে?

অতএব—

ওর মৃত্যুর পরোয়ানা সই হয়ে গেল।

না, কাগজ কলমে নয়, ও দুটি বস্তুকে যতদূর সম্ভব এরা এড়িয়ে চলে।

মুখের কথা এবং চোখের ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

॥ ছয় ॥

পর পর এই ঘটনাগুলোর প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল বৈকি।

কিন্তু তবু বোধ হয় এত বিচলিত আর কোনটায় হয় নি প্রদীপ—যত এই ব্রজেনের ব্যাপারটায় হ'ল।

ষষ্ঠী পুজোর দিন পাড়ার সর্বজনীন পুজোমণ্ডপে এসে দাঁড়িয়ে ছিল বেচারী।

পুজো দেখার কথা নয় ওদের, দেখতে আসেও নি, আসলে মানুষ দেখতেই এসেছিল।

ঐ বয়সের যা ধর্ম—চারিদিকে অল্পবয়সী ঝলমলে মেয়ের দল—দেখবার লোভ সামলাতে পারে নি।

আগে একবার ওদের মধ্যে কথা হয়েছিল পুজোমণ্ডপগুলো সব পণ্ড করতে হবে—প্রতিমা ভেঙে মণ্ডপে আগুন লাগিয়ে, প্রদীপ আর দু'একজনই জোর প্রতিবাদ করে, পাবলিকের একটা বিরাট অংশকে বিদ্বিষ্ট করে তোলা ঠিক হবে না—এই যুক্তি দেয়।

সকলের এক-বছরের-পথ-চেয়ে-থাকা এই উৎসবটা।

সেইজন্যেই চুপ ক'রে গিয়েছিল এরা।

অনেকের হাত-নিশপিশ করা সত্ত্বেও কিছু করতে পারে নি।

পুজো যখন আছে তখন প্রতিমা দেখার ভিড়ও আছে।

প্রতিমা যারা দেখতে চায় না, তাদের জন্যে মানুষ।

পুরুষদের জন্যে আছে সুবেশা মেয়েদের দল।

সেই আকর্ষণই টেনে এনেছিল ব্রজেনকে —সতর্ক হবার কথা ভাবে নি।

তা ছাড়া এ সম্ভাবনাটাও কল্পনা করে নি সে।

একেবারে যখন পিছন থেকে এসে চার পাঁচ জন মিলে কেউ বা হাত, কেউ বা জামার কলার চেপে ধরে, কেউ বা পিছন থেকে ঠেলে নিয়ে গেছে পাড়ার বাইরে, তখন আর বুঝতে অসুবিধা হয় নি।

'প্রদীপদা, আমাকে বাঁচাও', 'ও প্রদীপদা, আমাকে মেরে ফেললে এরা', 'প্রদীপদা, তোমার পায়ে পড়ি একবার এসো' বলে চেঁচিয়েছিল ব্রজেন।

বিশেষ ক'রে প্রদীপকেই ডেকেছিল তার কারণ প্রদীপের মনোভাব যে বদলাচ্ছে সেটা ব্রজেন জানত।

তা ছাড়াও, প্রদীপ ওদের গুরুস্থানীয়—হয়ত তার কথা এরা শুনবে ভেবেছিল।

চরম সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়ে অসম্ভব জেনেও ক্ষীণতম আশার সূত্রটুকু ধরতে যায় মানুষ।

তত্ত্ব আর জীবনের সত্য এক নয়—সে শিক্ষা সেই শেষ মুহূর্তেই হয়।

তখন আর কোন কাজে লাগে না।

প্রদীপের বাড়ির সামনে দিয়েই টেনে নিয়ে গেল ওরা।

সে তখন বাড়িতে ছিল, এই আকুল আর্তনাদের প্রত্যেকটি শব্দই তার কানে পেঁাচেছে। গরম লোহার শিকের মতই জ্বলতে জ্বলতে যেন ঢুকেছে তা—কান দিয়ে সোজাসুজি মর্মে পেঁাচেছে।

ছটফট করেছে, কিন্তু কোন প্রতিকার করতে পারে নি। জানে নিরর্থক।

কেউই অবশ্য কোন কথা বলে নি, রাস্তায় বহু লোক দাঁড়িয়েছিল—চারিদিকেই ভিড়। সবাই—উপন্যাসের ভাষায়—চিত্রার্পিতের মতোই দাঁড়িয়ে রইল।

ওদের হাতে বোমা ছিল কিনা তাও কেউ দেখে নি।

একটা বোমা ছুঁড়তে হয় নি, একটা ছোরা বার করতে হয় নি—কারণ ওগুলো যে ওদের কাছে আছে—থাকে, এইটেই ধরে নিয়েছে সবাই।

আজ যদি নাও থাকে, এখন যে বাধা দিতে যাবে সে চিহ্নিত হয়ে থাকবে—কোন এক অদূর ভবিষ্যতে ঐ সব অস্ত্র নিয়ে আসতে অসুবিধা ঘটবে না।

ও ছেলেটা তো গেছেই—নিজেরা ওর সঙ্গে গিয়ে লাভ কি?

কিছুই করা যায় নি তাই।

কেউই কিছু করতে পারে নি।

ওদের বাধা দেবার কথা ভাবতেও পারে নি।

পরের দিন ভিন্ন পাড়ার রাস্তার ধারে লাশটা দেখতে পেয়েও কেউ কোন কথা বলে নি।

যে মেরেছে তাকে কেউ চেনে না।

কে মেরেছে কেউ দেখে নি।

কোন ঝগড়া মারামারি? কারও কোনও আক্রোশ ছিল?

তাও জানে না কেউ।

যে ছেলেটা ক'দিন আগেও পাড়ার সকলের পরিচিত ছিল—দেখা গেল তাকে কেউই চেনে না এ পাড়ার, কোন খবরই জানে না কেউ।

প্রদীপও এই দলে।

তাকেও সব কথা গোপন করতে হয়েছে।

কারা মেরেছে, কেন মেরেছে সে কথা বলা যায় নি কাউকে।

পুলিসকে তো নয়ই। পাথরের মতো উদাসীন হয়ে থাকতে হয়েছে তাকে।

সব চেয়ে বিপদ ওর বাবা সত্যভূষণকে নিয়ে।

সে একবাড়ি ভাড়াটে এবং বাড়িওলাদের সামনেই উঠোনে দাঁড়িয়ে অভ্যাসমতো চেঁচামেচি করতে লাগল, 'ছোঁড়াটা তোর নাম ধরেই বা ডাকছিল কেন? তুই ওর মুরুব্বী নাকি, য়্যাঁ? তুইও তো এই সব ক'রে বেড়াস—তাহলে তোকেও একদিন মারবে বল? ওঃ, খুব ছেলে মানুষ করেছিলুম বাবা, এমন যেন না-খেয়ে, না-পরে কেউ ছেলে মানুষ না করে! স্বর্গে বাতি দিচ্ছেন ছেলে। বলে, আপনি মর্জিল রাম লঙ্কা মজাইল! তাই হয়েছে তোর। নিজেও মরবি, আমাদেরও মারবি।··· এই পুলিস এল বলে, কেউ কি আর শোনে নি ছোঁড়াটার চিৎকার? বজ্জাৎ ছোঁড়া, নিজে তো যাচ্ছিসই একে সুদ্ধু ফাঁসাবার মতলব। যেমন বোক-চন্দর ইনি!'

বাবার মুখে হাত চাপা দিয়ে, পায়ে ধরেও থামাতে পারে না প্রদীপ।

শেষে প্রদীপের মা এসে পায়ের কাছে মাথা খুঁড়ে, কপাল ফাটিয়ে ফেলতে তবে চুপ করেছে।

সত্যিই ফেঁসে যাবার কথা—কারণ ব্রজেনের সে আর্ত চিৎকার—প্রত্যক্ষ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে বাঁচবার জন্য সে আকুল মিনতি—সকলের কানেই গিয়েছিল।

নেহাৎ নিজেদের মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন আছে বলেই চুপ ক'রে গেল সকলে, কীল খেয়ে কীল চুরি করল।

এবার কিন্তু, ব্রজেনের মৃত্যুর পর, প্রদীপ একেবারেই বেঁকে দাঁড়াল।

সে আর এ কাজে নেই।

তাকে এবার ছুটি দেওয়া হোক।

অনেক করেছে সে, আরও অনেক করতে প্রস্তুত ছিল, নিজের সব রকম স্বার্থ ভবিষ্যৎ সব ত্যাগ করতে রাজী আছে সে আজও—কিন্তু এই অর্থহীন কতকগুলো নরহত্যা—নিহাৎ চুনোপুঁটি, যারা আমার হাতের মধ্যে, একান্ত অসহায়, তাদের মেরে বাহাদুরি নেওয়া কি আত্মতৃপ্তি বোধ করা, এ মেনে নিতে রাজী নয় প্রদীপ।

তাই বলে সে ওদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে না।

ওদের শত্রুতা করা কি ধরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই উঠছে না, ওরা যা ভাল বোঝে করুক, ওদের সার্থকতাই কামনা করছে প্রদীপ।

ওদের ব্রত বা আদর্শ নিয়েও তার কোন মতদ্বৈধতা নেই।

মোদ্দা সে নিজে আর এর ভেতর থাকবে না।

তাছাড়া তাকে রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে এবার।

সংসারের দায়িত্ব অস্বীকার করা আর সম্ভব নয় কোনমতেই।

আর সত্যিই—চাকরি বলতে তো এই।

বিপুল সংসার ওদের, ভাইদের মানুষ করা, বোনের বিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন আছে।

আর কিছু বাড়তি রোজগার না করলে চলবে না।

সামনের মাস থেকে আবার টিউশ্যনী ধরবে সে।

তা তাতে তাকে ওরা কাপুরুষই বলুক আর বুর্জোয়াই বলুক।

দেখা গেল একদিকে দৃষ্টি যেমন খুলেছে প্রদীপের, আর একদিকে তেমনি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

নইলে সব জেনেশুনেও এমন কথা বলতে পারত না।

এ দলে আসা মানে অজগরের মুখ-গহ্বরে ঢোকা। ওরা গিলতে পারে, ওগরাতে পারে না।

দেহের প্রতিটি নড়াচড়ায় ভক্ষ্য বস্তু ভেতর দিকেই চলে যায়—অজগরও ইচ্ছে করলে আর বার ক'রে দিতে পারে না।

প্রদীপের কথা শুনে গোরা-নিমাই, ওদের দলের পরিমল, স্বপন, মলয়—এদের মুখ কঠিন ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

খানিকটা অবশ্য চুপ ক'রে রইল সবাই।

তারপর গোরাই কথা কইল প্রথম। বলল, 'তুমিই আমাদের এ কাজে নামিয়েছ, এ সব আইন-কানুনের কথাও তোমার মুখেই শোনা। দলত্যাগীদের ক্ষমা করার নিয়ম আমাদের নেই।'

ব্যস্ত হয়ে উঠল প্রদীপ।

এদের মুখের এই কঠিন রেখার সঙ্গে তার ভাল রকমই পরিচয় আছে, এর অর্থ সে জানে।

সে বলল, 'দলত্যাগ কে বলছে, গোরা! দলত্যাগ তো আমি করছি না। আমি তো বারবার বলছি—আই উইশ ইউ অল সাকসেস!...শুধু আমি—আমি এতটা সহ্য করতে পারছি না, এইটুকু আমাকে মাপ করো।'

'মাপ চাওয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা—ওগুলো মধ্যযুগীয় সেণ্টিমেণ্টালিটি, বুর্জোয়া জীবন-ব্যবস্থার অঙ্গ এগুলো। ওসব কথা তোমার মুখে অন্তত মানায় না। যে আমাদের দিকে নয় সে আমাদের শত্রু—এ নীতির প্রয়োগ যদি না-ও করি, তুমি এককালে আমাদের মধ্যে ছিলে, এখন থাকতে চাও না—এই-ই তো যথেষ্ট। তোমাকে অতঃপর আমরা চরম শত্রু বলেই গণ্য করব।'

গোরা তবু কণ্ঠস্বরে একটা সংযম রেখেছিল।

পরিমল যেন সাপের মতো হিস হিস ক'রে উঠল।

মুখখানার—ইংরেজিতে যাকে বলে snarl করা, সেই রকম খেঁকিয়ে ওঠার মতো ভঙ্গী ক'রে বলল, তোমার কথায় আমরা এ পথে এসেছি, আমাদেরও ভবিষ্যৎ ছিল, লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরি ক'রে smoothly দিন কেটে যেতে পারত আমাদের—সে সব ছেড়ে এতদূর এগিয়ে এসেছি, তুমিই তার মূলে। আমরা এমন

ভাবেই নিজেদের কমিট করেছি যে আর ফেরার কোন রাস্তা নেই! পুলিস যদি ধরতে পারে—আমাদের রেহাই দেবে না। আমাদের ফেরার সব রাস্তা বন্ধ ক'রে তুমি ফিরে যাবে—বিয়ে-থা ক'রে মনের সুখে ঘরকন্না করবে···এ হয় না। তুমি তোমার ডেথ ওয়ারেন্ট নিজেই সই করলে পুপু। এটুকু তোমার ভেবে দেখা উচিত ছিল!'

অসহায় ব্যাকুলভাবে একবার সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখল প্রদীপ। প্রতিদিনের মতো প্রভাতদের বাড়ির পিছনে সঙ্কীর্ণ বাঁধানো নালার ধারে ওদের সভা বসেছে।

এদিকে অধিকাংশ বাড়িরই জানলা নেই, থাকলেও নর্দমার গন্ধের ভয়ে বন্ধ করা থাকে—একেবারে তেতলার ছাদে উঠে ঝুঁকে না পড়লে ওদের দেখা যায় না।

সে চেষ্টা কেউ করবেও না।

ক'দিন আগে প্রভাতের ভাদ্র-বৌ দৈবাৎ বিকেলে কাপড় তুলতে এসে উঁকি মেরে দেখতে পেয়েছিল ওদের—সঙ্গে সঙ্গে উদ্যত পাইপগানের নল আর বড় একটা ছোরাও চোখে পড়েছিল।

আর সেখানে দাঁড়ায় নি রমা, তারপর থেকে ছাদের এধারেই আর আসে না।

এইখানেই বৈঠক বসানো তাই নিরাপদ।

অন্ধকার সুঁড়ি গলি হলেও মুখগুলোর চেহারা নজরে পড়ে বৈকি।

সেটুকুর মতো আলো আসে এখানে, বিশেষ এটা প্রায় দ্বিপ্রহর, সূর্য এখনও পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়ে নি। মুখগুলো স্পষ্ট; মুখভাবও বুঝতে কোন অসুবিধা নেই।

কঠিন নির্মম সঙ্কল্প সে-সব মুখে।

ক্ষমাহীন দণ্ডাদেশ তাদের ওষ্ঠের ভঙ্গীতে। চোখের দৃষ্টিতে শীতল বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা।

'তোরা—তোরা বড্ড ভুল বুঝছিস পরিমল—কি···'

শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিয়ে একবার কি বলতে চেষ্টা করল প্রদীপ, শুরুতেই থামিয়ে দিল নিমাই।

বলল, 'আর কিছু বলতে হবে না, পুপুদা। তোমাকে আমরা বুঝে নিয়েছি, আসলে মাছের রক্ত তোমার গায়ে, কুকুরের লিভার। দুটো খুনেই শেকী হয়ে পড়েছ!···এখন আর তুমি এ মত বদলাতে চাইলেও বিশ্বাস করতে পারব না। আমাদের যা ব্যবস্থা আছে এ সব ক্ষেত্রে তাই করতে হবে।···নিজেদের বাঁচবার জন্যেই করতে হবে। তোমার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কারও কোন আক্রোশ নেই, বুঝতে পারছি তোমার এ নিছাৎই নার্ভের দুর্বলতা, গ্ল্যান্ডের দোষ, কিন্তু আমরা যে কাজে নেমেছি, দুর্বলতার কোন স্থান নেই আমাদের মধ্যে। দুর্বলতা মানেই আমাদের কাছে মৃত্যু। এ কথাটা যেমন আমাদের বেলাও প্রযোজ্য, তেমনি তোমার বেলাও।'

শান্ত শাণিত শোনায় নিমাইয়ের গলা।

ওদের হাতের ছোরার মতোই শীতল আর শাণিত।

আর কেউ কথা বাড়ায় না।

কার্যকরী সমিতি কি একে বলা যায়—?

বলা গেলে বলতে হয়—সমিতির অধিবেশন শেষ ক'রে উঠে পড়ে সবাই।

মৃত্যুদণ্ড তো দেওয়া হয়েই গেল—কিন্তু কবে পালিত হবে দণ্ডাদেশটা সেইটেই জানা গেল না।

সেটা বলল না কেউ।

সেই মুহূর্তেও হ'তে পারত। বোমা, ছোরা ও পিস্তলের অভাব ছিল না, তা প্রদীপ জানে। কার কাছে কী আছে—তাও।

প্রদীপ বাধাও দিতে পারত না।

বাধা দিতে যাওয়া মূর্খতা, তা জানে বলেই দিত না।

কিন্তু এখানে সেই শাস্তিদানের পালাটা শেষ করলে এই নিভৃত জায়গাটি নষ্ট হয়ে যেত চিরদিনের মতো।

কে জানে, এখন যারা চুপ ক'রে আছে ভয়টা অপেক্ষাকৃত দূরে বলে, তারাই —মানে প্রভাত ও আশপাশের বাড়ির লোকেরা—ভয়ে দিশেহারা হয়েই বলে দিত পুলিসকে!

সুতরাং ওটা ভবিষ্যতের জন্যেই, সুবিধা মতো সুযোগের জন্যেই রেখে দিল।

শাস্তিদানটা নিশ্চিত, আসামীরও পালাবার পথ নেই—এ সবাই জানে, সুতরাং অতো তাড়া নেই কারও।

শুষ্ক বিবর্ণ মুখেই বাড়ি ফিরল প্রদীপ।

নিজের বাড়ি নয়—দীপ্তাদের বাড়িতেই প্রথম এল সে।

মুখের শুষ্কতা ও বিবর্ণতা ঢাকার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে সে এই পথটুকু আসতে আসতে।

পারে নি।

এ অপরিসীম বিবর্ণতা, এই নিদারুণ মৃত্যুভয় গোপন করা সহজ নয়।

যতই হোক সে ছেলেমানুষ।

অন্তরের আবেগ বাইরের নির্লিপ্ততায় গোপন করার অভ্যাস এখনও হয় নি তার।

অবশ্য গোড়াতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চেপে রেখেছিল কথাটা, শেষ পর্যন্ত পারল না।

তার কারণ—দীপ্তা প্রদীপের মনোভাব জানত।

এ মনোভাব প্রকাশের কি ফল হ'তে পারে, সে সম্বন্ধেও একটা আতঙ্ক ছিলই বরাবর।

দুই আর দুইয়ে চার যোগ ক'রে নিতেও দেরি হয় নি তাই।

ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে—জোর ক'রে চেপে ধরেছে সে, আদায়ও ক'রে নিয়েছে খবরটা।

আর, প্রদীপও তো বলতে চায় কাউকে, কাউকে তার বলা দরকার, না বলতে পারলে পাগল হয়ে যাবে যে!

আন্দাজ যা-ই করে থাক—নিশ্চিত হওয়ার পর চোখে অন্ধকার দেখেছিল দীপ্তা।

সেদিনও—এমনি দুকূল প্লাবিত ক'রে কান্নার ঢল নেমেছিল ওর দুটি আয়ত চোখে।

প্রদীপের বহু আকাঙ্ক্ষিত সাদর সান্ত্বনাও সে জলে বাঁধ দিতে পারে নি।

অবশেষে বলেছে দীপু, 'আমি কি মেজদাকে বলব একবার? আমিও তো ওদের কর্মী একজন—আমার কি এটুকু দাবী নেই—আমি যদি ওদের হাতে-পায়ে ধরি, তোমার জন্যে জামিন থাকি—তাও ওদের দয়া হবে না?'

কোন ফল হবে না, ব্যর্থ নিষ্ফল চেষ্টা—তা কি দীপুই জানত না?

তবু, না বলেও যে থাকতে পারে নি।

এটুকু আশা ছাড়লে তো বুঝি তখনই আত্মহত্যা করতে হয়।

মেয়েছেলে যতই শক্ত এবং দৃঢ় হবার চেষ্টা করুক তার ভেতরকার চিরকালীন নারীটা কখনও বদলায় না।

প্রিয়জনের কোন বিপদাশঙ্কা দেখা দিলেই সে বাইরের নির্মোকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্ব-রূপে প্রকাশ পায়। আকুলতায় ব্যাকুলতায় প্রলাপে বিলাপে এক মুহূর্তে গ্রাম্য আদিম নারী হয়ে ওঠে।

ওর এই ছেলেমানুষীতে ম্লান হেসেছে প্রদীপ।

বলেছে, তুমি তো জানোই দীপু—দয়া আর মায়া এ দুটো শব্দ ওদের কাছে ট্যাবু। ওদের কেন, আমাদের কাছে বলাই ভাল। এ আমিই ওদের শিখিয়েছি। না, না, ওসব করতে যেয়ো না, তাতে তুমি সুদ্ধ চিহ্নিত হয়ে যাবে।···এমনিতেই, তোমাকে সুদ্ধ এ পথে টেনে এনেছি সেজন্যে আমার আপসোসের সীমা নেই, তার ওপর—যদি তোমার কিছু হয় মরার পরও শান্তি পাবো না। না, থাক। আমি জানি কোন ফল হবে না, মিছিমিছি ছোট হয়ে লাভ নেই। য়্যাডিং ইনসাল্ট টু ইনজুরী! লেট মি টেক লীভ ইন পীস।'

তারপর অনভ্যস্ত হাতে সঙ্কোচের সঙ্গেই নিজের ময়লা—এতক্ষণের ঘামমোছা রুমালটা দিয়ে ওর চোখের জল মোছাবার চেষ্টা করেছে, বলেছে, 'প্লীজ, প্লীজ দীপু, সহজ হও, স্বাভাবিক হও। নইলে, মুখে কিছু না বললেও—এইভাবে থাকলেই ওরা সন্দেহ করবে, বুঝে যাবে ব্যাপারটা। বুঝবে তুমি আমার কথা ভেবেই এমন ম্লান হয়ে আছ, আর সঙ্গে সঙ্গেই তোমার নামও ব্ল্যাক লিস্টে উঠবে।'

কথাটার যথার্থ্য দীপ্তাও অস্বীকার করতে পারে নি।

তেমনি পারে নি সে পরামর্শ-মতো চলতেও।

ওর বাইরের রাজনীতির মুখোশটা অন্তর্ভেদী আবেগের এই প্রচণ্ড আবেগে কোথায় খসে পড়ে গেছে, অন্তরের নারীসত্তা আর আত্মগোপন করার মতো ছদ্মবেশ খুঁজে পায় নি।

বেরোয় নিও তাই কদিন।

কিন্তু গোরা, নিতাই, সবু তো এই বাড়িতেই থাকে।

তারা কি আর লক্ষ্য করে নি ওর ম্লান বিষণ্নতা ?

তার কারণও কি বুঝতে পারে নি কিছু ?

কে জানে—ওর নাম ব্ল্যাক লিস্ট্ বা রেড্ লিস্ট্ যাতে ওঠে উঠুক—ওর ভয়, প্রদীপের প্রাপ্য শাস্তিটা এর জন্য না ত্বরান্বিত করে !

॥ সাত ॥

পাথরের মতো বসে শুনল সুভদ্রা।

শুনেও বহুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল পাথরের মতো।

সে কোনদিন সোজাসুজি এদের আলোচনা তর্কবিতর্কে অংশ নেয় নি এটা ঠিক, তবু অনেক দিন অনেক কথাই কানে গেছে—বাড়িতে তো বটেই, অন্ধকার রাত্রে সিঁড়ির কোণে বসে বসেও বহু আলোচনা শুনেছে সে।

সে যে ওখানে বসে শোনে তা এরাও জানে—ছেলেরা।

কিন্তু তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামায় নি।

তার কারণ সুভদ্রাকে কেউ ঠিক সক্রিয় সচেতন মানুষ বলে মনে করে না।

শুধু ছেলেরা কেন, তার উপস্থিতিকে কেউই ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করে নি কোথাও কোনদিন।

ওর যে কোন চিন্তাশক্তি আছে, বিশেষ কোন কথা বোঝার মতো জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা—এটাও কেউ ভাবে না।

তাই তার সামনে সাবধান হয়ে, হিসেব ক'রে কথা বলার কথাও মাথায় যায় নি কারও।

এই ধরনের অসতর্কতাই কাল হয় অনেকের কাছে।

কাউকেই হিসেব থেকে বাদ দিতে নেই।

কারও চিন্তা বা কর্মশক্তিকে অবজ্ঞা করাই উচিত নয়।

রাবণ নর আর বানরকে নিজের ভক্ষ্য জ্ঞান ক'রে বর নেবার সময় তাদের হিসেবে ধরেন নি, তাদের হাতেই নিহত হলেন শেষ পর্যন্ত।

এদের তাই ভাল ক'রেই চিনে নিয়েছে সুভদ্রা।

প্রদীপ ঠিকই বলেছে, এদের কাছে দয়ামায়া আশা করা বৃথা।

প্রদীপ এদের অনেক কথা জানে, ভেতরের অনেক রহস্য।

কে কে এই দলে আছে, কারা কারা কোন্ কাজে অংশগ্রহণ করে, কোথায় বোমা তৈরী হয়, এসব খরচ কোথা থেকে আসে, কার কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে কতটা কি

আদায় করা হয়েছে, পাইপগান, য়্যাসিড, রিভলভার, পেট্রোল বোমা—এ সব কোথা থেকে এসেছে, কোথায় স্টক থাকে, কে শেখায় এ সব চালাতে—প্রদীপ সমস্ত জানে।

অথবা ঠিকমতো বলতে গেলে একমাত্র প্রদীপই সমস্ত জানে।

সেই প্রদীপকে যদি ওদের শত্রু বলেই মনে ক'রে থাকে তো তাকে দয়া করতে পারবে না ওরা, হয়ত পারা উচিতও নয়—ওদের দিক থেকে সাধারণ বুদ্ধির দিক থেকে বিচার করতে গেলে অন্তত।

না, কোন যুক্তি বা কাকুতি-মিনতিতে কিছু হবে না। সুভদ্রাও তা জানে।

তাছাড়াও, সে যাদের কাছে করা যায়—গোরা, নিতাই, সবু—তাদের হাতেও এ সিদ্ধান্তের সবটা নির্ভর করছে না।

তারা এতটা ঝুঁকি নিতেও চাইবে না।

বিশেষ ক'রে গোরা—সে যেন দিন দিন কঠিন হতে কঠিনতর হয়ে উঠছে।

নির্মম থেকে নির্মমতর।

স্বার্থপরতার সর্বশেষ কথা সে।

শুধু—সে স্বার্থটা দলগত ও নীতিগত—ওর পক্ষে বলার মতো এ-ই একমাত্র যুক্তি।

সুতরাং প্রদীপকে কোথাও সরিয়ে দেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

ওকে বাঁচাবার বোধ হয় সে-ই একমাত্র উপায়।

কিন্তু কোথায় সরাবে?

যেখানে যেখানে প্রদীপের যাওয়া সম্ভব সেখানে সেখানে এরাও যেতে পারবে।

খবর পেতেও অসুবিধা নেই।

যখন থেকেই খরচের খাতায় নাম উঠেছে প্রদীপের, নিশ্চয় তখন থেকেই তার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য করছে—দিন-রাত, কেউ না কেউ।

পালা ক'রে পাহারা দিচ্ছে হয়ত।

তা ছাড়া, কোথায় পাঠানো সম্ভব সে সম্বন্ধেও ভাল কোন ধারণা নেই সুভদ্রার।

জন্মস্থান গুপ্তিপাড়া, মাসির বাড়ি কালনা, শ্বশুরবাড়ি সহজপুর—তারপর এই কলকাতা, এ ছাড়া সে কিছু জানে না।

কোনো দিন কোথাও যায় নি।

বিশুদা যতদিন বেঁচে ছিলেন বহুবার দিল্লী যাবার কথা লিখেছেন—কিন্তু সেও যাওয়া হয় নি।

তিনি ওর খরচও দিতেন হয়ত, তবু যেতে পারে নি সুভদ্রা।

প্রথমত সঙ্গীর অভাব, দ্বিতীয়ত এদের সংসারের অসুবিধা।

ওর যাওয়ার কথা উঠলেই শোভার মুখ শুকিয়ে উঠেছে।

কোথাও পাঠাতে গেলে খরচের প্রশ্নও আছে।

প্রদীপের যা মাইনে তা থেকে দশ-বারো টাকা মাত্র নিজের জন্যে রেখে সবটাই ধরে দিতে হয় সংসারে।

সে দশ-বারোর এক পয়সাও থাকা সম্ভব নয়, তবুও তো সব চেয়ে সস্তার সিগারেট খায় ও।

সংসারও দেনা ছাড়া চলে না।

সেখান থেকে পঞ্চাশটা টাকাও বার করতে পারবে না বোধ হয়।

আর কোথাও থেকেই ধার পাবে না সম্ভবত।

আপিসের অবস্থা খারাপ, তাঁর ওপর ফাঁকিবাজ বলে প্রদীপের নাম রটে গেছে—দেরিতে যায়, আগে বেরিয়ে আসে—কামাই তো লেগেই আছে, সুতরাং সেখান থেকেও কোন সহায়তা পাওয়ার আশা নেই।

তবে?

এই তবেটারই কোন জবাব খুঁজে পায় না সুভদ্রা।

অথচ আর সময় নেই মোটেই—এটাও বোঝে।

তিন চার দিন কেটে গেছে বিচার আর দণ্ডাদেশের পর।

এমনিতেই বহু বিলম্ব হয়েছে।

সুভদ্রা অস্থির হয়ে ওঠে কেমন যেন।

কোন দিকে কোন পথ দেখতে না পেয়ে একটা দম বন্ধ হবার ভাব বোধ করে।

মেয়েটা সেই থেকে আকুল আগ্রহে আর অসীম নির্ভরে চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে, একান্তভাবে ওকেই অবলম্বন করেছে।

তাকেও নিরাশ করতে, 'কিছু করতে পারব না' একথা বলতে পারছে না।

পারা সম্ভব নয়।

মেয়েটা হয়ত এখনই অজ্ঞান হয়ে যাবে সে কথা শুনলে।

না, 'না' বলা চলবে না কোনমতেই।

কিছু একটা করতেই হবে।

আর এখনই, আজই।···

একটা কারণহীন ভিত্তিহীন আশ্বাস আনার চেষ্টা করে সে মনে মনে।

সারা সন্ধ্যাটাই ভাবল সুভদ্রা, সংসারের অসংখ্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে। ডাল আর রুটি, এ ছাড়া কিছু রান্নার ছিল না, তবু—রুটিও তো অনেক।

শোভা বৌদি বেলে দেয় ঠিকই, তৎসত্ত্বেও সময় কম লাগে না।

সুভদ্রা তার ওপরও রাস্তার ধারে দূর্বা ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে যে গয়লানটে শাক হয়ে ছিল, সেগুলো সংগ্রহ ক'রে এনে বেছে গরম জলে ধুয়ে নিয়ে ভাজা করল।

এতে অনেক সময় গেল।

এই সময় যাওয়াটাই চাইছে সে।

কাজ করতে করতে ভাবাটা ভাল হয়—হাতের সঙ্গে মাথার কি একটা যোগাযোগ আছে, হাত না চললে মাথাও যেন জড় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

অন্তত সুভদ্রার যায়।···

অনেক রাত্রে খাওয়া-দাওয়া চুকল।

ছেলেরা যথারীতি খেয়ে বেরিয়ে গেছে—শুধু সবুর শরীর খারাপ বলে সে শুয়ে পড়ল।

দীপ্তাকে চাপা ধমক দিয়ে, প্রদীপের বিপদ আরও বাড়বে সে না খেলে—এই ভয় দেখিয়ে জোর ক'রে দুখানা রুটি খাওয়াল।

কানাইদা আজ সকাল ক'রে ফিরেছেন—তাঁরও খাওয়া-দাওয়া চুকে গেছে।

তীশু সত্যেনের সঙ্গে সিনেমায় বা অন্য কোথাও গিয়েছিল, সে খেয়েই ফিরেছে।

আজকাল প্রায়ই এমনি বাইরে থেকে খেয়ে আসে সে।

আর কোন কাজ কোথাও নেই।

শুধু সুভদ্রারই খাওয়া বাকী।

সে নিজের খাবার চাপা দিয়ে রেখে প্রতিদিনের অভ্যাস মতো এসে বসল।

একটা পথ পেয়েছে সে ভাবতে ভাবতে।

একমাত্র পথ পুপুকে বাঁচাবার, অন্তত সুভদ্রা যতদূর যা ভেবে দেখেছে।

বড়ই দুঃসাহসিক কাজ কিন্তু।

কখনও এ ধরনের কাজ করে নি সুভদ্রা।

পুরুষ, বিশেষ অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কথা কইতেই ওর ভয় করে।

ভাবতেই বুক কাঁপছে ওর।

অথচ উপায়ই নেই।

মেয়েটা শুয়ে শুয়ে কাঁদছে—এখানে আসার আগেও অন্ধকার বিছানায় পাশে দাঁড়িয়ে শুনে এসেছে।

শুতে পাঠাচ্ছে যখন—জোর ক'রেই পাঠাল সুভদ্রা, 'আমাকে একটু ভাবতে দে' বলে—তখনও ওর হাতটা চেপে ধরে করুণভাবে অনুক্ত প্রশ্ন করেছে, 'পিসী'?

কিছু বলতে পারে নি, বলেও নি, শুধু নীরবে মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়েছে।

কিন্তু সেও তো এক রকম প্রতিশ্রুতি দেওয়াই হয়েছে।···

না, আর দ্বিধার সময় নেই, সঙ্কোচের অবসর নেই।

শেষ মুহূর্তে এসব কথা ভেবে কোন লাভ হবে না।

করতেই যখন হবে, তখন ক'রে ফেলাই ভাল।

আর কারও পরামর্শ পাওয়া যখন সম্ভব নয়—নিজের বুদ্ধিতে যতটা এসেছে তার ওপরেই নির্ভর করতে হবে।

তবু স্থির হয়েই বসে রইল সুভদ্রা।

তখনও বোধ হয় বুদ্ধির কাছে মাথা খুঁড়ছে মনে মনে—অন্য কোন নিরাপদ উপায়ের জন্যে। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

ক্রমশ ঘড়িতে বারোটা বেজে গেল।

নিস্তব্ধ জনহীন হয়ে গেল রাস্তাঘাট।

এমনিতেই আজকাল দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে নিষুতি হয়ে যায় পাড়া—শুধু ঐ ছেলেগুলোই পথে পথে ঘুরে বেড়ায় যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে।

ওদেরই ভয় বেশী সুভদ্রার, তাই আরও আড়ষ্ট হয়ে কান পেতে বসে আছে।

কিন্তু আজ বোধ হয় তারাও এদিকে কেউ নেই।

শুধু পাড়ার পাহারাদারটা ল্যাম্পপোস্টের গায়ে লাঠি ঠুকে ঠঙ্ ঠঙ্ শব্দ ক'রে বেড়াচ্ছে।

নিঃশব্দেই উঠে পড়ল সুভদ্রা।

পিছনের দরজা দিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে সরু গলিপথে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

দরজা ভেজানো রইল। তা থাক।

এ বাড়িতে কেউ আসবে না।

চোর তো নয়ই। চুরি করার মতো বিশেষ কিছু নেই, তা সবাই জানে।

কাউকে ডেকে দরজা বন্ধ করতে বললে অনেক জবাবদিহি, অনেক কৈফিয়ত।

মিছিমিছি লোক-জানাজানি করা।···

পিছনের সরু গলি থেকে বেরোবার মুখে বড় রাস্তার মোড়ে আর একবার থমকে থেমে চারিদিক দেখে নিল সুভদ্রা।

না, এদিকে কেউই নেই, যতদূর দৃষ্টি চলে কোন মানুষই নজরে পড়ে না।

পাহারাদারটাও বোধ হয় পাড়ার অপর দিকে চলে গেছে।

বড় রাস্তায় পড়ে দ্রুতই হাঁটতে লাগল সে।

বড্ড বেশী আলো রাস্তাটায়। বহুদূর থেকে দেখা যায়।

গাছপালা আছে বটে দু'দিকে, কিন্তু তাতে যথেষ্ট ছায়া বা আড়াল হয় না।

বড় রাস্তা দিয়ে গিয়ে আর একটা সরু পথ।

ওদের বাড়ির পিছনের মতো অত গলি নয়।

অর্থাৎ অন্ধকার নেই, আবার বড় রাস্তার নির্জনতারও অভাব।

কাছাকাছি বাড়ি, সামান্য পায়ের আওয়াজও কানে গিয়ে কেউ জেগে উঠতে পারে।···

যতদূর সম্ভব নিঃশব্দেই চলছে সে, কিন্তু তবু, শুকনো পাতা মাড়ালেও তো আওয়াজ হয়।

নিজের বুকের আওয়াজই আজ যথেষ্ট বিপজ্জনক মনে হচ্ছে।

ওদের বাড়ি থেকে থানা বড় জোর মিনিট কুড়ির পথ।

সুভদ্রার আধ ঘণ্টা লাগল।

ওর মনে হ'তে লাগল পথ সীমাহীন, সে বোধ হয় এক যুগ ধরে হাঁটছে।

যেতে যেতে অনেক বার মনে হয়েছে—দরকার নেই গিয়ে, ফিরেই যায় বাড়িতে। আবার তখনই ভেবেছে, এই এতটা পথ এসেছে, যদি কেউ দেখার হয় তো

দেখেই নিয়েছে, ফিরতেও হবে এতটা ভেঙেই অর্থাৎ বিপদের সম্ভাবনাটা পুরোই রয়ে যাবে অথচ কাজ হবে না।

তার চেয়ে বেকুফি যদি হয়েই থাকে তো হোক, সে এর শেষ দেখে যাবে।

থানায় ঢোকার মুখে 'দরওয়াজা' অর্থাৎ বাইরের পাহারাওয়ালা সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে দেখল, কিন্তু একেবারেই শুধু হাতে এসেছে দেখে বোধ হয় কিছু বলল না।

এখনকার দিনে দিন-রাতই থানায় ভিড়।

কত লোক কত কাজে আসছে—মিছিমিছি জেরা করতে গিয়ে লাভ নেই।

সামনের ডেস্কে যে ছোট দারোগাবাবু বসেছিলেন, তিনিই প্রশ্ন করলেন, 'কী চাই আপনার ?'

'আপনিই কি এই থানার ও. সি. ?' প্রশ্ন করল সুভদ্রা।

এতদিনে এই শব্দটার সঙ্গে খুব পরিচয় ঘটে গেছে ওর—ছেলেমেয়েদের মুখে শুনতে শুনতে।

সে ভদ্রলোক ঈষৎ একটু ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললেন, 'না, আমি এস. আই.। বড়বাবু এখন কোয়ার্টারে—এখন তো তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না ! যা বলতে চান আমাকেই বলতে পারেন—'

'দেখুন,' হঠাৎ যেন কোথা থেকে একটা দৃঢ়তা আর সাহস এসে যায় সুভদ্রার মনে, 'আমি তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে চাই, খুব জরুরী দরকার। আমি ভদ্রলোকের মেয়ে, ব্রাহ্মণকন্যা—আমি আপনাকে বাজে কথা বলছি না, সত্যিই এটা বহু লোকের জীবন মরণের প্রশ্ন। একবারটি তাঁকে ডেকে দিতে পারেন না ? দরকার হয় তো আমিও যেতে পারি তাঁর কাছে, বরং বিশ্বাস না হয় তো আমার সঙ্গে দুজন সিপাহী দিন—তারা গিয়ে পেঁছে দিয়ে আসুক।'

ছোট দারোগা অপ্রসন্ন মুখে বললেন, 'কী মুশকিল, আমিই তো নাইটের ইন-চার্জ। তাঁকে যা বলা যায় আমাকে বলতে বাধা কি ? আইনত আমিই এখন বড়বাবু।'

'দেখুন,' দুহাত জোড় করে বলল সুভদ্রা, 'বাধা একটু আছে। আমি জানি এখান থেকে জরুরী খবরগুলো গলে বেরিয়ে যায়। যাদের জানা উচিত নয়—তারাই আগে জানতে পারে। এ যদি শুধু আমার কোন বিপদের কথা হ'ত আমি ঝুঁকি নিতে পারতুম। এটা বলতে পারব না, আমাকে ক্ষমা করবেন।'

দারোগাবাবুর মুখ আরও ভয়ঙ্কর এবং ভ্রূকুটিবদ্ধ হয়ে উঠল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী ভেবে তিনি টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন।

কী একটা নম্বর ডায়াল ক'রে নিম্নস্বরে কি কথাবার্তাও বললেন—বোধ করি বড়বাবুর সঙ্গেই, তারপর টেলিফোন নামিয়ে এক সিপাহীকে ইশারা ক'রে কাছে ডেকে বললেন, 'এঁকে বড়বাবুর কাছে নিয়ে যাও।'

সুভদ্রাকে বলল, 'আপনি যান এর সঙ্গে—তিনতলায় ওঁর কোয়ার্টারে।'

সিপাহী বোধহয় বিস্মিত হয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, সে চেষ্টার জড় মেরে দিলেন

দারোগা, বললেন, 'বড়বাবু রাজী হয়েছেন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে—তিনি অপেক্ষা করছেন।'

প্রাথমিক একটি দুটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েই সুভদ্রা একেবারে কাজের কথা পাড়ল।

প্রদীপ মুখার্জি বলে একটি ছোকরা—ত্রিশের তিন নম্বর মাধব বটব্যাল লেনে থাকে—সন্ত্রাসবাদীদের একজন নেতা, তারই চেষ্টায়, সে-ই টাকা-কড়ি তুলেছে, মাল কিনে এনেছে—ছেলেরা অনেকগুলো, বোধ হয় তিন-চারশ বোমা তৈরী করেছে।

বড়াল পার্কের কোণে যে পড়ো পুরনো বাড়িটা আছে—আগে কয়েকজন গুর্খা থাকত, সেখান থেকে তাদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেইখানেই বোমা তৈরী হয় এবং স্টক থাকে।

ওদের প্ল্যান—একদিনে ওরা এই বোমা দিয়ে কাছাকাছি রেল স্টেশন দুটো, পাঁচটা ইস্কুল, ইলেকট্রিকের ঘর, পাম্পিং রুম, এবং মেটারনিটি হোম পুড়িয়ে দেবে, সেই সঙ্গে—সুযোগ পেলে থানাও।

কিন্তু তাতেও সম্ভবত শেষ হবে না, সেই বিপুল মারণাস্ত্র-সম্ভার।

সেক্ষেত্রে আরও কিছু কিছু এই ধরনের 'নাশকতামূলক' কাজ করবে ওরা।

সে তালিকা অবস্থা বুঝে তখন-তখনই তৈরী হবে।

এও জানে সুভদ্রা—আজ-কালের মধ্যেই এটা কার্যকর করা হবে।

বড়বাবু যদি পারেন তো—এখনও বোধ হয় সময় আছে—এই প্রচণ্ড ধ্বংসকাণ্ড নিবারণ করুন।

নিদ্রালু চোখেই সুতীর স্লিপিং গাউনটা জড়িয়ে এসে বসেছিলেন বড়বাবু—কিন্তু তাঁর মস্তিষ্ক আদৌ তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল না। তিনি নীরবে স্থির হয়ে বসে সুভদ্রার কথা সব শুনে গেলেন।

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে শুধু বললেন, 'আপনি যে ঠিক বলছেন, বাজে ধাপ্পা দিচ্ছেন না—তার প্রমাণ ?'

বোধ করি এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুতই ছিল সুভদ্রা।

সে বললে, 'আমি এখানে বসে থাকছি, যে ঠিকানা বলছি সেখানে লোক পাঠান—যদি আমার কথা মিথ্যা হয়— যে শাস্তি দেবেন আমি মাথা পেতে নেব।'

'হুঁ। আপনি এসব কথা জানলেন কোথা থেকে ? আপনার ছেলেপুলে বুঝি এর মধ্যে আছে কেউ ?'

দু'হাত জোড় ক'রে সুভদ্রা উত্তর দিল, 'ঐটি আমাকে মাপ করবেন, বলতে পারব না। তবে আমার ছেলেপুলে নেই, বিশ্বাস করুন—আমি বাল্যবিধবা। যে কোন দিব্যি গালতে বলবেন গালতে রাজী আছি।'

'তা আপনি আর কারও নাম বলছেন না, শুধু প্রদীপের কথাই বলছেন কেন ? ওর ওপর আপনার কোন আক্রোশ আছে ?'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল সুভদ্রা।

মনে মনে বোধ হয় ভেবে নিল জবাবটা। তারপর বলল, 'ঠিক তার উল্‌টো। সব বলতে পারব না—তবে এটা জেনে রাখুন, সে আমার খুব প্রিয়পাত্র, স্নেহের পাত্র। ছেলের মতোই। তার কল্যাণের জন্যেই আমি ছুটে এসেছি। ওরা যা পরিকল্পনা করেছে—তা যদি করে তো এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে। তখন তার কিনারা না ক'রে আপনাদের উপায় থাকবে না। আর সেক্ষেত্রে একদিন না একদিন ও ধরা পড়বেই। কিন্তু তখন ওকে বাঁচাবার কোন পথ পাবো না। এতগুলো অপরাধের দায় চাপবে ওর মাথায়, চিরদিনের মতোই ডুববে। ধরা যদি নাও পড়ে, পালিয়ে বেড়াতে হবে—ছেলেটার ইহকাল পরকাল মাটি হয়ে যাবে। বড় গরীব হুজুর ওর বাবা মা, অনেক কষ্ট ক'রে মানুষ করেছে—আরও তিনটি ভাইবোন আছে ছোট ছোট। এমনভাবে বরবাদ হয়ে গেলে তাদেরও দাঁড়াবার মতো কোনো আশ্রয় থাকবে না। অথচ এখন ওকে ধরলে এ ব্যাপারের সঙ্গে সোজাসুজি জড়াতে পারবেন না হয়ত—কিছুদিন হাজতে রাখার পর ছাড়তে হবে।...আর প্রমাণ হলেও বোমা তৈরী করার অপরাধ এক জিনিস আর তা দিয়ে বাড়ি-ঘর-ইস্কুল নষ্ট করা, লোকের প্রাণহানি করা অন্য জিনিস। দুটোয় অনেক তফাত।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ওর মুখের দিকে চেয়ে বসে রইলেন বড়বাবু।

মনে মনে কথাগুলো হিসেব ক'রে ওজন ক'রে দেখে নিলেন যেন।

কী দেখলেন এই বিগত-যৌবনার অতি সাধারণ মুখে কে জানে, বোধ হয় সুভদ্রা বেশ বিশ্বাসযোগ্য ভাবেই ওর বক্তব্যের আন্তরিকতা প্রকাশ করতে পেরেছিল, তাই শেষ অবধি বিশ্বাসই করলেন বড়বাবু।

বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিকানাগুলো আর একবার বলুন তো, লিখে নিই। আপনার ঠিকানাটাও বলুন—'

ঠিকানা লিখিয়ে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে আসবার মুখে আর একবার দাঁড়াল সুভদ্রা। বলল, 'ওদের ঠিক আছে, কালই বোধ হয় ওরা কাজ সারবে। যদি ওদের তারিখ না এর মধ্যে বদলে থাকে তা হ'লে হয়ত কাল ভোর বেলাই প্রদীপ এ পাড়া ছেড়ে চলে যাবে—বেলুড়ে কি কোন্নগরে ওর মাসী বা কাকার বাড়ি গিয়ে থাকবে। ধরতে হ'লে আজ শেষরাত্রে ধরাই ভাল—'

'ঠিক আছে। আপনি যান। আমি দেখছি কি করা যায়।...নমস্কার।'

সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এসে বিদায় দিলেন বড়বাবু।

থানায় আসবার সময় তবু যেন একটা ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছিল। এখন ফেরার বেলা আরও ভয়-ভয় করতে লাগল সুভদ্রার।

যদি কেউ দেখে ফেলে!

এ থেকে অনেক কিছু কল্পনা ক'রে নেবে ওরা।

সত্যটাও কল্পনা করা একেবারে অসম্ভব নয়।

তা ছাড়া, যা দিনকাল—শুধু তো এরাই নয়, এদের আড়ালে চোর, ডাকাত, লুটেরারাও বেশ গুছিয়ে নিচ্ছে।

যদি তেমন কোন বদমাইশের পাল্লায় পড়ে ?

একবার মনে হ'ল—থানার দারোগাবাবুকে বলবে নাকি একজন সিপাহী সঙ্গে দিতে ?

পরক্ষণেই নিজের নিবুর্দ্ধিতায় নিজেরই হাসি পেল সুভদ্রার।

তাহলে কিছু আর জানতে বাকী থাকবে নাকি ?

তার ভারী বুটের আওয়াজে যারা ঘুমোচ্ছে তারাও ঘুম ভেঙে জানলা দিয়ে উঁকি মারবে।

আর হয়ত দারোগাবাবুও ন্যাকা ভাববেন।

বলবেন, 'আসবার সময় কই লোক তো লাগে নি—যাবার সময়ই যত ভয় !'

অন্য রকম সন্দেহও করতে পারেন।

পুলিস সিপাহীকে এইভাবে নিয়ে গিয়ে বিপদে ফেলতে চায় এমন মনে করাও অস্বাভাবিক নয়।

না, সে হবে না। ফিরতে ওকে একাই হবে।

একবার উঁকি মেরে দেখে নিল।

রাস্তা একেবারে জনহীন।

একটা গাড়ি ঘোড়া কি রিক্সা পর্যন্ত নেই।

চারদিক নিস্তব্ধ, সুষুপ্ত।

এদিক ওদিক চেয়ে একসময় ভরসা করে পথে বেরিয়ে পড়ল সে, তারপর আগের মতোই জোরে পা হাঁকাল।

খালি পা—পথে মধ্যে মধ্যে খোয়া উঁচু হয়ে আছে—পা বোধ হয় কেটেই গেল খানিকটা—তা হোক ; ভালয় ভালয় বাড়ি পেঁছিলে পায়ের পরিচর্যা করার ঢের অবসর পাবে।

আবারও সেই রাস্তার পর রাস্তা।

বড় থেকে সরু গলি, আবার বড় রাস্তা।

অনেকখানিই নিরাপদে চলে এল সে।

আর তিন মিনিটের রাস্তা বড় জোর।

এইটুকু পেরিয়ে যেতে পারলেই—।

এই তো সামনে রঞ্জনদের বাড়ি। আর কি, এসেই তো গেছে এবার।

আর দুটো মিনিট।

ভগবান বাঁচিয়ে দিলেন বোধহয় শেষ পর্যন্ত।

ভাগ্যে—আজ পথে কেউ ছিল না—ছোঁড়ার দল…।

একটু হিসেবে ভুল হয়ে গিয়েছিল সুভদ্রার।

বোধ হয় আপৎকালে এমনি ভুলই হয়।

নইলে সে জানত, শুনেছিল। রঞ্জনের বৌই তো গল্প করে গেছে একদিন।

ওদের বাড়িটা মোড়ের মাথায়—তেতলা ছাদ থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়

বলে, ছেলেরা ওদের ছাদে একটা ঘাঁটি করেছে। সারারাত জেগে পাহারা দেয়।

পেছনের বৃষ্টি-জলের পাইপ বেয়ে ওঠে ওরা, আবার শেষরাত্রে সেইভাবেই নেমে যায়।

একদিন রাত্রে হঠাৎ ছাদে গিয়ে পড়ে বেকুব হয়ে গিয়েছিল বুলা। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতে প্রচণ্ড ধমক দিয়েছিল ছেলের দল, 'চুপ করুন; চুপ! ছাদে উঠেছেন কী করতে? যান, শুয়ে পড়ুন গে।'

তবু বুলা বলতে গিয়েছিল, 'আমাদের না বলে তোমরা—এভাবে—' তাতে ওরা জবাব দিয়েছিল, 'তাতে হয়েছে কি? এ তো আপনাদেরই ভাল, আমরা সারারাত জেগে পাহারা দিই।...আর ভাল না লাগলেও উপায় নেই, কান্‌ট্‌ হেল্‌প।...কাজেই গোলমাল ক'রে লাভ নেই, ভালয় ভালয় নিচে নেমে যান!'

আজও ছিল সেই দল।

উজ্জ্বল, ভবেশ, শ্যামল আর নবু।

উজ্জ্বলই দেখেছে ওকে—সুভদ্রাকে। মানে—দেখেছে সবাই, উজ্জ্বলই চিনতে পেরেছে।

'কে যাচ্ছে রে এত রাত্রে—মেয়েছেলে? আরে—গোরার সেই হাড়গিলে পিসীটা নয়?...হ্যাঁ, সেই তো, ভদ্রা পিসী।...এত রাত্রে একা—ব্যাপারটা কি?'

ফিস ফিস ক'রে কথা হয়েছে ওদের মধ্যে—সাধারণ ফিস-ফিসানির থেকেও নিচু-সুরে।

এইভাবে কথা বলার চেষ্টা করতে করতে আশ্চর্য সিদ্ধি হয়ে গেছে একটা।

সে কথা বলার শব্দ নিচে রাস্তা পর্যন্ত পেঁছিবার কথা নয়।

পেঁছিয়ও নি।

নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেছে সুভদ্রা, থানার দিকে।

এদের অস্তিত্বের খবর তার কানে পেঁছিয় নি।

তেমনভাবে কেউ বলে নি তাকে।

এ ছাদের এই স্থায়ী পাহারার কথা।

রঞ্জনদের এই বাড়িটা থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়—থানার দোর পর্যন্ত।

দেখার কোন অসুবিধে নেই।

বিশেষ কোন তোড়জোড় করতে হয় না।

এদের সঙ্গে দূরবীন তো থাকেই—দূরবীন দিয়ে পরিষ্কার দেখল নবু, সুভদ্রাকে থানার ভেতর ঢুকতে।

চেয়েই রইল ওরা সেদিকে, এক রকম নিঃশ্বাস রোধ ক'রে।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে বেরোল আবার।

ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে চোরের মতো ফিরছে বাড়ির দিকে।...

সুভদ্রা এখান পর্যন্ত এসে পেঁছিবার আগেই আরও দেখল ওরা—থানার বন্দুকধারী পুলিস দু'লরি—হর্ন না দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে চলে গেল বড়াল পার্কের

দিকে।

ওদিকে এদের দলের কোন লোক থাকে না। শুধু ঐ পড়ো বাড়িটা, এদের 'আর্সেনাল'।

অন্তত পঞ্চাশ ষাটটা বোমা, বোমার সরঞ্জাম, পাইপগান, গুলি—অনেক কিছু আছে।

এদের অপরাধের বহু প্রমাণ এবং আয়োজন।

উজ্জ্বলরা দ্রুত নিচের দিকে নেমে এল পাইপ বেয়ে।…

সুভদ্রা ওদের দেখতে পায় নি।

পায়ের আওয়াজও পায় নি।

মনে হ'ল মাটি ফুঁড়ে অথবা বাতাস থেকেই মূর্তি পরিগ্রহ করে অপদেবতার মতো আপনিই দেখা দিল উজ্জ্বল।

'এ দিকে এত রাতে কোথায় গিছলেন পিসী?'

খুব শান্ত গলা উজ্জ্বলের, সহজ ও স্বাভাবিক।

কিন্তু সুভদ্রা তাতেই চমকে উঠল।

ভয়ে হিম হয়ে গেল বুকের মধ্যেটা। এতক্ষণে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে বলেই এ ধরনের প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

কেউ না দেখতে পায় এই কথাই ভেবেছে শুধু—দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করতে পারে এটা ভেবে রাখে নি, তাই জবাবও কিছু ভাবা ছিল না।

থতমত খেয়ে পাংশুমুখে জবাব দিল, 'আমি? এই—মানে, মাথাটা ধরে উঠেছিল কিনা আগুন-তাতে সারা দিন থেকে—তাই মানে একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলুম আর কি!…এই কাছেই একটু, বলি যাই ঘুরে আসি।…এত রাত…মানে রাতটাও ঠিক বুঝতে পারি নি—'

আর বল'তে হ'ল না। এতও বলবার দরকার ছিল না।

বলতে পারছিলও না সে।

কথাগুলো জিভে জড়িয়ে যাচ্ছিল যেন।

অজ্ঞাত অথচ অনুমানসাধ্য একটা সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে সে ইতিমধ্যেই।

তবু তো একটি প্রেতমূর্তির পাশে আরও কয়েকটি ছায়ামূর্তি কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে তা টের পায় নি সুভদ্রা!

বুঝতে পারে নি ওদের উদ্দেশ্যও।

কাজটা এমনভাবেই সম্পন্ন হয়ে গেল যে শেষ মুহূর্তেও কিছু বুঝতে পারল কিনা সন্দেহ।

ফলে, এ জীবনে আর কিছু বোঝার প্রয়োজনও রইল না।

॥ আট ॥

প্রথমটা কিছু বুঝতে পারে নি দীপ্তাও।

সংবাদটার স্থূল অর্থই মাথায় পৌঁছতে দেরি লেগেছিল। সংবাদদাতার মুখের দিকে বিমূঢ় বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে বসে ছিল প্রায় চার পাঁচ মিনিট—গূঢ় অর্থ তো ভাববারই অবকাশ পায় নি।

তার পিসীকে খুন করেছে?

সুভদ্রা পিসীকে?

ওদিকে রাস্তার ধারে শিরীষ গাছের নীচে পড়ে আছে?

দূর! তা কখনও হয়! ওর পিসীকে কে মারবে, কেন মারবে?

'হ্যাঁ গো,' পাশের বাড়ির লালী বলে হাঁপাতে হাঁপাতে, 'স্বচক্ষে দেখে এলুম আমি—এই মাত্তর। এখনও তো পড়ে আছে, লোকে লোকারণ্য। পুলিস এসেছে দু'গাড়ি। শুনছি কুকুর আনতে গেছে। তা কুকুর নাকি কিছু করতে পারবে না, রাঙা কাকা বলছিল—যারা মেরেছে তারা নাকি কিছু রেখে যায় নি ধরবার মতো। ওদের কোন জিনিস পড়ে থাকলে তাই শুঁকে শুঁকে তো কুকুর যায় কি না!··· মাগো, পাঁঠা-কাটার মতো ক'রে নাকি কুপিয়েছে ছুরি দিয়ে—কেউ বলছে দা দিয়েও। আঠারো-উনিশ জায়গায় কোপানোর দাগ। নিজে দেখি নি অবিশ্যি—কাছে তো যেতে পারলুম না। অনেক লোক ঘিরে আছে—শুনলুম, ওরা বলাবলি করছিল—'

লালীর কণ্ঠে রীতিমতো ইচ্ছাতুর ক্ষোভ একটা—এই বীভৎস দৃশ্য দেখতে পায় নি বলে।

অর্থাৎ সন্দেহের কোন অবকাশ নেই আর।

এমন কোন অবলম্বন নেই—যাকে ধরে সন্দেহের আশ্বাসটুকু জীইয়ে রাখা যায়।

খবর পেয়ে দীপুর বাবা-মাও ছুটে গেছেন।

ওর ভাইরা যে ভোর থেকেই নিপাত্তা হয়েছে, সেও বোধ হয় এই খবর পেয়েই।

কে জানে ওরাই কি—?

একটা কুটিল সন্দেহে মনটা যেন কেমন বিবশ বিকল হয়ে পড়ে কিছুকালের জন্যে।

তারপর নিজে নিজেই প্রবলবেগে ঘাড় নাড়ে আবার।

না না, ছিঃ! তা কেন হবে?

তা কখনও হয়?

ওরা যাই করুক—পিসীকে কখনও, মার চেয়েও যে পিসী ওদের কাছে বড়—?

না, এত অমানুষ ওরা হবে না।

তবে?

কে মারল, কারা মারল এমন ক'রে? কেন মারল? পিসী কি করল?

নিরীহ, ভালমানুষ, স্নেহময়ী—সারা জীবনটাই বলতে গেলে যে পরের জন্যে বিলিয়ে দিয়ে গেল !

তাকে মেরে কার কি লাভ হবে ?

কী উদ্দেশ্য সাধিত হবে ?

উত্তরটা, সংবাদের গূঢ় অর্থটা একটু একটু ক'রে আপনিই দেখা দিল মনে—বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে।

আর একটা গুরুতর সংবাদে এ সংবাদের টীকাভাষ্য আপনিই তৈরী হয়ে গেল।

শেষরাত্রে পুলিস নাকি বড়াল পার্কের বাড়িতে হানা দিয়ে একরাশ বোমা, বোমার সরঞ্জাম ও অন্য অস্ত্র পেয়েছে—পাইপগান, রিভলভার, দেশী পিস্তল, মায় দশ-বারোটা ছোরা।

আর প্রায় সেই সঙ্গেই তারা প্রদীপের বাড়িতেও এসেছে। বাড়ি ঘিরে ওদের ঘরে ঢুকে সামান্য কি খানাতল্লাশ করে প্রদীপকে ধরে নিয়ে গেছে। ও পাড়ায় আর কারও বাড়ি ঢোকে নি কিম্বা অন্য কোথাও কোন খানাতল্লাশী করে নি। মনে হয় যেন নিশ্চিত কোন খবর পেয়েই ওরা এই দু'জায়গায় হানা দিয়েছিল।

তবে কি—

তবে কি পিসীই এই ঘটনার মূলে ছিল ?

সে-ই কি ঘটিয়েছে এটা ?

নইলে সে-ই বা অত রাত্রে রাস্তায় বেরোবে কেন ? কোন দিন তো বেরোয় না ! খিড়কীর দোর খোলা রেখে—?

বাবা বলছেন বটে কোন ছুতো করে ডেকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দীপ্তার বিশ্বাস হয় না সে কথা।

তাহ'লে কি অন্তত ওদের কাউকে বলে যেত না, দরজাটা বন্ধ করে দিতে ?

যত ভাবে তত এই সমাধানটাই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়।

আর কোন পথ দেখতে পায় নি সুভদ্রা প্রদীপকে বাঁচাবার, অন্য কোন নিরাপদ জায়গা দেখতে পায় নি যেখানে তাকে সরিয়ে দেওয়া যায়—হাজত বা জেলখানা ছাড়া।

ঐখানে থাকলেই নিরাপদ !

এদের উদ্যত মারণাস্ত্র সেখানে পেঁছিতে পারবে না।

এই সব সন্দেহে পুলিস ধরলে অল্পে অব্যাহতি পাবে না প্রদীপ এটাও বুঝেছে সে, ছ'মাস এক বছর—কি আরও বেশী পড়ে থাকতে হবে হাজতে।

তত দিনে কত কি ঘটে যেতে পারে !

প্রদীপ যদি পুলিসের কাছে এদের কারও নাম কি প্ল্যান না বলে দেয়, চুকলি না খায়—চাই কি এদেরও আর বিদ্বেষ থাকবে না, সন্দেহটা শ্রদ্ধায় পরিণত হবে।

এই সব ভেবেই হয়ত পিসী দুপুর রাত্রে থানায় গিয়েছিল—চুকলি খেয়ে এসেছে প্রদীপদার নামে।

এদের কথাবার্তা, বিশেষ দুপুর রাতে গলির ধারে যে গুপ্তসভা বসে,

সেখানকার পরামর্শ পরিকল্পনা পিসীর শুনতে কোন অসুবিধা হয় না।

ছেলেরাও তা জানে।

কিন্তু পিসীকে এত নিরীহ, এতই ভালমানুষ—বোকাসোকা সেকেলে মুখ্যু মেয়েছেলে বলে জানে যে তা নিয়ে কোন মাথাও ঘামায় নি কখনও।

বিপদ আর যেখান দিয়েই আসুক—পিসীর কাছ থেকে আসতে পারে এ সম্ভাবনা কারও মাথাতেও যায় নি কখনও।

ইন্দ্রিয়যুক্ত কোন মানুষ বলেই মনে করে নি ওরা, ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করে নি কখনও।

সেই বিশ্বাসের বা মূঢ়তার সুযোগেই পিসী প্রায় প্রতিদিনই বসে শুনত ওদের কথা।

এইভাবে এইসব কথাবার্তার মধ্যে থেকেই বোধহয় বড়াল পার্কের ঘাঁটির খবর সংগ্রহ করেছিল পিসী—সেটাই কাজে লাগাল।

খবর দিয়ে থানা থেকে বেরোবার সময় কেউ দেখে থাকবে, ওদের দলের কেউ সেই সময়ই পিছু নিয়েছে, দলবলকে খবর দিয়ে ডেকে এনেছে—

আবারও সেই কুটিল যন্ত্রণাদায়ক সংশয়টা মনে দেখা দেয়।

তবে কি, তবে কি তার মেজদারাও এই দলে ছিল! তারাই—?

পিসী—আজন্ম যাকে দেখে আসছে—সে ছিল, সে থাকবে, এইভাবেই ওরা দেখত তাকে।

তার সম্বন্ধে যে বিশেষভাবে কিছু ভাববার বা অনুভব করবার আছে—এমন কখনই মনে হয় নি।

আজ এতকাল পরে এই প্রথম মনে হ'ল দীপ্তার, ওর এই চির-অবজ্ঞাত পিসী ওদের কত আপন ছিল, কত ভালবাসত! আর ওরাও—

ভাবতে ভাবতেই দুই চোখ জ্বালা ক'রে উষ্ণ অশ্রু ভরে এল ওর।

ওর জন্যে, ওর দুঃখ দূর করার জন্যে পিসী নিজের জীবনটাই দিল এইভাবে!

কত ভেবেছে পিসী, কতখানি ভেবে এত মরীয়া হতে পেরেছে না জানি!

কী দুঃসাহসে ভর করে কতখানি ঝুঁকি নিয়েই না গেছে!

সে যে কখনও একা ট্রামে বাসে চড়ে যায় নি আজ পর্যন্ত!

পিসী, পিসী তোমার দীপুকে তুমি এত ভালবাসতে?

আর সে এত অকৃতজ্ঞ যে কখনও সেটা উপলব্ধি করে নি, করার চেষ্টা পর্যন্ত করে নি?

কেন এ কাজ করতে গেলে পিসী?

কেন এইভাবে অপঘাতে জীবনটা দিলে?

কাদের জন্যে এত বড় আত্মদানটা করলে?

কোন দিন কারও কাছ থেকে কিছুই তো পেলে না, দিয়েই গেলে জীবনভোর!

একটু কৃতজ্ঞতাও ওরা কোন দিন জানাল না—এতখানি নিঃস্বার্থ ভালবাসার, এতদিনের এত স্বার্থত্যাগের !

পিসী, শুধু যদি তোমার দীপু আজ তোমাকে এটাও জানাতে পারত যে, সে তোমার এই মহৎ দানের অর্থ বুঝেছে, তোমার এই আত্মত্যাগের মূল্য !

সে সুযোগটুকুও যে আর রইল না।

এখন দীপার মনে হয়, যেন ওদের পিসীই এ বাড়ির—ওদের ইংরেজী পাঠ্য-বইতে পড়া—'প্রোটেক্‌টিং এঞ্জেল' ছিল।

ওদের ত্রাণকর্তা, রক্ষাকর্তা।

পিসী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে শুধু বিপদ আর বিষাদ, অমঙ্গল আর অশান্তি দেখা দিতে লাগল।

সংসার তো অচল বটেই—সুভদ্রা থাকতে শুধু ডাল ভাত আর শুধু ডাল রুটিই হোক, পেটে দেবার মতো কিছু-না-কিছু জুটতই, এখন সেটাও বন্ধ হয়ে গেল।

এখন এবেলা হয় তো ওবেলা হয় না, এতকাল পরে সাত্য-সত্যিই উপবাস শুরু হল ওদের।

কানাই এবার হয়ত বুঝেছে ব্যাপারটার গুরুত্ব। অসহায়ভাবে একে ওকে বলছে একটা কাজ খুঁজে দেবার জন্যে—কিন্তু যে কোন কাজই কখনও করে নি জীবনে, লেখাপড়াও জানে না, মানে চাকরি করার মতো—তাকে কী কাজ কে দেবে !

অনেক দিন আগে একটা ইস্কুলে ড্রয়িং মাস্টারের কাজ করার কথা বলেছিলেন সেখাকার সেক্রেটারী বিমলবাবু—তাঁর স্পর্ধায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল কানাই ; রাগ করে নি, করুণার হাসি হেসেছিল।

এখন তাঁর কাছেও গেল—কিন্তু বর্তমানে যিনি সে কাজ করছেন তাঁকে ছাড়িয়ে ওকে সে চাকরি দেওয়া সেক্রেটারিরও অসাধ্য, বিমলবাবু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সঙ্গে সবিনয়ে সেই কথাই জানিয়ে দিলেন।

তাঁর প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসা চরিতার্থ হওয়া ছাড়া কোন লাভই হ'ল না।

তবু এও তুচ্ছ।

সেটা পরে বোঝা গেল।

হঠাৎ তীপুর শরীর খারাপ হতে লাগল প্রায়ই।

যা খায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বমি হয়ে যায়, মাথা ঘোরে, পা দুটোও একটু ফোলা-ফোলা মনে হয়।

কী কারণ কেউ বুঝতে পারে না।

সুভদ্রার মৃত্যুর পর সেই যে নিতাই গোরা সবু সরে পড়েছিল—বহুদিন পর্যন্ত এদিকে কেউ আসে নি।

সম্প্রতি সবু এসেছে, কিন্তু সে ছেলেমানুষ, দীপুর চেয়েও এক বছরের ছোট।

তাকে দিয়ে কোন দায়িত্বের কাজ হয় না।

পয়সা খরচ করে ডাক্তার দেখানো সম্ভব নয়।

নিয়ে গেলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। সেটাও কানাইয়ের দ্বারা হয়ে ওঠে না।

হয়ত আত্মসম্মানে বাধে, হয়ত বা আসল কারণ অকর্মণ্যতাই।

কিন্তু শেষে আর সক্রিয় না হয়ে উপায় রইল না।

চোখের কোণে সুগভীর কালি দেখা দিল, সমস্ত শরীর রক্তহীন বিবর্ণ হয়ে উঠল।

এইবার বাবা-মা দুজনেরই টনক নড়ে উঠল।

যে শোভা নিজের ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে কোন দিন কিছু খারাপ ধারণা করতে পারে না, যার বিশ্বাস তার ছেলেরা আর মেয়েরা সকলেই দেবশিশুর মতো পবিত্র আর সরল—তারও মনে একটা সন্দেহ আর আশঙ্কা দেখা দিল।

অপমানকর লজ্জাজনক সম্ভাবনা একটা।

শেষ পর্যন্ত আর কোন উপায় না দেখতে পেয়ে পাশের বাড়ির আচার্যি গিন্নীকে ডেকে আনল।

আচার্যি গিন্নী বহুদর্শী লোক, বিস্তর টোটকা ওষুধ-বিষুধ জানেন—তিনি হয়ত ধরতে পারবেন—ব্যাধিটা কি!

আচার্যি গিন্নী ঘরে ঢুকে তীপুর দিকে মিনিট খানেক চেয়ে থেকেই বললেন, 'মর্ মাগী, ন্যাকা নাকি তুই বৌ? এতগুলো ছিলে বিইয়েছিস এখনও পইতি মেয়ে দেখলে বুঝতে পারিস না? তোর মেয়ে তো নিজের সব্বনাশ নিজে করে বসে আছে!'

গত দু'তিন দিন ধরে এই সন্দেহটাই যে তার মনে দেখা দেয় নি তা নয়—সেই জন্যেই আরও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—তবু শোভা যেন শিউরে উঠল কথাটা শুনে।

কিছুকালের মতো মনে হ'ল, হাতে-পায়ে এতটুকু বল নেই, সবটা অসাড় হয়ে গেছে।

সে কেমন এক রকমের আলগো গলায় প্রায় চুপি চুপি বলে উঠল, 'য়্যাঁ, সে কি!…কী বলছেন দিদি। না না, ভুল হচ্ছে আপনার!'

'তা আর হবে না! তার কম নেশা জমবে কেন?…আমি তোমার মতো ন্যাকা উদোমাদা হ'লে সে ভুল হ'ত! এ সব ব্যাপারে আমার ভুল হবে না—আমি যে কোন ডাক্তারের কান কেটে শাখাতে পারি!'

শুয়েই ছিল তৃপ্তি, তার মধ্যেই যেন মাথাটা হেঁট হয়ে এল তার, বালিশের খাঁজে মুখটা গুঁজে দিল।

অর্থাৎ সর্বশেষ আশ্রয় হিসেবে যেটুকু সন্দেহ থাকতে পারত,—তাও আর রইল না।

এ-তো এক রকমের স্পষ্ট স্বীকারোক্তিই।

ঘরের বাইরে এসে আচার্যি গিন্নী পুনশ্চ বললেন, 'দ্যাখ, সাবধান ক'রে দিয়ে যাচ্ছি—যা-তা ক'রে এটাকে নষ্ট করতে যাস নি, ওর শরীরের যা অবস্থা—সইতে পারবে না, হিতে বিপরীত হবে, হাতে দড়ি পড়বে। এক যদি কোন ভাল ডাক্তার রাজী হয় সে আলাদা কথা, তার দায়িত্বে করে করুক। নইলে—সোজাসুজি হাসপাতালে গিয়ে কার্ড করিয়ে ওর চিকিচ্ছে শুরু ক'রে দে। শরীরে কিছু নেই—জীবনমরণ সমিস্যে ওর!'

এইবার পুরোপুরিই সংসারের আবর্তে পড়তে হ'ল কানাইকে।

যে মিথ্যার স্বর্গ রচনা ক'রে তার মধ্যে তৃপ্ত ছিল এতদিন—সে স্বর্গ ধারে-কাছে কল্পনায়ও খুঁজে পেল না সে।

অথচ—এ বিপদে যে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারত, চিরদিন যে সাহায্য ক'রে এসেছে সেই সুভদ্রাই নেই।

অসহায় নির্বোধ লোকেরা যা করে, কানাইও প্রথমটা তাই করল।

চেঁচামেচি ক'রে, সত্যেন ও দীপুকে গালাগালি দিয়ে, নিজের ছেলেদের অভিসম্পাত করে হাট বসিয়ে ফেলল একেবারে।

ফলে যাদের কাছে গোপন করার কথা, যারা জানলে বেইজ্জৎ হ'তে হবে সব চেয়ে বেশী—সেই প্রতিবেশীদের কানাই নিজেই জানিয়ে দিল।

তারপর নিজের আস্ফালনেই ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

আবারও আচার্যি গিন্নীই এসে তাকে ঠেলে তুললেন কতকটা। বললেন, 'কী, করছ কি এসব? এখন কি আর বসে থাকার সময় আছে? যাও, দ্যাখো সে নচ্ছার ছোঁড়াটা কোথায়, তাকে ভয় দেখাও, বলো বে করতে—নইলে থানা-পুলিস করবে বল গে। চাই কি তোমার ছেলেদের যে দলটি আছে—তাদের নিয়ে গিয়ে ওর বাবা মিনসের বাড়ি ঘেরাও ক'রে চেঁচামেচি ক'রে এসো—যাতে সে মিনসেও মিটিয়ে দিতে পথ না পায়!'

কথাটা খুবই সমীচীন, মনে লাগেও।

কিন্তু মূলেই ভুল।

সে পথও বন্ধ।

দেখা গেল সত্যেন কোথায় থাকে—কত দূরে—তার কোন খবরই জানা নেই কারও।

এতদিন আসছে—তবু সেটা জেনে রাখার কথা মনে পড়ে নি কখনও।

নিতাই গোরা হাবু ওরা জানে, তারা এখনও নিপাত্তা।

সবু আছে এক, সে জানে না।

কানাই দীপুকেই চেপে ধরল, 'তুই নিশ্চয় জানিস, বল্ কোথায় থাকে সে। কাউকে দিয়ে যদি ডেকে পাঠাতে পারিস, তাই দ্যাখ বরং—'

এতটা শোভারও সহ্য হ'ল না।

সে বলল, 'তুমি পাগল হয়েছ! এই রকম ক্ষেত্রে ডেকে পাঠালেই সে অমনি

আসবে—হাড়কাঠে মাথা দিতে ? তোমাকেই যেতে হবে উদ্যোগী হয়ে, চেপে ধরতে হবে।

কানাইয়ের মনে হয়, চারিদিক থেকে সবাই যেন কোণঠাসা ক'রে তাকে খোঁচাচ্ছে অবিরত।

সারা পৃথিবীই আজ যেন তার শত্রু হয়ে উঠেছে।

রীতিমতো অবিচার বলেই মনে হয় তার।

শোভা নীরবে শুধু চোখের জল ফেলে, আজও স্বামীকে এর যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পারে না।

সে অভ্যাসই গড়ে ওঠে নি তার—এই দীর্ঘকালেও।

সে খিঁচিয়ে ওঠে, 'সব আমাকে করতে হবে এখন, আমাকেই ছুটোছুটি দৌড়ো-দৌড়ি করতে হবে, উদ্যোগী হ'তে হবে! লজ্জা করে না তোমার? তুমি মা হয়ে মেয়ের দিকে নজর রাখতে পার না! এমন কাণ্ডটা হয়ে গেল একটু টেরও পেলে না? ছোঃ!'

॥ নয় ॥

দীপু নিজের মনের স্বার্থপর চেহারাটা দেখে নিজেই অবাক হয়ে যায়।

তীপুর এই অবস্থা, বাঁচবে কিনা তারই ঠিক নেই, দিনরাত কাঁদছে সে—বাবা ছুটোছুটি করছেন, মার মুখে অন্ন নেই,—ভাইগুলো নিরুদ্দেশ, তবু এসব চিন্তা ছাপিয়ে তার মনে যেন প্রদীপের চিন্তাটাই বড় হয়ে ওঠে।

দিনরাত তার কথাই ভাবে আর চোখের জল ফেলে।

অবশ্য হ্যাঁ—সত্যেনের ঠিকানা সে-ই যোগাড় ক'রে দিয়েছে বটে।

এই বিপদের আভাস পেয়েই সম্ভবত গত মাসখানেক যাবৎ সত্যেন এদিকে আসা ছেড়ে দিয়েছে, বাড়িতেও নাকি থাকে না—কোথায় কোন্ আত্মীয়ের বাড়ি অজ্ঞাতবাস করছে।

কিন্তু দীপু জানে ওর একটি আড্ডা আছে—সেখানে একবার না একবার আসবেই সে!

মেজদার মুখেই শোনা ছিল কথাটা। ঠিকানাটাও মনে ছিল।

ঠিক কখন গেলে পাওয়া যাবে তাও জানত, মেজদা-সেজদারা বহুদিন আলোচনা করেছে। বোধহয় টাকার দরকারেই বার বার সত্যেনকে প্রয়োজন হ'ত ওদের।

সেই ঠিকানাই দিয়েছে বাবাকে।

আচার্য মশাই ওদের অবস্থা দেখে নিজে উপযাচক হয়ে কানাইকে সঙ্গে করে সেখানে গেছেন। সত্যেন নাকি প্রথমটা খুব চোটপাট করেছে, উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে—কিছুতেই স্বীকার করতে চায় নি।

কানাইও নাকি তাতে প্রথমটা খুব দমে গিয়েছিল, ওদেরই হয়ত ভুল হয়েছে

ভেবে—কিন্তু আচার্য মশাই পাকা লোক, তিনি সত্যেনেরও ওপর গলা বাড়িয়ে যাতে পাড়ার লোকের শুনতে কোন বাধা না থাকে—এমনি ভাবেই চেঁচামেচি ক'রে, নানা রকম ভয় দেখিয়ে কতকটা জব্দ করেছেন।

আচার্য মশাই বলেছেন যে, সহজে রাজী না হলে তাঁরা থানা-পুলিস করবেন, পাড়ায় ছেলেদের লেলিয়ে দেবেন—তারা একেবারেই শেষ ক'রে দেবে।

বোধ হয় এতেই কাজ হয়েছে।

খানিকটা গাঁইগুঁই করে শেষে কিছু টাকা দিয়ে মিটিয়ে নিতে পারে কিনা কানাই—সে রকম ইঙ্গিতও করেছে।

তখনও পর্যন্ত স্বীকার করে নি যে সে-ই দায়ী।

ভদ্রলোক বিপাকে পড়েছেন—তাঁকে সে কিছু আর্থিক সাহায্য করতে রাজী আছে—এই রকম একটা ভাব দেখিয়েছে।

তখন আচার্য মশাই আরও রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছেন। বেগতিক দেখে সত্যেন শেষে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, বাবার কাছে কথাটা পেড়ে তাঁকে রাজী করানোর চেষ্টা করবে।

তার জন্যে তিন-চারদিন সময় চেয়েছে, আর, বেশ বিশ্বাসযোগ্য আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছে যে—এর মধ্যে কথাটা নিয়ে যেন এ'রা গোলমাল বেশী না করেন, বাবার কানে এ কথাটা উঠলে আর তিনি কিছুতে রাজী হবেন না।

তিনি এটা কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না যে তাঁর ছেলেই এ কাজ করেছে—ইত্যাদি।

অর্থাৎ কিনা ভাঙলেও মচকাতে চায় নি শেষ পর্যন্ত।

এ সবই শুনেছে দীপু—কিন্তু তার মাথায় এর কোন অর্থ প্রবেশ করেছে কিনা সন্দেহ।

এর থেকেও ওর কাছে প্রদীপের বিপদটাই বেশী মনে হচ্ছে, সেই জন্যে।

তার কথা ভেবেই কাঁটা হয়ে আছে।

সেদিন যে কথাটা বলেছিল গোরা দীপুর মনে আছে।

বলেছিল, 'দলত্যাগীদের শাস্তি কি তা তো তোমার অজানা নেই পুপুদা, ঐ যে বাসিরহাটের দিকে এগারো জনকে একসঙ্গে বেঁধে মেরেছিল, পথের ধারে পড়ে ছিল বাঁধা লাশগুলো—ও তো এই দলত্যাগেরই শাস্তি। সে অবিশ্যি আমাদের দল নয়, আমাদের শত্রুই তারা। কিন্তু বিধি তো একই, তাদের দলের যা—আমাদের দলেরও তাই। সেদিন যে তিনজন একসঙ্গে লোপাট হ'ল শিবপুরে—তাও কেন বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই! মানুষ মারতে আমাদের কারুরই হাত কাঁপবে না তোমার মতো।'

কথাগুলো আজকাল, যেন একা হ'লেই কানের কাছে ঢাক পিটিয়ে কে বলতে থাকে, বজ্র-নির্ঘোষে।

হাত-পা ঝিম ঝিম করতে থাকে, মাথা ঘোরে, কপালে ঘাম দেখা দেয়।

মনে হয় পুলিস থেকে যদি আন্দামানে বা অমনি কোন জায়গায় পাঠিয়ে দেয় তো বেশ হয়।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর না কি একটা বলত না আগে!

না হয় ইহজীবনে আর তাকে দেখতেই পাবে না দীপু, তবু তার প্রাণটা তো বাঁচবে।

সেইটেই এখন ওর কাছে সব চেয়ে বড় প্রশ্ন।

সে বেঁচে আছে, সুস্থ আছে জানলেই ওর সুখ।

বিশেষ এখন আবার এ পাড়ায় এই বড় কারখানাটায় লক-আউট হওয়াতে আরও যেন বিপদ বেড়েছে।

তিন চার মাসের মাইনে পায় নি, মাসে দেড়শ দুশো টাকা আয়ের মিস্ত্রীমজুর যারা তাদের দুরবস্থা চরমে উঠেছে, ভাত খাবার মতো য়্যালুমিনিয়ামের বাসনগুলোও বেচে দিচ্ছে ফিরিওলা ডেকে, সোনা রুপো কি পেতল কাঁসা তো নেই-ই।

পর পর দু'বার এমনি হ'ল এক বছরের মধ্যে—কেমন ক'রে চালায় লোকগুলো?

এই সব মজুর—যাদের খাতির করে 'লেবার' বলা হয়—তার মধ্যে ছোকরা যারা, তারা বেমালুম এদের দলে মিশে গেছে; ওর মেজদাদের দলে।

এদের সঙ্গে মিশে বোমা তৈরী করছে, বাস পোড়াচ্ছে, ইস্কুল পোড়াচ্ছে, আবার এদের বাদ দিয়ে ইলেট্রিকের তার চুরি করছে, ট্রেন থেকে ব্যাটারি সরাচ্ছে, পাখা খুলছে।

ওয়াগন ভেঙে চুরি—এমনিও পথে পথে সুযোগমতো রাহাজানি করছে, দোকানে দোকনে ঘুরে টাকা তুলছে—'পার্টি'র নামে 'বোমা' তৈরীর খরচ বলে।

কোন্ পার্টি—ভয়ে কেউ খোঁজও নেয় না, ভয়ে-ভয়েই দিয়ে দেয়।

ওরা সেই কৃতজ্ঞতায় এদের খুন-জখমের কাজগুলোর,—ইস্কুলে আগুন লাগানোর কাজগুলোর—সাহায্য করতে এগিয়ে আসে বেশী না ডাকতেই।

ফলে 'কাজের' লোক এখন অনেক বেড়েছে।

দু'মাস আগে যেটুকু নিরাপত্তার কথা ভাবা চলত প্রদীপের সম্বন্ধে—এখন আর সেটুকু ভাবারও কারণ নেই।

অথচ সেই কথাটাই প্রদীপের বাবা বুঝছে না।

সত্যভূষণ ছেলেকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে।

একে ধরে, ওকে বলে—পুলিসের ওপরওলাদের হাতে-পায়ে ধরে বুক চাপড়ে মাথা খুঁড়ে বেশ একটু করুণারও উদ্রেক করেছে সকলের।

এইমাত্র ওদের বাড়ি গিয়েছিল দীপু, শুনে এল কে এক পুলিসের কর্তাব্যক্তি লোক নাকি কথা দিয়েছেন সত্যভূষণকে যে, শিগ্গিরই প্রদীপকে কোর্টে হাজির করিয়ে জামিনে খালাস দেবার ব্যবস্থা করবেন।

এমনভাবে কেস দাঁড় করাবেন তাঁরা—যাতে আদালত জামিন না দেওয়ার

কোন কারণ না খুঁজে পান।

সত্যভূষণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে কখনও কাঁদছে, কখনও হাসছে এ খবরে।

সে-ই সবিস্তারে ও সগর্বে খবরটা দিল দীপুকে।

নিজের অসামান্য কৃতিত্বের সংবাদটা।

আর দাঁড়াতে পারল না দীপু।

তারও তখন ঐ রকম পাগলের মতো কাণ্ডকারখানা করতে ইচ্ছে করছে, মনে হচ্ছে ঘাকতক চড় কষিয়ে দেয় সে ঐ আহাম্মক লোকটাকে, কিম্বা একটা লোহার রড মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়—যাতে বেশ কিছুদিনের মতো অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে, সেই ব্যবস্থা করে।

এত বোকাও হয় মানুষে !

এমন ক'রে ছেলের কল্যাণ ভেবে অমঙ্গল ডেকে আনে !

সব চেয়ে, তখন আর একটু দাঁড়ালেই বোধ হয় এই চোখের জলটা দেখে ফেলত ওরা।

ওর তখন ডাক ছেড়ে কাঁদতেই ইচ্ছে করছে যে !

এ কান্না ওর পিসীর কথা ভেবেই।

এতখানি স্বার্থত্যাগ তার, এতখানি আত্ম-বলিদান সবই বুঝি ব্যর্থ হ'তে চলল।

যারা সব চেয়ে হিতাকাঙ্ক্ষী প্রদীপের, তারাই এই চেষ্টাটাকে অর্থহীন ক'রে দিতে চলেছে।

সব চেয়ে মুশকিল এই, এ কথাটা বলাও যাচ্ছে না ঐ লোকটাকে।

কীল খেয়ে কীল চুরি করা যাকে বলে তাই করতে হচ্ছে।

বলতে পারছে না তার কারণ প্রদীপের, বাবাকে ও চেনে, পেটে একটাও কথা থাকে না, যত বড় বিপদের সম্ভাবনাই থাক—এ কথা সে চেপে রাখতে পারবে না। 'কাউকে বলো না ভাই' বলে অন্তত দশ জায়গায় বলে আসবে !

বিশেষ এক্ষেত্রে তার মনে হবে—বাপ হয়ে ছেলেকে ছাড়িয়ে আনবার চেষ্টা না করাটা খুব অশোভন, তাই কেউ কিছু মনে করুক বা না করুক—সে সকলকে ডেকে ডেকে কৈফিয়ৎ দেবে।

ফলে সর্বনাশটা বরং ত্বরান্বিতই হবে, তাকে রোধ করা যাবে না কোনমতেই।

সুতরাং আড়ালে এসে কাঁদা আর নিঃশব্দে কপাল চাপড়ানো ছাড়া কোন উপায় থাকে না দীপুর—এ বিপদ থেকে উদ্ধারের কোন পথ খুঁজে পায় না।

আবারও পিসীর কথা মনে পড়ে। এ সময় পিসী যদি থাকত !

॥ দশ ॥

সন্ধ্যার একটু পরেই—শোভা আচার্যি গিন্নীর বাড়ি গেছে, কানাই গেছে কয়েকটা

টাকা ধারা করতে, তীপু তেমনিই বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে—দীপু একা বাড়িতে ; নিঃশব্দে পাঁচিল টপকে কে একজন উঠোনে নামল ।

অন্ধকার বাড়ি, সময়ে টাকা না দেবার জন্যে আজ মাস-খানেক হ'তে চলল ইলেক্‌ট্রিকের তার কেটে দিয়ে গেছে ।

একটিমাত্র হ্যারিকেন লণ্ঠন ভরসা, সেটাও কম ক'রে রাখা আছে তেল পোড়ার ভয়ে—তার মধ্যে হঠাৎ এই ব্যাপারে চেঁচিয়ে ওঠারই কথা ।

অনভ্যস্ত অন্ধকারটাই যথেষ্ট ভয়াবহ, সামান্য কোন কারণ যোগ হ'লে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে ।

কিন্তু দীপু সে-সময়টায় নির্জন বাড়ি পেয়ে সাধ মিটিয়ে কাঁদছে, তাই ধরা গলায় একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে উঠল শুধু ।

তার বেশি কোন আওয়াজ বেরোল না ।

'চুপ ! আমি মেজদা ।' বলতে বলতে ভেতরের রকে উঠে এল গোরা । যে ট্রাউজার আর শার্ট পরে বাড়ি থেকে উধাও হয়েছিল সেদিন, এখনও বোধ হয় সেই অদ্বিতীয় পোশাকই পরা আছে—দীর্ঘকাল বোধ করি কাচাও হয় নি, অন্তত ঘামের দুর্গন্ধে তাই মনে হয় ।

'এই, ঘরে কিছু খাবার আছে, দিতে পারিস ? ভোর থেকে পেটে এক কাপ চা ছাড়া কিছু পড়ে নি ।'

'আছে বোধ হয় । সকালেই মা খানকতক রুটি ক'রে রেখেছিল—এ বেলার জন্যে । রূটি আর খানিকটা আলুভাতে ।'

'দে, তাই দে । তার বেশি আর তোদের কি জুটবে ! আর একটু চা দিতে পারিস ?'

'চা আছে—দুধ নেই । চিনিও বাড়ন্ত ।'

'তবে থাক । তুই রুটিই দে—'

মনে হ'ল হাত-মুখও ধোয়ার মতো ধৈর্য নেই গোরার—সেই অবস্থাতেই কলাইয়ের থালাটা একরকম দীপুর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে যেন গোগ্রাসে খেতে লাগল ।

'জল দে । বাসি রুটি আর শুকনো আলু, গেলা যায় !'

দীপু লণ্ঠনের আলোটা জোর ক'রে দিয়েছে, মোটামুটি খানিকটা দেখা চলছে তাতেই ।

রুক্ষ চুল, খোঁচা-খোঁচা এক গাল দাড়ি—কাপড়জামাও যৎপরোনাস্তি ময়লা ।

অত সুন্দর চেহারা গোরার—কিন্তু এ কী হাল হয়েছে !

ওর দিকে তাকিয়ে আবারও যেন দীপুর চোখে জল এসে গেল ।

'তা তুমি দাড়ি কামিয়ে একটু চান ক'রে নিলে না কেন আগে ? এ কী হালে ঘুরে বেড়াচ্ছ ?'

'সময় নেই । এখনই চলে যেতে হবে । শুধু জামা-প্যাণ্টটা পাল্‌টে যাব । আমার কি নিমাইয়ের একটা কিছু আছে তো বাইরে ? আর দ্যাখ—কিছু,

নিদেন দুটো একটা টাকা আছে বাড়িতে, দিতে পারিস ?'

'টাকা ! এ বাড়িতে ! তুমি কি নতুন হ'লে ? লক্ষ্মীর কৌটোর টাকা পর্যন্ত বার ক'রে খরচা হয়ে গেছে। এ পাড়ায় আর ধার পাবার উপায় নেই বলে বাবা সালকেয় গেছে বাবার কে পিসতুতো ভাইয়ের কাছে—হাঁটতে হাঁটতে যাবে বলে দুপুর বেলাই বেরিয়ে গেছে। নইলে কাল আর হাঁড়ি চড়বে না। একখানা ছোট পাঁউরুটি কেনারও পয়সা নেই।'

'থাক, থাক। আর তোকে ফিরিস্তি শোনাতে হবে না। ঝকমারি হয়েছিল আমার পয়সার কথা তোলা !'

বলতে বলতেই কথাটা থামিয়ে রেখে কলতলার দিকে যায় আঁচাতে।

'তুমি কি এখনই চলে যাবে নাকি ? আবার চলে যাবে ?'

'এক্ষুনি যাব। এতটা থাকাই ঠিক হয় নি আমার।'

তারপর দীপুকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই অসহিষ্ণুভাবে বলে ওঠে—'প্যাণ্টটা ? প্যাণ্ট একটা দে শিগগির !'

কিন্তু খামকা এমন পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন মেজদা ? কৈ, তোমাদের পুলিস খুঁজছে বলে তো শুনি নি ! তোমাদের কি কোন কেসে জড়িয়েছে ? মিছিমিছি এমন পালিয়ে থাকলেই তো বরং সন্দেহ করবে !'

এবার হাসল গোরা।

নিরানন্দ কঠিন এক ধরণের হাসি।

ওর আঁচলে হাত মুছতেই এপাশে ফিরে দাঁড়িয়েছিল সে।

লণ্ঠনের আলোটা নিচে থেকে এসে পড়ে আলো-আঁধারিতে মুখখানা বেশ একটু ভয়াবহই দেখাচ্ছিল ওর, তার সঙ্গে এই হাসিটা মিলে আরও বীভৎস বোধ হ'ল।

গোরা বলল, 'ব্যাটারা হয়ত এতক্ষণে কুকুর এনে ফেলেছে। বড়লোকের ছেলে, একটু গা-নাড়া দিতে হবে বৈকি। সত্যেনটাকে সাবাড় ক'রে এলুম যে !'

'য়্যাঁ !' এবার আর সামলাতে পারল না দীপু নিজেকে, 'করলে কি মেজদা ? বোনটার কথা একবারও ভাবলে না ? ওর কি হবে এখন—ওর পেটের ছেলেটা কি পরিচয় দেবে !'

'সে পরিচয় দেবার এমনিও উপায় ছিল না। তাই তো মারলুম। ব্ল্যাকগার্ড শয়তানটা এর মধ্যে আর একটা মেয়েকে রেজেস্ট্রী ক'রে বিয়ে ক'রে বসে ছিল। বাবার কাছে সময় চেয়ে সেই মেয়েটাকে নিয়ে আজই রাত্রে বিলেত পালাবার তালে ছিল। বিশ্বাসঘাতকের কি শাস্তি তা আগেই ওকে জানিয়ে দিয়েছিলুম, শয়তানটা বিশ্বাস করে নি। ভেবেছিল খুব চালাক ও, আমাদের কাঁচকলা দেখিয়ে সরে পড়বে। কে চালাক বুঝিয়ে দিয়েছি ভাল ক'রেই। কোপাতে-কোপাতেই শালাকে শুনিয়ে দিয়েছি কে আমি, কেন সাবাড় করলুম ! ভেবেছিল গরিবের মেয়ে—কটা টাকা ফেলে দিলেই আমরা সব হজম ক'রে নেব। তাও, শালা তখন তীপুর লোভে লোভে কত কথা বলেছিল, কিছুই দেয় নি তার—পনেরো আনাই ফাঁকি দিয়েছে !'

ঘরের মধ্যে তীপ্ন চেঁচিয়েই কাঁদছে, অবশ্য তার পক্ষে যতটা জোরে সম্ভব।

মেজদার কথা তার কানে যাওয়ার কোন অসুবিধা ছিল না, সবটা না গেলেও সর্বনাশের যে আর কিছুই বলার নেই সেটুকু বুঝেছে সে।

ইতিমধ্যে আলনা থেকে একটা ট্রাউজার আর শার্ট বার ক'রে পোশাকটা পাল্টে নিয়েছে গোরা।

পুরনো ছাড়া জামা-প্যাণ্টটাও গুটিয়ে তুলে নিয়ে বগলদাবা করল। বলল, 'এগুলো আর রেখে যাব না, হয়ত রক্ত লেগেছে কোথাও, পুলিস এলে তোরা বিপদে পড়বি। পথে কোথাও ফেলে দিতে হবে।'

তারপর, বোধ হয় তীপুর বুকফাটা কান্না অসহ্য হওয়াতেই—হয়ত এসব দুর্বলতার ওপরে উঠতে পারে নি এখনও—সেই অন্ধকার ঘরের দিকে চেয়েই খিঁচিয়ে উঠল, 'ওকে প্যান্‌প্যান্‌ করতে বারণ কর দিকি। তার শোকে আবার কাঁদছে! বেশ হয়েছে, প্রেম করার সময় মনে ছিল না? বোকা আহাম্মক কোথাকার!'

এবার আর পাঁচিল টপকাবার প্রয়োজন নেই। পিছনের দরজা—যেটা দিয়ে পিসী একদা শেষ বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই দোর খুলেই বেরিয়ে গেল গোরা।

যেতে যেতে একবার ফিরে দাঁড়িয়ে শুধু বলে গেল, 'বাবা-মাকে বলিস নি, তুইও ডাক ছেড়ে কাঁদতে বসিস নি। নিমেটাও কাল গেছে। পকেটে বোমা নিয়ে যাচ্ছিল নারকেলডাঙ্গা লাইন ধরে, হোঁচট খেয়ে পড়ে বোমা ফেটে উড়ে গেছে। সাংঘাতিক বোমা—ওর নিজেরই তৈরি, খুব এক্সপার্ট হয়ে উঠেছিল তো—ওর মুখের আর চিহ্নও নেই। সেইটেই রক্ষে! শালারা আইডেনটিফাই করতে পারবে না!'